তুলি-কলম

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬৫
অক্টোবর, ১৯৫৮

প্রকাশক: কল্যাণব্রত দত্ত ॥ তুলি-কলম ॥ ১, কলেজ রো, কলকাতা-৯
মুদ্রক : নলিনীকান্ত প্রামাণিক ॥ কণ্টাই প্রেস ॥
২৪৪/২, মানিকতলা মেইন রোড, কলকাতা-৫৪

TARJAN SAMAGRA

EDGAR RICE BURROUGHS

PART III

Translated by—Manindra Dutt

প্রকাশকের নিবেদন

এডগার রাইস বারুজের টারজন সিরিজের চব্বিশটি মূল ইংরাজি গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ অনূদিত রূপটি, সুবৃহৎ তিন খণ্ডে প্রকাশ করার এক পরিকল্পনা আজ হতে তিন বছর আগে আমরা গ্রহণ করি। কিন্তু ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম খণ্ড প্রকাশ করার পর বাকি দুটি খণ্ড প্রকাশ করতে দীর্ঘ দুটি বছর সময় লেগে গেল। কারণ টারজন সিরিজের মূল গ্রন্থগুলি বাজারে দুষ্প্রাপ্য থাকায় আমাদের প্রকাশকার্য আশানুরূপ অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। যাই হোক, অবশেষে বিভিন্ন রকমের প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে তিনটি খণ্ডে মূল টারজন সিরিজের সব বইগুলির পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পারায় আজ আনন্দিত আমরা। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের অবগতির জন্য জানাই যে আমাদের প্রকাশিত এই 'টারজন সমগ্র' বাজারে প্রকাশিত অন্যান্য 'টারজন' এর মত মূল গ্রন্থমালার সংক্ষিপ্ত বা বিকৃত রূপ নয়। ইতিমধ্যেই আমাদের দ্বারা প্রকাশিত টারজন সমগ্রের দুটি খণ্ড পাঠকদের মধ্যে যে বিপুল জনপ্রিয়তা ও অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে তার জন্য সহৃদয় পাঠকবর্গকে জানাই আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ।

টারজন দি ইন্‌ভিন্সিবল্‌

অজেয় টারজন

১—ছোট্ট নকিমা

আমি ইতিহাসকার নই, ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করাও আমার কাজ নয়; তাছাড়া, আমি বিশ্বাস করি, এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাকে এড়িয়ে চলাই উপন্যাসলিখিয়েদের উচিত, আর তার মধ্যে দুটো প্রধান বিষয় হল রাজনীতি ও ধর্ম। অবশ্য, এর যে কোন একটা ক্ষেত্র থেকে কোন ভাবধারাকে চুরি করা কিছু অন্যায় কাজ বলে আমি মনে করি না। অবশ্য সেই বিষয়বস্তুটাকে যদি এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যাতে উপন্যাসের একটা পরিষ্কার আমেজ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওঠে।

যে গল্পটা আমি বলতে যাচ্ছি সেটা যদি দুটি নির্দিষ্ট ইওরোপীয় রাষ্ট্রের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত তাহলে তার ফলে মহাযুদ্ধের চাইতেও ভয়ংকর আর একটা যুদ্ধ বেধে যেতে পারত। কিন্তু তা নিয়ে আমার কোনরকম মাথাব্যথা নেই। আমার কথা হচ্ছে, গল্পটা খুব ভাল আর আমার পক্ষে খুব আকর্ষণীয়ও বটে, কারণ এই কাহিনীর অনেকগুলি রোমহর্ষক অধ্যায়ের সঙ্গে অরণ্যরাজ টারজন খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

রাজনীতিভিত্তিক ইতিহাসের কচকচি শুনিয়ে আপনাদের বিরক্তি সৃষ্টি করতে আমি চাই না; আর কিছু মানুষ ও স্থানের কথা বলতে বসে যে সব কাল্পনিক নাম আমি ব্যবহার করব তাদের বাস্তব উৎস খুঁজবার চেষ্টায় আপনারাও অনর্থক বুদ্ধির খেলায় মেতে উঠবেন না; কারণ আমি মনে করি, শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের স্বার্থে সেগুলি অজানা থাকাই উচিত।

আর একটি টারজন-কাহিনী হিসাবেই এটাকেও গ্রহণ করবেন; আশা করি এর থেকে আপনারা আনন্দ ও স্বস্তির খোরাক পাবেন। আর যদি চিন্তার খোরাকও কিছু পেয়ে যান তাহলে তো আরও ভাল।

কিছুদিন আগে সংবাদপত্রগুলির এক কোণে অতি সাধারণভাবে প্রকাশিত একটি সংবাদে এই মর্মে একটি গুজব প্রচারিত হয়েছিল যে আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলবর্তী সোমালিল্যাণ্ডে মোতায়েন করা একটা ফরাসী উপনিবেশ-রক্ষীবাহিনী আফ্রিকাস্থ ইতালীয় উপনিবেশকে আক্রমণ করেছে। নিঃসন্দেহে সে সংবাদটি অনেকেরই চোখে পড়ে নি, আর যাদের চোখে পড়েছিল তারাও এতদিনে সেটা ভুলে গেছে। সেই সংবাদটির অন্তরালে রয়েছে আর একটি কাহিনী—ষড়যন্ত্র, গুপ্ত প্রণয়, দুঃসাহসিক অভিযান ও প্রেমের কাহিনী—সে কাহিনী গড়ে উঠেছে শয়তান ও বোকাদের নিয়ে, সাহসী মানুষদের নিয়ে, সুন্দরী নারীদের নিয়ে, অরণ্য ও জঙ্গলের পশুদের নিয়ে।

সেই ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে আফ্রিকার একেবারে ভিতরে আরও একটি বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছিল যার খবরও আপনারা কেউ রাখেন না। অবশ্য সে ঘটনাটির সঙ্গে ইওরোপের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র-জাল অথবা বিভিন্ন জাতির ভাগ্য যে জড়িয়ে থাকতে পারে সে কথা দূরতম কল্পনায়ও মনে আনা যায় না। কারণ ঘটনাটি অতি তুচ্ছ। একটা খুব ছোট বানর ভয়ে চীৎকার করতে করতে গাছের মাথায় মাথায় ছুটে পালিয়েছিল। বানরটা ছোট্ট নকিমা, আর তাকে তাড়া করেছিল একটা বড়, ধাড়ি বানর।

ইওরোপ ও পৃথিবীর কপাল ভাল; তাই বড় বানরটা নকিমার ছোটার সঙ্গে তাল রাখতে পারল না; নকিমা পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু সে থামল না। গাছের ডালে-ডালে অনবরত ছুটতে লাগল। তারপর এক সময় থেমে গিয়ে বিষণ্ণ মনে কি যেন ভাবতে লাগল। অবশ্য তার এই বিষণ্ণতার একটা গভীর কারণ আছে। অনেক অনেক চাঁদ আগে তার মনিব তাকে ফেলে চলে গেছে। অবশ্য একটা ভাল বাড়িতেই তাকে রেখে গেছে। তারা তাকে আদর-যত্ন করে, ভাল ভাল খাবার দেয়। কিন্তু সেই মহান টারমাঙ্গানির অভাব তাকে বড়ই পীড়া দেয়। তার উন্মুক্ত কাঁধটাই যে নকিমার সব চাইতে ভাল ও নিরাপদ আশ্রয়। তাই তো গভীর জঙ্গলের সব রকম বিপদকে তুচ্ছ করে দীর্ঘ দিন ধরে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার প্রিয় টারজনকে।

তার চিন্তায় বাধা পড়ল। বাতাসে ভেসে একটা শব্দ তার কানে এল। জঙ্গলের শব্দ সেটা নয়। কেমন যেন বেসুরো। আর যেখানে বেসুরো শব্দ সেখানেই মানুষ। অনেক মানুষের গলাই নকিমা শুনতে পেয়েছে। শব্দ লক্ষ্য করে সে এগিয়ে চলল।

সে ঠিকই শুনেছে। অনেক মানুষ। তাদের মধ্যে আছে কালো মানুষ গোমাঙ্গানি অর্থাৎ নিগ্রো; আর আছে টারমাঙ্গানি অর্থাৎ সাদা মানুষ।

একটা কাছাকাছি গাছের উপর থেকে নকিমা যে শিবিরটা দেখতে পেল সেটা বেশ পাকাপোক্তভাবে গড়া। এরা বেশ কিছুদিন এখানে আছে; মনে

হচ্ছে আরও কিছুদিন থাকবে। কোন রকমে একটা রাত কাটানোর মত ব্যবস্থা নয়। সাদা মানুষদের জন্য চারটে তাঁবু আর আরবদের জন্য “ব্যেট”গুলো বেশ সুন্দরভাবে শৃংখলার সঙ্গে সাজানো; তার পিছনে আছে স্থানীয় গাছ-গাছালি দিয়ে তৈরি নিগ্রোদের চালাঘর।

একটা “ব্যেট”এর সামনে খোলা জায়গায় বসে জনাকয় বেদুইন তাদের প্রিয় কফি খাচ্ছে; আর একটা তাঁবুর সামনে গাছের ছায়ায় বসে চারজন সাদা মানুষ তাস খেলছে; চালাঘরে একদল দীর্ঘদেহ গালা যোদ্ধা “মিংকালা” খেলছে; অন্য জাতির কালা মানুষরাও সেখানে আছে—পূর্ব আফ্রিকার ও মধ্য আফ্রিকার মানুষদের সঙ্গে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে কিছু পূর্ব উপকূলের নিগ্রো অধিবাসী। তাদের সঙ্গে এত বেশী রাইফেল আছে যে নকিমার মনে হল, তাদের প্রত্যেকের জন্যই একটা করে রাইফেল আছে।

একটি পাগড়ি-বাঁধা কালো পূর্ব-ভারতীয় মানুষ তাঁবুর সামনে পা ভেঙে বসেছিল; দেখে মনে হয় যেন ধ্যানে বসেছে। কিন্তু তার চোখ রয়েছে কিছু দূরের আর একটা তাঁবুর দিকে। একটু পরেই একটা মেয়ে যখন সেই তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল, তখনই রঘুনাথ জাফর উঠে তার দিকে এগিয়ে গেল। মিষ্টি হেসে তাকে কি যেন বলল। মেয়েটি উত্তর দিল, কিন্তু হাসল না। তারপরই যারা তাস খেলছিল মেয়েটি তাদের দিকে এগিয়ে গেল।

একটি পরিষ্কার মুখ বড়সড় লোক বলে উঠল, “হেলো জোরা! ভাল ঘুম হয়েছে তো?”

মেয়েটি বলল, “তাতো হয়েছে কমরেড; কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে বিরক্তি ধরে গেল। এভাবে অকর্মার মত তো আর বসে থাকা যায় না।”

“যা বলেছ। আমারও সেই দশা।”

রঘুনাথ জাফর শুধাল, “কম্যাণ্ডার জাভেরি, মার্কিনী লোকটির জন্য তুমি আর কতদিন অপেক্ষা করবে?”

বড় কর্তাটি কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, “তাকে আমার দরকার। তাকে ছাড়াই আমরা হয়তো সহজেই কাজ চালিয়ে যেতে পারি, কিন্তু একজন উচ্চবংশজাত ধনী মার্কিনীকে আমাদের কাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রাখার নৈতিক সুবিধার কথা চিন্তা করেই তার জন্য অপেক্ষা করাটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করছি।”

মেক্সিকোবাসী একটি কৃষ্ণকায় যুবক বড় কর্তাটির পাশেই বসেছিল। এই অভিযানের সেই দলপতি। যুবকটি শুধাল, “এই মার্কিনীটি সম্পর্কে তুমি কি খুব নিশ্চিত জাভেরি?”

জাভেরি বলল, “তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় নিউ ইয়র্কে, তারপর সানফ্রান্সিস্‌কোতে: তাকে খুব ভাল করে পরীক্ষা করা হয়েছে; ফলাফল তার স্বপক্ষেই গেছে।”

রোমেরো বলল, "এই লোকগুলি সম্পর্কে আমি কিন্তু সর্বদাই সন্দিহান। পুঁজিবাদই তাদের একমাত্র ভরসা। এটা তাদের রক্তের মধ্যেই আছে—মনে-প্রাণে তারা সর্বহারাদের ঘৃণা করে, ঠিক যেমন আমরা তাদের ঘৃণা করি।"

জাভেরি তবু বলল, "এ লোকটি একটু স্বতন্ত্র মিগুয়েল। সে পুরোপুরি ভাবেই আমাদের দলে এসে গেছে। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে তার বাবাকেও পরিত্যাগ করবে—আর নিজের দেশের বিরুদ্ধতা তো সে ইতিমধ্যেই করেছে।"

যে লোকটি এখনও জমায়েতে হাজির হয় নি তার সম্পর্কে এইসব কথা শুনে জোরা ড্রিনের ঠোঁট ঈষৎ ঘৃণায় বেঁকে গেল।

মিগুয়েল রোমেরো তবু বলল, "আমি কিন্তু এইসব মার্কিনীদের দরকারী বলে মনে করি না।"

জাভেরি ভারী কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে বলল, "আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোন দাম নেই; বিশ্বব্যাপী মজুরদের স্বার্থটাই আসল কথা। কোল্ট এসে হাজির হলে তাকে আমাদের একজন বলেই গ্রহণ করতে হবে; একথা ভুললে চলবে না যে আমেরিকা ও তার লোকজনদের আমরা যত অপছন্দই করি না কেন, তাদের ছাড়া, তাদের নোংরা টাকা ছাড়া আজকেব পৃথিবীতে কোন বড় কাজই করা সম্ভব নয়।"

রোমেরো ক্ষুদ্ধ গলায় বলল, "সে টাকা তো আসে শ্রমিকদের রক্ত ও ঘামের বদলে।"

রঘুনাথ জাফর বলে উঠল, "ঠিক তাই, পুঁজিবাদী আমেরিকাকে ক্ষমতাচ্যুত করে শ্রমিকদের রাজ প্রতিষ্ঠার কাজে সেই টাকাকে কিভাবে ব্যবহার করা সম্ভব সেটাও তো ভেবে দেখতে হবে।"

জাভেরি বলল, "আমারও তো সেই একই কথা। আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আমি প্রথমেই চাই আমেরিকার স্বর্ণ-সম্পদকে ব্যবহার করতে—তারপরে বৃটিশের।"

জোরা বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু একটিমাত্র মার্কিনীর যৎসামান্য সম্পত্তি দিয়ে আমরা কি করতে পারব? ইতিমধ্যেই আমেরিকা যে পরিমাণ টাকা সোভিয়েট রাশিয়ায় ঢালছে তার তুলনায় এতো কিছুই না—একটা বালতিতে এক ফোঁটা জলও নয়।"

"কি বলছ তুমি জোরা?" মিগুয়েল প্রশ্ন করল।

"আমি বলছি আমেরিকার সেই ব্যাংক-মালিক, উৎপাদক সংস্থার মালিক ও ইঞ্জিনীয়ারদের কথা যারা তাদের পেট-মোটা টাকার থলিতে আরও কিছু সোনা ভরবার আশায় তাদের নিজের দেশ ও পৃথিবীকে আমাদের কাছে বেচে দিচ্ছে। তাদেরই একজন ধর্মাত্মা ও বহু-প্রশংসিত নাগরিক রাশিয়াতেই আমাদের

জন্য এমন একটা বড় কারখানা বানাচ্ছে যেখানে আমরা ট্রাক্টর ও ট্যাংক তৈরী করতে পারব; তাদের উৎপাদক-সংস্থাগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে হাজার হাজার বিমান তৈরীর মত ইঞ্জিন কে কত বেশী সংখ্যায় আমাদের দিতে পারবে; তাদের ইঞ্জিনীয়াররাই তাদের মস্তিষ্ক ও কলা-কুশলতাকে আমাদের কাছে বিক্রি করছে যার সাহায্যে এমন একটা আধুনিক ও বৃহৎ যন্ত্র-নগরী আমরা গড়ে তুলতে পারি যেখানে উৎপাদন করা যাবে প্রচুর গোলা-বারুদ ও সমরাস্ত্র। এরাই তো বিশ্বাসঘাতক, এরাই তো সেই সব মানুষ যারা সেই দিনটিকে ত্বরান্বিত করছে যেদিন মস্কোর হাতেই পরিচালিত হবে সারা বিশ্বের শাসন-নীতি।"

"তুমি এমনভাবে কথা বলছ যেন সেটা তোমার পছন্দ নয়" জোরার পিছন থেকে একটা শুকনো গলায় কে যেন বলে উঠল।

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়াল। "ওঃ, তুমি, শেখ আবু বতন?" কৃষ্ণকায় আরবটি কফি ছেড়ে উঠে এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। "আমাদের লাভ হচ্ছে বলেই শত্রুপক্ষের এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি আমি চোখ বন্ধ করে থাকতে পারি না।'

"তুমি কি আমাকেও তোমার দলে টানছ নাকি," সন্দিগ্ধ গলায় রোমেরো প্রশ্ন করল।

জোরা হেসে বলল, "সেটা তুমি ভাল করেই জান মিগুয়েল। তুমি শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ--নিজের দেশের শ্রমিকদের প্রতি তুমি অনুগত—কিন্তু ওরা তো সব পুঁজিবাদী শ্রেণীর মানুষ; তাদের সরকার পুঁজিবাদী সরকার; তারা আমাদের ধ্যান-ধারণার এতই বিরুদ্ধে যে আজ পর্যন্ত আমাদের সরকারকে স্বীকৃতিটুকুও দেয় নি: অথচ লোভের বশে এইসব শুয়োরের বাচ্চারা তাদের নিজের মানুষ ও নিজের দেশকে বিক্রি করে দিচ্ছে কিছু নোংরা ডলারের বিনিময়ে। আমি ওদের ঘৃণা করি।"

জাভেরি হেসে বলল, "তুমিই সাচ্চা লাল জোরা। শত্রুপক্ষ যখন আমাদের সাহায্য করে আর যখন আমাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে উভয় ক্ষেত্রেই তুমি তাকে সমান ঘৃণা কর।"

মেয়েটি বলল, "কিন্তু এখানে বসে বসে মুখে ঘৃণার কথা বলে তো কোন লাভ হবে না। একটা কিছু করা দরকার।"

"তুমি কি করতে বল?" জাভেরি জানতে চাইল।

"ওপার-এর সোনার খনির সন্ধানে কিছু চেষ্টা তো করে দেখতে পারি। কিটেম্বোর কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে সেখানে যে সোনা আছে তা দিয়ে আমাদের পরিকল্পনার অনুরূপ ডজনখানেক অভিযানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান হতে পারবে। আর তাহলেই এইসব কেক থেকে মার্কিনীদের আর্থিক সাহায্যের কোন প্রয়োজন আমাদের হবে না।"

"আমিও ঐ একই কথা ভাবছি," রঘুনাথ জাফর বলল।

জাভেরি হুংকার দিয়ে উঠল, "মনে হচ্ছে তোমরাই কেউ একজন এই অভিযান পরিচালনা করতে চাইছ। আমি কি করছি তা শুধু আমিই জানি; সব কথা অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতে আমি চাই না। হুকুম দেবার সময় যখন আসবে তখন হুকুম ঠিকই দেব। কিটেম্বো তার হুকুম পেয়ে গেছে; বেশ কয়েকদিন হল ওপার-অভিযানের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে।"

রোমেরো পাল্টা চাপান দিল, "দেখ জাভেরি, আমরা বাকিরাও তোমার মতই আগ্রহী, আর ঝুঁকিও নিয়েছি তোমার সমান। আমাদের কাজ করবার কথা এক সঙ্গে—মনিব ও ক্রীতদাসের মত নয়।"

কুৎসিত গলায় জাভেরি ধমক দিয়ে বলল, "অচিরেই তোমরা বুঝতে পারবে যে আমিই মনিব।"

রোমেরো ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "জারও মনিব ছিল; 'ও ব্রেগনও; তাদের কি দশা হয়েছিল তা জান কি?"

জাভেরি লাফিয়ে উঠে রিভলবারটা বের করে রোমেরোকে তাক করতেই মেয়েটি তার হাতটা তুলে দিয়ে দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলল, "তুমি কি পাগল হয়েছ জাভেরি?"

"তুমি নাক গলিয়ো না জোরা; এটা আমার ব্যাপার, তাই যত তাড়াতাড়ি একটা ফয়সালা হয়ে যায় ততই ভাল। আমি এখানকার সর্দার। আমার শিবিরে কোন বিশ্বাসঘাতকের স্থান হবে না। সরে দাঁড়াও।"

"না!" মেয়েটি দৃঢ়সংকল্প। "মিগুয়েল অন্যায় করেছে, তুমিও করেছ, কিন্তু তাই বলে রক্তপাত—নিজেদের রক্তপাত তো আমাদের সাফল্যের যেটুকু সম্ভাবনা আছে তাকেও শেষ করে দেবে। এর ফলে কালো লোকগুলোর মনে ভয় ও সন্দেহ দেখা দেবে, আমরা ওদের শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলব. কারণ ওরা জানবে যে আমাদের মধ্যেও ঝগড়া-বিবাদ আছে। তাছাড়া, মিগুয়েল নিরস্ত্র, তাকে গুলি করা তো ভীরুর মত নরহত্যা। এর ফলে এই অভিযানের প্রতিটি ভালো মানুষের শ্রদ্ধা তুমি হারাবে।" কথাগুলি সে খুব তাড়াতাড়ি রুশ ভাষায় বলে গেল। ফলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে শুধু হাভেরি ও সে নিজে ছাড়া আর কেউই তা বুঝল না। তারপর মিগুয়েলের দিকে ফিরে ইংরেজিতে বলল, "তুমিও অন্যায় করেছ মিগুয়েল। সব দলেই একজনকে দায়িত্বশীল প্রধানের পদে রাখা হয়। কমরেড জাভেরিকেই সে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হঠাৎ কাজটা করায় সে দুঃখ প্রকাশ করেছে। তুমিও তাকে বল যে তোমার কথাগুলির জন্য তুমি দুঃখিত; তারপর দুজনে কর-মর্দন কর। এস আমরা সকলেই এ ব্যাপারটাকে ভুলে যাই।"

মুহূর্তের জন্য ইতস্ততঃ করেও রোমেরো জাভেরির দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমি দুঃখিত।"

রুশ লোকটিও হাতটা চেপে ধরে শক্ত হয়ে মাথাটা নোয়াল। মুখে বলল, "এস, আমরা এটা ভুলে যাই কমরেড," কিন্তু তার চোখ দুটি তখনও ভ্রূকুটিকুটিল।

গাছের অনেক উপরে একটা ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে ছোট্ট নকিমা একটা হাই তুলল। এই লোকগুলোকে তার আর ভাল লাগছে না। তবু হঠাৎ তার মনে হল, এদের উপস্থিতির কথাটা তার মনিবকে জানানো দরকার। সঙ্গে সঙ্গে আবার সে ডালে ডালে লাফিয়ে চলল টারজনের খোঁজে। তার লাল হাতের তালুতে যে তখন রয়েছে ইওরোপের ভাগ্য তা সে জানতেও পারল না।

বেলা গড়িয়ে এল।

একটা দলের আগে আগে হাঁটতে হাঁটতে একটি যুবক মাথাটা খাড়া করে কান পাতল। বলল, "এত দূরে তো নয় টনি।"

"না স্যার, আরও অনেক কাছে," ফিলিপিনোটি উত্তর দিল।

যুবকটি বকুনির সুরে বলল, "অন্য সকলের সঙ্গে দেখা হবার আগেই ওই 'স্যার' কথাটা তোমাকে ছাঁটাই করতে হবে টনি।"

ফিলিপিনোটি মুচকি হেসে বলল, "ঠিক আছে কমরেড। সকলকেই আমি 'স্যার' বলি তো, তাই ওটা পাল্টানো একটু শক্ত।"

"তাহলে তো তুমি খুব সাচ্চা লাল হতে পার নি টনি।"

ফিলিপিনোটি এবার জোর গলায় বলল, "আমি নিশ্চয় সাচ্চা লাল। না হলে এখানে এসেছি কেন? তুমি কি মনে কর সিংহ, পিঁপড়ে, সাপ, মাছি ও মশায় ভর্তি এই নিষিদ্ধ দেশে আমি বেড়াতে এসেছি? না, আমি এসেছি ফিলিপিনের স্বাধীনতার জন্য জীবন দিতে।"

অপরজন গম্ভীর গলায় বলল, "এটা তোমার মহত্ত্বের পরিচয় তাতে কোন সন্দেহ নেই টনি; কিন্তু তুমি এখানে আসায় ফিলিপিনের মানুষ স্বাধীন হবে কেমন করে?"

এণ্টনিও মোরি মাথা চুলকে বলল, "তা জানি না; তবে এর ফলে আমেরিকার বিপদ হবে।"

গাছের অনেক উপর দিয়ে একটা ছোট বানর তাদের পথটা পার হয়ে গেল।

আধ ঘণ্টা পরে হঠাৎ গর্জন করে উঠল একটা সিংহ। সে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ এত কাছে থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে উঠে এল যে ভয়ে ছোট্ট নকিমার গাছের ডাল থেকে প্রায় পড়ে যাবার মত অবস্থা। আতংকে চেঁচাতে চেঁচাতে সে যতটা উপরে সম্ভব উঠে গিয়ে গ্যাট হয়ে বসল।

বড় বড় কেশরে ঢাকা প্রকাণ্ড সিংহটা আর একবার গর্জে উঠল। সে ডাকে পায়ের নীচের মাটি পর্যন্ত কেঁপে উঠল। নকিমা নীচে তাকিয়ে উত্তেজিতভাবে লাফাতে শুরু করল। সিংহ নুমা মুখ তুলে উপরে তাকাল, আর তারপরেই ঘটল

একটা আশ্চর্য ঘটনা। সিংহটার চোখের হিংস্র চাউনির বদলে এবার তাতে ফুটে উঠল একটা শান্ত ভাব। পিঠটাকে বেঁকিয়ে গাছের সঙ্গে ঘসতে লাগল, আর মুখ দিয়ে একটা নরম শব্দ করতে লাগল। তখন ছোট্ট নকিমা দ্রুতগতিতে ডালপালার ভিতর দিয়ে নীচে নেমে শেষ পর্যন্ত একটা আল্‌তো লাফ দিয়ে পশুরাজের ঘন কেশরের উপর নেমে গেল।

২—হিন্দু

নতুন দিন দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শিবিরবাসী ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যেও দেখা দিল নতুন কর্মব্যস্ততা। বেদুইনরা কফি খাচ্ছে না : সাদা মানুষদেব তাস তুলে রাখা হয়েছে ; গালা যোদ্ধারাও আর মিংকালা খেলছে না।

একটা ফোল্ডিং ক্যাম্প-টেবিলে বসে জাভেরি সহকারীদের নির্দেশ দিচ্ছে ; জোরা ও রঘুনাথ জাফরের সাহায্যে সারিবদ্ধ সশস্ত্র মানুষগুলির হাতে গুলি-গোলা তুলে দিচ্ছে। মিগুয়েল রোমেরো ও অপর দুজন সাদা মানুষ কুলিদেব মালপত্র ভাগাভাগি করার ব্যাপারটা তদারক করছে। শেখ আবু বতন তার রোদে-পোড়া সৈনিকদের নিয়ে দূরে বসে আছে। লোকগুলোর শৃংখলাহীন উদ্যোগ-আয়োজনকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখছে।

জোরা বলল, "শিবির পাহারা দেবার জন্য কতজনকে রেখে যাচ্ছ ?"

জাভেরি জবাব দিল, "তুমি ও কমরেড জাফর এখানেই থেকে যাবে। শিবিরের রক্ষী হিসাবে তোমার ছেলেরা থাকবে : তাছাড়া দশজন আস্কারিও এখানে থেকে যাবে।"

মেয়েটি বলল, "তাই যথেষ্ট। এখানে কোন বিপদ নেই।"

জাভেরি বলল, "না। এখন নেই, তবে সেই টারজন এসে পড়লে ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াবে। তবে আমি শুনেছি সে নাকি অনেক দিন এদেশে নেই। আকাশপথে কি একটা অভিযানে বেরিয়েছে। সেই থেকে তার কোন খবরই নেই। প্রায় নিশ্চিত যে সে মারাই গেছে।"

শেষ কালো মানুষটির হাতে গুলি-গোলা পৌঁছে দেওয়া হয়ে গেলে কিটেম্বো তার স্বজাতীয়দের কিছুটা দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নীচু গলায় কি যেন বোঝাতে লাগল। তারা সকলেই বাসোম্বা ; তাই তাদের সর্দার কিটেম্বো তাদের ভাষাতেই কথা বলছে।

কিটেম্বো সব সাদা মানুষকেই ঘৃণা করে। স্মরণাতীতকাল থেকে বৃটিশরা এসে তাদের দেশকে অধিকার করেছে। দেশের বংশানুক্রমিক সর্দার কিটেম্বো

বিদেশীদের এই আধিপত্য কিছুতেই মেনে নেয় নি। তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তারা সর্দারের আসনে একটি পুতুলকে বসিয়েছে।

কিটেম্বো সর্দার অসভ্য, নিষ্ঠুর, বিশ্বাসহন্তা; তার কাছে সব সাদা মানুষই অভিশাপস্বরূপ। তবু জাভেরির সঙ্গে যোগাযোগটাকে সে বৃটিশদের উপর প্রতিশোধ নেবার একটা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেছে। তাই সে তার স্বজাতিদের অনেককে এনে জাভেরির অভিযানে নাম লিখিয়েছে, কারণ জাভেরি তাকে কথা দিয়েছে বৃটিশদের চিরদিনের মত এখান থেকে তাড়িয়ে দেবে এবং আবার কিটেম্বোকে সগৌরবে তার আসনে বসাবে।

অবশ্য নিজের লোকজনদেরও একথাটা বোঝানো কিটেম্বোর পক্ষে সব সময় খুব সহজ হচ্ছে না। বৃটিশের চক্রান্তে তার ক্ষমতা ও প্রভাব দুইই এখন হ্রাস পেয়েছে। তাই লোকজনরা এখন আর মুখ বুজে তার সব কথা শোনে না। তাই সে কখনও তাদের লুঠতরাজের লোভ দেখায়, আবার কখনও বা কঠোর শাস্তির ভয়ও দেখায়।

অবশ্য আর যারা জাভেরির সঙ্গে এসেছে তারা মানবতার ডাকেই এসেছে; এসেছে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও সর্বহারার অধিকার অর্জনের স্বপ্নের আকর্ষণে।

আজকের এই মনোরম সকালে এমনি একটি দলই যাত্রা করেছে রহস্যময় ওপার-এর রত্ন-ভাণ্ডার লুঠ করার আশায়।

জোরা ড্রিনভ তাদের যাত্রার পথের দিকেই তাকিয়ে আছে। যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ জোরার দুটি দুরধিগম্য সুন্দর চোখের তারা স্থিরনিবদ্ধ হয়ে রইল পিটার জাভেরির উপর। ধীরে ধীরে নদীর পথটা ধরে চলতে চলতে সে অন্ধকার বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এটা কি সমূহ বিপদের পথে প্রিয় প্রেমিকের যাত্রায় আতংকিত প্রেমিকার সভয় পর্যবেক্ষণ, না কি—

"হয়তো সে আর ফিরবে না" তার কাঁধের কাছে একটা মোলায়েম গলা শোনা গেল।

ঘাড় ফেরাতেই চোখ পড়ল রঘুনাথ জাফরের আধ-বোজা চোখের উপর। বলল, "ফিরবে কমরেড, পিটার জাভেরি সব সময় আমার কাছে ফিরে আসে।"

মেয়েটি তাঁবুর দিকে পা বাড়াতেই জাফর বলল, "দাঁড়াও।"

মেয়েটি থামল। তার দিকে ঘুরে বলল, "কি চাও?"

"তোমাকে। ওই কদাকার শুয়োরটার মধ্যে তুমি কি দেখেছ জোরা? ভালবাসা বা রূপের সে কি বোঝে? সকালের সুন্দর ফুলটি তুমি, তোমার মূল্য আমি বুঝি। আমি যে প্রেমের ব্যাপারি। জাভেরির মত পশু তোমাকে শুধু নীচেই নামাতে পারে।"

মেয়েটির চোখ দুটি ঘৃণায় ও বিরক্তিতে কুঁচকে গেলেও লোকটির কাছে তা

প্রকাশ করল না। শান্ত গলায় বলল, "তুমি মৃত্যু নিয়ে খেলা করছ জাফর। ভালবাসাবাসির জন্য আমি এখানে আসি নি। আর এইমাত্র তুমি যা বললে সে কথা জাভেরির কানে গেলে সে তোমাকে খুন করবে। এ রকম কথা আর কখনও আমাকে বলো না।"

"তার দরকার হবে না," হিন্দুটি রহস্যজনক গলায় বলল। তার 'আধ-বোজা চোখ দুটি মেয়েটির চোখের উপর স্থিরনিবদ্ধ।

এইভাবে আধমিনিট কাটতেই জোরা হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। হিন্দুটির লালসাসিক্ত ঠোঁট দুটি খুশিতে বাঁকা হয়ে গেল, ফিস্ ফিস্ করে আর একবার বলল, "তার দরকার হবে না।"

* * *

অভিযাত্রীরা এগিয়ে চলেছে ওপার-এর প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের দিকে। সেখান থেকে অনেক পশ্চিমে ওয়েনি কোল্ট চলেছে ষড়যন্ত্রকারীদের মূল শিবির অভিমুখে। দক্ষিণে একটা প্রকাণ্ড সিংহের পিঠে সওয়ার হয়ে চলেছে ছোট্ট বানর নকিমা।

অনেক দূর থেকে সিংহের গন্ধ পেল একদল গোরিলা। তাদের দলে আছে টো-ইয়াট জাতের বড় বড় গোরিলা। সিংহটা যত এগিয়ে আসছে মাঙ্গানিরা ততই চঞ্চল ও বিরক্ত হয়ে উঠছে। গোরিলাদের রাজা টো-ইয়াট বুক চাপড়াতে লাগল। গা-ইয়াট ঘাড় বেঁকিয়ে এগিয়ে চলল সামনে। জু-টো জোড় পায়ে মাটিতে লাথি মারতে লাগল। মেয়ে-গোরিলারা বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে গাছের নীচু ডালে আশ্রয় নিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি প্রায় নগ্ন সাদা মানুষ গাছের ঘন পাতার আড়াল থেকে নেমে এল তাদের মাঝখানে। গর্জে উঠে হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গোরিলারা তার দিকে ছুটে গেল। সকলের আগে গোরিলা-রাজ স্বয়ং।

মাঙ্গানিদের ভাষায় লোকটি বলে উঠল, "দেখছি টো-ইয়াটের স্মৃতি খুব ক্ষণস্থায়ী।"

মানুষের মুখে নিজেদের ভাষা শুনে বিস্মিত হয়ে গোরিলাটা থামল। তারপরই গর্জে উঠল, "আমি টো-ইয়াট! আমি খুন করি।"

লোকটি বলল, "আমি টারজন: বড় শিকারী, বড় যোদ্ধা। আমি এসেছি শান্তির জন্য।"

"মার! মার!" গর্জে উঠল টো-ইয়াট। দাঁত বের করে এগিয়ে এল অন্য সব বড় বড় গোরিলা।

লোকটি আবার বলল, "জু-টো! গো-ইয়াট! আমি, অরণ্যরাজ টারজন।"

ওদিকে সিংহের গন্ধ; সামনে টারজন হাজির; গোরিলারা কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। তবু তারা একটু একটু করে এগোতে লাগল।

আর তখনই বাচ্চাকে পিঠে নিয়ে একটা মা-গোরিলা চীৎকার করে বলল, "নুমা!" সঙ্গে সঙ্গে গোরিলাদের দৃষ্টি পড়ল নতুন বিপদের দিকে। কী সাংঘাতিক! এগিয়ে আসছে একটা প্রকাণ্ড হলদে সিংহ; তার হলুদ-সবুজ চোখ দুটি হিংস্রতায় জ্বলছে। তার পিঠের উপর বসে একটা ছোট বানর তাদের গালাগালি দিচ্ছে। এবার গোরিলারা ভয় পেল। প্রথম পালাল তাদের রাজা। একটা গাছে উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও পালিয়ে গেল। ক্রুদ্ধ সিংহটার সামনে তখন একা দাঁড়িয়ে টারজন।

জ্বলন্ত চোখ মেলে পশুরাজ তার দিকেই এগিয়ে গেল। নীচু স্বরে মানুষটি একটিমাত্র শব্দ উচ্চারণ করতেই সিংহটা চকিতে মাথা তুলল। তার চোখের ভয়ংকর দৃষ্টি নত হল। সেই একই সময়ে ছোট বানরটি আনন্দে চীৎকার করে এক লাফে নুমার মাথার উপর দিয়ে মাটিতে নেমেই আরও তিন লাফে লোকটির কাঁধের উপর চড়ে তার ব্রোঞ্জ-কঠিন গলাটা জড়িয়ে ধরল।

তার গালে গাল লাগিয়ে টারজন ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "ছোট্ট নকিমা!"

গম্ভীর চালে এগিয়ে গিয়ে সিংহটা টারজনের খোলা পা দুটো শুঁকল, তার গায়ে মাথাটা ঘসল, তারপর তার পায়ের নীচে শুয়ে পড়ল।

টারজন সাদরে ডাকল, "জাদ্‌-বাল্‌-জা!"

গোরিলারা গাছের উপর থেকেই সব কিছু দেখল। এতক্ষণে তাদের ভয় ও রাগ পড়ে গেছে।

জু-টো বলল, "এই তো টারজন।"

গা-ইয়াট বলল, "হাঁ, এই টারজন।"

টো-ইয়াটের ভয় কিন্তু তখনও কাটে নি।

গভীর মনোযোগ দিয়ে টারজন নকিমার সব কথা শুনল। এক অপরিচিত টারমাঙ্গানি এবং অনেক গোমাঙ্গানি যোদ্ধা যে অরণ্যরাজের রাজ্য আক্রমণ করেছে সে খবরও জানল।

রাজা টো-ইয়াট চীৎকার করে বলল, "চলে যাও! তোমরা চলে যাও। আমাদের শান্তিতে থাকতে দাও।"

টারজন বলল, "আমরা চলেই যাচ্ছি। কিন্তু টারজন বা সোনালী সিংহকে তোমরা ভয় পেয়ো না। আমরা তোমাদের বন্ধু। জাদ্‌-বাল্‌-জাকেও বলে দিয়েছি সে তোমাদের কোন ক্ষতি করবে না। তোমরা নেমে আসতে পার।"

টো-ইয়াট বলল, "নুমা চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই থাকব। সে তো তোমার কথা ভুলেও যেতে পারে।"

টারজন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "তুমি ভীরু। জু-টো বা গা-ইয়াট কিন্তু ভয় পেত না।"

"জু-টো কোন কিছুতেই ভয় করে না," জু-টো বলল।

এবার গোরিলারা গাছ থেকে নেমে এল। গা-ইয়াটের কাঁধে হাত রেখে টারজন জাদ্-বাল্-জাকে বলল, "এ হচ্ছে গা-ইয়াট, টারজনের বন্ধু। ওর কোন ক্ষতি করো না।"

বানরটি কিচির-মিচির করে বলল, "মাঙ্গানিকে বলে দাও টারজন ছোট্ট নকিমারও বন্ধু। সে যেন নকিমার কোন ক্ষতি না করে।"

গোরিলাটি বলল, "টারজনের বন্ধুরা গা-ইয়াটেরও বন্ধু।"

টারজন বলল, "খুব ভাল কথা। এবার আমি চলি। তোমার দলবলকে বলে দিও, টারজনের রাজ্যে নতুন লোকরা এসেছে। তারা যেন সেই সব লোকদের উপর নজর রাখে, কিন্তু কখনও যেন তাদের মুখোমুখি না হয়, কারণ তারা খারাপ লোক, তাদের সঙ্গে আছে সেই বজ্র-নল যা প্রচণ্ড শব্দ করে ধোঁয়া ও আগুনের সঙ্গে ছুঁড়ে দেয় সাক্ষাৎ মৃত্যু। কেন তারা এ দেশে এসেছে সেটা জানতেই টারজন এবার চলল।"

ওপার-এর অভিযাত্রীরা চলে যাবার পর থেকেই জোরা ড্রিনভ জাফরকে এড়িয়ে চলেছে। মাথা ধরার ওজুহাতে তাঁবু থেকেই বের হয় নি। হিন্দুটিও তার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে নি। এইভাবে প্রথম দিনটা কেটে গেল। দ্বিতীয় দিন সকালে জাফর আস্কারিদের সর্দারকে ডেকে পাঠাল। সে এলে বলল, "শিকারের পক্ষে আজকের দিনটা খুব ভাল। তোমার সব লোকজনদের নিয়ে বনে চলে যাও, আর সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার আগে ফিরো না। বুঝেছ?"

কালো সর্দারটি বলল, "হ্যাঁ বাওয়ানা।"

"মেয়ে মানুষটির চাকরটাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। এখানে তার কোন কাজ নেই। আমার ছেলেটি এসেই রান্না করে দেবে।"

নিগ্রো বলল, "ছেলেটা হয়তো যেতে চাইবে না।"

"তোমরা তো এতজন আছ; সে একা কি করবে। কিন্তু তাকে যে তোমরা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ সে কথা ঐ মেয়েটি যেন না জানতে পারে।"

নিগ্রোটি আপত্তি করায় রঘুনাথ জাফর তাকে অনেক উপহারের লোভ দেখিয়ে রাজী করাল।

দলবল নিয়ে তৈরী হয়ে আস্কারি-সর্দার কহিয়া জোরার চাকর ছেলেটিকে বলল, "তোমাকে আমাদের সঙ্গে শিকারে যেতে হবে।"

"কে বলেছে?" ওয়ামালা প্রশ্ন করল।

সর্দার কহিয়া বলল, "বাদামি বাওয়ানা।"

ওয়ামালা হেসে উঠল। বলল, "আমাকে হুকুম করবে আমার কর্ত্রী, বাদামি বাওয়ানা নয়।"

কহিয়া লাফ দিয়ে তাকে ঝাপটে ধরে এক হাতে তার মুখটা চেপে ধরে

বলল,' "কহিয়ার হুকুমই তোমাকে শুনতে হবে।" বল্লমের ফলাটা তার গায়ে লাগিয়ে আবার বলল, "আমাদের সঙ্গে শিকারে যাবে কিনা?"

ওয়ামালা বলল, "যাবই তো। আমি ঠাট্টা করছিলাম।"

জাভেরি দলবল নিয়ে চলেছে ওপার-এর পথে। ষড়যন্ত্রকারীদের মূল দলটার সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিলিত হবার আশায় ওয়েনি কোল্ট তার লোকজনদের তাড়া দিচ্ছে দ্রুততর গতিতে অগ্রসর হতে। পাছে অধিক সংখ্যায় এক সঙ্গে আফ্রিকায় ঢুকলে সকলের মনোযোগ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাই প্রধান ষড়যন্ত্রকারীরা ভিন্ন ভিন্ন পথে আফ্রিকায় ঢুকেছে। কোল্ট নেমেছে পশ্চিম উপকূলে। সেখান থেকে কিছুটা পথ ট্রেনে গিয়ে তারপর চলেছে পদব্রজে। স্বভাবতই অন্য প্রধান ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে মিলিত হতে সে খুবই ইচ্ছুক হয়ে পড়েছে। কারণ একমাত্র পিটার জাভেরি ছাড়া আর কারও সঙ্গে তার পরিচয় নেই।

ইওরোপের শান্তিকে বিঘ্নিত করা এবং উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করাই যাদের লক্ষ্য সে রকম একটি অভিযাত্রী দলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার মধ্যে যে প্রচণ্ড বিপদের ঝুঁকি আছে মার্কিন যুবকটি তা ভাল করেই জানে। তবু যৌবনের উৎসাহে ও উদ্দীপনায় সেসব চিন্তা তার মনকে দমিয়ে রাখতে পারে নি, বরং তার কাজে আরও প্রেরণা জুগিয়েছে।

উপকূল থেকে একঘেয়ে দীর্ঘ যাত্রাপথে তার একমাত্র সঙ্গী ছেলেমানুষ টনি। ফিলিপিনের স্বাধীনতা সম্পর্কে তার ধারণা খুবই অস্পষ্ট। অর্থনৈতিক বিপ্লবের ফলে একদিন না একদিন ফোর্ড বা রক্‌ফেলারের সম্পত্তির অংশীদার হয়ে সেও ভাল ভাল পোশাকপত্র কিনতে পারবে এই স্বপ্নেই সে বিভোর। তাই তার সঙ্গ কোল্টের কাছে মোটেই সুখকর নয়। তবু কেন যেন এই ছেলেটিকে তার খুব ভাল লেগেছে।

কোল্টরা চলেছে তো চলেছে। তারা কিন্তু ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি যে তাদের মাথার উপরকার বৃক্ষ-পথে চলেছে এক অরণ্য-দেবতা এপোলো, আর তার কাঁধে বসে অবিরাম কিচিরমিচির করছে একটা ছোট বানর। গাছের উপর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎই এই সাদা মানুষটি টারজনের চোখে পড়ে যায়। তখনই তার মনে হয়, যে নবাগত মানুষদের মূল শিবিরের খোঁজে সে চলেছে এই যুবকটিও হয়তো সেই দিকেই যাচ্ছে; আর তাই ধৈর্যের সঙ্গে সে এই যুবকটিকে অনুসরণ করে চলেছে।

ওদিকে রঘুনাথ জাফর চলেছে জোরা ড্রিনভের তাঁবুর দিকে। মেয়েটি খাটিয়ায় শুয়ে বই পড়ছিল। জাফর দরজায় দাঁড়াতেই তার ছায়া পড়ল বইটার উপর। মেয়েটি চোখ তুলে তাকাল।

হিন্দুটির ঠোঁটে খোসামোদের হাসি। বলল, “দেখতে এলাম তোমার মাথার ব্যথাটা কেমন আছে।”

মেয়েটি ঠাণ্ডা গলায় বলল, “ধন্যবাদ। কিন্তু কেউ আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটালেই আমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাব।”

তবু জাফর ভিতরে ঢুকে একটা চেয়ারে বসল। বলল, “সকলেই চলে যাওয়ায় বড় একা-একা লাগছে। তোমারও কি তাই মনে হচ্ছে?”

“না। আমি একাই ভাল আছি। বিশ্রাম নিচ্ছি।”

জাফর বলল, “তোমার মাথাব্যথাটা বড় তাড়াতাড়ি চাড়া দিয়ে উঠল। একটু আগেও তো তোমাকে বেশ তাজা ও হাসিখুশি দেখেছিলাম।”

মেয়েটি কোন জবাব দিল না। সে ভাবল, ওয়ামালা কোথায় গেল। তাকে তো বলেই দেওয়া হয়েছে কেউ যেন তার বিশ্রামের ব্যাঘাত না ঘটায়।

সম্ভবত তার মনের কথাটা আঁচ করেই রঘুনাথ জাফর বলল, “ওয়ামালা আস্কারিদের সঙ্গে শিকারে গেছে।”

“আমি তো তাকে অনুমতি দেই নি,” জোরা বলল।

“অনুমতিটা আমিই দিয়েছি,” জাফর বলল।

খাটিয়ায় উঠে বসে মেয়েটি সক্রোধে বলল, “সে অধিকার তোমার নেই। তুমি বড় বেশীদূর এগিয়েছ কমরেড জাফর।”

হিন্দুটি সান্ত্বনার ভঙ্গীতে বলল, “একটু অপেক্ষা কর লক্ষ্মীটি। ঝগড়া করো না। তুমি তো জান আমি তোমাকে ভালবাসি, আর ভিড়ের মধ্যে ভালবাসা জমে না। তাছাড়া, তুমি তো জান যে প্রেমে ও সমরে কিছুই অন্যায় নয়।”

মেয়েটি বলল, “বটে, এতদূর! জাভেরি ফিরে আসুক, তারপর এর ফয়সালা হবে।”

হিন্দুটি সাগ্রহে বলল, “জাভেরি ফিরে আসার অনেক আগেই আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব কেমন করে আমাকে ভালবাসতে হয়।” বলেই সে পা বাড়াল। মেয়েটিও লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রের খোঁজে চারদিকে তাকাল। তার কার্তুজের বেল্ট ও রিভলবার ঝুলছে জাফরের চেয়ারটার সঙ্গে, আর রাইফেলটা রয়েছে তাঁবুর অপর কোণে।

হিন্দুটি বলল, “তুমি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। তাঁবুতে ঢুকেই আমি সব কিছু দেখে নিয়েছি।”

“তুমি একটা পশু” জোরা বলল।

“কেন এত অবুঝ হচ্ছ জোরা? ভেবে দেখ—”

“বেরিয়ে যাও!” মেয়েটি আদেশ করল। কণ্ঠস্বরে ভয় নেই, উত্তেজনা নেই; শান্ত, সংযত।

কিন্তু রঘুনাথ জাফরের সামনে দাঁড়িয়ে তার কামনার নারী। দ্রুত এগিয়ে

সে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরল।

জোরো ভ্রিনভ যুবতী, ক্ষিপ্রগতি, শক্তিময়ী, তবু এই হোঁৎকা হিন্দুটার সঙ্গে পেরে উঠবে কেন? নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল জোরা, কিন্তু জাফর তাকে জড়িয়ে ধরে কাছে টানতে লাগল। রাগে জলে উঠে জোরা তার মুখে বার বার আঘাত করতে লাগল, কিন্তু জাফর তাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে খাটিয়ার দিকে এগিয়ে গেল।

৩ – কবর থেকে

ওয়েনি কোণ্টের গাইড কিছুটা আগে আগেই চলছিল। হঠাৎ থেমে মুখটা হাসিতে ভরিয়ে সে পিছন ফিরে তাকাল। সামনে আঙুল বাড়িয়ে বিজয়গর্বে বলল, "ঐ শিবির বাওয়ানা!"

কোণ্ট স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, "প্রভুকে ধন্যবাদ!"

গাইড বলল, "এটা কিন্তু পরিত্যক্ত।"

"সেই রকমই দেখাচ্ছে, তাই না?" কোণ্ট ঘাড় নাড়ল। "চারদিকে ঘুরে একটু দেখাই যাক।" লোকজন নিয়ে সে শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পরিশ্রান্ত কুলিরা কাঁধের বোঝা নামিয়ে আস্কারিদের নিয়ে গাছের ছায়ায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। টনিকে সঙ্গে নিয়ে কোণ্ট তাঁবুগুলো পরীক্ষা করে দেখতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে তার নজরে পড়ল, একটা তাঁবুর মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে। সেই দিকে ছুটে যেতে যেতে সে বলল, "ওখানে নিশ্চয় কেউ আছে।"

তাঁবুর ভিতরকার কাণ্ড দেখে কোণ্ট তো একেবারে হা—দুটি নর-নারী মেঝেতে পড়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে: পুরুষটি মেয়েটির গলা চেপে ধরেছে, আর মেয়েটি প্রাণপণে পুরুষটির মুখে কিল-গুঁতো মারছে।

কোণ্ট জাফরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এক ঝটকায় তাকে একপাশে ঠেলে ফেলে দিল। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে জাফরও এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে মার্কিন যুবকটিকে আক্রমণ করতেই সে তাকে এমন এক ঘুষি চালাল যে জাফরের মাথাটা ঘুরে গেল। আবার আক্রমণ করতেই আর এক ঘুষি পড়ল তার মুখে। এবার জাফর মাটিতে পড়ে গেল। কোন রকমে উঠে দাঁড়াতেই কোণ্ট তাকে সজোরে চেপে ধরে একপাক ঘুরিয়ে পাছায় এক লাথি মেরে তাঁবুর দরজা দিয়ে বাইরে ঠেলে দিল। ফিলিপিনো সঙ্গীকে বলল, "ও যদি আবার তাঁবুতে ঢুকতে

শুইয়ে দিয়ে কোণ্ট বালতি থেকে জল এনে জোরার কপাল, গলা ও কব্জি ভাল করে মুছে দিল।

বাইরে গাছের ছায়ায় কুলি ও আস্কারিদের শুয়ে থাকতে দেখে রঘুনাথ জাফর গুটি গুটি নিজের তাঁবুর দিকে সরে পড়ল। তার বুকের মধ্যে ক্রোধ ও খুনের নেশা টগবগ করে ফুটছে।

জোরা ড্রিনভ চোখ মেলে তাকাল। তার মুখের উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে ওয়েনি কোণ্ট।

তাঁবুর উপরে একটা গাছের ঘন পাতার আড়ালে বসে অরণ্যরাজ টারজন সব কিছুই দেখতে পেয়েছে। ফিস্ ফিস্ করে একটা কথা বলেই নকিমার বকর-বকর বন্ধ করে দিয়েছে। ভিতরে কি কাণ্ড চলেছে বা বাইরে কারা এসে হাজির হয়েছে সে সব কিছুই টারজন জানে না। জানতে চায়ও না। সে শুধু জানতে চায়, কি উদ্দেশ্য নিয়ে এরা এখানে এসেছে।

কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে জোরা ড্রিনভ বলল, "নিশ্চয় তুমিই সেই মার্কিন যুবক।"

কোণ্ট জবাব দিল, "আমি ওয়েনি কোণ্ট। আর তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ বলেই অনুমান করছি যে এটা কমরেড জাভেরির শিবির।"

মেয়েটি মাথা নাড়ল। "তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলে কমরেড।"

"সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।"

"ঈশ্বর বলে কেউ নেই।"

কোণ্ট লজ্জা পেল। বলল, "আমরা তো বংশগত ধারা ও অভ্যাসের দাস।"

জোরা ড্রিনভ হেসে বলল, "তা ঠিক। কিন্তু শুধু আমাদের নয় সারা বিশ্বের মানুষের ভালর জন্যই যত বেশী সম্ভব বদ অভ্যাসগুলিকে ভেঙে ফেলাই তো আমাদের কাজ।"

একটু পরে কোণ্ট শুধাল, "কমরেড জাভেরি কি শিবিরে নেই?"

"না; সে একটা ছোট অভিযানে বেরিয়েছে।"

কোণ্ট হেসে বলল, "তাহলে তো আমাদের দুজনকে পরিচয় করিয়ে দেবার মত কেউ এখানে নেই।"

জোরা বলল, "আমি ক্ষমা চাইছি। আমার নাম জোরা ড্রিনভ।"

"আর ও লোকটা কে?"

"রঘুনাথ জাফর, একজন হিন্দু।"

"ও কি আমাদের লোক?"

"হ্যাঁ; কিন্তু আর থাকবে না—পিটার জাভেরি ফিরে আসার পরে তো নয়ই।"

''তার মানে—?"

''মানে পিটার ওকে খুন করবে।"

কোণ্ট কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, ''সেটাই ওর প্রাপ্য। হয়তো সে প্রাপ্যটা আমারই মিটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

''না, সেটা পিটারের জন্য তোলা থাক।"

''কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই তোমাকে ক্রমশ এখানে রেখে গেছে?" কোণ্ট জানতে চাইল।

''না। আমার ছোকরা চাকর ও দশজন আস্কারিকে পিটার রেখে গিয়েছিল, কিন্তু যে ভাবেই হোক জাফর তাদের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

''এখন থেকে তুমি নিরাপদ। কমরেড জাভেরি ফিরে আসা পর্যন্ত আমিই তোমার দেখ্‌ভাল করব। দু'জন আস্কারিকে পাঠিয়ে দেব তোমার তাঁবু পাহারা দিতে।"

জোরা বলল, ''খুব ভাল কথা। তবে তুমি যখন এসে পড়েছ তখন আর সে সবের দরকার হবে না।"

"তবু আমাকে তা করতেই হবে। তাতে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করব।''

''বেশ, তাহলে এখানে তাঁবু ফেলার পরে তুমি আমার সঙ্গেই রাতের খাবার খাবে। ওই যা, আমি তো ভুলেই গিয়েছি। আমার ছোকরাটাকেও তো জাফর বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমার রান্নাটা করে দেবার লোকও তো নেই।"

কোণ্ট বলল, ''তাহলে তো তোমাকেই আমার তাঁবুতে গিয়ে খাবারটা সারতে হবে। আমার ছোকরটা কিন্তু ভাল রাঁধে।"

''খুব আনন্দের সঙ্গেই যাব কমরেড কোণ্ট," জোরা হেসে বলল।

মার্কিন যুবকটি তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল। চোখ দুটো অর্ধেক বুজে জোরা খাটিয়াতেই শুয়ে রইল। সে যেমনটি ভেবেছিল এ লোকটি তার থেকে কত আলাদা। তার মুখ দেখে, বিশেষত চোখ দুটি দেখে তো বিশ্বাস করাই কঠিন যে এই ছেলে তার বাবার প্রতি, তার দেশের প্রতি বিশ্বাসহন্তা হতে পারে। কিন্তু নীতির জন্য, আদর্শের জন্য অন্য অনেকেই তো এ কাজ করেছে।

কোণ্ট বেরিয়ে গিয়ে নিজের লোকজনদের ডেকে শিবির স্থাপনের নির্দেশাদি দিতে লাগল। নিজের তাঁবুর ভিতরে বসে রঘুনাথ জাফর তার উপর কড়া নজর রেখেছে। তার সারা মুখে গাঢ় মেঘের ছায়া; দুই চোখে বিদ্বেষের স্ফুলিঙ্গ।

গাছের উপরে বসে টারজন সবই লক্ষ্য করছে। অপরিচিত যুবকটির ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণ তার মনকে টেনেছে। ওদিকে রঘুনাথ জাফর যে একটা

রাইফেল হাতে নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল সেটাও তার দৃষ্টি এড়ায় নি।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে জাফর সোজা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। টারজনও গাছের উপর দিয়ে তার পিছু নিল। জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে শিবিরের অর্ধেকটা ঘুরে জাফর থেমে গেল। সেখান থেকে গোটা শিবিরটাই সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু পাতার আড়ালের জন্য তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না।

কোণ্ট লোকজনের কাজকর্মের তদারক করছে। পথশ্রমে ক্লান্ত লোকগুলি চুপচাপ কাজ করে চলেছে। চারদিকে শান্ত নিস্তব্ধতা। হঠাৎ একটা আর্ত চীৎকার ও রাইফেলের গুলির শব্দ সে স্তব্ধতা ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। একটা বুলেট কোণ্টের মাথার পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে পিছনে দাঁড়ানো লোকটির কানের নতি ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হৈ-চৈ পড়ে গেল। কোন্ দিক থেকে গুলিটা এসেছে খুঁজতে গিয়েই কোণ্টের চোখে পড়ল জঙ্গলের ভিতর থেকে এক ঝলক ধোঁয়া উঠছে।

"ঐ তো ওখানে," বলে কোণ্ট সেদিকেই ছুটে যাচ্ছিল, আস্কারিদের সর্দার তাকে বাধা দিয়ে বলল, "ওদিকে যেয়োনা বাওয়ানা, হয়তো কোন শত্রু আছে। আগে আমরাও গুলি ছুঁড়ে দেখি।"

কোণ্ট বলল, "না, আগে খুঁজে দেখব। কিছু লোক সঙ্গে নিয়ে তুমি ডান দিক থেকে এগিয়ে যাও, আর বাকিদের নিয়ে আমি এগোচ্ছি বাঁদিক থেকে।"

"ঠিক আছে বাওয়ানা," বলে সর্দার কিছু লোক নিয়ে এগিয়ে গেল।

প্রথমে তারা কাউকে দেখতে পেল না। দু'দলের দেখাও হয়ে গেল। তখন তারা অর্ধবৃত্তাকারে শিবিরের দিকে ফিরে চলল।

কোণ্টই প্রথম দেখতে পেল—শিবিরের কাছাকাছি পড়ে আছে রঘুনাথ জাফরের মৃতদেহ। তার ডান হাতে রাইফেলটা ধরাই আছে, বুকের উপর থেকে বেরিয়ে আছে একটা তীরের কাঠি।

হিন্দুটিকে কবর দেবার নির্দেশ দিয়ে ওয়েনি কোণ্ট লোকজন নিয়ে তাঁবুতে ফিরে এল।

জোরা ড্রিনভ তার তাঁবুর দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি? কি হয়েছে?"

কোণ্ট বলল, "কমরেড জাভেরির আর রঘুনাথ জাফরকে খুন করা হল না।"

"কেন?"

"কারণ রঘুনাথ জাফর আগেই খুন হয়েছে।"

সব বিবরণ শুনে জোরা বলল, "তাহলে তীরটা কে ছুঁড়ল?"

কোণ্ট বলল, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সবই যেন রহস্যে ঢাকা। লোকজনরা বলছে, আততায়ীর বুলেট থেকে আমাকে বাঁচাবার জন্যই তীরটা

ছোঁড়া হয়েছে, আর এটাও খুবই সম্ভব যে জাফর আমাকেই খুন করতে চেয়েছিল।”

জোরা বলল, “সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।”

কোণ্ট বলল, “হয়তো তাই, তবে সে মোটেই সফল হয় নি। এমন কি আমার ক্ষিধেটাকেও সে খুন করতে পারে নি। অতএব এবার খেতে চল।”

দূর থেকে টারজন ও নকিমা দেখল, রঘুনাথ জাফরকে কবর দেবার পরেই জোরার ছোকরা চাকর ওয়ামালাকে নিয়ে কহিয়া ও আস্কারিরা ফিরে এল। সে নকিমাকে শুধাল, “এই শিবিরের যে সব টারমাঙ্গানি ও গোমাঙ্গানিদের কথা তুমি বলেছিলে তারা কোথায় গেল?”

“বজ্র-নল হাতে নিয়ে তারা বেরিয়ে গেছে,” নকিমা বলল।

টারজন আবার শিবিরের উপরকার গাছটাতে ফিরে গেল।

খাবার টেবিলে বসে কোণ্ট বলল, “আজ তোমার উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে, অথচ তোমার তো কোন রকম ভাবান্তর দেখছি না।”

“জীবনে এ রকম অনেক ঝড় আমি কাটিয়ে এসেছি কমরেড কোণ্ট, কাজেই আমার মধ্যে এখন স্নায়ু বলতে কিছু নেই।”

কোণ্ট বলল, “সেই রকমই মনে হচ্ছে। তুমি তো রাশিয়ার বিপ্লবের ভিতর দিয়ে বড় হয়েছ।”

“তখন আমি খুব ছোট ছিলাম, তবু সব কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।”

কোণ্ট এক দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। বলল, “তোমাকে দেখে মনে হয় জন্মসূত্রে তুমি প্রোলেতারিয়েত নও।”

“আমার বাবা ছিল শ্রমিক। জারের আমলে নির্বাসনে থাকতেই তার মৃত্যু হয়। তাই তো যা কিছু রাজকীয়, যা কিছু পুঁজিবাদ সংক্রান্ত সে সবেতেই আমার এত ঘৃণা। তাই তো কমরেড জাভেরির দলে যোগ দেবার প্রস্তাব যখন এল তখন প্রতিশোধ নেবার আর একটা ক্ষেত্র আমি খুঁজে পেলাম—পেলাম বিশ্বজোড়া শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার একটা পথ।”

কোণ্ট বলল, “যুক্তরাষ্ট্রে জাভেরির সঙ্গে যখন আমার সর্বশেষ দেখা হয় তখন তার মাথায় এখনকার মত কোন পরিকল্পনা নিশ্চয় ছিল না, কারণ এ ধরনের কোন অভিযানের কথা সে তখন আমাকে বলে নি। এখানে এসে তার সঙ্গে যোগ দেবার নির্দেশ যখন পেলাম তখন ও বিস্তারিত বিবরণ কিছুই আমাকে জানানো হয় নি। কাজেই তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি এখনও সম্পূর্ণ অন্ধকারেই আছি।”

“হুকুম মেনে চলাই ভাল সৈনিকের কাজ,” জোরা তাকে স্মরণ করিয়ে দিল।

কোণ্ট বলল, “আমি জানি, তবু লক্ষ্যটা জানা থাকলে একজন সাধারণ

সৈনিকও অনেক বেশী বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করতে পারে।”

জোরা এবার বলল, “অবশ্য মোটামুটি পরিকল্পনাটা আমাদের কারও কাছেই গোপনীয় কিছু নয়। তাই তোমাকে সেটা বুঝিয়ে বললে বিশ্বাসভঙ্গ হবে না। মূল পরিকল্পনাটা হচ্ছে, পুঁজিবাদী শক্তিগুলিকে এমনভাবে যুদ্ধ ও বিপ্লবের মুখে ঠেলে দিতে হবে যাতে তারা আমাদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে না পারে। আমাদের প্রেরিত প্রতিনিধিরা দীর্ঘকাল ধরে ভারতবর্ষের বিপ্লবকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে যাতে গ্রেট বৃটেনের মনোযোগ ও সামরিক শক্তি সেই দিকে আকৃষ্ট হতে বাধ্য হয়। মেক্সিকোতে আমরা পরিকল্পনামাফিক সফল হতে পারি নি, তবু আমরা আশা ছাড়ি নি, কিন্তু ফিলিপিনে আমাদের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। চীনের অবস্থা তো তুমি ভালই জান। আমরা আশা করি, আমাদের সহায়তায় অচিরেই তারা জাপানের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে উঠবে। ইতালি একটি সাংঘাতিক শত্রু, আর প্রধানত সে দেশকে ফ্রান্সের সঙ্গে একটা যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলতেই আমরা এখানে এসেছি।”

“কিন্তু আফ্রিকায় বসে সে কাজটা হবে কেমন করে?” কোণ্ট জানতে চাইল।

“কমরেড জাভেরির বিশ্বাস, সেটা খুব সহজেই করা যাবে। ফ্রান্স ও ইতালির পারস্পরিক ঈর্ষা ও সন্দেহ সর্বজনবিদিত; নৌ-শক্তি হিসাবে প্রাধান্য অর্জনে তাদের প্রতিযোগিতা তো কুখ্যাতি অর্জন করে বসেছে। যে কোন পক্ষের একটি হটকারী কাজের ফলে সহজেই দুই শক্তির মধ্যে একটা যুদ্ধ লেগে যেতে পারে, আর ইতালি ও ফ্রান্সের যুদ্ধ তো অচিরেই সারা ইওরোপে ছড়িয়ে পড়বে।”

কোণ্ট তবু প্রশ্ন করল, “কিন্তু আফ্রিকার জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে জাভেরি ইতালি ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ লাগাবে কেমন করে?”

“এই মুহূর্তে ফরাসী ও ইতালীয় কমরেডদের একটি প্রতিনিধিদল রোমে রয়েছে ঠিক এই কাজেরই জন্য। বেচারিরা জানেও না যে মূল পরিকল্পনার এটা একটা অংশমাত্র, আর আমাদের বিশ্ব-পরিকল্পনার রূপায়নের জন্য তাদেরই শহিদ হতে হবে। ফরাসী সেনাবাহিনী কর্তৃক ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড অভিযানের পরিকল্পনাসমন্বিত কাগজপত্র তাদের সঙ্গে দেওয়া হয়েছে। যথাসময়ে কমরেড জাভেরির রোমস্থ জনৈক গুপ্ত সদস্য ফ্যাসিস্ট সরকারকে এই ষড়যন্ত্রের কথাটা জানিয়ে দেবে; আর প্রায় সেই একই সময়ে আমাদের অভিযানের কিছু সাদা মানুষ ফরাসী সামরিক অফিসারের ইউনিফর্ম গায়ে চড়িয়ে আমাদেরই কালো মানুষদের ফরাসী স্থানীয় সৈনিক সাজিয়ে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড আক্রমণ করবে।”

কোণ্ট সোৎসাহে বলে উঠল, “পরিকল্পনাটি যেমন দুঃসাহসিক তেমনি বিরাট,

কিন্তু এ রকম একটা পরিকল্পনাকে সফল করতে তো প্রচুর অর্থ ও জনবলের প্রয়োজন।"

মেয়েটি বলল, "এই পরিকল্পনাটি কমরেড জাভেরির খুবই মনের মত। আমি অবশ্য সব কথা জানি না, তবে এটুকু জানি যে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজের জন্য যথেষ্ট অর্থ সে ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করতে পেরেছে; আর বাকি অর্থের জন্য এই অঞ্চল থেকে পাওয়া সোনার উপরেই সে নির্ভর করছে।"

মাথার উপরে গাছের ডালের উপর টান-টান হয়ে শুয়ে টারজন কান খাড়া করে সব কিছুই শুনছে।

কোণ্ট আবার বলল, "আচ্ছা, কথাটা যদি খুবই গোপনীয় না হয় তাহলে বলতো এত বেশী পরিমাণ সোনা কমরেড জাভেরি কোথায় পাবে বলে আশা করছে।"

"ওপার-এর বিখ্যাত রত্ন-ভাণ্ডারে। আশা করি তার কথা তুমিও শুনেছ।"

"তা শুনেছি, কিন্তু তাকে নিছক উপকথা ছাড়া আর কিছুই ভাবি নি। এ ধরনের রত্ন-ভাণ্ডারের কথা সারা বিশ্বের গ্রাম্য কাহিনীতে অনেক শোনা যায়।"

"কিন্তু ওপার উপকথা নয়।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কোণ্ট একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "যাক সে কথা। এ অভিযানটি যে খুবই বিপদসংকুল তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। এ কাজ পুরুষদেরই করার কথা। কমরেড জাভেরি এ অভিযানে তোমার মত একটি মেয়েকে কেন আসতে দিলেন সেটাই বুঝতে পারছি না।"

জোরা বলল, "পুরুষের চাইতে মেয়ের জীবনের মূল্য তো বেশী হতে পারে না। এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় লেখাপড়ার কাজ আছে যা একমাত্র অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন লোকের হাতেই ছেড়ে দেওয়া চলে। আমার উপর কমরেড জাভেরির সেই বিশ্বাস আছে। তাছাড়া আমি টাইপ জানি, স্টেনোগ্রাফি জানি। কিন্তু সব চাইতে বড় কথা আমি চাই কমরেড জাভেরির সঙ্গে থাকতে।"

মেয়েটির কথায় কোণ্ট যেন রোমান্সের গন্ধ পেল। তবু তার মনে হল, একটি ভালবাসার মেয়েকে এভাবে সঙ্গে নিয়ে এসে কমরেড জাভেরি ভাল কাজ করে নি।

মাথার উপরে টারজন নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে গেল। যাবার আগে নকিমাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল।

কোণ্ট ও জোরার কথাবার্তা বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ঘুরতে লাগল। এক সময় টারজন আবার সেখানে ফিরে এল। এবার কিন্তু সে একা নয়।

জোরা বলল, "জাফরকে কে যে মেরেছে তা হয়তো আমরা কোনদিনই জানতে পারব না।"

কোণ্ট বলল, "সত্যি ঘটনাটা রহস্যময়। লোকজনগুলো প্রথমে তো ভয়ই পেয়েছিল। অবশ্য জাফরের দেহকে কবর দেবার পথে তারা অনেকটা স্বস্তি ফিরে পেয়েছে।"

তার কথা শেষ হবার আগেই তাদের মাথার উপরকার গাছের ডালে একটা সর্‌-সর্‌ শব্দ হল, আর তারপরেই একটা ভারীদেহ ছিটকে পড়ল দুজনের মাঝখানের টেবিলটার উপরে। টেবিলটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল।

দুজনই লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোণ্ট চকিতে রিভলবারটা বের করল, আর জোরা পিছনে সরে গিয়ে উদ্‌গত চীৎকারটাকে চেপে দিল। কোণ্টের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। তাদের দুজনের মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে রঘুনাথ জাফরের মৃতদহ; মৃত চোখ দুটি তাকিয়ে আছে রাতের অন্ধকারের দিকে।

৪—সিংহের বিবরে

জাভেরি দলবল নিয়ে এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের ঘোরানো পর ধরে। টারজনও জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে প্রায় আকাশপথে। অবশ্য দু'জনের একই লক্ষ্যস্থল। ফলে জাভেরি যতক্ষণে ওপার-এর নিষিদ্ধ উপত্যকায় প্রবেশের পথে সর্বশেষ প্রাকৃতিক বাধা খাড়া পাহাড়টার পাদদেশে পৌঁছল ততক্ষণে টারজন ও নকিমা পাহাড়ের চূড়াকে অতিক্রম করে নির্জন উপত্যকার পথে এগিয়ে চলেছে—তাদের সামনেই দেখা যাচ্ছে প্রাচীন ওপার-এর দীর্ঘ প্রাচীর, সুউচ্চ গৃহশীর্ষ ও গম্বুজের সারি। আফ্রিকার উজ্জ্বল সূর্য-কিরণে শহরের লাল ও সোনালী গম্বুজ ও মিনারগুলি ঝকঝক করছে।

এতটা দূর থেকে কোন রকম ধ্বংসস্তূপের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে না। তবু কল্পনায় টারজন যেন দেখতে পেল তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে অপূর্ব সুন্দর একটি শহর; তার রাজপথে ও মন্দিরে অনেক মানুষের ভিড়। বহুদূর অস্পষ্ট অতীতে যে সমৃদ্ধ ও শক্তিমান মানুষরা একদা এই দীর্ঘস্থায়ী শহরটি গড়ে তুলেছিল তারা ছিল এক অবলুপ্ত সভ্যতার ধারক। পরবর্তীকালে আটলান্টিস মহাদেশীয় বিরাট অঞ্চলটি সমুদ্রের তলায় ডুবে যাওয়ায় ওপারও ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

টারজন ইতিপূর্বেও আর একবার ওপারএ এসেছিল। সেবারে প্রধান পুরোহিত কাড্‌জিকে পরাস্ত করে সে লা-কে তার প্রিয় প্রজাদের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল। সেবারে ওপার-এর মানুষদের বন্ধুত্বের স্মৃতি নিয়েই সে

ফিরে গিয়েছিল। তারপর বেশ কিছু বছর ধরে লা-কে সে বান্ধবী বলেই জানে। সেখানে বন্ধুর সমাদর পাবার আশা নিয়েই সে ওপার-এর পথে চলেছে।

কাজেই নির্ভয়ে ও নিঃশংকচিত্তে সে ওপারের নিরেট পাথরের বহিঃপ্রাচীরের ফাটলের ভিতর দিয়ে ঢুকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। সেখানে খানিকটা খোলা জায়গার ওপারে চোখে পড়ল একটা পরিত্যক্ত নিঃশব্দ প্রাচীর। সেই নিস্তব্ধতাকে ভেদ করে আরও একটা সংকীর্ণ পথ পার হয়ে সে একটা প্রশস্ত রাজপথে গিয়ে পড়ল। তার বিপরীত দিকেই দাঁড়িয়ে আছে ওপার-এর বিরাট মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ।

নিঃশব্দে সে মন্দিরেব দরজা পার হয়ে গেল। দুই পাশে সারি সারি স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভের গায়ে নানা কিম্ভূতদর্শন পাখির মূর্তি খোদাই করা।

তখনও কারও দেখা নেই। কেউ এসে তাকে স্বাগত জানাল না।

প্রধান অলিন্দ-পথ ধরে যেতে যেতে সেই সব সোনার ফলক তার চোখে পড়ল। তাতে প্রাচীন বর্ণলিপিতে অপঠিত বাণী লেখা। অলিন্দ পার হয়ে সাত স্বর্ণ-স্তম্ভে বিধৃত কক্ষের স্বর্ণমণ্ডিত মেঝেতে পা দিল। তখনও সেই একই নৈঃশব্দ্য ও শূন্যতা। অথচ সে অস্পষ্টভাবে বুঝতে পারছে যে মাথার উপরকার দর্শকাসনে অনেক মূর্তি চলাফেরা করছে।

সামনে একটা ভারী দরজা। অগ্নি-দেবতার এই বিরাট মন্দিরের সেই কক্ষেই নিশ্চয় দর্শন মিলবে এখানকার সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীদের। টারজন নির্ভয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে পা রাখল। সঙ্গে সঙ্গে একটা পাকানো গদা সজোরে তার মাথায় এসে পড়ল। টারজন অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল।

জটা-বাঁধা চুল-দাড়িওয়ালা জনবিশেক লোক তাকে ঘিরে ফেলল। ছোট ছোট বাঁকানো পায়ে তারা এগিয়ে এল। তাদের পাট-করা দাড়ি লোমশ বুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। দুর্বোধ্য ভাষায় কলরব করতে করতে তারা শক্ত বেড়ি দিয়ে টারজনের হাত-পা বেঁধে ফেলল। তারপর তাকে তুলে নিয়ে আর একটা বড় ঘরে ঢুকল। মেঝেতে কয়েক ফুট উঁচু বেদীর উপরকার মস্ত বড় সিংহাসনে বসে আছে একটি যুবতী নারী।

তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল জট-বাঁধা চুল-দাড়িওয়ালা আর একটি লোক। তার হাতে-পায়ে সোনার তাগা বাঁধা, গলায় সাতনরী হার। নীচে মেঝের উপর অনেক নর-নারীর জটলা—তারা ওপার-এর অগ্নি-দেবতার সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী।

লোকগুলি টারজনকে এনে সিংহাসনের নীচে ফেলে দিল। ঠিক সেই মুহূর্তে চৈতন্য ফিরে আসায় টারজন চোখ মেলে চারদিকে তাকাল।

“এই কি সেই?” সিংহাসনারূঢ়ার প্রশ্ন।

জ্ঞান ফিরে আসায় লোকগুলো এক ঝটকায় টারজনকে টেনে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

সিংহাসনের পাশে দাঁড়ানো লোকটি বলল, "এই সে ওআ।"

তীব্র ঘৃণায় মেয়েটির মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। বলল, "ঈশ্বর তার প্রধান সন্ন্যাসিনীর প্রতি সদয় হয়েছে।"

টারজন দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিল লোকটির দিকে। জানতে চাইল, "এ সবের অর্থ কি ডুথ? লা কোথায়? তোমাদের প্রধান সন্ন্যাসিনী কোথায়?"

মেয়েটি ক্রুদ্ধ হয়ে সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "জেনে রাখ হে বিদেশী, আমিই প্রধান সন্ন্যাসিনী। আমার নাম ওআ, অগ্নি-দেবতার প্রধান সন্ন্যাসিনী আমি।"

তাকে উপেক্ষা করে টারজন আবার ডুথকে জিজ্ঞাসা করল, "লা কোথায়?"

ওআ রাগে জ্বলে উঠল। তার হাতের বলিদানের খড়্গের রত্নখচিত হাতল-ভাঙা ছাদের ফাটল দিয়ে আসা সূর্যকিরণে ঝিকমিকিয়ে উঠল। লাফ দিয়ে বেদীর শেষ প্রান্তে এসে সে চীৎকার করে বলে উঠল, "সে মারা গেছে! ঠিক যেমন তুমি মারা যাবে যখন তোমার রক্ত দিয়ে আমরা অগ্নি-দেবতার পূজা করব। লা ছিল দুর্বল। সে তোমাকে ভালবেসেছিল। অথচ দেবতা তোমাকে বেছে নিয়েছিল বলি হিসাবে। কিন্তু ওআ শক্তিময়ী। টারজন ও লা তার কাছ থেকে ওপার-এর সিংহাসন চুরি করে নিয়েছিল। এবার সে তার প্রতিশোধ নেবে। ওকে নিয়ে যাও। বলির যূপকাষ্ঠে ফেলার আগে ওকে যেন আমাকে আর না দেখতে হয়।"

টারজনের পায়ের বেড়ি কেটে দিয়ে তাকে নিয়ে চলল ওপার-এর অন্ধকার কারাকক্ষের দিকে। মশালের আলোয় পথ দেখে দেখে তাকে কারাকক্ষে রেখে লোকজনরা চলে গেল।

আগেও একবার টারজন এই কারাগারে ছিল; আর পালিয়েও গিয়েছিল। কাজেই এবারও সে সঙ্গে সঙ্গে পালাবার পথ খুঁজতে শুরু করে দিল।

পর পর তিন রাত তিন দিন একজন করে পুরোহিত তার উপর নজর রেখে চলল। চতুর্থ দিন সকালে টারজন বুঝতে পারল, ঘরের একমাত্র ঘুলঘুলির ওপারের বারান্দাটাতে কোন সন্ন্যাসী পাহারায় নেই। পালাবার এই তো সুযোগ। সৌভাগ্যক্রমে সে যখন এদের হাতে ধরা পড়ে তখন তার শিকারী ছুরিটা চিতার চামড়ার কটিবস্ত্রের আড়ালে লুকনো ছিল। তাই ওপার-এর লোকরা তার অন্য সব অস্ত্র হাতিয়ে নিলেও এই ছুরিটা তাদের নজর এড়িয়ে গেছে।

ঘুলঘুলিটার লোহার শিক বেঁকিয়ে টারজন লাফিয়ে পড়ল নীচের অন্ধকার বারান্দায়। না, সেখানে কেউ পাহারায় নেই। ঘরের পর ঘর পার হয়ে সে এগিয়ে চলল। কোন্ পথে বাইরে যাওয়া যাবে তার কিছুই সে জানে না। তবু কারাগার থেকে যত দূরে যাওয়া যায় ততই তার পক্ষে নিরাপদ।

একসময়ে অনেক মানুষের পায়ের শব্দ কানে এল। চকিতে সে পাশের বারান্দা ধরে পিছনে সরে যেতে লাগল।

অন্ধকারেও কেউ একজন তাকে মুহূর্তের জন্য দেখে ফেলে বলে উঠল, "ওই তো সেই লোকটা। ও তো পালিয়েছে।" পাকানো গদা ও বাঁকা ছুরি হাতে তারা তেড়ে এল।

টারজনের সামনে কাঠের হুড়কো দেওয়া একটা বড় দরজা। দ্রুত হাতে হুড়কোটা তুলে দরজা খুলে সে ভিতরে পা দিল।

অন্ধকার ঘরটাতে পা দিয়েই সে বুঝল, মারাত্মক ভুল করে বসেছে। সিংহ নুমার তীব্র গন্ধ এসে লাগল তার নাকে। প্রচণ্ড গর্জনে ঘরের স্তব্ধতা খান্‌ খান্‌ হয়ে ভেঙে গেল। অন্ধকারের পটভূমিতে সে দেখতে পেল দুটি হল্‌দে-সবুজ জ্বলন্ত চোখ। তারপরই সিংহটা তাকে আক্রমণ করে বসল।

৫—ওপার-এর প্রাচীরের সামনে

ওপার-এর নির্জন উপত্যকার রক্ষীস্বরূপ পর্বত-প্রাচীরের সানুদেশে বনের এক প্রান্তে পিটার জাভেরি তাঁবু ফেলল। কুলিদের ও কয়েকজন আস্কারিকে সেখানে পাহারায় রেখে কিটেম্বো ও তার সৈন্যদলকে নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার পথ ধরল।

ওপার-এর রত্ন-ভাণ্ডারের প্রবেশপথের উপরকার বড় পাথরের চাঁইটার উপর বসে একটা ছোট বানর তাদের উপর কড়া নজর রেখেছে। বজ্র-নল হাতে এতগুলি গোমাঙ্গানি ও টারমাঙ্গানির এই অভিযানের খবর মনিবকে জানাতেই হবে। কিন্তু এই বিরাট ধ্বংসস্তূপের চেহারা দেখে সে ভয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। পিটার জাভেরির স্পোরা তার পাশ দিয়েই চলে গেল; তার দিকে একবার তাকিয়েও দেখল না। কিন্তু ধ্বংসস্তূপের ভিতরকার গাছপালার আড়াল থেকে অনেকগুলি সতর্ক চোখ তাদের উপর নজর রেখে চলেছে।

ওপার-এর রত্ন-ভাণ্ডার যে কোথায় অবস্থিত সে কথা কিটেম্বো জানে না। জাভেরিও জানে না। সব চাইতে বিস্ময়ের কথা, ওপার-এর কোন জীবিত অধিবাসীও জানে না সে রত্ন-ভাণ্ডার কোথায় আছে। জীবিত প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র টারজন ও কিছু ওয়াজিরি সৈনিকই জানে তার অবস্থান ও পথের হদিস।

জাভেরি একটি শ্বেতকায় সঙ্গীকে বলল, "জায়গাটা তো দেখছি একটা ধ্বংসস্তূপমাত্র।"

সঙ্গী বলল, "জায়গাটা দেখলেই কেমন যেন ভয়-ভয় লাগে। লোকজনরাও ভয় পাচ্ছে।"

জাভেরি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "রাতেরবেলা ভয় পেতে পারে, কিন্তু দিনের আলোতে নয়।"

বহিঃপ্রাচীরের ধ্বংসস্তূপের কাছে পৌঁছে সকলে থামল। কয়েকজন পথের খোঁজে লেগে গেল। আবু বতনই প্রথম দেখতে পেল একটা সরু ফাটল ও তার পিছনে কয়েক ধাপ সিঁড়ি। জাভেরিকে বলল, "এখানে একটা পথ আছে কমরেড।"

"বেশ তো। তোমার কিছু লোক নিয়ে ভাল করে খোঁজ কর।"

শেখ পাহাড়ের ফাটল ধরে এগোতেই শহরের ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে একটা টানা আর্তনাদ ভেসে এল। বেদুইনরা থেমে গেল। কালো মানুষগুলো আতংকে সিঁটিয়ে গেল।

জাভেরি ধমক দিয়ে বলল, "এগিয়ে যাও। একটা আর্তনাদ তোমাদের মেরে ফেলবে না।"

একটি আরব চেঁচিয়ে বলল. "উল্লাহ্! কিন্তু 'জান্' তো মারতে পারে।"

জাভেরি রেগে বলল, "তাহলে বেরিয়ে এস। তোমরা ভীতুর দল যদি যেতে ভয় পাও, তাহলে আমি নিজেই যাব।"

কোন কথা না বলে আরবরা সরে দাঁড়াল। তারপরেই একটা ছোট বানর ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে শহরের ভিতর থেকে এসে প্রাচীরের মাথায় দর্শন দিল। সকলেরই চোখ পড়ল তার উপর। কাঁধের উপর দিয়ে সভয়ে একবার পিছনে তাকিয়েই বানরটা ভয়ে চীৎকার করে প্রাচীরের উপর থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ল। তারপরই লাফাতে লাফাতে খোলা মাঠ পার হয়ে চলে গেল।

আর যাবে কোথায়! সংস্কারাচ্ছন্ন কালা আদমিরা স্নায়ুর চাপ আর সহ্য করতে পারল না। সকলে একসঙ্গে মুখ ফিরিয়ে ছুট দিল। আবু বতন ও তার মরুভূমির যোদ্ধারাও তাদের পিছু নিল।

পিটার জাভেরি ও তার তিন সাদা সঙ্গী এভাবে পরিত্যক্ত হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। জাভেরি রেগে বলল, "ভীতুর ডিম সব। তুমি ফিরে যাও মাইক, চেষ্টা করে দেখ ওদের ফেরাতে পার কি না। এতদূর যখন এসেছি আমরা ভিতরে ঢুকবই।"

ওপার থেকে দূরে সরে যাবার সুযোগ পেয়ে মাইকেল ডরাস্কি পলায়মান সৈনিকদের পিছনে সবেগে ছুটে গেল। মিগুয়েল রোমেরো ও পল আইভিচকে সঙ্গে নিয়ে জাভেরি ফাটলের পথে পা বাড়াল।

শহরের পথটা রোমেরোর চোখেই প্রথম পড়ল। সঙ্গীকে ডেকে নিয়ে সেই সংকীর্ণ পথে পা দেওয়া মাত্রই আর একবার সেই বীভৎস চীৎকার প্রাচীন মন্দিরের স্তব্ধতাকে ভেঙে খান্ খান্ করে দিল।

তিনজনই দাঁড়িয়ে পড়ল। কপালের ঘাম মুছে জাভেরি বলল, "একা একা আমরা বড় বেশী দূর এসে পড়েছি। বরং চল ফিরে গিয়ে বাকি লোকজনদের ডেকে নিয়ে আসি। গোয়ার্তুমি করে কিছু করার কোন মানে হয় না।" কথাটা শুনে মিগুয়েল রোমেরো তাচ্ছিল্যের চোখে তার দিকে তাকাল, কিন্তু আইভিচ জাভেরিকে সমর্থন করল।

দ্রুত পায়ে উঠোনটা পার হয়ে দু'জন শহর থেকে বাইরে চলে এল। একবার তাকিয়েও দেখল না রোমেরো তাদের পিছনে আসছে কিনা।

বাইরে এসে আইভিচ শুধাল, "মিগুয়েল কোথায় গেল ?"

জাভেরি চারদিকে তাকিয়ে ডাকল, "রোমেরো।" কেউ সাড়া দিল না।

দুই সঙ্গীকে হঠাৎ বাইরে চলে যেতে দেখে মেক্সিকোর যুবকটি ভিতরের প্রাচীরের পথ ধরে এগিয়ে চলল। যে ওপার শহরকে দেখার জন্য এতদূর এসেছে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে যার কল্পিত ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখেছে, একবার তাকে চোখে দেখে যেতে সে দৃঢ়সংকল্প।

তার চোখের সামনে ছড়িয়ে আছে রাজকীয় ধ্বংসস্তূপের এক আশ্চর্য দৃশ্য। মন্ত্রমুগ্ধের মত রোমেরো সেই দিকে তাকিয়ে রইল। সামনের একটা বড় বাড়ির ভিতর থেকে আবার ভেসে এল সেই ভৌতিক আর্তনাদ। কিছুটা ভয় পেলেও তার আচরণে সেটা প্রকাশ পেল না। হয়তো হাতের রাইফেলটাকে আরও একটু বেশী চেপে ধরল ; হয়তো খাপ থেকে রিভলবারটাকে একটু টেনেও তুলল। সামনের এই অপূর্ব দৃশ্য যেখানে মহাকাল ও ধ্বংস হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে তাকে যেন সম্মোহিত করে ফেলেছে।

তার দৃষ্টি পড়ল মন্দিরের দিকে। ভিতর থেকে বেরিয়ে এল জটাধারী একটা লোক। ছোট ছোট বাঁকা পায়ে সে এগিয়ে এল। তার পিছনে আর একজন ; আরও একজন ; একে একে পুরো একশ'টি মূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে এল তার দিকে। তাদের হাতে পাকানো গদা ও ছুরি। সে বুঝল, যে কোন ভৌতিক আর্তনাদ অপেক্ষা এরা আরও ভয়ংকর।

একা তো এদের সঙ্গে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। বহিঃপ্রাঙ্গণ পার হয়ে সে শহর থেকে বাইরের খোলা মাঠে এসে দাঁড়াল। পলায়মান অভিযাত্রীদের পথের ধূলো দেখতে পেয়ে একটা সিগারেট টানতে টানতে সেও সেই দিকেই এগিয়ে চলল। তাকে চলে যেতে দেখে পাহাড়ের মাথায় বসে একটা ছোট বানর তখনও ভয়ে কাঁপছে আর আর্তনাদ করছে। আজ ছোট্ট নকিমার দিনটা বড়ই খারাপ যাচ্ছে।

জ্ব্রুস্কি ও আইভিচকে নিয়ে জাভেরি যখন অভিযাত্রীদের কাছে পৌছল ততক্ষণে তারা প্রায় সকলেই পাহাড় থেকে নীচে নেমে গেছে। ভয় দেখিয়ে বা

পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে তাদের কাউকেই ফেরানো গেল না। সকলে তাঁবুতে পৌঁছে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে জাভেরি আবু বতন, ডয়স্কি ও আইভিচকে নিয়ে একটা আলোচনা-বৈঠক ডাকল।

কিটেম্বো বলল, "তোমার সঙ্গে এসেছি সাদা মানুষদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে, দৈত্য ও প্রেতদের বিরুদ্ধে নয়। আমি ভীতু নই। আমি শহরে যেতাম; কিন্তু আমার লোকজনরা যখন গেল না তখন আমি একা তো শত্রুর সঙ্গে লড়তে পারি না।"

আবু বতন বলল, "আমারও সেই কথা।"

জাভেরি ঠাট্টা করে বলল, "আমি জানি তোমরা দুজনই খুব সাহসী, কিন্তু ভাল যোদ্ধা হওয়ার বদলে তোমরা হয়েছ ভাল দৌড়বাজ। আমাদের দেখ। আমরা তো ভয় পাই নি। আমরা ভিতরে গিয়েছিলাম, আর আমাদের কোন ক্ষতিও হয় নি।

"কমরেড রোমেরো কোথায়?" আবু বতন জানতে চাইল।

"দেখ, হয়তো তাকে আমরা হারিয়েছি," জাভেরি স্বীকার করল। "তোমরা কি আশা কর? কাউকে না হারিয়েই যুদ্ধ জিতবে?"

কিটেম্বো বলল, "যুদ্ধ তো হয় নি। অথচ লোকটি ফিরল না।"

হঠাৎ ডয়স্কি চোখ তুলে তাকিয়ে বলল, "ঐ তো সে আসছে।" সকলেই দেখল, মিগুয়েল রোমেরো তাঁবুর দিকেই এগিয়ে আসছে।

দূর থেকেই সে বলল, "আমার সাহসী কমরেডবৃন্দ, তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই। তোমাদের জীবিত দেখতে পেয়ে ভারী খুশি হলাম। আমার তো আশংকা হয়েছিল হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তোমরা সকলেই পটল তুলেছ।"

সে এসে পাশে বসলে জাভেরি বলল, "তোমার এত দেরী হল কেন?"

"ভিতরের প্রাচীরের ওপারে কি আছে দেখতে গিয়েছিলাম।"

"কি দেখলে?" আবু বতন-এর প্রশ্ন।

রোমেরো বলল, "দেখলাম আশ্চর্য সব অট্টালিকার সুমহান ধ্বংসস্তূপ—মৃত অতীতের ভগ্নদশাগ্রস্থ এক মৃত শহর।"

"আর কিছু" কিটেম্বোর প্রশ্ন।

"আর দেখলাম একদল অদ্ভুত যোদ্ধাকে; বাঁকা পায়ের ছোট ছোট মানুষ; সবল লম্বা হাত, আর লোমশ দেহ। মন্দিরের মত একটা অট্টালিকার ভিতর থেকে তারা বেরিয়ে এল। তারা সংখ্যায় অনেক, আমি একা; তাই যুদ্ধ না করেই চলে এসেছি।"

"তাদের হাতে অস্ত্র ছিল?" জাভেরির প্রশ্ন।

"গদা ও ছুরি," রোমেরো জবাব দিল।

জাভেরি বলে উঠল, "শুনলে তো। তারা গদাসর্বস্ব একদল অসভ্য মানুষ। একজনকেও না হারিয়ে আমরা অনায়াসে শহরটা দখল করতে পারতাম।"

কিটেম্বো বলল, "কিন্তু তারা তো মানুষ নয়, দানব।"

জাভেরি রেগে বলল, "মানুষই হোক আর দানবই হোক, আমরা ফিরে যাবই। শহরটা দখল করব। ওপার-এর সোনা আমাদের চাই।"

কিটেম্বো পাল্টা জবাব দিল, "তুমি যেতে পার সাদা মানুষ, কিন্তু তোমাকে একলা যেতে হবে। আমার লোকরা সেখানে যাবে না।"

"আর তুমি আবু বতন ?" জাভেরি প্রশ্ন করল।

আবু বতনও যেতে রাজী হল না।

জাভেরি রাগ করল, ভয় দেখাল, খোসামোদ করল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

"এখনও একটা উপায় আছে," রোমেরো বলল।

"কি ?"

"গ্রিঙ্গো ও ফিলিপিনটি এসে পৌঁছলে আরব ও আফ্রিকার মানুষ ছাড়াই আমরা ছ'জন হব। ছ'জনেই ওপার দখল করতে পারব।" পল আইভিচ ঠোঁট বাঁকাল; জাভেরি গলা খাকাড়ি দিল।

বলল, "আমরা যদি মারা যাই তো গোটা পরিকল্পনাটাই ভেস্তে যাবে।"

রোমেরো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "এটা আমার প্রস্তাবমাত্র। অবশ্য তোমরা যদি ভয় পাও—"

জাভেরি গর্জে উঠল, "আমি ভয় পাই নি; তাই বলে আমি বোকা নই।"

ঠোঁট বেঁকিয়ে রোমেরো বলল, "আমি খেতে যাচ্ছি।"

সে চলে গেল।

•

শিবিরে আসার পরদিন ওয়েনি কোণ্ট সাংকেতিক ভাষায় একটা লম্বা চিঠি লিখে ছোকরা চাকরটাকে দিয়ে সেটা উপকূলে পাঠিয়ে দিল। নিজের তাঁবু থেকেই জোরা ড্রিনভ সেটা দেখতে পেল। মাথা-চেঁরা লাঠির মাথায় চিঠিটা ঢুকিয়ে দিয়ে ছোকরাটা দীর্ঘ পথযাত্রায় বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে কোণ্ট এসে হাজির হল জোরার তাঁবুর পাশে বড় গাছটার ছায়ায়।

জোরা বলল, "কমরেড কোণ্ট, আজ সকালেই তুমি একটা চিঠি পাঠিয়েছ।"

দ্রুত চোখ তুলে কোণ্ট বলল, "হ্যাঁ।"

"তোমার জানা উচিত ছিল যে এই অভিযানে একমাত্র কমরেড জাভেরি ছাড়া আর কেউ চিঠি লিখতে পারে না।"

কোণ্ট বলল, "আমি জানতাম না। আমি উপকূলে পৌঁছবার আগেই কিছু টাকা সেখানে এসে থাকার কথা ছিল। টাকাটা আসে নি। সেটার

খোঁজ নিতেই ছোকরাকে পাঠিয়েছি।”

“ও” বলে জোরা চুপ করল।

বিকেলে দু'জন এক সঙ্গে শিকারে বের হল। এক সঙ্গে রাতের খাবার খেল। এইভাবে দিন কাটতে লাগল। তারপর একদিন একটি উত্তেজিত কালা আদমি এসে খবর দিল, অভিযাত্রীরা ফিরে এসেছে। সকলেই বুঝল, ছোট দলটির পতাকায় জয়ের বার্তা লেখা হয় নি। নেতাদের মুখে পরাজয়ের হতাশা। জাভেরি জোরাও কোণ্টের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করল।

রাতে খাবার টেবিলে বসে দু'পক্ষই তাদের অভিজ্ঞতার কথা শোনাল। রঘুনাথ জাফরের মৃত্যু, কবর দেওয়া ও তার ভৌতিক পুনরভ্যুত্থানের কাহিনী সকলকেই রোমাঞ্চিত করে তুলল।

কোণ্ট বলল, “যে তাকে মেরেছে সেই তাকে কবর থেকে তুলেছে। সে যেই হোক আর যাই হোক, একটা ভারী মৃতদেহকে যে গাছের উপর বয়ে নিয়ে যেতে পারে সে নিশ্চয় অমানুষিক ক্ষমতার অধিকারী।”

জোরা বলল, “সব চাইতে বিস্ময়ের কথা, কাজটা করা হয়েছে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে। মৃতদেহটাকে আমাদের টেবিলের উপর ছুঁড়ে দেবার আগে গাছের একটা পাতার সর্‌-সর্‌ শব্দও আমরা শুনতে পাই নি।”

“মানুষ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না,” জাভেরি বলল।

কোণ্ট বলল, “সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সে কী মানুষ।”

কিছুক্ষণ পরে সকলেই যার যার তাঁবুতে ফিরে গেল। জাভেরি ইসারায় জোরাকে থাকতে বলল।

“এই মার্কিন যুবকটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?”

“বেশ ভালই তো মনে হচ্ছে।”

“তোমার মনে সন্দেহ জাগতে পারে এমন কিছু কি সে বলেছে বা করেছে?”

“মোটেই না।”

জাভেরি আবার বলল, “বেশ কয়েকদিন তো তোমরা একসঙ্গে ছিলে। তোমাকে সে যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছে তো?”

“তোমার বন্ধু রঘুনাথ জাফরের চাইতে বেশী সম্মান অবশ্যই দেখিয়েছে।”

“সে কুকুরটার নাম আমার কাছে বলো না। আমি এখানে থাকলে সে আমার হাতেই মরত।”

“এ ব্যাপারে একজন কিন্তু তোমার উপর টেক্কা দিয়েছে।”

কিছুক্ষণ দু'জনই চুপচাপ। মনে মনে কি যেন ভেবে নিয়ে জাভেরি বলল, “কোণ্ট সত্যি মনোহরণ যুবক। দেখো জোরা, যেন তার প্রেমে পড়ো না।”

“কেন পড়ব না?” জোরা বলল। “আমার মন, আমার শক্তি, আমার বুদ্ধি, হয়তো আমার হৃদয়েরও অনেকটাই আমার আদর্শের জন্য উৎসর্গ করেছি।

কিন্তু আমার হৃদয়ের এমন একটি কোণ এখনও রয়েছে যেখানে আমি যা খুশি তাই করতে পারি।"

"তার মানে তুমি বলতে চাইছ যে তুমি তার প্রেমে পড়েছ?"

"মোটেই না। সে কথাই ওঠে না। এরকম কোন ভাব আমার মাথায়ই ঢোকে নি। আমি শুধু বলতে চাই পিটার যে এ সব ব্যাপারে তুমি কোন রকম হুকুম চালিও না।"

"শোন জোরা। তুমি ভাল করেই জান আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আরও জান যে অচিরেই তুমি আমার হবে। আমি যা চাই তা নিতেও জানি।"

"আমাকে বিরক্ত করো না পিটার। ভালবাসাবাসির মত বাজে কাজের মত সময় আমার নেই। যে কাজে নেমেছি সেটা শেষ হলে তবেই এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব।"

জাভেরি বলল, "মাথাটা তোমাকে এখনই ঘামাতে হবে জোরা। এই অভিযানের ব্যাপারে এমন অনেক কথা আছে যা আমি কাউকে বলি নি। আজ তোমাকে বলব, কারণ তোমাকে আমি ভালবাসি, অচিরেই তুমি আমার স্ত্রী হবে। এই অভিযানে বিপদের ঝুঁকি যে কত বড় তা তুমি স্বপ্নেও ভাবতে পার নি। এত বিপদ, এত কষ্টকে কাটিয়ে যে ক্ষমতা ও সম্পদ আমার হাতে আসবে তা আমি কাউকে দেব না।"

"আমাদের আদর্শকেও নয়?" জোরা প্রশ্ন করল।

"আদর্শের জন্যই সে সব কিছু আমি ব্যবহার করব।"

"তুমি কি বলতে চাইছ? আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।"

এবার জাভেরি স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করল, আমি স্বয়ং হতে চাই আফ্রিকার সম্রাট, আর তোমাকে বানাতে চাই আমার সম্রাজ্ঞী।"

"পিটার! তুমি কি পাগল হয়েছ?" জোরা চীৎকার করে বলল।

"হ্যাঁ, আমি পাগল হয়েছি—ক্ষমতার জন্য পাগল, অর্থের জন্য পাগল, তোমার জন্য পাগল।"

"এ তুমি করতে পারবে না পিটার। যে শক্তির অধীনে আমরা কাজ করছি তাদের দাঁড়াগুলি যে কত সুদূরপ্রসারী তা তো তুমি জান। একবার বিশ্বাস ভাঙলে সে সব দাঁড়া তোমাকে আঁকড়ে ধরবে, ক্ষমতার আসা থেকে টেনে নামিয়ে ধ্বংস করে ফেলবে।"

"লক্ষ্যে পৌছতে পারলে আমার হাতেও ক্ষমতা আসবে যে আমি অনায়াসে তাদের উপেক্ষা করতে পারব।"

"কিন্তু আর যারা এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তোমার কথামত কাজ করছে, তারা যে তোমাকে টুকরো-টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে পিটার।"

জাভেরি হেসে উঠল। "তুমি এদের চেন না জোরা। এরা সকলেই এক।

সব নর-নারীই এক। আমি যদি তাদের বড় বড় মন্ত্রীর পদ দেই, প্রত্যেকের জন্য একটা করে প্রাসাদ ও হারেম বানিয়ে দেই, তাহলে তা খাবার জন্য তারা তাদের মায়ের গলা কাটতেও দ্বিধা করবে না।"

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। "আমি অবাক হয়ে গেছি পিটার। আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্তত আদর্শের প্রতি অনুরক্ত।"

জাভেরি উঠে দাঁড়িয়ে জোরার হাতটা চেপে ধরে বলল, "শোন জোরা, আমি তোমাকে ভালবাসি, আর তাই আমার জীবনটাকে তুলে দিয়েছি তোমার হাতে। কিন্তু মনে রেখো, তুমি যদি বিশ্বাসভঙ্গ কর তাহলে আমি তোমাকেও খুন কবর।"

"সে কথা তোমাকে মুখে বলতে হবে না পিটার। আমি তা ভাল করেই জানি।"

পরদিন সকাল থেকেই ওপার-এ দ্বিতীয় অভিযান পরিচালনা নিয়ে একটা বৈঠক বসল। আলোচনায় স্থির হল, পুরো দলটাই ওপার-এর প্রাচীর পর্যন্ত যাবে; কিন্তু যোদ্ধাদের মধ্যে মাত্র দশজন সাদা মানুষদের সঙ্গে শহরে ঢুকবে। বস্তুত যে সব আস্কারি শিবির পাহারা দেবার জন্য থেকে গিয়েছিল এবং যারা কোল্টের সঙ্গে উপকূল অঞ্চল থেকে এসেছে অর্থাৎ ওপার-এর আতংকের অভিজ্ঞতা যাদের হয় নি শুধু তারাই শহরে ঢুকতে রাজী হল।

নতুন অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজনেই কয়েকটা দিন কেটে গেল। একদিন সকালে জাভেরি ও তার দলবল নতুন করে ওপার-এর পথে যাত্রা করল। জোরা ড্রিনভও তাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু যেহেতু উত্তর আফ্রিকার অনেক এজেন্টের কাছ থেকে চিঠিপত্র আসার কথা আছে তাই তাকে শিবিরে রেখে যাওয়া হল। আবু বতনও তার সেনাদল ও কিছু চাকরবাকরসহ শিবির পাহারা দেবার জন্য রয়ে গেল। অভিযাত্রীদলের যাত্রার সময় শেখের দলবল একবার চোখ তুলে তাকিয়েও দেখল না। আবু বতনও ধ্যানমগ্নের মত বসে রইল, যদিও তার চোখ দুটি পড়েছিল জোরার ক্ষীণ তনুর দিকে।

৬—বিশ্বাসঘাতক

ছোট্ট নকিমার অন্তর অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। পাহাড়ের মাথা থেকেই সে দেখল, মিগুয়েল রোমেরো ওপার শহর থেকে বেরিয়ে গেল। মৃত্যুবাহী বজ্র-নলে সজ্জিত এই সাহসী টারমাঙ্গানিকে ধ্বংসস্তূপ থেকে বিতাড়িত হতে দেখে তার মনে বদ্ধমূল ধারণা হল যে ঐ ধ্বংসস্তূপের কোন বিষণ্ণ প্রান্তে তার মনিব নিশ্চয়

ভয়ংকর কোন বিপদে পড়েছে। অন্তরের প্রভুভক্তি তাকে বলছে, ফিরে গিয়ে সব কিছু খোঁজ করতে; কিন্তু নকিমা তো একটি অতি ক্ষুদ্র মনুমাত্র, সব কিছু দেখে সে খুব ভয় পেয়েছে। দুবার ওপার-এর দিকে যাবার চেষ্টা করেও সাহসে কুলোয় নি। তাই শেষ পর্যন্ত প্রান্তরের পথ ধরে সে বিষণ্ণ মনে এগিয়ে চলল পরিচিত বনের দিকে।

* * *

অন্ধকার ঘরের দরজায় হাত রেখে দাঁড়িয়েছে টারজন। তার সম্মুখে আক্রমণোদ্যত সিংহ নুমা। নুমার চাইতেও দ্রুততর গতিতে কাজ করে টারজনের মন ও মাংসপেশী। মুহূর্তের মধ্যে গোটা দৃশ্যের একটা ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে দেখল—ওপার-এর জটাধারী সন্ন্যাসীরা তার দিকে এগিয়ে আসছে; ভারী দরজাটা ভিতর দিকে এসে থেমে গেছে; সিংহটা আক্রমণে উদ্যত। মুহূর্তের মধ্যে সে নিজের কর্তব্য স্থির করে ফেলল। দরজাটাকে চেপে ধরে তার পিছনে সরে গেল। নিজের গতিবেগের টানেই সিংহটা লাফিয়ে পড়ল বারান্দায় এগিয়ে-আসা সন্ন্যাসীদের একেবারে মুখের সামনে। আর মুহূর্তের মধ্যে টারজন দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিল।

বাইরের বারান্দায় কি ঘটল তা চোখে না দেখলেও অনুমান করতে পারল। বাইরের গর্জন ও আর্তনাদ ক্রমেই দূরে সরে গেল। টারজনের ঠোঁটে হাসি ফুটল। একটু পরেই একটা মর্মভেদী আর্তনাদ শুনে সে বুঝতে পারল, পলায়মান সন্ন্যাসীদের অন্তত একজনের জীবন-লীলা সাঙ্গ হল।

টারজন বুঝল, এখানে আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করে কোন লাভ হবে না। অবিলম্বে এখান থেকে বেরিয়ে এই গোলকধাঁধা থেকে পালাবার পথ খুঁজতে হবে। কিন্তু ভারী দরজাটা খুলতে গিয়েই বুঝল, ভিতর থেকে এ দরজাটা খোলা যাবে না। কাজেই ওপার-এর এই কারা-কক্ষে সে আবার বন্দী হয়ে গেছে।

এখন সে কি করবে? ভাবতে ভাবতেই ঘরের পিছন দিক থেকে চুপি চুপি পা ফেলার শব্দ তার কানে এল। খাপ থেকে ছুরি খুলে সে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল। ও কার পায়ের শব্দ! নিশ্চয় আরও একটা সিংহ ওখানে লুকিয়ে ছিল। এবার সে এগিয়ে আসছে মানুষের গন্ধ পেয়ে। জীবনে এই প্রথম তার মনে হল, এবার মৃত্যু অবধারিত। তার শেষ সময় উপস্থিত।

মরতে টারজন ভয় পায় না। কিন্তু পড়ে পড়ে মার সে খাবে না। নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল।

"কে তুমি?" একটি নারী-কণ্ঠের প্রশ্ন।

"তুমি কোথায়?" টারজনের পাল্টা প্রশ্ন।

"ঘরের পিছন দিকে," স্ত্রীলোকটি জবাব দিল।

"সিংহটা কোথায় গেল?"

"তুমি দরজা খুলতেই সেটা বেরিয়ে গেছে।"

"কিন্তু অন্যটা?"

"অন্য কোন সিংহ এখানে ছিল না। এবার আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি। এ কণ্ঠস্বর আমার পরিচিত। তুমি তো অরণ্যরাজ টারজন।"

"না।" টারজন চেঁচিয়ে বলে উঠল। "একটা সিংহের সঙ্গে এক ঘরে থেকেও তুমি বেঁচে আছ কেমন করে?"

লা বলল, "আমি আছি পাশের ঘরে। দুই ঘরের মধ্যে লোহার শিকের একটা দরজা আছে। দরজায় কোন তালা নেই, কারণ তালার দরকার নেই, দরজাটা খোলে সিংহের ঘরের ভিতর দিয়ে।"

অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে দুজনই এগিয়ে গেল। এক সময় দুজনের হাত পরস্পরকে স্পর্শ করল।

লা আরও কাছে এসে দাঁড়াল। সে কাঁপছে। বলল, "আমি ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন আর ভয় নেই।"

টারজন বলল, "আমি তো তোমাকে বেশী সাহায্য করতে পারব না। আমিও যে বন্দী।"

"তা জানি। তবু তুমি কাছে থাকলে আমি নিরাপদ বোধ করি।"

টারজন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, "কি ব্যাপার বল তো? ওআ হয়েছে প্রধান সন্ন্যাসিনী, আর নিজের কারাগারে তুমি নিজেই বন্দী?"

লা তার দুঃখের কাহিনী শোনাল। ওআ ডুথের সঙ্গে ভালবাসা করে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলে। টারজনকে ভালবাসার জন্য রাজ্যের জনসাধারণ এমনিতেই লার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এবার ওআর মিথ্যাপ্রচারের ফলে সকলেই লার বিরুদ্ধে গেল। লাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে সেখানে বসাল ওআকে, আর লাকে করল বন্দিনী।

কাহিনী শেষ করে লা বলল, "তুমি এসে পড়েছ; এবার আমাদের পালাতে হবে।"

টারজন অসহায়ভাবে বলল, "কোন্ পথে পালাব?" সিংহটাকে বন্দী করে ওরা তো এই অলিন্দপথেই ফিরবে।"

লা বলল, "আমার ঘরের পিছনের দেয়ালে দীর্ঘকাল ধরে অব্যবহৃত একটা সুড়ঙ্গ আছে। সেটাই আমাদের পালাবার একমাত্র পথ। কিন্তু এতদিন পরে সে সুড়ঙ্গ-পথ কি অবস্থায় আছে, বাইরের দিককার মুখটা খোলা আছে কি না কিছুই তো জানি না।"

"তাহলে আমি আগে গিয়ে সুড়ঙ্গটা পরীক্ষা করে আসি।"

তাকে বাধা দিয়ে লা বলল, "না, অত সময় পাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। সিংহটাকে নিয়ে ওরা এল বলে।"

হাতে হাত ধরে দু'জন অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে পা বাড়াল।

অনেক কষ্টের পথ পার হয়ে এক সময় দুজনই একটা নির্জন ঘরে এসে বিশ্রাম নিল। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। প্রধান সন্ন্যাসিনীর দুটি সুন্দর চোখ অরণ্য-দেবতার সুন্দর শরীরের উপর নিবদ্ধ।

এক সময় লা ডাকল, "টারজন!"

চোখ তুলে টারজন বলল, "বল লা।

"আমি আজও তোমাকে ভালবাসি টারজন।"

"ও কথা এখন থাক।'

"না, আমাকে বলতে দাও। একথা বলতে আমার দুঃখই হয়, তবু এ যে এক মধুর দুঃখ—আমার জীবনের একমাত্র মধুস্বাদ।"

তার কাঁধে হাত রেখে টারজন বলল, "তুমি চিরদিনই আমার অন্তর অধিকার করে আছ লা। তাকে ভালবাসাও বলতে পার। তোমার প্রতি আমার অনুরাগ যদি আর অগ্রসর না হয় তো সেটা আমার দোষ নয়, তোমারও নয়।"

লা হেসে বলল, "এতে আমার কোন দোষ থাকতে পারে না টারজন, কিন্তু আমি জানি এ জিনিস ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় না। ভালবাসা ঈশ্বরের দান। কখনও সে দান আসে ক্ষতিপূরণ হিসাবে, কখনও শাস্তি হিসাবে। আমার জীবনে হয়তো শাস্তি হয়েই এসেছে, তবু এই আমি চাই। যেদিন তোমাকে প্রথম দেখেছি সেইদিনই তোমার ভালবাসায় মজেছি। সে ভালবাসা যতই আশাহীন হোক, তবু তাকে ছাড়া আমি বেঁচে থাকতে চাই না।"

টারজন কোন জবাব দিল না। দু'জন চুপচাপ। এখন শুধু রাত নামার অপেক্ষা, যাতে সকলের অলক্ষ্যে তারা শহরে নামতে পারে। টারজনের মনে একটিমাত্র চিন্তা—কেমন করে লাকে আবার সিংহাসনে বসানো যায়।

লা বলল, "অগ্নি দেবতা যখন রাতের বিশ্রাম নিতে যায় তার ঠিক আগে সব সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা দরবার-কক্ষে সমবেত হয়। আজ রাতেই সেই সমাবেশ হবে। তখন আমরা শহরে নামতে পারব।"

"তারপর?" টারজনের সাগ্রহ প্রশ্ন।

"দরবার-কক্ষে যদি আমরা ওআকে খুন করতে পারি, সেই সঙ্গে ডুথ্‌কেও, তাহলে আর ওদের কোন নেতা থাকবে না। আর নেতাহীন হলেই ওরা শক্তিহীন।"

"কোন নারীকে আমি মারতে পারব না," টারজন বলল।

"আমি পারব," লা বলল। "তুমি ডুথ্‌-এর ব্যবস্থা করো। তাকে মারতে নিশ্চয় তোমার কোন আপত্তি হবে না।"

"সে যদি আক্রমণ করে তবেই তাকে মারব, নইলে নয়। টারজন জীবহত্যা

করে আত্মরক্ষা ও খাদ্যের জন্য, অথবা শত্রুকে বাধা দেবার আর কোন পথ যখন না থাকে। স্-স্-স্! কে যেন আসছে।”

নিঃশব্দে মেঝেটা পার হয়ে টারজন দরজার পাশে ঘাপ্‌টি মেরে বসল। একটি বুড়ো মত মানুষ মুখটা বাড়াতেই টারজন সজোরে তার গলা টিপে ধরে একটানে ভিতরে নিয়ে এল। বলল, “চুপ! যা বলছি তাই কর, তাহলে তোমার কোন ক্ষতি করব না।”

লা বুড়ো লোকটির কোমর থেকে ছুরিটা তুলে নিল। টারজন তাকে মেঝের উপর শটান শুইয়ে দিয়ে গলাটা ছেড়ে দিল।

লার দিকে চোখ পড়তেই অবিশ্বাস ও বিস্ময় ফুটে উঠল বুড়ো সন্ন্যাসীটির চোখে।

লা চেঁচিয়ে বলল, “ডারুস!”

সন্ন্যাসী বলল, “অগ্নি-দেবতার জয় হোক! সেই তোমার পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।”

টারজনের দিকে ঘুরে লা বলল, “ডারুসকে ভয় করো না। সে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। ওপার-এর সন্ন্যাসীদের মধ্যে তার চাইতে রাণীর প্রতি বিশ্বস্ত আর কেউ নেই।”

বুড়ো মাথা নেড়ে বলল, “ঠিক কথা।”

“লার প্রতি বিশ্বস্ত আরও অনেকে আছে কি?”

“হ্যাঁ, অনেক আছে, কিন্তু তারা ভয় করে। ওআ একটি শয়তানী, আর ডুথ্‌ একটা বোকা।”

একটু চিন্তা করে লা বলল, “শোন ডারুস। রাণীর প্রতি বিশ্বস্ত যত জনকে পারে আজ রাতে তাদের সকলকে দরবার-কক্ষে নিয়ে আসবে। অগ্নি-দেবতা যখন পালংকে শুতে যাবে তখন তোমাদের প্রধান সন্ন্যাসিনী লার শত্রুদের আঘাত হানতে প্রস্তুত থেকো।”

“তুমি সেখানে থাকবে?” ডারুস প্রশ্ন করল!

লা জবাব দিল, “আমি সেখানে থাকব। তোমার এই ছুরিই হবে সংকেত। যখনই দেখবে ওপার-এর রাণী লা এই ছুরি বসিয়ে দিল নকল সন্ন্যাসিনী ওআ-র বুকে, তখনই তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়বে লা-র শত্রুদের উপর।”

ডারুস বলল, “তোমার কথামতই কাজ হবে। এবার তাহলে আমি চলি।”

বুড়ো ডারুস ধীরে ধীরে চলে গেল।

টারজন বলল, “তুমি স্থির জান লা যে এই লোকটিকে বিশ্বাস করা যায়?”

লা বলল, “নিঃসন্দেহে। ডারুস আমার জন্য প্রাণ দেবে। আমি জানি, ওআ ও ডুথ্‌কে সে ঘৃণা করে।”

বেলা পড়ে এল। সূর্য নেমে এল পশ্চিম আকাশে। আলো থাকতে

থাকতেই দুটি প্রাণীকে নিতে হবে এক মস্ত ঝুঁকি—শহরে নেমে দরবার-কক্ষে যাত্রা করতে হবে। সকলের অলক্ষ্যে প্রাঙ্গণ পেরিয়ে দুজন মন্দিরে ঢুকল। অনেক গলি-পথ ঘুরে লা টারজনকে নিয়ে পৌঁছে গেল দরবার-কক্ষের বেদীর পিছন দিককার ছোট দরজাটার কাছে। সেই বেদীর উপরেই সিংহাসন। দু'জন সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল।

সান্ধ্য অর্চনার রীতি অনুসারে একসময় একমাত্র প্রধান সন্ন্যাসিনী ছাড়া অন্য সকলেই মাটিতে শুয়ে পড়ে মেঝেতে মুখ রাখল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে লা নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে বেদীর উপরে সিংহাসনের পিছনে বসে পড়ল। তার ঠিক পিছনেই টারজন। সঙ্গে সঙ্গে দুজনই বুঝতে পারল যে, তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়েছে। কারণ তাদের ধরে ফেলার জন্য বেদীর উপর সন্ন্যাসীদের যেন মেলা বসে গেছে।

ইতিমধ্যেই একজন লা-র হাতটা চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে টারজন একলাফে তার উপর পড়ে তার গলাটা চেপে ধরে এত জোরে তার মাথাটা হঠাৎ পিছন দিকে ঠেলে দিল যে, তার ঘাড়টা মট্ করে ভেঙে গেল। তারপর তাকে মাথার উপর তুলে আক্রমণোদ্যত সন্ন্যাসীদের দিকে ছুঁড়ে দিল। তারা হকচকিয়ে সরে যেতেই টারজন লা-কে ধরে যে বারান্দা দিয়ে তারা দরবার-কক্ষে ঢুকেছিল সেই পথেই বেরিয়ে গেল।

সন্ন্যাসীরা হৈ-হৈ করে দল বেঁধে তাদের পিছু নিল। টারজন এবার লা-কে কাঁধে ফেলে দ্রুত ছুটতে লাগল বহিঃপ্রাচীরের দিকে। একবার খোলা মাঠে পড়তে পারলে আর তাদের পায় কে।

ক্রমে সন্ধ্যা নেমে এল। বাইরের জগতের অন্ধকারে ওপার-এর মানুষরা অভ্যস্ত নয়। তাই আর না এগিয়ে তারা ফিরে গেল।

টারজন লা-কে মাটিতে নামিয়ে দিল। লা কিন্তু তবু তার গলা জড়িয়ে ধরেই রইল। তার বুকের মধ্যে মুখ রেখে কেঁদে উঠল।

টারজন বলল, "কেঁদো না লা। আমরা আবার ওপার-এ ফিরে যাব; তোমাকে আবার সিংহাসনে বসাব।"

লা বলল, "আমি সেজন্য কাঁদছি না।"

"তাহলে?"

"কাঁদছি আনন্দে, কারণ এখন আমি অনেকটা সময় তোমার সঙ্গে একলা থাকতে পারব।"

একটা গাছে চড়ে তারা রাতটা কাটাল!

ভোরে প্রথম ঘুম ভাঙল টারজনের। আকাশ মেঘে ঢাকা। ঝড় উঠবে। অনেক সময় হয়ে গেল কোনরকম খাবার মুখে পড়ে নি। আগের দিন সকাল থেকে লা-ও কিছু খায় নি। অতএব সকলের আগে চাই কিছু খাবার। আর

এখানে খাবার মানেই শিকার। টারজন একবার ঘুমন্ত লা-র দিকে তাকিয়ে শিকারের সন্ধানে চলে গেল।

লা-র ঘুম ভাঙল। চারদিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নরম গলায় ডাকল, "টারজন।" কোন জবাব এল না। আবার ডাকল। এবার বেশ জোরে। কোন সাড়া নেই। গাছের নীচটাও জনশূন্য। তাহলে টারজন নিশ্চয় শিকার করতে বেরিয়েছে।

ভাবতে ভাবতে লা গাছ থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করল। মাথার উপরে কালো মেঘ গর্জে উঠল। ঝড়ের রাজা ছেড়ে দিল তার সেনাদলকে। লা এগিয়ে চলল। তার পথের পাশে পাশেই ঝোপঝাড়ের আড়াল দিয়ে এগিয়ে চলল জ্বলন্ত চক্ষু এক বাদামী পশু।

৭—ব্যর্থ সন্ধান

খাদ্যের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে টারজনের চোখে পড়ে গেল শুয়োর হোর্টা। গাছের ডাল থেকে সেটার উপর লাফিয়ে পড়ে ছুরির আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তাকে মেরে ফেলল। তারপর সেই মৃতদেহের উপর পা রেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে উচ্চারণ করল গোরিলাদের বিজয়-ধ্বনি।

সেই বীভৎস চীৎকার এসে লাগল একদল অভিযাত্রীর কানে। দলের কালা আদমিরা চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"ওটা কোন্ শয়তানের গলা?" জাভেরি শুধাল।

"চিতাবাঘের গর্জন বলে মনে হল," কোণ্ট বলল।

কিটেম্বো বলল, "চিতা নয়, কোন গোরিলার গর্জন; হয় শিকার মেরেছে, আর না হয়—"

"নাহলে কি?" জাভেরি প্রশ্ন করল।

যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল ভয়ার্ত চোখে সেইদিকে তাকিয়ে কিটেম্বো বলল, "এখান থেকে আমাদের সরে পড়াই ভাল।"

আবর বিদ্যুৎ চমকাল। বজ্র হুংকার দিল। মুষলধারে বৃষ্টি নামল। দলটা অতি কষ্টে এগিয়ে চলল ওপার-এর পর্বত-প্রাচীরের দিকে।

* * *

বৃষ্টিতে ভিজে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ওপার-এর লা আশ্রয় নিয়েছে একটা বড় গাছের নীচে। কয়েক গজ দূরে ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে থেকে একটি বাদামী পশু অপলক চোখে তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

হাঁটতে হাঁটতে লা একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছল। সেখানে রোদ ঝলমল করছে। মাঝখানে একটা ছোট পাথরের চাঁই দেখতে পেয়ে তার উপর গিয়ে বসল শরীরটাকে ভাল করে শুকিয়ে নেবার জন্য। একটা খস্‌-খস্‌ শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখল। খোলা জায়গাটার ওপারে বনের প্রান্তে একটা চিতা ছুব্‌নি পেতে বসে আছে।

লা উঠে কোমর থেকে ছুরিটা বের করল। আত্মরক্ষার চেষ্টা বৃথা হবে জেনেও বিনা যুদ্ধে হার স্বীকার করা তার স্বভাবে নেই।

চিতাটা লাফ দিতে উদ্যত। হঠাৎ সেটা উঠে দাঁড়াল। পিঠটা বেঁকে গেল। মুখ থেকে বের হল একটা ভয়ের শব্দ। পরমুহূর্তেই লা-র পাশ দিয়ে পিছন থেকে বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গেল একটা প্রকাণ্ড সিংহ। লাফিয়ে পড়ল চিতাটার উপর। তার গলা কামড়ে ধরে চোয়াল ও থাবার সাহায্যে মাথাটাকে এমনভাবে ঘোরাতে লাগল যে, চিতার শিরদাঁড়াটাই মট্‌ করে ভেঙে গেল।

মৃত চিতাটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সিংহটা লা-র দিকে ঘুরে দাঁড়াল। লা বুঝল, এক পশুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে এবার সে ভয়ংকরতর আর এক পশুর শিকার হয়েছে।

সিংহটা এক দৃষ্টিতে তার দিকেই তাকিয়ে আছে। লা তো অবাক—সিংহটা তাকে আক্রমণ করছে না কেন। সে তো জানে না, সিংহটার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এই নারীর দেহ-গন্ধ তার মনে জাগিয়ে তুলেছে আর একটি দিনের স্মৃতি—যেদিন ওপার-এর যজ্ঞ-বেদীর যূপকাষ্ঠে বাঁধা ছিল টারজন, আর সোনালী সিংহ জাদ্‌-বাল্‌-জা দাঁড়িয়ে ছিল তারই পাহারায়। এমন সময় এসেছিল একটি নারী—এই সেই নারী—আর তার মনিব টারজন বলেছিল জাদ্‌-বাল্‌-জা যেন সেই নারীর কোন ক্ষতি না করে। সেই নারী তখন এগিয়ে এসে টারজনের বাঁধন কেটে দিয়ে তাকে মুক্তি দিয়েছিল।

সে কথা জাদ্‌-বাল্‌-জার মনে পড়েছে। কিন্তু ওপার-এর লা তো তা জানে না; জাদ্‌-বাল্‌-জাকে সে চিনতেও পারে নি। তাই তো সিংহটার আচরণে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। লা-র একেবারে কাছে এসে সে শুয়ে পড়ে একটা হাই তুলল। ভয়ে ও বিস্ময়ে লা-র ইস্পাত-কঠিন দেহটা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু এভাবে তো অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখে হাতের ছুরির মুখটা নিজের বুকে ঠেকিয়ে লা সিংহটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াল। যদি সিংহটা তাকে আক্রমণ করে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ছুরিটা নিজের বুকে বিঁধিয়ে দিয়ে সব যন্ত্রণার অবসান ঘটাবে।

জাদ্‌-বাল্‌-জা একটুও নড়ল না, আলস্যভরা আধ-বোজা চোখে শুধু একবার তাকিয়ে দেখল, সেই নারী খোলা জায়গাটা পেরিয়ে জঙ্গলের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

* * *

মৃত শুয়োরের রাংটা কেটে নিয়ে টারজন ফিরে চলল সেই গাছটার দিকে যার উপরে সে ঘুমন্ত লা-কে রেখে এসেছে। সেখানে পৌঁছে দেখল লা নেই। নাম ধরে ডাকল, সাড়া পেল না। কোথায় গেল লা? নিশ্চয় ওপার-এর দিকে ফিরে গেছে। সেটাই তো তার একমাত্র পরিচিত জায়গা। টারজন ভাবল, তার ফিরতে যত দেরীই হয়ে থাকুক, লা কোনমতেই তার আগে ওপার-এর পর্বত-প্রাচীরে পৌঁছতে পারবে না। পথেই সে তাকে ধরে ফেলতে পারবে। টারজন তাই ওপার-এর পথেই পা চালিয়ে দিল।

কিন্তু পর্বত-প্রাচীরের সানুদেশে পৌঁছেও তাকে দেখতে না পেয়ে সে একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠল। সেখান থেকে অনেক দূরে ওপার-কে দেখা যায়। এখানে বৃষ্টি খুব অল্পই হয়েছে। ফলে লা ও তার নেমে যাওয়ার পায়ের ছাপ বেশ স্পষ্টই চোখে পড়ছে। কিন্তু সে পথ বেয়ে উপরে ওঠার কোন পায়ের ছাপই তো দেখা যাচ্ছে না। তাহলে লা গেল কোথায়? তবে কি সে জঙ্গলের পথ ধরেই অন্য দিকে চলে গেছে?

হতাশ হৃদয়ে পাহাড় থেকে নামবার উদ্যোগ করতেই তার চোখে পড়ল কারা যেন জঙ্গল পার হয়ে পাহাড়ের দিকেই এগিয়ে আসছে। সে অনুমান করল, এটা নিশ্চয় সেই দল যারা ওপার-এর দিকে যেতে যেতে হঠাৎ রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, এ সময় তীর ধনুকটা সঙ্গে থাকলে খুব কাজে লাগত। যাই হোক, সেখান থেকেই সে অভিযাত্রী দলটির দিকে নজর রাখল। আরও এগিয়ে এসে তারা পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল।

পাহাড়ের উপর অনেক বড় বড় পাথরের চাঁই ইতস্তত ছড়ানো ছিল। দলপতিটি যখন পাহাড়ের মাঝামাঝি উঠে এসেছে তখন টারজন একটা বড় পাথরকে ঠেলে দিল তাদের লক্ষ্য করে। পাথরটা জাভেরির গা ঘেঁসে নেমে গিয়েই একটা বাড়ানো পাথরে ধাক্কা খেয়ে কোন্টের মাথা টপকে কিটেম্বোর দুটি সৈনিককে নিয়ে সবেগে পাহাড়ের নীচে ছিটকে পড়ল।

অভিযাত্রী দল থমকে দাঁড়াল। কিছু কালা আদমি সঙ্গে সঙ্গে পালাতে শুরু করল। অভিযাত্রী দল কেমন যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

দলের পিছনে ছিল ডর্স্কি ও আইভিচ। তাদের ডেকে জাভেরি বলল, "ঐ ভীরুর দলকে থামাও। আর পাহাড়ের উপরে উঠতে কে আমার সঙ্গে যাবে বল।"

"আমি যাব", রোমেরো বলল।

"আমিও যাব," কোণ্ট বলল।

"আর কেউ?" জাভেরি প্রশ্ন করল; কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না।

মেক্সিকো ও আমেরিকার যুবক দুটি ততক্ষণে পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করেছে।

পিছন ফিরে কোণ্ট চীৎকার করে জাভেরিকে বলল, "রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়তে থাক। তা হলে ওরা ভয় পেয়ে পাহাড়ের কিনারা থেকে সরে যাবে।"

যে কয়েকটি আস্কারি সঙ্গে এসেছে জাভেরি তাদের গুলি করার নির্দেশ দিল। সেই গুলির শব্দে বাকিদের বুকেও বুঝি সাহস ফিরে এল। ডরস্কি ও আইভিচও পলায়নপর কালা আদমিদের বাধা দিয়েছে। অতএব গোটা দলই আবার নতুন করে যাত্রা শুরু করল।

একা এতগুলি সশস্ত্র মানুষকে রোখা যাবে না বুঝতে পেরে টারজন তাড়াতাড়ি পাহাড়ের কিনারা বরাবর এগিয়ে গিয়ে পাথরের আড়ালে এমন একটা জায়গা বেছে নিল যেখান থেকে একটা বিপদসংকুল পথ সোজা নেমে গেছে পাহাড়ের নীচে। সেখানে লুকিয়ে থেকে সে সব ব্যাপারটা দেখতে পাবে, আবার দরকার হলে খুব তাড়াতাড়ি নীচেও নেমে যেতে পারবে।

বোমেরো ও কোণ্ট পাহাড়ের উপরে উঠে এলে টারজন কোণ্টকে দেখেই চিনতে পারল। প্রথম দর্শনেই এই মার্কিন যুবকটিকে তার ভাল লেগেছিল; এবার তার সাহসিকতা তাকে মুগ্ধ করল। সেখানে বসেই দেখতে পেল, অভিযাত্রী দলটি পাহাডের চূড়া পার হয়ে ওপার-এর পথে যাত্রা করল। সে জানত, ওপার-এর রত্ন-ভাণ্ডারের সন্ধান ওরা কোনদিনই পাবে না; আর এখন লা যখন সে শহরে নেই তখন সেখানকার কথা নিয়েও তার কোন মাথাব্যথাও নেই। দ্রুত পায়ে পাহাড় থেকে নেমে সে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল।

বনপথ ধরে কিছুদূর এগিয়েই নদীর তীরে সে একটা শিবির দেখতে পেল। তার মনে আশা জাগল, এখানে হয়তো লার দেখা মিলবে। কাঁটা গাছের বেডা দেওয়া জায়গাটার মাঝখানে কিছু সাদা মানুদের তাঁবু; গাছের ছায়ায় বসে কুলিরা ঝিমুচ্ছে: একটি মাত্র আস্কারি রয়েছে পাহারায়; বাকিরা রাইফেল পাশে রেখে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। কিন্তু ওপার-এর লা-কে কোথাও দেখতে পাওয়া গেল না। তবে কি লা-কে কোথাও বন্দী করে রেখেছে? কিন্তু রাতের অন্ধকারে ছাড়া তো তার সন্ধান করা যাবে না। অতএব তাকে অপেক্ষা করতেই হবে। কাছেই একটা গাছের উপরে উঠে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

* * *

জাভেরির বিরুদ্ধে আবু বতনের ক্রোধ তার স্বভাবগত ইওরোপীয় বিদ্বেষ ও ধর্মের গভীরে প্রোথিত। শেখ সক্ষোভে বলল, "নাস্‌রানির কুত্তা! আমাদের মত বেদুইনদের বলে ভীরু: বুড়ো ও বাচ্চাদের মত আমাদের এখানে রেখে গেছে শিবির ও মেয়েদের পাহারা দিতে।"

একজন আরব আপত্তির সুরে বলল, "নাস্‌রানির হাত থেকে আফ্রিকাকে মুক্ত করার মহান ব্রতে সে তো আল্লাহের হাতের যন্ত্রমাত্র।"

আবু বতন তবু বলল, "ওরা যে কথামতই কাজ করবে তার কি প্রমাণ আছে? এইসব শুয়োরের বাচ্চাদের সঙ্গে এক শিবিরে থাকার চাইতে আমি বরং যা কিছু মাল-কড়ি পাই গুছিয়ে নিয়ে মরুভূমির স্বাধীন জীবনেই ফিরে যেতে চাই।"

একজন বলল, "সর্দার নাস্‌রানির ট্রাংকে অনেক সোনা-রূপো আছে।"

আবু বতন বলল, "সবই তো নাস্‌রানিদের ভোগে লাগবে। আমরাই বা আমাদের ভাগটা আগাম নিয়ে চলে যাই না কেন?"

সন্ধ্যাবেলা জোরার জন্য রান্না করতে করতে ওয়ামালা বলল, "এর আগে তোমাকে বাদামী বাওয়ানার কাছে রেখে গিয়েছিল: সে লোক ভাল ছিল না। শেখ আবু বতনকেও আমার বিশেষ ভাল মনে হচ্ছে না। এখন বাওয়ানা কোল্ট এসে পড়লে বাঁচি।"

জোরা বলল, "আমারও তাই মনে হয়। ওপার থেকে ফিরে আসার পর থেকেই আরবরা যেন কেমন হয়ে উঠেছে।"

ওয়ামালা বলল, "সারাটা দিন তারা সর্দারের তাঁবুতে বসে ফুস্থর-ফুস্থর করেছে, আর আবু বতন বার বার তোমার দিকে তাকিয়েছে।"

জোরা বলল, "ওটা তোমার কল্পনা ওয়ামালা। এত সাহস তার হবে না।"

পরমুহূর্তেই সে হঠাৎ বলে উঠল, "ওদিকে দেখ ওয়ামালা। ও কে?"

কালো ছোকরাটি সেই দিকে চোখ ফেরাল। শিবিরের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। সুন্দরী যুবতীটি এক দৃষ্টিতে তাদের দিকেই তাকিয়ে ছিল।

ততক্ষণে কয়েকজন আরবও তাকে দেখতে পেয়ে তার দিকে ছুটে গেল। তা দেখে জোরাও দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল যাতে আরবরা তাকে ধরবার আগেই সে পৌঁছে যেতে পারে। তার মুখের হাসি দেখেই ওপার-এর লা তার মনের ভাব বুঝতে পারল।

জোরা শুধাল, "তুমি কে? একা এই জঙ্গলে কি করছ?"

লা মাথা নেড়ে যে ভাষায় জবাব দিল তার মাথামুণ্ডু কিছুই জোরা বুঝতে পারল না। জোরা ড্রিনভ অনেক ভাষা জানে, কিন্তু কোন ভাষাতেই কাজ হল না। আরবরা তাদের ভাষায় কথা বলল; ওয়ামালা তার ভাষায় কথা বলল। কিন্তু কোন ফল হল না। তখন জোরা তার গলা জড়িয়ে ধরে তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গেল। লা ইসারায় জানাল সে স্নান করবে।

আহারাদি শেষ হলে ওয়ামালা জোরার তাঁবুতেই লা-র জন্য আর একটা খাটিয়া পেতে দিল।

জোরা বলল, "ওয়ামালা, আজ রাতে তুমি তাঁবুর বাইরেই শোবে। এই নাও একটা পিস্তল।"

শেখ আবু বতন অনেক রাত পর্যন্ত তার তাঁবুতে বসে সর্দারদের সঙ্গে

কথাবার্তার শেষে বলল, "এই নতুন চিজ্‌টির জন্য যে দাম পাওয়া যাবে তেমনটি আগে কখনও মেলে নি।"

* * * *

ঘুম ভাঙতেই টারজন আকাশের তারার দিকে তাকাল। অর্ধেক রাত পার হয়ে গেছে। উঠে শরীরটাকে টান্‌ টান্‌ করে নীচে নেমে সে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

শিবিরের সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। একটিমাত্র আস্কারি প্রহরী ধুনির পাশে বসে আছে। তার চোখের দৃষ্টিকে এড়িয়ে টারজন কুলিদের ঝুপড়ির পিছন দিয়ে ইওরোপীয়দের তাঁবুর কাছে পৌঁছে গেল। একটার পর একটা তাঁবুর পিছন দিকের দেয়াল কেটে ভিতরে ঢুকে সে লা-কে খুঁজতে লাগল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। লা-কে দেখতে পেল না।

অগত্যা টারজন আবার সেই গাছেই ফিরে গেল। রাতটা সেখানে কাটিয়ে সকাল হলে আবার বেরিয়ে পড়ল লা-র সন্ধানে।

৮—আবু বতনের বিশ্বাসঘাতকতা

জোরা ড্রিনভের তাঁবুতে ঘুম ভেঙে গেল লা-র। সে চারদিকে তাকাতে লাগল। চোখ পড়ল ঘুমন্ত জোরার মুখের উপর। ভাবল, এরা নিশ্চয় টারজনের লোক, কারণ এরা তার কোন ক্ষতি করে নি; সদয় ব্যবহার করেছে, খাবার দিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে। একটা কথা মনে হতেই তার ভুরু দুটো কুঁচকে উঠল; দুই চোখের মণিতে জলে উঠল বর্বর আলো। পাশেই রাখা ডারুসের ছুরিটা চেপে ধরল। এই নারী হয়তো টারজনের সঙ্গিনী। কিন্তু যেমন হঠাৎ এসেছিল তেমনি হঠাৎই সে ভাবটা কেটে গেল। সেই সময়ই জোরাও চোখ মেলে তার দিকে তাকিয়ে হাসল।

জোরা ও লা—দু'জনই দু'জনকে দেখে বিস্মিত, বিমুগ্ধ।

এক সঙ্গে তৈরী হয়ে এসে দু'জন প্রাতরাশ খেতে বসল তাঁবুর বাইরে গাছের ছায়ায়। ওয়ামালা পরিবেশন করল। জোরার মনে হল, শেখদের ঘরগুলোতে যেন একটা কর্মব্যস্ততা চলেছে। ব্যাপারটাকে সে কোনরকম গুরুত্ব দিল না, কারণ মাঝে মাঝেই ওরা তাঁবুগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে যায়।

প্রাতরাশের পরে জোরা তার রাইফেলটা তেল দিয়ে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দুটো কালো কুলিকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে বেরিয়ে গেল। লা তাদের চলে যেতে দেখল, কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও জোরা তাকে ডাকল না বলে সে তাদের সঙ্গে গেল না।

আবু বতনের একই জাতির আর এক শেখের ছেলে ইব্‌ন দামু এই অভিযানে ইবন্ বতনের ডান হাত। দূর থেকে অনেকক্ষণ ধরেই সে মেয়ে দুটির উপর নজর রেখেছিল। একজন বন্দুকবহনকারী ও দু'জন কুলিকে নিয়ে জোয়াকে বেরিয়ে যেতে দেখেই সে বুঝল যে ওরা শিকারে চলে গেল।

সঙ্গী দুটিকে নিয়ে সে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর ওপার-এর লা-র তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। তার সামনে পৌঁছে ইবন্ দামুক কি যেন বলল। তার গলার স্বর নরম ও তৈলাক্ত, কিন্তু তাতে লা ভুলল না। উদ্ধত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথাটা নেড়ে তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ইবন্ দামুক আর একটু কাছে গিয়ে লা-র খোলা কাঁধে হাত রাখল।

লা-র দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠল। লাফ দিয়ে সরে গিয়ে কোমরের ছুরির বাটটা চেপে ধরল। ইবন্ দামুক কয়েক পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু তার এক সঙ্গী লাফিয়ে পড়ে তাকে ধরতে গেল।

লোকটা মহামূর্খ। লা বাঘিনীর মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বন্ধুরা বাধা দেবার আগেই অগ্নি-দেবতার পুরোহিত ডাকুসের ছুরিটা পর পর তিনবার আমূল বিদ্ধ হল তার বুকে। মরণ-আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে তার মৃতদেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

সে আর্তনাদ শুনে অন্য আরবরাও ছুটে এল। লা চীৎকার করে বলল, "দূরে থাক। অগ্নি-দেবতার প্রধান সন্ন্যাসিনীর গায়ে কেউ হাত তুলতে চেষ্টা করো না।"

তার কথাগুলি কেউ বুঝল না, কিন্তু বুঝল তার জ্বলন্ত চোখ ও রক্তাক্ত ছুরির অর্থ। সকলেই দূরে দাঁড়িয়ে হৈ-চৈ করতে লাগল। "এ সবের অর্থ কি ইবন্ দামুক?" আবু বতন প্রশ্ন করল।

"লোকটা ওকে স্পর্শও করে নি, অথচ—"

আবু বতন বলল, "সিংহিনী হলেও ওর কোন ক্ষতি করা চলবে না।"

ইবন্ দামুক বলল, "উল্লাহ্! কিন্তু ওকে পোষ মানাতে তো হবে।"

শেখ বলল, "যে লোক ওর জন্য সব চাইতে বেশী স্বর্ণমুদ্রা দেবে সে কাজের ভারটা সেই নেবে। আমাদের একমাত্র কাজ ওকে খাঁচায় বন্দী করা। শোন বাছারা, ওকে ঘিরে ধরে ছুরিটা কেড়ে নাও। ভাল করে পিছমোরা করে হাত বেঁধে ফেল। অন্য সকলে ফিরে আসার আগেই আমরা তাঁবু তুলে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকব।"

ডজনখানেক লোক একযোগে লা-র উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সিংহিনীর মত সেও লড়তে লাগল। ছুরির আঘাতে রক্তাক্ত হল অনেকে। আরও একটি আরবের মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। তবু শেষ পর্যন্ত লাকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। ছুরিটা কেড়ে নিয়ে তার দুই হাত শক্ত করে বেঁধে ফেলা হল।

দু'জন সৈনিককে পাহারায় রেখে আবু বতন অন্য চাকরদের সঙ্গে নিয়ে যাত্রার আয়োজন করতে লাগল। ইবন দামুকের উপর জিনিসপত্র ও খাবার-দাবার গুছিয়ে নেবার ভার দিয়ে সে নিজে গেল ইওরোপীয়দের তাঁবু লুঠ করতে। তার বিশেষ নজর জোরা ড্রিনভ ও জাভেরির তাঁবুর উপর। আশানুরূপ সোনাদানা না পেলেও জোরার তাঁবুতে একটা বাক্সের মধ্যে সে প্রচুর টাকা পেল। দূরদর্শী জাভেরি তার অর্থ-ভাণ্ডারের বেশী অংশটাই তাঁবুর মেঝেতে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছিল। তাই সেটার খোঁজ আবু বতন পেলই না।

জোরা খুব ভাল শিকার নিয়েই ফিরে এল। তার পিছনেই রাইফেল দুটো নিয়ে আসছে ওয়ামালা। কুলিরা চলেছে শিকারের ভারী বোঝা নিয়ে। কিন্তু শিবিরে পৌছবার আগেই পথের দু'পাশের ঝোপের ভিতর থেকে আরবরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জন ওয়ামালার হাত থেকে রাইফেল দুটো ছিনিয়ে নিল। বাকিরা চেপে ধরল জোরাকে। রিভলবারটা টেনে বের করেও সে এই আকস্মিক আক্রমণকে ঠেকাতে পারল না। অচিরেই তার দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হল।

সে জোর গলায় বলল, "এ সবের অর্থ কি? শেখ আবু বতন কোথায়?"

লোকগুলি হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, "একটু পরেই তার দেখা পাবে। আর একজন অতিথিকে নিয়ে সে ব্যস্ত আছে।"

আর একটু এগিয়ে শিবিরের অবস্থা দেখে সে তো স্তম্ভিত। সব তাঁবু খুলে ফেলা হয়েছে। আরবরা রাইফেল হাতে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। তার ক্ষণপূর্বের অতিথিটিকেও হাত বেঁধে আটকে রেখেছে।

"এসব কেন করেছ আবু বতন?" জোরা প্রশ্ন করল।

শেখ বলল, "আল্লার ইচ্ছায় আমাদের দেশকে আমরা নাস্‌রানিদের হাতে তুলে দেব না। আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি।"

"এই নারী ও আমাকে নিয়ে কি করতে চাও?"

"কিছুটা পথ তোমাদের সঙ্গে করেই নিয়ে যাব। সেখানে একটি ধনী লোক বাস করে। সে তোমাদের দু'জনকেই ভাল বাড়িঘর দেবে।"

"তার মানে, কোন কালা সুলতানের কাছে আমাদের বেচে দেবে?"

শেখ কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "কথাটা সে ভাবে আমি বলছি না। বরং বলতে চাই, আমরা চলে গেলে তোমরা যাতে এই জঙ্গলে শুকিয়ে না মর তাই একজন ভাল বন্ধুর কাছে তোমাদের উপহারস্বরূপ রেখে যেতে চাই।"

তীব্র ঘৃণায় ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জোরা বলল, "আবু বতন, তুমি ভণ্ড, বিশ্বাসঘাতক!"

শেখ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "শুয়োরের বাচ্চা, জাভেরি যদি আমাদের গালাগালি না করত তাহলে এটা ঘটত না।"

জোরা বলল, "বটে। ওপার-এ তোমাদের ভীরুতার জন্য সে বকেছিল, তাই তোমরা তার প্রতিশোধ নিলে ?"

আবু বতন বলল, "খুব হয়েছে। এস হে বাছারা, আমরা যাত্রা শুরু করি।"

শিবিরের স্তূপীকৃত বাড়তি জিনিসপত্রে আগুন লাগিয়ে দিয়ে আরবরা দল বেঁধে চলে গেল পশ্চিমের দিকে।

সময় কাটাবার জন্য দুর্ভাগ্যের সঙ্গিনীটিকে জোরা একটু একটু করে ইংরেজি শেখাতে শুরু করল। প্রথমে ইসারায় নানা জিনিস দেখিয়ে তার নাম বলে বলে শুরু করল। এইভাবে কয়েকদিনের মধ্যেই তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলার মত একটা চলনসই ব্যবস্থা করে ফেলল।

প্রথম দিনের পর থেকেই বন্দিনীদের হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আরব রক্ষীরা সব সময়ই তাদের চোখে-চোখে রাখে।

তারা চলতে লাগল আবিসিনিয়ার গালা অঞ্চলের ভিতর দিয়ে। আবু বতন ও তার অনুচরদের কথাবার্তা থেকে জোরা জানতে পেরেছে যে, এই পথটা তাদের পক্ষে বিপজ্জনক, কারণ ইতিপূর্বে অনেকবার গালা অঞ্চলে হানা দিয়ে তারা অনেক নিগ্রোকে হরণ করে নিয়ে গেছে ক্রীতদাস বানাবার জন্য। এমন কি তার সঙ্গী নিগ্রোদের মধ্যে একজন গালা ক্রীতদাসও আছে।

যাই হোক গালা অঞ্চলের একেবারে প্রান্তে পৌঁছে বন্যায় স্ফীত একটা নদীর তীরে তারা বাধা পেল। উত্তরে মূল আবিসিনিয়ায়ও যেতে পারল না, আবার দক্ষিণে যাবারও সাহস হল না। কাজেই তারা নদীর তীরেই অপেক্ষা করতে বাধ্য হল।

আর সেই সুযোগেই ইবন দামুক আঘাত হানল।

৯—ওপার-এর মৃত্যু-গুহা

পিটার জাভেরি আর একবার এসে দাঁড়াল ওপার-এর প্রাচীরের সামনে। রহস্য-নগরীর সেই একই ভৌতিক চীৎকার শুনে এবারও তার কালাসৈনিকদের বুক কেঁপে উঠেছে। সেই রক্ত জল-করা আর্তনাদ শুনে তারা সভয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

এবারও দলের আগে আগে চলেছে মিগুয়েল রোমেরা; তার ঠিক পিছনে ওয়েনি কোল্ট। আর বাকি সাদা মানুষরা রয়েছে সকলের পিছনে যাতে দরকার হলে তারা অবাধ্য কালা আদমিদের জোর করে এগিয়ে যেতে বাধ্য করতে পারে।

ভয় দেখাবার জন্য রিভলবার তাক করে জাভেরি চেঁচিয়ে বলল, "ভীরুর দল, ঢুকে পড়।"

একটি কালা আদমিও রাইফেল উঁচিয়ে বলল. "তোমার অস্ত্র সরিয়ে নাও সাদা মানুষ। আমরা মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করব, ভূত-পিশাচের সঙ্গে নয়

ডর্স্কি বলল, "ছেড়ে দাও পিটার; ওরা এককাট্টা হলে আমাদের মেরে ছাতু করে দেবে।"

অনন্যোপায় হয়ে জাভেরি বাকি সঙ্গীদের অর্থাৎ ডর্স্কি, আইভিচ ও ফিলিপিনো চাকরটির উদ্দেশ্যে বলল. "তোমরাই চলে এস: এই হলুদ কুত্তাগুলো যদি না আসে তো আমরাই চেষ্টা করে দেখব।"

রোমেরো ও কোণ্ট ততক্ষণে ভিতরের প্রাচীরের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। বাকি চারজন বাইরের প্রাচীরের ভিতর ঢুকতেই বিধ্বস্ত নগরের বিষণ্ণ নিস্তব্ধতাকে ভেঙে আবার শোনা গেল সেই আর্ত কণ্ঠস্বর।

আইভিচ বলে উঠল, "হা ঈশ্বর। এ কিসের চীৎকার?"

জাভেরি বিরক্ত হয়ে বলল, "চুপ কর। এ সব চিন্তা মন থেকে মুছে ফেল, নইলে তুমিও ভয়ে হল্‌দে মেরে যাবে।'

উঠোনটা পার হয়ে ভিতরের প্রাচীরের দিকে এগোতেই দেয়ালের বিপরীত দিক থেকে তাদের কানে এল একটা নারকীয় হল্লা—বহুকণ্ঠের বীভৎস রণ-হুংকার আর দ্রুত পায়ের শব্দ। একটা গুলির শব্দ হল; তারপর আর একটা, আরও একটা।

সঙ্গীরা পিছনে আছে কি না দেখার জন্য টনি ফিরে তাকাল। তারা দাঁড়িয়ে পড়েছে। সকলেরই মুখ ছাইয়ের মত সাদা।

আইভিচ ঘুরে দাঁড়াল। "জাহান্নামে যাক সোনাদানা!" বলেই সে বাইরের দিকে ছুট দিল।

"ওরে খেঁকি কুত্তা, ফিরে আয়!" বলে জাভেরি তার পিছু নিল। তার সঙ্গে ডর্স্কিও ছুট দিল। দেখেশুনে টনিও ছুটল তাদের পিছনে।

সকলে এসে থামল বহিঃ প্রাচীরের বাইরে। আইভিচের গলা টিপে ধরে জাভেরি বলল, "তোমাকে খুন করা উচিত।"

আইভিচ খ্যাঁক করে বলল, "তুমিও তো আমার মতই পালিয়ে বেঁচেছ। ওখানে ঢুকে লাভটা কি হত? কোণ্ট ও রোমেরোর মত আমরাও মারা পড়তাম।"

ডর্স্কি বলল, "তোমার কথাই ঠিক। সাহস থাকা ভাল, কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে—আমরা যদি মরি তাহলে আমাদের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে।"

জাভেরি চেঁচিয়ে বলল, "কিন্তু সোনা। সোনার কথাটাও ভাব।"

“সে সোনা মরা মানুষের কোন্ কাজে লাগবে ? ডস্কি পাল্টা প্রশ্ন করল।

টনি বলল, “আমাদের কমরেডদের কি হবে ? তাদের কি আমরা মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে চলে যাব ?”

“তাছাড়া আর উপায় কি ?”

“তাদের উদ্ধারের একটা চেষ্টাও করবে না ?”

“সেটা আমার একার কাজ না,” জাভেরি বলল।

“আমি তোমার সঙ্গে যাব,” বলল টনি।

রোমেরো ও কোল্ট ভিতরের প্রাচীর পার হয়ে মন্দিরের যতটুকু ভিতরে দেখতে পেল তাতে মনে হল সবটাই জনশূন্য।

কোল্ট পিছনে ঘুরে বলল, “ওদের জন্য অপেক্ষা করব নাকি ?”

রোমেরো দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, “শোন কমরেড, এ গৌরবটা আমরা নিজেরাই ভোগ করতে চাই।”

কোল্ট হেসে বলল, “তাহলে কাজ শুরু করা যাক। খুব ভয় পাবার মত কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।”

রোমেরো বলল, কিছুই বলা যায় না। ভিতরে কাদের যেন নড়াচড়া করতে দেখা যাচ্ছে।”

রাইফেল উদ্যত করে তারা মন্দিরের দিকে পা বাড়াল। কিছুটা এগোতেই ছায়া-ঢাকা খিলান ও অসংখ্য দরজার পথে ছুটে বেরিয়ে এল একদল মানুষ। তাদের বীভৎস রণ-হুংকারে প্রাচীন নগরীর স্তব্ধতা ভেঙে খান্‌খান্ হয়ে গেল।

শুরু হল লড়াই। দু'জনই গুলি ছুঁড়তে লাগল। প্রতিপক্ষের কয়েকজন আহত হল। একটা ছুটন্ত গুলি এসে কোল্টের মাথায় লাগল। ধপাস্ করে সে মাটিতে পড়ে গেল, আর মুহূর্তের মধ্যে ওপার-এর বেঁটে মানুষগুলো তার দেহটাকে ঘিরে ফেলল।

মিগুয়েল রোমেরো বুঝল, তার সঙ্গীর অবস্থা শোচনীয়। এখনও মারা না গিয়ে থাকলেও তার পক্ষে একাকি সঙ্গীকে উদ্ধার করার আশা সুদূর পরাহত। তাই সে চেষ্টা না করে নিজের প্রাণ বাঁচাতে সে পিছু হটতে লাগল। তার হাতের মরণ অস্ত্রের ভয়ে আক্রমণকারীরাও তাকে তাড়া করল না। ছুটো প্রাচীর পার হয়ে আবার সে খোলা মাঠে ফিরে এল।

জাভেরি শুধাল, “কোল্ট কোথায় ?”

“তার মাথায় গদার আঘাত লেগেছে। এতক্ষণে হয়তো মরেই গেছে।”

“আর তুমি তাকে ফেলে চলে এলে ?” জাভেরি বলল।

রোমেরো রাগে ফেটে পড়ল। “তুমি বলছ এ কথা ? তোমরা সবাই ভয়ে কাঠ হয়ে এখানে দাঁড়িয়ে রইলে, আর এখন আমাকে বলছ ভীরু ?”

প্রাচীরের ভিতর থেকে আবার শোনা গেল অসভ্যদের বিজয়-উল্লাস।

জাভেরি বলল, "আমিও একা ওপার দখল করতে পারব না। অতএব সকলকেই শিবিরে ফিরে যেতে হবে।"

বেটে সন্ন্যাসীরা কোণ্টকে ঘিরে ধরে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। তারপর কাঁধে তুলে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গেল।

চেতনা ফিরে এলে কোণ্ট দেখল সে একটা মস্ত বড় ঘরের মেঝেতে শুয়ে আছে। এটাই ওপার-মন্দিরের দরবার-কক্ষ। কোণ্টের চেতনা ফিরে আসতে দেখে রক্ষীরা এক ঝট্‌কায় তাকে দাঁড় করিয়ে ওআ-র সিংহাসনের বেদীর দিকে ঠেলে দিল।

সম্মুখে সুদৃশ্য সিংহাসনে বসে আছে অপরূপ সুন্দরী এক তরুণী। তাকে ঘিরে রয়েছে প্রাচীন সভ্যতার জৌলুষের প্রাচুর্য। কিম্ভুত চেহারার লোমশ পুরুষ ও সুন্দরী-সখিদলপরিবৃত হয়ে উদ্ধত ভঙ্গীতে সে বসে আছে। চোখ দুটি নির্মম ও নিষ্ঠুর।

তরুণী সিংহাসনে উঠে দাঁড়াল। বন্দীর উপর স্থির দৃষ্টি রেখে কোমর থেকে ছুরি বের করে মাথার উপর তুলে হিংস্র দ্রুতকণ্ঠে কি যেন বলে গেল।

ওআ-র সিংহাসনের ডান দিকের সন্ন্যাসিনীর অন্যতমা এক উদ্ভিন্নযৌবনা তরুণী আধ-বোজা চোখে বন্দীর দিকেই তাকিয়ে ছিল। একটি অপরিচিত যোদ্ধাকে দেখে নাও-র বুকের মধ্যে আবেগের যে ঢেউ উথাল-পাতাল হয়ে উঠেছে তাতেই তার রত্নহারমণ্ডিত বুকটা সবেগে ওঠা-নামা করছে।

ওআ-র কথা শেষ হতেই রক্ষীরা কোণ্টকে বাইরে নিয়ে গেল। বেচারা বুঝতেও পারল না যে অগ্নি-দেবতার প্রধান সন্ন্যাসিনী তাকে দিয়েছে মৃত্যুদণ্ড।

রক্ষীরা তাকে নিয়ে গেল সুরঙ্গের মুখে একটা গুহায়। লোহার গরাদ দেওয়া দরজা ও জানালা দিয়ে প্রচুর আলো বাতাস সে ঘরে ঢুকছে। কব্জির বাঁধন খুলে দিলে রক্ষীরা তাকে সেই গুহার মধ্যে রেখে চলে গেল।

ওয়েনি কোণ্ট জানালা দিয়ে তাকাতেই দেখতে পেল ওপার-এর সূর্য-মন্দির। যজ্ঞ-বেদীর সিঁড়িতে অনেক রক্তের দাগ। প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত নর-কপাল। কোণ্ট ভয়ে শিউরে উঠল। এতক্ষণে সে বুঝতে পারল, কি শাস্তি তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

এইভাবে দীর্ঘ অপরাহ্ন কেটে গেল। নেমে এল রাতের অন্ধকার। কিন্তু কারও দেখা নেই। তবে কি খাদ্য ও পানীয় ছাড়াই তাকে অপেক্ষা করে থাকতে হবে আসন্ন বলিদানের জন্য।

গুহার মেঝেতে শুয়ে সে ক্লান্তিহর ঘুমের জন্য চেষ্টা করতে লাগল। হঠাৎ তার মনে হল, প্রাঙ্গণের যজ্ঞ-বেদীর দিক থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ যেন কানে এল। ভাল করে কান পাততেই বুঝতে পারল, সত্যি কে যেন আসছে। নিঃশব্দে উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। দূরাগত তারার আলোয় দেখল,

প্রাঙ্গণ থেকে কে যেন তার গুহার দিকেই এগিয়ে আসছে ; তবে সে মানুষ কি জন্তু তা সে ঠাহর করতে পারল না।

অকস্মাৎ ধ্বংসস্তূপের শিখর থেকে আবারও ভেসে এল একটা দীর্ঘায়ত চীৎকার।

* * *

টাণ্টর হাতির চওড়া মাথার উপর কনুই দুটো রেখে টারজন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে তার পিঠে। ওপার-এর লা-র সব সন্ধান ব্যর্থ হয়েছে। ধরিত্রী যদি ফাঁক হয়ে তাকে গিলে ফেলত তাহলেও বোধহয় সে এমনভাবে নিখোঁজ হয়ে যেত না। টারজন ও টাণ্টর দু'জনই নিশ্চুপ। হঠাৎ মাথার উপরকার বড় গাছটার পাতার আড়াল থেকে একটা ছোট বানর এমনভাবে কিচির-মিচির ডেকে উঠল যে দু'জনই সচকিত হয়ে পড়ল।

বানরটি নকিমা। টারজনকে খুঁজে পাবার আনন্দ ও উত্তেজনা যেন বাঁধ মানছে না। একলাফে সে টারজনের শরীরের উপর নেমে এল।

টারজন শুধাল, "এতদিন কোথায় ছিলে নকিমা ?"

"তোমাকেই তো খুঁজছিলাম," বানরটি জবাব দিল।

"ওপার-এর প্রাচীরে তোমাকে ছেড়ে আসার পর থেকে আর কি কি দেখেছ ?"

"দেখেছি অনেক কিছু। টারজনের শত্রুদের বনের ভিতর দিয়ে চলে যেতে দেখেছি।"

"একটি মেয়ে টারমাঙ্গানিকে দেখেছ কি ?"

"না। টারজনের গোমাঙ্গানি ও টারমাঙ্গানি শত্রুদের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক ছিল না।"

"তাহলে তো একবার নিজে গিয়ে দেখতে হচ্ছে," বলে টারজন টাণ্টরের পিঠ থেকে একলাফে একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে পড়ল। তারপর চলল বৃক্ষপথে তার অনায়াস দ্রুত সঞ্চরণ। সোজাসুজি চলার ফলে রাতের জন্য বিশ্রামরত অভিযাত্রীদের সে সহজেই ধরে ফেলল।

অরণ্য জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে সে সহজেই বুঝতে পারল যে অভিযাত্রীরা ওপার-এর রত্ন-ভাণ্ডার সঙ্গে আনতে পারে নি। অভিযাত্রীদের প্রায় সকলকেই সে চেনে। তাই কোণ্টের অনুপস্থিতিও তার নজর এড়াল না।

ক্রমে রাত গভীর হল। শুধুমাত্র শিবিরের ধুনির আগুন ছাড়া চারদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ঢাকা। নকিমাকে কাঁধে নিয়ে টারজন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে সব কিছু দেখল। তারপর হঠাৎ ওপার-এর মানুষদের রণ-হুংকারকে অবিকল নকল করে একটানা চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শিবিরের উপর তার অনিবার্য ফল ফলল। থেমে গেল কথা, গান, হাসি। ভয়বিহ্বলভাবে সকলে

ক্ষণেক চুপচাপ বসে রইল। তারপরই যার যার অস্ত্র হাতে নিয়ে ধুনির আগুনের পাশে ছুটে গেল।

ঈষৎ হেসে টারজন জঙ্গলের ভিতর মিলিয়ে গেল।

১০—সন্ন্যাসিনীর প্রেম

ইবন দামুক সুযোগের অপেক্ষায় আছে। দলের একটি কালা আদমীকে আবু বতন জোর করে ধরে এনেছিল। মুক্তির আশ্বাস দিয়ে ইবন দামুক তাকে হাত করেছে। এই গভীর জঙ্গলে মেয়ে দুটি পালাতে সাহস করবে না এই ভরসাতে আবু বতন ইদানিং তাদের পাহারার ব্যবস্থারও ঢিল দিয়েছে। দু'জনকে রাখা হয়েছে একটা আলাদা তাঁবুতে, আর মাত্র একটি শান্ত্রীকে রেখেছে তাদের পাহারায়।

ইবন দামুক আজকের রাতটাই বেছে নিয়েছে তার শয়তানীর জন্য, কারণ তার নিজের জাতির একজন বিশ্বস্ত লোকের উপর আজ শিবির পাহারার ভার পড়েছে। তাছাড়া, নিজের জাতির আরও দু'জন শেখও সেই বিশ্বস্ত কালা আদমিটিকে সঙ্গে নিয়ে ইবন দামুক অপেক্ষা করছে জঙ্গলের মধ্যে।

জোরা ও লা-র তাঁবুতে একটা কাগজের লণ্ঠন জ্বলছে। লা-র নতুন শেখা ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে দু'জন কথাবার্তা বলছে। এমন সময় কে যেন নীচু গলায় ডাকল, “মেমসাহেব ড্রিনভ।”

“কে? কি চাই?” জোরা নীচু গলায় প্রশ্ন করল।

“একটা পালাবার পথ পেয়েছি। যদি চাও তো তোমাদের সাহায্য করতে পারি।”

“তুমি কে?”

“আমি বাকুলা।” গলার আওয়াজ শুনেই জোরা লোকটিকে চিনতে পারল। সে আবার বলল, “লণ্ঠনটা নিভিয়ে দাও। আমি ভিতরে গিয়ে সব কথা বলব।”

জোরা উঠে ফুঁ দিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল। হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে বাকুলা বলল, ‘শোন মেমসাহেব, যে ছোকরাদের আবু বতন চুরি করে এনেছিল বাওয়ানা জাভেরির কাছ থেকে তারা আজ রাতে পালাচ্ছে। আমরাও সেই দলের সঙ্গে চলে যাচ্ছি; তোমরা চাইলে তোমাদের দু'জনকেও সঙ্গে নেব।”

জোরা বলল, “হ্যাঁ, আমরা যাব।”

বাকুলা বলল, “তাহলে শোন। শান্ত্রী আর ফিরে আসবে না। কিন্তু

আমরা সকলে এক সঙ্গে যেতে পারব না। আমাদের লোকরা জঙ্গলের মধ্যে অপেক্ষা করছে। আমি প্রথমে অন্য মেমসাহেবকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তারপর এসে তোমাকে নিয়ে যাব।"

সেই ব্যবস্থাই ঠিক হল। বাকুলা সতর্ক পায়ে তাঁবুর মুখে গিয়ে চারদিক দেখে নিয়ে বলল, "চলে এস।" জোরার চোখের সামনে বাকুলা লা-কে সঙ্গে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অন্ধকার তাঁবুতে বসে জোরা একাকি অপেক্ষা করছে। মিনিটের পর মিনিট কেটে গেল। বাকুলার দেখা নেই। ক্রমে তার মনে ভয় দেখা দিল। সে স্থির করল, আর অপেক্ষা না করে নিজেই জঙ্গলের দিকে চলে যাবে। এমন সময় পায়ের শব্দ কানে এল। কিন্তু বাকুলার বদলে দেখা দিল লম্বা নলওয়ালা গাদা বন্দুক হাতে একটি আরব। তাঁবুর ভিতর মুখ বাড়িয়ে লোকটি পলায়িত শাস্ত্রীর নাম করে জিজ্ঞাসা করল, "হাজেলান কোথায় ?"

জোরা গম্ভীর গলায় জবাব দিল, "তার আমরা কি জানি ? মাঝরাতে এসে কেন আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছ ?"

লোকটি কি যেন বলতে বলতে বেরিয়ে গিয়ে হাঁক দিয়ে জানিয়ে দিল, হাজেলানকে পাওয়া যাচ্ছে না ; কেউ তাকে দেখে থাকলে জানিয়ে দাও। অন্য সৈনিকরা বেরিয়ে পড়ল। শিবিরে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। অনেক ডাকা-ডাকিতেও হাজেলানের সাড়া মিলল না। তখন শেখ নিজে বেরিয়ে এসে লোকটিকে শুধাল, "মেয়ে দুটি তাঁবুতে আছে তো ?"

"হাঁ। তাদের সঙ্গে আমি কথা বলে এসেছি।"

আবু বতন বলল, "আশ্চর্য ! হাজেলান ! তুমি কোথায় ?"

পাশে দাঁড়ান একজন বলল, "সে এখানে নেই।"

আর একজন বলল, "ফোদিল ও দারেয়েমও নেই।"

শেখ বলল, "গোটা শিবির খুঁজে দেখ আর কে কে নেই।" খোঁজ করে দেখা গেল, দামুক, হাজেলান, ফোদিল ও দারেয়েম নিপাত্তা। সেই সঙ্গে পাঁচটি কালা আদমিও হাওয়া।

আবু বতন বলল, "ইবন দামুক চলে গেছে ভালই হয়েছে। মেয়ে দুটোকে বেচে যা পাওয়া যাবে তার ভাগীদার কমল।" তাঁবুতে ফিরে গিয়ে সে নতুন করে আর একটা ঘুম লাগাল।

লা-র কথা ভেবে সারা রাত জোরার চোখে ঘুম এল না। তবু ভাগ্য ভাল, আসল কথাটা সে তখনও জানতে পারে নি।

লা-কে সঙ্গে নিয়ে বাকুলা নিঃশব্দে জঙ্গলে ঢুকল। কিছুদূর গিয়ে দেখল, কালো কালো মানুষগুলি দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। জোব্বা পড়া আরবরা লুকিয়ে ছিল ঝোপের আড়ালে। শুধু ক্রীতদাসরা সাদা আলখাল্লা খুলে ফেলে লেংটিমাত্র

পরে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তারা একযোগে এগিয়ে এসে লা-র মুখে কাপড় চাপা দিয়ে দুই হাত পিছমোড়া করে বেঁধে গলায় একটা দড়ি ঝুলিয়ে দিল।

তখন ইবন দামুক বেরিয়ে এল আরব সঙ্গীদের নিয়ে। নদীর তীর বরাবর তারা নিঃশব্দে এগিয়ে চলল গহন অরণ্যের দিকে।

একসময় লা-র মুখ থেকে কাপড় খুলে দেওয়া হল। ইবন দামুক তার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে লাগল। কিন্তু লা সে সব কথা বুঝতে পারল না। বুঝবার ইচ্ছাও তার নেই।

দুপুর নাগাদ তারা নদীর ধারে ছাউনি ফেলল। আর সেখানেই ইবন দামুক একটা মারাত্মক ভুল করে ফেলল। একটি সুন্দরী নারীর পাশাপাশি চলতে চলতে তার মনে জ্বলে উঠল কামনার আগুন। লা-কে নিয়ে দলবলের চোখের আড়ালে সরে গিয়ে সে আর একটা পথ ধরে হাঁটতে লাগল। কিছুদূর গিয়েই সে লাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে চেষ্টা করল।

কিন্তু হায়! একটি সিংহিনীকে আলিঙ্গন করাও বুঝি এর চাইতে নিরাপদ ছিল। গভীর আবেগে নিজের কোমরের ছুরিটার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু ভোলে নি ওপার-এর লা। প্রথমে সে ইবন দামুকের আলিঙ্গনে ধরা দেবার ভান করল। দেহটাকে তার বুকের উপর এলিয়ে দিয়ে এক হাতে জড়িয়ে ধরল তার গলা, আর অন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল কোমরের নীচে। এবার অন্য মূর্তি। সাদা নরম আঙুলগুলি হঠাৎ ইস্পাতকঠিন হয়ে চেপে ধরল তার কণ্ঠনালি, আর ডান হাতের দীর্ঘ ছুড়িটা কাঁধের নীচ দিয়ে আমূল বিদ্ধ হল তার পিঠে। একটিমাত্র আর্ত চীৎকারও তার গলা দিয়ে বের হল না। ইবন দামুকের দীর্ঘ দেহটা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তার কোমরবন্ধটা খুলে নিয়ে তারই জোব্বায় ছুরির রক্ত মুছে ফেলে সেটাকে খাপে আটকে লা ছুটতে লাগল নদীর তীর থেকে জঙ্গলের গভীরে। ছুটতে ছুটতে ক্লান্তিতে অবসন্ন হল দেহ। একসময় একটা বড় গাছে চড়ে বিশ্রামের জন্য শরীরটাকে এলিয়ে দিল।

* * *

ওয়েনি কোল্ট তাকিয়েই আছে। মূর্তিটি তার গুহার দিকেই এগিয়ে আসছে। ও কি তার মৃত্যু-দূত? তাকে যজ্ঞ-বেদীতে নিয়ে যেতে আসছে? কাছে—আরও কাছে। সে এসে দাঁড়াল তার গুহার দরজার শিকের ওপারে। নরম গলায় ফিস্‌ ফিস্‌ করে কি যে বলল তার বিন্দু-বিসর্গও সে বুঝতে পারল না; শুধু বুঝতে পারল, যে এসেছে সে নারী।

কৌতূহলবশে সেও দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। একটা নরম হাত এসে তাকে স্পর্শ করল—পরম আদরে। প্রাঙ্গণের মাথার উপরে খোলা আকাশ

থেকে ভরা চাঁদের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না এসে পড়েছে গুহার মুখে। শিকের ফাঁক দিয়ে মেয়েটি তাকে খাবার দিল। আর সেই সময় তার হাতটা টেনে নিয়ে তাতে ঠোঁট দুটি ছোঁয়াল।

ওয়েনি কোল্ট হতবাক। সে জানত যে এই তরুণী সন্ন্যাসিনীটি প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়েছে। ওপার-এর কিম্ভুতদর্শন লোমশ পুরুষদের দেখে অভ্যস্ত তার চোখে ও মনে এই নবাগত পুরুষটি দেখা দিয়েছে দেবতার মহিমায়।

মেয়েটির কথাগুলি না বুঝলেও কোল্ট এটা বুঝতে পারল যে এই মেয়েটি তাকে বন্ধুর মত যথাসাধ্য সাহায্য করতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে। দরজার শিকের ফাঁক দিয়ে তাকে কাছে টেনে এনে কোল্ট তাঁর কপালে একটি চুমো খেল। মেয়েটির চোখ জলে ভরে উঠল। দুই হাতে কোল্টের গলা জড়িয়ে ধরে তার মুখে মুখ রাখল। তারপরই হঠাৎ তাকে ছেড়ে দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিঃশব্দ পায়ে মন্দিরের খিলানের অন্ধকার-পথে অদৃশ্য হয়ে গেল

মেয়েটির আনা খাবার খেয়ে কোল্ট শুয়ে শুয়ে কেবলই ভাবতে লাগল, কী এক দুর্নিরীক্ষ শক্তি মানুষের সব কর্মধারাকে পরিচালিত করে। ভাবতে ভাবতে একসময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হলে জনৈক লোমশ সন্ন্যাসী এসে তাকে খাদ্য দিল, পানীয় দিল। সারা দিন অনেকেই তাকে দেখতে এল—সে যেন চিড়িয়াখানার এক আজব জীব! এমনি করে দীর্ঘ দিন কেটে গেল। আবার রাত এল—হয়তো তার জীবনের শেষ রাত। তার মন বলল, আজ রাতে মেয়েটি যদি আর একবার আসত, তাহলে জীবনের শেষ রাতটা সে একটি প্রিয়জনের সাহচর্যে কাটাতে পারত। কিন্তু রাত শেষ হয়ে এল, সে এল না। কোল্ট আবার পাশ ফিরল।

ঠিক সেই সময় ওপার-এর এক ছোট সন্ন্যাসী ফির্গ তার নিজস্ব শয়ন-কক্ষে খড়ের বিছানায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছে। ফির্গ মন্দিরের চাবি-রক্ষক।

বিধ্বস্ত মন্দিরের উপরতলার একটি অক্ষত ঘরই তার শয়ন-কক্ষ। মন্দিরের মূল প্রাঙ্গণের চারধারে ঘোড়ানো বারান্দার উপর ঘরটি অবস্থিত। চাঁদ সরে যাওয়ায় এখন বারান্দাটি অন্ধকারে ঢাকা। কাজেই সে বারান্দা ধরে একটি মানুষ যে নিঃশব্দ পায়ে ফির্গের ঘরের দিকে চলেছে সেটা দূর থেকে কারও নজরে পড়ার কথা নয়। কোন রকম ইতস্তত না করে সে ফির্গের ঘরের দরজায় উঁকি দিল। তার নাক ডাকার শব্দে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে সে সোজা ঘুমন্ত লোকটির শয্যার পাশে গিয়ে নতজানু হয়ে বসল। এক হাতে তার দেহের কোথায় চাবির গোছা আছে সেটা খুঁজতে লাগল, আর অন্য হাতে একটা দীর্ঘ শাণিত ছুরি ধরে রাখল তার লোমশ বুকের উপর।

প্রত্যাশিত বস্তুটি সহজেই মিলে গেল--চামড়ার বেড়ির সঙ্গে ঝোলানো অনেকগুলি বড় মাপের চাবি। ছুরি দিয়ে কোমরবন্ধ থেকে চাবির গোছাটা

কেটে নিয়ে উঠে দাঁড়াতেই চাবিতে-চাবিতে লেগে ঠুং করে একটা শব্দ হল।

সঙ্গে সঙ্গে ফির্গের ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু উঠে বসা আর তার হল না। কোন দিন হবে না। ছুরির তীক্ষ্ণ ফলাটা তার বুকে আমূল বসে গেছে।

কোণ্ট ঘুমের মধ্যেই একবার নড়ে উঠে চমকে জেগে উঠল। অস্তগামী চাঁদের আলোয় দেখল, দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে সেই বাঞ্ছিতা নারী। চাবি ঘুরিয়ে তালা খুলে সে ভিতরে ঢুকল। কোণ্ট লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। নাও মুহূর্তের জন্য তাকে জড়িয়ে ধরল। তারপরই হাত ধরে তাকে টেনে নিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

অনেক অন্ধকার গলি-পথে ঘুরে ঘুরে ভিতরের প্রাচীরের কাছে এসে নাও আঙুল বাড়িয়ে বলল, "ঐ পথে চলে যাও। নাও-র হৃদয়কে নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে। তোমাকে আর কোন দিন চোখে দেখতে পাব না, তবু সারা জীবন এই মুহূর্তটির স্মৃতি আমি বুকের মধ্যে বয়ে বেড়াব।"

ওয়েনি নীচু হয়ে তার সুন্দর ছোট হাতখানিতে চুমো খেল। নাও তার খাপশুদ্ধ ছুরিটা কোণ্টের হাতে তুলে দিল। এই বিপদসংকুল পথে নিরস্ত্র যাত্রা সমীচিন নয়। ধীরে ধীরে ভিতরের প্রাচীরের কাছে পৌঁছে কোণ্ট একবার পিছন ফিরে তাকাল। চাঁদের আবছা আলোয় প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের ছায়ায় ছোট্ট সন্ন্যাসিনী খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোণ্ট হাত নাড়িয়ে নীরবে শেষ বিদায়-সম্ভাষণ জানাল।

১১—জঙ্গলে পথহারা

সেই বিচিত্র হুংকার শুনে চক্রান্তকারীদের শিবিরে যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল ধীরে ধীরে তা শান্ত হয়ে এল। জাভেরির বিশ্বাস, ওপার-এর একদল সৈন্য তাদের পিছু নিয়েছে, এবং রাতে অতর্কিত আক্রমণ হানতে পারে। কিন্তু কালা আদমিদের স্থির বিশ্বাস, সে অপার্থিব হুংকার কোন মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত নয়।

যাই হোক, রাতে কিছু ঘটল না। পরদিন সকালে ভগ্নোদ্যম লোকগুলি আবার যাত্রা শুরু করল। অতিদ্রুত পা চালিয়ে সন্ধ্যার আগেই মূল শিবিরে পৌঁছে গেল। কিন্তু যে দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল তাতে তারা সকলেই হতাশায় ভেঙে পড়ল। শিবির নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মাঝখানে পড়ে আছে শুধু স্তূপীকৃত ছাই। এই নতুন দুর্ভাগ্যে জাভেরি অন্ধ ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়ল। কিন্তু দোষ দেবে কাকে? দ্রুত পায়চারি করতে করতে নানা ভাষায় কেবল নিজের মন্দ ভাগ্যকেই শাপান্ত করতে লাগল।

গাছের উপর থেকে টারজান তাকে দেখছিল। শিবিরটার এ অবস্থা কেমন করে ঘটল তা সেও বুঝতে পারছে না। তবু দলপতির তীব্র বেদনা দেখে মনে মনে সে খুশিই হল।

জাভেরির নেতৃত্বকে ধন্যবাদ, কখনও বাবা-বাছা বলে কখনও বা ভয় দেখিয়ে সঙ্গের লোকজনদের বিদ্রোহের প্রায় মুখ থেকে ফিরিয়ে এনে সে তাদের দিয়ে নতুন করে শিবির গড়ে তুলতে লাগল। দলের বিভিন্ন কেন্দ্রে লোক পাঠাল প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের জন্য। সে জানত, প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস যেমন পোশাক, রাইফেল, গুলি-গোলা ইত্যাদি অচিরেই এসে পড়বে। এখন তার বিশেষ করে প্রয়োজন খাদ্য ও টুকিটাকি জিনিস। দলের শৃংখলা বজায় রাখতে সে তাদের সর্বক্ষণই নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত করে রাখল।

এইভাবে দিন গেল, সপ্তাহ কাটল। টারজান বসে বসে সবই দেখছে। তার কোন তাড়া নেই, কারণ তাড়াহুড়া পশুদের প্রকৃতিগত নয়।

* * *

শিবির ভেঙে দিয়ে আবু বতন একটিমাত্র বন্দিনীকে নিয়ে সদলে উত্তরমুখে যাত্রা করল। ইবন দামুক লাকে চুরি করায় জোরা ড্রিনভের জন্য সে দ্বিগুণ সতর্কতার ব্যবস্থা করেছে। তার আর পালাবার কোন উপায় রইল না। জোরার মনে আশা ছিল জাভেরি এসে তাকে আরবদের হাত থেকে উদ্ধার করবে, কিন্তু যতই দিন যেতে লাগল ততই সে আশা তার মন থেকে মুছে যেতে লাগল।

ওদিকে ছোট্ট নকিমা তখন একটা কাজ নিয়ে জঙ্গলের পথে ছুটে চলেছে। মনিবের কোন কাজের দায়িত্ব ঘাড়ে নিলে ছোট্ট নকিমা একটানা অনেক সময় ধরে একই চিন্তা ও কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারে। মাঝে-মধ্যে অন্য দিকে মন গেলেও শেষ পর্যন্ত অর্পিত দায়িত্ব সে ঠিকই পালন করে। তাই জাভেরি জানে, একদিন নকিমা তার গন্তব্যে ঠিকই পৌঁছে যাবে।

এদিকে ওয়েনি কোল্টও ঘর্মাক্ত দেহে এলোপাথারি ছুটে চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সঙ্গীদের সন্ধানে। কিন্তু সে চলেছে ভুল পথে। পথ হারিয়ে ফেলেছে। ভাগ্যক্রমে সে কথা সে এখনও জানে না; জানবে পরে।

চলতে চলতে একদিন দুপুরে সে একটা নদীতে পৌঁছে গেল। এ পথে আর এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। এতদিনে বুঝতে পারল সে পথ হারিয়েছে। কোন্‌টা যে সঠিক পথ তাও সে জানে না। তাই নদীবরাবর পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে চলাটাই সে বেছে নিল।

নতুন পথে কিছুদূর যেতেই অনেক দূর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ তার কানে এল। তাড়াতাড়ি একটা গাছে চড়ে শব্দ লক্ষ্য করে তাকাল। একটু পরেই বুঝতে পারল, কে যেন সেইদিকেই ছুটে আসছে—একজন নয়, দু'জন।

তখনই একটা পুরুষ-কণ্ঠ হাঁক দিল, "থাম!" তারপরেই একটা নারী

কণ্ঠ বলল, "আমাকে চলে যেতে দাও! তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যেতে চাইছ, আমার প্রাণ থাকতে সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না।"

"তাহলে এবার তোমাকে আমার নিজের জন্যই নেব," লোকটি বলল।

কোণ্ট যতটা শুনল তাই যথেষ্ট। খোলা ছুরি হাতে নিয়ে নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে সে শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল। মোড় ঘুরতেই জোব্বায় ঢাকা একটা পিঠ শুধু দেখতে পেল। সে বুঝল, মেয়েটি তার জোব্বার আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

লাফিয়ে পড়ে সে লোকটার কাঁধ চেপে ধরে এক ঝটকায় তাকে ঘুরিয়ে দিল। আরে! এ যে আবু বতন। আর ও—ও তো জোরা ড্রিনভ।

বাধা পেয়ে আবু বতন রাগে আগুন হয়ে উঠল। কোণ্টের মুঠি থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চীৎকার করে বলল, "নাস্‌রানির কুত্তা! নোংরা হাত দিয়ে আল্লার খিদ্‌মদগারকে স্পর্শ করো না।" সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলটা বের করার চেষ্টা করতেই কোণ্ট তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দুজনই মাটিতে পড়ে গেল। কোণ্ট উপরে।

তারপরের ঘটনা ঘটল অতি দ্রুত। আবু বতনের হাতের চাপে রিভলবারের বুলেট বের হয়ে মাটিতে ঢুকে গেল। কিন্তু সেই শব্দ শুনে আসন্ন বিপদ বুঝে কোণ্ট হাতের ছুরির ফলাটাকে সে শেখের গলায় আমূল বসিয়ে দিল।

শেখের মৃতদেহ ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই জোরা ড্রিনভ তার হাত ধরে বলল, "শিগ্‌গির! গুলির শব্দে অন্যরা এসে পড়বে। তার আগেই আমাদের পালাতে হবে।"

কোন কথা না বলে নীচু হয়ে আবু বতনের আগ্নেয়াস্ত্র ও বুলেট হাতিয়ে নিয়ে কোণ্ট শুধাল, "তুমি গাছে চড়তে পার?"

"পারি। কিন্তু কেন?"

"গাছে-গাছে চলাটাই সুবিধাজনক।"

দু'জনই গাছে উঠে গেল। কিছুদূর গিয়ে একটা দো-ডালায় আরাম করে বসে জোরা বলল, "কমরেড কোণ্ট! কি হয়েছে? তুমি একা এখানে কি করছ? তুমি কি আমাকেই খুঁজছ?"

মুচকি হেসে কোণ্ট বলল, "আমি পুরো দলটাকেই খুঁজছি। ওপার-এ ঢুকবার পর থেকে আমি কাউকে দেখি নি। শিবিরটা কোথায়? আবু বতনই বা তোমার পিছু নিয়েছিল কেন?"

জোরা সংক্ষেপে সব কথাই বলল। কোণ্টও শোনাল তার দুঃসাহসিক অভিযানের কথা।

ক্রমে রাত হল। কোণ্ট গাছের দো-ডালায় দুটো পাটাতন তৈরী করল। তারপর দু'জনই টান্-টান্ হয়ে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল।

কোণ্টের চোখে তন্দ্রা নেমে এল। স্বপ্নের মধ্যে একটি নক্ষত্রনয়না দেবী তাকে দেখা দিল। তার দুই গাল বেয়ে জল ঝরে পড়ছে। তাকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতেই কোণ্ট দেখল সে জোরা ড্রিনভ। আর তখনই একটা বীভৎস চীৎকারে আচমকা তার ঘুম ভেঙে গেলে। উঠে বসে সে শেখের আগ্নেয়াস্ত্রটা হাতে নিল।

মেয়েটি মৃদুস্বরে বলল, "একটা শিকারী সিংহ।"

' আচ্ছা ; আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।"

"হ্যাঁ ; তুমি ঘুমের মধ্যেও কথা বলছিলে," মেয়েটি হেসে বলল।

"কি বলছিলাম ?"

"বলছিলে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি'।"

"সত্যি ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলছিলে ?"

কোণ্ট বলল, "আশ্চর্য !" মনে পড়ল, স্বপ্নের মধ্যে একটি নারী-মূর্তি আর একটি নারী-মূর্তিতে মিশে গিয়েছিল।

তাদের গলা শুনে সিংহটা চলে গেল। ঘৃণিত মানুষকে সে শিকার করে না।

১২—আতংকের পথ ধরে

দুটি নর-নারী কমরেডদের সন্ধানে ঘুরছে। দিনের পর দিন গড়িয়ে যাচ্ছে। খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থা করতে তারা ক্লান্ত, বিষণ্ণ। সঙ্গিনীর চরিত্র ও ব্যক্তিগত ব্যবহার কোণ্টকে ক্রমেই মুগ্ধ করছে। সে বুঝতে পারছে, অপ্রচুর আহার ও পথচলার ক্লান্তিতে জোরা ক্রমেই ভেঙে পড়ছে। তাই তাকে যতদূর সম্ভব বিশ্রাম দেবার চেষ্টাই সে করে।

তাই আজও তাকে নদীর তীরে একটা গাছের উপরে বিশ্রাম করার জন্য রেখে কোণ্ট একাই বেরিয়েছে শিকারের খোঁজে। একটা হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে সে অনেক দূর চলে গেছে। তার ফিরতে দেরী দেখে জোরা গাছ থেকে নেমে নদীর দিকে চলেছে জল খেতে।

জল খেয়ে উঠে দাঁড়াতেই দূর থেকে একটা শব্দ তার কানে এল। কে যেন আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তার সব ক্লান্তি ও বিষণ্ণতা যেন কেটে গেল। কোণ্টের সঙ্গলাভের আশায়ই জোরা ড্রিনভের চোখ আনন্দের অশ্রুতে ভরে উঠল। শব্দ লক্ষ্য করে পা বাড়াতেই সামনের জঙ্গল দু'ভাগ করে তার আতংকিত দৃষ্টির সামনে দেখা দিল একটা দৈত্যাকার লোমশ গোরিলা।

গোরিলা-রাজ টো-ইয়াট মেয়েটিকে দেখে বিস্মিত হল, কিন্তু ভয় পেল না। ধীরে ধীরে তার দিকে এগোতে লাগল। প্রাথমিক বিস্ময়কে কাটিয়ে মেয়েটি যেই ছুটে পালাতে যাবে অমনি একটা লোমশ থাবা তার ঘাড়টাকে চেপে ধরল। খাপ থেকে শেখের পিস্তলটা বের করতেই টো-ইয়াট সেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর জোরাকে বুকে চেপে ধরে জঙ্গলের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শিকার কাঁধে নিয়ে কোল্ট ফিরে এল। গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কাউকে না দেখে "জোরা! জোরা!" বলে ডাকল। কোন সাড়া এল না। ভয়ে সে দিশেহারা হয়ে পড়ল। চারদিক খুঁজে দেখল। পিস্তলটা চোখে পড়তেই সে আরও নিঃসন্দেহ হল। জোরা একা কোথাও গেলে নিশ্চয় পিস্তলটা ফেলে যেত না। নির্ঘাৎ কেউ তাকে জোর করে তুলে নিয়ে গেছে।

ওয়েনি কোল্টের মাথার মধ্যে ঝড় বইতে লাগল। সব কিছু ভুলে গোরিলা-রাজ টো-ইয়াটের অস্পষ্ট পায়ের ছাপ অনুসরণ করে সোজা ছুটতে লাগল বনের পথ ধরে।

* * *

ইবন দামুক ও তার সঙ্গীদের হাত থেকে পালিয়ে ওপার-এর লা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল। এক সময় চলার গতি বাড়িয়ে দিল। শেখের দলও নিশ্চয় এতক্ষণ তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু একটা মোড় ঘুরতেই হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে কেশর ফোলানো একটা প্রকাণ্ড সিংহ। দেখেই লা চিনতে পারল, এই সিংহটাই তাকে বাঁচিয়েছিল চিতার হাত থেকে।

লা-র গায়ের গন্ধ নাকে আসায় জাদ্-বাল্-জা অনেক দূর থেকেই তাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে এসেছে। এবার পোষা বিড়ালের মত কাছে এসে সে গলার কেশর দিয়ে লা-র পা ঘসতে লাগল।

লা তার মাথায় একটা হাত রেখে আদিম মানুষের ভাষায় কি যেন বলতে লাগল।

হাজেলানও দলবল নিয়ে লা-র খোঁজ করতে করতে পথের মোড় ঘুরতেই ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনেই একটা প্রকাণ্ড সিংহ দুই পাটি দাঁত বের করে গর্জে উঠেছে। তার ঘন কালো কেশরের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সেই শ্বেতাঙ্গিনী।

মেয়েটি গোরিলাদের ভাষায় উচ্চারণ করল একটিমাত্র শব্দ—"মার!" সঙ্গে সঙ্গে সিংহটা লাফ দিল। ফোদিল ও দারেয়েম পিছন থেকেই ছুটে পালিয়ে গেল। সিংহের থাবায় ধরা পড়ল হাজেলান। বিরাট চোয়ালের চাপে তার মাথাটাকে ডিমের খোলার মত ভেঙে ফেলে জাদ্-বাল্-জা তার দেহটাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে লা-র দিকে তাকাল।

লা ততক্ষণে পালিয়েছে। শিকার করার পরে সিংহটা পাছে অন্য মূর্তি ধরে এই ভয়ে সে সরে পড়েছে। সিংহটা কিন্তু শিকারের দিকে ফিরেও তাকাল না। ছায়াচ্ছন্ন বনপথ ধরে লা-কেই অনুসরণ করল।

একটিমাত্র লেংটি ছাড়া প্রায় উলঙ্গ একটি নিগ্রো চলেছে জাভেরির উদ্দেশে। এসেছে উপকূল অঞ্চল থেকে। দূর থেকে পায়ের শব্দ শুনেই সে তাড়াতাড়ি একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। একটু পরেই যে দৃশ্য তার চোখে পড়ল তাতে তার নিজেরই সন্দেহ হল, সে জেগে আছে না ঘুমিয়ে আছে। কিন্তু না, ঐ তো একটি শ্বেতাঙ্গিনী—বুকের উপর কিছু সোনার চাকতি আর কটিদেশে একফালি চিতার চামড়া ছাড়া প্রায় নগ্নদেহ। প্রকাণ্ড একটা সোনালী সিংহের কালো কেশরে হাত বুলাতে বুলাতে এগিয়ে চলেছে। চৌ-মাথায় পৌঁছে তারা বাঁদিকে মোড় নিয়ে এগিয়ে গেল। সেই পথ ধরেই তো সেও চলেছে।

দুটি মূর্তি দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই কালো মানুষটি বুকে ঝোলানো তাবিজে হাত বুলিয়ে মুলুঙ্গোদেবের উদ্দেশে প্রার্থনা জানাল। তারপর একটা ঘোরানো পথে গন্তব্যের দিকে যাত্রা করল।

রাতের অন্ধকার নেমে এলে টারজন প্রায়ই ষড়যন্ত্রকারী দলের শিবিরে আসে। মাথার উপরকার গাছের ডালে বসে জাভেরি ও তার দলের সব পরিকল্পনার কথাই শোনে। সে জেনেছে, এখান থেকে তাদের তল্পিতল্পা গুটাতে এখনও বেশ কিছু দিন দেরী আছে। তাই আজ রাতে অভ্যাসবশত সে বেরিয়ে পড়েছে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরতে। সেটাই তো তার জীবনের নেশা—তার আনন্দ।

জোরা ড্রিনভ ও তার অপহরণকারীর সন্ধানে গভীর নৈরাশ্য বুকে নিয়ে একাকি পথ চলছে ওয়েনি কোল্ট। চলেছে ভুল পথ ধরে। আরও দূর দক্ষিণে টৌ-ইয়াট চলেছে শ্বেতাঙ্গিনীকে কাঁধে নিয়ে।

মুহূর্তকাল পরে একটি ব্রোঞ্জদেহ টারমাঙ্গানি অনায়াস ভঙ্গীতে তার পথের সামনে এসে নামল।

গোরিলার চোখ দুটি ক্রোধে ও ঘৃণায় জ্বলে উঠল। বলল, "সরে যাও। আমি টৌ-ইয়াট। চলে যাও, নইলে খুন করে ফেলব।"

টারজন আদেশের সুরে বলল, "ওকে নামিয়ে দাও।"

"না।" হুংকার দিল টৌ-ইয়াট। "ও আমার।"

টারজন আবার বলল, "ওকে নামিয়ে রেখে চলে যাও। নইলে মেরে ফেলব। আমি অরণ্যরাজ টারজন।"

টারজন তার বাবার দেওয়া ছুরিটা টেনে বের করল। টৌ-ইয়াটও গর্জে উঠল। মেয়েটিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে ঘুরে দাঁড়াল। শুরু হল গর্জন-হুংকারের পালা। হঠাৎ বাতাসে ভেসে এল গাছপালা ভাঙার একটা প্রচণ্ড শব্দ।

হাতি টাণ্টর নিরাপদে ঘুমিয়েছিল গভীর জঙ্গলে। হঠাৎ দুই পশুর গর্জন-হুংকারে তার ঘুম ভেঙে গেল। নাকে এল পরিচিত গন্ধ—প্রিয় টারজনের দেহ-গন্ধ। শব্দ শুনেই বুঝতে পারল গোরিলার সঙ্গে তার যুদ্ধ হচ্ছে।

গাছপালা মড়-মড় করে ভেঙে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ছুটে এল টাণ্টর। টো-ইয়াট দেখল, তার দুই ক্রুদ্ধ চোখ ও ঝকঝকে দাঁতে মৃত্যুর স্বাক্ষর। মুখ ঘুরিয়ে সে সোজা ছুট দিল জঙ্গলের গভীরে।

১৩—সিংহ-পুরুষ

ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ড অভিযানের চূড়ান্ত সাফল্যের ব্যাপারে যে আত্মবিশ্বাস পিটার জাভেরি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিল, ধীরে ধীরে সে আবার সেটা ফিরে পাচ্ছে। বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সরবরাহ আসতে আরম্ভ করেছে; বিদ্রোহী নিগ্রোরাও অনেকটা শান্ত হয়েছে, আর তার ফলে নতুন নতুন সংগ্রামী মানুষ এসে তার দলে যোগ দিচ্ছে। জাভেরির পরিকল্পনাটা অনেকটা এই রকম: দ্রুত ও আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে কিছু আদিবাসী গ্রাম ধ্বংস করে ও দু'একটা ফাঁড়ি দখল করে তড়িৎ-গতিতে সীমান্ত পার হয়ে চলে আসবে, ফরাসী ইউনিফর্মগুলিকে ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের জন্য বাক্সবন্দী করে রাখবে এবং আবিসিনিয়াতে রাস্‌তাকারিকে গদীচ্যুত করবে; সেখানকার দলীয় প্রতিনিধিরা আগেই জানিয়েছে যে, সেখানে বিপ্লবের ভূমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। প্রতিনিধিরা আরও আশ্বাস দিয়েছে, একবার আবিসিনিয়া দখল করে সেখানে ঘাঁটি বানাতে পারলে সমগ্র উত্তর আফ্রিকার আদিম জাতিরা দলে দলে এসে তার পতাকাতলে সমবেত হবে।

ওদিকে মার্কিন পুঁজিপতিদের লোভের সুযোগ নিয়ে সুদূর বোখারোতে বম্বার, স্কাউট ও যোদ্ধা বিমানসহ দু-শ' বিমানের একটা বহরকে হঠাৎ পারস্য ও আরবের আকাশপথে নিয়ে আসা হবে তার আবিসিনিয়ার ঘাঁটিতে। স্থানীয় লোকদের নিয়ে যে বিরাট বাহিনী সে গড়ে তুলেছে তার সঙ্গে এই সব শক্তি মিলিত হলে গোটা পরিস্থিতি আসবে তার অনুকূলে; তার সঙ্গে যোগ দেবে মিশরের বিদ্রোহী সেনাদল। এইভাবে, ইওরোপ একটা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তার বিরুদ্ধে কোন সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না, তার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হবে, আর সে হবে চিরদিনের মত অজেয়।

হয়তো এটা একটা উন্মাদ স্বপ্ন; হয়তো পিটার জাভেরি সত্যি উন্মাদ—কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন্ বিশ্ব-বিজয়ী কিছুটা উন্মাদ ছিল না?

সে যেন দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছে তার সাম্রাজ্যের সীমান্ত একটু একটু করে দক্ষিণে প্রসারিত হচ্ছে। তারপর একদিন সে শাসন করবে একটা বিরাট মহাদেশ—সে হবে আফ্রিকার সম্রাট প্রথম পিটার।

ছোট্ট এণ্টোনিও মোরি বলল, "তোমাকে খুব খুশি দেখাচ্ছে কমরেড জাভেরি।"

স্বপ্নদর্শী উত্তর দিল, "কেন খুশি হব না টনি? সাফল্য তো আমাদের দুয়ারে এসে হাজির হয়েছে। আমাদের সকলেরই খুশি হওয়া উচিত, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা আরও বেশী খুশি হতে পারব।"

টনি বলল, "তা ঠিক, ফিলিপিন স্বাধীন হলে আমি খুব খুশি হব। আচ্ছা কমরেড, তোমার কি মনে হয় না যে তখন দেশে ফিরে গিয়ে আমিও একজন কেউকেটা হয়ে উঠব?"

"তা তো হবেই; তবে তুমি যদি এখানে থেকে আমার হয়ে কাজ কর তাহলে তুমি আরও বড় হতে পারবে। আচ্ছা টনি, গ্র্যাণ্ড ডিউক হওয়াটা তুমি কেমন পছন্দ কর?"

ফিলিপিনো সবিস্ময়ে বলল, "গ্র্যাণ্ড ডিউক! আমার তো ধারণা গ্র্যাণ্ড ডিউক বলে কিছু আর থাকবেই না।"

"কিন্তু থাকতেও তো পারে। যথেষ্ট টাকা-পয়সা, যথেষ্ট ক্ষমতা কি তুমি চাও না টনি?"

"তা আর কে না চায় বল?"

"তাহলে সর্বদা আমার কথামত কাজ করবে। আমিই একদিন তোমাকে গ্র্যাণ্ড ডিউক করে দেব।"

একদিকে সমস্ত শিবির জুড়ে যখন চলেছে এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার উদগ্র কর্মব্যস্ততা, তখন ওদিকে একশ' কাল সৈনিক এগিয়ে আসছে জঙ্গলের পথে। তাদের গায়ের চামড়া মসৃণ, চকচকে; তাদের দুরন্ত মাংসপেশী ও সহজ পদক্ষেপ তাদের দৈহিক সক্ষমতার সাক্ষ্য বহন করছে। গোড়ালিতে ও কব্জিতে তামার বালা, গলায় সিংহ বা চিতার নখের মালা, এবং সিংহ বা চিতার চামড়ার এক ফালি কটি-বস্ত্র ছাড়া নগ্ন দেহ। প্রত্যেকের মাথায় সাদা পাখির পালক গোঁজা। কিন্তু তাদের আদিম সাজসজ্জার এখানেই ইতি, কারণ তাদের সকলেরই হাতে আধুনিক অস্ত্রের সম্ভার; স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, রিভলবার ও বুলেটভর্তি চামড়ার বক্ষবন্ধনী। একটি দুর্ভেদ্য বাহিনী নিঃশব্দে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। তাদের দলপতির কাঁধের উপর বসে আছে একটা ছোট্ট বানর।

* * *

টাণ্টরের অপ্রত্যাশিত আক্রমণে টো-ইয়াট জঙ্গলে পালিয়ে যাওয়ায় টারজন বেশ স্বস্তি বোধ করল। কোন মাঙ্গানির সঙ্গে যুদ্ধ করতে সে চায় না; তাদের

সকলকেই সে ভাই বলে মনে করে। সে কখনও ভুলতে পারে না যে গোরিলা-মা কালার বুকের দুধ খেয়েই সে বড় হয়েছে। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত সে তো গোরিলা হিসাবেই বেড়ে উঠেছে।

শায়িত মেয়েটির পাশে হাঁটু ভেঙে বসে টারজন তাকে ভাল করে দেখতে লাগল। প্রথমে মনে হয়েছিল মেয়েটি মরেই গেছে, কিন্তু অচিরেই বুঝল যে সে মূর্চ্ছা গেছে মাত্র। তাকে দুই হাতে তুলে ধরে টারজন হাতিটাকে কি যেন বলল, আর হাতিও নীচু হয়ে দু'জনকে পিঠে তুলে নিল।

তিনটি প্রাণী এগিয়ে চলল বনের পথ ধরে। একটা খর-স্রোতা নদী পার হল। আবার নিঃশব্দ যাত্রা।

জোরা ড্রিনভ চোখ মেলল। জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের শোচনীয় অবস্থার কথা সবই মনে পড়ল। কিন্তু এ কি! যার কাঁধে চড়ে সে চলেছে সে তো কোন লোমশ গোরিলা নয়, এটা যে মানুষের মসৃণ দেহ। এ কি স্বপ্ন, না মায়া, না মতিভ্রম!

তার নড়াচড়ায় টারজন মুখ ফিরিয়ে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। দু'জনেরই চোখে চোখ পড়ল।

জোরা ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "তুমি কে? আমি কি স্বপ্ন দেখছি?"

টারজন চোখ ফিরিয়ে নিল; কোন কথা বলল না।

শেষ পর্যন্ত একটা খোলা জায়গায় পৌঁছে সকলে থামল। টারজন মেয়েটিকে ঘাসের উপর শুইয়ে দিল। পাশেই একটা ছোট নদী। মাথার উপর পত্রবহুল গাছের প্রসারিত স্নিগ্ধ ছায়া।

সে যে কত দুর্বল, কত ক্লান্ত এতক্ষণে জোরা ড্রিনভ সেটা বুঝতে পারল। উঠে বসতে চেষ্টা করেও পারল না। আবার দেহটাকে এগিয়ে দিল ঘাসের বিছানায়।

তার খুব তেষ্টা পেয়েছে। ইসারায় সে কথা জানাতেই টারজন একটা গোলাকার পাতায় করে জল এনে তাকে খাওয়াল। প্রাণভরে জল খেয়ে আবার সে টারজনের সুন্দর মুখের দিকে তাকাল। তাকে ধন্যবাদ জানাল। তবু লোকটি কিছু বলল না দেখে জোরা ভাবল তার কথা সে বুঝতে পারছে না।

একটু পরেই টারজন একলাফে একটা গাছে চড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। জোরাকে পাহারা দিতে প্রকাণ্ড হাতিটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল।

চারপাশের শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে তার স্নায়ুও ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। তবু তার মন থেকে ভয় গেল না। এই লোকটি তার কাছে একটা রহস্য। যে গোরিলাটা তাকে অপহরণ করেছিল সে যে অলৌকিকভাবে হঠাৎ এই সুন্দর অরণ্য-দেবতায় রূপান্তরিত হয় নি তা সে বোঝে। তাই সে ধরে নিল, এদের দু'জনের মধ্যে একটা যোগাযোগ আছে; মনিবের হয়েই গোরিলাটা তাকে চুরি

করেছে। অথচ লোকটির হাবভাবে এটা ভাবা যায় না যে তার মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে।

যাই হোক, বেশ কিছু সময় পরে লোকটি ফিরে এল। সঙ্গে নিয়ে এল অনেক ডালপালা ও শুকনো পাতা, আর একটা মরা হরিণ। ডালপালা ও পাতা দিয়ে কোনরকমে একটা ঘর বানিয়ে ফেলল। পাতা বিছিয়ে বিছানা করে দিল। তারপর মেয়েটিকে দুই হাতে তুলে এনে সেই বিছানায় শুইয়ে দিল।

জোরা শুয়ে শুয়েই দেখল, লোকটি আগুন জ্বালাল; মাংসটা ঝল্‌সে নিল। তারপর সেটা নিয়ে এসে জোরার পাশে বসে ছুরি দিয়ে মাংসটাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ছোট শিশুর মত জোরাকে খাইয়ে দিতে লাগল।

ধীরে ধীরে জোরার মনে নিরাপত্তার ভাব ফিরে এল। ভাল খাদ্য ও প্রচুর বিশ্রামের ফলে তার স্বাস্থ্যও ফিরে পেল।

দিনের পর দিন কেটে গেল। রাতের বেলা তাকে নিঃশব্দে পাহারা দেয় সেই অরণ্য-দেবতা, আর দিনের বেলা পাহারা দেয় বিরাটকায় হাতিটা। এবার তার মন জুড়ে বসল ওয়েনি কোল্টের নিরাপত্তার চিন্তা।

আসলেও দুশ্চিন্তার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। দিনের পর দিন জোরার সন্ধানে সে বিশ্রাম ভুলেছে, আহার ভুলেছে। ফলে তার শরীর একেবারেই ভেঙে পড়েছে। এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে, কয়েক পা হেঁটেই সে মাটিতে শুয়ে পড়ে। সেখান থেকে উঠতে অনেক সময় লাগে। আর প্রতিবারই মনে হয়, আর বুঝি সে উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

তবু জোরার সন্ধান সে ছাড়তে পারে না। জোরা ড্রিনভের বিপদ যতক্ষণ না কাটছে ততক্ষণ সে মরতে পারে না, তাকে বেঁচে থাকতেই হবে।

এইভাবে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে চলতে চলতে একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবেই একদিন সেই চরম মুহূর্তটি বুঝি দেখা দিল। শুয়ে শুয়েই তার মনে হল, সে আর একা নয়; কে যেন তার উপর নজর রেখেছে।

অনেক কষ্টে মাথা তুলে তাকাল। পথের উপর দাঁড়িয়ে আছে একটা সিংহ। দুই ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল একটা ক্রুদ্ধ গর্জন; হলুদ-সবুজ চোখে হিংসার স্ফুলিঙ্গ।

১৪—গুলির আঘাতে

মানুষের অজ্ঞাত বনপথ ধরে টারজন প্রায় প্রত্যহই শত্রু-শিবিরের কাজ-কর্ম দেখতে একবার করে সেখানে যায়। একটা বড় রকম আঘাত হানার প্রস্তুতি

প্রায় সম্পূর্ণ। তারপরই দলের সকলকেই ইউনিফর্ম দেওয়া হল—টারজন চিনতে পারল সেগুলি ফরাসী উপনিবেশ-রক্ষীবাহিনীর ইউনিফর্ম। সে বুঝল, এবার তাকেও কাজে নামতে হবে। ছোট্ট নকিমা এতদিনে তার চিঠিটা যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছে; আর যদি না দিয়েও থাকে, তাহলে টারজনকে অন্য উপায়ের কথা ভাবতে হবে।

জোরা ড্রিনভ ধীরে ধীরে শক্তি ফিরে পাচ্ছে। এখন সে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে।

একদিন জোরাকে সঙ্গে নিয়ে টারজন জঙ্গলের পথে ঘুরতে বের হল। জোরার হাত ধরে এক লাফে একটা গাছে উঠে গেল। তারপর ডাল থেকে ডালে, গাছ থেকে গাছে তারা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। জোরা তো বিস্ময়ে হতবাক। এত শক্তি ও সাবলীলতা কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব? এ কি কোন অলৌকিক পুরুষ?

অনেক ঘুরে তারা ফিরে এল। এক জায়গায় এসে দূর থেকে দেখতে পেল শিবিরের ঘরবাড়ি। জোরাকে সেখানেই গাছ থেকে নামিয়ে দিয়ে টারজন বলল, এবার সে একাই শিবিরে ফিরে যেতে পারবে।

মেয়েটি বলল, "কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব!" সে আরও কি বলতে যাচ্ছিল তার আগেই টারজন লাফিয়ে উঠে একটা গাছের ঘন পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পল আইভিচ শিকার করতে বেরিয়েছিল। শিবিরে ফেরার পথে তার চোখে পড়ল, খোলা জায়গার কিনারায় একটা গাছের উপর কি যেন নড়ছে। নীচে চিতাবাঘের পায়ের ছাপ দেখে সে রাইফেল তুলে গুলি ছুঁড়ল। যে মুহূর্তে জোরা শিবিরে ঢুকল ঠিক তখনি গাছের উপর থেকে টারজনের দেহটা তার ঠিক পাশেই ছিটকে পড়ল। তার মাথায় গুলি লাগায় ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরছে।

* * *

মুখের উপর একটি গর্জনমুখর সিংহকে দেখলে যে কোন মানুষেরই সংজ্ঞা লোপ পাবার কথা; কিন্তু পিছন থেকে একটি সুন্দরী নারীকে বন্য পশুটার দিকে ছুটে আসতে দেখে ওয়েনি কোল্টের বিস্ময়ের আর অবধি রইল না। এই সিংহ, এই নারী—এরা কি তার উন্মাদ মস্তিষ্কের অলীক কল্পনামাত্র!

কিন্তু তার কানে এল, মেয়েটি সিংহটাকে কি যেন বলল; তারপর এগিয়ে এসে উপুড় হয়ে তাকে স্পর্শ করল। এ নারী তাহলে কল্পনা নয়, বাস্তব।

ভাঙা ইংরেজিতে মেয়েটি শুধাল, "তুমি কে? তোমার কি হয়েছে?"

কোল্ট বলল, "আমি হারিয়ে গেছি। আমার মৃত্যু আসন্ন। অনেক দিন আমি কিছুই খাই নি।" বলেই সে জ্ঞান হারাল।

একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এলে লা অনেক কষ্টে ধরাধরি করে তাকে কুটিরে নিয়ে গেল। ঘরে যে মাংস ছিল তাই তাকে খেতে দিল। নদী থেকে জল এনে দিল।

খেয়েদেয়ে শরীরে একটু বল পেয়ে কোন্ট লা-র দিকে তাকাল।

লা শুধাল, “এখন কিছুটা ভাল বোধ করছ তো?”

“অনেকটা।”

“তাহলে এবার বল তুমি কে, আর এটাই তোমার দেশ কি না।”

কোন্ট জবাব দিল, “এটা আমার দেশ নয়। আমি আমেরিকার মানুষ। আমার নাম ওয়েনি কোন্ট।”

তুমি কি অরণ্যরাজ টারজনের বন্ধু?”

লোকটি মাথা নাড়ল। “না তার কথা আমি শুনেছি, কিন্তু তাকে চিনি না।”

লা-র চোখে ভ্রূকুটি। “তাহলে তুমি তার শত্রু?”

“নিশ্চয় না। আমি তাকে চিনিই না।”

লা-র চোখে একটা আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল। “তুমি জোরাকে চেন?”

“জোরা ড্রিনভ? তুমি তাকে চেন?”

“সে আমার বন্ধু।”

“সে আমারও বন্ধু” কোন্ট বলল।

লা বলল, “তার খুব বিপদ।”

“জানি; কিন্তু তুমি কি করে জানলে?”

“মরুভূমির লোকরা যখন তাকে বন্দী করে তখন আমি তার সঙ্গে ছিলাম। তারা আমাকেও আটকে রেখেছিল, কিন্তু আমি পালিয়েছি।’

“সেটা কতদিন আগেকার কথা?”

“জোরার সঙ্গে শেষ দেখা হবার পরে অগ্নি-দেবতা অনেকবার শয়ন করেছে।”

“তারপরেও তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।”

“এখন সে কোথায়?”

“তা জানি না। তাকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তুমি কে তা তো বললে না।”

“আমি অগ্নি-দেবতার প্রধান সন্ন্যাসিনী ওপার-এর লা।”

ওপার! সে তো রহস্যের নগরী, গুপ্তধনের নগরী। যে নগরীর কিম্ভুত জীবদের সঙ্গে রোমেরো ও তার দেখা হয়েছিল সেখানে কি নাও ও লার মত সুন্দরীরাও বাস করে?

জাদ্-বাল্-জা, লা ও কোন্ট পাশাপাশি শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিল। সকালে

উঠে কোণ্টের শরীরটা বেশ তাজা মনে হল। বলল, "চল, এবার আমরা জোয়ার বন্ধুদের শিবিরের খোঁজ করিগে।"

লা মাথা নেড়ে বলল, "এখনই না। তুমি আরও বিশ্রাম নাও। তারপর সে চেষ্টা করা যাবে।"

* * *

তার সিংহ-পুরুষকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে জোরা ড্রিনভ ছুটে তার কাছে গিয়ে বসে পড়ল। গুলির শব্দ সে শুনেছে। তার মাথা থেকে রক্ত ঝরতে দেখে সে ভাবল যে কেউ ইচ্ছা করে তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে। এমন সময় আইভিচ রাইফেল হাতে দৌড়ে বেরিয়ে আসায় জোরা বাঘিনীর মত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তুমি ওকে খুন করেছ। জানোয়ার। ও যে তোমার মত দশটা মানুষের চাইতে বেশী মূল্যবান।"

গোলমাল শুনে শিবির থেকে অনেকেই বেরিয়ে এসে টারজন ও মেয়েটিকে ঘিরে দাঁড়াল।

আইভিচ যেন পাথর হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বলল, "আমি বুঝতে পারি নি কমরেড ড্রিনভ। গাছের উপর কাকে নড়তে দেখে চিতা মনে করে গুলি করেছি, বুঝতে পারি নি যে আমার চোখ পড়েছিল ওর পরনের চিতার চামড়ার উপর।"

কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে জাভেরি এসে দাঁড়াল। অবাক হয়ে বলল, "জোরা! তুমি কোথেকে এলে? কি হয়েছে? এ সবের অর্থ কি?"

জোরা বলল, "এই লোকটা আমার প্রাণ রক্ষা করেছে, আর আইভিচ তাকেই খুন করেছে।"

"ও কে?"

"তা জানিনা" জোরা বলল। "কোন কথা সে আমাকে বলে নি। আমার জানা কোন ভাষা সে জানে বলে মনে হয় না।"

এমন সময় আইভিচ চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ও মরে নি। ওই দেখ, নড়ছে।"

রোমেরো বসে পড়ে টারজনের আঘাত ভাল করে পরীক্ষা করে বলল, "মূর্চ্ছা গেছে মাত্র। খুলি ভেঙে যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখছি না। এ রকম আঘাত লাগা মানুষ আমি আগেও দেখেছি। তবে জ্ঞান ফিরতে দেরী হতে পারে।"

জাভেরি আবার শুধাল, "লোকটা কে হতে পারে?"

একটা নিগ্রো এগিয়ে বলল, "আমি জানি ওকে। যদি মরে না গিয়ে থাকে তো এখনি ওকে মেরে ফেল, কারণ ও তোমাদের পয়লা নম্বর শত্রু।"

জাভেরি বলল, "তার মানে? ও কে?"

"অরণ্যরাজ টারজন।"

"তুমি ঠিক জান ?"

"জানি বাওয়ানা। ওকে আমি আগেও দেখেছি। ওকে একবার দেখলে কখনও ভোলা যায় না।"

জাভেরি বলল, "তোমার গুলি খুব পয়মন্ত আইভিচ। যে কাজ শুরু করেছিলে এবার সেটা শেষ কর।"

"তার মানে, ওকে মেরে ফেলব ?" আইভিচ প্রশ্ন করল।

জাভেরি উত্তর দিল, "ও বেঁচে থাকলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে, সেই সঙ্গে আমাদের জীবনও। আমি ভেবেছিলাম ও মারা গেছে, নইলে এখানে আসতাম না। ওর চাইতে বড় শত্রু আমাদের কেউ নেই।"

"ঠাণ্ডা মাথায় আমি ওকে খুন করতে পারব না," আইভিচ বলল।

জাভেরি বলল, "তোমার মন আগাগোড়াই দুর্বল, কিন্তু আমি দুর্বল নই। জোরা, সরে দাঁড়াও।" রিভলবার বের করে সে টারজনের দিকে এগিয়ে গেল।

জোরা তাকে আড়াল করে দাঁড়াল। বলল, "ওকে খুন করতে পারবে না। আমি খুন করতে দেব না।"

"বোকার মত কথা বলো না জোরা," জাভেরি ধমক দিল।

"ও আমার জীবন রক্ষা করেছে, আমাকে শিবিরে নিয়ে এসেছে। এর পরেও আমি ওকে খুন হতে দেব ?"

জাভেরি বলল, "খুন করতে আমিও চাই না জোরা ; কিন্তু এটা যে ওর জীবন ও আমাদের আদর্শের লড়াই। ও যদি বাঁচে তো আমরা ব্যর্থ হয়ে যাব।"

জোরা লাফ দিয়ে জাভেরির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, "পিটার, তুমি যদি ওকে খুন কর তাহলে আমিও তোমাকে খুন করব। ইচ্ছা হলে ওকে বন্দী কর, কিন্তু তোমার জীবনকে যদি মূল্যবান মনে কর তাহলে ওকে খুন করো না।"

জাভেরি রাগে লাল হয়ে উঠল, "তোমার কথায় বিদ্রোহের সুর। এর চাইতে অনেক ছোট কথার জন্য অনেক বিশ্বাসঘাতককে প্রাণ দিতে হয়েছে।"

জোরা বুঝল, পরিস্থিতি খুবই সঙ্গীন। টারজনকে বাঁচাতে হলে যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। জাভেরিকে বলল, "অন্যদের চলে যেতে বল। তোমাকে আমার কিছু বলার আছে।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে জাভেরি পাশে দাঁড়ানো ডর্স্কিকে বলল, "লোকটাকে ভাল করে বেঁধে একটা তাঁবুতে নিয়ে যাও। জ্ঞান ফিরলে তার বিচার হবে : তারপর ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে তাকে হাজির করো। জোরা, তুমি আমার সঙ্গে এস। তোমার কথা শুনব।"

জাভেরির তাঁবুতে ঢুকে তার প্রশ্নের উত্তরে জোরা বলল, "তুমি যদি ওকে খুন কর তাহলে তোমার আসল মতলব আমি ফাঁস করে দেব। বলে দেব, তুমি নিজেই তোমার আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছ—আফ্রিকার সম্রাট

হয়ে বসার উচ্চাকাংখা পুরণের জন্যই তুমি সকলকে কাজে লাগিয়েছ।"

জাভেরি চীৎকার করে বলল, "তোমার এতদূর সাহস! কিন্তু স্থির জেনো, তোমাকে যত ভালই বাসি না কেন, আমার পথের অন্তরায় হলে সেই মুহূর্তেই তোমাকেও খুন করব।"

জোরা বিদ্রূপের সুরে বলল, "সে সাহস তোমার হবে না। দেখ পিটার, শিবিরের প্রতিটি মানুষকে তুমি শত্রু করে তুলেছ, আর তারা সকলেই আমাকে পছন্দ করে। কেউ কেউ হয়তো একটু ভালও বাসে। তুমি কি মনে কর, আমাকে খুন করলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তারা প্রতিশোধ নেবে না? আমার কথা শোন বন্ধু। ইচ্ছা হয়, টারজনকে বন্দী করে রাখ, কিন্তু নিজের প্রাণের কথা ভেবে তার প্রাণ নিতে চেষ্টা করো না।"

জাভেরি হতাশ হয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল। বলল, "সকলেই আমার শত্রু। তোমাকে যে এত ভালবাসি সেই তুমিও।"

"তুমি ভুল করছ পিটার; তোমার সম্পর্কে আমি এতটুকু বদলে যাই নি।"

"ঠিক বলছ?"

"সম্পূর্ণ ঠিক।"

একটু থেমে জাভেরি আবার বলল, "ওই লোকটার সঙ্গে একা একা জঙ্গলে কতদিন কাটিয়েছ তুমি?"

জোরা বলল, "ওকথা তুলো না পিটার। সে আমার ভাই হলেও এর চাইতে ভাল ব্যবহার করতে পারত না। কিন্তু সে কথা থাক। এবার আসল কথায় এস—টারজনের কথায়।"

জাভেরি বলল, "তোমার জন্যই তাকে বাঁচতে দেব। কিন্তু আজ আর কাউকে আমি বিশ্বাস করি না। কেমন করে করব? এই দেখ—" বলে একটা সাংকেতিক লিপি বের করে জোরার হাতে দিল। "কয়েক দিন আগে এটা এসেছে—বিশ্বাসঘাতক। তাকে যদি হাতের মুঠোয় পেতাম।"

জোরা কাগজটা নিল। সাংকেতিক লিপির নীচে জাভেরির হাতের লেখায় চিঠির মর্মার্থ রুশ ভাষায় পুনর্লিখিত। পড়তে পড়তে জোরার দুই চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। বলল, এ যে অবিশ্বাস্য।"

"তাহলেও সত্যি," জাভেরি বলল। "নেড়ি কুত্তাটাকে আমি আগেই সন্দেহ করেছিলাম। মনে হয় ব্যাটা মেক্সিকানও ওই দলের।"

জোরা বলল, "আর যাই হোক তার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে, কারণ মনে হচ্ছে চিঠিটা সঠিক জায়গায় পৌছায় নি।"

জাভেরি বলল, "তা পৌছায় নি। ভুলক্রমে তার লোকের পরিবর্তে আমাদের লোকের হাতেই চিঠিটা পড়েছিল।"

"তাহলে ক্ষতি কিছু হয় নি।"

"ভাগ্যক্রমে তা হয় নি, কিন্তু এর ফলে সকলের সম্পর্কেই আমার মন সন্দিহান হয়ে উঠেছে। তাই আরও কোন বিঘ্ন ঘটার আগেই আমি এখনই অভিযান শুরু করতে চাই।"

"সব কিছু প্রস্তুত ?"

"সব প্রস্তুত। কাল সকালেই আমরা যাত্রা করব।"

১৫—"মার টাণ্টর, মার !"

পরদিন খুব সকালে অভিযাত্রী দল সারি বেঁধে শিবির থেকে বেরিয়ে পড়ল। কালা আদমিরা গায়ে চড়িয়েছে ফরাসী উপনিবেশরক্ষীবাহিনীর উর্দি ; জাভেরি, রোমেরো, আইভিচ ও মোরির গায়ে ফরাসী অফিসারদের পোশাক। টারজনের সেবাশুশ্রূষার জন্য জোরা ড্রিনভ থেকে যেতে চেয়েছিল, কিন্তু জাভেরির হুকুমে তাকেও দলের সঙ্গে চলতে হচ্ছে। বন্দীর দেখাশুনা এবং রেখে যাওয়া রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র পাহারা দেবার জন্য অল্প কয়েকটি নিগ্রো ও ডর্স্কিকে শিবিরে রেখে যাওয়া হয়েছে।

যাত্রার ঠিক পূর্বক্ষণে জাভেরি চুপিচুপি শেষ নির্দেশ শুনিয়ে দিল ডর্স্কিকে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তোমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। এমন ব্যবস্থা করবে যাতে মনে হবে যে সে পালিয়েছে অথবা কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়েছে।"

ডর্স্কি বলল, "এ নিয়ে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না কমরেড। তুমি ফিরে আসার অনেক আগেই বাছাধনকে ভবপারে পাঠিয়ে দেব।"

আক্রমণকারীদের সামনে কষ্টকর দীর্ঘপথ। পাঁচশ' মাইল বন্ধুর পথে দক্ষিণ-পূর্ব আবিসিনিয়ার ভিতর দিয়ে তাদের ঢুকতে হবে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডে। জাভেরির মনোগত বাসনা—ইতালীয় উপনিবেশে আক্রমণের একটা মহড়া শুধু দেবে। তাতেই ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইতালীয়দের ক্রোধ জাগ্রত হবে, আর সেখানকার ফ্যাসিস্ত ডিক্টেটর সেই ওজুহাতে ইওরোপের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

জাভেরি হয়তো কিছুটা পাগল ছিল। এতদিন সে দেখেছে একটি সাম্রাজ্যের স্বপ্ন ; এখন দেখছে দুটি সাম্রাজ্যের স্বপ্ন। এক নতুন রোমক সম্রাট শাসন করবে ইওরোপ, আর সে নিজে হবে আফ্রিকার সম্রাট। তার চোখের সামনে ভাসছে দুই সোনার সিংহাসন—একটিতে আসীন সম্রাট প্রথম পিটার, আর অপরটিতে সাম্রাজ্ঞী জোরা। অভিযানের দীর্ঘ পথ এই স্বপ্ন দেখেই সে কাটাতে লাগল।

* * *

পরদিন সকালে টারজনের জ্ঞান ফিরল। শরীর দুর্বল, রুগ্ন ; মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা। নড়বার চেষ্টা করতেই বুঝল, হাত-পা শক্ত করে বাঁধা। কি ঘটেছে, কোথায় আছে—কিছুই সে জানে না। তাঁবুর ক্যানভাসের দেয়াল দেখে বুঝল, যে ভাবেই হোক শত্রুর হাতে সে ধরা পড়েছে। এখানে সে একা নয় ; বাইরে লোকজনের গলা শোনা যাচ্ছে। তবে যতদূর মনে হয়, তারা সংখ্যায় বেশী নয়।

গভীর জঙ্গল থেকে ভেসে এল হাতির ডাক। অস্পষ্টভাবে কানে এল সিংহের গর্জন। মাথাটা ঘুরিয়ে তাঁবুর বাইরে তাকাল। তার ঠোঁট থেকে বের হল একটানা নীচু চীৎকার—বিপন্ন পশুর বুক-ফাটা ডাক।

ডয়স্কি তার তাঁবুর সামনে একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছিল। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কালা আদমিরা গল্প-গুজব থামিয়ে হাতে অস্ত্র তুলে নিল।

"ওটা কি ?" ডয়স্কি ছোকরা নিগ্রো-চাকরটাকে প্রশ্ন করল। সে কাঁপতে কাঁপতে মাথা নেড়ে বলল, "জানি না বাওয়ানা। হয়তো তাঁবুর ভিতরকার লোকটা মারা গেছে, কারণ এ রকম শব্দ কেবল ভূতের গলা থেকেই বেরুতে পারে।"

ডয়স্কি বলল, "যতসব বাজে কথা। চল, দেখে আসি।"

দু'জনই ভয়ে ভয়ে টারজনের তাঁবুর দিকে এগোতে লাগল। ডয়স্কির হাতে উদ্যত রিভলবার।

ঘরে ঢুকে দেখল, টারজন যেখানে ছিল সেখানেই শুয়ে আছে। তবে তার চোখ দুটি খোলা। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে ডয়স্কির দিকে তাকাল। ডয়স্কি কয়েকটা প্রশ্ন করল, কোন জবাব পেল না। তখন একটি নিগ্রোকে ডেকে এনে বলল, দেখতো লোকটা তোমার কথা বুঝতে পারে কি না। যদি পারে তো ওকে বল যে ওর কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে।"

নিগ্রো বলল, "এ যদি অরণ্যরাজ টারজন হয় তাহলে আমার কথা বুঝতে পারবে।"

টারজন কিন্তু তার কথা শুনেও কোনরকম উচ্চ-বাচ্য করল না।

ডয়স্কির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। চীৎকার করে বলল, "ব্যাটা গোরিলা, আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করো না। আমি ভাল করেই জানি, এ লোকটার বকবকানি সব তুমি বুঝতে পেরেছ। তাছাড়া, তুমি একজন ইংরেজ, অবশ্যই ইংরেজি জান। তোমাকে পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে গেলাম। ফিরে এসেও যদি দেখি তুমি কথা বলছ না, তাহলে তোমার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে।" বলেই সে তাঁবু থেকে সটান বেরিয়ে গেল।

* * *

ছোট্ট নকিমা অনেক পথ পার হয়ে গিয়েছিল। তার গলার শক্ত বেড়ি

থেকে ঝুলছিল একটা চামড়ার থলে। তার মধ্যেই চিঠিটা ছিল। সেটা সে এনে দিয়েছিল ওয়াজিরিদের সেনাপতি মুভিরোকে। আর ওয়াজিরিরা যখন পথে নামল তখন নকিমা সগর্বে মুভিরোর কাঁধেই বসে পড়ল। অনেকটা সময় পর্যন্ত সে মুভিরোর কাঁধেই ছিল ; তারপর মনের খেয়ালেই হোক আর অন্য কোন প্ররোচনাতেই হোক সকলকে ছেড়ে সে নিজের কাজে চলে গেল।

বড় বড় গাছের ডালে ডালে ঝুলতে ঝুলতে সে চলতে লাগল। অনেকবার অনেক বিপদে পড়েও তা পার হয়ে গেল। আপন খেয়াল খুশিতে একবার এদিকে ছোটে, একবার ওদিকে। আর তাতেই অনেক সময় নষ্ট হল। নইলে যথাসময়েই সে তার মনিবের কাছে পৌঁছে যেত, তার অনেক কাজে লাগত। এই মুহূর্তে একটি বন্ধুর বড়ই প্রয়োজন ছিল টারজানের—এর আগে কখনও সে এমন করে একটি বন্ধুর অভাব অনুভব করে নি।

এইভাবে নকিমা যখন বহুদূর জঙ্গলে অকারণে ছুটাছুটি করছে, ঠিক তখনই পাঁচ মিনিট পরে ডর্স্কি আবার ঢুকল টারজানের তাঁবুতে। নিজস্ব মতলবটাকে মনে মনে ঠিক করে নিয়েই সে এসেছে।

বন্দীর মুখের ভাব বদলে গেছে। কান পেতে কি যেন শুনছে। ডর্স্কিও কান পাতল। কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না। টারজানের অন্তর কিন্তু খুশিতে ভরে উঠেছে।

ডর্স্কি বলল, “আমি এসেছি তোমাকে শেষ সুযোগ দিতে। ওপার-এর স্বর্ণ-ভাণ্ডারের সন্ধানে কমরেড জাভেরি দু'বার সেখানে অভিযান চালিয়েছে ; দু'বারই ব্যর্থ হয়েছে। সকলেই জানে, ওপার-এর রত্ন-ভাণ্ডার কোথায় আছে তা তুমি জান এবং আমাদের সেখানে নিয়ে যেতেও পার। কথা দাও, কমরেড জাভেরি ফিরে এলেই তুমি একাজ করবে, তাহলে তোমার কোন রকম ক্ষতি করা তো হবেই না, উপরন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। আমার প্রস্তাব না মানলে তুমি মরবে।” কোমরের খাপ থেকে লম্বা ছুরিটা টেনে বের করল।

টারজান তবু পাথরের মত নিশ্চুপ। ছুরির সরু ফলাটা তার চোখের সামনে এনে ডর্স্কি বলল, “বেশ ভাল করে ভেবে দেখ। মনে রেখো, এই ফলাটা যখন তোমার পাঁজরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব তখন একটুও শব্দ হবে না। ফলাটা তোমার হৃৎপিণ্ডে ঢুকে যাবে, আর রক্ত বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকবে। তারপর ফলাটা বের করে ঘাটা জুড়ে দেব। বিকেলের দিকে দেখা যাবে তুমি মরে পড়ে আছ, আর নিগ্রোদের কাছে আমি জানাব যে হঠাৎ গুলি লেগে তুমি মারা গেছ। সত্য ঘটনা তোমার বন্ধুরা জানতেও পারবে না। তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধও কেউ নেবে না। বৃথাই তোমার জীবনটা যাবে।”

ছুরিটা টারজানের মুখের একেবারে কাছে এসে গেছে। হঠাৎ বন্যপশুর মত

টারজন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ইস্পাত-কঠিন চোয়াল দিয়ে চেপে ধরল ডর্স্কির কব্জি। সে ছিট্‌কে সরে গেল। অবশ আঙুলের ভিতর থেকে ছুরিটা মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টারজন তার আততায়ীকে লেঙ্গি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার পিঠের উপর চেপে বসল।

চীৎকার করে লোকজনদের ডাকতে ডাকতে ডর্স্কি বাঁ হাত দিয়ে কোমরের রিভলবারটা বের করতে চেষ্টা করল, কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারল যে দেহের উপর থেকে টারজনকে সরাতে না পারলে সে কাজ করা যাবে না।

তার কানে এল, লোকজন সব হৈ-হৈ করে ছুটে আসছে। তারপরই শুনতে পেল আতংকের চীৎকার। আর পরমুহূর্তেই মাথার উপর থেকে তাঁবুটা অদৃশ্য হয়ে গেল; ডর্স্কি সভয়ে দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড হাতি তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মুহূর্তের মধ্যে ডর্স্কিকে ছেড়ে দিয়ে টারজন পাশ ফিরে সরে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ডর্স্কিও রিভলবারে হাত দিল। টারজন চীৎকার করে বলল, "মার টাণ্টর, মার।"

হাতির ঝোলানো শুড়টা এসে ডর্স্কিকে পেঁচিয়ে ধরল। কুত্‌কুতে চোখ দুটো তীব্র ঘৃণায় জ্বলছে। কর্কশ গলায় চীৎকার করতে করতে ডর্স্কিকে মাথার উপর তুলে কয়েক পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিল শিবিরের মধ্যে। আতংকিত নিগ্রোরা ছুটে জঙ্গলে পালিয়ে গেল। টাণ্টর এগিয়ে গিয়ে দাঁত দিয়ে ডর্স্কির দেহটাকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এমনভাবে তাকে পায়ের নীচে পিষতে লাগল যে মাইকেল ডর্স্কি একটা রক্তাক্ত পিণ্ডে পরিণত হল।

ধীরে ধীরে সে শান্ত হল। হেলে দুলে টারজনের পাশে এসে দাঁড়াল। তার কথামত টারজনকে পিঠের উপর তুলে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল।

গভীর বনে ঢুকে টাণ্টর নরম ঘাসের উপর টারজনকে শুইয়ে দিল।

সেই সময় গাছের ডালে ডালে ঝুলতে ঝুলতে ছোট্ট নকিমাও সেখানে এসে হাজির হল।

তাকে দেখে টারজন বলল, "নীচে নেমে এস নকিমা; আমার হাতের বেড়ি খুলে দাও।"

নকিমা ছোট ছোট দাঁত দিয়ে চামড়ার বেড়ি কেটে দিল। এবার সে নিজের পায়ের বেড়ি কেটে ফেলল।

এবার টাণ্টর টারজনকে পিঠে তুলে নিল। নকিমাও মনিবের দেখাদেখি লাফিয়ে উঠল প্রথমে টাণ্টরের পিঠে, তারপর সেখান থেকে টারজনের কাঁধে।

তিন বন্ধু নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। গাছের ছায়া দীর্ঘতর হতে লাগল। বনের আড়ালে সূর্য অস্ত গেল।

১৬—"ফিরে যাও!"

একটানা কত যে দুঃখকষ্ট ওয়েনি কোণ্ট সহ্য করেছে, আর তার ফলে কত যে অসহনীয় চাপ পড়েছে তার দেহ-যন্ত্রের উপর সেটা বোঝা গেল যখন সে আবার জ্বরে পড়ল। দিনের পর দিন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, দিনের পর দিন বিকার দেখা দিচ্ছে, মাঝে মাঝে জ্ঞান ফিরে আসছে—এমনি করেই দিন চলেছে। মাঝে মাঝেই উদ্ভট সব ছবি ভেসে ওঠে চোখের সামনে—মুহূর্তের মধ্যে লা হয়ে যায় জোরা ড্রিনভ, কখনও হয় স্বর্গের দেবদূত, আবার কখনও বা রেডক্রসের নার্স। কিন্তু যে রূপেই সে আসুক, লা-র উপস্থিতি তার কাছে সদাই রমণীয়, সুখপ্রদ।

অগ্নি-দেবতার প্রধান সন্ন্যাসিনী হিসাবে প্রাচীন ওপার-এর অনেক তন্ত্রমন্ত্রই লা জানে। সারা দিন বন-জঙ্গলে ঘুরে সে সংগ্রহ করে ওষধি গাছ-গাছড়া ও শিকড়-বাকড়। সারা রাত সে সব জ্বালিয়ে পাচন তৈরী করে, কোণ্টকে খাওয়ায়। রোগীর পায়ের কাছে বসে বিচিত্র সুরে ও ভাষায় প্রার্থনা করে—উদয়-সূর্যের উদ্দেশে, মধ্যাহ্ন-সূর্যের উদ্দেশে, আবার অস্ত-সূর্যের উদ্দেশে।

এইভাবে দিন কাটে। অসহায় কোণ্ট শয্যাশায়ী। জাভেরি এগিয়ে চলেছে ইতালীয় সোমালিল্যাণ্ডের দিকে। মাথার ক্ষত সেরে যাওয়ায় টারজন চলেছে তাদেরই পথ ধরে।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন নিগ্রোকে টারজন মূল শিবিরে রেখে গিয়েছিল। একদিন সকালে হঠাৎ একটা দৃশ্য দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। শিবির প্রান্তের খোলা জায়গায় দেখা দিল একটা প্রকাণ্ড হাতি। তার মাথার উপর বসে আছে তাদের সাম্প্রতিক বন্দী টারজন। আর তার কাঁধে বসে একটা ছোট বানর কিচির-মিচির করছে। আতংকে চীৎকার করে লাফ দিয়ে নিগ্রোরা জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেল।

হাতির পিঠ থেকে নেমে টারজন ডর্স্কির তাঁবুতে ঢুকল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে এসেছে সেটা সফল হল। তার দড়ি ও ছুরি সেখানেই পেয়ে গেল। তীর-ধনুক ও বর্শা পেল নিগ্রোদের ঝুপড়িতে। সেগুলো নিয়ে যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই বেরিয়ে গেল।

এবার টারজনকে ছুটতে হবে দ্রুতগতিতে। তাই বলল, "আমি চললাম টাণ্টর। সাবধানে থেকো; বিশেষ করে মানুষ থেকে সাবধান, কারণ, প্রাণী জগতের তারাই বড় শত্রু।"

নকিমাকে কাঁধে নিয়ে সে বনের পথ ধরল।

এক সময় জাভেরির অগ্রগামী বাহিনীকে সে ধরে ফেলল। তখন রাত। শ্রান্ত লোকজনরা শিবিরে বসে আমোদ-ফূর্তি করছে। ব্যাপারটা যে জানে না

তার মনে হবে এটা বুঝি ফরাসী উপনিবেশ রক্ষীবাহিনীর শিবির।

গাছের উপর বসে টারজন সবই দেখল। ধনুকে একটা তীর জুড়ল। ছিলায় টংকার দিয়ে তীরটা ছুঁড়ে দিল। সেটা গিয়ে বিঁধল একটি শান্ত্রীর পায়ের গুলিতে। বিস্ময়ে ও বেদনায় চীৎকার করে সে মাটিতে পড়ে গেল। লোকজন এসে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। সেই ফাঁকে টারজন জঙ্গলের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

জাভেরি শুধাল, "তীরটা কে ছুঁড়েছে ?"

শান্ত্রী বলল, "জানি না।"

"শিবিরে এমন কেউ কি আছে যে তোমাকে মেরে ফেলতে চায় ?" জাভেরি বলল।

রোমেরো বলল, "থাকলেও সে তীর পাবে কোথায় ? আমাদের সঙ্গে তো তীর-ধনুক নেই।"

"তা বটে।"

"কাজেই এটা নিশ্চয় কোন বাইরের লোকের কাজ।"

অনেক কষ্টে আইভিচ ও রোমেরো তীরটা কেটে বের করে দিল। ওদিকে জাভেরি ও কিটেম্বো ঘটনাটা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল।

জাভেরি বলল, "এবার আমরা শত্রু-রাজ্যে প্রবেশ করেছি।"

কিটেম্বো রোমেরোকে বলল, "তীরটা দেখি। হয়তো ওটা থেকেই সব বোঝা যাবে।"

আগুনের পাশে নিয়ে তীরটাকে ভাল করে পরীক্ষা করে কাঁপা গলায় কিটেম্বো বলল, "খুব খারাপ।"

"মানে ?" জাভেরি প্রশ্ন করল।

"মূল শিবিরে যে সৈনিককে আমরা রেখে এসেছি তারই চিহ্ন আঁকা রয়েছে এই তীরে।"

"অসম্ভব," জাভেরি বলল।

কিটেম্বো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "অসম্ভব হলেও এটাই সত্য।"

জাভেরি ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "ঠিক আছে। কিন্তু একথা যেন বাইরে প্রচার না হয়। কিটেম্বো বা তুমি একথা কাউকে বলবে না।"

দুজনই ঘাড় নড়ল। কিন্তু দেখা গেল, আধ ঘণ্টার মধ্যেই কথাটা শিবিরময় রাষ্ট্র হয়ে গেছে। নিগ্রোরা কেমন যেন ভয়ে ভয়ে কথা বলছে, চলাফেরা করছে। ওদিকে আর একটা সেনাদলও চলেছে সেই জঙ্গলের পথ ধরে। সারাদিন হেঁটে রাতে তাদের অস্থায়ী শিবির পড়ল। আহারাদি শেষ করে শ' খানেক কালো সৈনিক ধুনির চারপাশে ইতস্তত শুয়ে বসে গল্প শুরু করল।

এমন সময় মাথার উপরকার গাছের ডাল থেকে একটি মূর্তি এসে নামল তাদের ঠিক মাঝখানে।

সঙ্গে সঙ্গে একশ' সৈনিক লাফ দিয়ে অস্ত্র হাতে নিল; কিন্তু পরমুহূর্তেই সহজভাবে থেমে গিয়ে গলা ছেড়ে বলে উঠল, "বাওয়ানা! বাওয়ানা!"

যেন কোন সম্রাট বা দেবতার সামনে তারা সকলেই নতজানু হল; যারা কাছে ছিল তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে তার হাত-পা স্পর্শ করল। ওয়াজিরিদের কাছে টারজন তো শুধু রাজা নয়, সে যে তাদের জীবন্ত দেবতা।

টারজন বলল, "খুব ভাল কাজ করেছ বাছারা। নকিমাও ঠিক মতই কাজটা করেছে। আমার চিঠিটা তোমাদের পৌঁছে দিয়েছে, আর যেখানে তোমাদের দেখা পাব বলে ভেবেছিলাম ঠিক সেখানেই তোমাদের পেয়ে গেলাম।"

মুভিরো বলল, "সব সময় আমরা নবাগতদের চাইতে একদিনের পথ এগিয়ে থাকি বাওয়ানা। শিবির ফেলি ওদের পথ থেকে বেশ কিছুটা দূরে, যাতে আমাদের শিবির ওদের চোখে না পড়ে।"

টারজন বলল, "আগামীকাল আমরা এখানেই তাদের জন্য অপেক্ষা করব। আজ রাতে টারজন তোমাদের বুঝিয়ে বলবে তার পরিকল্পনার কথা।"

পরদিন সকালে জাভেরির দলবল আবার যাত্রা শুরু করল। ঘণ্টাখানেক নির্বিঘ্নে কেটে গেল। কিটেম্বোর একজন কালো সৈনিক হঠাৎ থেমে গেল। পিছনে দাঁড়ানো কিটেম্বোকে বলল, "ওই দেখ!"

এগিয়ে গিয়ে কিটেম্বো দেখল, পথের উপর একটা তীরের ফলা মাটিতে ঢুকে আছে। তীরটাকে তুলে ভাল করে দেখে জাভেরিকে বলল, "সেই একই তীর। আমাদের ফিরে যাবার সতর্ক-বাণী।"

জাভেরি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, "ফুঃ! একটা তীর মাটিতে পোতা আছে বলে একটা সশস্ত্র বাহিনী থেমে যেতে পারে না। তুমিও যে এত বড় ভীরু তা ভাবি নি কিটেম্বো।"

"আমি ভীরু নই; তাই বলে মূর্খও নই। অরণ্যের বিপদ-সংকেত আমি তোমার চাইতে ভাল চিনি। সাহস দেখাতে আমরা এগিয়েই যাব। কিন্তু অনেকেই আর ফিরবে না। তোমার পরিকল্পনাও ব্যর্থ হবে।"

দুপুরের পরেই বিশ্রামের জন্য সকলে থামল। চুপচাপ ঠাণ্ডা খাবার খেল। হাসি নেই, গান নেই, কেমন যেন থমথমে ভাব।

হঠাৎ মাথার উপর থেকে একটি ভৌতিক কণ্ঠস্বর। বান্টু ভাষায় ঘোষণা করল: "মুলুঙ্গুব, সন্তানরা, ফিরে যাও। যদি বাঁচতে চাও তো ফিরে যাও। আর বিলম্ব না করে সাদা মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ কর।"

জাভেরি বলল, "ওটা কে? কি বলল?"

"আমাদের সতর্ক করে দিয়ে ফিরে যেতে বলল," কিটেম্বো জবাব দিল।

জাভেরি চমকে উঠল, "ফেরা হবে না। যাই ঘটুক, আমরা এগিয়ে যাবই। রোমেরো, মোরি ও তুমি দলের পিছনে চলে যাও। যে এগোতে আপত্তি করবে

তাকেই গুলি করবে।"

আপত্তি কেউ করল না। বিষণ্ণ মনে যার যার জায়গায় থেকে চলতে লাগল। সামনে অনেক দূর থেকে ভেসে এল সেই ভৌতিক কণ্ঠস্বর; "সাদা মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ কর।"

জাভেরি ও জোরা ড্রিনভ পাশাপাশি হাঁটছিল। চোখ-মুখ খিঁচিয়ে বলল, "ওই লোকটাকে যদি হাতের কাছে পেতাম তো এক গুলিতে—

বাধা দিল জোরা, "ভুলে যেয়ো না পিটার ওরা সংখ্যায় অনেক, আমরা কয়েকজন মাত্র। তাছাড়া, তোমার কৃপায় ওরা সশস্ত্র। আমার তো মনে হচ্ছে, যে ফ্রাংকেন্‌স্টিনকে তুমি সৃষ্টি করেছ শেষ পর্যন্ত সেই তোমাকে ধ্বংস করবে।"

জাভেরি গর্জে উঠল, "তুমি দেখছি কালা আদমিদের চাইতেও এক কাঠি উপরে; একটা উই-ঢিপিকে পর্বত বানিয়ে তুলছ। আমি যদি—"

তার কথা শেষ হবার আগেই দলের পিছন দিকে আকাশ থেকে ভেসে এল সেই কণ্ঠস্বর: "সাদা মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ কর।"

ইতিমধ্যে গোটা দল জঙ্গল পার হয়ে একটা খোলা জায়গায় পড়েছে। সেখানে তার মাথা-সমান উঁচু ঘাসের ভিতর দিয়ে চলতে লাগল। মাঝামাঝি পৌঁছবার পরেই গর্জে উঠল একটা রাইফেল। আর একটা। আরও একটা।

গুলি কারও গায়ে লাগে নি। তবু সেনাদলের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল। দেখা দিল বিশৃংখলা।

আবার সামনে সোনা গেল সেই সতর্ক-বাণী: "ফিরে যাও! এই শেষ সতর্ক-বাণী। অমান্য করলে মৃত্যু অনিবার্য।"

দলে ভাঙন দেখা দিল। রোমেরো গুলি করার হুকুম দিল। প্রত্যুত্তরে সামনের ঘাসের ভিতর থেকে গুলি চলল। এবার ডজনখানেক লোক পড়ে গেল—কেউ নিহত, কেউ আহত হল।

"আক্রমণ কর!" রোমেরো চেঁচিয়ে উঠল। কিন্তু লোকগুলো হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে পিছন দিকে ছুট দিল। তাদের দেখাদেখি অন্যরা ছুটতে লাগল। বিরক্ত হয়ে রোমেরো একাই পিছনে পড়ে রইল। কিন্তু কোথাও কোন শত্রুকে দেখতে পাচ্ছে না। এক পা এক পা করে সে আবার বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তার আগে আগে কে যেন হেঁটে যাচ্ছে। চিনতে পারল, সে জোরা ড্রিনভ।

জোরা বলল, "আমি তো ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ।"

রোমেরো হেসে বলল, "শুভলগ্নে আমার জন্ম হয়েছিল। আমার দুই পাশে, পিছনে কতজন গুলিতে মারা পড়ল। জাভেরি কোথায়?"

"জানি না," জোরা বলল।

"তাহলে সে পালিয়েছে।"

"হতে পারে।"

"কিন্তু এভাবে তোমাকে একা রেখে চলে যাওয়া ঠিক হয় নি।"

"নিজের বোঝা আমি নিজেই বইতে পারি," জোরা বলল।

"তাহলেও তুমি তার আপনজন," রোমেরো বলল।

"কি করে জানলে ?" জোরার প্রশ্ন।

"তা না হলে তুমি তার স্ত্রী হতে সম্মত হতে না।"

"আমি সম্মত হয়েছি তোমাকে কে বলল ?"

রোমেরো উত্তর দিল, "কমরেড জাভেরি তো প্রায়ই সগর্বে একথা বলে

"ওঃ, তাই বুঝি ?" জোরা আর কিছু বলল না।

১৭—সেতুবন্ধন

জাভেরির দলবল অনেক কষ্টে তাদের শেষ শিবিরে পৌঁছে গেল। কিন্তু রাত পর্যন্ত হিসাব করে দেখা গেল শতকরা পঁচিশজন তখনও নিখোঁজ: তাদের মধ্যে জোরা ও রোমেরোও আছে। একে একে যারাই শিবিরে এল তাদের প্রত্যেককে জাভেরি মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কেউ তাকে দেখে নি। সে নিজেই তার খোঁজে বের হতে চেয়েছিল, কিন্তু কেউ তার সঙ্গী হতে রাজী হল না।

শেষ পর্যন্ত হয়তো সে একাই বেরিয়ে পড়ত, কিন্তু আরও একটু রাত হতেই দু'জন এক সঙ্গে শিবিরে ঢুকল। তাদের দেখে জাভেরি যেমন স্বস্তি বোধ করল, তেমনি রাগও হল।

ধমক দিয়ে বলল, "তোমরা আমার সঙ্গে থাকলে না কেন ?"

"কারণ আমি তোমার মত ছুটতে পারি না," জোরা জবাব দিল। জাভেরি আর কিছুই বলল না।

শিবিরের উপরকার অন্ধকারের ভিতর থেকে ভেসে এল সেই পরিচিত সতর্ক-বাণী: "সাদা মানুষদের সঙ্গ ত্যাগ কর!" তারপর দীর্ঘ নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে কালা আদমিদের ফিস্‌ফিস্‌ আলোচনা। আবার সেই কণ্ঠস্বর: "তোমাদের দেশে ফিরে যাবার পথ সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত, কিন্তু সাদা মানুষদের পিছনে হাঁটছে মৃত্যু। তোমাদের উর্দি ছুঁড়ে ফেলে দাও; সাদা মানুষদের ছেড়ে দাও জঙ্গলের ও আমার হাতে।"

একটি কালা সৈনিক শরীর থেকে ফরাসী উর্দি খুলে ফেলে উনুনের আগুনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও তাই করতে লাগল।

"থাম!" জাভেরি চীৎকার করে বলল।

"চুপ কর সাদা মানুষ!" পাল্টা গর্জে উঠল কিটেম্বো।

"সাদাদের মেরে ফেল!" জনৈক বাসেম্বো সৈনিক চীৎকার করে বলল।

সবাই ছুটল সাদা মানুষদের লক্ষ্য করে। উপর থেকে আবার ভেসে এল সতর্ক-বাণী: "সাদা মানুষরা আমার লোক। তাদের আমার হাতেই ছেড়ে দাও।"

সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকরা থেমে গেল। জাভেরি রাগে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। সব্বাইকে গালাগালি করে বলল, "আমাকে কেউ সাহায্য করলে এ রকমটা ঘটত না। কিন্তু আমি একা তো সব কাজ করতে পারি না।"

"এ কাজটা তো তুমি একাই করেছ," রোমেরো বলল।

"কি বলতে চাও তুমি?"

"আমি বলতে চাই, একটা উদ্ধত গাধার মত কাজ করে তুমি সব্বাইকে শত্রু করে তুলেছ। তবু তোমার সাহসের উপর ভরসা থাকলে তারা তোমার সঙ্গেই চলত। একটা ভীরুকে অনুসরণ করতে কেউ চায় না।"

"তোমার এতদূর স্পর্ধা!" চীৎকার করে উঠে জাভেরি রিভলবারে হাত দিল।

রোমেরো ধমকের সুরে বলল, "ওটা থাক। তোমার আগেই ওটা আমার হাতে উঠে এসেছে। কান পেতে শোন, সেনোরিটা ড্রিনভ না থাকলে এই মুহূর্তে তোমাকে হত্যা করে অন্তত একটা পাগ্‌লা কুত্তার হাত থেকে জগৎটাকে মুক্ত করতাম।"

জোরা বলে উঠল, "এ সব কী পাগলামি হচ্ছে। একদল উচ্ছৃংখল কালা আদমির মধ্যে আমরা মাত্র পাঁচজন। কাল তারাও আমাদের ছেড়ে চলে যাবে। আমরা যদি প্রাণ নিয়ে আফ্রিকা থেকে ফিরে যেতে চাই তাহলে আমাদের এক সঙ্গে চলতে হবে। নিজেদের ঝগড়া ভুলে যাও; সকলের মুক্তির জন্য এক যোগে কাজ কর।"

"তোমার জন্যই তোমার কথা আমি মেনে নিলাম সেনোরিটা," রোমেরো বলল।

"কমরেড ড্রিনভ ঠিক কথাই বলেছে।"

বাকি রাতটা সুখে না হোক নির্বিঘ্নেই কাটল। সকালে দেখা গেল, সব কালা আদমি গা থেকে ফরাসী উর্দি খুলে ফেলেছে। পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্য একজনের সহাস্য চোখও সে দৃশ্য দেখল। কোন কালো ছোকরা সাদা মানুষদের সেবা করতে এল না। তারা নিজেরাই প্রাতরাশ তৈরী করল।

বিভিন্ন উপজাতির সর্দারদের নিয়ে তাঁবুতে ঢুকল কিটেম্বো। বলল, "আমাদের লোকজনকে নিয়ে আমরা দেশে ফিরে যাচ্ছি। তোমাদের খাবার তোমাদের

তাঁবুতেই রইল। আগামীকাল পর্যন্ত তোমরা এখানেই থেকো। তারপর যেখানে ইচ্ছা চলে যেয়ো।”

জাভেরি অনুনয়ের ভঙ্গীতে বলল, “কিন্তু এভাবে কুলি বা আস্কারি ছাড়া আমাদের ফেলে রেখে তোমরা যেতে পার না।”

কিটেম্বো বলল, “আজ আর তোমরা সে কথা বলতে পার না। তোমাদের ক্ষমতা আমরা বুঝে ফেলেছি। সব কাজেই তোমরা ব্যর্থ হয়েছ। এমন নেতাকে মেনে আমরা চলি না। তবে এই শ্বেতাঙ্গিনীকে ফেলে যাব না। সে আমার সঙ্গে যাবে।” বলেই সে জোরা ড্রিনভের হাত চেপে ধরে বলল, “চলে এস।”

বলতে বলতেই মাথার উপর দিয়ে শা করে কি যেন ছুটে এল, একটা তীর এসে বিঁধল কিটেম্বোর বুকে।

উপর থেকে কে যেন বলল, “কালো মানুষরা, যা বলছি কান পেতে শোন। তোমরা দেশে ফিরে যাও। সাদা মানুষদের এখানেই রেখে যাও। তাদের কোন ক্ষতি করো না। তারা আমার লোক। আমার কথা শেষ হল।”

বিস্ফারিত চোখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মৃত কিটেম্বোর দেহটাকে সেখানেই ফেলে রেখে কালা আদমিরা ফিরে গেল তাদের ঝুঁপড়িতে। যার যার গাঁঠরি কাঁধে ফেলে শিবির থেকে বেরিয়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করল। তাদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে সাদা মানুষগুলি চুপচাপ বসে রইল।

অনেকক্ষণ পরে আইভিচ বলল, “আচ্ছা, আমরা ওর লোক বলতে সে কি বোঝাতে চাইছে?”

জাভেরি বলল, “তা আমি কি করে জানব?”

রোমেরো হেসে বলল, “ওটা বোধহয় মানুষ-খেকো ভূত।”

মোরি বলল, “ঠাট্টা রাখ। এখন কাজের কথা বল।”

পরদিন সকালে পাঁচ শ্বেতমূর্তি ফিরে চলল তাদের মূল শিবিরে।

আর ঠিক একদিনের পথ আগে থেকে অন্য এক সোজা পথে টারজন ও তার ওয়াজিরি সেনারা চলল ওপাব-এর দিকে।

টারজন মুভিরোকে বলল, “লা হয়তো সেখানে নেই। কিন্তু ওআ ও ডুথ্‌কে আমি শাস্তি দিতে চাই, যাতে লা বেঁচে থাকলে একদিন না একদিন ওপার-এ ফিরে গিয়ে প্রধান সন্ন্যাসিনীর গদিতে বসতে পারে।”

কিন্তু আমাদের পিছন থেকে যে সাদা শত্রুরা আসছে তাদের কি করা হবে?” মুভিরো শুধাল।

টারজন বলল, “তাদেরও রেহাই দেবে না। তারা দুর্বল, জঙ্গলে অনভিজ্ঞ। চলে ধীর গতিতে। যে কোন সময় আমরা তাদের ধরে ফেলতে পারব। কিন্তু আমার চিন্তা লা-কে নিয়ে। সে আমাদের বন্ধু। এরা তো শত্রুমাত্র।”

বহু মাইল দূরে তাদের এই বন্ধুটি জঙ্গলের মধ্যে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে

পৌঁছল। একসময় সেখানে একটা বড় শিবির ছিল; এখন কয়েকটা ঝুপড়িতে কিছু কালা আদ্‌মি থাকে।

তার পাশাপাশি হাঁটছে ওয়েনি কোণ্ট। এতদিনে সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাদের পিছনে চলেছে সোনালী সিংহ জাদ্-বাল্-জা।

কোণ্ট বলল, "শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেলাম। তোমাকে ধন্যবাদ।"

লা বলল, "তা পেলাম। কিন্তু এটা যে জনশূন্য। তারা সকলেই চলে গেছে।"

"না। ডান দিকের ঐ ঝুপড়িগুলোতে কিছু লোক দেখতে পাচ্ছি।"

লা বলল, "ভালই হল। এবার তোমার কাছ থেকে বিদায় নেব।" তার গলায় বেদনার সুর।

কোণ্ট বলল, "বিদায় কথাটা আমার ভাল লাগে না। তবু আমি জানি তোমার মনটা কোথায় পড়ে আছে। যাই হোক, কৃতজ্ঞতা জানানো বৃথা, তবে আমার মনে যে কৃতজ্ঞতা বাসা বেঁধেছে সেটা তোমার অজানা থাকবার কথা নয়।"

লা বলল, "তা ঠিক; আমি যে একটি বন্ধু পেয়েছি সেটা জানাই যথেষ্ট।"

কোণ্ট বলল, "আমাকে সঙ্গে নিলে আমি খুশিই হতাম। ওপার-এ তোমার শত্রুর অভাব নেই। আমি পাশে থাকলে হয়তো তোমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারতাম।"

মাথা নেড়ে লা বলল, "তা হয় না। অন্য জগতের একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলাম বলেই আমার দেশের মানুষরা আমার প্রতি বিরূপ হয়েছিল। তুমি আমার সঙ্গে গেলে তারা আরও চটে যাবে। তাছাড়া, জাদ্-বাল্-জা ও আমি যদি সফল না হই, তাহলে তুমি সঙ্গে থাকলেও বেশী কিছু হবে না।"

একটি নারী ও একটি পশু পাশাপাশি চলে গেল ওপার-এর পথে। সেদিকে তাকিয়ে কোণ্টের গলায় কি যেন আটকে আসতে লাগল। আহা, এই সুন্দরী নারী ও সোনালী সিংহ যে তার কাছে সহৃদয়তা, শক্তি ও নির্জনতার প্রতীক।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে শিবিরে ফিরে গেল। কালো মানুষগুলি দুপুরের রোদেও ঘুমিয়ে আছে। তাদের ডেকে তুলল। কোণ্টকে দেখে তারা তো হতবাক। তারা যে ধরেই নিয়েছিল সে মারা গেছে।

* * *

ওপার-এর প্রান্তরে বিধ্বস্ত নগরীর দিকে হাঁটছে একটা নারী ও একটি সিংহ। তাদের পিছনে খাড়ির উঁচু মাথায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকেই লক্ষ্য রেখেছে আর একটি মানুষ। তার পিছনে একশ' সৈনিক পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে উপরে উঠছে। তারা এসে পাশে দাঁড়াতেই দীর্ঘদেহ মানুষটি আঙুল বাড়িয়ে বলল, "লা!"

"আর সুমাও", মুভিরো বলল। "সে পিছন পিছন হাঁটছে। কী আশ্চর্য

বাওয়ানা, সে কিন্তু আক্রমণ করছে না।"

টারজন বলল, "আক্রমণ করবে না। ও যে জাদ্-বাল্-জা।"

পিছনের হৈ-চৈ-এর শব্দ প্রথমে জাদ্-বাল্ জার কানেই ধরা পড়ল। থেমে সে মুখ ফেরাল। মাথাটা তুলল। কান খাড়া করল। নাক কুঁচকাল। তার পরই গাঁ-গাঁ করে ডেকে উঠল। লা দাঁড়িয়ে পিছন ফিরল। একটি অগ্রসরমান সেনাদলকে দেখে সে হতাশায় ভেঙে পড়ল। এতগুলি সৈনিকের হাত থেকে জাদ্-বাল্-জাও তো তাকে বাঁচাতে পারবে না। একবার ভাবল, জোরে ছুটে ওদের আগেই ওপার-এ ঢুকে যাবে। কিন্তু এখনও যে অনেকটা পথ বাকি। এতটা পথ সে তো ওদের চাইতে আগে পার হতে পারবে না।

দলটা এগিয়েই আসছে। হঠাৎ লা-র নজরে এল, যে লোকটি সকলের আগে আগে আসছে তার গায়ের রং অনেকটা ফর্সা। লা-র বুকের ভিতরে কি যেন লাফিয়ে উঠল। সে চিনতে পেরেছে। ওপার-এর সন্ন্যাসিনীর চোখে জলের ধারা নেমে এল। চীৎকার করে বলল, "ওই তো টারজন! জাদ্-বাল-জা, ওই তো টারজন!"

হয়তো জাদ্-বাল্-জাও মনিবকে চিনতে পারল। এক ছুটে এগিয়ে গেল। টারজনের সামনে গিয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল। তার কাঁধে দুই থাবা রেখে আদর করে গলাটা চাটতে লাগল। তাকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে টারজন লা-র দিকে এগিয়ে গেল।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, "শেষ পর্যন্ত—"

লা বলল, "হ্যাঁ. শেষ পর্যন্ত তুমি শিকার করে ফিরে এলে।"

টারজন বলল, "আমি তখনই ফিরেছিলাম, কিন্তু তুমিই চলে গিয়েছিলে।"

"তুমি ফিরে এসেছিলে? তা যদি জানতাম তাহলে তো আমি অনন্তকাল সেখানেই অপেক্ষা করে থাকতাম।"

"তোমার তো জানা উচিত ছিল যে ওভাবে তোমাকে ফেলে যেতে আমি পারি না।"

"লা খুবই দুঃখিত।"

"সেই থেকে তুমি ওপার-এ ফিরে যাও নি?"

"এই তো ফিরে যাচ্ছি। কি জান, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাছাড়া, একটি রুগ্ন, দুর্বল সাদা মানুষ ছিল সঙ্গে। যতদিন না তার জ্বর ছাড়ল, গায়ে বল ফিরে এল, ততদিন সে আমার সঙ্গেই ছিল, কারণ আমি ভেবেছিলাম সে হয় তো টারজনের বন্ধু।"

"তার নাম কি?"

"ওয়েনি কোল্ট।"

টারজন হাসল। শুধাল, "তাকে তোমার ভাল লেগেছিল লা?"

লা বলল, "খুবই ভাল লেগেছিল। কিন্তু টারজনকে যে রকম ভাল লাগে সে রকমটা নয়।"

টারজন সস্নেহে লা-র কাঁধে হাত রাখল। অস্ফুট স্বরে বলল, "সেই চিরকালের লা! তারপরই কি যেন মনে পড়তে ওপার-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে উঠল, "চল। রাণী এবার ফিরে যাবে তার সিংহাসনে।"

ওপার-এর অদৃশ্য চোখগুলি অগ্রসরমান দলটিকে দেখতে পেল। লা, টারজন ও ওয়াজিরিদের তারা চিনতে পারল। অনেকে জাদ্-বাল্-জাকেও চিনল। ওআ ভয় পেল। ডুথ্ কাঁপতে লাগল। ছোট নাও-এর বুক খুশিতে ভরে উঠল।

অভিযাত্রীরা বহিঃপ্রাচীরের প্রাঙ্গণে ঢুকল। একটি প্রাণীও তাদের বাধা দিল না। আসলে ওআ-র অত্যাচার আর ডুথ্-এর নিবুর্দ্ধিতায় ওপার-এর সকলেই তাদের উপর বিরূপ হয়েইছিল। তাই ধ্বংস-নগরীর অন্ধকারের ভিতর থেকে বহু কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল অভিযাত্রীদের প্রতি সাদর আহ্বান ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি।

দরবার-কক্ষে ঢুকে যে দৃশ্য তাদের চোখে পড়ল তাতেই সব কিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। রক্তাপ্লুত অবস্থায় পড়ে আছে ওআ ও ডুথ-এর মৃতদেহ; পাশেই ছ'টি সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর মৃতদেহ। আর কেউ কোথাও নেই।

অগ্নি-দেবতার প্রধান সন্ন্যাসিনী লা আর একবার ওপার-এর রাণী হয়ে সিংহাসনে বসল।

সেদিন রাতে অরণ্যরাজ টারজন ওপার-এর সোনার থালায় আহার্য গ্রহণ করল। সুন্দরী তরুণীরা পরিবেশন করল মাংস, ফল ও অমৃতস্বাদ দ্রাক্ষারস।

পরদিন সকালে টারজন ফিরে চলল দলবল নিয়ে। তার কাঁধের উপর ছোট্ট নকিমা, পাশে সোনালী সিংহ, আর পিছনে একশ' ওয়াজিরি সৈন্য।

* * *

দীর্ঘ একঘেয়ে পথ চলার পর সাদা মানুষদের ক্লান্ত অবসন্ন দলটা তাদের মূল শিবিরে ফিরে এল। সকলের আগে জাভেরি ও আইভিচ, তাদের পিছনে জোরা ড্রিনভ, বেশ কিছুটা দূরে পাশাপাশি রোমেরো ও মোরি। এই ভাবেই দীর্ঘ পথ তারা পার হয়ে এসেছে।

তাদের আসতে দেখে কোল্ট এগিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্বলে উঠল জাভেরি। চীৎকার করে বলল, "বিশ্বাসঘাতক! তোমাকে শেষ করাই আমার জীবনের শেষ কাজ।" রিভলবার বের করে নিরস্ত্র কোল্টকে লক্ষ্য করে

প্রথম গুলিটা কোল্টের গা ঘেসড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু দ্বিতীয়বার গুলি করার সময় আর জাভেরি পেল না। তার পিছন থেকে গর্জে উঠল আর একটা আগ্নেয়াস্ত্র। পিটার জাভেরির হাত থেকে পিস্তলটা পড়ে গেল। এক হাতে

পিঠ চেপে ধরে সে মাতালের মত টলতে লাগল।

আইভিচ বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল। "হা ভগবান, এ তুমি কী করলে জোরা?"

জোরা বলল, "যা করতে বারো বছর অপেক্ষা করেছিলাম। শৈশব পার হবার পর থেকেই যে কাজটি করার জন্য বেঁচে আছি।"

ওয়েনি কোল্ট ছুটে গিয়ে জাভেরির রিভলবারটা মাটি থেকে তুলে নিল। ততক্ষণে রোমেরো ও মোরিও ছুটে এসেছে।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জাভেরি হিংস্র চোখে চারদিক তাকাতে তাকাতে বলল, "কে? কে আমাকে গুলি করল?"

"আমি," জোরা ড্রিনভ বলল।

"তুমি!" জাভেরি ঢোক গিলল।

হঠাৎ ওয়েনি কোল্টের দিকে ফিরে জোরা বলতে লাগল, "সব কথা তোমার জানা দরকার। আমি কম্যুনিষ্ট নই, কোনো দিন ছিলাম না। এই লোকটা আমার বাবাকে, মাকে, আর দাদা ও দিদিকে খুন করেছে। আমার বাবা ছিল—কিন্তু সে কথা থাক। এতদিনে তার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিলাম।" তীব্র দৃষ্টিতে জাভেরির দিকে তাকিয়ে বলল, "গত কয়েক বছরে অনেকবারই তোমাকে মারতে পারতাম, কিন্তু মারি নি। কারণ তোমার জীবনের চাইতেও বেশী কিছু আমি চেয়েছিলাম। গোটা বিশ্বের সুখ-শান্তিকে ধ্বংস করার যে জঘন্য পরিকল্পনা তুমি এবং তোমার মত লোকরা করেছিল, আমি চেয়েছিলাম সেটাকে ব্যর্থ করার কাজে সাহায্য করতে।"

পিটার জাভেরি উঠে বসল। বিস্ফারিত চোখ দুটি চকচক করছে। হঠাৎ সে খক্‌-খক্‌ করে কাসল। মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠতে লাগল। তার পরই সে ঢলে পড়ল মৃত্যুর কোলে।

খোলা জায়গাটার ওপারে জঙ্গলের প্রান্তে এসে দাঁড়াল একটি মূর্তি। এক মুহূর্ত আগেও সে সেখানে ছিল না। নিঃশব্দে সে যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছে। জোরা ড্রিনভই তাকে প্রথম দেখতে পেল। তার মুখ দিয়ে একটা সবিস্ময় চীৎকার বেরিয়ে এল। সকলেই ফিরে তাকাল। চিতার চামড়ার লেংটি-পরা একটি সাদা মানুষ এগিয়ে আসছে। তার চলনে সিংহের সাবলীল গতি-ভঙ্গী।

"ওকে?" কোল্ট প্রশ্ন করল।

জোরা বলল, "কে তা জানি না, তবে এটুকু জানি যে জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেললে সেই আমার প্রাণরক্ষা করেছিল।"

লোকটি সামনে এসে দাঁড়াল।

"কে তুমি?" ওয়েনি কোল্ট শুধাল।

"আমি অরণ্যরাজ টারজন। এখানে যা কিছু ঘটেছে সব আমি দেখেছি, শুনেছি।" জাভেরির মৃতদেহ দেখিয়ে বলল, "ওই লোকটা যে মতলব ফেঁদেছিল তা ভেস্তে গেছে, সেও মারা গেছে। এই মেয়েটি নিজেই বলেছে সে তোমাদের কেউ নয়। কিছুটা দূরেই আমার লোকরা শিবির ফেলেছে। একে আমি তাদের কাছে নিয়ে যাব ; সে যাতে সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করব। তোমরা আর যারা আছ তাদের জন্য আমার কোন সহানুভূতি নেই। তোমরা জঙ্গল থেকে চলে যেতে পার। আমার কথা শেষ।"

"কিন্তু এই মার্কিন ভদ্রলোক ওদের সঙ্গে যাবে না," জোরা বলল।

"যাবে না? কেন?" টারজন জানতে চাইল।

"কারণ সে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন স্পেশ্যাল এজেন্ট।"

সকলেই সবিস্ময়ে জোরার দিকে তাকাল। কোল্ট বলল, "এ কথা তুমি কেমন করে জানলে?"

"শিবিরে এসে প্রথম যে চিঠিটা তুমি পাঠিয়েছিলে সেটা জাভেরির একজন লোকের হাতে পড়েছিল। এখন বুঝতে পারলে?"

"হ্যাঁ।"

"সেই জন্যই জাভেরি তোমাকে বিশ্বাসঘাতক ভেবে খুন করতে চেয়েছিল।"

কালা আদমিরা এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। তাদের ভাষায় টারজন বলল, "তোমাদের দেশ আমি চিনি। উপকূলে যাবার রেলপথের শেষে সে দেশ অবস্থিত।"

তাদের একজন বলল, "ঠিক বলেছ হুজুর।"

"রেলপথের শেষ পর্যন্ত এই সাদা মানুষটিকে তোমরা সঙ্গে নিয়ে যাও। তার খাবার ব্যবস্থা করে দিও। আর কোন রকম ক্ষতি করো না। তারপর তোমাদের দেশ থেকে তাকে চলে যেতে বলো।" তারপর সাদা মানুষদের দিকে ফিরে বলল, "আপাতত তোমরা আমার সঙ্গে শিবিরেই চল।"

সকলে ফিরে চলল। অন্যদের থেকে একটু পিছিয়ে পড়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল জোরা ড্রিনভ ও ওয়েনি কোল্ট।

জোরা বলল, "আমি তো ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ।"

"আমি তো ভাবছিলাম তুমি মরে গেছ," কোল্ট বলল।

জোরা আবার বলল, "আর সব চাইতে দুঃসংবাদ কি জান, জীবিত বা মৃত কোন অবস্থাতেই আমার মনের কথাটি তোমাকে বলতে পারব না।"

কোল্ট নীচু গলায় বলল, "আর আমি ভেবেছিলাম, তোমার-আমার মধ্যে যে ব্যবধান তার উপর একটা সেতু গড়ে তুলতে যে প্রশ্নটা তোমাকে করতে চাই তা কোন দিন করা হবে না।"

জোরা ঘুরে দাঁড়াল। দুই চোখ জলে ভরা। ঠোঁট কাঁপছে। বলল,

"আর আমি ভাবছিলাম, জীবিত বা মৃত কোন অবস্থাতেই তোমায় সে প্রশ্নের জবাবে কোন দিন হ্যাঁ বলতে পারব না।"

দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরল। ঠোঁটে ঠোঁট মিলল। একটা বাঁক ঘুরে তারা সকলের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেল।

টারজন অ্যাণ্ড দি লস্ট এম্পায়ার

লুপ্ত সাম্রাজ্যে টারজন

মনিবের খোলা বাদামী কাঁধের উপর নকিমা উত্তেজিতভাবে নাচতে শুরু করে দিল। অনবরত কিচির-মিচির করছে, আর একবার টারজনের মুখের দিকে একবার জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছে।

ওয়াজিরিদের ছোট সর্দার মুভিরো বলল, "কে যেন আসছে বাওয়ানা; নকিমা ঠিক শুনতে পেয়েছে।"

"টারজনও শুনেছে।"

মুভিরো বলল, "বড় বাওয়ানার কান তো হরিণের মতই তীক্ষ্ণ।"

টারজন হেসে বলল, "তা যদি না হত তাহলে আজ টারজনকে এখানে দেখতেই পেতে না। তার মা কালা যদি তাকে মুলুঙ্গুর দেওয়া সবগুলি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার না শেখাত তাহলে আজ সে এত বড় মানুষটি হতে পারত না।"

"কে আসছে?" মুভিরো শুধাল।

"একদল মানুষ," টারজন জবাব দিল।

আফ্রিকার মানুষটি বলল, "হয়তো তারা আমাদের বন্ধু নয়। সৈনিকদের সতর্ক করে দেব কি?"

টারজন তাকিয়ে দেখল, ছোট তাঁবুতে জনবিশেক সৈনিক সন্ধ্যাবেলার খাবার তৈরী করছে। ওয়াজিরিদের প্রথামত তাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো হাতের কাছেই মজুত আছে।

বলল, "না, তার দরকার হবে বলে মনে হয় না। ওরা শত্রুর মত লুকিয়ে আসছে না, আর ওরা সংখ্যায়ও এত বেশী নয় যাতে আমরা ভয় পেতে পারি।"

নকিমার ভয় কিন্তু তবু গেল না। বানরদের ভাষায় সে চেঁচিয়ে বলল, "পালাও, পালাও! অদ্ভুত সব গোমাঙ্গানিরা আসছে। ছোট্ট নকিমাকে তারা মেরে ফেলবে।"

টারজন বলল, "কোন ভয় নেই নকিমা। টারজন ও মুভিরোই তো রয়েছে।"

নকিমা কিচির-মিচির করে বলল, "অদ্ভুত টারমাঙ্গানির গন্ধ যেন পাচ্ছি। টারমাঙ্গানিরা গোমাঙ্গানির চাইতেও খারাপ। বজ্র-দণ্ড হাতে করে এসে তারা

নকিমা ও তার ভাই-বোনদের মারে। মাঙ্গানিদের মারে। গোমাঙ্গানিদেরও মারে। হাতের বজ্র-দণ্ড দিয়ে সব্বাইকে মারে। তাই তো নকিমা ভয় পেয়েছে।"

জঙ্গলের অন্যসব অধিবাসীদের মতই নকিমার কাছে টারজন টারমাঙ্গানি অর্থাৎ সাদা মানুষ নয়। সে জঙ্গলের মানুষ, তাদেরই একজন। বড় জোর তাকে তারা মাঙ্গানি অর্থাৎ গোরিলা বলে মেনে নিতে পারে।

তাঁবু থেকে প্রথম দেখা গেল একটি দীর্ঘদেহ নিগ্রো সৈনিককে। ওয়াজিরিদের দেখেই সে থেমে গেল। একটু পরে একটি দাড়িওয়ালা সাদা মানুষ এসে তার পাশে দাঁড়াল।

তাঁবুটাকে ভাল করে লক্ষ্য করে সাদা মানুষটি শান্তির চিহ্ন দেখিয়ে এগিয়ে গেল। জঙ্গলের ভিতর থেকে একডজন বা তারও বেশী সৈনিক তাকে অনুসরণ করল। তাদের বেশীর ভাগই কুলি; সঙ্গে মাত্র তিন-চারটে রাইফেল।

টারজন এবং ওয়াজিরিরা এবার বুঝতে পারল যে দলটা ছোট ও নিরীহ। ভয়ের কোন কারণ নেই।

দাড়িওয়ালা লোকটি এগিয়ে আসতেই টারজন সোল্লাসে বলল, "ডক্টর ভন হাবুবেন! প্রথমে তো তোমাকে চিনতেই পারি নি।"

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে ভন হাবুবেন বলল, "অরণ্যরাজ টারজন, ঈশ্বর আমার প্রতি সদয়। তোমার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে পুরো দু'দিন আগেই তোমার দেখা পেয়ে গেলাম।"

টারজন বলল, "একটা গরু-খাদকের খোঁজে আমরা বেরিয়েছি। সম্প্রতি বেশ কয়েক রাতেই সে আমাদের গ্রামে হানা দিয়ে কয়েকটা সেরা গরু-মোষকে মেরেছে। কিন্তু সে ব্যাটা ভীষণ ধূর্ত। মনে হচ্ছে, একটা বুড়ো সিংহই টারজনের চোখকে ফাঁকি দিয়ে চলেছে। কিন্তু তুমি কেন টারজনের দেশে এসেছ ডাক্তার? আশা করি আমার বন্ধুটির কোন বিপদ দেখা দেয় নি; প্রতিবেশীর সঙ্গে সৌজন্যমূলক সাক্ষাতেই তোমরা এসেছ।"

ভন হাবুবেন বলল, "তা হলেই তো ভাল হত। কিন্তু আসলে আমরা এসেছি তোমার সাহায্য পাবার আশায়। আমি বিপদে পড়েছি—গুরুতর বিপদ।"

"আশা করি তুমি বলবে না যে আরবরা আবার নেমে এসেছে তোমাদের ক্রীতদাস বা হাতির দাঁত চুরি করতে, অথবা চিতা-মানুষরা রাতের বেলা পথের পাশে ওৎ পেতে থেকে তোমার লোকজনদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে?"

"না, তার কোনটাই নয়। আরও বেশী ব্যক্তিগত দরকারেই তোমার কাছে এসেছি। আমার ছেলে এরিকের ব্যাপারে। তাকে তো তুমি কখনও দেখ নি।"

টারজন বলল, "না। কিন্তু তোমরা খুব ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত। এইখানে তাঁবু ফেল। খাবার তৈরী। খেতে খেতেই তোমার সব কথা শোনা যাবে।"

ভন হাবুবেনই শুরু করল। "তোমার সঙ্গে দেখা করার মূল উদ্দেশ্যের

ভূমিকা হিসাবে কয়েকটা কথা বলে নিতে চাই। এরিক আমার একমাত্র ছেলে। চার বছর আগে উনিশ বছর বয়সে সম্মানের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম শেষ করে প্রথম ডিগ্রিও পেয়েছে। সেই থেকে ইওরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা নিয়েই দিন কাটিয়েছে এবং প্রত্নতত্ত্ব ও অপ্রচলিত প্রাচীন ভাষায় বিশেষ জ্ঞানলাভ করেছে। এ ছাড়া পর্বতারোহণে তার বিশেষ ঝোঁক আছে এবং গ্রীষ্মের ছুটিতে ছুটিতে আল্‌প্‌স্ পর্বতের প্রতিটি শৃঙ্গে সে আরোহণ করেছে।

"কয়েক মাস আগে সেই একই উদ্দেশ্যে সে আমার কাছে এসেছিল, এসেই আমাদের জেলায় এবং কাছাকাছি অঞ্চলে ব্যবহৃত কয়েকটি উপজাতির বিভিন্ন বান্টু কথ্য ভাষার প্রতি সে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

"সেই বিষয়ে উপজাতিদের মধ্যে গবেষণা চালাতে গিয়ে ওয়াইরামওয়াজি পর্বতমালার লুপ্ত উপজাতির প্রাচীন উপকথার বিষয় সে জানতে পারে, আর সেই থেকেই তার মনে বিশ্বাস জন্মেছে যে এই উপকথার কোন বাস্তব ভিত্তি আছে, আর তা নিয়ে গবেষণা চালাতে পারলে হয়তো বাইবেলীয় যুগের লুপ্ত উপজাতিদের কোন বংশধরদের দেখাও মিলে যেতে পারে।"

টারজন বলল, "সে উপকথা আমি ভাল করেই জানি, আর তা নিয়ে অনুসন্ধান চালাবার ইচ্ছাও অনেকবার হয়েছে, কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে তা আর ঘটে ওঠে নি।"

ডাক্তার আবার বলতে লাগল, "আমিও স্বীকার করছি যে সে ইচ্ছা আমার মনেও অনেকবার জেগেছে। ওয়াইরামওয়াজি পর্বতমালার সানুদেশে বাগেগো উপজাতির যে সব লোক বাস করে তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে বার দুই কথাও বলেছি। তারাও জোর দিয়ে বলেছে যে ঐ বিরাট পর্বতমালার অভ্যন্তরে কোন স্থানে সাদা মানুষদের একটি উপজাতি বাস করে। তারা প্রত্যেকেই আরও বলেছে যে, স্মরণাতীতকাল থেকে তারা ঐ উপজাতির লোকদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছে এবং শান্তিপূর্ণ ব্যবসা এবং পর্বতারোহীদলের যুদ্ধকালীন অভিযান উপলক্ষ্যে সেই লুপ্ত জাতির অনেক মানুষের সঙ্গেই তাদের দেখাও হয়েছে।

"ফলে এরিক যখন ওয়াইরামওয়াজিতে একটা অভিযানের প্রস্তাব করল তখন আমি বরং তাকে উৎসাহই দিয়েছি, কারণ এ ধরনের একটা অভিযান পরিচালনার পক্ষে সেই তো সবচাইতে উপযুক্ত লোক। সে বান্টুদের কথ্য ভাষা জানে, উপজাতিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে। আর পর্বতারোহণের যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও তার আছে।

"মোটকথা, আমার বিশ্বাস এ অভিযান পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই আদর্শ পরিচালক; তবে আমার একমাত্র দুঃখ যে, এ সময় আমি তার সঙ্গে যেতে পারি নি। অবশ্য দরকারী মালপত্র ও খাবার-দাবারের সংস্থান করে এই

অভিযানের আয়োজনের ব্যাপারে আমি তাকে সর্ব রকমে সাহায্য করেছি।”

“কিন্তু যাত্রার পরে কিছুদিন যেতে না যেতেই আমি খবর পেয়েছি যে তার দলের কিছু লোক নিজ নিজ গ্রামে ফিরে এসেছে। তাদের সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা আমাকে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু যে সব কথা আমার কানে এসেছে তাতে পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে আমার ছেলের সময় ভাল যাচ্ছে না; কিছু গোলমাল দেখা দিয়েছে। সুতরাং স্থির করলাম, একটা সাহায্যকারী দল নিয়ে তার কাছে যাব। কিন্তু সারা জেলা ঘুরে ওয়াইরামওয়াজি পর্বতে যাবার মত মাত্র এই ক'টি লোককে যোগাড় করতে পেরেছি, কারণ তাদের ধারণা যে ওয়াইরামওয়াজির লুপ্ত উপজাতিরা একদল রক্তচোষা প্রেত। তখনই বুঝলাম যে এরিকের দল ছেড়ে যারা চলে এসেছে তারাই জেলার সর্বত্র এই আতংক ছড়িয়েছে।”

“এই পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই আমাকে অন্যত্র সাহায্য খুঁজতে হচ্ছে, আর স্বভাবতই এই দুরবস্থায় অরণ্যরাজ টারজনের কথাই আমার প্রথম মনে হয়েছে। ... এখন বুঝতে পারছ কেন আমি এখানে এসেছি।”

তার কথা শেষ হতেই টারজন বলল, “আমি তোমাকে সাহায্য করব ডাক্তার।”

ভন হারবেন বলল, “খুব ভাল কথা! আমি জানতাম তোমার সাহায্য পাব। যতদূর মনে হচ্ছে এখানে তোমার লোকের সংখ্যা প্রায় কুড়ি, আর আমার সঙ্গে আছে চোদ্দ। আমার লোকরা তল্পিবাহকের কাজ করতে পারবে, আর তোমার লোকরা তো আফ্রিকার সেরা যোদ্ধা বলে পরিচিত। তোমার নির্দেশে আমরা অচিরেই পথের হদিস পেয়ে যাব, আর ছোট হলেও যে দলটি আমাদের সঙ্গে যাবে তাদের নিয়ে এমন কোন দেশ নেই যেখানে আমরা যেতে পারব না।”

টারজন মাথা নেড়ে বলল, “না ডাক্তার, আমি একাই যাব। সেটাই আমার চিরকালের রীতি। একা হলে আমি অনেক দ্রুত যেতে পারব; আর আমি যখন একা থাকি তখন অরণ্য আমার কাছে কিছুই গোপন করে না—ফলে বহুজনের সঙ্গী হওয়ার পরিবর্তে একা হলেই পথের অনেক বেশী খবর আমি পাই। তুমি তো জান জংলী লোকরা আমাকে তাদের আপনজন বলে মনে করে। অন্য লোক দেখলেই তারা দূরে সরে যাবে, কিন্তু আমার কাছ থেকে দূরে যাবে না।”

ভন হারবেন বলল, “তুমি ভাল করেই বোঝ যে আমি তোমার সঙ্গেই যেতে চাই। আমার যা কর্তব্য সেটুকু করতে চাই। তবে তুমি না বললে আমাকে তা মানতেই হবে।”

“তুমি তোমার মিশনে ফিরে যাও ডাক্তার; সেখানেই আমার চিঠির জন্য অপেক্ষা করে থেকো।”

ভন হার্বেন বলল, "তুমি কি কাল সকালেই ওয়াইরামওয়াজি পর্বতে যাত্রা করবে ?"

"এখনই যাত্রা করব," টারজন বলল।

"কিন্তু অন্ধকার হয়ে এসেছে যে," ভন হার্বেন আপত্তি জানাল।

টারজন বলল, "সামনেই ভরা চাঁদের রাত ; তার সুযোগ আমি নিতে চাই। দিনের গরমে শুয়ে বিশ্রাম করব।" মুভিরোর দিকে ঘুরে বলল, "মুভিরো, আমার সৈন্যদের নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। প্রয়োজন হলে আমি ডাকলেই যাতে তাদের পাই সেই ভাবে ওয়াজিরির প্রতিটি সৈনিককে সর্বদা প্রস্তুত রেখো।"

মুভিরো বলল, "তাই হবে বাওয়ানা। তোমার খবরের জন্য আমরা কতদিন অপেক্ষা করে থাকব ?"

"নকিমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি ; দরকার হলেই তাকে পাঠিয়ে দেব ; সেই তোমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

"তাই হবে বাওয়ানা," মুভিরো বলল।

টারজন তার ধনুক ও তীর-ভর্তি তূনীর পিঠে ঝুলিয়ে নিল ; বাঁ কাঁধ ও ডান বগলের নীচে জড়িয়ে নিল ঘাসের দড়িটা ; কোমরে ঝোলাল স্বর্গত পিতার শিকারী ছুরি। ছোট বর্শাটা হাতে নিয়ে মাথা সোজা করে দাঁড়াল। বাতাসে ঘ্রাণ নিল। তামাটে চামড়ার উপর আগুনের ঝিলিমিলি।

এক মুহূর্ত সেইভাবে দাঁড়িয়ে ছোট্ট নকিমাকে সঙ্গে নিয়ে একটি বিদায়-বাণীও উচ্চারণ না করে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে টারজন জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল। সে দৃশ্য দেখে ভন হার্বেনের মনে পড়ল জঙ্গলের আর একটি শক্তিমান প্রাণীর কথা—সে নুমা, পশুরাজ সিংহ।

২

ওয়াইরামওয়াজি পর্বতের গায়ে তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে এরিক ভন হার্বেন একটা পরিত্যক্ত শিবিরের দিকে তাকাল।

প্রথম ঘুম ভাঙতেই চারদিকে অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা তার মনে একটা গোলমালের পূর্বাভাষ জাগিয়ে তুলেছিল। খাস খানসামা গাবুলাকে বার বার ডেকেও কোন সাড়া না পেয়ে সেটা আরও বেড়ে গেল।

অভিযাত্রী দলটি যতই ওয়াইরামওয়াজির দিকে এগোচ্ছিল ততই একজন-দু'জন করে দল থেকে সরে পড়ছিল ; ফলে গতকাল সন্ধ্যায় পাহাড়ের গায়ে এই তাঁবুটা যখন গড়ে তোলা হয় তখন অল্প কয়েকজন আতংকিত লোকই তাতে ঢুকেছিল। এখন রাতের অন্ধকারে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের প্রভাবে তারাও শিবির ছেড়ে চলে গেছে ; এখানকার ভয়াবহ পরিবেশে এখানে আছে শুধু তাদের মনিব।

তাড়াতাড়ি খোঁজ-খবর করতেই দেখা গেল, লোকজনরা ভন হারবেনের সব কিছু নিয়ে সরে পড়েছে। সমস্ত খাবার-দাবার, রাইফেল ও গুলি তারা সঙ্গে নিয়ে গেছে। রেখে গেছে শুধু একটা লাজার পিস্তল ও এমুনিশন বেল্ট ; এ দুটি বস্তু তাঁবুতে তার নিজের কাছেই ছিল।

ভন হারবেন পাহাড়ের উৎরাইয়ে বনের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। দূরের ওই বনের পথ ধরেই তার লোকজনরা দেশের দিকে ছুটে চলেছে। এখনও চেষ্টা করলে হয়তো সে তাদের ধরে ফেলতে পারে : তবে ধরতে যে পারবেই সে কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। আর তা না পারলে একাকি ওই বনের মধ্যে থাকাটা এখানে পাহাড়ের ঢালুতে বাস করার চাইতে ভাল কিছু হবে না।

মুখ ফিরিয়ে দূরের উঁচু পাহাড় শ্রেণীর দিকে তাকাল। যে উদ্দেশ্য নিয়ে এত দীর্ঘ পথ পার হয়ে এসেছে ঐ দিগন্ত-রেখার কোথাও না কোথাও রয়েছে সেই অভিষ্ট লক্ষ্যস্থল। কাজেই পরাজয়কে মেনে নিয়ে কিছুতেই সে ফিরে যাবে না। এই দুর্গম পাহাড়ি পথে একদিন বা একটা সপ্তাহ চললেই হয়তো লুপ্ত উপজাতির প্রচলিত কাহিনীর আসল সত্যটা জানা যাবে ; আর মাসখানেক ধরে অনুসন্ধান চালালেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে সে কাহিনীর প্রচলিত অলৌকিকতার কোন ভিত্তিই নেই। ভন হারবেনের দৃঢ় বিশ্বাস, মাসখানেক অনুসন্ধান চালাতে পারলেই সে মনুষ্য বসতির সন্ধান পেয়ে যাবে, তার বেশী বড় জোর পাওয়া যাবে উপকথায় বর্ণিত উপজাতির কিছু ধ্বংসাবশেষ—কিছু ধ্বংসস্তূপ ও ভাঙা কবর। ভন হারবেনের শিক্ষা ও বুদ্ধি তাকে এটুকু অন্তত শিখিয়েছে যে লুপ্ত জাতির কাহিনীটা কিছু ভাঙা বাড়ি-ঘর ও ধ্বংসপ্রায় কংকালকে ঘিরে গড়ে ওঠা অস্পষ্ট স্মৃতি-কথা ছাড়া অন্য কিছুই হতে পারে না।

সুতরাং একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে তার বেশী সময় লাগল না। তাঁবুতে ফিরে গিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু টুকিটাকি জিনিস হ্যাভারস্যাকে ভরে নিল, এমুনিশন বেল্টটা বুকের উপর জড়িয়ে নিল, তারপর উপরের দিকে তাকিয়ে ওয়াইরামওয়াজির রহস্যের পথে যাত্রা করল।

লাজার পিস্তলটা ছাড়া তার সঙ্গে আছে একটা শিকারী-ছুরি। সেটা দিয়ে একটা ছোট গাছকে কেটে নিয়ে পথ চলার ভরসা হিসাবে একটা শক্ত লাঠি বানিয়ে নিল। পাহাড়ি ঝর্ণার জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাল। পিস্তলের সাহায্যে একটা খরগোস মারল। আগুন জ্বালিয়ে সেটাকে পুড়িয়ে খেল। পাইপ ধরিয়ে টানতে টানতে আরাম করে শুয়ে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে লাগল। স্বভাবতই বিরূপ পরিবেশে ভেঙে পড়ার বা নিরুৎসাহ হবার মত ছেলে সে নয় ; তবু সে স্থির করল উত্তেজনার বশে তাড়াহুড়া করে কোন কিছু করা ঠিক হবে না ; আসন্ন দুর্দিনের জন্য সাধ্যমত শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয় করে রাখতে হবে।

সারাটা দিন সে পাহাড় বেয়ে উঠল। বিশ্রাম শুধু রাতে। শেষ শিবির থেকে একটা কম্বল সঙ্গে করে এনেছিল। সেটা পেতেই ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে উঠে আবার যাত্রা শুরু।

শেষ বাধা পেরিয়ে পর্বত-শিখরে দাঁড়িয়ে ভন হার্বেন উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল। সম্মুখে প্রসারিত একটা উঁচু-নীচু উপত্যকা। ঝড়ো হাওয়ায় মুণ্ডিতশীর্ষ গাছগুলি ইতস্তত দাঁড়িয়ে আছে। দূরে দেখা যাচ্ছে আর একটা পর্বত শ্রেণী—অস্পষ্ট ও ধূসর। দূরের পাহাড় ও তার মধ্যে কি আছে? আবিষ্কারের সম্ভাবনায় তার নাড়ির গতি দ্রুততর হল। সম্মুখের তরাইয়ের চেহারাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ও অপ্রত্যাশিত। বহু দূরে দেখা যাচ্ছে সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ; মাঝে আর কিছু নেই। অতএব সেখানে নিশ্চয়ই আছে অদৃশ্য খাদ ও উপত্যকা—এমন সব নতুন দেশ যেখানে কোন আবিষ্কারকের পায়ের চিহ্ন পড়ে নি।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিঃসঙ্গতা সব কিছু ভুলে ভন হার্বেন উপত্যকার ভিতর দিয়ে উত্তরদিকে হাঁটতে লাগল। জমি ঈষৎ উঁচু-নীচু, ইতস্তত পাথর ছড়ানো, অনুর্বর, নিরাসক্ত। মাইলখানেক চলার পরে তার মন সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। দূরের অস্পষ্ট পর্বতমালা পর্যন্ত যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে তো সবটাই পণ্ডশ্রম হবে।

ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ সামনের তরাইয়ের চেহারায় একটা অস্পষ্ট পরিবর্তন চোখে পড়ল। একটা অবাস্তবতার আভাষ। মনে হল, দূরের পাহাড়গুলো যেন একটা মহাশূন্যের ভিতর থেকে উঠে গেছে—যেন তার আর ঐ পাহাড়ের মধ্যে কোন কিছুই নেই। যেন সমুদ্রের তীর থেকে সে তাকিয়ে আছে বহু দূরবর্তী অস্পষ্ট তটরেখার দিকে—অথচ সে সমুদ্র জলহীন, কারণ জলের তিলমাত্র চিহ্নও চোখে পড়ছে না। সহসা সে থেমে গেল; বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পায়ের নীচে এসেই উপত্যকাটা যেন হঠাৎই শেষ হয়ে গেছে; দূরের পাহাড় শ্রেণী পর্যন্ত প্রসারিত একটা বিরাট অতলস্পর্শ খাদ—বিশ্ববিখ্যাত কলোরাডো গিরি-খাদেরই অনুরূপ।

কিন্তু একটা তফাৎ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। এখানে ভূমিক্ষয়ের চিহ্ন সুস্পষ্ট। গিরি-প্রাচীরগুলো ক্ষত-বিক্ষত ও জলধারার আঘাতে জীর্ণ। আদিম গ্র্যানিট পাহাড় থেকে খোদাই করা গম্বুজ, বুরুজ ও মিনারগুলি নীচ থেকে উপরে মাথা তুলেছে; কিন্তু সে সবই খাদের সঙ্গে সংলগ্ন; আর তার ঠিক ওপারেই দেখা যাচ্ছে গিরি-খাদের প্রশস্ত ভিত্তিভূমি। সে দৃশ্যের অপার বিস্ময় তাকে যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অভিভূত করে ফেলল।

এই বসে-যাওয়া গিরিনালার মেঝে প্রায় এক মাইল নীচে অবস্থিত। দূরের দেয়ালটা উত্তরদিকে আনুমানিক পনেরো থেকে বিশ মাইল বিস্তৃত, যদিও এটাই গিরি-খাদের সব চাইতে ছোট দিক বলেই মনে হচ্ছে। তার ডাইনে অর্থাৎ পূর্ব দিকে, তার বাঁয়ে অর্থাৎ পশ্চিম দিকে খাদটা আরও বেশী বিস্তৃত—ঠিক কতটা

তা সে বুঝতে পারছে না। সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে পশ্চিম দিকের দেয়ালটা দেখাই যাচ্ছে না। তবে খাদের যতটা দেখা যাচ্ছে তা থেকেই সে অনুমান করল যে খাদের মেঝেটা পূব-পশ্চিমে পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাইল তো হবেই। তার ঠিক নীচেই একটা বড় হ্রদ বা জলাভূমি খাদের পূর্ব দিককার বেশীর ভাগ অঞ্চলটা জুড়ে আছে। ঘন নল-খাগড়ার ভিতর দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে; তার উত্তর তীরের কাছেই একটা বড় দ্বীপ। অনেক নীচে ফিতের মত তিনটে স্রোতধারা সেই হ্রদে এসে পডছে; আরও দূরে চোখে পড়ছে আর একটা ফিতে—সেটা সম্ভবত রাস্তা। খাদের পশ্চিম দিকটা ঘন জঙ্গলে ঢাকা। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল, সেই বন ও হ্রদের মাঝখানে কি যেন নড়াচড়া করছে; হয়তো কোন তৃণভোজী পশুই হবে।

এ দৃশ্য দেখে ভন হারবেনের আবিষ্কারক মনটা উত্তেজনার একেবারে চরমে উঠে গেল। নিশ্চয় এখানেই আছে ওয়াইরামওয়াজির লুপ্ত উপজাতির গোপন রহস্য; যতদূর চোখে পড়ছে এইসব খাড়া পাথরের প্রাচীর বেয়ে নীচে নামা একেবারেই অসম্ভব। তবু তাকে নামতেই হবে—এই কুহকের উপত্যকায় নামবার একটা পথ নিশ্চয় আছে।

খাদের পার ধরে হাঁটতে হাঁটতে পাথরের গায়ে পা রাখবার মত কোন গর্ত আছে কি না তাই সে খুঁজতে লাগল। কিন্তু বৃথা খোঁজা। পাথর-প্রাচীরের এক হাজার ফুটের মধ্যে কোথাও মানুষের পা রাখবার মত কোন জায়গা খুঁজে পাওয়া গেল না।

সূর্য ডুবে গেল। একসময় গ্র্যানিটের প্রাচীরে একটা সংকীর্ণ ফাটল তার চোখে পড়ল। পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে নামবার মত একটা পথ তবু পাওয়া গেল; কিন্তু সে পথটা কতদূর পর্যন্ত নেমে গেছে ঘনায়মান অন্ধকারে তা বোঝা গেল না।

ক্ষুধায় ও ঠাণ্ডায় কাতর হয়ে রাতের অন্ধকারে সে সেখানেই বসে পড়ল; নীচের অন্ধকার শূন্যে তার চোখ। অন্ধকার আরও গাঢ় হতেই সে দেখল, অনেক নীচে একটা আলোর ফুল্‌কি ঝিলিক দিয়ে উঠল; আরও একটা, আবারও একটা। প্রতিটি ঝিলিকের সঙ্গে বাড়ছে তার উত্তেজনা, কারণ আলো থাকা মানেই মানুষের উপস্থিতি। জলাভূমির মত হ্রদের অনেক জায়গাতেই আলোর ফুল্‌কি জ্বলছে; আর যেখানে দ্বীপটা অবস্থিত সেখানে অনেক চলাফেরা।

এইসব আগুন যারা জ্বেলেছে তারা কারা? বন্ধু না শত্রু? তারা কি আর একটি আফ্রিকান উপজাতিমাত্র, নাকি প্রাচীন উপকথাই সত্য? অনেক নীচের ওই রহস্যময় আগুনে লুপ্ত উপজাতির মানুষরাই কি তাদের রাতের খাবার তৈরী করছে?

ওটা কি ? নীচের আঁধার-ঢাকা গহ্বর থেকে যে শব্দটা উঠে আসছে সেটা শুনবার জন্য ভন হারবেন কান পাতল। অস্পষ্ট ক্ষীণ একটা শব্দ কানে এল ; কিন্তু তার ভুল হয় নি—সে শব্দ মানুষের কণ্ঠস্বর।

অনেক দূরে উপত্যকার বুক থেকে ভেসে এল কোন জন্তুর আর্তনাদ ; তার পরেই দূরে বজ্রপাতের মত একটা গর্জন শোনা গেল। সেই শব্দ শুনতে শুনতে ভন হারবেন ক্লান্ত দেহে সেখানেই শুয়ে পড়ল ; ঘুম এসে ঠাণ্ডা ও ক্ষুধার জ্বালা থেকে সাময়িক স্বস্তি দিল।

সকাল হলে কিছু গাছপালা জোগাড় করে আগুন জেলে শরীর গরম করল। দিনের আলোয় পাহাড়ের গায়ের ফাটলটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল। সেটা কয়েকশ' ফুট পর্যন্ত নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে। তবু তার ধারণা হল, সেটা ওখানেই শেষ হয়ে যায় নি, আরও নীচে নেমে গেছে। ভাল করে দেখে নিয়ে বুঝতে পারল, ওই ফাটল বেয়ে নীচে নামা হয়তো সম্ভব, কিন্তু পুনরায় উঠে আসা একেবারেই অসম্ভব। কাজেই ফাটলের নীচ পর্যন্ত পৌঁছে যদি দেখা যায় যে আর নামা সম্ভব নয় তাহলে তো সে ফাঁদে আটকে যাবে—না পারবে নামতে, না পারবে উঠে আসতে।

অতএব আত্মপ্রত্যয়ী উৎসাহী যুবক ভন হারবেনেরও মনে হল যে এ-পথে নেমে যাওয়া আত্মহত্যারই সামিল। তবু নিরুপায় হয়েই তাকে নীচে নামতে হবে। আশা মরীচিকা। যদি একটা পথ মিলে যায়। ফাটলের উপর থেকে পা বাড়িয়ে নীচে নামতে যাবে এমন সময় পিছনে পায়ের শব্দ শুনে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে গিয়ে সে হাতের লাঙ্গারটা বাগিয়ে ধরল।

৩

শিকার মেরে ভোজন-পর্ব সমাধা করে টারজন একটা বড় গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে শুয়েছিল। হঠাৎ কিচির-মিচির করতে করতে নকিমা গাছের উঁচু ডাল থেকে ছুটে নেমে এল।

চীৎকার করে বলল, "গোমাঙ্গানি। গোমাঙ্গানি। তারা আসছে। তারা আসছে।"

টারজন বলল, "ভয় নেই নকিমা। টারজন থাকতে কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পারবে না।"

নকিমা বলল, "তাহলে যাও ; গোমাঙ্গানিদের মেরে ফেল। নকিমা তাদের পছন্দ করে না।"

ধীরে-সুস্থে উঠতে উঠতে টারজন বলল, "যাচ্ছি। নকিমা ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে আসতে পারে, অথবা মগডালে গিয়ে লুকোতে পারে।"

ছোট বানরটা সদম্ভে বলে উঠল, "নকিমা ভীরু নয়। সে অরণ্যরাজের সঙ্গেই যাবে, গোমাঙ্গানিদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।" একলাফে সে টারজনের কাঁধে চড়ে বসল।

ডালে-ডালে ঝুলতে ঝুলতে কিছুদূর গিয়েই টারজন দেখতে পেল জনবিশেক আদিবাসী বনপথ ধরে এগিয়ে আসছে। কয়েকজনের হাতে রাইফেল, বাকি সকলের কাঁধেই নানা ধরনের পোটলা-পুটলি।

অরণ্যরাজ হাঁক দিতেই চমকে তারা থেমে গেল ; সভয়ে মুখ তুলে তাকাল।

টারজন তাদের আশ্বাস দিয়ে বলল, "আমি অরণ্যরাজ টারজন। তোমাদের কোন ভয় নেই।" বলেই সে আস্তে তাদের মাঝখানেই পথের উপর নেমে পড়ল ; আর নকিমা একলাফে তার কাঁধ থেকে একটা গাছের ডালে চড়ে কিচির-মিচির করতে করতে মগডালে উঠে গেল। একটু আগেই নিজের মুখে যে আস্ফালন করেছিল তা বোধ হয় ভুলেই গেল।

টারজন প্রশ্ন করল, "তোমাদের সর্দার কোথায় ?"

আফ্রিকানরা বিষণ্ণমুখে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল, কোন জবাব দিল না।

টারজন আবার প্রশ্ন করল, "বাওয়ানা কোথায়—ভন হার্বেন ?"

একটি ঢ্যাঙা লোক ভয়ে ভয়ে বলল, "সে মারা গেছে।"

"কেমন করে মারা গেল ?"

"একটা হাতিকে আঘাত করেছিল, সেই মেরেছে।"

"মৃতদেহটা কোথায় ?"

"সেটা খুঁজে পাই নি।"

"তাহলে কি করে জানলে যে সে হাতির হাতে মারা গেছে ?"

অপর একজন বলল, "আমরা কিছুই জানি না। সে শিবির থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরে আসে নি।"

ঢ্যাঙা লোকটি বলল, "কাছেই একটা হাতি দেখে ভাবলাম হাতিটাই তাকে মেরে ফেলেছে।"

টারজন শক্ত গলায় বলল, "তোমরা সত্যি কথা বলছ না।"

তৃতীয়জন বলল, "আমি বলছি। আমাদের বাওয়ানা ওয়াইরামওয়াজির ঢালু বেয়ে উপরে উঠে যায় ; তাতেই মৃতদের আত্মারা রাগ করে তাকে ধরে নিয়ে গেছে।"

টারজন, "আসল কথাটা আমিই বলছি। মনিবকে একাকি বনের মধ্যে ফেলে তোমরা পালিয়ে এসেছ।"

লোকটি বলল, "আমরা ভয় পেয়েছিলাম। তাকে পাহাড়ে উঠতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু সে আমাদের কথা শোনে নি। তাই মৃতের আত্মারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।"

"এটা ক'দিন আগেকার ঘটনা ? টারজন শুধাল।

"ছয়, সাত, কি দশও হতে পারে। সঠিক মনে পড়ছে না।"

"তাকে তোমরা সর্বশেষ কোথায় দেখেছ ?"

তারা সাধ্যমত ওয়াইরামওয়াজির ঢালুতে তাদের শেষ শিবিরের একটা বর্ণনা দিল।

"তোমরা উরাম্বি দেশে তোমাদের গ্রামে ফিরে যাও। দরকার হলে আমিই তোমাদের খুঁজে নেব। তোমাদের বাওয়ানা যদি সত্যি মরে গিয়ে থাকে তাহলে তোমাদের শাস্তি হবে।"

একটা নীচু ডাল ধরে ঝুলে পড়ে টারজন মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল বেচারি আদিবাসীদের দৃষ্টির আড়ালে। আর্তস্বরে চীৎকার করতে করতে গাছপালার ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল নকিমা তার মনিবকে ধরতে।

যে পথ ধরে ভন হার্বেন গেছে সেটাকে পেরিয়ে যাবার আশায় টারজন কোনাকুনিভাবে এগিয়ে চলল পশ্চিমদিক লক্ষ্য করে। তার মনে আশা, পথ চলতে যদি ভন হার্বেনের দেখা নাও পায় তাহলে পূব দিকে এগিয়ে গিয়ে আরও উঁচু কোন শিখরে উঠে তার খোঁজ করতে পারবে। যত এগোচ্ছে পথ ততই খাড়া চড়াই ও বন্ধুর হয়ে উঠছে। একসময় তার সামনে দেখা দিল একেবারে খাড়া একটা পর্বত-প্রাচীর ; অপর দিকে অতলস্পর্শ খাদ। তারই ভিতর দিয়ে ইতস্তত ছড়ানো পাথরের পথে অতি সন্তর্পণে সে চলতে লাগল। নিজের পথের চিন্তায় সে এতই ডুবে গিয়েছিল যে তাদের অলক্ষ্যে অনেক নীচে গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে একদল সৈনিক যে তাদের উপর লক্ষ্য রেখে চলেছে সেটা সে বুঝতেই পারে নি। আর নকিমাও চিতাবাঘ শীতার ভয়ে এতই অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে সেও সেদিকে নজর দেয় নি।

আরও কিছুটা উঠতে গিয়েই ঘটল বিপদ। খুব সংকীর্ণ এক মোড়ে পৌঁছে টারজনের পায়ের নীচের পাথরটা হঠাৎ সরে যেতেই টাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে গেল। মনিব পড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নকিমাও মুহূর্তের মধ্যে লাফ দিয়ে তার কাঁধ থেকে সরে গেল। ফলে টারজন পাহাড়ের গায়ে গড়িয়ে না পড়ে ছিটকে গিয়ে একটা বেঁটে গাছের ডালে আটকে পড়ল।

আতংকিত নকিমা মনিবের কাছে ছুটে গিয়ে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকতে লাগল; তাকে টানতে লাগল, ঠেলতে লাগল। কিন্তু টারজন নিশ্চল, নিশ্চুপ, তার কপাল কেটে রক্ত গড়িয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে তার কালো চুলের রাশি।

সৈনিকরা নীচ থেকে তাকে সেই অবস্থায় দেখে তাড়াতাড়ি পাহাড় বেয়ে উঠে এল।

৪

মুখ ফেরাতেই এরিক ভন হায়্বেন দেখল রাইফেলধারী জনৈক নিগ্রো তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

হাতের পিস্তল নামিয়ে সে চীৎকার করে ডাকল, "গাবুলা! তুমি এখানে কি করছ?"

সৈনিক বলল, "বাওয়ানা, আমি তোমাকে একলা ফেলে চলে যেতে পারি নি; এই পাহাড়ের অধিবাসী প্রেতাত্মাদের হাতে তো তোমাকে মরতে দিতে পারি না।"

ভন হায়্বেন সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, "তাই যদি হয় গাবুলা, তাহলে তারা তো তোমাকেও মেরে ফেলতে পারে।"

গাবুলা বলল, "জানি বাওয়ানা, আমিও মরব। আমি শুধু বুঝতে পারছি না তারা কেন প্রথম বা দ্বিতীয় রাতে তোমাকে মেরে ফেলে নি। আজ রাতে আমাদের দু'জনেরই মৃত্যু অনিবার্য।"

"তবু তুমি আমার পিছু পিছু এসেছ কেন?"

"তুমি আমাকে কত দয়া করেছ বাওয়ানা; তোমার বাবা আমাকে কত দয়া করেছে। ওদের কথা শুনে ভয় পেয়ে আমি ওদের সঙ্গে পালিয়েছিলাম, কিন্তু আমি ফিরে এসেছি।"

ভন হায়্বেন বলল, "গাবুলা সাহসী বীর। আমি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করি না, তাই আমার ভয় পাবারও কিছু নেই। কিন্তু তুমি প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করেও আমার জন্য ফিরে এসে সাহসের পরিচয়ই দিয়েছ। কিন্তু আমি তোমাকে ধরে রাখব না। অন্যদের সঙ্গেই তুমি ফিরে যাও গাবুলা।"

"বটে!" গাবুলা সাগ্রহে বলে উঠল। "বাওয়ানা তাহলে ফিরে যাচ্ছে? খুব ভাল কথা। গাবুলাও তার সঙ্গে ফিরে যাবে।"

"না, আমি ওই খাদের নীচে নামব।"

"কিন্তু বাওয়ানা, ওই খাড়া পাহাড় বেয়ে নীচে নামবে কেমন করে?"

"কেমন করে, কোথায়, কখন—সে সব কিছুই জানি না। ওই ফাটল বেয়ে যতদূর নামা যায় নামব; তারপর হয়তো নীচেও নেমে যেতে পারব, হয়তো পারব না।"

গাবুলা তবু বলল, "কিন্তু ধর, ফাটলের পরে যদি পা রাখবার মত জায়গা না পাও তাহলে?"

"জায়গা পেতেই হবে!"

গাবুলা মাথা নেড়ে বলল, "দেখ বাওয়ানা, যদি ধরেই নেই যে তুমি নীচে নেমে গেলে, সেখানে কোন প্রেতাত্মা নেই অথবা থাকলেও তারা তোমাকে মারল না, কিন্তু সেখান থেকে তুমি আবার ফিরে আসবে কেমন করে?"

ভন হায়বেন দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে একটু হাসল। তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "বিদায় গাবুলা। তুমি খুব সাহসী।"

গাবুলা কিন্তু মনিবের বাড়ানো হাত না ধরেই বলল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

"জীবন্ত ওখানে নামতে পারলেও কোন দিন ফিরতে পারবে না জেনেও?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না গাবুলা। তুমি ভয় পেয়েছ, সঙ্গীদের সঙ্গে গ্রামে ফিরে যেতেও তুমি চাও। তাহলে আমি ছুটি দেওয়া সত্ত্বেও কেন তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাইছ?"

"কারণ আমি তোমাকে কথা দিয়েছি বাওয়ানা যে তোমার কাজ করব। আর আমি একজন বাটোরো।"

ভন হায়বেন বলল, "তুমি যে একজন বাটোরো সেজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, কারণ তিনিও জানেন যে ঐ খাদের নীচে নামতে হলে আমার অন্যের সাহায্য প্রয়োজন। ক্ষুধার জ্বালায় যদি না মরি তাহলে আমরা নীচে নামবই।"

গাবুলা বলল, "আমি খাবার এনেছি বাওয়ানা। আমি জানতাম তুমি ক্ষুধার্ত, তোমার খাদ্য দরকার। তাই তোমার পছন্দমত কিছু খাবার আমি এনেছি।"

একটা ছোট পুটুলি খুলে সে চকোলেট ও খাদ্য বের করে দিল। ক্ষুধার্ত ভন হায়বেন কালবিলম্ব না করে সে খাবারের সদ্ব্যবহার করল। নতুন উৎসাহে ও শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে আবার নীচে নামতে পা বাড়াল।

গাবুলারা বংশানুক্রমে জঙ্গলেরই অধিবাসী ; তবু যে ভয়ংকর গহ্বরের দিকে মনিব তাকে নিয়ে চলেছে সে দিকে তাকিয়ে তার বুকটাও ভয়ে কেঁপে উঠল। কিন্তু বাইরে সে ভয় প্রকাশ না করে সেও মনিবের পিছু-পিছু নামতে লাগল।

ফাটল ধরে নেমে যাওয়াটাকে যত শক্ত মনে হয়েছিল কার্যক্ষেত্রে ততটা শক্ত হল না ; কিন্তু আসল সমস্যা দেখা দিল ফাটল পর্যন্ত পৌছবার পরে।

যাই হোক, নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে অনেক কষ্ট স্বীকার করে প্রথমে ভন হায়বেন ও পরে গাবুলা সেই গহ্বরের নীচে পৌছে গেল।

সামনেই একটা ছোট নদী সবুজ উপত্যকার বুক চিরে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গিয়ে পড়েছে একটা বড় জলাভূমিতে। যতদূর মনে হয়, জলাভূমিটা মাইল দশেক বিস্তৃত।

জলজ ঘাস ও শেওলার নীচের কর্দমাক্ত মাটির উপর দিয়ে দু'জন সেই জল ভেঙে এগিয়ে চলল। যেতে যেতে এক সময় পায়ের নীচে শক্ত মাটি পেয়ে ভন হায়বেন বলে উঠল, "আর ভয় নেই গাবুলা ; মনে হচ্ছে এই পথ ধরেই আমরা হ্রদটাতে পৌছতে পারব।"

জলের উপর থেকে বারো বা পনেরো ফুট উঁচু প্যাপিরাস গাছের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দু'জন খুব সন্তর্পণে এগোতে লাগল। জলের গভীরতা খুব একটা বাড়ছে না, যদিও মাঝে মাঝে গর্তের মধ্যে পড়লে অল্প-সল্প সাঁতার কাটতে হচ্ছে।

প্যাপিরাসের জঙ্গলটা সবে পার হয়েছে এমন সময় পিছন থেকে একটা ছোট নৌকো দ্রুতবেগে ছুটে এসে সেখানে থেমে গেল। এক নৌকো ভর্তি সশস্ত্র সৈনিক তাদের দু'জনকে ঘিরে ফেলল।

৫

ওয়াইরামওয়াজি পর্বতের পশ্চিম প্রান্তের ঢালুতে অবস্থিত গ্রামের বাগেগো লুকেডি লাউয়ের খোলায় দুধ নিয়ে একটা কুটিরে এসে হাজির হল।

কুটিরের দরজায় দু'জন বর্শাধারী পাহারারত। লুকেডি বলল, "বন্দীর জন্য এই দুধ দিয়ে ম্যুটো আমাকে পাঠিয়েছে। তার আত্মা ফিরে এসেছে তো?"

শান্ত্রী বলল, "ভিতরে গিয়ে দেখ।"

লুকেডি ঘরে ঢুকল। একটি দৈত্যাকার সাদা মানুষ নোংরা মেঝেতে বসে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার হাত দুটো পিছ-মোড়া করে বাঁধা; পায়ের গোড়ালিতেও বেড়ি।

বন্দীর পাশে লাউয়ের খোলাটা রেখে লুকেডি বলল, "এই তোমার খাবার।"

"হাত পিছ-মোড়া করে বাঁধা থাকলে আমি খাব কেমন করে?" টারজন বলল। মাথা চুলকে লুকেডি বলল, "তা আমি জানি না। ম্যুটো আমাকে খাদ্য দিয়ে পাঠিয়েছে। তোমার হাত খুলে দিতে বলে নি।"

টারজন বলল, "বাঁধন কেটে দাও। নইলে আমি খেতে পারব না।"

একজন বর্শাধারী কুটিরে ঢুকে বলল, "লোকটা কি বলছে?"

"বলছে হাত খুলে না দিলে খেতে পারবে না।"

"ম্যুটো কি হাত খুলে দিতে বলেছে?" বর্শাধারী শুধাল।

"না।"

"তাহলে খাবার রেখে চলে যাও; এর বেশী কিছু করতে তোমাকে বলা হয় নি।"

লুকেডি বের হবার জন্য পা বাড়াতেই টারজন বলল, "দাঁড়াও। ম্যুটো কে?"

"বাগেগোদের সর্দার," লুকেডি বলল।

"তাকে গিয়ে বল আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তাকে আরও বলো, পিছ-মোড়া করে হাত বাঁধা থাকলে আমি খেতে পারি না।"

আধ ঘণ্টা পরে ক্রীতদাস বাঁধার একটা জং-ধরা শিকল ও একটা সেকেলে তালা নিয়ে লুকেডি ফিরে এল। প্রহরীকে বলল, "ম্যুটো বলেছে ওকে একটা

বাঁশের সঙ্গে বেঁধে তারপর হাতের বাঁধন খুলে দিতে পারি।"

তিনজন কুটিরে ঢুকল। ঘরের মাঝখানের একটা বাঁশের সঙ্গে লাগানো আংটার ভিতর দিয়ে শিকলটা ঘুরিয়ে এনে অপর দিকটা টারজনের গলায় প্যাঁচ দিয়ে পুরনো তালাটা লাগিয়ে দিয়ে লুকেডি বলল, "এবার হাতের বাঁধন কেটে দাও।"

শান্ত্রী বলল, "কাজটা নিজেই কর। ম্যুটো আমাকে বাঁধন কাটতে বলে নি।"

লুকেডি ইতস্তত করতে লাগল। বোঝাই গেল, সে ভয় পেয়েছে।

রক্ষীরা বলল, "আমরা বর্শা নিয়ে প্রস্তুত আছি; ও তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

টারজন বলল, "আমি ওর কোন ক্ষতি করব না। তোমরা জান আমি কে?"

একজন রক্ষী বলল, "তোমাকে আমরা ভাল করেই চিনি।"

"আমি অরণ্যরাজ টারজন; বাগেগোদের সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই।"

"তোমার বিবাদ না থাকতে পারে, কিন্তু বাগেগোদের বিবাদ আছে।" বলে দুই রক্ষী হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল। যুবক লুকেডি কিন্তু বিস্ময়বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে বন্দীর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েই রইল, যেন কোন দেবতাকে দেখছে।

টারজন বলল, "তোমার নাম কি?"

"লুকেডি।"

"অরণ্যরাজ টারজনের নাম কখনও শোন নি?"

"না।"

"আমার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?"

"আমরা জানি তুমি লুপ্ত জাতির একজন।"

টারজন বলল, "না, আমি তাদের কেউ নই। আরও দক্ষিণের একটা দেশ থেকে আমি এসেছি। তবে বাগেগোদের কথা আমি শুনেছি।"

"তোমার কথা বিশ্বাস করি না," লুকেডি বলল।

"আমি সত্যি কথাই বলছি," টারজন বলল।

লুকেডি মাথা চুলকে বলল, "হয়তো তাই। তোমার পোশাক লুপ্ত জাতির লোকদের মত নয়; তোমার অস্ত্রশস্ত্রও অন্য রকম।"

"লুপ্ত জাতির কোন লোককে তুমি দেখেছ?" টারজন প্রশ্ন করল।

লুকেডি জবাব দিল, "অনেকবার। বছরে একবার করে তারা বেরিয়ে আসে ওয়াইরামওয়াজির পেটের ভিতর থেকে, আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করে। তারা নিয়ে আসে শুঁটকি মাছ, শামুক, লোহা, আর বিনিময়ে নিয়ে যায় নুন, ছাগল ও গরু।"

টারজন প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, তারা যখন শান্তিতে তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, তখন আমি তাদের একজন জেনেও আমাকে বন্দী করেছ কেন?"

লুকেডি বলল, "প্রথম থেকেই তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ চলেছে। তাদের সঙ্গে আমরা লেন-দেন করি সত্য, কিন্তু তারা আমাদের শত্রু।"

"কিন্তু কেন?" টারজন জানতে চাইল।

"কারণ কখন যে তারা অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে আমাদের পুরুষ, নারী ও শিশুদের বন্দী করে নিয়ে যাবে, আর কখনও ফিরিয়ে দেবে না—তা আমরা কেউ বলতে পারি না। তাদের কপালে কি ঘটে তাও জানি না। হয়তো ওরা তাদের খেয়েই ফেলে।"

"তোমাদের সর্দার ম্যাটো আমাকে নিয়ে কি করবে?"

"তা আমি জানি না। ওরা সেই কথাই আলোচনা করছে। সকলেই চায় তোমাকে মেরে ফেলা হোক, কিন্তু কিছু লোকের বিশ্বাস তাতে মৃত বাগেগোদের প্রেতাত্মারা ক্রুদ্ধ হবে।"

"বাগেগোদের প্রেতাত্মারা আমাকে রক্ষা করতে চাইবে কেন?"

"অনেকেই মনে করে যে, তোমরা লুপ্ত জাতির মানুষরাই আমাদের মৃত পূর্ব-পুরুষদের প্রেতাত্মা।"

"তোমাদের পঞ্চায়েত-সভা আমার সম্পর্কে কি স্থির করবে বলে তোমার মনে হয়?"

"আমার ধারণা তারা তোমাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারবে, কারণ তাহলেই তুমি ও তোমার আত্মা দুই-ই ধ্বংস হয়ে যাবে; তাহলে আর সে আত্মা এসে আমাদের উপর ভর করতে পারবে না।"

এবার টারজন বলল, "আচ্ছা, ইদানীংকালে আর কোন সাদা মানুষকে তোমরা দেখেছ কি? বা কিছু শুনেছ কি?"

"না," যুবকটি জবাব দিল।

টারজন মুখ বাড়িয়ে দুধটা খেয়ে নিল। "কাল আবার তোমার জন্য দুধ নিয়ে আসব," বলে লুকেডি চলে গেল।

ক্রমে রাত হল। শক্ত নোংরা মেঝেতে শুয়ে টারজন ঘুমিয়ে পড়ল। কতক্ষণ পরে যে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে গেল সে জানে না। তবে গন্ধ শুঁকে সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল যে, কুটিরের খড়ের চালের উপর থেকে আসা কোন জন্তুর শব্দেই তার ঘুম ভেঙেছে। সে যাই হোক, নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে। তার উদ্দেশ্য কি তাও বুঝতে পারল না।

কিন্তু চালের উপর বসে আছে কে? কেন? সে কি ঘরের ভিতর ঢুকতে চায়? চিৎ হয়ে শুয়ে অন্ধকার চালের দিকে তাকিয়ে টারজন এইসব প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজতে লাগল।

একসময় ঠিক তার মাথার উপরে একঝলক চাঁদের আলো দেখা দিল। চালের উপর যেই থাকুক সেই চালে একটা ফাঁক তৈরী করেছে। ফাঁকটা একটু

একটু করে বড় হচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে সেই চালের খড় সরিয়ে ফাঁকটাকে বড় করছে। ফাঁকটা বেশ বড় হতেই চন্দ্রালোকিত আকাশের পটভূমিতে একটি ছায়া-মুখ দেখেই টারজনের মুখটা হাসিতে ভরে উঠল। একটু পরেই সেই ফাঁক দিয়ে শরীর গলিয়ে মেঝেতে নেমে এল নকিমা।

টারজন বলল, "আমাকে খুঁজে পেলে কেমন করে?"

নকিমা বলল, "তোমার পিছন পিছন এসে সারাদিন একটা উঁচু গাছে বসেছিলাম। অন্ধকার হতেই নেমে এসেছি। তুমি এখানে আছ কেন?"

টারজন বলল, "আমাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছে।"

নকিমা বলল, "নকিমা এখনই গিয়ে মুভিরো ও তার সৈন্যদের নিয়ে আসবে।"

টারজন বলল, "না, সে সব কিছুই করতে হবে না। তুমি জঙ্গলে ফিরে গিয়ে অপেক্ষা কর নকিমা; হয়তো শিগ্‌গিরই আমি তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারব।"

এই সময় একটি শান্ত্রী হামাগুড়ি দিয়ে কুটিরের ভিতরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ?"

একটা খচ্‌মচ্‌ শব্দ শুনে উপরে তাকাতেই দেখতে পেল, একটা ছায়ামূর্তি চালের গর্তের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গেল। সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ও কে?"

"ও তোমার ঠাকুর্দার প্রেতাত্মা," টারজন বলল। "সে আমাকে বলতে এসেছিল, এখানে আমার একটা কিছু হলে তুমি, তোমার বউ, ও ছেলেমেয়ে সকলেই অসুখে পড়বে। সেই একই কথা সে ম্যাটোকেও বলতে বলেছে।"

শান্ত্রী কাঁপতে কাঁপতে মিনতি করে বলল, "ওকে ফেরাও। ওকে বলো, এ ব্যাপারে আমি কিছুই করি নি। আমি নয়, সর্দার ম্যাটোই তোমাকে মারতে চেয়েছে।"

টারজন বলল, "এখন আর ওকে ফেরানো যাবে না। তুমি বরং ম্যাটোকে বলো সে যেন আমাকে না মেরে ফেলে।"

রক্ষী আর্তগলায় বলল, "সকালের আগে তো ম্যাটোর সঙ্গে আমার দেখা হবে না; ততক্ষণে তো অনেক দেরী হয়ে যাবে।"

টারজন বলল, "না, তোমার ঠাকুর্দার প্রেতাত্মা আগামী কালের আগে কিছু করবে না।"

পরদিন সকালে একটু বেলা করেই লুকেডি দুধের লাউ নিয়ে কুটিরে ঢুকল। তাকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

বলল, "ওগোম্যা যা বলছে তা কি সত্যি?"

"ওগোম্যা কে?" টারজন জানতে চাইল।

"কাল রাতে সে এখানে পাহারায় ছিল। সে ম্যাটো ও সারা গ্রামকে বলেছে সে নাকি শুনেছে যে তার ঠাকুর্দার প্রেতাত্মা তোমাকে বলেছে—তোমার

কোন ক্ষতি হলে সে গ্রামের সবাইকে শেষ করে দেবে। তাই সকলে খুব ভয় পেয়েছে।"

"আর ম্যাটো?" টারজন শুধাল।

"ম্যাটো কোন কিছুকেই ভয় করে না," লুকেডি বলল।

"পূর্বপুরুষদের প্রেতাত্মাকেও না?"

"না। বাগেগোদের মধ্যে একমাত্র সেই লুপ্ত জাতির মানুষদের ভয় করে না। তুমি সকলকে ভয় দেখিয়েছ বলে সে খুব রেগে গেছে। আজ সন্ধ্যায়ই তোমাকে পুড়িয়ে মারা হবে। ঐ দেখ!" কুটিরের নীচু দরজার দিকে সে আঙুল বাড়াল। "এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছ তোমাকে বাঁধবার জন্য একটা খুঁটি পোতা হচ্ছে। ওদিকে ছেলেরা জঙ্গলে গেছে জ্বালানি কাঠ আনতে।"

আঙুল তুলে চালের ফাঁকটা দেখিয়ে টারজন বলল, "ওগোন্যার ঠাকুর্দাই ওই ফাঁকটা বানিয়েছে। ম্যাটোকে এনে ওটা দেখাও। তাহলে হয়তো সে বিশ্বাস করবে।"

"তাতে কোন ফল হবে না। হাজার প্রেতাত্মাকে নিজের চোখে দেখলেও সে ভয় পাবে না। সে বড় একবগ্‌গা। এবার আমরা সকলেই মারা পড়ব।"

"তাতে কোন সন্দেহ নেই," টারজন বলল।

"তুমি কি আমাদের বাঁচাতে পার না?" লুকেডি বলল।

"তুমি যদি আমাকে পালাতে সাহায্য কর তো কথা দিচ্ছি, প্রেতাত্মারা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।"

এই সময় গ্রামের মধ্যে এক ভয়ানক সোর-গোল উঠল। পুরুষরা নানা রকম হুকুম জারি করছে। ছেলেমেয়েরা চীৎকার করছে। অনেক পায়ের শব্দ হচ্ছে। বেজে উঠল রণ-ডংকা। শুরু হল অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা। উচ্চ চীৎকার। দরজার রক্ষীরাও সেই দিকে ছুটে গেল। লুকেডি দরজার দিকে এগিয়েই সত্রাসে চীৎকার করে পিছিয়ে গেল।

"তারা আসছে! তারা আসছে!" বলতে বলতে ঘরের এক কোণে ছুটে গিয়ে সে ভয়ে কুঁকরে বসে পড়ল।

৬

এরিক ভন হার্বেন দীর্ঘকায়, উলঙ্গপ্রায় সৈনিকদের মুখের দিকে তাকাল। প্রথমেই তার মনোযোগ পড়ল তাদের অস্ত্রশস্ত্রের দিকে।

আধুনিককালের অসভ্য মানুষদের হাতে যে রকম দেখা যায় তাদের বর্শাগুলি তার চাইতে অন্য রকম। আফ্রিকার অসভ্য লোকদের মত বর্শা তো আছেই, তাছাড়া আর একরকম ভারী বল্লম আছে যা দেখে যুবক পুরাতত্ত্ববিদটির মনে

স্বভাবতই প্রাচীন রোমকদের হাতের তীক্ষ্ণমুখ শলাকার কথাই মনে পড়ল। সেই মিলটি আরও বেশী স্পষ্ট করে তুলল তাদের কাঁধের উপর থেকে ঝোলানো কোষবদ্ধ এক ধরনের ছোট, চওড়া দু-মুখো তরবারি। এগুলি যদি রোমের রাজকীয় বাহিনীর "গ্লেডিয়াস হিস্‌পেনাস" না হয় তো ভন হার্‌বেন এতকাল বৃথাই পড়াশুনা করেছে, গবেষণা করেছে।

বলল, "গাবুলা, ওদের জিজ্ঞাসা করতো ওরা কি চায়।"

বান্টু ভাষায় গাবুলা শুধাল, "তোমরা কারা, আর এখানে কি চাও?"

ভন হার্‌বেনও বলল, "আমরা বন্ধু হতে চাই। আমরা এসেছি তোমাদের দেশ দেখতে। তোমাদের সর্দারের কাছে আমাদের নিয়ে চল।"

একটি ঢ্যাঙা নিগ্রো মাথা নেড়ে বলল, "আমরা তোমাদের কথা বুঝতে পারছি না। তোমরা আমাদের বন্দী। তাই তোমাদের নিয়ে যাব আমাদের মনিবের কাছে। নৌকোয় উঠে এস। বাধা দিলে বা গোলমাল করলে মেরে

রোমের প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে তার অপ্রচলিত ভাষাগুলি সে ভালই জানে। কাজেই লোকটির বক্তব্য সে মোটামুটি বুঝতে পারলেও তার জানা রোমের প্রাচীন ভাষা আর এই লোকটির ভাষার পার্থক্য দেখে সে বিস্মিত হল।

সেনিকটি শুধাল, "তুমি কি রোমের নাগরিক?"

ভন হার্‌বেন উত্তর দিল, "না, কিন্তু আমার দেশের সঙ্গে রোমের শান্তির সম্পর্ক। আমি জার্মানিয়ার মানুষ।"

"ও রকম কোন দেশের কথা কোনদিন শুনি নি।"

"আমাকে তোমাদের সর্দারের কাছে নিয়ে চল।"

"আমিও তো চাই। নৌকোয় উঠে পড়। তোমাকে নিয়ে কি করবে সেটা মনিবরাই বুঝবে।"

ভন হার্‌বেন ও গাবুলা ডোঙ্গায় পা দিল। একটা চওড়া খালের বুকে দুই পাশে দশ-পনেরো ফুট লম্বা প্যাপিরাস গাছের ভিতর দিয়ে ডোঙ্গা ভেসে চলল।

ভন হার্‌বেন শুধাল, "তোমরা কোন্ জাতির লোক?"

"আমরা মারে ওরিয়েন্টিসের বর্বর জাতি, পূর্ব দেশের সম্রাট ভ্যাল্ডিয়াস অগাস্টাসের প্রজা। কিন্তু এসব প্রশ্ন করছ কেন? এসব তো তুমিও আমার মতই ভাল জান।"

আঁকা-বাঁকা নালা ধরে আধ ঘণ্টা বৈঠা চালাবার পরে তারা মৌমাছির বাসার মত আধা ডজন কুটিরের একটা গ্রামে এসে থামল। ভন হার্‌বেন ও গাবুলাকে নিয়ে সেখানকার লোকজনদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে গেল।

গ্রামের সর্দার তাদের দু'জনকে নিয়ে একটা সুরক্ষিত দুর্গের মত বাড়িতে

ঢুকল। বলল, "তুমি কি গুপ্তচর ?"

ভন হার্বেন জবাব দিল, "না. আমি গুপ্তচর নই, শত্রুও নই। আমি একজন বর্বর, কিন্তু মিত্র বর্বর।"

গাবুলাকে দেখিয়ে সর্দার বলল, "এ লোকটি কে ? তোমার ক্রীতদাস ?"

"ও আমার ভৃত্য, কিন্তু ক্রীতদাস নয়।।

গাবুলাকে রক্ষীদের ঘরে সাময়িকভাবে আটক রাখতে বলে সর্দার ভন হার্বেনকে নিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল।

বলল, "বস। এবার তোমার সব কথা আমাকে বল। তুমি কোথা থেকে এসেছ ?"

ভন হার্বেন জবাব দিল, "জার্মানিয়া থেকে।"

সর্দার বলে উঠল, "আরে! তারা তো বন্য ও অসভ্য বর্বর। তারা তো রোমের ভাষাই বলে না; তোমার মত খারাপ করেও বলে না।"

"কতদিন আগে জার্মান বর্বরদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ ঘটেছিল ?"

"আমি তো কখনও সে দেশে যাই নি; তবে আমাদের ইতিহাসকাররা তাদের ভাল করেই চেনে।"

"তারা কতদিন আগে তাদের কথা লিখেছে ?"

"রোমক সনের ৮৩৯তম বর্ষে।"

"সে তো আঠারো'শ সাঁইত্রিশ বছর আগেকার কথা। তারপরে সেখানে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।"

সর্দার বলল, "তা কেমন করে হবে ? এদেশের তো কোন পরিবর্তন ঘটে নি। যাক সে কথা। এবার তোমার কথা বল।"

ভন হার্বেন বলতে লাগল, আমার বাবা আফ্রিকার একজন মেডিক্যাল মিশনারি। যখনই বাবাকে দেখতে গিয়েছি তখনই একটি লুপ্ত উপজাতির কথা শুনেছি; তারা নাকি এইসব পাহাড়েই বাস করে। ওয়াইরামওয়াজ্জির গভীরে বসবাসকারী একদল শ্বেতকায় জাতি সম্পর্কে অনেক অস্পষ্ট কাহিনী তারা বলে। সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করতেই আমি এসেছি। একজন ছাড়া অন্য সঙ্গীরা আমাকে ফেলে চলে গেছে। আমরা দুজন অনেক কষ্টে খাদের নীচে নেমেছিলাম। আর তখনই আমাদের গ্রেপ্তার করে এখানে আনা হয়েছে।"

সর্দার চুপ করে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, "হয়তো তুমি সত্যি কথাই বলেছ। তোমার পোশাক রোমকদের মত নয়। তোমার উচ্চারণও এতই অদ্ভুত যে এই ভাষাটা তোমার মাতৃভাষা নয় বলেই মনে হয়। যাই হোক, তোমার গ্রেপ্তার হওয়ার খবরটা সম্রাটকে জানাতেই হবে। ইতিমধ্যে তোমাকে আমার খুড়োমশায় সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমার কথায় তার বিশ্বাস হলে সে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে, কারণ সম্রাট

ভাল্ডিয়াস অগাস্টাসের উপর তার যথেষ্ট প্রভাব আছে।"

ভন হাম্বেন বলল, "তোমার অনেক দয়া। আমার কথা তো অনেক শুনলে, এবার তোমার কথা কিছু বল।"

সর্দার বলল, "বলার বিশেষ কিছু নেই। আমার নাম মালিয়াস লোপাস। ভাল্ডিয়াস অগাস্টাসের সেনাবাহিনীতে আমি একজন যাত-নায়ক।

এই সময় আর একটি লোক ঘরে ঢুকল। সর্দার বলল, "এই তো আস্পার এসে গেছে। এবার সে ফটক পাহারা দেবার দায়িত্ব আমার কাছ থেকে বুঝে নেবে। তোমাকে নিয়ে আমি এখনই যাব আমার খুড়োমশায় সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের বাড়ি।"

৭

টারজন সবিস্ময়ে লুকেডির মুখের দিকে তাকিয়ে পরে নীচু দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল।

গ্রামের পথে উদ্যত বর্শা হাতে পুরুষ, আতংকিত নারী ও শিশুদের ভিড়।

প্রথমে টারজন ভাবল, অন্য কোন অসভ্য জাতি বুঝি গ্রাম আক্রমণ করেছে। কিন্তু একটু পরেই হৈ-চৈ থেমে গেল। বাগেগোরা ইতস্তত পালাতে লাগল। তাদের পিছনে ধাওয়া করছে কিছু সৈনিক। কিছুক্ষণ চুপচাপ। তার পরেই ত্রস্ত পায়ের শব্দ, কিছু হুকুম, আর মাঝেসাঝে ভয়ার্ত আর্তনাদ।

তিনটি মূর্তি সবেগে কুটিরে ঢুকে পড়ল—শত্রু সেনারা কিছু পলাতককে খুঁজছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে লুকেডি ঘরের এক কোণে লুকিয়ে পড়ল। ঘরের মাঝখানের যে খুঁটিটার সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে সেটাতে হেলান দিয়েই টারজন বসে রইল। তাকে দেখতে পেয়ে দলপতি সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করল। একজন টারজনকে কিছু বলল। টারজন কিছুই বুঝতে পারল না, যদিও ভাষাটা যেন তার কাছে চেনা-চেনা মনে হল।

তাদের একজন লুকেডিকে দেখতে পেয়ে তাকে টানতে টানতে ঘরের মাঝখানে নিয়ে এল। তারপর আঙুল বাড়িয়ে দরজাটা দেখিয়ে টারজনকে আবার কিছু বলল। তাকে বাইরে যেতে বলা হচ্ছে বুঝতে পেরে টারজন তার গলার শিকলটা দেখাল।

একটি সৈনিক তালাটা ভাল করে পরীক্ষা করে কুটির থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই দুটো পাথর হাতে নিয়ে ফিরে এসে সে টারজনকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে পাথরটাকে সজোরে তালার উপর ঠুকতে লাগল। তালাটা ভেঙে গেল।

মুক্তি পাওয়া মাত্রই টারজন ও লুকেডিকে কুটিরের বাহিরে নিয়ে যাওয়া হল।

গ্রামের মাঝখানে প্রায় পঞ্চাশটি পুরুষ, নারী ও শিশু বাগেগো বন্দীকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে শ'খানেক হালকা বাদামী রঙের সৈনিক। টারজন এবার এইসব নবাগতদের দিকে দৃষ্টি ফেরাল।

তাদের আলখাল্লা, বর্ম, শিরস্ত্রাণ, পাদুকা—এসব কিছুই টারজন আগে কখনও দেখে নি ; অথচ সবই তার কাছে কেমন যেন পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। একটা বিচিত্র অনুভূতি জাগল তার মনে ; সে যেন এই লোকগুলিকে আগেও দেখেছে, তাদের কথাবার্তা শুনেছে, এমন কি তাদের ভাষাও যেন বুঝতে পারছে। অথচ সে এও জানে যে, আগে কখনও সে তাদের দেখে নি। এমন সময় গ্রামের অপর দিক থেকে আর একটি মানুষ এগিয়ে এল—একটি সাদা মানুষ, সৈনিকদের মতই সাজপোশাক, তবে অনেক বেশী দামী ও ঝল্‌মলে। হঠাৎ টারজন যেন সব রহস্যের চাবিকাঠিটি হাতে পেয়ে গেল—যে লোকটি এগিয়ে আসছে সে যেন উঠে এসেছে রোমের পালাজ্জো ডি কন্‌জারভেটারিতে অবস্থিত জুলিয়াস সিজারের প্রতিমূর্তির বেদী থেকে।

এরা সবাই রোমক। রোমের পতনের হাজার বছর পরে সিজারের একদল সেনানীর হাতে সে বন্দী হয়েছে। তাই তো সব কিছু তার কাছে পরিচিত বলে মনে হয়েছে। সভ্য জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার জন্য একসময় সে অন্য অনেক কিছুর সঙ্গে লাটিন ভাষাও শিখেছিল। কিন্তু শুধু সিজারের ভাষ্য আর ভার্জিল পড়লেই তো লাটিন ভাষায় পণ্ডিত হওয়া যায় না। তাই কথ্য লাটিন ভাষা সে বলতেও পারে না, বুঝতেও পারে না ; কিন্তু কেউ বললে সেটা চেনা-চেনা লাগে।

প্রতিটি সৈনিকের হাতে একটা করে ছোট শিকল ও তার এক দিকে একটা করে ধাতুর কলার ও তালা। সেগুলির সাহায্যে তারা বন্দীদের গলায় গলায় শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলল।

ততক্ষণে প্রথম সাদা মানুষটির মত বেশভূষায় সজ্জিত আরও দু'জন অফিসার এসে তার সঙ্গে যোগ দিল। টারজনকে দেখেই তারা তিনজন এগিয়ে এসে তাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। টারজন মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল যে, তাদের কথা সে বুঝতে পারছে না। তখন দলপতি টারজন সম্পর্কে কিছু নির্দেশ দিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

ফলে টারজনকে দলবন্দী করে এক শিকলে বাঁধা হল না ; তার গলায় একটা লোহার কলার পরিয়ে শিকলের অপর প্রান্তটা তুলে দেওয়া হল একজন সৈনিকের হাতে। টারজন ধরেই নিল, তার গায়ের রং এবং একটি সাদা মানুষকে নিগ্রোদের সঙ্গে এক শিকলে বাঁধার অনিচ্ছার জন্যই তার প্রতি এই বিশেষ আচরণটুকু করা হল।

পর্বতের সানুদেশ ধরে তারা উত্তর দিকে এগিয়ে চলল। তারপর কোনা-

কুনিভাবে ওয়াইরামওয়াজির পশ্চিম দিকের পথ বেয়ে উপরে উঠতে লাগল।

ঘটনাক্রমে টারজনের জায়গা হয়েছে বন্দী-সারির পিছনে আর লুকেডি রয়েছে সেই সারির একেবারে শেষে।

হাঁটতে হাঁটতে টারজন শুধাল, "এরা সব কারা লুকেডি ?"

বাগেগো যুবকটি জবাব দিল, "এরা সব ওয়াইরামওয়াজির প্রেত।"

টারজনের দিকে তাকিয়ে জনৈক বন্দী বলল, "ওরা এসেছে ওদেরই একজনের হত্যাকে প্রতিরোধ করতে। ভালই হয়েছে যে এই লোকটিকে মেরে ফেলার আগেই ওরা এসে পড়েছে। নইলে আমাদের সব্বাইকে মেরে ফেলত।"

টারজন বলল, "আমার তো মনে হয় ওরা আমাদের মারবে না।"

"তোমাকে মারবে না, কারণ তুমি ওদেরই একজন। কিন্তু তোমাকে বন্দী করার অপরাধেই ওরা বাগেগোদের মেরে ফেলবে।"

ছ'ঘণ্টা চলবার পরে পথটা হঠাৎ ডান দিকে মোড় নিয়ে একটা সংকীর্ণ পাহাড়ি সুড়ঙ্গে ঢুকে গেল। সুড়ঙ্গের মুখটা গাছপালা ও ঝোপঝাড়ে এমনভাবে ঢাকা যে, নীচের ঢালু থেকে সেটা একেবারেই চোখে পড়ে না।

সুড়ঙ্গটা এত সরু যে ছ'দিকে হাত বাড়ালেই দেয়াল ছোঁয়া যায়। মেঝেতে এত বেশী টুকরো পাথর ছড়িয়ে আছে যে পা ফেলাই শক্ত।

চলতে চলতেই টারজন বুঝতে পারল যে তারা ক্রমেই পাহাড়ের ভিতরে ঢুকলেও উপরে ওঠার বদলে সুড়ঙ্গটা বরং নীচের দিকেই নেমে যাচ্ছে।

আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ-পথে আরও ঘণ্টাখানেক চলবার পরে মানুষের তৈরী একটা ইঁটের ফটকের ভিতর দিয়ে সকলে সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে বেরিয়ে জঙ্গলের পথ ধরল। সে জঙ্গলে বাবলা ও দেওদার গাছ কিছু কিছু থাকলেও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ওক গাছই বেশী।

কিছুক্ষণ পরে একটা ছোট নিগ্রো গ্রামে ঢুকেই যাত্রার বিরতি ঘটল। সৈন্য-সামন্তরা গ্রামের মানুষদের ঘরগুলি দখল করে বসল, আর তাদের উপর নানা রকম হুকুম চালাতে লাগল। বন্দীদের জন্য কোন ঘরের ব্যবস্থা করা হল না; তবে তারা যাতে কাঠ-খড় এনে আগুন জ্বালাতে পারে তার অনুমতি দেওয়া হল। খেতে দেওয়া হল শস্য-কণা ও শুঁটকি মাছ। গলায় শিকল বাঁধা অবস্থায়ই তারা আগুনের চারপাশে গোল হয়ে বসল।

একটা ওকের ফল এসে পড়ল টারজনের মাথায়। টারজন সেদিকে নজর দিল না। আবার একটা, আরও একটা ফল সোজা এসে পড়ল তার মাথায়। এবার উপরে তাকিয়ে টারজন দেখল, নীচে ডালের উপর একটা ছোট বানর বসে আছে।

সে সবিস্ময়ে বলল, "আ—রে! নকিমা, তুমি এখানে এলে কেমন করে ?"

"তোমাকে গোমাঙ্গানিদের গ্রাম থেকে নিয়ে আসতে দেখে আমিও পিছু নিলাম।"

"তুমিও সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে এসেছ নকিমা ?"

"পাছে পাথরের চাপে পড়ে মারা যায় সেই ভয়ে নকিমা সুড়ঙ্গের মধ্যে না ঢুকে গাছের ডালে-ডালে চলে এসেছে।"

টারজন বলল, "নকিমা বরং বাড়ি ফিরে যাক।"

নকিমা শুধাল, "এই টারমাঙ্গানিরা অরণ্যরাজকে নিয়ে কি করবে ?"

"তা তো জানি না নকিমা।"

"তাহলে নকিমা ফিরে গিয়ে মুভিরো ও ওয়াজিরিদের নিয়ে আসবে।"

টারজন বলল, "না। যে টারমাঙ্গানিকে আমরা খুঁজছি তাকে ফিরে পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তারপর গিয়ে মুভিরোকে খবর দিও।"

সে রাতে টারজন ও অন্য বন্দীরা খোলা জায়গায় শক্ত মাটির উপরেই ঘুমিয়ে পড়ল। অন্ধকার হলে ছোট্ট নকিমাও গাছ থেকে নেমে এসে মনিবের কোলের মধ্যে শুয়ে পড়ল ; প্রিয় টারমাঙ্গানির কাছে শুয়ে রাতটা পরম সুখে কাটিয়ে দিল।

ভোর হল। বন্দীদের অন্যতম ওগোম্ম্য চোখ মেলে চারদিকে তাকাল। সৈনিকরাও জেগে উঠেছে। কেউ কেউ ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। বন্দীরা তখন আগুনের চারপাশে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ঘুমিয়ে আছে। একটু দূরেই ঘুমিয়ে আছে টারজান। এমন সময় ঘুমন্ত টারজনের দুই হাতের ভিতর থেকে মাথা তুলল একটা ছোট বানর। চারদিকে তাকিয়ে সৈনিকদের দেখতে পেয়েই বানরটা একলাফে গাছে চড়ে ডালপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওগোম্ম্য ভয়ে চীৎকার করে অন্য বন্দীদের জাগিয়ে তুলল।

"ব্যাপার কি ওগোম্ম্য ?"

"আমার ঠাকুর্দার প্রেতাত্মা। তাকে আবার দেখতে পেলাম। টারজন নামক সাদা মানুষটার মুখ থেকে সে বেরিয়ে এল। সাদা মানুষটকে বন্দী করেছি বলে সে আমাদের অভিশাপ দিয়েছে। তাই তো আমরাই এখন বন্দী হয়েছি ; অচিরেই ওরা আমাদের কেটে খেয়ে ফেলবে।"

আর একবার খাওয়া-দাওয়া সেরে ধূলোভর্তি পথ ধরে সকলে এগিয়ে চলল দক্ষিণ দিকে। অনেকগুলি গ্রাম পার হয়ে গম্বুজ ও বুরুজওয়ালা একটা উঁচু প্রাচীরের সামনে সকলে হাজির হল। প্রাচীরের চারদিক ঘিরে একটা খাল ; তাতে তির্ তির্ করে স্রোত বইছে। খালের উপর প্রাচীরের ভিতর ঢুকবার একটা চওড়া সেতু।

সেই সেতু পার হয়ে ভিতরে ঢুকতেই চোখে পড়ল একটা অট্টালিকা-নগরী। রাজপথ ধরে চলতে চলতে দেখল রাস্তায় ও বাড়ির ফটকে অনেক বাদামি ও কালো মানুষের ভিড়। অনেকেরই পরনে কুর্তা ও আলখাল্লা, যদিও নিগ্রোরা প্রায় উলঙ্গ।

শহর পরিক্রমা করতে করতেই টারজনের মনে হল, এখানকার নিগ্রো বাসিন্দারা হল ভৃত্য, হয়তো বা ক্রীতদাস; বাদামি লোকেরা সৈনিক ও দোকানি; আর সাদা মানুষরা অভিজাত শ্রেণীর।

অধিকতর প্রশস্ত আর একটা রাজপথ ধরে কিছুটা এগোতেই একটা বৃত্তাকার বিরাট গ্র্যানিট পাথরের বাড়ি দেখা গেল। বড় বড় থামের উপরে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট উঁচু পর্যন্ত ধাপে ধাপে উঠে গেছে একটা বিরাট বাড়ি। একতলায় পর পর অনেকগুলি ঘর; কিন্তু পরের সবগুলি তলাই ফাঁকা। তার ভিতর দিয়েই টারজন দেখতে পেল, বৃত্তাকার বাড়িটার উপরে কোন ছাদ নেই; বুঝতে পারল এটা একটা মল্লক্ষেত্র—রোমের কালোসিয়ামের মত।

সকলে ঘোরানো বাড়িটার পিছন দিকে পৌছে গেল। বাড়ির ভিতরে অসংখ্য গলি, বারান্দা ও ছোট ছোট ঘর; যেমন সংকীর্ণ, তেমনিই অন্ধকার। সবগুলি ঘরের লোহার দরজা খোলা। চার-পাঁচজনের এক একটা দলের গলা থেকে শিকল খুলে নিয়ে তাদের এক একটা অন্ধকার নরকের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হল।

টারজন দেখল, লুকেডি ও অন্য দু'জন বাগেগোর সঙ্গে তাকে যে ঘরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে সেটা আগাগোড়া গ্যানিট পাথরে গড়া। ঘরের একটি মাত্র দরজায় লোহার গরাদে বসানো। দরজার উল্টো দিকের দেয়ালের মাথায় একটিমাত্র গরাদ দেওয়া জানালা দিয়ে সামান্যমাত্র আলো ও হাওয়া ঘরে ঢুকছে। তাদের মুখের উপরেই দরজা বন্ধ করে ভারী তালা লাগিয়ে দেওয়া হল। সেই নির্জন ঘরে সকলে অপেক্ষা করতে লাগল অনাগত নিয়তির জন্য।

একজন সৈনিককে ডেকে গাবুলাকে নিয়ে আসতে বলে মালিয়াস লেপাস ভন হার্বেনকে সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে বলল, "এরিক ভন হার্বেন, তুমি আমার সঙ্গে যাবে আমার অতিথি হিসাবে; আর জুপিটারের নামে বলছি, তোমাকে নিয়ে যাবার জন্য সেপ্টিমাস ফ্যাবোনিয়াস আমাকে ধন্যবাদই জানাবে। নতুন নতুন অতিথি না পেলে তার ভোজ-সভাই জমে না। এই তো, তোমার ক্রীতদাসটিও এসে পড়েছে। খাস-খানসামাটিকে তো তোমার সঙ্গে অবশ্যই যেতে হবে।"

প্রাকার-সংলগ্ন লম্বা চালাটার সামনে এসে দাঁড়াতেই আট পাল্কি-বাহক উঠে দাঁড়াল।

মালিয়াস শুধাল, "তুমি যদি সম্প্রতি রোমে গিয়ে থাক তাহলে বল তো সেখানকার সম্ভ্রান্ত লোকরা এখন যে ধরনের পাল্কিতে চেপে বেড়ায় সেগুলো কি আমার পাল্কির চাইতে ভাল?"

"কি জান মালিয়াস লেপাস, তোমাদের ইতিহাসকার স্যারজুইনারিয়াস যে রোমের কথা লিখে গেছে আজকের দিনে তার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সে

পরিবর্তন এতই বেশী যে, তার ছিঁটেফোঁটার কথা বললেও তোমার বিশ্বাস হবে না।"

"তাবলে পাল্কির আর কি পরিবর্তন হবে ?"

ভন হায়্বেন বলল, "এখন তারা যে পাল্কিতে চাপে তাতে চাকা লাগানো থাকে।"

"অবিশ্বাস্য !" মালিয়াস চেঁচিয়ে বলল। "গো-গাড়ির বড় বড় কাঠের চাকায় ঠোক্কর খেতে খেতে পথ চলা তো এক কষ্টকর ব্যাপার। না এরিক ভন হায়্বেন, তোমার এ গল্প আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। যাই হোক, রোমের সে সব পাল্কি নিশ্চয়ই আমাদের পাল্কির মত এত জোরে চলতে পারে না।"

"আমরা কত জোরে চলেছি ?" ভন হায়্বেন প্রশ্ন করল।

মালিয়াস জবাব দিল, "তা ঘণ্টায় পঁচাশি শ' পায়ের চাইতে বেশী তো হবেই।"

"কিন্তু আজকের চাকাওয়ালা পাল্কির গতি ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার পায়ের চাইতে বেশী হওয়াটা মোটেই কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। সে সব পাল্কিকে বলা হয় মোটর গাড়ি।"

খুশিতে ফেটে পড়ে মালিয়াস বলল, "তবে তো মার দিয়া কেল্লা! তোমার মুখে এসব কথা শুনলে সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস খুব খুশি হবে।"

ভন হায়্বেন হেসে বলল, "আরও আছে মালিয়াস। সে সব পাল্কি মানুষ টানে না।"

"তবে কি ঘোড়ায় টানে ? তা এমন কোন্ জাতের ঘোড়া আছে যারা অত জোরে ছুটতে পারে ?"

"আরে না না, সে সব পাল্কি ঘোড়াও টানে না।"

"তাহলে তারা নিশ্চয় উড়ে চলে! ওঃ! একথা সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসকে বললে সে তো তোমার প্রেমে পড়ে যাবে।" মালিয়াস হো-হো করে হেসে উঠল।

পাল্কি একটা রাজপথে পড়ল। দু' পাশে বড় বড় বাড়ি। একটা ফটকের সামনে পাল্কি থামল। লেপাস ও এরিক পাল্কি থেকে নামল। বাগানে ঢুকল। একটা গাছের ছায়ায় বসে একজন মজবুত-দেহ বয়স্ক লোক নীচু ডেস্কে কি যেন লিখছে। তার প্রাচীনকালের রোমক দোয়াত, খাগের কলম, পার্চমেণ্ট কাগজ দেখে ভন হায়্বেনের দেহে শিহরণ খেলে গেল।

"কেমন আছ খুড়ো।" লেপাস চেঁচিয়ে বলল। বয়স্ক লোকটি তার দিকে মুখ ফেরাল। লেপাস আবার বলল, "আজ তোমার জন্য এমন একজন অতিথি এনেছি যেমনটি আগে কখনও এই শহরের কোন বাড়িতে আসে নি। এই হচ্ছে অনেক দূরের দেশ জার্মানিয়া হতে আগত বর্বর সর্দার এরিক ভন হায়্বেন।"

তারপর ভন হারবেনের দিকে ঘুরে বলল, "আর এই আমার মাননীয় খুড়ো মশায় সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস।"

সেপ্টিমাস সাদরে ভন হারবেনকে গ্রহণ করল। কুশল-প্রশ্নাদি বিনিময়ের পরে লেপাসকে সঙ্গে দিয়ে তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিল।

এক ঘণ্টা পরে পোশাকাদি বদলে ভন হারবেন আবার যখন একাকি বাগানে ফিরে গেল সেপ্টিমাস তখন সেখান থেকে চলে গেছে।

ভন হারবেন একাই বাগানের ভিতর ঘুরতে লাগল। সমস্ত বাগান জুড়ে রোমীয়-গ্রীক স্থাপত্য ও আফ্রিকার শিল্পকৃতির এক আশ্চর্য সমন্বয় ছড়িয়ে আছে। যত দেখছে ভন হারবেন ততই বিস্মিত ও অভিভূত হচ্ছে।

ঘুরতে ঘুরতে একটা ঝোঁপের বাঁক ঘুরতেই একটি সুন্দরী তরুণীর একেবারে মুখোমুখি হল। তরুণীটিও তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ভন হারবেনের মনে হল, এত সুন্দরী কোন মেয়েকে সে আগে কখনও দেখে নি।

অস্ফুট গলায় মেয়েটি বলল, "তুমি কে?'

ভন হারবেন জবাব দিল, "আমি এখানে নবাগত।'

মেয়েটি বলল, "কাস্ট্রাম মেয়ারের লোক যে নও সে তো দেখতেই পাচ্ছি।"

ভন হারবেন বলল, "তোমার সঙ্গে এভাবে এখানে দেখা হয়ে যাবে তা ভাবি নি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।"

"আগে বল তুমি কে, আর কেনই বা এখানে এসেছ; তার আগে তোমার কথার কোন জবাব দেব না। কে জানে, তুমি তো শত্রুপক্ষের লোকও হতে পার।"

ভন হারবেন হেসে বলল, 'মালিয়াস লেপাস আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। আমি তার খুড়ো সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের অতিথি।"

মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "তা হতে পারে। অতিথি সৎকারের ব্যাপারে বাবার কুখ্যাতি আছে।"

ভন হারবেন প্রশ্ন করল, "তুমি কি ফেবোনিয়াসের মেয়ে?"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ, আমি ফেবোনিয়া। কিন্তু তোমার পরিচয় এখনও দাও নি।"

"আমি এরিক ভন হারবেন; জার্মানিয়া থেকে এসেছি।"

মেয়েটি সোৎসাহে বলে উঠল, "জার্মানিয়া! সিজার জার্মানিয়ার কথা লিখে গেছে বটে। সাঙ্গুইনারিয়াসও লিখেছে। সে দেশ তো অনেক দূরে।"

ভন হারবেন বলল, "সেদিনের পরে এত বেশী শতাব্দীকাল পার হয়ে গেছে যে তার তুলনায় তিন হাজার মাইলের দূরত্বটাকে খুব বেশী বলে মনে হচ্ছে না।"

একটু চুপ করে থেকে ভন হারবেন ডাকল, "ফেবোনিয়া!"

সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে মেয়েটি বলল, "বল।"

"তোমার নামটা বড় সুন্দর। এ রকম নাম আগে কখনও শুনি নি।"

"নামটা তোমার পছন্দ ?"

"খুব।"

হঠাৎ মেয়েটি চমকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ভন হারবেনও পিছন দিকে ঘুরে গেল। একটি তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি সম্পর্কে তারা কেউই সজাগ ছিল না।

ভন হারবেন দেখল, একটি বেঁটে, কৃষ্ণকায় যুবক তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ঝলমলে পোশাক। কোমর থেকে ঝুলছে একটা বেঁটে তরবারি।

যুবকটি বলল, "তোমার এই বর্বর বন্ধুটি কে ফেবোনিয়া ?"

মেয়েটি উদ্ধত কণ্ঠে জবাব দিল, "এ হচ্ছে এরিক ভন হারবেন; আমার বাবা সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের অতিথি। আর এ হচ্ছে ফুলবাস ফুপাস; বাবার প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে ধরাকে সড়া জ্ঞান করে।"

ফুপাস ক্রুদ্ধ চোখ তুলে তাকাল। ঠিক সেই সময় মালিয়াস লেপাস এসে পড়ায় ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াল না। তবে ভন হারবেন বুঝতে পারল যে এই যুবকটি ফেবোনিয়াকে ভালবাসে।

আরও একটু পরে সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস এসে তাদের দলে যোগ দিল। বলল, "এবার সবাই মিলে স্নানে যাওয়া যাক।"

লেপাস ভন হারবেনকে চুপি-চুপি বলল, "খুড়ো এবার সবাইকে নিয়ে সিজারের স্নানাগারে যাবে।"

স্নান সেরে ফুপাস যখন পোশাক বদলাচ্ছে তখন অপর একটি সম্ভ্রান্ত যুবক বলল, "সে কি ফুপাস, এরই মধ্যেই চলে যাচ্ছ ?"

"হ্যাঁ। ভাল লাগছে না।"

"তুমি তো সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস ও তার নতুন অতিথির সঙ্গেই এসেছ; তা লোকটি কেমন ?"

ফুপাস বলল, "দেখ সিসিলিয়াস মেটেলাস। লোকটি নিজের নাম বলছে এরিক ভন হারবেন; জার্মানিয়ার একজন সর্দার; কিন্তু আমার ধারণা অন্য রকম।"

"কি রকম ?"

"আমার ধারণা সে কাস্ট্রা সাঙ্গুইনারিয়াসের গুপ্তচর।"

মেটেলাস মাথা নেড়ে বলল, "না, না, সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়।"

ফুপাস সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "সে বিচার করতে পারে শুধু একজন। আমি তার কাছেই যাচ্ছি।"

"কার কথা বলছ ?" মেটেলাস প্রশ্ন করল।

"প্রাচ্যের সম্রাট ভ্যাল্ডিয়াস অগাস্টাস—তার কাছেই চললাম।"

মেটেলাস বলল, "বোকামি করো না ফুপাস। এর ফলে তুমি কেবল হাস্যাস্পদই হবে; হয়তো আরও খারাপ কিছুও হতে পারে। তুমি কি জান না যে সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র?"

"হয়তো তাই; কিন্তু এ কথাও তো সকলেই জানে যে, সে সম্রাটের ভাইপো কেসিয়াস হাস্টার বন্ধু, আর ভ্যাল্ডিয়াস অগাস্টাস তাকে রাজদ্রোহিতার অপরাধে দেশ থেকে নির্বাসিত করেছে। এই এরিক ভন হারবেন যে কেসিয়াস হাস্টার লোক সে কথা সম্রাটকে বোঝাতে খুব বেগ পেতে হবে না।

সিসিলিয়াস মেটেলাস হেসে উঠল; বলল, "তাহলে চলে যাও, তারপর দড়িতে ঝুলো।"

ফুপাস বলল, "হ্যাঁ, দড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছেই ব্যাপারটা মিটে যাবে; তবে সেখানে ঝুলবে ভন হারবেন, আমি নই।"

৯

রাত নেমে এল শহর কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের বুকে। শহরের কলোসিয়ামের নীচেকার পাথরের কারা-কক্ষের অন্ধকার ঘনতর হয়ে এল। তারাভরা আকাশের একটুমাত্র চতুষ্কোণ অংশ দেখা যাচ্ছে লোহার গরাদ দেওয়া জানালাটার ভিতর দিয়ে।

পাথরের অসমান মেঝেতে বসে দেয়ালে হেলান দিয়ে জানালা দিয়ে টারজন দেখছে চলমান তারার দলকে। লুকেডি ও অন্য সঙ্গীরা ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু টারজন বসে বসে চলন্ত তারাদের দেখছে, আর ঈর্ষায় তার মন ভরে উঠছে। আহা, সেও যদি ওদের মত স্বাধীনভাবে চলতে পারত! এমন সময় একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এল। শব্দটা আসছে মল্ল-ক্ষেত্রের দিক থেকে। মল্ল-ক্ষেত্রের মেঝের উচ্চতা কারা-কক্ষের উঁচু জানালাটার গোবরাটের প্রায় সমান। মল্ল-ক্ষেত্রের বালির উপর দিয়ে কে যেন চুপি-চুপি খুব সতর্কতার সঙ্গে এগিয়ে আসছে। একটু পরেই আকাশের পটভূমিকায় একটি পরিচিত ছায়ামূর্তি দেখা দিল জানালার মাঝখানে। টারজনের মুখে হাসি দেখা দিল। জানালার গরাদের ভিতর দিয়ে গলে নকিমা নেমে এল মেঝেতে।

বলল, "আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে চল। মাটির নীচে এই অন্ধকার ঠাণ্ডা গর্তের মধ্যে বসে আছ কেন?"

টারজন বলল, "সোনালী সিংহ জাদ্-বাল্-জাকে মাঝে মাঝে যে খাঁচায় রাখা হয় সেটা তুমি দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"আমরা খাঁচার দরজা খুলে না দিলে জাদ্-বাল্-জা বেরিয়ে আসতে পারে না। আমিও এখন খাঁচায় বন্দী। ওরা দরজা খুলে না দিলে বাইরে যেতে পারি না।"

কিছুক্ষণ পরে টারজান ঘুমিয়ে পড়ল। তার কোলের মধ্যে কুণ্ডুলি পাকিয়ে নকিমাও ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম ভেঙে উঠে টারজান দেখল, নকিমা চলে গেছে।

একটু বেলা হলে সৈন্যরা এসে কারা-কক্ষের দরজা খুলে দিল। জনৈক ক্রীতদাসসহ একটি শ্বেতকায় যুবক অফিসার ও কয়েকজন সৈনিক ঘরে ঢুকল। অফিসারটি শহরের ভাষায় টারজনকে কিছু বললে সে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল যে, সে কিছুই বুঝতে পারছে না। তখন ক্রীতদাসটি বাগেগোদের ভাষায় কথা বললে টারজন তা বুঝতে পারল। তখন সেই ক্রীতদাসের মারফৎ অফিসার টারজনের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

অফিসার বলল, "তুমি কে, আর একজন সাদা মানুষ হয়ে বাগেগোদের গ্রামে কি করছিলে?"

বন্দী জবাবে জানাল, "আমি অরণ্যরাজ টারজন। এই পাহাড়ে এসে হারিয়ে গেছে এমন আর একটি সাদা মানুষের খোঁজেই আমি এসেছি। পা ফস্কে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলে বাগেগোরা আমাকে বন্দী করে। তোমার সৈন্যরা বাগেগোদের গ্রামে হানা দিয়ে আমাকে ধরে এনেছে। সব কথা তো বললাম; আশা করি এবার তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে।"

অফিসার বলল, "কেন? তুমি কি রোমের নাগরিক?"

"মোটেই না," টারজন বলল: "কিন্তু তার সঙ্গে আমার মুক্তির কি সম্পর্ক?"

"তুমি যদি রোমের নাগরিক না হও তাহলে তো শত্রুপক্ষের লোক হওয়াই সম্ভব। কেমন করে বুঝব যে তুমি কাস্ট্রাম মেয়ার থেকে আস নি?"

টারজন বলল, "কাস্ট্রাম মেয়ার কোথায়? আর সেটা আসলে কি?"

অফিসারটি হেসে উঠল। "তুমি তো খুব চালাক হে।"

টারজন বলল, "আবার বলছি, তোমাদের ঠকাবার চেষ্টা আমি করছি না। একবার আমার কথা বিশ্বাস কর, আর একটা প্রশ্নের জবাব দাও।"

"কি প্রশ্ন?"

"গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আর কোন সাদা মানুষ কি তোমাদের দেশে এসেছে? আমি তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

অফিসার বলল, "সম্প্রতিকালে কোন সাদা মানুষ এ দেশে ঢোকে নি।"

"ঢুকলে তোমরা নিশ্চয়ই জানতে?"

"কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসে ঢুকলে নিশ্চয় জানতাম, কিন্তু সে যদি উপত্যকার পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত কাস্ট্রাম মেয়ারে ঢুকে থাকে তাহলে সেটা আমার জানবার

কথা নয়। কিন্তু তোমার কথার জবাব দিতে আমি এখানে আসি নি; এসেছি তার কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে যে তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে।"

অফিসারের নির্দেশে সৈনিকরা টারজনকে নিয়ে কারা-কক্ষের বাইরে চলে গেল।

শহরের রাজপথ ধরে মাইলখানেক যাবার পরে সকলে একটা খুব বড় বাড়িতে ঢুকল। চওড়া বারান্দা ঘুরে তারা ঢুকল একটা প্রশস্ত কক্ষে। বড় বড় স্তম্ভের উপরে কক্ষের ছাদটা দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই কক্ষের এক প্রান্তে উঁচু বেদীর উপর কারুকার্যখচিত প্রকাণ্ড আসনে বসে আছে একটি দশাসই মানুষ।

ঘরে আরও অনেক লোকের সমাবেশ; সকলেরই পরনে কম-বেশী ঝকঝকে পোশাক-পত্তর। ক্রীতদাস, হরকরা ও অফিসাররা অনবরত আসা-যাওয়া করছে। টারজনকে নিয়ে সকলে একটা স্তম্ভের পাশে অপেক্ষা করতে লাগল।

বাগেগো দোভাষীকে টারজন জিজ্ঞাসা করল, "এটা কোন্ জায়গা? আর দূরের ঐ লোকটিই বা কে?"

"এটা হচ্ছে পাশ্চাত্য দেশের সম্রাটের দরবার-কক্ষ। আর ওই হচ্ছে সাব্‌লেটাস ইম্পারেটার স্বয়ং।"

সম্রাট সাব্‌লেটাসের চেহারা দেখবার মত। সাদা সুতীর টিউনিকের উপর সোনার বর্ম আঁটা; সাদা স্যাণ্ডেলে সোনার বক্‌লস; আর কাঁধের উপর থেকে নেমে এসেছে সিজারদের লাল পৃষ্ঠ-বসন। ভুরুর উপর দিয়ে জড়ানো কারুকার্য-খচিত সাদা ফিতেটা বহন করছে তার মর্যাদার অপর চিহ্ন।

এক সময় একটি লোক এসে অফিসারকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের কাছ থেকে এসেছ?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে বন্দীকে নিয়ে সম্রাটের সামনে হাজির হও।"

সকলে সিংহাসনের অদূরে থামতেই টারজন বাগেগো দোভাষীকে বলল, "সাব্‌লেটাসকে জিজ্ঞাসা কর, কেন আমাকে বন্দী করা হয়েছে; তাকে বল, আমি চাই অবিলম্বে আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক।"

লোকটি ইতস্তত করছে দেখে সাব্‌লেটাস নিজেই জানতে চাইল, "লোকটি কি বলছে?"

"সে কথা সম্রাটকে বলতে আমার ভয় করছে," দোভাষী বলল।

"আমার হুকুম—সব কথা বল," সাব্‌লেটাসের কণ্ঠস্বর গম্ভীর শোনাল।

"সে বলছে কেন তাকে বন্দী করা হয়েছে। আর অবিলম্বে তাকে মুক্তি দেওয়া হোক।"

সাব্‌লেটাস সক্রোধে বলে উঠল, "সাব্‌লেটাস ইম্পারেটরকে হুকুম করতে সাহস করে সে কে?"

দোভাষীর কথা শুনে টারজন বলল, "ওকে বলে দাও যে আমি অরণ্যরাজ টারজন ; আর ওর মতই আমিও হুকুম করতে এবং সেই হুকুম তামিল হতে দেখতেই অভ্যস্ত।"

সে কথা শুনে সাব্‌লেটাস গর্জন করে উঠল, "এই উদ্ধত কুত্তাটাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।"

সঙ্গে সঙ্গে দুটি সৈনিক টারজনকে চেপে ধরল। একজন ধরল ডান হাত, অপরজন বাঁ হাত। কিন্তু হঠাৎ টারজন এত জোরে দু'জনের মাথা ঠুকে দিল যে, তারা অজ্ঞান হয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল, আর সে নিজে বিড়ালের মত অনায়াস ভঙ্গীতে একলাফে সম্রাট সাব্‌লেটাসের বেদীর সামনে পৌঁছে গেল।

সমস্ত ব্যাপারটা এত দ্রুত ও এতই অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে গেল যে, উপস্থিত সকলে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পরবর্তী ভয়ংকর ঘটনাটাও ঘটে গেল। শক্ত থাবায় সম্রাটের কাঁধ দুটো চেপে ধরে টারজন তাকে সিংহাসন থেকে তুলে নিয়ে বারকয়েক সজোরে ঘুরিয়ে দিল। কয়েকজন বর্শাধারী সাব্‌লেটাসকে উদ্ধার করতে ছুটে আসা মাত্রই সম্রাটের গলার চামড়া ও বর্মের নীচটা ধরে টারজন তাকে এমনভাবে তুলে ধরল আত্মরক্ষার ঢালের মত করে যে, পাছে সম্রাটের গায়ে আঘাত লাগে সেই ভয়ে বর্শাধারীরা টারজনকে আক্রমণ করতেই সাহস পেল না।

বাগেগো দোভাষীকে উদ্দেশ্য করে টারজন তীক্ষ্নস্বরে বলল, "ওদের বলে দাও, আমি রাস্তায় নেমে যাবার আগে কেউ যদি আমাকে বাধা দেয় তাহলে সম্রাটের গলাটা আমি ছিঁড়ে ফেলব।"

কথাগুলি শুনে সাব্‌লেটাস তার লোকজনদের হুকুম দিল, তারা যেন টারজনকে আক্রমণ না করে বরং তাকে নির্বিবাদে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যেতে দেয়। ক্রোধে, ত্রাসে ও ক্ষোভে সাব্‌লেটাসের গলা তখন থর্ থর্ করে কাঁপছে।

সদর ফটকের লাল পোশাক-পরা রক্ষী সাব্‌লেটাসকে উদ্ধার করার অনুমতি চাইল। সম্রাটের এ অসম্মানের প্রতিবিধান সে করতে চায়। কিন্তু সম্রাট তাকে বারণ করল। অর্ধনগ্ন বর্বর লোকটি তাদের সম্রাটকে দুই হাতে তুলে ধরে ফটক পেরিয়ে গাছের সারি দিয়ে ঘেরা রাজপথে নেমে গেল। দোভাষী চলল তার আগে আগে।

গিরিবর্ত্মের পশ্চিম প্রান্তের আদিম অরণ্যকে কেটেই কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াস শহরটিকে গড়ে তোলা হয়েছে। শহরের যারা প্রতিষ্ঠাতা তারা আদিম অরণ্যের শুধু ততটুকু জায়গার গাছ-গাছালিই কেটে সাফ করেছিল যতটুকু শহরের পথঘাট, বাড়িঘর ও দোকানপাট ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন হয়েছিল। ফলে পথের দু'ধারে প্রাচীন বনস্পতিগুলি ডালপালা মেলে আজ এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যে, ছোট ছোট বাড়িঘরগুলির উপরে সেগুলি যেন ছায়াময় ছাতা ধরে আছে।

প্রশস্ত রাজপথের মাঝখানে থেমে টারজন সাব্‌লেটাসকে মাটিতে নামিয়ে দিল। চোখ ফিরিয়ে ফটকের দিকে তাকিয়ে দেখল। সৈনিকরা রাজপথে এসে ভিড় করেছে।

টারজন দোভাষীকে বলল, "ওদের প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে ঢুকে যেত বলে দাও; একমাত্র তা হলেই ওদের সম্রাটকে আমি ছেড়ে দেব।"

রক্ষীরা ইতস্তত করছে দেখে সাব্‌লেটাস তাদের বলল টারজনের হুকুম মত কাজ করতে, কারণ বর্বর লোকটির ভারী থাবা এমনভাবে তার গলায় চেপে বসেছে যে, তার কথামত কাজ না হলে যে কোন মুহূর্তে তার ভবলীলা সাঙ্গ হতে পারে।

রক্ষীরা একে একে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে ঢুকে গেল। শেষ রক্ষীটি চলে যাবার পরেই টারজন সম্রাটকে ছেড়ে দিল। সাব্‌লেটাস অতি দ্রুত ফটকের দিকে এগিয়ে চলল, আর রক্ষীরা আবার এসে রাজপথে ভিড় করল। কিন্তু তাদের চোখের সামনেই তাদের শিকার কয়েক পা দৌড়ে গিয়ে এক লাফে একটা বুড়ো ওক গাছের ডালে চড়ে ডাল-পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সাব্‌লেটাস ছুটতে ছুটতে বলতে লাগল, "শিগ্‌গির! ওর পিছু নাও। ওই অসভ্য লোকটাকে যে নামিয়ে আনতে পারবে তাকে এক হাজার দিনার পুরস্কার দেব।"

এদিকে গাছের ডালে-ডালে কিছুদূর গিয়ে টারজন একটা নীচু ছাদের উপর নেমে এক লাফে আর একটা গাছে চড়ে বসল। সে গাছটার ডালপালা ছড়িয়ে আছে অন্দর মহলের প্রাঙ্গণের উপর। কোন লোকজন সেদিকে আসছে কি না দেখবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে টারজন মাটি থেকে মাত্র বিশ ফুট উপরে নেমে এল। এত নিঃশব্দে সে নেমে এল যে, প্রাঙ্গণে দাঁড়ানো দুটি মানুষ কিছুই টের পেল না।

টারজন কিন্তু তাদের ভালভাবেই চিনতে পারল। দুটি যুবক-যুবতী। কিন্তু পূর্বরাগ যেন জমছে না। যুবকটির কণ্ঠে ক্রোধের আভাষ। যুবতীটি সহসা চলে যাবার জন্য পা বাড়াল। যুবকটিও এক লাফে এসে তার হাত চেপে ধরল। যুবতীটি চীৎকার করে উঠল। যুবকটি এক হাতে তার মুখ চাপাদিয়ে আর এক হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল। তার দুর্বল শরীরটাকে বেঞ্চির উপর শুইয়ে দিয়ে নিজের ঠোঁট ছোঁয়াতে গেল মেয়েটির ঠোঁটে। আর তখনই মাটিতে ধপাস্ করে একটা শব্দ হওয়ায় মুখ ফিরিয়ে একটি অর্ধনগ্ন দৈত্যকে দেখে বিস্ময়ে হাঁ করে রইল। দুটি ইস্পাত-ধূসর চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ তার ভয়ার্ত কালো চোখের উপর, দুটি ভারী হাত চেপে ধরল তার টিউনিক; তাকে মেয়েটির শরীরের উপর থেকে তুলে আছড়ে ফেলে দিল এক পাশে।

যুবকটি দেখল, আক্রমণকারী মেয়েটিকে দাঁড় করিয়ে দিল। সে আরও

দেখল, অপরিচিত লোকটি নিরস্ত্র! সঙ্গে সঙ্গে কোষমুক্ত হল ফাস্টাসের তরবারি। উন্মুক্ত ইস্পাত-ফলকের সামনে অসহায় নিরস্ত্র অরণ্যরাজ।

দ্রুত হাতে মেয়েটিকে ধরে সে কাঁধে তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে ফাস্টাসও লাফিয়ে পড়ল তার উপরে। কিন্তু প্রতিপক্ষকে চিনতে তখনও তার অনেক বাকি। শত্রুর দেহকে দ্বিখণ্ডিত করতে সে তরবারি ঘোরাল, কিন্তু কোথায় শত্রু!

এত ক্ষিপ্রগতি ফাস্টাস জীবনে দেখে নি। তিন তিনবার ফাস্টাস তরবারি চালাল প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে, কিন্তু প্রতিবারই সে অস্ত্র বাতাসকেই কেটে বেরিয়ে গেল। বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে যুবতীটি এই অসম যুদ্ধ দেখতে লাগল। পরমুহূর্তেই একটি বাদামী হাত ছিটকে বেরিয়ে গেল, ইস্পাত-কঠিন আঙুলগুলি চেপে বসল রোমকটির কব্জিতে, আর তার হাতের তরবারি ঝন্-ঝন্ শব্দে ছিটকে পড়ল পাথরে বাঁধানো প্রাঙ্গণের উপর। ঠিক সেই মুহূর্তে দুটি সাদা মানুষ ও একটি নিগ্রো রুদ্ধশ্বাসে ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে হাজির হল। তাদের দু'জনের হাতে ছুরি, আর নিগ্রোটির হাতে তরবারি।

নতুন করে তিনজন সশস্ত্র প্রতিপক্ষকে দেখে টারজন প্রমাদ গুণল—তিন-জনের বিরুদ্ধে একজনের লড়াইতে জেতা যে অসম্ভব ব্যাপার। ফাস্টাসের দেহটাকেই ঢাল হিসাবে ব্যবহার করতে সেটাকে তুলতে যেতেই যুবতীটির ইঙ্গিতে তিনজনই থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। যুবতীটি তাকে কি যে বলল টারজন তার কিছুই বুঝতে পারল না।

নিগ্রোটির দিকে নজর পড়তেই টারজন বাগেগো ভাষায় তাকে বলল, "তুমি কি বাগেগো?'

লোকটি অবাক হয়ে বলল, "হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কে?"

যুবতী ও ফাস্টাসকে দেখিয়ে টারজন আবার প্রশ্ন করল, "তুমি কি এদের ভাষায় কথা বল?"

নিগ্রো বলল, "নিশ্চয়। এখানে আমি অনেক দিন যাবৎ বন্দী আছি। আবার বন্দীদের মধ্যেও অনেক বাগেগো আছে; কাজেই মাতৃভাষাটাও ভুলি নি।'

টারজন বলল, "ভাল কথা। তোমার মারফতে এই যুবতী আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবে।"

বাগেগো বলল, "সে জানতে চাইছে তুমি কে, কোথা থেকে এসেছ, এই বাগানে কি করছিলে, এখানে এলেই বা কেমন করে, আর ফাস্টাসের হাত থেকে তাকে রক্ষাই বা করলে কেন, এবং—"

টারজন হাত তুলে বলল, "একবারে মাত্র একটা প্রশ্ন। ওকে বল, আমি অরণ্যরাজ টারজন, এসেছি অনেক দূরের দেশ থেকে, আমাদেরই একজন হারানো

মানুষকে খুঁজতে বন্ধুভাবেই এখানে এসেছি।"

যুবতী বলল, "ডিলেক্টা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। এজন্য আমার বাবা তোমাকে পুরস্কৃত করবে।"

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই একটি যুবক অফিসার এসে হাজির হল। টারজনকে দেখেই তার চোখের চাউনি বদলে গেল; চমকে উঠে সে তরবারির হাতলে হাত রাখল। টারজনও তাকে চিনতে পারল। এ সেই ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস যে তাকে কলোসিয়াম থেকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এসেছিল।

যুবতী বলল, "তরবারি থেকে হাত উঠাও ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস; কারণ এ আমাদের শত্রু নয়।"

"তুমি ঠিক জান ডিলেক্টা? এর সম্পর্কে তুমি কতটা জান?"

"অন্তত এইটুকু জানি যে, এই লোকটি যথাসময়ে এখানে না এলে এই শুয়োরের বাচ্চা আমার অনেক ক্ষতি করতে পারত।" ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে সে ফাস্টাসের দিকে তাকাল।

ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস একবার সাব্‌লেটাসের ছেলে ফাস্টাসের দিকে তাকাল, আর পরক্ষণেই তাকাল টারজনের দিকে। সে যেন উভয় সংকটে পড়েছে।

ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে ফাস্টাস বলল, "এ তোমার লোক। একে নিয়ে আবার কারাগারে ফিরে যাও।"

যুবকটি জবাব দিল, "ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস ফাস্টাসের হুকুমে কাজ করে না। তার কর্তব্য সে ভালই বোঝে।"

ডিলেক্টা বলল, "এই লোকটি আমাকে বাঁচিয়েছে, আর তাকেই তুমি গ্রেপ্তার করবে প্রিক্লেরাস?"

"কি করব বল? এটা আমার কর্তব্য।"

"তাহলে সে কর্তব্য পালন কর," ফাস্টাস বাঁকা হাসি হেসে বলল।

প্রিক্লেরাস রেগে আগুন। বলল, "থাম। ভাল চাও তো এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যাও।"

ডিলেক্টা ক্রীতদাসকে হুকুম করল, "মৃপিংগু, ফাস্টাসকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও।"

ফাস্টাসের মুখ লাল হয়ে উঠল। বলল, "আমার বাবা সম্রাট সব কিছুই শুনতে পাবে। ডিলেক্টা, তুমিও ভুলে যেয়ো না যে, সাব্‌লেটাস ইম্পারেটর তোমার বাবার প্রতিও খুব প্রসন্ন নয়।"

ডিলেক্টা চীৎকার করে বলল, "আমার ক্রীতদাসকে হুকুম করার আগেই তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও!"

দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফাস্টাস বাগান থেকে বেরিয়ে গেল। এবার ডিলেক্টা যুবক অফিসারের কাছে গিয়ে বলল, "এখন আমরা কি করব? এই অপরিচিত

মানুষটি আমাকে ফাস্টাসের হাত থেকে বাঁচিয়েছে, সুতরাং তাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য; আবার একে সাব্‌লেটাসের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া তোমার কর্তব্য।"

ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস বলল, "আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। ম্‌পিংগুকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় তো?"

"তা যায়," ডিলেক্টা বলল।

তখন অন্যদের সেখান থেকে সরিয়ে দিয়ে প্রিক্লেরাস ম্‌পিংগুকে বলল, "নবাগত লোকটিকে বল যে, আমি তাকে বন্দী করতে এলেও সে যদি আমার নির্দেশমত কাজ করে তাহলে ডিলেক্টার অনুরোধে আমি তাকে সাহায্য করতেই চাই।"

টারজন বলল, "কি নির্দেশ? আমাকে কি করতে হবে?"

প্রিক্লেরাস বলল, "তুমি যেন আমার বন্দী এইভাবে আমার সঙ্গে চল। আমি তোমাকে কলোসিয়ামের দিকেই নিয়ে যাব। আমার বাড়ির বিপরীত দিকে পৌঁছেই আমি এমন একটা ইঙ্গিত করব যাতে তুমি বুঝতে পারবে যে, সেটা আমার বাড়ি। তারপরেই আমি এমন সুযোগ করে দেব যাতে তুমি গাছের উপর দিয়ে পালিয়ে আমার বাড়িতে ঢুকে যেতে পার। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি সেখানেই অপেক্ষা করবে। ডিলেক্টা এখনই ম্‌পিংগুকে আমার বাড়ি পাঠাবে তোমার সেখানে যাবার সংবাদটা জানাতে, যাতে প্রাণ দিয়েও তারা তোমাকে রক্ষা করে। বুঝতে পারলে?"

"বুঝেছি," টারজন বলল।

প্রিক্লেরাস বলল, "পরে তোমাকে কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের বাইরে পাহাড়ের ওপারে পাঠাবার একটা ব্যবস্থা আমরা করতে পারব বলেই আশা করি।"

১০

প্রাচ্যের সম্রাট ভালিডাস অগাস্টাসের উপাধিটা বড় হলেও রাজ্যের ভারটা খুব ভারী নয়। রাজ্য ছোট, প্রজার সংখ্যাও সীমিত। তাই আমোদ-আহ্লাদেই তার দিন কাটে।

আজও দরবারের কাজ শেষ করে সম্রাট ফিরে এসেছে প্রাসাদ-উদ্যানে। নিকট বন্ধুদের সঙ্গে বিশ্রাম-আলাপে ঘণ্টাখানেক সময় কেটে যাবে। দূরে দ্রাক্ষাকুঞ্জের অন্তরালে বসে গায়ক ও বাদকের দল সম্রাটের মনোরঞ্জনে ব্যস্ত।

এমন সময় খানসামা এসে খবর দিল, সম্ভ্রান্ত নাগরিক ফুল্‌বাস ফুপাস সম্রাটের দর্শনপ্রার্থী।

সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট জানাল, "ফুল্‌বাস তো জানে এক ঘণ্টা হল দর্শনের সময়

পার হয়ে গেছে। তাকে কাল আসতে বলে দাও।"

খানসামা বলল, "মহামান্য সিজার, সে বলছে যে ব্যাপারটা খুবই জরুরি ; সম্রাটের নিরাপত্তা বিপন্ন বলেই সে এমন অসময়ে এসেছে।"

"তাহলে তাকে এখানেই নিয়ে এস," ভালিডাস হুকুম দিল। খানসামা চলে গেলে পাশের বন্ধুটিকে বলল, "এরা কি এক মুহূর্তের জন্যও আমাকে একটু আরাম করতে দেবে না?"

একটু পরে ফুল্‌বাস হাজির হতেই সম্রাট নিরাসক্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

ফুল্‌বাস বলল, "মহামান্য সিজার, রোমের একজন নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য পালন করতেই আমি এখানে এসেছি। সম্রাটের নিরাপত্তাই আমার প্রধান বিবেচ্য।"

ভালিডাস বলল, "কি আজেবাজে বকছ? ঝটপট আসল কথাটা বলে ফেল।"

"একটি অপরিচিত মানুষ কাস্ট্রাম মেয়ারে এসে হাজির হয়েছে। সে বলছে জার্মানিয়া থেকে এসেছে ; সে একজন বর্বর। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে কাস্ট্রাম স্যাঙ্গুইনারিয়াসের গুপ্তচর ; লোকে বলে, ক্যাসিয়াস হাস্টা সেই শহরেই সাব্‌লেটাসের মাননীয় অতিথি হিসাবে বাস করছে।"

"ক্যাসিয়াস হাস্টা সম্পর্কে তুমি কতটুকু জান, আর এ সবের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কি?" ভালিডাস প্রশ্ন করল।

ফুল্‌বাস ফুপাস তো-তো করে বলল, "এটা শোনা কথা—একটা গুজব যে—"

ভালিডাস চেঁচিয়ে উঠল, "ক্যাসিয়াস হাস্টা সম্পর্কে অনেক গুজব আমার কানে এসেছে। কী আশ্চর্য! আমার ভাইপোকে কি আমি কোন কাজে বাইরে পাঠাতে পারব না; আর পাঠালেই কি কাস্ট্রাম মেয়ারের আহাম্মক লোক-গুলো বিনিদ্র রাত জেগে সে কাজের পিছনে কতকগুলি খারাপ উদ্দেশ্য আবিষ্কার করবে, আর শেষ পর্যন্ত সেটা আমার ঘাড়েই চাপিয়ে দেবে?"

বেকায়দায় পড়ে ভয়ে লাল হয়ে ফুল্‌বাস বলল, "আমি যা শুনেছি, তাই বলছি। আমি নিজে কিছুই জানি না।"

"কি শুনেছ? খুলে বল," ভালিডাস ধমক দিল।

"স্নানাগারে সকলেই বলছে যে, আপনি ক্যাসিয়াস হাস্টাকে বাইরে পাঠিয়েছেন কারণ সে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছিল ; আর সেও সোজা চলে গেছে সাব্‌লেটাসের কাছে ; সেখানে দু'জনে মিলে কাস্ট্রাম মেয়ার আক্রমণের ফন্দি আঁটছে।"

ভালিডাস ধমক দিয়ে বলল, "যত সব বাজে গুজব। কিন্তু বন্দীর ব্যাপারটা কি? এ সবের সঙ্গে তার সম্পর্কই বা কি? তার এখানে আসার কথা আমাকে

জানানোই বা হয় নি কেন ?”

ফুল্‌বাস বলল, “তা আমি জানি না। তবে এই অপরিচিত লোকটিকে আশ্রয় দিয়েছে একজন শক্তিশালী সম্ভ্রান্ত নাগরিক, আর তার উচ্চাকাংখাও কিছু কম নয়।”

“কে সে ?” সম্রাট শুধাল।

“সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস,” ফুপাস বলল।

“সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস ! অসম্ভব !” সম্রাট বলল।

ফুপাস বলল, “মোটেই অসম্ভব নয়। সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের ভাইপো মালিয়াস লেপাসের সঙ্গে ক্যাসিয়াস হাস্টার অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের কথা একবার স্মরণ করলেই মহামান্য সিজার বুঝতে পারবেন যে, সেটা মোটেই অসম্ভব নয়।”

বিচলিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে সম্রাট পায়চারি করতে লাগল। তারপর একজন অফিসারের দিকে ঘুরে বলল, “সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস, মালিয়াস লেপাস ও এই নবাগতের গ্রেপ্তারের হুকুম জারি কর।”

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খানসামা এসে খবর দিল, “সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস দর্শনপ্রার্থী। তার সঙ্গে আছে ভাইপো মালিয়াস লেপাস ও জনৈক অপরিচিত মানুষ।”

“তাদের নিয়ে এস,” খানসামাকে হুকুম দিয়ে ভালিডাস অফিসারকে বলল, “তুমি এখানেই অপেক্ষা কর। দেখি সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের কি বলার আছে।”

একটু পরেই তিনজন বাগানে ঢুকে সম্রাটের দিকে এগিয়ে এল। দু'জন সম্রাটকে অভিবাদন জানিয়ে ভন হার্বেনকে জার্মানিয়ার জনৈক বর্বর সর্দার বলে বর্ণনা করল।

ভালিডাস বলল, “এই বর্বর সর্দারের কথা আমরা আগেই শুনেছি। সে কোথা থেকে এসেছে। আর এদেশে কি করছে ?”

উত্তর দিল ভন হার্বেন নিজে, “আপনার ইতিহাসকাররা যাকে জার্মানিয়া বলে আমি এসেছি সেই দেশ থেকে।”

“জার্মানিয়াতে থাকতেই তুমি আমাদের ভাষা শিখেছিলে ?”

‘হ্যাঁ।”

“কখনও কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসে যাও নি? ”

“কখনও না।”

“রোমে নিশ্চয় গিয়েছ ?” ভালিডাস হেসে শুধাল।

“হ্যাঁ, অনেকবার,” ভন হার্বেন জবাব দিল।

“এখন সেখানে সম্রাট কে ?”

“রোমে কোন সম্রাট নেই।”

“রোমে কোন সম্রাট নেই !” ভালিডাস চেঁচিয়ে উঠল। “তুমি যদি

গুপ্তচর না হও তো একটা বদ্ধ পাগল। হয়তো দুটোই, কারণ পাগল না হলে কেউ কি আশা করতে পারে যে, এই গল্প আমি বিশ্বাস করব? রোমে কোন সম্রাট নেই!"

ভন হার্‌বেন তবু বলতে লাগল, "রোমক সম্রাট বলে কেউ নেই, কারণ রোমক সাম্রাজ্যই নেই। মালিয়াস লেপাস আমাকে বলেছে, গত আঠারো শ' বছর ধরে বাইরের জগতের সঙ্গে তোমার দেশের কোন যোগাযোগ নেই। এই দীর্ঘ সময়ে অনেক কিছু ঘটতে পারে—অনেক কিছুই ঘটেছে। এক হাজার বছর আগে রোমের পতন হয়েছে। কোন জাতি আজ রোমক ভাষায় কথা বলে না; সে ভাষা বোঝে কেবল পুরোহিত ও পণ্ডিতরা। ইতিমধ্যে জার্মানিয়া, গালিয়া ও ব্রিটানিয়ার বর্বর জাতিরা সাম্রাজ্য গড়েছে, এক প্রচণ্ড শক্তিশালী সভ্যতা গড়ে তুলেছে। আর আজ রোম ইতালির একটা শহর মাত্র।"

মালিয়াস লেপাসের মুখ খুশিতে ঝলমল করে উঠল। ফেবোনিয়াসের কানে কানে বলল, "বলেছিলাম না তুমি ওকে ভালবেসে ফেলবে। জুপিটারের দোহাই, ঘণ্টায় পঞ্চাশ হাজার পা চলে যে পাল্কি তার গল্পটা যদি ও ভালিডাসকে বলে তাহলে কী ভালই না হয়!"

ভন হার্‌বেনের কণ্ঠস্বর ও বলার ভঙ্গীতে সন্দেহপ্রবণ ভালিডাসও তার উদ্ভট কাহিনীকে যেন কিছুটা বিশ্বাসই করল। ফুল্‌বাস ফুপাসকে জিজ্ঞাসা করল, "এই লোকটি যে কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের গুপ্তচর কি প্রমাণের ভিত্তিতে তুমি এ অভিযোগ করছ?"

ফুপাস পাল্টা প্রশ্ন করল, "সে যখন কাস্ট্রা মেয়ারের লোক নয়, তখন আর কোথা থেকে আসবে?"

"অর্থাৎ অভিযোগ প্রমাণ করার মত কোন তথ্য তোমার হাতে নেই?"

ফুপাস ইতস্তত করতে লাগল।

ভালিডাস রেগে হুকুম দিল, "বেরিয়ে যাও। পরে তোমার সঙ্গে কথা হবে।"

ফুপাস বেরিয়ে গেলে ভালিডাস কয়েক মিনিট ধরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভন হার্‌বেনের দিকে তাকিয়ে রইল; বুঝি তার অন্তরটাকেই স্পষ্ট করে দেখতে চেষ্টা করল। তারপুর অর্ধ-উচ্চারিত কণ্ঠে নিজের মনেই বলতে লাগল, "তাহলে রোমে কোন সম্রাট নেই। স্যাঙ্গুইনারিয়াস যখন তার বিপুল বাহিনী নিয়ে ইজিপ্টাস থেকে ফিরে আসে তখন সম্রাট ছিল নার্ভা। সেটা নার্ভার রাজত্বকালের দ্বিতীয় বর্ষ অর্থাৎ এই শহরের ৮৪৮তম বর্ষের ফেব্রুয়ারি মাসের ষষ্ঠ দিবস আগেকার ঘটনা। সে দিনের পরে রোমের কোন সংবাদই স্যাঙ্গুইনারিয়াস এবং তার সেনাদলের বংশধরদের কানে এসে পৌঁছয় নি।"

ভন হার্‌বেন অতি দ্রুত স্মৃতির পাতা হাতড়ে প্রাচীন ইতিহাসের সন-

তারিখ ও তথ্য হিসাব করে নিয়ে বলল, "ফেব্রুয়ারি মাসের ষষ্ঠ দিবস আগেকার ঘটনা :

সেটা তো হবে ৮৪৮তম বর্ষের জানুয়ারি মাসের সাতাশ তারিখ—আর খৃস্টপূর্ব ৯৮ সালের সাতাশে জানুয়ারিই তো নার্ভার মৃত্যুর তারিখ।"

ভালিডাস প্রশ্ন করল, "আচ্ছ, নার্ভার পরে কে সম্রাট হয়েছিল তুমি জান ?"

"ট্রোযান" ভন হার্বেন জবাব দিল।

"একজন বর্বর হয়ে রোমের ইতিহাসের এত কথা তুমি জানলে কেমন করে ?"

"আমি যে এই ইতিহাসেরই ছাত্র। সে বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ হওয়াই আমার আকাংখা।"

"নার্ভার মৃত্যুর পর থেকে এইসব ঘটনার কথা তুমি লিখতে পারবে ?"

"যতটা মনে করতে পারি বা যতটা পড়েছি—সব লিখতে পারব ; কিন্তু তাতে তো অনেক সময় লাগবে।"

ভালিডাস বলে উঠল, "একাজ তোমাকে করতেই হবে। সময় তুমি পাবে।"

ভন হার্বেন আপত্তি জানিয়ে বলল, "কিন্তু তোমাদের দেশে দীর্ঘদিন থাকবার পরিকল্পনা তো আমার নেই।"

ভালিডাস বলল, "কিন্তু থাকতে তোমাকে হবেই। প্রাচ্যের সম্রাট ভালিডাস অগাস্টাসের রাজত্বকালের ইতিহাসও তোমাকে লিখতে হবে।"

"কিন্তু—" ভন হার্বেন বাধা দিল।

"খুব হয়েছে। আমি সিজার। এটা আমার হুকুম।"

ভন হার্বেন কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে হাসল। এ যে দেখছি এক সত্যিকারের সিজার। যদিও কয়েক বর্গ মাইল জলাভূমি, এক অজ্ঞাত সুরঙ্গের ভিতর অবস্থিত একটি দ্বীপ ও তার তীরভূমি নিয়েই তার ক্ষুদে সাম্রাজ্য, যদিও তার প্রজার সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারেরও কম, তবু স্বয়ং প্রথম অগাস্টাসও ঐ একই নামধারী ভালিডাসের চাইতে বড় সিজার ছিল না।

ভালিডাস আবার বলল, "এবার তোমাকে নিয়ে যাব, আমার গ্রন্থাগারে, কারণ সেটাই তো হবে তোমার কর্মক্ষেত্র।"

লম্বা বারান্দার শেষ প্রান্তের একটি সুরক্ষিত ভূগর্ভ-কক্ষে গ্রন্থাগারটি অবস্থিত। সেখানে তাকের উপর পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো রয়েছে কয়েকশ' গুটানো তুলোট কাগজ।

তার ভিতর থেকে একটা তুলে নিয়ে ভালিডাস বলল, "এতে আছে স্তাঙ্গুইনারিয়াসের কাহিনী, আর কাস্ট্রাম মেয়ার শহর প্রতিষ্ঠার দিন পর্যন্ত আমাদের দেশের ইতিহাস। এটা তুমি নিয়ে যাও, অবসর সময়ে পড়ে ফেলো। প্রতিদিন সকালে তুমি প্রাসাদে আসবে, আর আমি তোমাকে শোনাব আমার রাজত্বের ইতিহাস। এবার সেপ্টিমাসের সঙ্গে চলে যাও ; কাল সকালে ঠিক

এই সময় সিজারের সঙ্গে দেখা করো।"

প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসে ভন হার্বেন লেপাসকে বলল, "আমি তো বুঝতে পারছি না আমি বন্দী, না অতিথি।"

মালিয়াস লেপাস বলল, "হয়তো দুটোই। তবু তুমি যে আংশিক আতিথ্যও পেয়েছ এটা তোমার, আমার ও ফেবোনিয়াসের মহাভাগ্য। ভালিডাস অগাস্টাস একাধারে গর্বিত, উদ্ধত ও নিষ্ঠুর।"

ভন হার্বেন বলল, "কিন্তু রোমের ইতিহাস লিখতে তো অনেক দিন লাগবে।"

"আর লিখতে অস্বীকার করলে তার অনেক আগেই তোমার মৃত্যু ঘটবে," লেপাস মুচকি হেসে বলল।

সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস বলল, "বাস করার পক্ষে কাস্ট্রাম মেয়ার তো খারাপ জায়গা নয়।"

"হয়তো তোমার কথাই ঠিক," হঠাৎই ফেবোনিয়াস-তনয়ার মুখখানি চোখের সামনে ভেসে ওঠায় ভন হার্বেন বলল।

বাড়ি ফিরে ফেবোনিয়াসের বাগানের গাছের ছায়ায় আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দিয়ে হার্বেন তুলোট কাগজের বাণ্ডিলটা খুলে চোখ বুলোতে লাগল। কিন্তু তার মন তখন স্যাঙ্গুইনারিয়াসের ইতিহাসের পরিবর্তে পড়ে রইল এখান থেকে পালাবার মতলবের দিকে।

একজন বিদ্যোৎসাহী, আবিষ্কারক, গবেষক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হিসাবে এই প্রাচীন দেশে কিছুদিন থাকতে তার ভাল লাগবারই কথা; কিন্তু একটি ভূগর্ভ-গ্রন্থাগারে প্রাচ্যের সম্রাটের মুখোমুখি বসে লাতিন ভাষায় প্রাচীন রোমের ইতিহাস লিখে যাওয়াটা তার মোটেই ভাল লাগছে না।

নতুন পোশাকের খস্‌খসানি ও বাগানের বাঁধানো পথে স্যাণ্ডেলের মৃদু শব্দে তার চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল; চোখ তুলে তাকাল সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের কন্যা ফেবোনিয়ার মুখের দিকে। মেয়েটির মিষ্টি হাসিতে মুহূর্তের মধ্যে তার মন থেকে সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেল প্রাচীন রোমের ইতিহাস, আর এখান থেকে পালাবার অর্ধ-পরিকল্পিত উপায়ের চিন্তা—প্রাতঃ সূর্যের আলোয় যেমন করে মিলিয়ে যায় ভোরের কুয়াশা।

১১

টারজনকে সঙ্গে নিয়ে সৈন্যসামন্তসহ ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস এগিয়ে চলল কলোসিয়ামের দিকে। কিছুদূর গিয়ে প্রিক্লেরাস পথের পাশে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল, আর তার পরেই এসে সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিল।

টারজন বুঝতে পারল, তরুণ অফিসারটি তার বাড়ির নিশানা তাকে বুঝিয়ে দিল।

আরও কয়েক শ' গজ এগিয়ে যাবার পরে অফিসারটি দলবল নিয়ে একটা বড় গাছের ছায়ায় থামল জল খাবার জন্য। রাস্তা পার হয়ে অপরদিকের বাড়ির বাগান-সংলগ্ন ঝর্ণা থেকে জল খেয়ে ফিরে এসে প্রিক্লেরাস ইসারায় জানতে চাইল, টারজন জল খাবে কি না। টারজন সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ায় সে সৈন্যদের আদেশ করল, টারজনকে রাস্তা পার হয়ে ঝর্ণার কাছে যেতে দেওয়া হোক।

টারজন ধীরে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তাটা পার হয়ে গেল। নীচু হয়ে ঝর্ণা থেকে জল খেল। পাশেই একটা বড় গাছ। দ্রুত পায়ে সে গাছটার পিছনে চলে গেল। একটি সৈনিক চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে প্রিক্লেরাসসহ সেনাদলের সকলেই সেদিকে ছুটে গেল। কিন্তু সেখানে পৌছে দেখল, বন্দী হাওয়া হয়ে গেছে।

গাছের ডালে ঝুলতে ঝুলতে টারজন প্রিক্লেরাসের বাড়িতে গিয়ে নামল। ম্‌পিংগু সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করেই ছিল। আর তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল মধ্যবয়সী একটি সম্ভ্রান্ত মহিলা।

মহিলা ম্‌পিংগুকে শুধাল, "এই কি সেই লোক ?"

ম্‌পিংগু বলল, "হ্যাঁ, সেই।"

মহিলা বলল, "ওকে বল যে আমি ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের মা কেস্টিভিটাস; আমার ছেলের পক্ষ হয়ে তাকে এখানে অভ্যর্থনা করছি।"

বিকেলের দিকে বাড়ি ফিরেই ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস টারজনের ঘরে ঢুকল। সঙ্গে সকালবেলাকার সেই দোভাষী লোকটি।

লোকটি টারজনকে বলল, "তোমার দোভাষী ও চাকর হিসাবে আমি এখানেই থাকব।"

প্রিক্লেরাস জানাল, "একমাত্র এই বাড়িটা ছাড়া আর সর্বত্র সম্রাটের লোকরা তন্ন তন্ন করে তোমার খোঁজ করেছে। কোথাও না পেয়ে সাব্‌লেটাসের ধারণা হয়েছে যে তুমি পালিয়েছ। আমরা তোমাকে দিন কয়েক এখানে লুকিয়ে রাখব; তারপর রাতের অন্ধকারে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেব।"

টারজন হেসে বলল, "দিনে বা রাতে যে কোন সময়েই আমি ইচ্ছা করলেই এখান থেকে চলে যেতে পারি। কিন্তু যার খোঁজে আমি এসেছি সে যে এখানে নেই সেটা নিশ্চিত জানতে পারলে তবেই আমি যাব। কিন্তু সর্বপ্রথম তোমার এই করুণার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যদিও এই করুণার কারণ আমি জানি না।"

প্রিক্লেরাস বলল, "কারণটা খুবই সরল। আজ সকালে যে যুবতীটিকে তুমি রক্ষা করেছ সে ডিয়ন স্প্লেন্ডিটার মেয়ে ডিলেক্টা। তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আশা করি, আমার কৃতজ্ঞতার কারণটা এবার বুঝতে পেরেছ।"

"তা পেরেছি," টারজন বলল, "ভাগ্যিস আমি ঠিক সময়ে সেখানে হাজির হয়েছিলাম।"

এবার প্রিক্লেরাস বলল, "এখানে তোমার জীবন যে কোন সময় বিপন্ন হতে পারে। তবু তুমি এখানে থাকতে চাইছ কেন?"

টারজন বলতে লাগল, "আমার এক বন্ধুর ছেলেকে খুঁজতে আমি এখানে এসেছি। অনেক সপ্তাহ আগে সেই যুবকটি আবিষ্কারের নেশায় এই ওয়াই-রামওয়াজি পর্বতে এসে ঢুকেছে। বাইরে থেকেই তার লোকজন তাকে ফেলে পালিয়েছে। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা যে কোন ভাবেই হোক সে এখানেই এসেছে। তাই যদি হয় তাহলে আজ হোক কাল হোক সে তোমাদের এই শহরে আসবেই, আর নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছি যে এখানে এলে তোমাদের সম্রাট তার সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করবে না। তাই আমি এখানে থেকে যেতে চাই তাকে সাহায্য করব বলে।"

প্রিক্লেরাস বলল, "বেশ তো, তাই থাক। আমার বাড়িতে তুমি স্বাগত অতিথি।"

টারজন তিন সপ্তাহ কাটাল ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের বাড়িতে।

ওদিকে ঠিক সেই সময় ভন হার্বেন সুখে দিন কাটাচ্ছে প্রাচ্যের সম্রাটের দরবারে একজন সম্ভ্রান্ত নাগরিকের মর্যাদা নিয়ে। কিন্তু যতই সুখে ও মর্যাদায় দিন কাটুক, আসলে সে যে একজন বন্দীমাত্র এই চেতনা তাকে সর্বদাই বিমর্ষ করে তোলে; সেখান থেকে পালাবার উপায়ের কথা ভাবে। তবু সে সব কিছুই সে ভুলে যায় যখনই সেপ্টিমাস ফেরোনিয়াসের কন্যার কথা তার মনে পড়ে।

এই ভাবেই দিন কাটে। আর অনেক দূরের অন্য এক জগতে একটি ভয়ার্ত ছোট বানর এক সুদূর অরণ্যের প্রান্তে লাফিয়ে বেড়ায় মনের দুঃখে।

১২

আত্মম্ভরিতা কোন বিশেষ কাল, জাতি বা ব্যক্তির একচেটিয়া দোষ নয়; সব কালে, সব দেশেই দোষটা অল্প-বিস্তর দেখা যায়। আর ন্‌কিমাও কোন ব্যতিক্রম নয়। তার মনিব-কন্যা ও প্রিক্লেরাসের পরিবারের লোকজন ছাড়া একমাত্র সেই যে এত বড় একটা গোপন খবর জানে সেটাই মাঝে মাঝে ন্‌কিমার মনকে সুড়সুড়ি দেয়, আর সেও এখানে-সেখানে মুখ খুলে বসে। এতে যে কোন ক্ষতি হতে পারে তা সে বোঝে না। ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাস পরিবারের সে বিশ্বস্ত ভৃত্য। তবু হাটে-বাজারে কখন যে সে কাকে কি বলেছে তাতেই ক্ষতি যা হবার তা হয়েছে।

একদিন বাজার করে ফিরবার পথে হঠাৎ কে যেন তার পিঠে একটা ভারী হাত রাখল। চমকে তাকিয়ে দেখল একজন সেনানায়ককে; তার পিছনে একদল সৈনিক।

সেনানায়ক বলল, "তুমি ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাসের ক্রীতদাস ম্পিংগু?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের সঙ্গে চলে এস।"

ম্পিংগু সভয়ে বলল, "কোথায়? আমি তো কিছু করি নি।"

"সে তর্ক তোমার সঙ্গে করব না। চলে এস।" সেনানায়ক এক ধাক্কায় তাকে সৈনিকদের মধ্যে ঠেলে দিল। সকলে তাকে নিয়ে প্রাসাদের দিকে চলল।

প্রাসাদে পৌঁছবার পরে একজন পদস্থ অফিসার ম্পিংগুকে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগল।

"যে বন্দী তার নাম বলেছে টারজন তুমি তাকে পালাতে সাহায্য করেছ; এমন কি এখনও তাকে লুকিয়ে রেখেছ।"

"আমি তাকে পালাতে সাহায্য করি নি; লুকিয়েও রাখি নি।"

"মিথ্যে কথা। তুমি জান সে কোথায় আছে। অন্য ক্রীতদাসদের তুমি সে কথা বলেছ। বল সে কোথায়।"

"আমি জানি না।"

অফিসারটি সরে গিয়ে একটা ঘণ্টা বাজাল। একটা ক্রীতদাস ঘরে ঢুকলে তাকে বলল, "একজোড়া সাঁড়াশি নিয়ে এস। আর জলন্ত লোহাসমেত একটা আগুনের মালসা।"

সেগুলি আনা হলে অফিসারের নির্দেশে চারজন সৈনিক ম্পিংগুকে মেঝেতে ফেলে তার হাত-পা চেপে ধরল।

অফিসার বলল, "সাঁড়াশিটা দাও।"

ম্পিংগু আর্তনাদ করে উঠল, "দাঁড়াও। সব বলছি।"

"ওকে ছেড়ে দাও। এটাই তোমার শেষ সুযোগ। এখনও বেগড়বাই করলে তোমার জিভ ছিঁড়ে ফেলব, চোখ উপড়ে নেব।"

ম্পিংগু ভয়ে ভয়ে বলল, "সে ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের বাড়িতে লুকিয়ে আছে।"

"এ ব্যাপারে তোমার মনিবের হাত আছে?"

"না। সবটাই ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের ফন্দি।"

"ঠিক আছে। একে নিয়ে কড়া পাহারায় রেখে দাও। খুব সাবধান; ও যেন কারও সঙ্গে কথা বলতে না পারে।"

সম্রাট সাব্লেটাসের কাছে খবরটা পৌঁছতেই সে হুকুম দিল, "সব্বাইকে বন্দী কর।"

অফিসার বলল, "অর্থাৎ ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাস ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস ও টারজনকে?"

"এ তিনজন তো বটেই, তাছাড়াও ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাস ও ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের সমগ্র পরিবার।"

রাজপুত্র ফাস্টাসও সেখানে হাজির ছিল। সে বলল, "একটু অপেক্ষা কর সিজার। এই অসভ্য লোকটা দু-দুবার সৈনিকদের ফাঁকি দিয়েছে। তিলমাত্র আভাষ পেলেই সে আবার পালাবে। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। শোন।"

এক ঘণ্টা পরে জনৈক পত্রবাহক ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাসের বাড়িতে হাজির হল জনৈক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারির বাড়িতে সস্ত্রীক সেনেটরকে নৈশ ভোজে আমন্ত্রণ জানাতে। অপর এক পত্রবাহক গেল ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসকে একজন সম্ভ্রান্ত যুবকের বাড়িতে নৈশ ভোজের আমন্ত্রণ জানাতে।

কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসে রাত নেমে এল। ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাস সস্ত্রীক বাড়ি থেকে বেড়িয়ে গেল নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে; আর ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসও ততক্ষণে এক অন্যতম ধনী যুবকের ভোজ-কক্ষে পানীয়ের বোতলের সামনে বসে গেছে। সেখানে ফাস্টাসকে উপস্থিত দেখে এবং তার প্রতি বন্ধুর মত ব্যবহারের আতিশয্য দেখে প্রিক্লেরাস কেমন যেন বিস্মিত ও বিচলিত বোধ করতে লাগল।

ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের বাড়িতে বসে টারজন ও ফেস্টিভিটাস নানা রকম গল্প-গুজবে সময় কাটাচ্ছে। এমন সময় বাইরের ফটকে একটা অস্পষ্ট টোকার আওয়াজ শোনা গেল। ক্রীতদাস এসে জানাল, ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাসের ক্রীতদাস ম্‌পিংগু এসেছে টারজনের জন্য খবর নিয়ে।

ঘরে ঢুকে ম্‌পিংগু টারজনকে বলল, "আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাসের বাড়ি নিয়ে যেতে।"

"বল কি!" ফেস্টিভিটাস বলল।

"তোমার ছেলে ভোজ-সভায় যাবার পথে আমার মনিবের বাড়িতে নেমেছিল। সেখান থেকে যাবার সময় আমাকে বলে গেল, টারজনকে আমার মনিবের বাড়িতে পৌছে দিতে হবে। আমি শুধু এইটুকুই জানি।"

ফেস্টিভিটাস টারজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "এর যে কি কারণ হতে পারে বুঝতে পারছি না; কিন্তু যথেষ্ট কারণ নিশ্চয়ই আছে, নইলে তোমার ব্যাপারে এতবড় ঝুঁকি সে নিত না।"

টারজন বলল, "কোন বিপদ হবে না। দরকার না হলে তোমার ছেলে আমাকে নিয়ে যেতে লোক পাঠাত না। চল ম্‌পিংগু।"

ফেস্টিভিটাসের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে টারজন উঠে পড়ল।

অল্প কিছু দূর যাবার পরেই ক্রীতদাসটি ইসারায় টারজনকে রাজপথের এক পাশে সরে দাঁড়াতে বলল। সেখানকার নিরেট দেয়ালে একটিমাত্র ছোট দরজা দেখা যাচ্ছে।

মৃপিংগু বলল, "আমরা এসে গেছি।"

টারজন সন্দেহের স্বরে বলল, "এটা তো ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাসের বাড়ি নয়।"

মাত্র একবার বাড়িটাকে দেখেই এই অপরিচিত লোকটি সেটাকে চিনে রেখেছে দেখে মৃপিংগু খুবই অবাক হল। কিন্তু সে ভাব গোপন করে তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "এটা সদর ফটক নয়; পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই সদর ফটক দিয়ে তোমাকে নিয়ে যাওয়াটা ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস নিরাপদ মনে করে নি। এই ফটক দিয়ে গেলেই একটা গলি পাওয়া যাবে। সে গলি দিয়ে পর পর কয়েকটা বাড়িতে যাওয়া যায়। তাই কেউ কোন রকম সন্দেহ করবে না।"

"তাই বুঝি", টারজন বলল। "তুমি আগে চল।"

ফটক খুলে মৃপিংগু টারজনকে ইসারায় ভিতরে ঢুকতে বলল; আর ফটক পেরিয়ে ওপারের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে পা দিতেই প্রায় জনবিশেক লোক টারজনকে চেপে ধরে মাটিতে ফেলে দিল। সে বুঝল, বিশ্বাসঘাতকের হাতে সে ধরা পড়েছে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তার কব্জি বাঁধা পড়ল শক্ত শিকলে।

১৩

দ্বীপ-নগর কাস্ট্রাম মেয়ারে সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের বাগানে চাঁদের আলোয় ভরা আকাশের নীচে এরিক ভন হারবেন যখন ফেবোনিয়ার সঙ্গে প্রেম-গুঞ্জনে রত, ঠিক তখনই সাব্লেটাস ইম্পারেটরের সৈন্যরা অরণ্যরাজ টারজন ও ক্রীতদাস মৃপিংগুকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের কলোসিয়ামের ভূগর্ভস্থ কারা-কক্ষের দিকে,—আর অনেক দূর দক্ষিণে একটি ছোট বানর জঙ্গলের একটি বড় গাছের মগডালে বসে ভয়ে ও শীতে কাঁপছে; নীচের অন্ধকার ছায়ায় গুড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে চিতাবাঘ শীতা।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস ভোজ-সভা ছেড়ে উঠে পড়ল। সম্মানিত অতিথি ফাস্টাসের রকম-সকম ও কথাবার্তা তার ভাল লাগছে না; একটা অজানা আশংকা ছায়া ফেলছে তার মনে।

বাড়ির দরজায় পৌঁছে পাল্কি থেকে নেমেই সে থমকে দাঁড়াল। দরজাটা অর্ধেক খোলা, অথচ কোন ক্রীতদাস সেখানে নেই। সারা বাড়ি অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ ও নিষ্প্রাণ। বাড়ির কেউ বাইরে থাকলে সাধারণত যে নৈশ-বাতিটা জ্বালানোই থাকে সেটাও দেখা যাচ্ছে না। মুহূর্তের জন্য ইতস্তত করে

প্রিক্লেরাস ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুলে ভিতরে পা দিল।....

ওদিকে আর এক ভোজ-সভায় অতিথিদের সকলেরই তখন হাই উঠছে। কিন্তু সম্মানিত অতিথি সম্রাট যতক্ষণ উপস্থিত আছে ততক্ষণ কেউই সভা ছেড়ে চলে যেতেও পারছে না।

কিছুক্ষণ পরে জনৈক অফিসার এসে সম্রাটের হাতে একটা চিরকুট দিল। সেটা পড়ে তার মুখে খুশির রেখা দেখা দিল। বলল, "এইমাত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পেয়েছি। এই সংবাদের সঙ্গে মহান সেনেটর ডিয়ন সৃপ্লেণ্ডিডাস ও তার স্ত্রীর স্বার্থ জড়িত। তাই আমার ইচ্ছা, আমাদের তিনজনকে একাকি রেখে আপনারা সকলেই এখান থেকে চলে যান।"

সকলে চলে গেলে সম্রাট বলল, "অনেক দিন থেকেই গুজব শোনা যাচ্ছে সৃপ্লেণ্ডিডাস যে রাজবেশের প্রতি তোমার মনে মোহ জন্মেছে।"

"এ গুজব যে একেবারেই মিথ্যা তা তো তুমি জান সাব্‌লেটাস," সেনেটর জবাব দিল।

সাব্‌লেটাস সঙ্গে সঙ্গে বলল, "কিন্তু অন্য রকম বিশ্বাস করবার মত যথেষ্ট কারণ আমার আছে। দেখ সৃপ্লেণ্ডিডাস, দুই সিজার কখনও থাকতে পারে না, আর রাজদ্রোহের শাস্তি কি তা তুমি ভাল করেই জান।"

"যে কোন কারণেই হোক সম্রাট যদি স্থির করে থাকে যে আমাকে শেষ করে দেবে তাহলে বৃথা তর্ক করে কোন লাভ নেই," উদ্ধত কণ্ঠে সৃপ্লেণ্ডিডাস বলল।

সাব্‌লেটাস বলল, "কিন্তু আমি অন্য কথা ভাবছি, আর তোমার মৃত্যু ঘটালে আমার পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে পারে।"

"বটে?" সৃপ্লেণ্ডিডাস সবিনয়ে বলল।

"হ্যাঁ। আমার ছেলের ইচ্ছা তোমার মেয়ে ডিলেক্টাকে বিয়ে করে। আমারও তাই ইচ্ছা, কারণ একমাত্র সেই ব্যবস্থাতেই কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের দুটি শক্তিশালী পরিবার মিলিত হতে পারে এবং সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎও সুনিশ্চিত হতে পারে।"

"কিন্তু আমাদের মেয়ে ডিলেক্টা যে অন্যের কাছে বাগ্‌দত্তা।"

"ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের কাছে?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আমার কথাও শুনে রাখ—ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসকে সে কোন দিন বিয়ে করতে পারবে না।"

"কেন?"

"কারণ ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের মৃত্যু আসন্ন।"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

"যদি বলি যে সাদা বর্বর টারজন ধরা পড়েছে তাহলে হয়তো বুঝতে পারবে," বিকৃত হাসির সঙ্গে সাব্‌লেটাস বলল।

ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাস তবু মাথা নেড়ে বলল, "আমি দুঃখিত, সিজারের কথা আমি বুঝতে পারছি না।"

সম্রাট বলল, "পারছ স্প্লেণ্ডিডাস, খুব পারছ। তবু আমি বুঝিয়ে বলছি। সাদা বর্বরটা পালিয়ে যাবার পরে ম্যাক্সিমাস তাকে দেখতে পায় তোমার বাগানে। সেখানে তাদের মধ্যে কি কথা হয়; বর্বরটা পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় ম্যাক্সিমাসেরই বাড়িতে। আজ রাতে সেখান থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তারপর তাকে ও ম্যাক্সিমাসকে পাঠানো হয়েছে কলোসিয়ামের কারা-কক্ষে। এতসব কাণ্ড ঘটে গেছে আর তুমি তার কিছুই জান না—সেটা তো হতে পারে না। তবে এ সবই আমি ভুলে যাব যদি ডিলেক্টা ফাস্টাসকে বিয়ে করে।"

স্প্লেণ্ডিডাস বলল, "আমার মেয়ের কথা তো আমি বলতে পারব না। বরং কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের প্রচলিত প্রথা অনুসারে পুত্র নিজেই তার সঙ্গে কথা বলুক।"

সাব্‌লেটাস উঠে দাঁড়াল। বলল, "মহামান্য সেনেটর ও তার স্ত্রী এবার বাড়ি যেতে পারে। সিজারের কথাগুলি তাদের আর একবার ভেবে দেখতে বলছি। কয়েক দিনের মধ্যেই ফাস্টাস যাবে উত্তরটা জানতে।"

যে সৈনিকরা টারজনকে কারা-কক্ষের মধ্যে ঠেলে দিল তাদের হাতের মশালের আলোয় সে দেখতে পেল, আরও একটি সাদা মানুষ ও জনাকয়েক নিগ্রোকে দেয়ালের গায়ে শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছে। নিগ্রোদের মধ্যে একজন লুকেডি। টারজনকেও শিকলে আটকে দেওয়া হল সাদা মানুষটির ঠিক পাশেই।

সৈনিকরা চলে গেল। কারা-কক্ষ অন্ধকারে ভরে গেল।

পাশের সাদা লোকটি বলল, "তুমিই কি সেই সাদা বর্বর যার সুখ্যাতি কারাগারের মধ্যেও এসে পৌঁচেছে?"

"আমি অরণ্যরাজ টারজন।"

"সাব্‌লেটাসকে তুমিই দুই হাতে মাথার উপর তুলে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে! তাজ্জব ব্যাপার!"

টারজন বলল, "ওসব কথা থাক। তুমি কে, আর কোন্ অপরাধে সিজারের কারাগারে ঢুকেছ?"

লোকটি বলল, "কোন সিজারের কারাগারে আমি ঢুকি নি। যে জীবটা এখন কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের সিংহাসনে বসেছে সে কোন সিজারই নয়।"

"তাহলে সিজার কে?" টারজন প্রশ্ন করল।

"একমাত্র প্রাচ্যের সম্রাটরাই সিজার নামের অধিকারী।"

টারজন বলল, "তাহলে ধরেই নিচ্ছি যে তুমি কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের লোক নও।"

"না। আমি কাস্ট্রা মেয়ারের মানুষ।"

"তাহলে তুমি এখানে বন্দী হলে কেমন করে?"

লোকটি বলল, "সে অনেক কথা। আমার খুড়ো প্রাচ্যের সম্রাট ভালিডাস অগাস্টাস বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে সাব্‌লেটাসের হাতে তুলে দিয়েছে। আমার নাম ক্যাসিয়াস হাস্টা; ভালিডাসের আগে আমার বাবাই ছিল সম্রাট। ভালিডাসের ভয়, আমি হয়তো সিংহাসনের দিকে হাত বাড়াতে পারি। তাই একটা সামরিক মিশনে পাঠাবার নাম করে সে আমাকে সাব্‌লেটাসের হাতে তুলে দিয়েছে।"

"তোমাকে নিয়ে সাব্‌লেটাস কি করবে?" টারজন জানতে চাইল।

"ঠিক তোমাকে নিয়ে যা করবে," ক্যাসিয়াস হাস্টা জবাব দিল। সাব্‌লেটাসের বিজয় উপলক্ষ্যে প্রতি বছর যে উৎসব হয় সেখানে আমাদের হাজির করা হবে, আর মল্ল-ক্ষেত্রে তাদের আমোদের খোরাক জোগাতে আমরা খুনোখুনি করে মরব।"

"সেটা কখন হবে?" টারজন জানতে চাইল।

"আর বেশী দেরী নেই। দেখছ না এখানে কত সাদা ও কালো মানুষকে আটক করে রেখেছে।"

অন্ধকারে লুকেডিকে দেখা যাচ্ছে না, তবু তার দিকে ফিরে টারজন ডাকল, "লুকেডি।"

"বল," লুকেডির গলা শোনা গেল।

"তুমি ভাল আছ তো?"

"আমি তো মরতে বসেছি। ওরা আমাকে সিংহ দিয়ে খাওয়াবে, না হয় ক্রুশে পুড়িয়ে মারবে, অথবা যোদ্ধাদের সঙ্গে আমাকে লড়িয়ে দেবে। লুকেডির কাছে সবই সমান।"

"এইসব লোকই কি তোমাদের গাঁয়ের?"

"না, অনেকেই নানা গ্রাম থেকে এসেছে।"

কে একজন বলে উঠল, "গতকাল ওরা বলেছিল আমরা ওদের আপনজন, আর কালই সিজারের মজার জন্য ওরা আমাদের দিয়ে খুনোখুনি করাবে।"

টারজন বলল, "তোমরা নিশ্চয় সংখ্যায় খুব কম, তাই এই ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছ।"

"মোটেই না; সংখ্যায় আমরা শহরের লোকের দ্বিগুণ। আমরা সকলেই সাহসী যোদ্ধা।"

“তাহলে তোমরা বোকা।”

“আমরা চিরদিন বোকা থাকব না। অনেক লোকই সাব্‌লেটাস ও কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের সাদা মানুষদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত।

“শহরের এবং বাইরের নিগ্রোরা সিজারকে ঘৃণা করে।” কথাগুলি বলল মৃপিংগু। তাকেও টারজনের সঙ্গে বন্দী করে আনা হয়েছে।

লোকগুলির কথাবার্তা টারজনের মনে নতুন চিন্তার খোরাক জোগাল। সে জানে, হাজার হাজার আফ্রিকান ক্রীতদাস শহরে আছে; আরও হাজার হাজার আছে বাইরের গ্রামে গ্রামে। তাদের ভিতর থেকে যদি কোন নেতা মাথা তুলে দাঁড়ায় তাহলে অচিরেই সিজারের অত্যাচারের অবসান ঘটানো যায়।

এই সময় আর একদল সৈন্য এসে কারাগারের বাইরে থামল। ফটক খুললে তাদের মশালের আলোয় টারজন দেখল, আরও একটি বন্দীকে তারা সঙ্গে করে এনেছে। লোকটিকে টানতে টানতে ভিতরে নিয়ে আসতেই টারজন তাকে চিনতে পারল। ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস। প্রিক্লেরাস তাকে চিনতে পেরেও কথা বলল না দেখে টারজনও চুপ করে গেল। প্রিক্লেরাসকে শিকল দিয়ে দেয়ালের সঙ্গে বেঁধে রেখে সৈন্যরা বেরিয়ে গেলে টারজন বলল, “আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের ফলেই তোমার আজ এই দশা হয়েছে।”

প্রিক্লেরাস বলল, “নিজেকে অকারণে দোষী করো না বন্ধু। ফাস্টাস বা সাব্‌লেটাস অন্য যে কোন একটা ছুতো খুঁজে নিত। যবে থেকে ডিলেকটার উপর ফাস্টাসের নজর পড়েছে তবে থেকেই আমার কপাল পুড়েছে। ওরা আমাকে সরিয়ে দিতই। আমি শুধু ভাবছি, কে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করল।”

“আমি,” অন্ধকারেই একজন বলে উঠল।

“কে কথা বলল ?” প্রিক্লেরাস শুধাল।

টারজন বলল, “মৃপিংগু। তোমার সঙ্গে দেখা করতে ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাসের বাড়ি যাবার পথে আমার সঙ্গে তাকেও বন্দী করা হয়েছে।”

“আমার সঙ্গে দেখা করতে !” প্রিক্লেরাস সবিস্ময়ে বলল।

“আমিই মিথ্যা করে ও কথা বলেছি” মৃপিংগু বলল। “ওরা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে।”

“ওরা কারা ?”

“সিজারের অফিসার ও ছেলে। আমাকে সম্রাটের প্রাসাদের মধ্যে টেনে নিয়ে চিৎ করে ফেলে সাঁড়াশি দিয়ে আমার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল, গরম শিক দিয়ে চোখ পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। বল কর্তা, তারপরে আমি আর কি করতে পারতাম ?”

প্রিক্লেরাস বলল, “সব বুঝতে পেরেছি। তোমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না মৃপিংগু।”

কারাগারের ঠাণ্ডা ও শক্ত পাথরের মেঝেতে শুয়েও টারজন একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। সে ঘুম ভাঙল অনেক বেলায় কারাধ্যক্ষের ডাকে। সকলকেই খেতে দেওয়া হল মোটা রুটি ও জল।

খেতে খেতে টারজন অন্য বন্দীদের ভাল করে দেখতে লাগল। কাস্ট্রাম মেয়ারের এক সিজারের পুত্র ক্যাসিয়াস হাস্টা, কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের এক সম্রান্ত নাগরিক সৈন্যাধ্যক্ষ ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস, আর সে নিজে এই তিনজনই সাদা মানুষ। বাকি সকলেই কালো নিগ্রো। তাদের মধ্যে আর এক বাগেগো ওগোন্যেকেও টারজন চিনতে পেরেছে।

দুদিন দু'রাত কেটে গেল। তৃতীয় দিনে আর একটি বন্দীকে সেখানে রেখে রক্ষী-সৈন্যরা চলে গেল।

ক্যাসিয়াস হাস্টা চাপা উত্তেজনায় ডেকে উঠল, "সিসিলিয়াস মেটেলাস, তুমি!"

হাস্টার কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে মুখ ফিরিয়ে অপর যুবক বলে উঠল, "হাস্টা! টার্টারাসের গভীরতম গভীর থেকে উঠে এলেও ও কণ্ঠস্বর আমি চিনতে পারতাম।"

"কোন্ দুর্ভাগ্য তোমাকে এখানে এনে ফেলেছে?" হাস্টা শুধাল।

"যে ভাগ্য আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে আমাকে মিলিত করেছে সেটা দুর্ভাগ্য হতে পারে না।"

"কিন্তু এ ঘটনা ঘটল কেমন করে?"

মেটেলাস বলতে লাগল, "তুমি কাস্ট্রাম মেয়ার ছেড়ে আসার পরে সেখানে অনেক কিছুই ঘটেছে। সম্রাটের ছত্রছায়ায় আশ্রয় নিয়ে ফুল্‌বাস ফুপাস তোমার সব বন্ধুদেরই সন্দেহ করছে। তাদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। এমন কি ফুপাস যদি তার মেয়ে ফেবোনিয়ার প্রেমে না পড়ত তাহলে সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসকেও এতদিন কারাগারে ঢুকতে হত। কিন্তু সব চাইতে বড় দুঃসংবাদ হল, ভালিডাস অগাস্টাস ফুল্‌বাস ফুপাসকে পোষ্যপুত্র নিয়েছে এবং তাকেই পরবর্তী সম্রাটরূপে ঘোষণা করেছে।"

হাস্টা চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ফুপাস হবে সিজার! আর মিষ্টি মেয়ে ফেবোনিয়া? সে কি ফুপাসকে ভালবাসতে পারবে?"

মেটেলাস বলল, "সেখানেই তো গোলমালের মূল। সে ভালবাসে আর একজনকে।"

"কে সে? মাসিয়াস লেপাস নিশ্চয় নয়?"

"না। সে এক অপরিচিত জন। তাকে তুমি দেখই নি।"

ক্যাসিয়াস হাস্টা বলল, "তা কি করে হয়? কাস্ট্রাম মেয়ারের সব সম্রান্ত মানুষকে আমি চিনি।"

"সে কাস্ট্রাম মেয়ারের মানুষ নয়। জার্মানিয়া থেকে আগত এক বর্বর সর্দার।"

"কী বাজে কথা বলছ?" হাস্টা বলল।

"ঠিকই বলছি।"

"তার নাম কি?"

"সে নিজের নাম বলেছে এরিক ভন হার্বেন।"

টারজন বলে উঠল, "এরিক ভন হার্বেন। তাকে তো আমি চিনি। সে কোথায়? নিরাপদে আছে তো?"

মেটেলাস বলল, "মালিয়াস লেপাসের সঙ্গে সেও কাস্ট্রাম মেয়ারের কারাগারে বন্দী। মল্ল-ক্ষেত্রের খেলায় যদি সে বেঁচেও যায়, তাহলে তাকে সরিয়ে দেবার অন্য পথের অভাব ফুপাসের হবে না।"

"মল্ল-ক্ষেত্রের খেলা কবে হবে?" টারজন প্রশ্ন করল।

"অগাস্টের মাঝামাঝি তারিখে," হাস্টা জবাব দিল।

"আমি শুনেছি সে খেলা এক সপ্তাহ ধরে চলে। কাস্ট্রাম মেয়ার যেতে ক'দিন লাগে?" টারজন শুধাল।

মেটেলাস জবাব দিল, "সেনাদলের লাগে আট ঘণ্টা। কিন্তু সে প্রশ্ন কেন? তুমি কি কাস্ট্রাম মেয়ার যাবার কথা ভাবছ নাকি?"

টারজন কঠিন গলায় বলল, "হ্যাঁ।"

মেটেলাস হেসে বলল, "আমাদেরও নিশ্চয় সঙ্গে নেবে।"

টারজন বলল, "তুমি কি ভন হার্বেনের বন্ধু?"

"আমি তার বন্ধুদের বন্ধু, তার শত্রুদের শত্রু। তবে তার সঙ্গে আমার এত ঘনিষ্ঠতা নেই যে তাকে আমার বন্ধু বলতে পারি।"

"কিন্তু সম্রাট ভালিডাস অগাস্টাসের প্রতি তোমার ভালবাসা নেই তো?" টারজন প্রশ্ন করল।

"না।"

"আশা করি ক্যাসিয়াস হাস্টারও তার খুড়োর প্রতি ভালবাসা থাকার কোন কারণ নেই?" টারজনের প্রশ্ন।

"ঠিক ধরেছ," হাস্টা বলল।

"তাহলে তোমাদের দুজনকেই সঙ্গে নেব," টারজন বলল।

দুজনই হেসে উঠল।

ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস বলল, "কাস্ট্রাম মেয়ারে গিয়ে ক্যাসিয়াস হাস্টা যদি আমার বন্ধু থাকে তাহলে আমিও আছি তোমাদের দলে।"

হাস্টা বলল, "কথা দিলাম ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস।"

হাতের শিকল বাজিয়ে মেটেলাস বলল, "কবে আমরা যাত্রা করব?"

টারজন বলল, "যে মুহূর্তে আমার হাতের শিকল খোলা হবে; মল্ল-ক্ষেত্রে নিয়ে যাবার আগে সে কাজটা নিশ্চয় করা হবে।"

"তখন কিন্তু সেখানে অনেক সৈন্য-সামন্ত থাকবে, সেটা মনে রেখো," কাস্ট্রা কথাটা স্মরণ করিয়ে দিল।

টারজন দম্ভভরে বলে উঠল, "ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেয়াসই তোমাদের বলবে যে, দু' দুবার আমি সাব্‌লেটাসের সৈন্যদের মাঝখান থেকে পালিয়েছি। তবে তোমাদের দুজনকে নিয়ে পালানোটা একটু শক্ত হবে; তবু তোমাদের দুজনকে নিয়েই আমি যাব। তার প্রথম কারণ, সাব্‌লেটাসের মতলব ব্যর্থ হলেই আমি খুশি হব; আর দ্বিতীয় কারণ, কাস্ট্রাম মেয়ার শহরে এরিক ভন হার্বেনকে খোঁজার কাজে তোমাদের দুজনকে আমার দরকার হবে।"

ক্যাসিয়াস হাস্টা বলল, "তোমাকে আমার খুব ভাল লাগছে। আমি প্রায় বিশ্বাস করেই ফেলেছি যে এ অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা একমাত্র তোমার পক্ষেই সম্ভব।"

১৪

মেঘমুক্ত আকাশে মস্ত বড় সূর্য উঠেছে। অগাস্ট মাসের প্রভাত। সূর্যরশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে মল্ল-ক্ষেত্রের বালির আস্তরণে আর সমবেত দর্শকদের উপর।

গতরাত থেকেই লোকজন জমতে শুরু করেছে। হৈ-হট্টগোল, চীৎকার-চেঁচামেচিতে আসর সরগরম। কাস্ট্রা স্যাংগুইনারিয়াসের ইতিহাসে আর কোন সম্রাট এত বড ও এমন বিচিত্র বন্দী-সমাবেশ ঘটাতে পারে নি। সিজারের রথের সঙ্গে শিকলে বেঁধে আনা হচ্ছে বন্দীদের। তাদের মধ্যে আছে বাগেগো-সর্দার ন্যাটো, প্রাচ্যসম্রাটের সেনাদলের উপপ্রধান সিসিলিয়াস মেটেলাস, সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র ক্যাসিয়াস হাস্টা। কিন্তু যে বন্দীকে নিয়ে জনতার আগ্রহ সর্বাধিক সে হচ্ছে সাদা বর্বর টারজন; তার মাথাভর্তি কালো চুল, পরনে চিতাবাঘের ছাল; সোনার গলাবন্ধ ও সোনার শিকল দিয়ে তাকে বাঁধা হয়েছে সিজারের রথের সঙ্গে। মাথা উঁচু করে সে সগর্বে হেঁটে চলেছে—যেন সিংহের পাশে চলেছে সিংহ।

সাব্‌লেটাস সদলে এসে তার আসনে বসল। ঠিক পাশেই ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাসের আসন। এক সময় সেও এসে বসল। সঙ্গে মেয়ে ডিলেক্টা।

ডিলেক্টা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সারিবদ্ধ প্রতিযোগীদের দিকে। কিন্তু ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেয়াসকে তাদের মধ্যে দেখতে পেল না। তবে কি? আতংকে শিউরে উঠল ডিলেক্টা।

একটি যুবক পিছন দিক থেকে এসে তার পাশেই বসল। বলল, "সে

এখানে নেই।"

ঘাড় ফিরিয়ে বক্তার দিকে তাকিয়েই মেয়েটি বলে উঠল, "ফাস্টাস। তুমি কি করে জানলে যে সে এখানে নেই?"

"আমার সেই রকম হুকুমই আছে," যুবরাজ বলল।

"সে মারা গেছে।" ডিলেক্টা আর্তনাদ করে উঠল। "তুমি তাকে খুন করেছ।"

"না, সে কারাগারে নিরাপদেই আছে।"

"তার কি হবে?"

"তার ভাগ্য তো তোমার হাতে," ফাস্টাস বলল। "তার আশা ছেড়ে দিয়ে কথা দাও যে তুমি ফাস্টাসের স্ত্রী হবে। তাহলেই আমি দেখব যাতে তাকে মল্ল-ক্ষেত্রে আসতে না হয়।"

মেয়েটি সগর্বে বলল, "তরবারি, ছুরি, বা বর্শা হাতে পেলে. তার কোন জুড়ি নেই। প্রতিযোগিতায় নামলে সে বিজয়ী হবেই।"

"শোনা যায় সিজার নিরস্ত্র মানুষকে সিংহের সঙ্গে লড়িয়ে দেয়।"

"সে তো হত্যা," ডিলেক্টা বলল।

ফাস্টাস বলল, "সিজারের কাজকে বড় কড়া ভাষায় বর্ণনা করা হচ্ছে।"

বাঁকা হাসি হেসে ফাস্টাস উঠে দাঁড়াল। আসন ছেড়ে চলে গেল।

খেলা শুরু হল। প্রথমেই ডাক পড়ল টারজনের। তাকে মল্ল-ক্ষেত্রে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। সে নিরস্ত্র। তার প্রতিদ্বন্দ্বী একটি অতিকায় খুনী। ক্রীড়া-পরিচালক তাকেও পরিয়ে দিয়েছে টারজনের মতই কটিবস্ত্র ও চিতাবাঘের চামড়া।

একজন রক্ষী দুজনকে সঙ্গে করে সম্রাটের আসনের নীচে বালির উপরে দাঁড় করিয়ে দিল।

ক্রীড়া-পরিচালক ঘোষণা করল, এরা দু'জন খালি হাতে যেমন খুশি লড়াই করবে; লড়াইয়ের শেষে যে জীবিত থাকবে অথবা মল্ল-ক্ষেত্রে টিকে থাকবে তাকেই বিজয়ী বলে ঘোষণা করা হবে। কারা-কক্ষের দরজা খোলাই রাখা হবে; দরকার হলে যে কেউ মল্ল-ক্ষেত্র ছেড়ে সেখানে চলে যেতে পারে; কিন্তু মনে রাখতে হবে, যে চলে যাবে তারই হার হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে।

ক্রীড়া-পরিচালক ইঙ্গিত করা মাত্রই দু'জন লড়াইয়ের পায়তাড়া শুরু করল; প্রতিদ্বন্দ্বী লোকটি টারজনকে ভয় দেখাবার জন্যই হুংকার দিতে দিতে সুযোগের অপেক্ষায় ঘুরতে লাগল।

মল্ল-ক্ষেত্রের এক প্রান্তের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, "ওহে বর্বর, ওই দিকে ফটক আছে; এখনও পালিয়ে প্রাণ বাঁচাবার সময় আছে।"

টারজন শান্তভাবে বলল, "আমি ঠিক আছি।"

"পালাও!" বলে হুংকার দিয়ে খুনী লোকটা ক্রুদ্ধ মেষের মত এগিয়ে গেল।

টারজন একলাফে শূন্যে উঠে খুনী লোকটার উপর আছড়ে পড়ল; কিসে কি হল তা কেউ বুঝতে পারল না; শুধু দেখা গেল, মোটা লোকটা সশব্দে বালির উপর পড়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। লোকটা ধীরে ধীরে আবার উঠে দাঁড়াল। তেমনি হুংকার করে আক্রমণ করল। টারজনও সেই একই কায়দায় আবার তাকে মাটিতে ফেলে দিল।

সমবেত দর্শক হৈ-হৈ করে উঠল। তারা চায়, টারজন লোকটাকে মেরে ফেলুক।

সিজারের দিকে তাকিয়ে টারজন বলল, "যা হয়েছে সেটাই কি যথেষ্ট নয়?"

জবাব দিল প্রিফেক্ট, "জনতা ওর মৃত্যু চাইছে। যতক্ষণ লোকটা জীবিত আছে ততক্ষণ তুমি বিজয়ী হতে পার না।"

সাব্‌লেটাসের মুখের দিকে সোজা তাকিয়ে টারজন প্রশ্ন করল, "সিজারও কি চায় এই অসহায় লোকটিকে আমি মেরে ফেলি?"

সম্রাট বলল, "মহামান্য প্রিফেক্টের কথা তো শুনলে।"

টারজন বলল, "বেশ, তাহলে লড়াইয়ের রীতি অনুসারেই কাজ হোক।" অচেতন দেহটাকে দুই হাতে মাথার উপর তুলে জনতার দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাদের সম্রাটকেও ঠিক এইভাবে আমি দরবার-কক্ষ থেকে রাজপথ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলাম।"

সানন্দ চীৎকারে জনতা তাকে সমর্থন জানাল। রাগে ও ক্ষোভে সম্রাটের মুখ লাল হয়ে উঠল। আসন থেকে উঠে দাঁড়াবার আগেই খুনীর দেহটাকে মাথার উপর সবেগে দোলাতে দোলাতে টারজন সেটাকে ছুঁড়ে দিল মল্ল-ক্ষেত্রের প্রাচীরের উপর দিয়ে সাব্‌লেটাসের আসনের দিকে। তার তীব্র আঘাতে সাব্‌লেটাস মেঝেতে ছিটকে পড়ল।

টারজন চেঁচিয়ে বলল, "মল্ল-ক্ষেত্রে এখন আমি জীবিত ও একা। কাজেই আমিই বিজয়ী।"

জনতা হৈ-হৈ করে তাকে সমর্থন করল। স্বয়ং সিজারও সে সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে সাহসী হল না।

১৫

আরামবিহীন সেলের মধ্যে রক্তাক্ত দিনের পর বিশ্রামহীন রাতগুলি এল আর গেল। ক্রমেই বাড়তে লাগল উকুন আর ইঁদুরের সংখ্যা। খেলা শুরু হবার দিন টারজনের সেলে ছিল বারোটি সঙ্গী। এখন দেয়ালে তিনটে শূন্য আংটা ঝুলছে। আর প্রতিদিনই অন্তরা ভাবছে, এবার কার পালা।

টারজন তাদের ভরসা দিয়েছিল এখান থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু সে ভরসার উপর আর তারা ভরসা করতে পারছে না।

প্রিক্লেরাস বলল, “আমরা জানি তুমি আমাদের ভাল করতেই চেয়েছিলে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা তোমার চাইতে আমরাই ভাল জানি।”

টারজন শুধু বলল, “সময় হলেই সব হবে।”

হাস্টা বলল, “সময় আর কবে হবে? সিজারের সেনাবাহিনীর অর্ধেক লোক তো সব সময়ই কলোসিয়ামে হাজির থাকে।”

টারজন বলল, “সব বিজয়ী প্রতিযোগীরা যেদিন একসঙ্গে মল্ল-ক্ষেত্রে হাজির হবে সেইদিন সময় হবে। তখন আমরা একযোগে ছুটে গিয়ে সিজারকে তার আসন থেকে টেনে নামিয়ে আনব মল্ল-ক্ষেত্রের ভিতরে। আর সাব্‌লেটাসকে মুক্তিপণ হিসাবে সামনে রেখে আমাদের সকলের মুক্তি দাবী করব। আমার বিশ্বাস, সিজারের জীবনের বিনিময়ে তারা আমাদের মুক্তি দেবে।”

“কিন্তু সিজারের আসনের কাছে আমরা যাব কেমন করে?” মেটেলাস প্রশ্ন করল।

“মুহূর্তের মধ্যে নতজানু মানুষদের একটা সিঁড়ি আমরা তৈরী করে ফেলব; তাদের উপর পা রেখে রেখে বাকিরা উঠে যাবে সম্রাটের আসনের কাছে। হয়তো আমাদের কিছু লোক মারা যাবে, কিন্তু বাকি অনেকে নিশ্চয় সিজারকে ধরে নীচের বালির উপর নামিয়ে আনতে পারবে।”

প্রিক্লেরাস বলল, “তোমাকে আমার শুভ কামনা জানাই। আমার বিশ্বাস, তুমি সফল হবে। আমিও যদি তোমাদের দলে থাকতে পারতাম।”

“সে কি? তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে না?”

“কেমন করে যাব? আমাকে তো সেলের মধ্যে তালাবন্ধ করে রাখবে। কারাধ্যক্ষ আমাকে বলেছে, কোন প্রতিযোগীতায়ই আমার নাম নেই।”

“কিন্তু তোমাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যাবই,” টারজন বলল।

প্রিক্লেরাস মাথা নেড়ে বলল, “কোন উপায় নেই।”

“দাঁড়াও,” টারজন বলল। “তুমি তো কলোসিয়ামের রক্ষীদলের সেনাপতি ছিলে?”

“হ্যাঁ।”

“তাহলে সেলের চাবিও তোমার কাছে ছিল?”

“হ্যাঁ; হাতের বেড়ির চাবিও ছিল।”

“সেগুলি কোথায়?” টারজন শুধাল।

প্রিক্লেরাস বলল, “সেগুলি আমার ঘরেই আছে। সেই রাতে ভোজ-সভায় যাবার আগে পোশাক বদলাবার সময় সেগুলি আমি সঙ্গে নেই নি।”

টারজন উৎসাহভরে বলে উঠল, “খুব ভাল। চাবিগুলো পেলেই আমাদের

সমস্যার সমাধান হবে।"

"কিন্তু সেগুলো তোমরা পাবে কেমন করে?"

"তা জানি না; তবে এটা জানি যে পেতেই হবে," টারজন বলল।

হাস্টা বলল, "আমরা তো একথাও জানি যে আমাদের মুক্তি পেতেই হবে। কিন্তু জানা আর পাওয়া তো এক কথা নয়।"

এই সময় সেলের দরজা খুলে একটি লোক দুটি মশালবাহী লোকসহ সেলে ঢুকল। সে ফাস্টাস। চারদিকে তাকিয়ে সে বলল, "প্রিক্লেরাস কোথায়? আরে, ওই তো সে।"

পরক্ষণেই উদ্ধত ভঙ্গীতে হুকুম করল, "উঠে দাঁড়াও ক্রীতদাস। সকলেই উঠে দাঁড়াও। সিজারের সামনে বসে আছ কোন্ সাহসে!"

প্রিক্লেরাস ঠাট্টা করে বলল, "তোমার মত লোকের যোগ্য উপাধি শুয়োরের বাচ্চা।"

দরজার বাইরে দাঁড়ানো সৈন্যদের দিকে ফিরে ফাস্টাস বলল, "ওদের টেনে বের কর! বল্লম দিয়ে খোঁচাও!"

তার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল কলোসিয়াম-রক্ষক। দরজা আটকে দাঁড়িয়ে সে সৈন্যদের হুকুম দিল, "সরে যাও। স্বয়ং সিজার ও আমি ছাড়া এখানে হুকুম করার এক্তিয়ার আর কারও নেই। তুমি এখনও সিজার হও নি ফাস্টাস।"

যুবরাজ বলল, "একদিন হব। সেদিন তোমার পক্ষে হবে বড়ই দুর্দিন।"

অফিসার বলল, "সেদিন গোটা কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের পক্ষেই হবে দুর্দিন। তুমি বলেছিলে প্রিক্লেরাসের সঙ্গে কথা বলবে। যা বলার আছে বলে চলে যাও। আমার অধীনস্থ লোকজনদের গায়ে হাত তোলার অধিকার সিজারের ছেলেরও নেই।"

নিরুপায় ফাস্টাস রাগে কাঁপতে লাগল। কিন্তু তার কিছুই করার নেই। ধীরে ধীরে নিজেকে সংযত করে বলল, "আমি এসেছি প্রিয় বন্ধু ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসকে আমার বিয়েতে নিমন্ত্রণ করতে।"

প্রিক্লেরাস কোন কথা বলল না।

ফাস্টাস আবার বলল, "কে সেই কনে তা তো জিজ্ঞাসা করলে না? তুমি কি জানতে চাও না কে হবে কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের পরবর্তী সম্রাজ্ঞী? বেশ, তাহলে আমিই বলছি, ডিয়ন সুপ্লেণ্ডিডাসের কন্যা ডিলেক্টা কোন রাজদ্রোহী শয়তানকে বরণ করবে না। সে চায় কোন সিজারের পাশে সিংহাসনে বসতে। মল্ল-ক্ষেত্রের খেলার শেষ দিনের পরের সন্ধ্যায় ডিলেক্টা ও ফাস্টাসের বিয়ে হবে প্রাসাদের দরবার-কক্ষে।"

প্রিক্লেরাস তবু চুপ করে আছে দেখে রাগে ফাস্টাসের মাথা ঘুরে গেল। ছুটে

গিয়ে প্রিক্লেরাসের গালে একটা চড় মারল, মুখে থুথু ছিটিয়ে দিল। ফলে টারজনের খুব কাছে এসে পড়ায় টারজন ফাস্টাসের গোড়ালিটা চেপে ধরে একটানে তাকে মেঝেতে ফেলে দিল। ফাস্টাস কোমর থেকে তরবারি বের করতেই টারজন একটানে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল [illegible] হাতের মধ্যে।

কলোসিয়াম-রক্ষী বলল, "বেরিয়ে যাও ফাস্টাস। অনেক হয়েছে।"

যুবরাজ হিস্‌হিসিয়ে বলল, "এর জন্য তোমাকে দেখে নেব। তোমাদের সব্বাইকে দেখে নেব।" বলতে বলতে দলবল নিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

ক্যাসিয়াস হাস্টা মুচকি হেসে বলল, "সিজার! শুয়োরের বাচ্চা!"

এই সময় দূর থেকে একটা আলো এসে বারান্দায় পড়ায় মেটেলাস বলল, "আবার কোন্ অতিথি আসছে?"

হাস্টা হেসে বলল, "হয়তো ফাস্টাসই ফিরে এসেছে টারজনের মুখে থুথু দিতে।"

প্রিক্লেরাস বলল, "যে আসছে সে একা আসছে, আর চুপি চুপি আসছে।"

"তাহলে ফাস্টাস নয়?"

"হয়তো তার পাঠানো কোন ঘাতক।"

একটু পরেই সেলের দরজার লোহার জালের ফাঁকে দেখা গেল কলোসিয়ামের রক্ষী-প্রধানকে।

ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস চেঁচিয়ে বলল, "এপ্পিয়াস এপ্লোসাস! বন্ধুগণ, এ কোন ঘাতক নয়।"

এপ্লোসাস বলল, "আমি তোমার দেহের ঘাতক নয় প্রিক্লেরাস, কিন্তু তোমার সুখের ঘাতক।"

"কি বলছ তুমি?"

"রাগের মুখে ফাস্টাস আমাকে এমন কিছু বলেছে যা সে তোমাকে বলে নি।"

"কি বলেছে?" প্রিক্লেরাস শুধাল।

"সে বলেছে, নিজের বাবা, মা, এবং তোমাকে ও তোমার মাকে বাঁচাবার জন্যই ডিলেক্টা তার স্ত্রী হতে রাজী হয়েছে।"

প্রিক্লেরাস বলল, "ওকে শুয়োর বললে শুয়োরকেই অপমান করা হয়। ডিলেক্টাকে তুমি বলে দিও এপ্লোসাস, আমি বরং মরব তবু ফাস্টাসের সঙ্গে তার বিয়ে হতে দেব না।"

অফিসার বলল, "সে কথা সে জানে বন্ধু; কিন্তু সে ভাবছে নিজের বাবা-মার কথা, তোমাদের কথা।"

প্রিক্লেরাসের থুত্‌নি বুকের উপর ঝুলে পড়ল। আর্তকণ্ঠে বলল, "সেটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। তবু যেমন করে হোক এ বিয়ে বন্ধ করতেই হবে।"

এপ্লোসাস বলল, "ভুলে যেয়ো না যে সে সিজারের পুত্র, আর সময়ও অল্প।"

প্রিক্লেরাস আর্তকণ্ঠে বলল, "আমি জানি। আমি জানি। কিন্তু এ যে ভয়ংকর। এ হতে পারে না।"

টারজন বলল, "এই অফিসার তোমার বন্ধু প্রিক্লেরাস?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পার?"

"পারি।"

"তাকেই তোমার চাবিগুলি নিয়ে আসতে বল।"

প্রিক্লেরাসের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "সত্যি তো; একথা তো আমার মাথায় আসে নি। কিন্তু এর ফলে যে বন্ধুর জীবন বিপন্ন হবে।"

এপ্লোসাস বলল, "বিপন্ন তো হয়েই আছে। আজ রাতে ফস্টাসকে যা বলেছি তার পরে সে আমাকে ছেড়ে কথা বলবে না। তোমার কোন্ চাবিগুলি চাই? কোথায় আছে? আমি এনে দিচ্ছি।'

প্রিক্লেরাস বলল, 'আমার ঘরের জানালার কাছে যে বইয়ের তাকগুলি আছে দেখেছ?"

"হ্যাঁ।"

"তৃতীয় তাকটাকে একদিকে ঠেলে দিলে তার পিছনেই চাবিগুলি পাবে।"

'চলি প্রিক্লেরাস; চাবি তোমার হাতে পৌঁছে যাবে।"

কলোসিয়ামের নীচেকার বারান্দা ধরে এপ্লিয়াস এপ্লোসাসের মূর্তি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

খেলার শেষ দিন এসে গেল। রক্তপিপাসু মানুষের দল আবার কলোসিয়ামে সমবেত হয়েছে। সেলের বাসিন্দাদের শেষবারের মত নিয়ে যাওয়া হয়েছে মল্ল-ক্ষেত্রের বেড়ার ধারে। লড়াইতে তাদের ফল ভালই হয়েছে, কারণ বারোটার মধ্যে মাত্র চারটে আংটা শূন্য হয়েছে।

সেলে রয়ে গেছে শুধু প্রিক্লেরাস। সে বলেছে, "বিদায় বন্ধুরা। তোমাদের মধ্যে যারা আজও বেঁচে থাকবে তারা হবে মুক্ত। পরস্পরের সঙ্গে আর আমাদের দেখা হবে না। ভাগ্য তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হোক; ঈশ্বর তোমাদের বাহুতে দিক শক্তি ও কৌশল—এই আমার একমাত্র প্রার্থনা, কারণ যে সাহসের পরিচয় তোমরা ইতিমধ্যেই দিয়েছ তার অধিক সাহস কোন দেবতাও তোমাদের দিতে পারবে না।"

হাস্টা বলেছে, "এপ্লোসাসই কথা রাখল না।"

টারজন বলেছে, "তুমিও যদি আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারতে তাহলে চাবির কোন দরকার হত না প্রিক্লেরাস

মল্লক্ষেত্র থেকে ভেসে আসছে লড়াইয়ের শব্দ, আর্তনাদ, দর্শকদের শিস ও হল্লা। বন্দীরা সবই শুনতে পাচ্ছে, কিন্তু বেড়ার এপার থেকে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

দরজাটা সপাটে খুলে একজন ছোট অফিসার এসে বলল, "তোমরা সকলেই এস। এবার শেষ খেলা।"

তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হল একটা করে তরবারি, ছুরি, বল্লম, ঢাল, ও শনের জাল। একে একে তাদের ঢোকানো হল মল্লক্ষেত্রের ভিতরে। সপ্তাহব্যাপী লড়াইয়ের পরেও বেঁচে আছে এমন শ'খানেক যোদ্ধা সেখানে হাজির ছিল।

তাদের দুই সমান দলে ভাগ করা হল ; এক দলের কাঁধে বেঁধে দেওয়া হল লাল ফিতে, অপর দলের কাঁধে সাদা ফিতে।

টারজান, হাস্টা, মেটেলাস, লুকেডি, ম্‌পিংগু ও ওগোন্নু—সকলেই পড়ল লাল ফিতের দলে।

টারজন হাস্টাকে শুধাল, "আমাদের কি করতে হবে?"

"লালের সঙ্গে সাদার যুদ্ধ চলবে যতক্ষণ না সব লাল অথবা সব সাদা মারা পড়ে।"

দুই দল মল্লক্ষেত্রের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়ল। প্রিফেক্ট লড়াইয়ের নিয়মকানুন শুনিয়ে দিল। ভেরী বেজে উঠল। দুই দল সশস্ত্র মানুষ এগিয়ে চলল পরস্পরের দিকে। শুরু হল দুই দলের মুখোমুখি লড়াই।

১৬

অনেকক্ষণ ধরে লড়াই চলল। 'দংশনক্ষত শ্যেন বিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।' এ এক আশ্চর্য লড়াই। বাঁচার লড়াই। নিয়ম নেই, নীতি নেই। হয় তোমার জীবন যাবে, নয়তো আমার।

এক সময় দেখা গেল লালের দলে আছে পনেরো জন, আর সাদার দলে দশ। বাড়তি পাঁজনকে টারজনই শেষ করেছে। তাই জনতার মুখে মুখে ধ্বনিত হচ্ছে টারজনের নাম ; আর ততই সাব্‌লেটাস রেগে আগুন হচ্ছে। প্রিফেক্টকে কাছে ডেকে চুপি চুপি কি যেন হুকুম করল।

এবার টারজন লড়াইয়ের কায়দা পাল্টালো। তিনজন করে এক একটা দলে ভাগ হয়ে একযোগে আক্রমণ করতে লাগল একজন করে সাদাকে। ফলে একে একে শেষ সাদাটিও খতম হয়ে গেল। রক্তাক্ত লড়াই শেষ হল। লালের দলে তখনও পনেরোজনই বেঁচে আছে।

তখন জনতা সমস্বরে চীৎকার করে বলতে লাগল, বিজয়ীর মালা লালদের

গলায় পরিয়ে দেওয়া হোক, তাদের মুক্তি দেওয়া হোক ; কিন্তু তার পরিবর্তে একমাত্র টারজন ছাড়া বাকি সকলকেই মল্ল-ক্ষেত্রের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল।

সকলে ভাবল, সাব্‌লেটাস হয়তো তাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করতে ইচ্ছুক। কিন্তু এ সব কী হচ্ছে!

ক্রীতদাসরা এসে মৃতদেহগুলিকে মল্লক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল ; পরিত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্রগুলি কুড়িয়ে নিল ; নতুন করে বালি ছড়িয়ে দিল। টারজন যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সিজারের আসনের নীচে, একাকি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

বুকের উপর দুই হাত ভাঁজ করে টারজন দাঁড়িয়েই আছে। কিসের জন্য এ প্রতীক্ষা তাও সে জানে না। জনতার ভিড়ের ভিতর থেকে ভেসে এল একটা অস্পষ্ট আর্তনাদ—ক্রমেই সে আর্তনাদ তীব্রতর হতে হতে প্রচণ্ড ক্রোধের চীৎকারে পরিণত হল, আর সে সব কিছুকে ছাড়িয়ে টারজনের কানে বাজতে লাগল কয়েকটা শব্দ : "অত্যাচারী!" "ভীরু!" "বিশ্বাসঘাতক!" "সাব্‌লেটাস নিপাত যাক!" চারদিকে তাকিয়ে দেখতে পেল, সকলেই আঙুল বাড়িয়ে মল্লক্ষেত্রের অপর প্রান্তে কি যেন দেখাচ্ছে। সেই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে টারজনও এবার দেখতে পেল জয়ের মালা নয়, মুক্তি নয়, তার দিকেই তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কালো কেশরওয়ালা একটা প্রকাণ্ড ক্ষুধার্ত সিংহ।

সিংহটা এগিয়ে আসছে। স্বার্থপর, নিষ্ঠুর জনতা ভুলে গেল টারজনের প্রতি সাব্‌লেটাসের অবিচারের কথা ; আর একটি রক্তাক্ত লড়াই দেখার উত্তেজনায় তারা সিংহটার পক্ষ নিয়েই চীৎকার করতে লাগল।

টারজনের হাতে তখন একটিমাত্র ছুরি ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। তাই নিয়েই সে রুখে দাঁড়াল। মুহূর্তের মধ্যে তার ভিতরে জেগে উঠল এক আদিম জানোয়ার।

সিংহ লাফিয়ে পড়ল। টারজনও একলাফে এগিয়ে গেল তার সামনে। জনতা রুদ্ধশ্বাস, নীরব। এমন কি সাব্‌লেটাস পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে হা করে তাকাল ; ভুলে গেল যে সে সিজার।

সিংহ নুমার পা বালিতে একটু হড়কে যাওয়ায় তার উদ্যত থাবাটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল ; আর সেই মুহূর্তের সুযোগে টারজন একলাফে চড়ে বসল তার পিঠের উপর। এক হাত দিয়ে পেচিয়ে ধরল নুমার কেশর-ঢাকা গলা ; ইস্পাত-কঠিন দুই পা দিয়ে সাঁড়াশির মত চেপে ধরল তার সরু পেট। নুমা মাথাটা ঘুরিয়ে কামড় বসাতে চেষ্টা করল টারজনের দেহে, কিন্তু টারজনের দৃঢ় মুষ্টি ততক্ষণে চেপে বসেছে তার গলায় ; শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে। কোমর থেকে ছুরিটাকে টেনে বের করে টারজন সেটাকে আমূল বসিয়ে দিল সিংহের পেটে। আবার—আবার।

নুমার দুই কস বেয়ে ফেনা ও রক্ত মিলে গিয়ে একসাথে ঝরে পড়তে

লাগল। কাঁপা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে পিঠের উপরকার মানুষটাকে ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে দেবার একটা শেষ চেষ্টা করল। আর তখনই টারজনের হাতের ছুরিটা আর একবার বসে গেল তার পেটের ভিতরে। নাক-মুখ দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত বেরিয়ে এল। তার প্রানহীন দেহটা সপাটে পড়ে গেল রক্তমাখা বালির উপরে।

অরণ্যরাজ উঠে দাঁড়াল; সভ্যতার ক্ষীণতম আবরণটিও বুঝি ঘুচে গেছে। মৃত পশুটির উপর এক পা রেখে যে মানুষটি দাঁড়িয়ে আছে সে কোন ইংরেজ লর্ড নয়—বুঝি কোন মানুষই নয়। সে এক বন্য পশু, মাথাটা আকাশে তুলে জয়োল্লাসে গর্জন করে উঠল বিজয়ী গোরিলার মত। সে গর্জন শুনে সমবেত জনতা স্তব্ধ হয়ে গেল—তাদের বুকের রক্তও বুঝি জমে গেল।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সে আরণ্য মূর্তি বদলে গেল। বদলে গেল মুখ-চোখের ভাব। ঠোঁটে দেখা দিল ঈষৎ হাসি। নীচু হয়ে নুমার কেশরে ছুরির রক্ত মুছে নিয়ে সেটাকে কোষবদ্ধ করল। সমবেত জনতা তার জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল।

সে দৃশ্য দেখে ভয় দেখা দিল সিজারের মনে। যতই চাপা দেবার চেষ্টা করুক, একটা কথা সে ভালই জানে যে রাজ্যের প্রজা-সাধারণ তাকে ভালবাসে না, আর তার ছেলে ফাস্টাসকে ঘৃণা করে।

প্রিযেক্টকে কাছে ডেকে সিজার ফিস্‌ফিস করে আবার তার সঙ্গে কি যেন পরামর্শ করল। বেজে উঠল ভেরী। প্রিযেক্ট উঠে দাঁড়াল। হাত তুলে সকলকে চুপ করতে বলল। হৈ-হট্টগোল থেমে গেল। টারজনের জন্য নতুন কি সম্মান ঘোষণা করা হয় সেটা শুনবার জন্য সকলেই কান পাতল।

প্রিযেক্ট বলতে লাগল, "এই বর্বর লোকটির অসাধারণ ক্রীড়া-কৌশল সম্রাটের এতই ভাল লেগেছে যে তার প্রিয় প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য তাকে দিয়ে আর একটি নতুন খেলার ব্যবস্থা—" প্রিযেক্ট তার কথা শেষ করতে পারল না; বিস্ময়ে ও রাগে সমবেত দর্শকরা হৈ-হৈ করে উঠল। সিজারকে লক্ষ্য করে নানা রকম ধ্বনি দিতে লাগল। উদ্যত বল্লম হাতে সৈনিকরা তাদের ঠেকিয়ে রাখতে লাগল।

এমন সময় মল্লক্ষেত্রের শেষ প্রান্তের ফটকটা সপাটে খুলে গেল।

১৭

মল্লক্ষেত্রের শেষ প্রান্তের দিকে তাকিয়ে টারজন দেখল, ছ'টি গোরিলাকে ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কয়েক মিনিট আগেই মল্লক্ষেত্র থেকে উৎসারিত বিজয়-গর্জন তাদের কানে গেছে; তাই উত্তেজনায় ও হিংস্রতায়

কাঁপতে কাঁপতে তারা খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে। সামনেই দেখতে পেল একটি ঘৃণিত টারমাঙ্গানিকে। যারা তাদের বন্দী করেছে, বিরক্ত করেছে, আঘাত করেছে, এ তো তাদেরই একজন।

একটি গোরিলা গর্জে বলল, "আমি গায়ইাট। আমি খুন করি।"

আর একটিও গর্জে উঠল, "আমি জুঠো। আমি খুন করি।"

গো-ইয়াড খেঁকিয়ে বলল, "টারমাঙ্গানিকে মার।"

তারা হেলে-দুলে এগোতে লাগল।

ওদিকে জনতা শিস দিচ্ছে, আর্তনাদ করছে। সে সব ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে তাদের স্লোগান: "সিজারের পতন হোক!" "সাব্‌লেটাস মুর্দাবাদ!"

উত্তেজিত জনতা উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু উদ্যত বল্লমের শাণিত মুখ তাদের এগিয়ে যেতে দিচ্ছে না। দু' একজন অধিক সাহসী হঠকারী তথাপি সিজারের আসনের দিকে ধাওয়া করতে গিয়ে সৈনিকদের বল্লমের খোঁচায় প্রাণ দিয়েছে। অপর সকলের মনে ত্রাস জাগাবার জন্য তাদের মৃতদেহগুলিকে পথের পাশে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

পাশের জনৈক পার্ষদকে সাব্‌লেটাস ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "সিজারের বিরুদ্ধে যারা মাথা তুলতে সাহস করে এসব দেখে তাদের শিক্ষা হবে।"

পার্ষদ বলল, "ঠিক হয়েছে। মহামান্য সিজার সর্বশক্তিমান।" মুখে কথাগুলি বলল বটে, কিন্তু সামনে তাকিয়ে ভয়ে তার ঠোঁট নীল হয়ে গেল। কাতারে কাতারে জমা হয়েছে সাধারণ মানুষ; সে তুলনায় বাধাদানকারী বল্লমধারী সৈন্যের সংখ্যা নগণ্য।

গোরিলারা এগিয়ে চলল। সকলের সামনে জুঠো। সে বলল, "আমি জুঠো। খুনে।"

টারজন বলল, "বন্ধুকে খুন করার আগে ভাল করে তাকাও জুঠো। আমি অরণ্যরাজ টারজন।

জুঠো অবাক হয়ে থেমে গেল। অন্যরা তাকে ঘিরে দাঁড়াল। জুঠো বলল, "এ টারমাঙ্গানি যে গোরিলাদের ভাষার কথা বলে।"

গো-ইয়াড বলল, "আমি ওকে চিনি। আমি যখন যুবক ছিলাম তখনও ছিল রাজা।"

গাইয়াট বলল, "সত্যি তো এর চামড়া সাদা।"

টারজন বলল, "হ্যাঁ, আমি সাদা-চামড়া। এখানে আমরা সকলেই বন্দী। এইসব টারমাঙ্গানিরা আমাদের শত্রু, তোমাদের শত্রু। ওরা চায় আমরা পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি, কিন্তু আমরা তা করব না।"

জুঠো বলল, "না, আমরা টারজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না।"

সাব্‌লেটাস পাশের অতিথিকে শুধাল, "কি ব্যাপার? ওরা ওকে আক্রমণ

করছে না কেন ?"

"লোকটা ওদের মন্ত্রে বশ করেছে," অতিথি বলল।

উপস্থিত জনতা হা করে দেখছে। একটি মানুষ ও একদল পশু পরস্পরের দিকে গজরাচ্ছে। এইভাবে যে ওরা কথা বলছে তা জনতা বুঝবে কেমন করে ? তারা দেখল, টারজন সিজারের আসনের দিকে এগিয়ে চলেছে; গোরিলারা হেলে-দুলে চলেছে তার পাশে পাশে।

সম্রাটের আসনের নীচে পৌছে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। টারজন তাকাল মল্লক্ষেত্রের চারদিকে। সমস্ত দেওয়ালটা ঘিরে দাড়িয়ে আছে বল্লমধারী সৈনিকরা। তাদের হাত এড়িয়ে টারজনের পক্ষেও এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। সাব্‌লেটাসের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার সব ফন্দি ব্যর্থ হয়েছে সিজার। এরা সবাই আমার আপনজন। আমার কোন ক্ষতি এরা করবে না। বরং আমার এক কথায় এরা গিয়ে তোমাকেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবে।"

সে কাজ টারজন অনায়াসেই করতে পারত, কিন্তু তার পরেই তো সৈনিকদের হাতের বল্লমের আঘাতে তারও ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। তাছাড়া, নিজে পালিয়ে যাবার আগে ক্যাসিয়াস হাস্টা ও সিসিলিয়াস মেটেলাসকেও তো সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে; তাদের সাহায্য ছাড়া সে তো এরিক ভন হার্বেনের খোঁজই করতে পারবে না।

তাই প্রিফেক্ট যখন আবার তাকে ও গোরিলাদের কারাগারে ফিরিয়ে নিতে এল তখন সে কোনরকম বাধাই দিল না। মল্লক্ষেত্রের ফটক বন্ধ হয়ে গেলে আবার একবার তার কানে এল জনতার সমবেত কণ্ঠস্বর: "সাবলেটাসের পতন হোক।"

কারাধ্যক্ষ সেলের দরজা খুলে দিতেই টারজন দেখল সেখানকার একমাত্র বাসিন্দা ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস।

রোমকটি বলল, "স্বাগত টারজন। তোমাকে আবার দেখতে পাব ভাবি নি। কিন্তু তুমি তো মারাও যাও নি। আবার মুক্তিও পাও নি—এটা কেমন করে হল ?"

টারজন হেসে বলল, "সেটাই তো সিজারের ন্যায় বিচারের মহিমা। কিন্তু সে কথা থাক। আমার বন্ধুরা তো মুক্তি পেয়েছে, কারণ তাদের কাউকেই এখানে দেখছি না।"

কারাধ্যক্ষ বলল, "সে গুড়েও বালি; তোমার বন্ধুদের শিকলে বেঁধে রাখা হয়েছে অন্য একটা সেলে।"

"কিন্তু তারা তো নিজেদের মুক্তি অর্জন করেছে," টারজন বলল।

"সে তো তুমিও করেছ; কিন্তু মুক্তি পেয়েছ কি ?"

প্রিক্লেরাস বলল, "এ অন্যায়; এ হতে পারে না।"

"কিন্তু তাই হয়েছে," কারাধ্যক্ষ বলল।

"কিন্তু কেন ?" প্রিক্লেরাস জানতে চাইল।

কারাধ্যক্ষ বলল, "কি করে তুমি ভাবলে যে একজন সাধারণ সৈনিক সিজারের মনের কথা জানবে ? তবে এর কারণ হিসাবে একটা গুজব আমি শুনেছি। সর্বত্র রাজদ্রোহের হাওয়া বইছে। সিজার তোমাকে ও তোমার বন্ধুদের ভয় করছে, কারণ জনতা তোমাকে সমর্থন করে আর তুমি সমর্থন কর ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাসকে।"

প্রিক্লেরাস বলল, "বুঝেছি ; তাহলে তো অনির্দিষ্টকালের জন্য আমাদের এখানেই থাকতে হবে।"

"তা বলতে পারি না," বলে মুচকি হেসে কারাধ্যক্ষ দরজায় তালা লাগিয়ে চলে গেল।

গাঢ় অন্ধকার নেমে এল শহরের বুকে। কারাকক্ষের ম্লান আলোও যেন মুছে গেল। এক সময়ে দুজনেরই মনে হল, একটা কাঁপা আলোয় বাইরের বারান্দার অন্ধকার যেন কিছুটা ফিকে হয়ে আসছে। আলোটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। তারা বুঝল, জলন্ত মশাল নিয়ে কেউ এগিয়ে আসছে।

একটি লোক তাদের সেলের সামনে এসে চাবি লাগিয়ে তালাটা খুলে ফেলতেই প্রিক্লেরাস তাকে চিনতে পারল।

হাঁক দিয়ে বলল, "এপ্লিয়াস এপ্লোসাস ! তুমি এসেছ !"

"শ্-স্-স্।" দরজাটা সন্তর্পণে বন্ধ করে দিয়ে সেলটাকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে এপ্লোসাস দেয়ালের গায়ে চেপে মশালটা নিভিয়ে ফেলল। "ভালই হল যে মাত্র তোমরা দুজনই আছ," বলে সে দুজনের পাশে বসে পড়ল।

প্রিক্লেরাস বলল, "তুমি কাঁপছ। কি হয়েছে ?"

"কিছু হয় নি, কিন্তু হতে চলেছে। তোমরা হয়তো অবাক হয়েছ কেন আমি চাবি নিয়ে আগে আসি নি। আসা সম্ভব ছিল না।"

"কিন্তু কলোসিয়ামের প্রধান রক্ষীর পক্ষে সেটা এত শক্ত কাজ হবে কেন ?"

আমি আর প্রধান রক্ষী নই। যে কারণেই হোক সিজারের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, আর তোমরা এখান থেকে চলে যাবার পরেই আমাকে পদচ্যুত করা হয়েছে। কলোসিয়াম থেকে সরিয়ে আমাকে টানা ডিউটি দেওয়া হয়েছে পোর্টা প্রিটোরিয়াতে। এমন কি আমার বাড়িতে পর্যন্ত আমাকে যেতে দেওয়া হয় নি।

"একটা খুব খারাপ গুজব কানে আসায় মাত্র একঘণ্টা আগে সব রকম বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমি সেখান থেকে চলে এসেছি।"

"কি গুজব ?" প্রিক্লেরাস জানতে চাইল।

"প্রাসাদরক্ষীদলের একজন অফিসারের উপর আদেশ হয়েছে আজ রাতেই সে তোমাদের সেলে এসে দুজনকেই খুন করবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি ফেস্টি-

ভিটাসের কাছে চলে যাই এবং চাবি নিয়ে আসি। এই নাও চাবি, আর যদি অন্য কিছু করণীয় থাকে তো বল।”

প্রিক্লেরাস বলল, “না বন্ধু, ইতিমধ্যেই তুমি যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়েছ। এখনই তোমার ঘাঁটিতে ফিরে যাও।”

এপ্লোসাস বলল, “তাহলে বিদায়। আমার শুভেচ্ছা রইল। যদি এ শহর ছেড়ে যেতে হয় তো মনে রেখো যে এপ্পিয়াস এপ্লোসাস আছে পোর্টা প্রিটোরিয়াতে।”

প্রিক্লেরাস বলল, “বন্ধুর কথা আমি ভুলব না; তবে তোমার বন্ধুত্বের উপর বোঝা চাপাতে চাই না।”

সেল থেকে বের হতে গিয়েও এপ্লোসাস হঠাৎ দরজার কাছে থেমে গেল। বলল, “দেরী হয়ে গেছে বন্ধু। ঐ দেখ।”

অনেক দূরের মশালের আলো বারান্দার অন্ধকারকে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছে।

প্রিক্লেরাস ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, “ওরা আসছে। তুমি পালাও।”

এপ্লোসাস পালাল না। দ্রুত দরজার এক পাশে গেল। তার হাতে স্প্যানিশ তরবারি। বারান্দা থেকে তাকে যাতে দেখা না যায় এমনভাবে সে অপেক্ষা করে রইল।

বারান্দা দিয়ে মশালটা দ্রুত এগিয়ে এল। পাথরের উপর স্যাণ্ডালের শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। টারজন বুঝল, যে আসছে সে একা। লম্বা কালো আলখাল্লায় ঢাকা একটি লোক জাল-লাগানো দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। মশালটা মাথার উপরে ধরে ভিতরে উঁকি দিল।

ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, “ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস। তুমি ভিতরে আছ কি?”

“হাঁ।”

“ভাল। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না এটাই সঠিক সেল কি না।”

“কি সংবাদ?” প্রিক্লেরাস প্রশ্ন করল।

“আমি সিজারের কাছ থেকে আসছি। সে একটা চিরকুট পাঠিয়েছে।”

“খুব কড়া কি?”

“কড়া এবং ছুঁচলো।”

“তুমি আসবে আমরা জানতাম।’

“জানতে?”

“অনুমান করেছিলাম, কারণ সিজারকে আমরা চিনি।”

তরবারি বের করে দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলে অফিসার বলল, “তাহলে ঈশ্বরের নাম কর, কারণ তোমাদের মৃত্যু আসন্ন।”

সঙ্গে সঙ্গে এপ্লোসাসের তরবারি তার শিরস্ত্রাণ ভেদ করে মাথায় আঘাত করল। লোকটি মাটিতে পড়েই মারা গেল। বাঁ হাতের মশালটা

মেঝেতে পড়ে নিভে গেল।

প্রিক্লেয়াস এপ্রোসাসকে বলল, "এবার চলে যাও। যাদের জীবন তুমি বাঁচালে তাদের কৃতজ্ঞতা তোমাকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করুক।"

এপ্রোসাস বলল, 'এতো ভালই হল। তোমার চাবি পেয়ে গেলে; তার অস্ত্রশস্ত্র পেলে; সব জানাজানি হবার আগেই পালাবার যথেষ্ট সময়ও পেলে। বিদায়, আবার বিদায়। ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করুক।

হাতের বেড়ি খুলে তারা সোজা হয়ে দাঁড়াল। অন্ধকার বারান্দা দিয়ে সেল থেকে সেলে ঢুকে সব বন্দীকেই মুক্ত করে দিল। শুধু নিজেদের দলের লোকই নয়। আরও যে সব পেশাদার যোদ্ধাকে সিজার আটকে রেখেছিল তাদেরও মুক্তি দেওয়া হল।

সকলেই একবাক্যে টারজনের নেতৃত্বকে মেনে নিল।

টারজন বলল, "আমরা সকলে হয়তো জীবিত অবস্থায় বেরিয়ে যেতে পারব না, কিন্তু যারা পারবে তারা অবশ্যই সিজারের অবিচারের প্রতিশোধ নেবে।"

জনৈক যোদ্ধা বলল, "তুমি ন্যায় করেছ কি অন্যায় করেছ জানি না: আমরা বাঁচব কি মরব তাও বুঝি না; শুধু বুঝি লড়াই—যুদ্ধ।"

টারজন বলল, "যুদ্ধ তোমরা পাবে—প্রচুর যুদ্ধ।"

"তাহলে আমাদের পরিচালনা কর।"

টারজন বলল, "কিন্তু তার আগে আমার বাকি বন্ধুদের মুক্তি দিতে হবে।"

প্রিক্লেরাস বলল, "সব সেল আমরা খালি করে দিয়েছি; আর কেউ কোথাও নেই।"

"আছে বন্ধু, আছে," টারজন বলল; "এখনও বাকি আছে আমার গোরিলা বন্ধুরা।"

১৮

কাস্ট্রাম মেয়ারে ভালিডাস অগাস্টাসের কারাগারে এরিক ভন হারবেন ও মালিয়াস লেপাস সুদিনের জন্য অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু সুদিন কি আসবে?

লেপাস বিষণ্ন গলায় বলল, "মৃত্যু ছাড়া আর কিই বা আমরা আশা করতে পারি। আমাদের বন্ধুরা ক্ষমতাচ্যুত, কারাগারে বন্দী, না হয় নির্বাসিত।"

"আর সব দোষ আমার," ভন হারবেন বলল।

"নিজেকে অকারণে দোষী করো না। ফেবোনিয়া তোমাকে ভালবেসেছে সেটা তো তোমার অপরাধ নয়। আসল অপরাধী কুচক্রী ফুপাস।"

ভন হারবেন তবু বলতে লাগল, "আমার ভালবাসাই ফেবোনিয়ার বিপদ

ডেকে এনেছে, তার বন্ধুদের বিপন্ন করেছে। আর আমি এখানে পাথরের দেয়ালে শিকলে বন্দী হয়ে আছি। কিছুই করতে পারছি না।"

লেপাস বলে উঠল, "আহা, এ সময় ক্যাসিয়াস হাস্টা যদি এখানে থাকত! একটা মানুষের মত মানুষ। সিজার পোষ্যপুত্র নিয়েছে ফুপাসকে। এ পরিস্থিতিতে হাস্টার-নেতৃত্ব পেলে গোটা শহর ভালিডাস অগাস্টাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াত।"

সেই সময়ে উপত্যকার অপর প্রান্তে কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াস শহরে সাবলেটাসের দরবার-কক্ষে নিমন্ত্রিত লোকরা একে একে জড় হতে শুরু করেছে, কারণ সেই সন্ধ্যায়ই সিজার-পুত্র ফাস্টাসের বিয়ে হবে ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাসের কন্যার সঙ্গে।

রাজপথে পথে, এমন কি রাজপ্রাসাদের ফটকের ভিতরেও প্রচণ্ড ভিড় জমে গেছে। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি, হৈ-হল্লার শেষ নেই। জনতার চোখে-মুখে প্রচণ্ড ক্রোধ। আর সে ক্রোধ প্রকাশের মন্ত্র—"অত্যাচারীর পতন হোক!" "সাবলেটাস মুর্দাবাদ!" "ফাস্টাস মুর্দাবাদ!"

ওদিকে প্রাসাদের উপরের ঘরে ক্রীতদাসী-পরিবৃত হয়ে বসে আছে বিয়ের কনে, মা তাকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

ডিলেক্টা বলছে, "তা হবে না; কিছুতেই আমি ফাস্টাসের স্ত্রী হব না।" ঘাঘরার নীচে দৃঢ়মুষ্টিতে সে ধরে আছে একটা সরু ছুরির হাতল।

কলোসিয়ামের নীচেকার বারান্দায় টারজন তার সেনাসমাবেশ নিয়ে ব্যস্ত। লুকেডি ও সহ-বন্দী জনৈক গ্রাম-প্রধানকে ডেকে বলল, "তোমরা পোর্টা প্রিটোরিয়াতে চলে যাও। সেখানে এক্সিয়াস এপ্রোসাসকে বলবে, ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের খাতিরে তোমাদের যেন শহর থেকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হয়। তারপর গ্রামে গ্রামে গিয়ে যোদ্ধা সংগ্রহ করবে। তাদের বলবে, তারা যদি সিজারের উপর প্রতিশোধ নিতে চায়, যদি চায় স্বাধীন মুক্ত জীবন, তাহলে তাদের অবিলম্বে শহরে এসে এখানকার বিদ্রোহী নাগরিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অত্যাচারীকে ধ্বংস করতে হবে। তাড়াতাড়ি চলে যাও; সময় বড়ই অল্প। সকলকে সঙ্গে নিয়ে পোর্টা প্রিটোরিয়ার পথে শহরে ঢুকে সোজা চলে যাবে সিজারের প্রাসাদে।"

* * *

দলে দলে লোক আসতে লাগল। বাইরের গ্রাম থেকে অর্দ্ধ-নগ্ন যোদ্ধার দল, শহরের ক্রীতদাসের দল, আর সমাজচ্যুত মানুষের দল যাদের মধ্যে আছে খুনী, চোর ও পেশাদার মল্লযোদ্ধা। সকলের আগে আগে চলেছে প্রিক্লেরাস, হাস্টা, মেটেলাস ও টারজন। টারজনকে ঘিরে চলেছে গাইয়াট, জুঠো, গো-ইয়াড ও অন্য গোরিলারা।

পরিকল্পনা অনুসারে প্রিক্লেয়াস জনৈক অফিসারের অধীনে একদল সৈন্যকে পাঠাল পোর্টা প্রিটোরিয়াতে। তাদের নির্দেশ দেওয়া হল, এম্লিয়াস এপ্লোসাস যদি অনুরোধ না শোনে তাহলে যেন জোর করে বন্দর-এলাকা দখল করা হয়, যাতে বাইরের গ্রামের যোদ্ধারা বিনা বাধায় শহরে ঢুকতে পারে।

প্রশস্ত রাজপথ "ভায়া প্রিন্সি প্যালিস" বড় বড় সব গাছে ঢাকা থাকায় রাতের অন্ধকারে একটা সুড়ঙ্গের রূপ নিয়েছে। সেই পথে কয়েকজন মশালধারীর পিছন পিছন টারজন প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল অনুগামীদের নিয়ে।

ফটকে শান্ত্রী চেঁচিয়ে বলল, "কে আসে?"

"আমি অরণ্যরাজ টারজন।"

সমবেত জনতা এক কণ্ঠে তার জয়ধ্বনি করে উঠল।

"কেন তোমরা এখানে এসেছ? কি চাও?"

"আমরা এসেছি ফাস্টাসের হাত থেকে ডিলেক্টাকে উদ্ধার করতে, আর কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের সিংহাসন থেকে অত্যাচারীকে টেনে নামিয়ে দিতে।"

হাজার কণ্ঠ এই ঘোষণাকে সমর্থন জানিয়ে বলল, "অত্যাচারী মুর্দাবাদ!" "প্রাসাদ-রক্ষী মুর্দাবাদ!" "তাদের হত্যা কর—হত্যা কর!"

জনতা দৃঢ়পদক্ষেপে প্রাসাদ-ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

সংবাদ-বাহক ছুটে গেল দরবার-কক্ষে সিজারের কাছে। ভাঙা গলায় বলল, "জনতা বিদ্রোহ করেছে। সেনাদল, মল্লযোদ্ধা ও ক্রীতদাসরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা ফটকের উপর ভিড় করছে। ফটক ভেঙে পড়বে।"

সিজার বিচলিত হয়ে ঘরময় পায়চারি করতে করতে এক সময় থেমে গিয়ে প্রাসাদের সব অফিসারদের ডেকে পাঠাল। তারা সম্রাটের সামনে হাজির হলে হুকুম দিল, "প্রতিটি ফটকে, প্রতিটি সেনা-বারিকে খবর পাঠাও। সব সৈন্যদের এনে ফটকে মোতায়েন কর। বিদ্রোহীদের তারা খতম করুক। কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের রাজপথে যেন একটি নাগরিকও বেঁচে না থাকে। কাউকে যেন বন্দী করা না হয়।"

তখন সিজারের দরবার-কক্ষের সোপানশ্রেণীতে চলেছে ফাস্টাস ও ডিলেক্টার বিয়ের আয়োজন। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দাঁড়িয়ে আছে সমবেত দর্শকদের দিকে মুখ করে। একপাশে দাঁড়িয়ে আছে ফাস্টাস। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল বিয়ের কনে। সঙ্গে প্রদীপ হাতে কুমারী সখীর দল। ডিলেক্টার মুখখানি ম্লান, কিন্তু পদক্ষেপ ধীর অথচ দৃঢ়। তাকে দেখাচ্ছে সম্রাজ্ঞীর মত। কিন্তু কনের পোশাকের নীচে তার ডান হাতে যে ধরা আছে একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা সেটা কেউ দেখতে পেল না।

সে সোপানে পা রাখল; কিন্তু ফাস্টাসের মত পুরোহিতের কাছে না থেমে সে সোজা উপরে উঠে গেল। সাব্লেটাসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল,

"যুগ যুগ ধরে কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের মানুষরা জেনে এসেছে যে তাদের একমাত্র রক্ষাকর্তা সিজার। শুধু আইনের প্রণেতা নয়—সে নিজেই আইন। হয় সে ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক, আর না হয় তো অত্যাচারী। সাব্‌লেটাস, তুমি কোন্‌ সিজার?"

সিজার রাগে লাল। "তুমি কি পাগল হয়েছ সোনা? এসব কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে?"

"কেউ শেখায় নি। বিফল হবে জেনেও আমার শেষ আবেদন নিয়ে তোমার কাছে এসেছি।"

সিজার বলল, "ওসব কথা থাক। আর বোকামি করো না। পুরোহিতের সামনে বসে বিয়ের মন্ত্র পড়ে নাও।"

মেয়েটি ক্ষুব্ধ গলায় বলল, "না, আমাকে তুমি ফিরিয়ে দিতে পারবে না। রোমের নাগরিক হিসাবে আমি আবেদন রাখছি সিজারের কাছে।"

সম্রাট বলল, "কাল এস। তুমি যা চাইবে তাই পাবে।"

"এখনই যদি আমার কথা না শোন তাহলে কাল বলে কিছু থাকবে না। এই মুহূর্তেই আমি আমার অধিকার দাবী করছি।"

সিজার বলল, "বেশ, বল তুমি কি অনুগ্রহ চাও।"

"আমি কোন অনুগ্রহ চাই না; আমি দাবী করছি আমার অধিকার। আমি জানতে চাই, যে শর্তে এই ভয়ংকর মূল্য আমি দিচ্ছি সেটা পূরণ করা হয়েছে কি না।"

সাব্‌লেটাস বলল, "কি বলছ তুমি? কি প্রমাণ তুমি চাও?"

মেয়েটি উত্তর দিল, "ফাস্টাসের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার আগে ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসকে আমি এইখানে জীবিত ও মুক্ত দেখতে চাই। তুমি তো ভালই জান যে সেই শর্তেই আমি এ বিয়েতে রাজী হয়েছি।"

সিজার সক্রোধে উঠে দাঁড়াল। বলল, "তা হতে পারে না।"

দরবার-কক্ষের এক পাশের অলিন্দ থেকে ভেসে এল একটি কণ্ঠস্বর, "হ্যাঁ, নিশ্চয় হতে পারে, কারণ আমার ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস।"

১৭

সকলেরই দৃষ্টি পড়ল অলিন্দের দিকে। একসঙ্গে অনেকে বলে উঠল, "সেই বর্বর লোকটা! ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস!"

অলিন্দ থেকে একলাফে একটা উঁচু স্তম্ভকে আঁকড়ে ধরে টারজন দ্রুত নেমে গেল মেঝের উপর। তার পিছন পিছন নেমে এল ছ'টি লোমশ গোরিলা।

সিজার চীৎকার করে ডাকল, "রক্ষী! রক্ষী!"

টারজন ও ছ'টি গোরিলা ধেয়ে গেল সিংহাসনের দিকে। রক্ষীদের হাতে ঝল্‌সে উঠল দশ-বারোখানা তরবারি। মেয়েরা আর্তনাদ করে মূর্চ্ছা গেল। ভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় সিজার স্বর্ণ-সিংহাসনে এলিয়ে পড়ল।

জনৈক রাজ-পারিষদ খোলা তলোয়ার হাতে টারজনের সম্মুখীন হতেই গো-ইয়াড তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক কামড়ে তার গলাটা ছিঁড়ে ফেলে মৃত শিকারের উপর দাঁড়িয়ে জয়োল্লাসে গর্জন করে উঠল। তা শুনে অন্য পারিষদরা পিছিয়ে গেল। ফাস্টাস আর্তনাদ করে পালিয়ে গেল। একলাফে টারজন হাজির হল ডিলেক্টার পাশে। গোরিলারা সিঁড়ি বেয়ে সিংহাসনের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিজার লুকিয়ে পড়ল তার মহত্ব ও শক্তির প্রতীক সিংহাসনেরই পিছনে।

ততক্ষণে ঘরের সম্ভ্রান্ত লোকরা, অফিসাররা এবং সৈন্যরা সাময়িক বিহ্বলতা কাটিয়ে নতুন করে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। আর তখনই অলিন্দের নীচেকার ছোট দরজাটা খুলে দরবার-কক্ষে ঢুকল ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস, ক্যাসিয়াস হাস্টা, সিসিলিয়াস মেটেলাস, ম্‌পিংগু ও অন্য সকলে যারা টারজনের সঙ্গেই রাজপ্রাসাদের প্রাচীরে উঠে পড়েছিল।

শুরু হল প্রচণ্ড সংঘর্ষ। টারজন ডিলেক্টাকে তুলে দিল ম্‌পিংগুর হাতে। তারপর প্রিক্লেরাসকে সঙ্গে নিয়ে সেও যুদ্ধে যোগ দিল।

কিন্তু প্রতিপক্ষের যোদ্ধা সংখ্যায় অনেক বেশী। প্রাসাদের অন্য সব ঘাঁটি থেকেও সৈন্য ও রক্ষীরা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। টারজন ও তার সহযোদ্ধারা ক্রমেই ছোট দরজাটার দিকে পিছু হটতে লাগল।

ওদিকে "ভায়া প্রিন্সিপ্যাসিস"-এর উপর প্রচণ্ড ঢেউয়ের মত একের পর এক আছড়ে পড়ছে ক্রুদ্ধ জনতার দল। ফটক ভেঙে তারা ভিতরে ঢুকে পড়েছে। তাদের পায়ের নীচে অনেক রক্ষী চাপা পড়ে মরল।

এমন সময় পোর্টা ডেকুমানার দিক থেকে অনেক দূরে শোনা গেল ভেরীর আওয়াজ। সকলে আনন্দে উল্লাস-ধ্বনি করে উঠল। নিশ্চয় গ্রাম থেকে যোদ্ধার দল এসে পড়েছে তাদের সাহায্য করতে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা তা নয়। বল্লম ও তরবারি উঁচিয়ে ধেয়ে এল সম্রাটের সৈন্যদল। ভীতত্রস্ত জনতা ছুটে পালাতে শুরু করল। আর দুর্ধর্ষ সেনাদল রক্তাক্ত তরবারি ও জ্বলন্ত মশাল হাতে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল।

দরবার-কক্ষের পাশের যে ঘরটায় সকলে আশ্রয় নিয়েছিল সেটা খুব ছোট। সকলের জায়গা হওয়াই শক্ত। তবু সাবলেটাসের প্রাসাদের সেটাই আশ্রয় হিসাবে সব চাইতে ভাল, কারণ ঘরটার একদিকে একটা ছোট দরজা আর অন্য দিকে বাগানের উপরে একটামাত্র ছোট জানালা। পাথরের দেয়ালও সহজে

ভাঙা যাবে না। কিন্তু বিদ্রোহ যদি ব্যর্থ হয়, সম্রাটের সেনাদল যদি প্রাসাদ দখল করে নেয়, তাহলে এই সাময়িক আশ্রয়ের মূল্য কতটুকু? যে মুহূর্তে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তারা কাতর হয়ে পড়বে, তখন এই ঘরই তো হয়ে উঠবে অনেকের সমাধিস্থল।

"হায় ডিলেক্টা!" তার কাছে পৌঁছনোমাত্রই প্রিক্লেরাস বলে উঠল, "হারাবার জন্যই কি তোমাকে আমি ফিরে পেলাম। আমিই হলাম তোমার মৃত্যুর কারণ।"

পোশাকের নীচ থেকে ছুরিটা বের করে দেখিয়ে মেয়েটি বলল, "তুমি এসেই আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছ। ফাস্টাসের হাতে পড়ার চাইতে একেই আমি স্বামীরূপে বরণ করতাম। তাই এখন যদি মরি তাহলে তো কিছু সময় বেশীই বেঁচে গেলাম। আর এখন তো আমি সুখে মরতে পারব, কারণ এবার মরব সকলে এক সাথে।"

টারজন বলল, "এখন সবার কথা বলার সময় নয়। কয়েক ঘণ্টা আগেও কি ভেবেছিলে যে আবার তোমরা একত্র হতে পারবে? দেখ, সকলেই তো এখানে রয়েছ। হয়তো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব কিছু এমন বদলে যাবে যে আজকের এই ভয়ের জন্য একদিন সকলেই হাসাহাসি করবে।"

জনাকয়েক পেশাদার যোদ্ধা কথাগুলি শুনছিল। তারাও মাথা নাড়তে লাগল।

ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস হেসে বলল, "হয়তো তোমার কথাই ঠিক। তুমি কি করতে বল? এখানে থাকলে তো মৃত্যু অনিবার্য; কাজেই বেরিয়ে যাবার একটা কোন উপায় বল।"

টারজন বলল, "আমিও স্বীকার করি যে বর্তমানে আমাদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। কিন্তু আমি আশা ছাড়ি নি; বরং আমি বিশ্বাস করি, ঘটনা যেদিকেই মোড় নিক, এর চাইতে ভাল ছাড়া মন্দ আর কিছু হতে পারে না।"

মেটেলাস জানালার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, "ঐ দেখ, ওরা বাগানে একটা গুল্‌তি-যন্ত্র বসিয়েছে। এর ফলে আমাদের অবস্থা আরও খারাপ হবে।"

ক্যাসিয়াস হাস্টা বলল, "ওরা সোজাসুজি জানালা তাক করে গুলি ছুঁড়বে বলে তো মনে হয় না।"

প্রিক্লেরাস বলল, "না, তা করবে না। বরং ওরা চাইছে দেয়ালে একটা ফাটল সৃষ্টি করতে, যাতে একসঙ্গে অনেক লোক ভিতরে ঢুকে আমাদের কাবু করতে পারে।"

টারজন আপন মনেই বলল, "আমরা যদি চকিতে ছুটে গিয়ে গুল্‌তি-যন্ত্রটাকে দখল করে নিতে পারি, তাহলে তো ওদেরই পাল্টা মার মারতে পারব। সেই জন্যই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।"

বিপরীত দিকের দরজার উপর ঘন ঘন আঘাত পড়তে লাগল। ওক কাঠের

দরজা ও পাথরের প্রাচীর কাঁপছে।

ক্যাসিয়াস হাস্টা বাঁকা হাসি হেসে বলল, "নিশ্চয় ওরা একটা ঢেঁকি-যন্ত্র নিয়ে এসেছে।"

শত্রুপক্ষ থেকে শুরু হল দ্বিমুখী আক্রমণ। বাগানের দিকে থেকে অনবরত ছোঁড়া হচ্ছে গোলাগুলি; আর দরবার-কক্ষের দিক থেকে জানালার উপর পড়ছে ভারী ঢেঁকির আঘাত।

টারজন একডজন অসিধারীকে দরজার একপাশে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলল, "দরজার উপর নজর রাখ।" ঘরের এক কোণে ছুব্‌নি পেতে বসে আছে ছ'টি গোরিলা। টারজন অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাদের ঠেকিয়ে রেখেছে।

দরজাটা ভেঙে পড়ল। দু'পক্ষই অপেক্ষা করতে লাগল।

জানালার ফোকরটাও ক্রমেই বড় হতে লাগল। আর তখনই—হয়তো পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারেই—দুই পক্ষই একযোগে আক্রমণ করে বসল ঘরের ভিতরকার বন্দী লোকগুলোর উপর। একদল ধেয়ে এল দরবার-কক্ষ থেকে ভাঙা দারজার ভিতর দিয়ে, আর অপর দল ছুটে এল ভাঙা প্রাচীরের ফাঁক দিয়ে।

ভাঙা প্রাচীরের দিকে আঙুল দেখিয়ে টারজন চীৎকার করে বলল: "ওদের হটিয়ে দাও। জুঠো, সাবাড় কর। গো-ইয়াড, সাবাড় কর।"

ছয় গোরিলার বিকট চীৎকারে সৈনিকরা বিস্ময়ে শিউরে উঠল। পর মুহূর্তেই তারা বল্লম তুলে নিল হাতে। বল্লমে বিদ্ধ হয়ে দুটো গোরিলা নীচে লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু বাকিদের পাশবিক আক্রমণের মুখে সিজারের সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিল।

টারজন চেঁচিয়ে প্রিক্লেরাসকে বলল, "ওদের পিছু নাও। বাগান পর্যন্ত ধাওয়া কর। গুলতি-যন্ত্রটা দখল করে সৈন্যদের বিরুদ্ধে বাগিয়ে ধর। ততক্ষণ আমরা দরবার কক্ষের সৈন্যদের আটকে রাখব; তারপর যোগ দেব তোমাদের সঙ্গে।"

যুদ্ধোন্মত্ত গোরিলাদের পিছনে ছুটল তিন বীর ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাস, ক্যাসিয়াস হাস্টা ও সিসিলিয়াস মেটেলাস। তাদের সঙ্গে বাগানের দিকে ছুটল পেশাদার মল্লবীর, চোর, খুনে ও ক্রীতদাসের দল।

বাকি পেশাদার মল্লবীরদের পাশে দাঁড়িয়ে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করতে লাগল টারজন নিজে। ছোট দরজাটার দখল শত্রুপক্ষের হাতে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া হবে না। এক সময় পিছন ফিরে তাকিয়ে সে দেখল, ডিলেক্টাকে নিয়ে মৃপিংগু এগিয়ে চলেছে বন্দীদের পিছন পিছন বাগানের দিকে। কী আশ্চর্য! ততক্ষণে গুলতি যন্ত্রটা যে তার দলের লোকদের হাতেই এসে গেছে। কাল-বিলম্ব না করে সহযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে সেও এক পা দু' পা করে ভাঙা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

কিন্তু বাইরেও তো বিপদ অল্প নয়। সম্রাটের সৈন্যরা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল।

প্রিক্লেরাস বলল, "এবার ওরা একযোগে আমাদের আক্রমণ করবে।"

"আর তাহলেই আমাদের ভবলীলা সাঙ্গ হবে, বলল ক্যাসিয়াস হাস্টা।

"ঈশ্বর যেন হাসিমুখে আমাদের দিকে হাতটা বাড়ান।" বলল মেটেলাস।

টারজন বলে উঠল, "কিন্তু ঈশ্বরের পছন্দটা আমাদের চাইতে ওদের দিকেই বেশী।"

"কেন ?" হাস্টা প্রশ্ন করল।

"কারণ আজ রাতে ওরাই তো বেশী সংখ্যায় স্বর্গে পাড়ি জমিয়েছে," চারদিকে ছড়ানো মৃতদেহের স্তূপ দেখিয়ে টারজন বলল। ক্যাসিয়াস হাস্টা সমর্থনসূচক হাসি হাসল।

"মুহূর্তের মধ্যেই ওরা আমাদের আক্রমণ করবে," বলেই প্রিক্লেরাস ডিলেক্টাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। "বিদায় প্রিয়তমা। হায়, সুখ কত ক্ষণস্থায়ী। মানুষের আশা কত অসহায়।"

মেয়েটি বলল, "বিদায় চেয়ো না প্রিক্লেরাস, কারণ তুমি যেখানে যাবে আমিও সেখানেই যাব।" হাতের সরু ছুরিটা সে দেখাল।

প্রিক্লেরাস চীৎকার করে বলল, "না! আমাকে কথা দাও ও কাজ তুমি করবে না।"

"কিন্তু কেন করব না ? মৃত্যু কি ফাস্টাসের চাইতে মধুরতর নয় ?"

বিষণ্ন হেসে প্রিক্লেরাস বলল, "হয়তো তুমি ঠিকই বলেছ।"

"ওরা আসছে।" ক্যাসিয়াস হাস্টা চেঁচিয়ে উঠল।

উচ্চতর হল টারজনের কণ্ঠস্বর: "তৈরী হও! সব শক্তি দিয়ে যুদ্ধ কর। কলোসিয়ামের নরক অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়।"

২০

দুই পক্ষের রণ-কোলাহলকে ছাপিয়ে বাগানের দূর প্রান্ত থেকে ভেসে এল এক বর্বর চীৎকার। সে চীৎকার উভয় পক্ষের সেনানীদেরই ক্ষণতরে স্তব্ধ করে দিল। টারজন সাগ্রহে মাথা তুলে তাকাল। বাতাসের গন্ধ শুঁকতে লাগল। পরিচয়, আশা, বিস্ময়, অবিশ্বাস—সব যেন একসঙ্গে তার বুকের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠল।

সে বর্বর চীৎকার বাড়তে বাড়তে ক্রমে সিজারের বাগানে ঢুকে পড়ল। সম্রাটের ভাড়াটে সৈনিকরা মুখ তুলে দেখল, একটি বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে একদল বীর যোদ্ধা। তাদের মাথায় চামড়ার শিরস্ত্রাণে উড়ছে পাখির পালক,

তাদের কণ্ঠেই ধ্বনিত হচ্ছে এই ভয়ংকর রণ-গর্জন—ওয়াজিরিরা এসে পড়েছে।

টারজন দেখল, সকলের সামনে রয়েছে মুভিরো; তার পাশে লুকেন্তি। কিন্তু সেই মুহূর্তে টারজনের বা সেখানে সমবেত অন্য কারও নজরে না পড়লেও সেই ওয়াজিরি বাহিনীর সঙ্গেই ছিল কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াসের নানা গ্রাম থেকে আসা সেইসব যোদ্ধার দল যারা দীর্ঘকালব্যাপী অবিচারের প্রতিহিংসা নিতে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে এসেছে সিজারের রাজপ্রাসাদকে লক্ষ্য করে।

শেষ পর্যন্ত সম্রাটের সেনাদল অস্ত্র ত্যাগ করে টারজনের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করল। মুভিরো ছুটে এসে টারজনের সামনে নতজানু হয়ে তার হাতে চুমু খেল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ছোট বানর ঝুলন্ত ডাল থেকে লাফিয়ে নেমে এল টারজনের কাঁধে।

মুভিরো বলল, “ওয়াজিরিদের প্রতি পূর্ব পুরুষের অনেক কৃপা না থাকলে আমরা ঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারতাম না।”

টারজন বলল, “নকিমাকে না দেখা পর্যন্ত আমিও তো বুঝতে পারি নি আমার সন্ধান তোমরা কেমন করে পেলে।”

মুভিরো বলল, “হাঁ, সবই নকিমার কৃতিত্ব। সেই তো ওয়াজিরিদের দেশে গিয়ে আমাদের এখানে নিয়ে এসেছে। তাই তো আজ বড় বাওয়ানাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা দেশে ফিরে যেতে পারব।”

টারজন মাথা নেড়ে বলল, “না, আমি তো এখন যেতে পারব না। আমার বন্ধুর ছেলে এখনও এই উপত্যকায় আছে। তোমাদের সকলের সাহায্যে এবার আমি তাকে উদ্ধার করতে পারব।”

এই সময় প্রিক্লেরাস এসে বলল, “বন্ধু টারজন, গ্রাম থেকে যে সব লোক এসে রাজপ্রাসাদে ঢুকেছে তারা নির্বিচারে সকলকে খুন করছে, লুট চালাচ্ছে। তাদের তো বাধা দিতে হবে। এ সব থামাতে হবে।”

টারজন বলল, “নিশ্চয় থামাতে হবে। সৈন্য পাঠিয়ে সাব্‌লেটাস ও ফাস্টাসকে এখানে নিয়ে এস।”

কিন্তু যাদের পাঠানো হল তারা ফিরে এসে জানাল, সাব্‌লেটাস মারা গেছে, ফাস্টাসও মারা গেছে। দরবার-কক্ষে ও অলিন্দ-পথে সেনেটর, রাজপুরুষ ও অফিসারদের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে আছে।

বিষণ্ন মুখে প্রিক্লেরাস শুধাল, “কেউ কি বেঁচে নেই?”

একজন বলল, “আছে। কিছু লোক একটা ঘরে আত্মগোপন করেছিল। শুধু তারাই বেঁচে আছে। তাদের আমরা সব কথা জানিয়েছি। তারা এখনই এসে পড়বে।”

অলিন্দ-পথে ঘরে এসে ঢুকল সদলে ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাস। তাকে দেখেই ডিলেক্টা আনন্দে চীৎকার করে উঠে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে টারজন বলল, "সিজারের মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু তোমাদেরই একজনকে তো সিজারের দায়িত্বভার বহন করতেই হবে।"

একজন চীৎকার করে বলে উঠল, "টারজন জিন্দাবাদ! নতুন সিজার জিন্দাবাদ।" সঙ্গে সঙ্গে ঘরের প্রতিটি ক্যাস্টুইনারিয়াসের মুখে উচ্চারিত হল সেই ধ্বনি।

টারজন হেসে মাথা নেড়ে বলল, "না আমি নই। এখানে এমন একজন আছে যার মাথায় আমি এই রাজমুকুট পরিয়ে দিতে চাই; তবে এক শর্তে।"

"কে সে? আর কি সেই শর্ত?"

"ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাস, বাইরের গ্রাম থেকে যে সব মানুষ এসেছে তাদের চিরতরে মুক্তি দিতে হবে, তাদের পুত্র-কন্যাদের আর কখনও ক্রীতদাস করে রাখা হবে না। অথবা তাদের মল্লবীরদের কখনও জোর করে মল্লক্ষেত্রে পাঠানো হবে না—এই শর্তে তুমি কি রাজমুকুট পরতে রাজী আছ?"

ডিয়ন স্প্লেণ্ডিডাস মাথা নুইয়ে সম্মতি জানাল; আর টারজন রাজমুকুট পরিয়ে নতুন সিজারকে অভিষিক্ত করল।

২১

প্রাচোর সম্রাট ভালিডাস অগাস্টাসের বিজয়-উৎসব দেখে এরিক ভন হারবেন ও মালিয়াস লেপাস সেলে ফিরে এসেছে।

ভন হারবেন জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, কালকের মল্লযুদ্ধে যদি আমরা জয়লাভ করি, তাহলে তো মুক্তি পাব?"

লেপাস বলল, "জয়লাভ আমরা করব না—করতে পারি না; ফুলবাস ফুপাস সে ব্যবস্থা করেই রেখেছে।"

"কী সর্বনাশ।" ভন হারবেন অস্ফুট কণ্ঠে বলল।

"তুমি কি মরতে ভয় পাও?"

"সে কথা নয়। আমি ভাবছি ফেবোনিয়ার কথা।"

"তা ভাবতে পার। তবে আমার বোন ফুলবাস ফুপাসকে বিয়ে করার চাইতে মৃত্যুকেই সুখকর বলে মনে করবে।"

ভন হারবেন বলল, "নিজেকে বড়ই অসহায় লাগছে। একটি বন্ধু নেই, এমন কি অনুগত খানসামা গাবুলাও নেই।"

লেপাস বলে উঠল, "ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। আজ সকালেই তার খোঁজ হচ্ছিল।"

"খোঁজ হচ্ছিল? কেন? সে কী কারাগারে বন্দী নয়?"

"তাই ছিল, কিন্তু আজ ভোরের অন্ধকারে সে পালিয়েছে।"

"খুব ভাল খবর!" ভন হার্বেন বলল। "সে যে পালাতে পেরেছে তাতেই আমি খুশি। অবশ্য আমার জন্য সে কিছুই করতে পারবে না। সে কোথায় গেছে বলে তোমার মনে হয়?"

"অনেক পথেই সে পালিয়ে যেতে পারে, তবে আমার ধারণা সে শহরেই কোথাও লুকিয়ে আছে—কোন ক্রীতদাসের আশ্রয়ে, কিংবা হয়তো সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস নিজেই তাকে আশ্রয় দিয়েছে।"

সময় বয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। পরদিন সকালে কলোসিয়াম-রক্ষীরা এরিক ভন হার্বেনকে নিয়ে গেল মল্লক্ষেত্রে।

জনাকীর্ণ মল্লক্ষেত্র। প্রাচ্যের উদ্ধত সিজার বসেছে তার রক্তবর্ণ চন্দ্রাতপের নীচে কারুকার্যখচিত আসনে। তার পাশেই নতমুখে বসে আছে সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াস। সঙ্গে তার স্ত্রী ও ফেবোনিয়া। মেয়েটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে যোদ্ধাদের প্রবেশ-পথের দিকে। এরিক ভন হার্বেনকে নিয়ে মল্লক্ষেত্রে ঢুকল মালিয়াস লেপাস। শিউরে উঠে ফেবোনিয়া চোখ বন্ধ করল। আবার যখন চোখ মেলল তখন মল্লবীরেরা এগিয়ে চলেছে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে।

প্রাচীন রোমের এইসব মল্লক্রীড়ার অনেক কাহিনী এরিক ভন হার্বেন শুনেছে, পড়েছে। শুনে মুগ্ধ হয়েছে। কিন্তু এখন চোখের সামনে যা দেখছে সেটা মোটেই মনোমুগ্ধকর নয়। কোন চাকচিক্য নেই, গাম্ভীর্য নেই। তার মনে প্রশ্ন জাগল, প্রাচীন রোমেও কি এই রকমটাই ঘটত?

সম্ভ্রান্ত জনদের আসনের পিছন দিকে একটু সোরগোল হওয়ায় সে দিকে তাকিয়ে ভন হার্বেন অবাক হয়ে গেল। তার ভুল হয় নি তো? এও কি সম্ভব! ভিড় ঠেলে সম্রাটের আসনের দিকে এগিয়ে আসছে গাবুলা। মুহূর্ত পরেই সিজারের সিংহাসনের পিছনে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রিফেক্টের নির্দেশে অন্য সকলের সঙ্গে ক্রীড়া-ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে যেতেই ভন হার্বেন ভাবতে লাগল—গাবুলা এখানে এল কেমন করে? আর এই বিপজ্জনক জায়গায় এলই বা কেন?

সহসা একটা আর্তনাদ শুনে সকলেই সেদিকে ফিরে তাকাল। ভন হার্বেন যা দেখছে তা কি স্বপ্ন! মায়া! সে দেখল, একটি লোক সিজারের গলা চেপে ধরে হাতের ছুরিটা আমূল বসিয়ে দিল তার বুকে। লোকটি গাবুলা।

ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে সিজারের মৃত্যু-আর্তনাদ কলোসিয়ামের বাতাসে ধ্বনিত হবার আগেই তার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ল সিংহাসনের পায়ের তলে, আর হত্যাকারী গাবুলা একলাফে দেয়ালটা পার হয়ে ছুটে গেল ভন হার্বেনের কাছে।

চীৎকার করে বলল, "তোমার প্রতি অবিচারের প্রতিশোধ আমি নিয়েছি বাওয়ানা।"

প্রথমে জনতার ভিতর থেকে ভেসে এল একটা আর্তনাদ। তারপরেই একজন যখন বলে উঠল : "সিজারের মৃত্যু হয়েছে।" তখন সকলেই সানন্দ চীৎকারে তাকে সমর্থন জানাল।

ভন হারবেনের বুকের মধ্যে আশার আলো জ্বলে উঠল। মালিয়াস লেপাসকে জড়িয়ে ধরে বলল, "সিজার মরেছে। এই আমাদের সুযোগ।"

"কি বলছ তুমি ?" লেপাস বলল।

"এই গোলমালের সুযোগে আমরা পালাব। শহরে কোথাও লুকিয়ে থেকে রাতে ফেবোনিয়াকে নিয়ে এখান থেকে চলে যাব।"

"কোথায় ?"

"তা জানি না। তবে এ জায়গা থেকে অন্য যে কোন স্থানে। ফুল্‌বাস ফুপাস এখন সিজার হল। কাজেই আজ রাতেই ফেবোনিয়াকে উদ্ধার করতে না পারলে আর কোন দিনই পারব না।"

"ঠিক বলেছ," লেপাস বলল।

ভন হারবেন বলল, "অন্য সবাইকে ডাক দাও। যত বেশী সংখ্যায় পালাতে চেষ্টা করব ততই আমাদের সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়বে।"

মালিয়াস লেপাস কয়েদিদের দিকে ফিরে বলল. "ঈশ্বর আমাদের প্রতি করুণা করেছে। সিজার মরেছে। এই সুযোগে আমরা পালাতে পারব। চলে এস।"

কথা শেষ করেই মালিয়াস লেপাস ছুটল ফটকের দিকে। বন্দীরাও হৈ-হৈ করে ছুটল তাদের পিছনে। শুধু পেশাদার মল্লবীররা দূরে দাঁড়িয়ে রইল ; তবে তাদের বাধা দিল না।

রাজপথে নেমে এসে একজন শুধাল, "এবার ?"

মালিয়াস লেপাস বলল, "চারদিকে ছড়িয়ে পড়। প্রত্যেকে যার যার পথ দেখ।"

ভন হারবেন বলল, "না মালিয়াস লেপাস, আমরা একসঙ্গেই থাকব।"

"শেষ পর্যন্ত," লেপাস যোগ করল।

এমন সময় গাবুলা এসে হাজির। ভন হারবেন বলল, "এই যে গাবুলা। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।"

"বীর গাবুলাকে আমরা ছেড়ে যেতে পারি না," মেলাস বলল। "কিন্তু সকলের আগে আমাদের খুঁজে নিতে হবে লুকিয়ে থাকার মত একটা জায়গা।"

তারও অভাব হল না। পথের পাশেই একটা নীচু দেয়াল। তারপরেই গাছের সারি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। দেয়াল টপকে সকলেই সেই গাছগাছালিতে ভরা জঙ্গলে ঢুকে পড়ল। কিছুদূর এগিয়েই একটা ভাঙা বাড়ি পাওয়া গেল। দরজার পাল্লা ঝুলে পড়েছে, জানালার খড়খড়ি ভেঙে গেছে, চৌকাঠের উপর জঞ্জাল জমে আছে। একটা পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়ি।

ভন হার্বেন বলল, "রাত পর্যন্ত লুকিয়ে থাকার পক্ষে এটাই উপযুক্ত জায়গা।"

লেপাস বলল, "তা ঠিক। তবে একবার খুঁজে-পেতে দেখতে হবে কোন লোকজন আছে কি না।"

সব কিছু দেখে শুনে বোঝা গেল, জায়গাটা ভবঘুরে ভিখারিদের আস্তানা হলেও হতে পারে। কোন লোক স্থায়ীভাবে সেখানে বাস করে না।

মালিয়াস লেপাস বলল, "এর চাইতে ভাল আশ্রয় হয় না। কোন কারণে আক্রান্ত হলেও বের হবার তিনটে পথ খোলা—একটা পিছনের বাগানের দিকে, একটা সামনের রাজপথের দিকে। আর একটা ছাদে ওঠার পথ।"

ভন হার্বেন বলল, "রাত না হওয়া পর্যন্ত এখানেই নিরাপদে থাকা যাবে। তারপর অন্ধকার রাজপথ ধরে সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের বাড়ি যাওয়াটা শক্ত হবে না।"

২২

কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াস থেকে "ভায়া মেয়ার" পথ ধরে পুব দিকে এগিয়ে চলেছে পাঁচ হাজার মানুষ। টারজনের ঠিক পিছনে উড়ছে ওয়াজিরিদের মাথার সাদা পালক। ম্যাক্সিমাস প্রিক্লেরাসের নেতৃত্বে চলেছে দীর্ঘদেহী ভাড়াটে সৈনিকের দল; আর সকলের পিছনে চলেছে দূর গ্রাম থেকে আগত যোদ্ধারা।

ঘর্মাক্তদেহ ক্রীতদাসরা বয়ে নিয়ে চলেছে ক্ষেপন-যন্ত্র, গুল্‌তি-যন্ত্র, বড় বড় ঢেকি ও অন্যান্য প্রাচীন যুদ্ধ-যন্ত্র, সঙ্গে আছে প্রাচীর বেয়ে ওঠার মই, দেয়ালে লাগাবার মত আংটা, আর আগুনে গোলা ছুঁড়বার মত যন্ত্রপাতি। এতসব লটবহর নিয়ে পথ চলতে স্বভাবতই বিলম্ব ঘটছে। টারজন তাতে বিরক্তি বোধ করলেও প্রিক্লেরাস্, হাস্টা, ও মেটেলাসের পরামর্শ সে মেনে নিয়েছে। তারা সকলেই বুঝিয়েছে যে, কাস্ট্রাম মেয়ারে ঢুকবার একমাত্র পথে মুখে যে দুর্গটি আছে সেটাকে দখল করতে এই সব যন্ত্রপাতি অপরিহার্য।

গরম ধূলোভর্তি রাস্তা "ভায়া মেয়ার" ধরে ওয়াজিরিরা পথ চলছে তাদের নিজস্ব রণ-সঙ্গীত গাইতে গাইতে। ভারী শিরস্ত্রাণ বুকের উপর ঝুলিয়ে, লাঠির মাথায় বোঝাপত্তর ঝুলিয়ে কাঁধের উপর ফেলে মুখ-খিস্তি করতে করতে চলেছে ভাড়াটে সৈনিকরা। আর দূর গ্রাম থেকে আশা যোদ্ধারা হাসি-ঠাট্টা করতে করতে চলেছে একদল বনভোজনকারীর মত।

দুর্গের পরিখা ও বাঁধানো তীর, বুরুজ ও গম্বুজ যখন দূর থেকে তাদের চোখে পড়ল, ওদিকে তখন ক্রীতদাসরা ভালিডাস অগাস্টাসের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চলেছে রাজপ্রাসাদের দিকে, আর বন্ধুবান্ধব পরিবৃত ফুল্‌বাস ফুপাস নিজেকে সিজার বলে ঘোষণা করছে।

কাস্ট্রাম মেয়ারের পথে পথে রাজকীয় সৈনিকরা খুঁজে বেড়াচ্ছে পলাতক বন্দীদের। তারা বিশেষ করে খোঁজ করছে সেই ক্রীতদাসটির যে ভালিডাস অগাস্টাসকে হত্যা করেছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে তারা কেউই গাবুলাকে চেনে না।

কয়েকটি চোর ও কিছু পেশাদার মল্লবীরও হৈ-হট্টগোলের সুযোগে পালিয়ে এসেছিল। এখন তারা শহরের নীচু অঞ্চলের একটা জায়গায় লুকিয়ে আছে।

তাদেরই একজন কথাপ্রসঙ্গে বলল, "এই ফুলবাস ফুপাস কেমন সিজার হবে?"

আর একজন বলল, "ভালিডাস অগাস্টাসের চাইতেও খারাপ হবে। লোকটা যেমন উদ্ধত, তেমনি বোকা; সকলেই তাকে মনে মনে ঘৃণা করে।"

"শোনা যাচ্ছে সে নাকি সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের মেয়েকে বিয়ে করবে।"

একজন বলল, "আজই তাকে কলোসিয়ামে দেখেছি। তাছাড়া, আমি তাকে আগেও চিনতাম, কারণ আগে সে প্রায়ই আমার বাবার দোকানে জিনিসপত্র কিনতে আসত।"

"তুমি কখনও সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের বাড়িতে গেছ?"

"তা গেছি। দু'বার তো জিনিসপত্র দেখাতেই গেছি—বড় উঠোনটা পেরিয়ে ভিতরের বাগানে। বাড়িটা ভালই চিনি।"

নীচু ভুরু ও কুৎকুতে চোখওয়ালা একটা লোক বলল, "তার মত একটা মেয়েকে যদি কোন রকমে হাতের মুঠোয় আনা যেত তাহলে আর আমাদের মুক্তি ও অনেক টাকার পুরস্কারকে কে আটকাতে পারে।"

আর একজন বলল, "ফন্দিটা মন্দ নয়।"

কয়েক মিনিট ধরে সকলেই চুপচাপ মদের গ্লাসে চুমুক দিতে লাগল।

"পছন্দের কনেকে হাতে পেলে নতুন সিজার প্রচুর টাকা দেবে।"

বণিকের ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমিই তোমাদের সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের বাড়ি নিয়ে যাব। বাজি রেখে বলছি, ওরা আমাকে দেখে ঠিক দরজা খুলে দেবে।"

অচিরেই তারা গিয়ে হাজির হল সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের বাড়ি। যুবকটি দরজায় টোকা দিতে বাতি হাতে একটি ক্রীতদাস এসে ঘুলঘুলির ভিতর দিয়েই জানতে চাইল, বাইরে কে আছে আর কি জন্য সে এসেছে।

যুবক বলল, "আমি টেবারনারিয়াসের ছেলে। সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের পছন্দ হয় কিনা জানবার জন্য বাবা এই কাপড়গুলো দোকান থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

ক্রীতদাসটি ইতস্তত করছে দেখে সে আবার বলল, "তুমি নিশ্চয় আমাকে চিনতে পারছ। আগেও অনেকবার এসেছি।"

বাতিটা আরও একটু তুলে ধরে ক্রীতদাস বলল, “হ্যাঁ, মুখটা চেনা লাগছে। তুমি এখানে অপেক্ষা কর। আমি মনিব-কন্যার কাছ থেকে জেনে আসছি সে দেখা করবে কি না।”

একটা পুটুলি তুলে ধরে যুবকটি বলল, “এটা খুব দামী। আমাকে ভিতরে ঢুকে দাঁড়াতে দাও, নইলে হয়তো আমি চোরের পাল্লায় পড়ে যাব।”

“ঠিক আছে,” বলে ক্রীতদাস দরজা খুলে যুবকটিকে ভিতরে ঢুকতে দিল। “আমি না আসা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা কর।”

ক্রীতদাস চলে যেতেই টেবারনারিয়াসের ছেলে অতি দ্রুত দরজার হুড়কোটা খুলে অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে একটা শিস দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের ভিতর থেকে কয়েকটি ছায়ামূর্তি পিল্‌পিল্‌ করে এসে ফটক দিয়ে ঢুকে পড়ল। যুবকটি পাশের একটা ছোট ঘরে তাদের ঢুকিয়ে দিয়ে দুটো দরজাই বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল।

ক্রীতদাস ফিরে এসে বলল, “মনিব-কন্যা এত রাতে কিছু দেখতে পারবে না। তুমি ফিরে গিয়ে বাবাকে বলে দিও, মনিব-কন্যা নিজেই দরকার মত দোকানে গিয়ে কাপড় পছন্দ করে আসবে।”

কিন্তু এভাবে ফিরে যেতে তো সে আসে নি। এখন কি করা যায়? সঙ্গে সঙ্গে একটা ফন্দি এল তার মাথায়। বলল, “দেখ, আসলে ফেবোনিয়াকে একটা গোপন কথা জানাতেই আমি এসেছি, কাপড় পছন্দ করানোটা একটা ছুতোমাত্র। আর সে কথা শুধু ফেবোনিয়া ছাড়া আর কাউকে বলা চলবে না।”

ক্রীতদাসটি ভাবনায় পড়ে গেল। সে জানে, মালিয়াস লেপাস ও এরিক ভন হার্বেন কলোসিয়াম থেকে পালিয়েছে। তাদের কারও কোন গোপন খবরও তো হতে পারে। তাই সে বলল, “তুমি অপেক্ষা কর। আমি তাকে খবর দিচ্ছি।”

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। ফেবোনিয়াকে সঙ্গে করে ক্রীতদাসটি একটু পরেই এসে গেল। উত্তেজনায় হাঁপাতে হাঁপাতে ফেবোনিয়া বলল, “বল, কি খবর এনেছ?”

যুবকটি ঠোঁটে আঙুল তুলে ইসারায় তাকে চুপ করিয়ে বলল, “আমি যে এখানে এসেছি তা যেন কেউ জানতে না পারে। যে খবর এনেছি তাও যেন তুমি ছাড়া আর কেউ শুনতে না পায়। তোমার ক্রীতদাসকে এখান থেকে যেতে বল।”

মনিব-কন্যার নির্দেশে ক্রীতদাস সেখান থেকে চলে যেতেই মেয়েটি আবার বলল, “সে কি খবর পাঠিয়েছে? সে কোথায় আছে?”

“এখানেই আছে,” পাশের ঘরটা দেখিয়ে যুবক বলল।

“এখানে?”

"হ্যাঁ, এখানে। এস," বলেই তাকে দরজার দিকে নিয়ে গেল। তারপরই হঠাৎ পিছন থেকে এক হাতে তার মুখটা চেপে ধরে টানতে টানতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

সেখানে আরও কতকগুলি কর্কশ হাত তাকে চেপে ধরে মুখ আটকে বেঁধে ফেলল। তাদের ফিস্‌ফিস্ কথা মেয়েটির কানে এল।

"এখান থেকেই আমরা আলাদা হয়ে যাব। দু'জন একে নিয়ে যাবে নির্ধারিত জায়গায়। একজন ফুলবাস ফুপাসের উদ্দেশে একটা চিরকুট রেখে আসবে যাতে সেটা প্রাসাদ-রক্ষীদের নজরে পড়ে। আর বাকিরা বিভিন্ন পথে কলোসিয়ামের অদূরে পরিত্যক্ত বাড়িটায় চলে যাবে। বাড়িটা চেন তো?"

"খুব ভাল চিনি। অনেক রাতই তো সেখানে কাটিয়েছি।"

"ভাল কথা। তাহলে চলে যাও। সময় নষ্ট করো না।"

টেবারনারিয়াসের ছেলে বাধা দিয়ে বলল, "দাঁড়াও। মুক্তি-পণের টাকার ভাগ-বাঁটোয়ারা তো এখনও স্থির হল না। আমি না থাকলে তোমরা কিছুই করতে পারতে না। তাই আমার প্রাপ্য অন্তত পক্ষে আধাআধি।"

সর্দার গর্জে উঠল, "চুপ কর। কিছু পেলেই সেটাকে ভাগ্য মনে করো।"

আর একজন বলে উঠল, "পাঁজরে একটা ছুরি ঢুকিয়ে দিলেই মজাটা টের পাবে।"

সর্দার বলে উঠল, "চুপ কর। চল হে।" একটা পুরনো ছেঁড়া আলখাল্লায় ফেবোনিয়ার দেহকে মুড়ে সকলের অলক্ষিতে তারা সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। আর সেদিকে তাকিয়ে দেখে টেবারনিয়াসের ছেলে ঠিক বিপরীত দিকে পা চালিয়ে দিল।....

ছেঁড়া-খোঁড়া জামা গায়ে ও শক্ত স্যাণ্ডেল পায়ে একটি যুবককে সিজারের প্রাসাদের সামনে পায়চারি করতে দেখে একটি রক্ষী সঙ্গীণ উঁচিয়ে প্রশ্ন করল, "এত রাতে রাজপ্রাসাদের সামনে ঘুর ঘুর করছ কেন?"

"সিজারের জন্য গোপন খবর এনেছি," যুবকটি বলল।

"তাহলে চটপট বলে ফেল খবরটা কি?"

"এখনই গিয়ে সিজারকে বল, সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে, আর এখনই চলে গেলে কলোসিয়ামের রথের ফটকের বিপরীত কোণের অদূরে অবস্থিত একটা পড়ো বাড়িতে তাকে পাওয়া যাবে।"

"তুমি কে?" রক্ষী প্রশ্ন করল।

যুবক বলল, "সে কথা থাক। কাল সকালে আমি নিজে এসে পুরস্কারটা নিয়ে যাব।" বলেই সে অন্ধকারে হাওয়া হয়ে গেল।

* * *

ভন হারবেন বলল, "এভাবে বসে থাকলে মাঝ রাত কখনও আসবে না।"

তার কাঁধে হাত রেখে মালিয়াস লেপাস বলল, "তুমি অধৈর্য হয়ে উঠেছ বন্ধু, কিন্তু মনে রেখো মাঝ রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করাটা আমাদের সকলের পক্ষেই ভাল। রাজপথে এখনও অনুসন্ধানকারীর দল খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাদের ভাগ্য ভাল যে এ বাড়িটার উপর তাদের নজর পড়ে নি।"

"শ্-স্-স্!" ভন হার্বেন ইসারায় তাকে আসতে বলল। "ওটা কিসের শব্দ?"

"সামনের ফটকে যেন ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হল।"

"তার মানে ওরা আসছে।"

তিনজনই তলোয়ার হাতে তুলে নিল। পূর্ব-ব্যবস্থা মতই তারা মই বেয়ে ছাদে উঠে গেল। দরজাটাকে ঈষৎ ফাঁক করে কান পাতল।

ভন হার্বেন শুনতে পেল একজন বলছে, "এতক্ষণে কাজ ফতে। কেউ আমাদের দেখতেও পায় নি। বাকিরাও চলে এস।" দরজার মরচে-ধরা কব্জার ক্যাঁচ-ক্যাঁচ শব্দ হল। জনাকয়েক লোক ভিতরে ঢুকল।

"আজ রাতের কাজটা ভালই হল," একজন বলল।

"মেয়েটা বেঁচে আছে তো? নিঃশ্বাসের শব্দও তো শুনতে পাচ্ছি না।"

"মুখ থেকে কাপড়টা খুলে দাও।"

"আর চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করুক।"

"কি করে চুপ করিয়ে রাখতে হয় তা আমার জানা আছে। কিন্তু মরে গেলে তো আমাদের কাছে ওর দাম এক কাণা-কড়িও নয়।"

"ঠিক আছে, খুলে দিচ্ছি।"

"শোন, তোমার মুখের বাঁধন খুলে দিচ্ছি। চেঁচালে কিন্তু খুব খারাপ হবে।"

"চেঁচাব না।" পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে আসতেই ভন হার্বেনের বুকের ভিতরটা টিপ্ টিপ্ করতে লাগল।

"তুমি যদি চুপচাপ থাক, আর সিজার মুক্তি-মূল্যটা পাঠিয়ে দেয়, তাহলে আমরা তোমার কোন ক্ষতি করব না।"

"যদি না পাঠায়?" মেয়েটির পাল্টা প্রশ্ন।

"তাহলে হয়তো তোমার বাবা সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসকেই সেটা পাঠাতে হবে।"

"হা ঈশ্বর!" ভন হার্বেনের ভগ্ন কণ্ঠ। "শুনলে লেপাস।"

"শুনলাম।"

"তাহলে নেমে এস। নেমে এস গাবুলা। নীচেই ফেবোনিয়া।"

কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই ভন হার্বেন অন্ধকার ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। তার পিছন পিছন লাফ দিল মালিয়াস লেপাস এবং গাবুলা।

চীৎকার করে বলল, "আমি এসেছি ফেবোনিয়া। তুমি কোথায়?"

"আমি এখানে," ফেবোনিয়া সাড়া দিল।

কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে ভন হারবেন সবেগে সেদিকে ছুটে গেল। অপহরণকারীদের একজনের সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই সে ভন হারবেনকে জড়িয়ে ধরল। ওদিকে সরকারী সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করেছে ভেবে দলের বাকিরা সবেগে ছুটে পালিয়ে গেল। দরজাটা হাট করে খুলে রেখে যাওয়ায় ভরা চাঁদের আলো পড়ে অন্ধকার অনেকটা কেটে গেল। দেখা গেল, লোকটা ভন হারবেনের গলা টিপে ধরে কোমর থেকে ছুরিটা বের করার চেষ্টা করছে।

সঙ্গে সঙ্গে মালিয়াস লেপাস ও গাবুলা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লেপাসের তরবারির এক আঘাত লোকটার শয়তানী খেলার চির অবসান ঘটিয়ে দিল। ভন হারবেন ছাড়া পেয়েই একলাফে ফেবোনিয়ার কাছে চলে গেল। একগাদা নোংরা কাপড়ের উপর সে শুয়ে আছে দেয়ালটা ঘেঁসে। তার সব বাঁধন কেটে দেওয়া হল। থেমে থেমে সে সব কথাই বলল।

মালিয়াস লেপাস বলল, "তোমার নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়েছে, কিন্তু এই শয়তানরা আমাদের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। কারণ এখন আমাদের হিসাবের চাইতে পুরো তিনটি ঘণ্টা আগেই আমরা এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করতে পারব।"

"তাহলে আর সময় নষ্ট করা নয়," ভন হারবেন বলল; "এখনই যাত্রা শুরু করা যাক।"

তাকে আশ্বাস দিয়ে লেপাস বলল, "আমার তো বিশ্বাস আর কোন ভয় নেই। তারপর কপালে কি আছে কে জানে।"

গাবুলা দরজায়ই দাঁড়িয়ে ছিল। তাড়াতাড়ি সেটা বন্ধ করে ভন হারবেনের কাছে ছুটে এসে বলল, "বাওয়ানা, রাজপথে আলো দেখা যাচ্ছে। মনে হল অনেক লোক আসছে। হয়তো সৈন্যরাই আসছে।"

চারজনই কান পাতল। পায়ে পায়ে মিল রেখে চলার স্পষ্ট সামরিক ভঙ্গী।

মালিয়াস লেপাস বলল, "অনুসন্ধানকারী আরও একটা দল। ওরা চলে গেলে তবে আমাদের যাত্রা শুরু হবে।"

সৈন্যদের মশালের আলো বাড়িটার দিকেই এগিয়ে আসছে। তারা তো রাজপথ ধরে এগিয়ে গেল না। লেপাস খড়খড়িতে চোখ রেখে বলল, "ওরা বাড়িটার সামনেই থেমেছে। একদল কোণের দিকে মোড় নিল। বাকিরা দাঁড়িয়ে আছে।"

ঘরের ভিতরে সকলেই নীরব। কেটে গেল কয়েক মিনিট, কিন্তু এদের মনে হল দীর্ঘ সময়।

লেপাস বলে উঠল, "ওরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে। এবার সামনের ফটকের দিকে আসছে। এই বাড়িটাতেই তল্লাসী চালাবে।"

"আমরা কি করব ?" ফেবোনিয়া কেঁদে ফেলল।

"ছাদই আমাদের একমাত্র ভরসা," ভন হারবেন ফিস্‌ফিস্ করে কথাগুলি বলতে না বলতেই পায়ের শব্দ আরও কাছে এসে গেল। ছাদের খোলা দরজা দিয়ে মশালের আলো এসে পড়ল।

লোপাস বলল, "ওরা ছাদেও উঠে পড়েছে। আর কোন আশা নেই। একটা পুরো সেনাদলকে আমরা পরাস্ত করতে পারব না।"

"লড়াই তো করতে পারব," ভন হারবেন বলল।

"তাতে শুধু ফেবোনিয়ার জীবনই বিপন্ন হবে ; তার কোন লাভ হবে না।"

ভন হারবেন বলল, "ঠিক বলেছ।... দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। ফেবোনিয়া, তাড়াতাড়ি এস। এইখানে মেঝেতে শুয়ে পড়। এইসব ছেঁড়া কাঁথা কম্বল দিয়ে আমি তোমাকে ঢেকে দিচ্ছি। সকলে ধরা দিয়ে কি লাভ ? মালিয়াস লেপাস, গাবুলা, ও আমি হয়তো পালাতে পারব না, কিন্তু তুমি যে এর নীচে শুয়ে আছ সেটা ওরা বুঝতে পারবে না। তারপর ওরা চলে গেলে তুমি সহজেই কলোসিয়ামের রক্ষীদের ঘরে চলে যেতে পারবে। আর সেখানকার অফিসারই তোমাকে লোক দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।"

ফেবোনিয়া বলল, "ওরা আমাকেও ধরুক। তোমরা যদি বন্দী হও তো আমাকেও বন্দী করুক।"

ভন হারবেন বলল, "তাতে তো কোন লাভ হবে না। বরং তোমাকে আমাদের সঙ্গে দেখতে পেলে তোমার বাবার উপর এদের সন্দেহ পড়বে।"

আর কোন কথা না বলে ফেবোনিয়া হারবেনের যুক্তির কাছে হার মেনে মেঝেতে শুয়ে পড়ল। অনেক ভিখারির কাঁথা-কম্বল এনে ভন হারবেন তাকে ভাল করে ঢেকে দিল।

২৩

কাস্ট্রাম মেয়ারের দুর্গের সম্মুখে সেনা সমাবেশ ও যুদ্ধের যন্ত্রপাতি সাজিয়ে বসাতে এত সময় কেটে গেল যে সব কাজ শেষ হবার পরে ক্যাসিয়াস হাস্টা বুঝতে পারল সেদিন আর দুর্গ আক্রমণ করা সম্ভব হবে না, কারণ ততক্ষণে অন্ধকার নেমে আসবে। তাই আর একটা মতলব মাথায় নিয়ে টারজন, মেটেলাস ও প্রিক্লেরাসকে সঙ্গে নিয়ে সে দুর্গের ফটকের দিকে এগোতে লাগল। তাদের সামনে চলল একদল মশালবাহী ও শান্তির পতাকা হাতে একদল সৈনিক।

বিপক্ষের সৈন্যদের আগমনের সময় থেকেই দুর্গের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ও কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। এখন শান্তির পতাকা হাতে একটি দলকে আসতে দেখে দুর্গাধিপতি একটি বুরুজ থেকে তাদের উদ্দেশ্য জানতে চাইল।

ক্যাসিয়াস হাস্টা বলল, "শাস্তির ব্যাপারে ভালিডাস অগাস্টাসের কাছে আমার দুটিমাত্র দাবী। এক, মালিয়াস লেপাস ও এরিক ভন হার্বেনকে মুক্তি দিতে হবে ; দুই, আমাকে কাস্ট্রাম মেয়ারে ফিরে যাবার অনুমতি দিতে হবে এবং আমার পদ-মর্যাদার অনুকূল সবরকম সুযোগ-সুবিধা আমাকে ভোগ করতে দিতে হবে।"

"কে তুমি ?"

"আমি ক্যাসিয়াস হাস্টা। আমাকে তো তোমার ভাল করেই চেনা উচিত।"

দুর্গাধিপতি বলল, "ঈশ্বর করুণাময়।"

"ক্যাসিয়াস হাস্টা জিন্দাবাদ। ফুল্‌বাস ফুপাস মুর্দাবাদ।" বহুকণ্ঠ একসঙ্গে গর্জে উঠল।

কয়েকজন ছুটে এসে দুর্গের ফটক খুলে দিল। দুর্গাধিপতি হাস্টার পুরনো বন্ধু। ছুটে বেরিয়ে এসে সে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

হাস্টা বলল, "এ সবের অর্থ কি ? কি হয়েছে ?"

"ভালিডাস অগাস্টাসের মৃত্যু হয়েছে। আজই মল্লক্ষেত্রে গুপ্তঘাতকের হাতে সে নিহত হয়েছে। ফুল্‌বাস ফুপাস এখন বসেছে সিজারের আসনে। বড় ভাল সময়ে তুমি এসে পড়েছ। সারা কাস্ট্রাম মেয়ার তোমাকে স্বাগত জানাবে।"

দুর্গ থেকে হ্রদের তীর পর্যন্ত এবং ভাসমান সেতু হয়ে দ্বীপ পর্যন্ত এগিয়ে চলল প্রাচ্যের নতুন সম্রাটের বাহিনী। খবরটা ছড়িয়ে পড়ল সারা শহরে। জনসাধারণ উল্লাসে ফেটে পড়ল ; ক্যাসিয়াস হাস্টাকে জানাল স্বাগত সম্ভাষণ।

পরিত্যক্ত বাড়িটাতে চার পলাতক অপেক্ষা করে আছে ফুল্‌বাস ফুপাসের সৈনিকদের জন্য। সৈনিকরা ততক্ষণে গোটা বাড়িটা ঘিরে ফেলেছে।

সৈনিকদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এল একজন অফিসার। প্রথমেই প্রশ্ন করল, "মেয়েটি কোথায় ?"

"কোন্ মেয়ে ?" মালিয়াস লেপাস শুধাল।

"সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের মেয়ের কথা বলছি।"

"তা আমরা কেমন করে জানব ?" ভন হার্বেন বলল।

অফিসার বলল, "তোমরাই তো তাকে অপহরণ করে এখানে নিয়ে এসেছ। ঘরগুলি ভাল করে তল্লাসী কর।"

একটি সৈনিক সহজেই ফেবোনিয়াকে খুঁজে পেল। তাকে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল।

অফিসার হেসে উঠে তিনজনকে নিরস্ত্র করার হুকুম দিল।

ভন হার্বেন বলল, "দাঁড়াও। সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের মেয়েকে নিয়ে

তোমরা কি করবে? সে যাতে নিরাপদে বাবার কাছে ফিরে যেতে পারে তার ব্যবস্থা করবে কি?"

"সে ব্যাপারে সিজারের হুকুম নিতে হবে।"

"এর সঙ্গে সিজারের কি সম্পর্ক?"

"সিজার হুকুম দিয়েছে, ফেবোনিয়াকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে হবে, আর অপহরণকারীদের অকুস্থলেই হত্যা করতে হবে।"

"তাহলে সিজার ও তার সৈনিকরা মরুক," বলেই ভন হার্বেন উদ্যত তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল অফিসারের উপর। সঙ্গে সঙ্গে লেপাস ও গাবুলাও ছুটে গেল সেই সব সৈনিকদের বাধা দিতে যারা ছাদের পথে মই বেয়ে নীচে নেমে আসছিল। আকস্মিক আক্রমণে হতচকিত সৈন্যরা পিছু হটে গেল। অফিসার কোন রকমে আঘাত এড়িয়ে ছুটে বাইরে গিয়ে সঙ্গীনধারী সৈনিকদের হুকুম দিল, "ঐ ঘরে তিনটি পুরুষ ও একটি নারী আছে। পুরুষ তিনজনকে হত্যা কর, কিন্তু খুব সাবধান, নারীটি যেন কোনরকম আঘাত না পায়।"

ঠিক সেই মুহূর্তে বহুকণ্ঠের উল্লাস-ধ্বনি তার কানে এল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, মশালের আলোয় রাজপথ আলোকিত হয়ে উঠেছে। তার কানে এল ভেরীর নিনাদ ও বহু মানুষের এগিয়ে আসার পদ-ধ্বনি।

ব্যাপার কি? এরা কারা? সাব্‌লেটাসের সৈন্যরা তো মোতায়েন রয়েছে দুর্গের বাইরে—শত্রুর মুখোমুখি। তারা তো বিনা যুদ্ধে এত রাতে এভাবে শোভাযাত্রা করে আসতে পারে না। তাহলে?

শোভাযাত্রীরা আরও কিছুটা এগিয়ে আসতেই তাদের উল্লাস-ধ্বনির ফাঁকে ফাঁকে ক্যাসিয়াস হাস্টার নাম তার কানে এল।

একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে? ব্যাপার কি?"

"একটা বিরাট বাহিনী নিয়ে ফিরে এসেছে ক্যাসিয়াস হাস্টা, আর ফুল্‌বাস ফুপাস পালিয়ে আত্মগোপন করেছে।"

ঘরের ভিতর থেকেও সকলে প্রশ্নোত্তরটা শুনতে পেল। মালিয়াস লেপাস চেঁচিয়ে বলল, "আমরা বেঁচে গেলাম; ক্যাসিয়াস হাস্টা কখনই সেপ্টিমাস ফেবোনিয়াসের বন্ধুদের কোন ক্ষতি করবে না।"

অফিসার বাইরে থেকেই চাৎকার করে বলল, "তোমরা সকলেই বেরিয়ে রাজপথে চলে এস। প্রাচ্যের সম্রাট ক্যাসিয়াস হাস্টার এই সব বন্ধুদের গায়ে কেউ হাত তুলো না।"

ভন হার্বেন মুচকি হেসে বলল, "কোন্ পক্ষ নিলে বেশী লাভ হবে লোকটা দেখছি সেটা ভালই বোঝে।"

ফেবোনিয়া, ভন হার্বেন, লেপাস ও গাবুলা একসঙ্গে পড়ো-বাড়িটার সিঁড়ি বেয়ে নেমে রাজপথে এসে দাঁড়াল।

মালিয়াস লেপাস বলল, “ঐ তো ক্যাসিয়াস হাস্টা। কিন্তু বাকি ওরা সব কারা?’

ফেবোনিয়া বলল, “ওরা নিশ্চয় স্যাঙ্গুইনারিয়াসের মানুষ। কিন্তু দেখ, ওদের মধ্যে একজনের কেমন বর্বরদের মত পোশাক। আরও দেখ, তার পিছনে যে যোদ্ধারা আসছে তাদের মাথায় কেমন পাখির পালক উড়ছে।”

মালিয়াস লেপাস বলল, “এ রকম দৃশ্য আমি জীবনে কখনও দেখি নি।”

ভন হারবেন বলল, “আমিও না। তবু ওদের আমি চিনতে পেরেছি, কারণ ওদের খ্যাতি ও বিবরণ আমি হাজার বার পড়েছি।”

“ওরা কারা?” ফেবোনিয়াস শুধাল।

“শ্বেতকায় দৈত্যটি হল অরণ্যরাজ টারজন, আর যোদ্ধারা হল তারই ওয়াজিরি সেনাদল।”

বাড়িটার সামনে সৈনিকদের ভিড় দেখে ক্যাসিয়াস হাস্টা দলবলসহ থেমে গেল। জানতে চাইল, “এই সেনাদলের দলপতি কে?”

যে অফিসারটি ফেবোনিয়ার অপহরণকারীদের গ্রেপ্তার করতে এসেছিল সেই এগিয়ে এসে বলল, “আমি মহামান্য সিজার।”

“তোমাকেই কি ফুলবাস ফুপাস পাঠিয়েছে মালিয়াস লেপাস ও ভন হারবেনের খোঁজে?”

মালিয়াস লেপাস বলল, ‘আমরা এখানে সিজার।” ফেবোনিয়া, ভন হারবেন ও গাবুলাও এগিয়ে এল।

পুরনো বন্ধুকে আলিঙ্গন করে হাস্টা বলল, “ঈশ্বরের জয় হোক। কিন্তু জার্মানিয়ার যে বর্বর দলপতির খ্যাতি কাস্ট্রা স্যাঙ্গুইনারিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সে কোথায়?’

লেপাস বলল, “এই তো সে। নাম এরিক ভন হারবেন।”

টারজন আরও কাছে এগিয়ে গেল। ইংরেজীতে বলল, “তুমিই এরিক ভন হারবেন?”

ভন হারবেনও ইংরেজিতে বলল, ‘আর তুমি তো অরণ্যরাজ টারজন, আমি জানি।”

টারজন হেসে বলল, “তোমাকে দেখাচ্ছে ষোল আনা একজন রোমকের মত।”

ভন হারবেন মুচকি হেসে বলল, “আমি কিন্তু ষোল আনা একজন বর্বর।”

“রোমকই হও আর বর্বরই হও, তোমাকে যখন তোমার বাবার হাতে ফিরিয়ে দেব তখন সে খুব খুশি হবে।”

ভন হারবেন শুধাল, “অরণ্যরাজ, তুমি কি আমার খোঁজেই এখানে এসেছ?’

টারজন বলল, “একেবারে ঠিক সময়েই এসে পড়েছি ”

“কি করে যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব?” ভন হারবেন বলল।

“আমাকে নয় বন্ধু,” টারজন বলল, “ধন্যবাদ জানাও ছোট্ট নকিমাকে।”

টারজন দি আনটেম্‌ড্

দুর্দমনীয় টারজন

১—হত্যা ও লুণ্ঠন

হাউট্‌ম্যান ফ্রিজ স্নাইডার ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছে অন্ধকার অরণ্যের গা ঘেঁসে। বুলেটের মত গোল মাথা বেয়ে গড়িয়ে পড়ে ঘামের বিন্দুগুলো তার ভারি চোয়াল ও বৃষস্কন্ধের উপর স্থির হয়ে আছে। লেফ্‌টেন্যাণ্ট হাঁটছে তার পাশাপাশি, আর আণ্ডারলেফ্‌টেন্যাণ্ট ভন গস জনকয়েকমাত্র আস্কারিকে সঙ্গে নিয়ে শ্রান্ত, ক্লান্ত তল্পিবাহকদের পিছন পিছন হাঁটছে। সাদা অফিসারদের দেখাদেখি কালা সৈনিকরাও বেয়নেটের তীক্ষ্ণ মুখে আর রাইফেলের ধাতু-জড়ানো কুঁদোর আঘাতে তল্পিবাহকদের এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

কাছাকাছি কোন তল্পিবাহক না থাকায় হাউট্‌ম্যান স্নাইডার আস্কারিদের উপরেই মনের ঝাল ঝারছিল। অবশ্য আফ্রিকার একেবারে ভিতরে এই সব রাইফেলধারী আস্কারিদের মাঝে তারা মাত্র তিনটি সাদা মানুষ যে নেহাৎই নিঃসঙ্গ এ-কথা সে কখনও ভুলে যায় নি।

হাউট্‌ম্যানের সামনে দলের অর্ধেক লোক, আর বাকি অর্ধেক তার পিছনে—এই ভাবেই অসভ্য মানুষদের বাসভূমি এই জঙ্গলে জার্মান ক্যাপ্টেনটি তার বিপদকে যথাসম্ভব কমিয়ে নিয়েছে। দলের একেবারে সামনে টলতে টলতে চলেছে দুটি স্থানীয় উলঙ্গ মানুষ—গলার শিকলে তারা পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। সংস্কৃতি-বিস্তারের অভিযানে এরাই স্থানীয় পথিকৃৎ—তাদের দেহের নানা নিষ্ঠুর আঘাতের চিহ্নই বহন করছে সংস্কৃতির প্রতীক।

এই ভাবে আফ্রিকার গহণতম অরণ্যে যখন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে জার্মান সভ্যতার আলো, ঠিক তখনই ১৯১৪ সালের শুরুতে তমসাচ্ছন্ন বেলজিয়ামের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে জার্মানির গৌরবময় আলোকছটা।

একথা সত্যি যে গাইড দু'জন পুরো দলটাকে ভুল পথে নিয়ে চলেছে। আফ্রিকার অধিকাংশ গাইডরা তাই করে থাকে। সেটা অজ্ঞানতার জন্য বা ইচ্ছাকৃত ভুল যাই হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। আফ্রিকার গহণ অরণ্যে সে যে পথ হারিয়েছে এটাই হাউট্‌ম্যান ফ্রিজ স্নাইডারের পক্ষে যথেষ্ট।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই অপ্রত্যাশিতভাবে যে দৃশ্যটি তাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল তাতে গাইড দুজনের বিষণ্ণ অন্তর নতুন আশায় উজ্জীবিত হয়ে উঠল।

হাউট্‌ম্যানের বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস—দিনের পর দিন একটা দুর্ভেদ্য জঙ্গলের ভিতরে আশাহীন পথযাত্রার পরে দূর-বিস্তার বৃক্ষলতা-শোভিত আন্দোলিত তৃণভূমি ও আঁকাবাঁকা নদীর উপস্থিতি ইওরোপীয়টির সামনে যেন এক স্বর্গের স্বপ্ন-ছবি নিয়ে এল।

খুশির হাসি হেসে হুনটি লেফ্‌টেন্যান্টের সঙ্গে কি যেন বলে ফিল্ড-গ্লাসটা চোখে লাগিয়ে দূরে তাকাল। বলল, "আমাদের কপাল ভাল। দেখতে পাচ্ছ?"

লেফ্‌টেন্যান্টও তার গ্লাস চোখে লাগিয়ে সেই একই দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, "হ্যাঁ, একটা ইংরেজ গোলাবাড়ি। ওটা নিশ্চয় গ্রেস্টোকের গোলাবাড়ি, কারণ বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকার এই অঞ্চলে আর কোন গোলাবাড়ি নেই। ঈশ্বর আমাদের সহায় হয়েছেন হের ক্যাপ্টেন।"

শ্নাইডার বলে উঠল, "ওর দেশ যে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে সে কথাটা ও জানবার আগেই আমরা ওকে বাগে পেয়েছি। জার্মানির লৌহ-কব্জির স্বাদটা সেই প্রথম লাভ করুক।"

লেফ্‌টেন্যান্ট বলল, "এখন সে বাড়িতে থাকলেই হয়। বিখ্যাত অরণ্যরাজকে যদি যুদ্ধ-বন্দী হিসাবে নাইরোবিতে ক্রাউতের কাছে নিয়ে যেতে পার তাহলে আর হের হাউট্‌ম্যান ফ্রিজ শ্নাইডারকে কে পায়।"

শ্নাইডার হেসে বলল, "ঠিক বলেছ। আমাদের দুজনেরই পোয়া বারো।

খুশি মনেই সকলে এগিয়ে চলল লর্ড গ্রেস্টোক জন ক্লেটনের ছিমছাম গোলাবাড়িটা লক্ষ্য করে। কিন্তু হায় কপাল। টারজন বা তার ছেলে কেউ বাড়ি নেই।

বৃটেন ও জার্মানির যুদ্ধের কোন খবরই লেডি জেন রাখে না। কাজেই সে অফিসারদের সাদরে গ্রহণ করল; শত্রুপক্ষের কালা সৈনিকদের জন্য ভোজের আয়োজন করার হুকুম দিল বিশ্বাসী ওয়াজিরি সৈনিকদের।

সুদূর পূর্বাঞ্চলে অরণ্যরাজ টারজন দ্রুতপায়ে নাইরোবি থেকে ফিরছে তার গোলাবাড়ির দিকে। নাইরোবিতেই সে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার খবর পেয়েছে। জার্মানরা যে কোন সময় বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা আক্রমণ করতে পারে এই আশংকা করে স্ত্রীকে কোন নিরাপদ অঞ্চলে সরিয়ে নিতেই সে বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে। সঙ্গে জনবিশেক কালো যোদ্ধা।

তার স্ত্রী বিপন্ন। এই দুশ্চিন্তাই তার সারা মন জুড়ে বসেছে। সভ্যতার বহিরাবরণস্বরূপ পোশাকপত্র গা থেকে খুলে ফেলে মুহূর্তের মধ্যে ইংরেজ ভদ্রলোকটি উলঙ্গ গরিলা-মানবে রূপান্তরিত হয়েছে। বানর ছোট্ট মানু অনেক দিন পরে মহান টারমাঙ্গানিকে এইভাবে ছুটতে দেখে অবাক হয়ে গেছে।

দিনের পর দিন এইভাবে ছুটতে ছুটতে বনের পর বন পার হয়ে অবশেষে টারজন বাড়ির কাছে পৌঁছে গেল।

দূর থেকে গোলাবাড়ির উপর নজর পড়তেই তার চোখ দুটি কুঁচকে গেল; মাংসপেশীগুলি টান-টান হল। একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। গোলাটার চিহ্নমাত্র নেই; সেখান থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠছে। আর বাংলোর যে চিমনি থেকে ধোঁয়া ওঠাই উচিত ছিল সেটা এখন সম্পূর্ণ নির্ধূম।

একটা অজ্ঞাত ভয়ের তাড়নায় এবার সে দ্রুততর বেগে ছুটতে লাগল।

দ্রাক্ষালতায় ঘেরা কটেজটি নিঃশব্দ, পরিত্যক্ত। চারদিকে দগ্ধ কাঠ ও ছাইয়ের স্তূপ। চাকরদের খড়ো ঘরগুলি নিশ্চিহ্ন; মাঠগুলো ফাঁকা; মৃত মানুষ ও পশুদের ঘিরে চক্রাকারে উড়ছে শকুনের দল।

বাড়িতে ঢুকেই টারজন আতংকে শিউরে উঠল। শোবার ঘরের দেওয়ালে ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হয়েছে প্রভুভক্ত মুভিরোর দৈত্যসদৃশ পুত্র ওয়াসিম্বুকে। এক বছরের বেশী কাল ধরে সে ছিল লেডি জেনের দেহরক্ষী।

ঘরের আসবাবপত্র ইতস্তত ছড়ানো। মেঝেতে চাপ চাপ জমাট রক্ত। দেওয়ালে ও কাঠে রক্তাক্ত হাতের ছাপ। সব কিছুতেই এক ভয়ংকর যুদ্ধের স্বাক্ষর। ছোট পিয়ানোটার পাশে আর এক কালা আদমির শব পড়ে আছে। লেডি জেনের শোবার ঘরের দরজার সামনে পড়ে আছে গ্রেস্টোক পরিবারের আরও তিনটি চাকরের মৃতদেহ।

ঘরের দরজা বন্ধ। নতমুখে বিবর্ণ চোখে টারজন নীরবে সে দিকে তাকিয়ে রইল। ভিতরে কী দৃশ্য তার জন্য অপেক্ষা করছে তা সে কল্পনাও করতে পারছেন না।

ধীরে ধীরে ভারী পা ফেলে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফেলল। ঘরের এক পাশে ছোট কোচটায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটি নিষ্প্রাণ দেহ। দেহটা এমনভাবে পুড়ে গেছে যে অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেও টারজন তাকে চিনতে পারল না। ধীরে ধীরে নীচু হয়ে তাকে দুই হাতে তুলে নিল। মৃতদেহকে উল্টে ধরতেই মৃত্যুর সেই ভয়ংকর রূপ দেখে শোকে, আতংকে ও ঘৃণায় সে আর্তনাদ করে উঠল।

বাইরের ঘরে ভাঙা জার্মান রাইফেলটা, অথবা মেঝের উপর পড়ে-থাকা রক্তমাখা সৈনিকের টুপির সাক্ষ্য দেখেই সে বুঝতে পারল এই ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড কাদের কীর্তি।

তবু আশা জেগে রয়। এই বিকৃত দগ্ধ মৃতদেহটা তার স্ত্রীর নাও হতে পারে। কিন্তু হায়রে দুরাশা! মৃতদেহের আঙুলে যে আংটিগুলো রয়েছে সেগুলো তো তার না চিনবার কথা নয়। আশার শেষ ক্ষীণ আলোটুকুও মিলিয়ে গেল।

মৃতদেহটাকে জেন ক্লেটনের বড় আদরের গোলাপ বাগানে নিয়ে গিয়ে নীরবে, প্রেমে ও শ্রদ্ধায় তাকে কবর দিল। যে কালো মানুষগুলি কর্ত্রীঠাকরুণের জীবনরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় জীবন দিয়েছে তাদেরও সমাধি দেওয়া হল পাশাপাশি।

বাড়ির অপর দিকে যে কবরগুলি নতুন খোঁড়া হয়েছে তার ভিতর থেকে একডজন জার্মান আস্কারির দেহ তুলে তাদের পোশাকের প্রতীক-চিহ্ন দেখেই টারজন বুঝতে পারল তারা কোন্ কোম্পানির কোন্ রেজিমেণ্টের সৈনিক। এই পরিচয়ই যথেষ্ট। এই মানুষগুলিকে চালিয়ে নিয়ে এসেছিল সাদা চামড়ার অফিসাররা। তাদের খুঁজে বের করাও খুব শক্ত হবে না।

টারজন ফিরে গেল গোলাপ বাগানে। নতমস্তকে সকলকে জানাল শেষ বিদায়। পশ্চিমের ঘন অরণ্যের ওপারে ধীরে অস্ত গেল সন্ধ্যা-সূর্য। মুখ ফিরিয়ে টারজন পথে নামল—যে পথে চলে গেছে হাউট্‌ম্যান ফ্রিজ স্নাইডার ও তার রক্তমাখা সেনাদল।

টারজনের বুকের মধ্যে বোবা জানোয়ারের অসহ্য যন্ত্রণা ; বোবা, কিন্তু তীব্র, তীক্ষ্ণ। তার মস্তিষ্ক জুড়ে শুধু একটিই অব্যক্ত বাণী ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত : সে নেই! সে নেই! সে নেই!

২—সিংহের বিবর

মুষলধারে বৃষ্টি নামল। যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি কষ্টকর। বুনো টারজন তবু এগিয়ে চলল। বানর মনু শীতে কাঁপতে কাঁপতে কিচির-মিচির ডেকে দূরে সরে গেল, চিতা ও সিংহরাও দেখা দিল না পথে। বৃষ্টির ধারায় পায়ের ছাপগুলোও মুছে গেল।

চব্বিশ ঘণ্টা টানা বৃষ্টির'পরে দ্বিতীয় দিন সূর্য উঠল। কুড়ুর উত্তাপ গায়ে মেখে টারজন দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল নতুন উদ্যমে। জার্মান পূর্ব আফ্রিকায় পৌঁছে কিলিমাঞ্জারো পর্বতমালাকে ঘুরে পূব দিকে রেলপথ অভিমুখে যাবার পথটাই সে বেছে নিল।

দু' দিন পরে কিলিমাঞ্জারোর দক্ষিণ সানুদেশ থেকে বহুদূর পূবে কামানের শব্দ শুনতে পেল। বুঝতে পারল, সেখানে জার্মানদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেঁধেছে। মুহূর্তের জন্য তার বুকটা ইংরেজ হিসাবে গর্বে ভরে উঠল, কিন্তু পরমুহূর্তেই মাথা নেড়ে সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, "না, অরণ্যরাজ টারজন ইংরেজ নয়, কারণ ইংরেজরা মানুষ, আর টারজন একজন টারমাঙ্গানি মাত্র।"

আবার ঝড় উঠে এল। পাহাড়ের গায়ে একটা গুহা খুঁজে পেয়ে টারজন তার ভিতরে আশ্রয় নিল। সারাদিন ভেসে এল গুলি-গোলার শব্দ—কখনও জোরে, কখনও আস্তে। টারজন লক্ষ্য করল, গুলি-গোলা সবচাইতে বেশী চলে

ভোরে আর সন্ধ্যার দিকে ; রাতে প্রায় থাকেই না সে শব্দ।

পরদিন সকালে আবার যাত্রা শুরু হল। দুপুর নাগাদ দেখতে পেল, একদল সৈনিক চলেছে তার আগে আগে। তাদের সঙ্গে গরু-ছাগল আছে ; স্থানীয় কুলিরা বয়ে নিয়ে চলেছে মালপত্র ও খাদ্যবস্তু। সকলেই শিকল দিয়ে গলায়-গলায় বাঁধা। জার্মান ইউনিফর্মধারী স্থানীয় লোকদের নিয়েই সৈন্যদল গড়া হয়েছে। অফিসাররা সব সাদা আদমি। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে টারজন তাদের সাথে সাথেই চলল, কিন্তু তারা কেউ টারজনকে দেখতে পেল না। তাদের ইউনিফর্মের প্রতীক চিহ্ন দেখে সে বুঝল, তার বাংলোয় সমাহিত মৃত সৈনিকদের একজনের যে ইউনিফর্ম সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে তার প্রতীক চিহ্ন আর এদের প্রতীক চিহ্ন এক নয়।

তারা যতই অগ্রবর্তী সেনাবাহিনীর দিকে এগোতে লাগল সৈন্য-সংখ্যা ততই বাড়তে লাগল। তাদের দলে মোটর ট্রাক আছে, ষাঁড়ের দল আছে, আহত সৈনিক আছে। কিছুক্ষণ আগেই তারা রেল-পথটা পার হয়ে এসেছে। টারজন অনুমান করল, আহতদের নিশ্চয়ই কোন বেস-হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আর সেটা সম্ভবত উপকূলবর্তী টাঙ্গার কাছাকাছি কোথাও হবে।

সন্ধ্যা নাগাদ সে পৌছে গেল পারে পর্বতমালার সানুদেশে একটা বড় গুপ্ত ঘাঁটিতে। সেখানে পাহারার ব্যবস্থা যৎসামান্য ; যে সব শাস্ত্রী রয়েছে তারাও খুব সজাগ নয়। কাজেই সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকিয়ে একটা তাঁবুর কাছে পৌছতে টারজনের কোন অসুবিধাই হল না।

দেশী ভাষার কিছু কথা কানে আসতেই সে ভাল করে কান পাতল। একজন বলছে : "ওয়াজিরিরা দানোর মতই লড়াই করল ; কিন্তু আমাদের বাঘা-বাঘা যোদ্ধারা তাদের একেবারে কচুকাটা করে ফেলল। শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন এসে মেয়েটাকে খতম করল। বাইরে দাঁড়িয়ে সে চীৎকার করে হুকুম করতে লাগল, আর আমরা একে একে সবাইকে সাবার করলাম। আণ্ডার লেফ্‌টেন্যাণ্ট ভন গস আরও এক কাঠি সরেশ : দরজায় দাঁড়িয়ে সে হুকুম দিল, আর আমরা একটা ওয়াজিরিকে দেয়ালের গায়ে পুঁতে দিলাম। লোকটা যন্ত্রণায় কাতরাতে লাগল আর আমরা হো-হো করে হেসে উঠলাম। সে এক মজার ব্যাপার।"

টারজন তখন শিকারী জানোয়ারের মত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গেল তাঁবুটার আরও কাছে। কি আছে তার মনে ? কে জানে ? কথা শেষ করে সৈনিকটা উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে কি যেন বলে শিবিরের পিছন দিকে এগিয়ে চলল। শিকারী চিতার মত টারজন নিঃশব্দে তার পিছু নিল। একটা ঝোপের ছায়ায় পৌছেই সে লাফিয়ে পড়ল লোকটার ঘাড়ে। তাকে মাটিতে ফেলে ইস্পাত-কঠিন আঙুল দিয়ে সাঁড়াসির মত চেপে ধরল তার গলা। লোকটা একটা আর্তনাদও করতে পারল না।

টানতে টানতে তাকে একটা ঝোপের মধ্যে নিয়ে টারজন তার গলা থেকে হাত সরিয়ে নিল। ফিস্-ফিসিয়ে বলল, "টু শব্দটি করো না।"

লোকটি বিস্ময়ে বিমূঢ়, হতবাক। গোল গোল চোখ মেলে কেবল দেখতে পেল, একটি উলঙ্গ বাদামী মানুষের দেহ তার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে।

টারজন বলল, "যে অফিসার বাংলোতে মেয়েটিকে খুন করেছে তার নাম কি?"

লোকটি মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করে জবাব দিল, "হাউট্‌ম্যান শ্নাইডার।"

"সে কোথায়?"

"এখানেই আছে। হয়তো হেডকোয়ার্টারে গেছে। অনেক অফিসারই কাজের নির্দেশ আনতে সন্ধ্যায় সেখানে যায়।"

টারজন আদেশ করল, "আমাকে সেখানে নিয়ে চল। খুব সাবধান! আমি ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ তোমাকে খুন করব। ওঠ।"

ঝোপের আড়ালে বেশ কিছুটা এগিয়ে দূরে একটা দো-তলা বাড়ি দেখিয়ে লোকটি বলল, "ওটাই হেডকোয়ার্টার। তুমি সকলের অলক্ষ্যে আর এগোতে পারবে না। চারদিকে অনেক সৈন্য ঘোরাঘুরি করছে।"

সেটা বুঝতে পেরে লোকটার দিকে তাকিয়ে টারজন বলল, "ওয়াজিরি ওয়াসিম্বুকে ক্রুশবিদ্ধ করার কাজে তুমি হাত লাগিয়েছিলে?"

কালা আদমিটি কাঁপতে কাঁপতে বলল, "আমরা তো হুকুমের চাকর।"

"কে হুকুম দিয়েছিল?"

"আণ্ডার লেফ্‌টেন্যান্ট ভন গস! সেও এখানে আছে।"

টারজন দৃঢ়কণ্ঠে বলল, "তাকে আমি খুঁজে পাবই। কিন্তু ওয়াজিরি ওয়াসিম্বকে ক্রুশবিদ্ধ করার কাজে তুমি হাত লাগিয়েছিলে; সে যখন যন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তুমি হাসছিলে।"

লোকটা মাথা ঘুরে বসে পড়ল। তার মৃত্যুদণ্ড আসন্ন। একটি কথাও না বলে টারজন আবার তার গলা ধরে টেনে তুলল। দুই হাতে তাকে মাথার উপরে তুলে ধরে এক, দুই, তিন পাক ঘুরিয়ে সবেগে টারজন তাকে ছুঁড়ে দিল। তারপর এগিয়ে গেল জেনারেল ক্রাউটের হেডকোয়ার্টারের দিকে।

পাহারায় ছিল একটিমাত্র শান্ত্রী। বুকের উপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে লোকটির পিছনে গিয়ে টারজন অতর্কিতে লাফিয়ে উঠে শান্ত্রীর গলা টিপে ধরল। টু-শব্দটি করার সুযোগও সে পেল না। মৃতদেহটা বয়ে নিয়ে টারজন বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

একতলায় আলো জ্বলছে; উপর তলা অন্ধকার। জানালা দিয়ে টারজনের চোখে পড়ল, সামনে একটা বড় ঘর—সেখানে বেশ কয়েকজন অফিসারের জটলা; পিছনের ছোট ঘরটায় টেবিলের পিছনে বসে আছে একটি লাল-মুখো লোক।

পিছনে বসে আছে কয়েকজন অফিসার। সামনে দু'জন দাঁড়িয়ে। দরজায় টোকা পড়ল। একজন এড্‌-ডি ঘরে ঢুকে স্যালুট করে জানাল, "ফ্রলিন কির্‌চার এসে গেছে স্যার।"

"ভিতরে আসতে বল," জেনারেল হুকুম করল। সামনের অফিসার দুজনকে চলে যেতে ইঙ্গিত করল।

ফ্রলিন ঘরে ঢুকল। মেয়েটি খুব সুন্দরী। পথশ্রমের ক্লান্তি ও ধূলো-ময়লাতে তা ঢাকা পড়ে নি। মেয়েটি যুবতী; উনিশের বেশী বয়স হবে না।

জেনারেলের টেবিলের কাছে গিয়ে কোটের ভিতরের পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা কাগজ বের করে তার হাতে দিল।

জেনারেল বলল, "বস ফ্রলিন।" একজন অফিসার একটা চেয়ার এনে দিল। জেনারেল কাগজটা খুলে পড়তে লাগল। কারও মুখে কথা নেই।

ঘরের সবগুলো লোকের উপর চোখ বুলিয়ে নিল টারজন। দুই ক্যাপ্টেনের একজন তো হাউট্‌ম্যান স্নাইডার হতে পারে। মেয়েটি নিশ্চয় গোয়েন্দা বিভাগের লোক—গুপ্তচর।

জেনারেল মুখ তুলে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "খুব ভাল।" এড্‌-ডিকে বলল, "মেজর স্নাইডারকে ডেকে পাঠাও।"

মেজর স্নাইডার! টারজনের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। যে পশুটা তার সঙ্গিনীকে খুন করেছে ইতিমধ্যেই তার পদোন্নতি হয়েছে!

এড্‌-ডি বেরিয়ে যেতে সকলে গল্প-গুজবে মেতে উঠল। তাদের সব কথাই টারজন অলক্ষ্যে থেকে শুনতে লাগল। বুঝতে পারল, পূর্ব আফ্রিকায় জার্মান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা বৃটিশ সৈন্যদের চাইতে অনেক বেশী, আর তার ফলে বৃটিশরা সেখানে প্রচণ্ড মার খাচ্ছে।

এড্‌-ডি ফিরে এল। সঙ্গে মাঝারি আকারের একজন অফিসার। মুখে পুরুষ্টু, তীক্ষ্ণ গোঁফ। নবাগত এগিয়ে গিয়ে স্যালুট করল। জেনারেল ঘাড় কাত করে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, "ফ্রলিন কির্‌চার, ইনি মেজর স্নাইডার—"

বাকিটা সোনার ধৈর্য হল না। জানালার গোবরাটে একটা হাত রেখে এক-লাফে টারজন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। কাইজারের অফিসাররা তো হতভম্ব। আর একলাফে টেবিলের কাছে পৌঁছে এক ঘুষিতে টারজন টেবিল-ল্যাম্পটাকে ছিটকে ফেলে দিল জেনারেলের মোটা ভুঁড়ির উপর। আগ-শুদ্ধির হাত থেকে বাঁচবার জন্য সেও চেয়ারসমেত চিৎ হয়ে পড়ল মেঝেতে। দুই এড্‌-ডি ধেয়ে গেল টারজনের দিকে। সেও পাল্টা একজনকে তুলে ধরে ছুঁড়ে দিল অপর এড্‌-ডির মুখের উপর। মেয়েটি চেয়ার থেকে লাফ দিয়ে দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ল। অন্য অফিসাররা সাহায্যের জন্য চেঁচামেচি শুরু করে দিল। টারজনের

মনোযোগ কিন্তু একজনের উপরেই নিবদ্ধ। মুহূর্তের মধ্যে মেজর স্নাইডারকে ধরে মাথার উপর তুলে এত দ্রুত জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল যে উপস্থিত কেউ ব্যাপারটা বুঝতেই পারল না।

ফটক তখনও শাস্ত্রীমুক্ত। হাতের বোঝা সমেত টারজন একটা খড়ের গাদার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। দুই হাতের সাঁড়াশি-চাপে মেজর স্নাইডারের গলা দিয়ে একটা আর্তনাদও বের হল না। মুঠো আলগা করে এবার টারজন বলল, "শব্দ করলেই গলা টিপে মেরে ফেলব।"

অসীম ধৈর্যের সঙ্গে টারজন জার্মানদের শেষ ঘাঁটিটা পার হয়ে গেল। বন্দীকে আগে আগে হাঁটতে বাধ্য করে সে তাকে ঠেলে নিয়ে চলল পশ্চিম দিকে। একসময় রেলপথকে আবার পার হয়ে গভীর রাতে নিজেকে অনেকটা নিরাপদ মনে করল। জার্মান মেজরটি কখনও শাপান্ত করছে, কখনও ভয় দেখাচ্ছে, কখনও নানা প্রশ্ন করছে। টারজনের কিন্তু একটিমাত্র জবাব—বর্শার একটা খোঁচা।

খোঁচায় খোঁচায় স্নাইডারের দেহ রক্তাক্ত হল। দীর্ঘ রাত এইভাবে কেটে গেল। টারজনের ভয়ংকর নীরবতা জার্মানটির স্নায়ুর উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করতে লাগল। সে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

সকাল হল। এতক্ষণে দৈববাণীর মত টারজনের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। স্নাইডারকে কি শাস্তি দেওয়া যায় সে বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত করে ফেলল। সে জানে সামনেই একটা নদী আছে। জার্মানটিকে চুপ করে থাকতে বলে দু'জন নিঃশব্দে নদীর দিকে এগিয়ে চলল।

নদী পার হয়ে আবার পথচলা শুরু হল। তৃতীয় দিন দুপুরে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেল। পাহাড় বেয়ে কিছুটা হেঁটে চূড়ায় উঠে একটা খাড়া খাদের সামনে দু'জন থামল। স্নাইডার নীচে তাকিয়ে দেখল, সংকীর্ণ খাদের অনেক নীচে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে একটিমাত্র গাছ। সভয়ে সে সরে এল। টারজন তাকে ধরে জোর করে খাদের ধারে নিয়ে বলল, "নেমে যাও!" তিন দিনের মধ্যে এই দ্বিতীয়বার সে কথা বলল।

ভয়ার্তচোখে নীচে তাকিয়ে স্নাইডার নামবার চেষ্টা করতেই টারজন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমিই লর্ড গ্রেস্টোক। ওয়াজিরিদের দেশে আমার স্ত্রীকে তুমিই খুন করেছ। এবার বুঝতে পারছ কেন আমি তোমার খোঁজে এসেছি। নেমে যাও!"

জার্মানটি নতজানু হয়ে বলে উঠল, "তোমার স্ত্রীকে আমি খুন করি নি। দয়া কর! আমি তোমার স্ত্রীকে খুন করি নি। সে ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না—"

"নেমে যাও!" টারজন বর্শা উঁচিয়ে হুকুম করল। সে জানে লোকটা মিথ্যা কথা বলছে। উদ্যত বর্শার মুখে স্নাইডার একটু একটু করে নামতে

লাগল। পিছনে টারজন।

আর মাত্র কয়েক ফুট নামতে বাকি। "এবার থাম," টারজন সতর্ক করে দিল। খাদের শেষ প্রান্তে একটা গুহা দেখিয়ে বলল, "ওর মধ্যে আছে একটা ক্ষুধার্ত সিংহ। সিংহটা তোমাকে দেখতে পাবার আগে যদি ঐ গাছটার কাছে পৌছতে পার তাহলে আরও কয়েকটা দিন বেঁচে থাকতে পারবে; তারপর—দুর্বল দেহ নিয়ে যখন আর গাছের ডাল ধরে থাকতে পারবে না তখন নর-খাদক নুমা তোমাকে খেয়ে ফেলবে।" এক ঠেলায় স্নাইডারকে নীচে ফেলে দিয়ে বলল, "এবার ছুট লাগাও।"

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জার্মানটি গাছ লক্ষ্য করে ছুটল। প্রায় গাছটার কাছে পৌঁছে গেছে এমন সময় ভয়ঙ্কর গর্জন করে ক্ষুধার্ত সিংহটা খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

এক চুলের জন্য স্নাইডার এ যাত্রা বেঁচে গেল। টারজন আবার উঠে গেল পাহাড়ের চূড়ায়। তার কানে এল ব্যর্থ নুমার চাপা গর্জন আর একটি মনুষ্য-কণ্ঠের প্রলাপোক্তি।

চূড়ায় উঠে টারজন একবার নীচে তাকাল। জার্মানটি সারা শরীর দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টায় গাছের একটা ডালকে আঁকড়ে ধরে আছে। তার নীচে নুমা—অপেক্ষমান।

টারজন সূর্য কুডুর দিকে মুখ তুলল। তার প্রশস্ত বুকের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা বন্য গোরিলার বিজয়-হুংকার।

৩—জার্মান শিবিরে

টারজনের প্রতিহিংসা এখনও পূর্ণ হয় নি। এখনও লক্ষ লক্ষ জার্মান বেঁচে আছে—তাদের উপর প্রতিশোধ নিতেই তার বাকি জীবনটা কেটে যাবে। কিন্তু তার জীবনে যে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে সব জার্মানকে খুন করলেও তা পূরণ হবে না—লক্ষ লক্ষ জার্মানের মৃত্যু তো তার প্রিয়তমাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না।

পারে পর্বতমালার জার্মান শিবিরে থাকার সময় যে সব খবর তার কানে এসেছে তা থেকেই সে বুঝতে পেরেছে যে আফ্রিকার যুদ্ধে বৃটিশরাই জার্মানদের হাতে মার খাচ্ছে। কথাটা মনে হলেই লজ্জায় তার মাথাটা নুয়ে পড়ে। সে যতই গোরিলা-জীবনে ফিরে যেতে চাক, যতই চাক সভ্য জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে, তবু সে তো কিছুতেই ভুলতে পারে না যে সে একজন ইংরেজ, আর এ-যুদ্ধে তারও কিছু করণীয় আছে।

এই সব সাত-পাঁচ ভেবে সে জার্মান শিবিরের দিকেই পা চালিয়ে দিল।

পথে একটা হরিণ শিকার করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করল।

পরদিন বেশ কিছুটা হাঁটতেই চোখে পড়ল জার্মান শিবির। পাহাড়ের একটা ঝোপের ভিতর থেকে নীচে তাকিয়ে সে দেখতে পেল শত্রুপক্ষের বাম ব্যূহ, এবং আরও দূরে বৃটিশ শিবির। হয়তো অন্য কারও চোখেই পড়ত না, কিন্তু টারজনের সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ল, আশে-পাশে লুকনো অনেক মেসিনগানের ঘাঁটি আর লাউডস্পিকারের দণ্ড।

পাহাড়ের নীচ থেকে ভেসে এল কামান ও রাইফেলের গুলির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ পড়ল সেই জায়গাটার উপর যেখানে একজন রাইফেলধারী নির্ঘাৎ লুকিয়ে বসে আছে। তবু জায়গাটা সঠিক ধরবার জন্য আর একটা গুলির শব্দ শোনার জন্য সে কান পেতে রইল। শব্দটা এল। চিতা বাঘের মত নিঃশব্দ পায়ে সে পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল।

একটা নীচু পাহাড়ের কিনারায় পৌঁছে প্রায় পনেরো ফুট নীচে একটা মুখ-বের-করা পাথরের উপর একটি জার্মান সৈনিককে সে দেখতে পেল। ঝোপের আড়ালে সে এমনভাবে লুকিয়ে বসে আছে যে বৃটিশ শিবির থেকে তাকে একেবারেই দেখা যাচ্ছে না। লোকটি পাকা গোলন্দাজ; জার্মান শিবিরের পিছনে বসে সে গুলি ছুঁড়ছে তারই সহকর্মীদের মাথার উপর দিয়ে। তার উচ্চশক্তিসম্পন্ন রাইফেলের সঙ্গে দূরবীক্ষণ যন্ত্র লাগানো। হাতেও একটা ছোট দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

সব কিছু ভালভাবে দেখে নিয়ে হাতের দূরবীক্ষণ যন্ত্রটা পাশে রেখে হুনটি রাইফেল কাঁধে তুলে বৃটিশ ছাউনির দিকে তাক করল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বাদামী দেহ পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ল তার উপর। তার কঠিন আঙুলগুলি চেপে বসল রাইফেলধারীর কণ্ঠনালিতে। মুহূর্তের ব্যর্থ প্রতিরোধ। হুনের প্রাণহীন দেহটা লুটিয়ে পড়ল পাথরের উপর।

সেখানেই পাহাড় ও গাছপালার আড়ালে বসে পড়ে টারজন মৃত জার্মানের রাইফেলটা তুলে নিল। নীচে অফিসার ও সৈনিকরা চলাফেরা করছে। তার ঠিক সামনেই একটা লুকনো মেসিনগান ঘুরে ঘুরে বৃটিশ শিবির লক্ষ্য করে গোলা ছুঁড়ছে।

ঈষৎ হেসে টারজন রাইফেলের ঘোড়ায় আঙুল রাখল। মেসিনগানের জার্মান গোলন্দাজটি নিজের যন্ত্রের পাশেই ঢলে পড়ল। তিনটি সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে জনৈক জার্মান অফিসার পরিখার ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। দেখতে দেখতে তাদের মৃতদেহও লুটিয়ে পড়ল। এবার টারজন শুরু করল দূরপাল্লার গুলি বর্ষণ। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

কিন্তু জার্মান শিবিরে আসল আতংক দেখা দিল তখন যখন জনৈক জার্মান সৈন্য তার অফিসায়ের গুলিবিদ্ধ দেহ থেকে বুলেটটা বের করে বুঝতে পারল যে

সেটা জার্মানির তৈরী। হৈ-চৈ পড়ে গেল। কে এই বিশ্বাসঘাতক। পেরিস্কোপের সাহায্যে চারদিকে চলল তার সন্ধান। টারজন দেখল, একটা মেসিনগান তার দিকেই তাক করে বসানো হয়েছে। শেষ গুলিটা ছুঁড়ে দিয়ে রাইফেলটা সেখানেই ফেলে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে টারজন পিছনের পাহাড়ে যেন মিলিয়ে গেল। পিছন থেকে ভেসে এল মেসিনগানের গর্জন। টারজনের ঠোঁটে খুশির হাসি। জার্মান গোলার অকারণ অপব্যবহারেই সে খুশি।

রাতের অন্ধকারে দুই বিবদমান পক্ষকেই পাশ কাটিয়ে টারজন হাজির হল বৃটিশ শিবিরে। কেউ তাকে দেখতে পেল না। তার উপস্থিতিটাও টের পেল না।

শত্রুপক্ষের দৃষ্টির আড়ালে সুবিধাজনক দূরত্বে গড়ে উঠেছে দ্বিতীয় রোডেশীয় বাহিনীর হেডকোয়ার্টার। একটা ফিল্ড-টেবিলের সামনে বসে আছে কর্নেল ক্যাপেল। সঙ্গে কয়েকজন অফিসার। টেবিলে বিছানো একখানা সামরিক মানচিত্র। মাথার উপর একটা বড় গাছ। টেবিলের উপর একটা লণ্ঠন জ্বলছে। পাশেই মাটিতে একটা ধুনি জ্বলছে। শত্রুপক্ষের হাতে বিমান নেই। অতএব তারা নিরাপদ।

গাছের ডালে খস্-খস্ আওয়াজ হল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামনে নেমে এল একটা কঠিন বাদামী দেহ। সকলেরই হাত পড়ল পিস্তলের উপর। তারা বিস্মিত। কে এই প্রায় নগ্নদেহ শ্বেতকায় মানুষ!

একজন অফিসার বলল, "কে হে তুমি মহাশয়?"

"অরণ্যরাজ টারজন," নবাগত জবাব দিল।

"ও হো, গ্রেস্টোক!" বলে মেজর সাহেব হাতটা বাড়িয়ে দিল।

হাতে হাত রেখে টারজন ডাকল, "প্রেস্‌উইক।"

মেজর বলল, "তোমাকে তো চিনতেই পারি নি। সর্বশেষ তোমাকে লণ্ডনে দেখেছিলাম সান্ধ্য পোশাকে। তফাৎ বড়ই বেশী নয় কি?"

টারজন হেসে কর্নেলের দিকে ফিরে বলল, "তোমাদের আলোচনা কিছুটা শুনেছি। জার্মান শিবিরের পিছন থেকেই আমি আসছি। হয়তো তোমাদের কিছুটা সাহায্য করতে পারব।"

কর্নেল প্রশ্ন করল, "তুমি তাহলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছ?"

টারজন জবাব দিল, "নিয়মিতভাবে নয়। আমি লড়ব আমার নিজের মত করে।" সংক্ষেপে নিজের সব কথাই সে খুলে বলল।

একটু চুপ করে থেকে ক্যাপেল শুধাল, "তুমি কার সঙ্গে এসেছ?"

খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে টারজন বলল, "আমি একাই এসেছি। আচ্ছা, এখনকার মত চলি। দ্বিতীয় রাতে আবার দেখা হবে।"

হাত তুলে কর্নেল বলল, "দাঁড়াও। একজন অফিসার সঙ্গে দিচ্ছি। সেই

তোমাকে শিবিরটা পার করে দেবে।"

টারজন মুচকি হেসে পা চালিয়ে দিল। কিছুদূর এগোতেই অফিসারের ভারী ওভারকোটে গা ঢেকে একটি ছোটখাট লোককে পাশ দিয়ে যেতে দেখল। কোটের কলার তোলা, আর সামরিক টুপিটা চোখ পর্যন্ত টেনে নামানো। কিন্তু ধুনির আগুন মুখের উপর পড়ায় টারজনের মনে হল, মুখটা তার চেনা। হয়তো লণ্ডনে পরিচিত কোন অফিসার। টারজন এগিয়ে গেল।

সারাটা রাত কিলিমাঞ্জারোর অচেনা পথ ধরে সে হাঁটতে লাগল। যা সে খুঁজছে আরও উঁচু কোন জঙ্গলের ঢালু পথেই তার দেখা মিলবে বলে তার ধারণা। ভোর হবার তিন ঘণ্টা আগে তার তীক্ষ্ণ নাসারন্ধ্রই তাকে বলে দিল যে সে যা চায় কাছাকাছি কোথাওই তা আছে। একটা লম্বা গাছে চড়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নেবার জন্য সে একটা জায়গা বেছে নিল।

৪—সিংহের খাদ্য

টারজনের ঘুম যখন ভাঙল সূর্য কুডু তখন আকাশের অনেক উপরে উঠে এসেছে। শরীরটাকে টান-টান করে আড়মোড়া ভেঙে ঘন চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে ডাল থেকে ঝুলে মাটিতে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আগেকার পথ ধরে নতুন যাত্রা।

পথে একদল শুয়োর দেখতে পেয়ে তাদের মেরে পেট ভরে খেয়ে বাকিটা বস্তাবন্দী করে কাঁধে ফেলে হাঁটতে লাগল।

একটা সুড়ঙ্গ-পথের মুখে পৌঁছবার আগেই দেখা হয়ে গেল সিংহ নুমার সঙ্গে। বেঁধে গেল তুমুল লড়াই। টারজন সুদক্ষ সিংহ-শিকারী। অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে একটা বস্তা ছুঁড়ে নুমার মুখটা ঢেকে ফেলে সহজেই তার পিঠে চেপে বসল। তারপর কোমরের দড়িটা দিয়ে আচ্ছা করে সেটাকে তার গলায় জড়িয়ে বাঁধল। এবার মুখের বস্তা খুলে নিয়ে নুমাকে হুকুম করল সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকতে। নুমা কিছুতেই ঢুকবে না; ঘাড় ফুলিয়ে গর্জন করতে লাগল। টারজনও ছাড়বে না; হাতের বর্শার খোঁচায়-খোঁচায় তাকে অস্থির করে তুলল। এইভাবে আধ ঘণ্টা চলার পরে শ্রান্ত ক্লান্ত নুমা হাল ছেড়ে দিয়ে টারজনের কাছে হার মানল। সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে এগোতে লাগল। দড়ির অপর প্রান্ত হাতে নিয়ে পিছন পিছন এগিয়ে চলল টারজন। সুড়ঙ্গ শেষ হলে বাইরের খোলা হাওয়ায় পা দিতেই নুমার মনে জাগল স্বাধীন মুক্ত জীবনের প্রেরণা। মাথা ও লেজ তুলে সে ছুট লাগাল।

টারজনের পক্ষে ফলটা হল সাংঘাতিক। সে তো তখনও সুড়ঙ্গের মুখে হাত-পায়ে ভর রেখেই এগোচ্ছে। হঠাৎ হাতের দড়িতে টান লাগায় সে মুখ থুবড়ে

পড়ে গেল। পাথুরে পথে ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে প্রায় শ'খানেক গজ ছিটকে এগিয়ে গেল। নুমা দাঁড়িয়ে পড়তেই সেও কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। রাগের মাথায় একবার ভাবল নুমাকে ভাল করে শিক্ষা দিয়ে দেবে। কিন্তু বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখাই টারজনের নীতি। তাই সে ইচ্ছা ত্যাগ করে তাকে নিয়ে এগিয়ে চলল। নুমাও তার হাতের বর্শার খোঁচার ভয়ে অনুগত ভৃত্যের মত চলল তার সামনে-সামনে।

রাত হল। নুমাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে টারজন গাছে চড়ে একটা ডালের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকাল থেকে সারাটা দিন আবার তারা পথ চলল। যখন বৃটিশ শিবিরে পৌঁছল তখন রাত হয়েছে। শিবির থেকে কিছুটা দূরে নুমাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে একাই এগিয়ে চলল কর্নেল কাপেলের হেডকোয়ার্টারের দিকে। কর্নেল অফিসারদের নিয়ে একত্র বসে গুলতানি করছিল। এমন সময় যেন এক বিদেহী আত্মার মত টারজন সেখানে নেমে এল শূন্যের ভিতর থেকে।

টারজনের এই আকাস্মিক আবির্ভাবে অফিসাররা তাকে সহাস্য অভ্যর্থনা জানাল। কর্নেল কিন্তু মাথা চুলকে বলে উঠল, "ব্যাটাদের একজনকে গুলি করে মারা উচিত। যখন-তখন যে কেউ যদি রক্ষীদের নজর এড়িয়ে এখানে ঢুকতে পারে তাহলে পাহারা বসাবার দরকারটা কি?"

টারজন হেসে বলল, "ওদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি তো মানুষ নই—আমি টারমাঙ্গানি। ইচ্ছা করলে যে কোন মাঙ্গানি ইচ্ছামত তোমার শিবিরে ঢুকতে পারে। কিন্তু তাদের যদি শাস্ত্রী হিসাবে রাখ তাহলে কেউ তাদের অজান্তে এখানে ঢুকতে পারবে না।"

"মাঙ্গানি কারা?" কর্নেল জানতে চাইল।

টারজন মাথা নেড়ে বলল, "তারা গোরিলা; আমার অনুগত। কিন্তু তুমি তাদের কাজে লাগাতে পারবেনা। কারণ তারা একই কাজ নিয়ে বেশী দিন থাকতে পারে না। তাদের মন শিশুর মত চিরচঞ্চল।"

মেজর প্রেস্‌উইক বলল, "আচ্ছা, তুমি ওদের বল মাঙ্গানি, আর নিজেকে বল টারমাঙ্গানি—এ দুইয়ের মধ্যে তফাৎ কি?"

টারজন জবাব দিল, "টার মানে সাদা, আর মাঙ্গানি মানে গোরিলা। আমার নামের অর্থ সাদা চামড়া। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন হয়তো আমার ধাই-মা কালার কালো চামড়ার তুলনায় আমি ছিলাম খুবই সাদা; তাই তারা আমাকে ডাকত সাদা চামড়ার টারজন বলে। তারা তোমাকেও টারমাঙ্গানিই বলবে।"

ক্যাপেল হেসে বলল, "সেটা কোন নিন্দার কথা নয় প্রেস্টোক। সে ভূমিকায় অভিনয় করতে পারলে যে কেউ নিজেকে ধন্য মনে করবে। যাই

হোক, এবার তোমার মতলবের কথা বল। তুমি কি মনে কর শত্রুপক্ষের ট্রেঞ্চটা ফাঁকা করে দিতে পারবে ?"

"ট্রেঞ্চটা কি এখনও গোমাঙ্গানিদের দখলে আছে ?" টারজন প্রশ্ন করল।

কর্নেল জানতে চাইল, "গোমাঙ্গানি কারা ? তুমি কি দেশী সৈনিকদের কথা বলছ ?"

"হ্যাঁ, গোমাঙ্গানি হচ্ছে কালা আদমি—নিগ্রোরা।"

ক্যাপেল তবু প্রশ্ন করল, "তোমার মতলবটা কি, আর আমাদেরই বা কি করতে হবে ?"

টেবিলের কাছে এগিয়ে গিয়ে মানচিত্রের উপর একটা আঙুল রেখে টারজন বলল, "এইখানে একটা লাউড-স্পিকার বসানো আছে, আর সেই ঘাঁটিতে আছে একটা মেসিনগান। এখানে আছে আর একটা ট্রেঞ্চ আর সেটা ঐখানে গিয়ে মেসিনগানের কাছে মিশেছে। আমাকে একটা বোমা দাও ; লাউড-স্পিকারে যখন সেটা ফেটে যাওয়ার শব্দ শোনা যাবে তখনই যেন তোমার সৈনিকরা ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। ইতিমধ্যে তারা শত্রুর ট্রেঞ্চের মধ্যে একটা গোলমাল শুনতে পাবে ; কিন্তু তাতেও যেন তারা কোনরকম তাড়াহুড়া না করে। তাদের বলে দিও যে আমিও হয়তো সেই ট্রেঞ্চের মধ্যেই থাকব।"

ক্যাপেল বলে উঠল, "বাস, তাহলেই তুমি একা ট্রেঞ্চটা সাফ করে দিতে পারবে ?"

কঠোর হাসি হেসে টারজন বলল, "ঠিক একা নয়। তবে ট্রেঞ্চটা আমি ফাঁকা করে দেবই ; আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই।"

টারজন বোমাটা নিয়ে বেরিয়ে গেল ; যেতে যেতেই হঠাৎ একটা ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল : আগের দিন কর্নেলের কাছ থেকে ফিরে যাবার সময় ধুনির আলোয় যে মুখটা মুহূর্তের জন্য দেখেই তার চেনা-চেনা মনে হয়েছিল। ঘাড় নাড়তে নাড়তে আপন মনেই বলল—তা তো হতে পারে না। তবু সেই তরুণ অফিসারের মুখটা অবিকল জার্মান গুপ্তচর ফ্রলিন কিৎচারের মতই।

শাস্ত্রীদের ঘাঁটি পার হয়ে টারজন দ্রুত এগিয়ে গেল সিংহ নুমার কাছে। পশুটা শুয়ে ছিল, টারজনকে দেখেই উঠে দাঁড়াল। তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল একটা চাপা গর্জন—গর্বিত পশুরাজের গর্জনের চাইতে ক্ষুধার্ত কুকুরের চাপা রোষই তাদের অধিক প্রকট।

টারজন গোরিলাদের ভাষায় বলল, "হবে—হবে ; অচিরেই শিকার মিলবে—ক্ষুধাও মিটবে।"

সতর্ক পদক্ষেপে দুই পশু এগিয়ে চলল জার্মান লাউড-স্পিকারটার দিকে। টারজনের এক হাতে ইংরেজদের দেওয়া বোমা, অন্য হাতে সিংহের গলায় বাঁধা দড়ির একটা প্রান্ত। আর মাত্র কয়েক গজ দূরেই দেখা গেল জার্মান শাস্ত্রীর

মাথা ও গলা। ডান হাতে বোমাটা চেপে ধরে দূরত্বটা অনুমান করে শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে টারজন সবেগে বোমাটা ছুঁড়ে দিয়েই মাটির উপর সটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

পাঁচ সেকেণ্ড পরেই ভেসে এল বোমা-বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ। ভীত নুমাকে টানতে টানতে টারজন সেই দিকে এগিয়ে গেল। কয়েক টুকরো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হাড়-মাংস ছাড়া শান্ত্রীটির কোন চিহ্নই সেখানে নেই। শুধু বালির বস্তায় ঢাকা থাকায় মেসিনগানটার কোন ক্ষতি হয় নি।

একটি মুহূর্ত নষ্ট করার মত সময়ও হাতে নেই। সামনেই সেই ট্রেঞ্চের মুখটা হাঁ করে আছে যেটা সোজা চলে গেছে জার্মান ট্রেঞ্চ পর্যন্ত। এক ঝটকায় নুমাকে সেই ট্রেঞ্চের মুখে ঠেলে দিয়ে দ্রুত হাতে মেসিনগানটাকে নামিয়ে এনে সেই দিকে মুখ করে বসিয়ে দিল। তারপরেই ছুরিটা বের করে নুমার গলার কলারটা কেটে দিল—খুলে দিল তার মুখের বস্তার বন্ধনি। তবু নুমা এগিয়ে যেতে ইতস্তত করছে দেখে টারজন তাকে জোর করে ঠেলে দিল ট্রেঞ্চের ভিতরে। পিছন থেকে খোঁচা লাগাল বর্শা দিয়ে। একটু একটু করে এগিয়ে চলল নুমা। পর মুহূর্তেই শোনা গেল তার ক্রুদ্ধ গর্জন। টারজন বুঝতে পারল, ক্ষুধার্ত নুমা মাংসের গন্ধ পেয়েছে। মেসিনগানটাকে টেনে নিয়ে টারজনও সেই দিকে এগিয়ে চলল। নুমার গর্জন ও ভয়ার্ত মানুষের আর্তনাদ মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেল।

অরণ্যরাজের মুখে ফুটে উঠল কুটিল হাসি। অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল, "ওরা আমার ওয়াজিরিদের খুন করেছে; মুভিরোর ছেলে ওয়াসিম্বুকে ক্রুশে বিঁধেছে।"

ট্রেঞ্চের মধ্যে তখন চলেছে একতরফা আক্রমণ। ক্ষুধার্ত হিংস্র নুমার দাঁত ও নখের আঘাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কালা আদমির দল আত্মরক্ষার জন্য পালাতে গিয়ে নিজেরাই নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে।

বৃটিশ সৈন্যরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে জার্মান ট্রেঞ্চের দিকে। ভীত পলায়নপর কালা আদমিরা যেন স্বেচ্ছায় এসে আত্মসমর্পণ করতে লাগল। একটু একটু করে এগিয়ে জার্মান ট্রেঞ্চের মধ্যে পৌঁছে হঠাৎ তাদের কানে এল মেসিন-গানের ঘন ঘন আওয়াজ। হঠাৎ তারা দেখতে পেল একটা প্রকাণ্ড সিংহ একটা হুনকে কামড়ে ধরে একলাফে রাতের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একেবারে সামনের সারির রোডেশীয় সৈন্যরা আরও একটা দৃশ্য দেখতে পেল—একজন দশাসই চেহারা জার্মান অফিসার গর্তের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল টারজনের ঠিক পিছনে। মৃত সৈনিকের পরিত্যক্ত রাইফেল তুলে নিয়ে সে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে টারজনের দিকে। রোডেশীয় সৈন্যরা টারজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য চীৎকার করতে করতে ছুটে গেল; কিন্তু ট্রেঞ্চের ভিতরকার হৈ-হল্লা ও মেসিনগানের শব্দে কিছুই তার কানে গেল না। জার্মানটি

লাফিয়ে পাঁচিলের উপর উঠে রাইফেলটা বাগিয়ে ধরতেই অরণ্যরাজ হঠাৎ বিদ্যুৎ-গতিতে ঘুরে দাঁড়াল।

জার্মান অফিসারটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা খড়কুটোর মত যে তার হাতের বেয়নেটটাকে কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে যেন কোন মানুষ নয়—সে যেন একটা বুনো জানোয়ার। বুনো জানোয়ারের মতই হুনটার কাঁধে সে দাঁত বসিয়ে দিল—তার মোটা গলায় ঢুকিয়ে দিল সুতীক্ষ্ণ নখর। সকলে দেখল, টারজন লোকটাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে শিকারী কুকুর যে ভাবে ইঁদুরকে ঝাঁকায় সেই ভাবে তাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে একটা হাঁটু দিয়ে তার পিঠটা চেপে ধরে গলাটাকে উল্টে দিয়ে পট্ করে ভেঙে ফেলল। প্রাণহীন জার্মানের দেহটাকে দুই হাতে তুলে টারজন সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

আণ্ডার লেফ্টেন্যান্ট ভন গসের মৃত্যু হল।

আতংকবিহ্বল সৈনিকদের দিকে পিছন ফিরে একবার মাত্র তাকিয়ে টারজন একলাফে ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

৫—সোনার লকেট

পূর্ব আফ্রিকার ছোট বৃটিশ বাহিনীটি প্রাথমিক বিপর্যয়ের পরে এখন ধীরে ধীরে পায়ের নীচে মাটি ফিরে পাচ্ছে। জার্মান আক্রমণে ভাটা পড়েছে; হুনরা ক্রমেই পিছু হটে যাচ্ছে রেলপথ বরাবর টাঙ্গার দিকে।

টারজন ও সুমার হাতে প্রচণ্ড মার খাবার পরে জার্মানরা বাঁ দিককার ট্রেঞ্চগুলি ছেড়ে চলে গেছে, আর দ্বিতীয় রোডেশীয় রেজিমেণ্ট সেগুলি দখল করে নিয়েছে।

তারপর বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে গেছে। আণ্ডার লেফ্টেন্যান্ট ভন গসকে হত্যা করার পর অরণ্যরাজ টারজনের আর কোন হদিসই নেই। অনেকেই মনে করছে জার্মানদের হাতে তার মৃত্যু ঘটেছে।

কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটে নি। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি জার্মান গুপ্তচরকে জীবিত অবস্থায় গ্রেপ্তার করে সে বৃটিশদের হাতে তুলে দিতে চায়। গুপ্তচর মেয়েটিকে সে প্রথম দেখেছে জার্মান জেনারেলের হেডকোয়ার্টারে। তারপর দেখেছে বৃটিশ শিবিরে একজন বৃটিশ অফিসারের ছদ্মবেশে। তার সন্ধানেই টারজন বার বার হানা দিয়েছে জার্মান হেডকোয়ার্টারে।

একদিন রাতে। হাউট্ম্যান ফ্রিজ স্নাইডারের নেতৃত্বাধীন একদল কালা সৈনিক ঘুমিয়েছিল তাঁবুর বাইরে খোলা জায়গায়। পাশেই অফিসাররা ঘুমচ্ছে তাঁবুর ভিতরে।

নিঃশব্দ পায়ে সেখানে হাজির হল টারজন। ঘুমন্ত সৈনিকদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল তাঁবুর দিকে। প্রথম তাঁবুর পাশে সটান শুয়ে পড়ে কান পাতল। একটি ঘুমন্ত মানুষের নিয়মিত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ—মাত্র একজন। খুশি মনে তাঁবুর পিছনের দড়িটা ছুরি দিয়ে কেটে টারজন ভিতরে ঢুকল। একটা পাতা ঝরে পড়ার মত শব্দও হল না। ঘুমন্ত লোকটির উপর ঝুঁকে পড়ে তাকাল। লোকটি স্নাইডার কি অন্য কেউ তা সে জানে না, কারণ তাকে সে কখনও চোখেই দেখে নি। কাঁধ ধরে নাড়া দিতেই লোকটি পাশ ফিরে হকচকিয়ে উঠল।

টারজন ফিস্‌ ফিস্‌ করে বলল, "চুপ! একটি কথা বললে শেষ করে ফেলব।" এক হাতে কাঁধটা চেপে ধরে আর একটা হাত চেপে বসল লোকটির গলায়। টারজন আবার বলল, "তোমার নাম কি?"

অফিসারটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "লুবের্গ। তুমি কি চাও?"

"হাউট্‌ম্যান ফ্রিজ স্নাইডার কোথায়? কোন্‌টা তার তাঁবু?"

লুবের্গ উত্তর দিল, "সে এখানে নেই। কালই তাকে উইল্‌হেল্‌ম্‌স্টলে পাঠানো হয়েছে।"

টারজন বলল, "এখন তোমাকে মারব না। আগে দেখে আসি তুমি মিথ্যা বলেছ কি না। তা যদি করে থাক তো তোমার মৃত্যু হবে আরও ভয়ংকর। মেজর স্নাইডারের কি ভাবে মৃত্যু হয়েছে জান?"

লুবের্গ মাথা নেড়ে জানাল, জানে না।

টারজন বলল, "আমি জানি। যাক সে কথা। এবার উপুড় হয়ে শুয়ে চোখ বোজ। নড়াচড়া করো না। হল্লা করো না।"

লোকটি উপুড় হয়ে চোখ বুজতেই টারজন চকিতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ল। এক ঘণ্টা পরে দেখা গেল। জার্মান শিবির ছেড়ে সে ছুটে চলেছে ছোট্ট শৈল-শহর উইল্‌হেল্‌ম্‌স্টলের দিকে—জার্মান পূর্ব আফ্রিকা সরকারের সেটাই গ্রীষ্মাবাস।

ফ্রলিন বার্থা কির্‌চার পথ হারিয়ে ফেলেছে। পাঙ্গানি ও টাঙ্গা রেলপথের মধ্যবর্তী ছোট্ট জায়গাটিতেই পথের হদিস হারিয়ে ফেলেছে। সে জানে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে উইল্‌হেল্‌ম্‌স্টল অবস্থিত; কিন্তু যে ভাবেই হোক দক্ষিণ-পূর্ব দিক নির্ণয়েই সে ভুল করেছে।

বিনা দানা-পানিতে তার ঘোড়াটা সারাদিন পথ চলেছে। রাত নেমে আসছে। বুনো মাছি আর হিংস্র প্রাণী অধ্যুসিত এই পথহীন অজানা অঞ্চলে সে পথ হারিয়েছে। কোন্‌ দিকে যাচ্ছে তাই বুঝতে পারছে না; হয়তো ভুল করে ক্রমেই রেলপথ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে নিষিদ্ধ দেশ পাঙ্গানির দিকে। তবু থেমে যাওয়া অসম্ভব—তাকে চলতেই হবে।

আর যাই হোক বার্থা কির্‌চার ভীরু নয়; তবু রাতের অন্ধকার যতই ঘিরে

আসতে লাগল ততই আসন্ন রাত্রির নানা রকম বিপদের সম্ভাবনা তাকে বিহ্বল করে তুলল। কোনমতে কিছু শুকনো কাঠ-খড় যোগাড় করে একটা ধুনি জ্বালাল। পাশেই বড় বড় ঘাসে ঢাকা খানিকটা জমি দেখতে পেয়ে সেখানে ঘোড়াটাকে ঘাস খেতে দিল। আর নিজে একটা বিছানার মত তৈরী করে ধুনির পাশে শুয়ে পড়ল।

অন্ধকার। আকাশে চাঁদ নেই, তারা নেই। ধুনির যৎসামান্য আলো যেন অন্ধকারকে গাঢ়তর করে তুলেছে।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে গা ছম-ছম্ করে। ঘুম আসে না। এমন সময় দূর থেকে—সম্ভবত মাইলখানেক দূর থেকে ভেসে এল সিংহের গর্জন। চমকে উঠে কিম্‌চার পাশের রাইফেলে হাত রাখল। তার শরীরের ভিতর দিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেল। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

বার বার সেই একই শব্দ। ক্রমেই কাছে—আরও কাছে। আতংক ও উৎকণ্ঠায় ভরা আরও একটি ঘণ্টা কেটে গেল। আরও একঘণ্টা—আরও—

হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তার ঘুম ভেঙে গেল। কী আশ্চর্য! এত বিপদের মুখেও সে ঘুমিয়ে পড়েছিল কেমন করে! ঘুম ভাঙতেই কিম্‌চার তো অবাক। চারদিকে দিনের আলো। বীভৎস রাতটা কোথায় হারিয়ে গেছে তার অবর্ণনীয় আতংকের ছবি নিয়ে। সামনেই পূব দিকে যাবার রাস্তা। তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে কিম্‌চার ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল। সেই মুহূর্তে তার মনে হল সে বুঝি উইল্‌হেল্‌ম্‌স্টল অপেক্ষাও নিরাপদ।

হায় রে! সে যদি জানত যে ঝোপের আড়াল থেকে দুটি চোখ অনেকক্ষণ থেকেই তার দিকে নজর রেখেছে তাহলে হয়তো এতটা নিশ্চিত হতে সে পারত না।

একান্ত নির্ভরতায় ঘোড়াটাকে নিয়ে ঝোপটার কাছে পৌঁছনমাত্রই সিংহ নুমা লাফিয়ে পড়ল ঘোড়াটার ঘাড়ের উপর। আকস্মিক আতংকে ঘুরে যাবার চেষ্টা করতেই ঘোড়াটা সবেগে মাটিতে আছড়ে পড়ল। মেয়েটি নিজেকে ঘোড়ার পিঠ থেকে সরাবার ফুরসৎটুকুও পেল না; সেও ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল; তার বাঁ পাটা ঘোড়ার নীচে চাপা পড়ল।

তার চোখের সামনেই পশুরাজ প্রকাণ্ড হাঁ করে কামড় বসাল ঘোড়াটার পিঠে। সেই হাঁ ধীরে ধীরে বুজে এল। মড়-মড় করে শিরদাঁড়া ভাঙার একটা শব্দ হল। কাঁপতে কাঁপতে ঘোড়াটার নিথর দেহ মাটিতে এলিয়ে পড়ল।

নুমা জাঁকিয়ে বসল তার শিকারের উপর। দুটি ভয়ংকর চোখ স্থির-নিবদ্ধ কিম্‌চারের মুখের উপর—গরম নিঃশ্বাস পড়ছে তার গালের উপর—মুখের তীব্র গন্ধে গুলিয়ে উঠছে পেটের ভিতর পর্যন্ত। দু'জন দু'জনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। কিম্‌চারের মনে হল, বুঝি অনন্তকাল ধরে চলছে সে দৃষ্টিবিনিময়।

বার্থা কির্‌চার জীবনে কখনও এত ভয় পায় নি—এমন ভয়ংকরের মুখোমুখিও আগে কখনও হয় নি। তার প্যান্টের পকেটে পিস্তল আছে। তা দিয়ে মানুষের মোকাবিলা করা যায়; কিন্তু এই বিরাটদেহ পশুরাজের পক্ষে সে পিস্তল তো একটা খেলনার সামিল।

কী আশ্চর্য! এত বড় বিপদের মধ্যেও সহসা বার্থা কির্‌চারের মনে পড়ল, জীবনে কতবার তার মনে সাধ জেগেছে, চোখের সামনে দেখবে একটা সিংহ শিকার ধরে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার মাংস খাচ্ছে। হায়! তখন কি সে জানত যে সেই সাধ এমন কঠোর বাস্তব হয়ে পূর্ণ হবে!

চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে আছে পশুরাজ আর এক মানব-কন্যা। দু'জনই নিশ্চল, জড়বৎ। হঠাৎ মেয়েটির কানে এল তার পিছন থেকে উচ্চারিত হল একটি মানব-কণ্ঠের পাশবিক হুংকার।

সহসা মেয়েটির উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নুমা তাকাল তার পিছনে। পশুরাজের মুখের গর্‌-গর্‌ শব্দ রূপান্তরিত হল গর্জনে।

নুমা প্রথম যখন ঘোড়াটার উপর লাফিয়ে পড়ে তখন থেকেই অরণ্যরাজ টারজন তাদের উপর নজর রেখেছে। প্রথমে ভেবেছিল নুমা মেয়েটাকে নিয়ে যা খুশি করুক। ও তো একটা ঘৃণিত জার্মান গুপ্তচর ছাড়া কিছু নয়। সে তো প্রথম ওকে দেখেছে জেনারেল ক্রাউটের হেডকোয়ার্টারে। তারপর দেখেছে বৃটিশ শিবিরে বৃটিশ অফিসারের ছদ্মবেশে। শেষের চিন্তাটা মাথায় আসতেই তার মন ঘুরে গেল। যেমন করে হোক মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে। ওকে সামনে বসিয়ে জেরা করতে পারলে জেনারেল জ্যান স্মাট্‌স্‌ নিশ্চয় খুশি হবে। ওকে গুলি করে হত্যার হুকুম দেবার আগে তার কাছ থেকে জেনারেল নিশ্চয় অনেক মূল্যবান তথ্য জেনে নিতে পারবে।

টারজন যে শুধু মেয়েটিকেই চিনেছে তা নয়, চিনেছে সিংহটাকেও। একটু এগিয়ে এসে সে বলে উঠল, “নুমা, চলে যাও। নইলে টারজন আবার তোমাকে বেঁধে নিয়ে কোন খাবার না দিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাবে। দেখছ আমার হাতের এই বর্শা! মনে পড়ে এটা দিয়ে কতবার তোমাকে আঘাত করেছি? আঘাতে-আঘাতে রক্তাক্ত করেছি তোমার দেহকে? নুমা, চলে যাও। আমি অরণ্যরাজ টারজন বলছি।”

যেন তার কথা শুনেই নুমা পিছনে সরে গেল। টারজন মেয়েটির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করল, “তুমি কি গুরুতর আহত?”

মেয়েটি বলল, “বোধ হয় না। তবে ঘোড়ার নীচ থেকে আমার পাটাকে কিছুতেই ছাড়াতে পারছি না।”

টারজন বলল, “আবার চেষ্টা কর। নুমাকে কতক্ষণ এভাবে রাখা যাবে জানি না।”

দু'জনের চেষ্টায় মেয়েটি মুক্ত হল। টারজন বলল, "তুমি হাঁটতে পারবে?"

"পারব। পাটা অবশ লাগছে, তবে বিশেষ ক্ষতি হয় নি।"

"খুব ভাল," টারজন বলল। "আমার পিছন-পিছন পিছিয়ে এস। হঠাৎ দৌড় দিও না। মনে হচ্ছে, ও তোমাকে আক্রমণ করবে না।"

খুব সতর্ক হয়ে দু'জন পিছু হটতে লাগল। কোন রকমে ঝোপের ভিতর ঢুকেই কিরচারের মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল। টারজন ধরে না ফেললে সে হয়তো পড়েই যেত।

একটু পরেই সুস্থ বোধ করে সে বলল, "মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। এখন ভাল বোধ করছি। তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব। কী আশ্চর্য ব্যাপার—ভয়ংকর প্রাণীটাকে তুমি কিন্তু এতটুকু ভয় পাও নি, অথচ সে তোমাকে ভয় করেছে। তুমি কে?"

টারজন কঠিন কণ্ঠে বলল, "ও আমাকে চেনে, তাই ভয় করে।"

মেয়েটির একেবারে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এতক্ষণে সে তাকে ভালভাবে দেখার সুযোগ পেল। মেয়েটি খুব সুন্দরী—সেটা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাতে টারজনের মন গলল না। সে যে একজন জার্মান—জার্মান গুপ্তচর।

হঠাৎ টারজনের চোখ পড়ল মেয়েটির খোলা বুকের উপর। বিস্ময়ে ও ক্রোধে সে আঁতকে উঠল। মেয়েটির সাদা বুকের উপর ঝুলছে একটা হীরকখচিত সোনার লকেট—যে লকেট তার প্রথম প্রণয়-উপহার—যা তার সঙ্গিনীর বুক থেকে চুরি করেছিল হুন স্নাইডার। মেয়েটির হাত চেপে ধরে হারটা ছিনিয়ে নিয়ে ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, "এটা তুমি কোথায় পেয়েছ?"

মেয়েটি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "হাত ছেড়ে দাও।"

তার কথায় কান না দিয়ে টারজন আবার বলল, "আমার প্রশ্নের জবাব দাও। এটা কোথায় পেয়েছ?"

"তা দিয়ে তোমার কি দরকার?"

"এটা আমার। বল কে তোমাকে এটা দিয়েছে, নইলে আবার তোমাকে নুমার মুখে ছুঁড়ে দেব।"

"এমন কাজ তুমি করতে পারবে?" মেয়েটি শুধাল।

"কেন পারব না? তুমি তো গুপ্তচর, আর গুপ্তচরের শাস্তি মৃত্যু।"

মেয়েটি জবাব দিল, "আমাকে ওটা দিয়েছে হাউট্‌ম্যান ফ্রিজ স্নাইডার।"

টারজন গম্ভীর গলায় বলল, "বুঝলাম। এবার হেডকোয়ার্টারে চল।"

ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে এক সময় কিরচার বলল, "তুমি কি করে বুঝলে যে আমি গুপ্তচর?"

টারজন বলল, "তোমাকে প্রথম দেখেছিলাম জার্মান হেডকোয়ার্টারে, তারপর বৃটিশ শিবিরে।"

বার্থা কির্‌চার পকেটের পিস্তলটা স্পর্শ করল। কোন মতেই সে বৃটিশ শিবিরে ফিরে যাবে না। তার জন্য দরকার হলে পিস্তলের আশ্রয়ই নেবে। পাশের দীর্ঘকায় মূর্তিটির দিকে একবার তাকাল। কী অপূর্ব মূর্তি। তবু সে তো একটা জানোয়ার মাত্র। তাকে ধরে নিয়ে যেতেই সে এসেছে। আর ঐ লকেটটা। ওটা তাকে ফিরে পেতেই হবে—পৌঁছে দিতে হবে উইল্‌হেল্‌ম্‌স্টলে।

পথটা এখন খুব সরু হয়ে গেছে। তাই টারজন তার দু'-এক ফুট আগে আগে চলেছে। একটা গুলিই যথেষ্ট; আর এত কাছে থেকে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবারও কোন আশংকা নেই। আবার সে তাকাল লোকটির রাজোচিত দেহের দিকে। বুকের ভিতরটা উদ্বেল হয়ে উঠল। না, তাকে সে হত্যা করতে পারবে না। কিন্তু—তাকে তো মুক্তি পেতেই হবে; ফিরে পেতে হবে লকেটটা। পরমুহূর্তেই এক অন্ধ আবেগে পিস্তলটা বাগিয়ে ধরে তার কুঁদো দিয়ে সজোরে আঘাত হানল টারজনের মাথায়। টারজনের দেহটা ছিন্নমুণ্ড ষাঁড়ের মত সেখানেই লুটিয়ে পড়ল।

৬—প্রতিহিংসা ও করুণা

টারজন ধীরে ধীরে চোখ মেলল। জঙ্গলের মধ্যে একটা সরু পথের উপর সে পড়ে আছে। ক্রমে সব কথাই মনে পড়ল। মেয়েটি মোক্ষম আঘাত হেনেছিল। তার সাহসের প্রশংসা করতে হয়।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল তার চোখে। উইল্‌হেল্‌ম্‌স্টলে পৌঁছবার আগেই তাকে ধরতে হবে। শহরটা এখান থেকে অন্তত ত্রিশ মাইল দূরে। পাহাড়ি রাস্তাটায় পথচলা কষ্টসাধ্য। দুদিনের আগে সেখানে পৌঁছতে পারবে না।

টারজন উঠে দাঁড়াল। বার্থা কির্‌চারের পায়ের ছাপ অনুসরণ করে হাঁটতে শুরু করল।

রেলপথে পৌঁছে পায়ের ছাপ শেষ হয়ে গেছে। মেয়েটি নিশ্চয় ট্রেনে চেপেছে। অতএব এবার টারজনের গন্তব্যস্থল উইল্‌হেল্‌ম্‌স্টল। সেখানেই ক্যাপ্টেন ফ্রিজ স্নাইডার ও মেয়েটির দেখা মিলবে; মিলবে তার হীরকখচিত লকেটের সন্ধান।

টারজন যখন ছোট পার্বত্য শহর উইল্‌হেল্‌ম্‌স্টলে পৌঁছল তখন রাত হয়েছে। সৈনিকরা চলাফেরা করছে। শহরটি সুরক্ষিত। শ'খানেক গজ দূরে একটি শান্ত্রীকে তো সে দেখতেই পাচ্ছে।

অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে কখনও হেঁটে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে সেনাশিবিরের একটা আউটহাউসের ছায়ায় পৌঁছে গেল। সেখান থেকে বাড়ির পর

বাড়ি পার হয়ে একটা বাংলোর পিছনে হাজির হল। ভিতরে আলো জ্বলছে। ইউনিফর্মধারী লোকজন নড়াচড়া করছে।

একটা কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ডাক কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে ইউনিফর্মধারী একজন জার্মান অফিসার বাংলোর দরজা খুলে বেরিয়ে এসে ডাকল, "সিম্বা!"

টারজন একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

কোন সাড়া না পেয়ে লোকটি বার বার 'সিম্বা' বলে ডাকতে ডাকতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গাছটার দিকে এগিয়ে এল। জার্মান অফিসারটি আরও কাছে এল। ফুট দশেক দূরে থাকতেই টারজন তার উপর লাফিয়ে পড়ল। প্রচণ্ড ধাক্কায় জার্মানটি মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল। ইস্পাত-কঠিন আঙুলের চাপ গলায় বসে যাওয়ায় একটা ক্ষীণ আর্তনাদও আর মুখ দিয়ে বের হল না। মুহূর্তকাল পরে তার প্রাণহীন দেহটা মাটিতে এলিয়ে পড়ল। টারজন তাড়াতাড়ি তার পোশাকটা পড়ে নিল।

এবার হোটেলটা খুঁজে বের করতে হবে। তার অনুমান মেয়েটিকে সেখানেই পাওয়া যাবে। তার সঙ্গেই পাওয়া যাবে হাউট্‌ম্যান ফ্রিজ স্নাইডারকে। আর সেখানেই পাবে তার মূল্যবান লকেটটা।

অনেক খুঁজে হোটেলটা পাওয়া গেল। একটা নীচু দোতলা বাড়ি। সামনে বারান্দা। উপরে-নীচে আলো জ্বলছে। অনেক অফিসারের মেলা।

একতলার ঘরে আকাংখিত লোকদের দেখতে না পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে গেল বারান্দার ছাদে। সেখান থেকে জানালার ফাঁক দিয়ে ভিতরটা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলল।

কোণের একটা ঘরের শার্সি নামানো। ভিতরে আলো জ্বলছে। কথাবার্তাও শোনা যাচ্ছে। টারজন দরজায় কান পাতল।

প্রথমে শুনতে পেল একটি নারী-কণ্ঠ: "আমার অভিজ্ঞান হিসাবে লকেটটা আমি নিয়ে এসেছি। জেনারেল ক্রাউটের সঙ্গে তোমার তো সেই রকমই কথা হয়েছিল। আমার কাছে আর কোন পরিচয়পত্র নেই। তার দরকারও নেই। এবার কাগজপত্রগুলো আমাকে দিয়ে দাও, আমি চলে যাচ্ছি।"

পুরুষটি নীচু গলায় কি বলল টারজন তা ধরতে পারল না। আবার নারী-কণ্ঠ—তাতে ঘৃণা ও ভয়ের আভাষ।

"এত স্পর্ধা ভাল নয় হাউট্‌ম্যান স্নাইডার। আমাকে স্পর্শ করো না। হাত সরিয়ে নাও।"

এবার অরণ্যরাজ টারজন দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। দেখল, বৃষস্কন্ধ একটি জার্মান অফিসার এক হাতে ফ্রলিন বার্থা কির্‌চারের কোমরটা জড়িয়ে ধরে আর এক হাতে তার কপালটাকে ঠেলে দিয়ে তার ঠোঁটে চুমো খেতে চেষ্টা করছে। মেয়েটি প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে, কিন্তু জানোয়ারটার সঙ্গে শক্তিতে এঁটে উঠছে না।

ধীরে ধীরে লোকটির ঠোঁট মেয়েটির মুখের আরও কাছে নেমে আসছে।

পিছনে দরজা খোলা ও বন্ধ হবার শব্দ শুনে স্নাইডার ঘুরে দাঁড়াল। অপরিচিত অফিসারটিকে দেখে মেয়েটিকে নামিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

"এভাবে এ ঘরে ঢোকার অর্থ কি লেফ্‌টেন্যাণ্ট? এখনই ঘর থেকে বেরিয়ে যাও।"

টারজন মুখে কিছু বলল না; কিন্তু তার গলার ভিতর থেকে এমন ভয়ংকর একটা গর্‌-গর্‌ শব্দ বেরিয়ে এল যা শুনে মেয়েটি শিউরে উঠল, আর লালমুখো হুনটি বিবর্ণ মুখে পিস্তলটা চেপে ধরল। সেটা টেনে বের করা মাত্রই টারজন সেটাকে ছিনিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একটু পিছিয়ে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে গায়ের কোটটা খুলে ফেলল।

দৃঢ়কণ্ঠে শুধাল, "তুমিই হাউট্‌ম্যান স্নাইডার?"

"তাতে তোমার কি?" জেনারেল গর্জে উঠল।

"আমি অরণ্যরাজ টারজন। এবার বুঝতে পারছ কেন আমি এঘরে ঢুকেছি।"

কোটটাকে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে টারজন ট্রাউজারটাও খুলে ফেলল। এখন তার পরিধানে একটিমাত্র কটি-বস্ত্র। এবার মেয়েটি তাকে চিনতে পারল।

টারজন চীৎকার করে বলল, "পিস্তলে হাত দিও না।" মেয়েটির হাত সোজা নেমে গেল। "এবার এদিকে এস।"

মেয়েটি এগিয়ে গেল। টারজন তার অস্ত্রটা তুলে নিয়ে সেটাকেও জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

স্নাইডার ভয়ে-ভয়ে বলল, "আমার কাছে কি চাও তুমি?"

টারজন বলল, "ওয়াজিরিদের দেশে একটা ছোট বাংলোতে যে অপকর্ম তুমি করে এসেছ তারই দামটা মিটিয়ে নিতে চাই।"

স্নাইডার নানা রকম হুমকি দিতে লাগল। তাতে কান না দিয়ে টারজন দরজার তালার চাবিটা ঘুরিয়ে সেটাকেও পিস্তল দুটোর মত জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মেয়েটিকে বলল, "তুমি সরে যাও। অরণ্যরাজ টারজন এবার খুন করবে।"

জার্মানটির মুখ সাদা হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, "বাড়িতে আমার স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে। আমি কিছুই করি নি। আমি—"

তাকে বাধা দিয়ে টারজন বলল, "তোমার হাতে রক্ত আর মুখে মিথ্যা কথা। তোমার মত লোকদের উপযুক্ত মৃত্যুর ব্যবস্থাই করব।"

একলাফে এগিয়ে টারজন লোকটির গলা টিপে ধরে শিকারী-ছুরিটা টেনে বের করল। সেটাকে আমূল বসিয়ে দিল স্নাইডারের তলপেটে। ভয়ংকর গলায় হিস্‌হিসিয়ে বলল, "এইভাবে তুমি হত্যা করেছিলে আমার সঙ্গিনীকে। এইভাবেই তুমিও মরবে!"

মেয়েটি স্খলিত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বলে উঠল, "হায় ঈশ্বর! না, না! এ কাজ করো না। তুমি সাহসী পুরুষ—তুমি তো এই লোকটার মত পশু হতে পার না।"

তার দিকে ঘুরে টারজন বলল, "পারি না! তুমি ঠিক বলেছ, এ কাজ আমি করতে পারি না—আমি তো জার্মান নই।"

ঠিক তখনই "আমি একাজ করি নি! সেই নারী তো—" মুখের কথা শেষ না করেই হুনের কণ্ঠস্বর চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেল।

মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়ে হাতটা বাড়িয়ে টারজন বলল, "আমার লকেটটা দাও।"

মৃত অফিসারকে দেখিয়ে মেয়েটি বলল, "ওর কাছে আছে।" লকেটটা খুঁজে পেয়ে টারজন বলল, "এবার কাগজপত্রগুলো দিয়ে দাও।"

বিনা বাক্যব্যয়ে মেয়েটি ভাঁজ-করা দলিলগুলো টারজনের হাতে তুলে দিল।

টারজন বলল, "আমি তোমার খোঁজেও এসেছিলাম। তোমাকে সশরীরে নিয়ে যেতে না পারলে তোমাকেও খুন করতাম, কারণ তোমাদের সবাইকে শেষ করার ব্রতই আমি নিয়েছি। কিন্তু তুমি ঠিকই বলেছ, ওই নারীঘাতীর মত পশু আমি হতে পারি না। তুমি নারী বলেই তোমাকে খুন করতে আমি পারি না।"

জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে শার্সিটা তুলে মুহূর্তের মধ্যে টারজন বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ফ্রলিন বার্থা কির্চার অতি দ্রুত মেঝের উপর পড়ে-থাকা মৃতদেহটার কাছে গিয়ে তার জামার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে একটা ছোট কাগজের বাণ্ডিল বের করে নিজের কোমরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। তারপর জানালার কাছে গিয়ে সাহায্যের জন্য চীৎকার করতে লাগল।

৭—আকাশ থেকে

রয়্যাল এয়ার সার্ভিসের লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক অনুসন্ধানে বেরিয়েছে। জার্মান পূর্ব আফ্রিকার বৃটিশ হেডকোয়ার্টারে একটা খবর এসেছে—বরং বলা যায় যে একটা গুজব ছড়িয়েছে—যে শত্রুপক্ষ সসৈন্যে এসে পশ্চিম উপকূলে নেমেছে এবং ঔপনিবেশিক বাহিনীকে জোরদার করতে অন্ধকার মহাদেশের ভিতরেও ঢুকে পড়েছে। এমন কি তারা দশ বারো দিনের মত এগিয়েও গেছে।

তাই লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ—ওল্ডউইক বিমানপথে পশ্চিম দিকেই চলেছে—কোন হুন বাহিনী সেদিকে এসেছে কি না সে দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

রেখেছে। নীচে দূর বিস্তার ঘন অরণ্য। পাহাড়, উপত্যকা, মরুভূমি—সব মিলিয়ে চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। কিন্তু জনমানুষের চিহ্নমাত্র নেই।

উড়ে চলতে চলতে বিকেল হয়ে এল। গাছপালার ভিতর দিয়ে একটা নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ চোখে পড়ায় সেখানেই রাতের মত তাঁবু খাটাবার সিদ্ধান্ত নিল। আর তখনই ইঞ্জিনটা থেমে গেল। কাজেই কাছের একটা খোলা মাঠের মধ্যে নেমে মোটরটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে গুন গুন করে একটা গানের সুর ভাঁজতে লাগল। পাশের জঙ্গলেই যে কোন বিপদ ওঁৎ পেতে থাকতে পারে তা সে ভাবতেও পারে নি। বিশ জোড়া বর্বর চোখের দৃষ্টি যে আড়ালে থেকে তার উপর নজর রেখেছে তা সে বুঝবে কেমন করে।

বিমান থেকে কিছুটা দূরে একটা ফুলন্ত ঝোপ দেখতে পেয়ে পুষ্পবিলাসী তরুণ ইংরেজটি সেদিকেই এগিয়ে গেল। একটা সিগারেটে টান দিতে দিতে ফুলগুলোকেই ভাল করে দেখতে লাগল। সে তখন বিমান থেকে শ'খানেক গজ দূরে। ঠিক সেই মুহূর্তে ওয়ামাবো-সর্দার নুমাবো সঙ্গীদের নিয়ে হঠাৎ লাফিয়ে পড়ে তার দিকে ধেয়ে এল।

প্রত্যেকের হাতে বর্শা ও তীর-ধনুক। নিজের কাছে পিস্তল থাকলেও সে বুঝতে পারল যে অচিরেই সে এদের হাতে ধরা পড়বে। তবু সে পিস্তল তুলে গুলি ছুঁড়ল। সকলের সামনে ছিল সর্দার নুমাবো। কিন্তু নিশানায় গলদ থাকায় তাকে পাশ কাটিয়ে গুলি লাগল পিছনের লোকটির বুকে। আর্তনাদ করে লোকটি মুখ থুবড়ে পড়ে যেতেই অন্য সকলে থমকে দাঁড়াল। কিন্তু সর্দারের ধমক খেয়ে তারা ছুটল বিমানটাকে লক্ষ্য করে। ফলে বিমানটা লেফ্‌টেন্যাণ্টের আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। মাঝখানে অসভ্য সৈনিকদের ব্যবধান।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ঘুরে দাঁড়াল। একজন লাফিয়ে উঠে বর্শা ঘোরাতে ঘোরাতে হুংকার দিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সকলেও তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে ইংরেজটিকে লক্ষ্য করে এগোতে লাগল। তার পিস্তলের গুলিতে আরও একজন খতম হল। আর মাত্র পাঁচটা গুলি আছে, অথচ শত্রুর সংখ্যা তখনও আঠারো। পর পর গুলি চালালেও আত্মরক্ষা করা অসম্ভব।

যা সে আশংকা করেছিল তাই ঘটল। অসভ্য লোকগুলি চারদিক থেকে তাকে ঘিরে এগিয়ে আসতে লাগল। একেবারে কাছে এসে বর্শাগুলিকে ঘুরিয়ে ধরে হাতল দিয়ে তাকে সমানে পেটাতে শুরু করল। আঘাতে-আঘাতে জর্জরিত হয়ে সে মাটিতে পড়ে গেল। সকলে তাকে ধরাধরি করে তুলে দুই হাত পিছ-মোড়া করে বেঁধে ঠেলতে ঠেলতে জঙ্গলের দিকে নিয়ে চলল। অসহায় স্মিথ-ওল্‌ডউইক বুঝতে পারল কোন অসভ্য রাজশক্তির খেয়ালখুশির উপরেই নির্ভর করছে তার জীবন-মরণ।

জঙ্গল পার হয়ে একটা খোলা জায়গায় পৌঁছে সে দেখতে পেল, দূরে একটা

কুটিরের ভিতর থেকে এগিয়ে আসছে একদল নিগ্রো। তাদের পরনে জোড়াতালি দেওয়া জার্মান ইউনিফর্ম। প্রথমে অবাক হলেও সে যখন বুঝতে পারল যে জার্মান-সেনাদলের সন্ধানে সে এসেছে এতদিনে তাদেরই একটা অংশের দেখা মিলেছে তখন একটা ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল তার ঠোঁটে।

সেই আধা-ইউনিফর্মধারী কালা আদমিদের মধ্যে একটি গাট্টাগোট্টা লোকের গায়ে ছিল সার্জেন্টের পোশাক। বৃটিশ অফিসারটির উপর চোখ পড়তেই সে সোল্লাসে চীৎকার করে উঠল। অন্য সকলের কণ্ঠে উঠল তার প্রতিধ্বনি।

কালা সার্জেন্ট উসাঙ্গা সর্দার নুমাবোকে জিজ্ঞাসা করল, “এই ইংরেজকে কোথায় পেলে? তার সঙ্গে কি আরও অনেকে আছে?”

সর্দার বলল, “ও তো আকাশ থেকে নেমেছে এমন একটা আজব বস্তুতে চড়ে যা পাখির মত আকাশে ওড়ে। তা দেখে প্রথমে আমরা ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। পরে যখন বুঝলাম ওটা কোন জীবিত প্রাণী নয়, তখন সাহস করে এগিয়ে গেলাম, আর এই লোকটাকে ধরে ফেললাম।”

উসাঙ্গা চোখ বড় বড় করে শুধাল, “ও কি মেঘের ভিতর দিয়ে উড়ে এসেছিল?”

উমাবো বলল, “হ্যাঁ। বস্তুটা দেখতে পাখির মত। এখনও জঙ্গলের ওপারেই পড়ে আছে, অবশ্য যদি এর মধ্যে উড়ে গিয়ে না থাকে।”

উসাঙ্গা বলল, “সে ভয় নেই; এই লোকটা না উঠলে সেটা উড়তে পারবে না। ওকে ধরে এনে খুব ভাল করেছ। এই ইংরেজগুলো খুব খারাপ সাদা আদমি।”

তখন উমাবো ইংরেজ অফিসারটিকে ঠেলতে ঠেলতে গ্রামের একটা কুটিরে ঢুকিয়ে দিয়ে দুজন সাহসী যোদ্ধাকে পাহারায় রেখে দিল।

ঘণ্টাখানেক পরে কালা সার্জেন্ট উসাঙ্গা সেখানে এলে অফিসারটি বলল, “আমাকে নিয়ে ওরা কি করবে? আমার দেশের সঙ্গে তো ওদের যুদ্ধ হচ্ছে না। তুমি ওদের বুঝিয়ে বল, আমি ওদের শত্রু নই; আমি ইংরেজ।”

উসাঙ্গা হেসে বলল, “ওরা ইংরেজ-জার্মান বোঝে না। ওরা জানে, সাদা আদমি মাত্রই শত্রু।”

“তাহলে ওরা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কেন?” লেফ্‌টেন্যান্ট শুধাল।

“এস,” বলে তাকে দরজার কাছে নিয়ে দূরে একটা চাতালের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, “ওই দেখ।”

লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক দেখল, অনেকগুলি নিগ্রো রমণী একটা দণ্ডের চারপাশে জ্বালানী কাঠ সাজিয়ে অনেকগুলি বড় বড় রান্নার পাত্রের নীচে আগুন জ্বালাবার কাজে ব্যস্ত।

তরুণ ইংরেজটি সবই বুঝল। শুধাল, “কী আশ্চর্য, তোমরা কি আমাকে খাবে?”

উসাঙ্গা বলল, "আমরা না; মানুষের মাংস আমরা খাইনা; কিন্তু ওয়ামাবোরা খায়; ওদের ভোজের জন্য আমরা তোমাকে মারব।"

দরজার মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে স্মিথ-ওল্ডউইক আসন্ন অগ্নি-পরীক্ষার কথাই ভাবতে লাগল। উসাঙ্গা ধীরে ধীরে দণ্ডটার দিকে এগিয়ে গেল। এক দঙ্গল নর-নারী সেখানে দাঁড়িয়ে হাসি-ঠাট্টায় মশগুল হয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পরে তারা গ্রামের ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল। লেফ্‌টেন্যান্টের মনের মধ্যে তখন পালিয়ে যাবার নানা ব্যর্থ পরিকল্পনার আনাগোনা।

গ্রাম থেকে কয়েকমাইল উত্তরে ঘাস ও গাছগাছালিতে ঢাকা একটা উঁচু ঢিবির উপরে একটি পুরুষ ও একটি নারী একত্রে একটা খড়ের বাড়ি বানাবার কাজে ব্যস্ত। প্রায় নিঃশব্দে তারা কাজ করছে; মাঝে মাঝে যৎসামান্য কাজের কথাই কেবল বলছে।

একটিমাত্র কটি-বস্ত্র ছাড়া পুরুষটি নগ্নদেহ। রোদে-জলে তার গায়ের চামড়ায় বাদামী রং ধরেছে। তার চলা-ফেরায় বন-বেড়ালের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য; সে যখন কোন ভারী বোঝা তোলে তখন মনে হয় বুঝি শূন্য হাতটাই তুলছে।

কদাচিৎ সে মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছে। মেয়েটি কিন্তু তাকেই ফিরে ফিরে দেখছে। সে যেন একটি প্রহেলিকা। এমনিতেই তো মধ্য আফ্রিকার এক অনাবিষ্কৃত অরণ্যে এরকম একটি অসভ্য বর্বর মানুষের সঙ্গে বাস করাটাই যথেষ্ট বিপদসংকুল; তার উপর এই লোকটি অতিমাত্রায় তাদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন। কী এক ব্যক্তিগত বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে তার বুকে। লোকটি তাকে ঘৃণা করে, অথচ বার বার তাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছে। উইল্‌হেল্‌ম্‌স্টালে সেই রাতে সে যখন হাউট্‌ম্যান ফ্রিজ স্নাইডারকে হত্যা করেছিল তখনও তার উপর কোন অত্যাচার না করে স্বেচ্ছায় সেখান থেকে চলে গিয়েছিল। কালা সার্জেন্ট উসাঙ্গা তাকে জঙ্গল থেকে বন্দিনী করে আনার পরে সেখান থেকে পালিয়ে গেলে বনের মধ্যে গোরিলারা যখন তাকে ছিঁড়ে খেতে উদ্যত হয়েছিল তখনও এই মানুষটিই তাকে উদ্ধার করেছিল তাদের কবল থেকে। কিন্তু কেন? নিষ্ঠুর এই জঙ্গল-রাজ্যের অন্য অধিবাসীদের হাত থেকে সে তাকে বার বার রক্ষা করছে কোন্ হীন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য?

ফ্রলিন বার্থা কির্‌চার স্বভাবতই স্ফূর্তিবাজ ও সঙ্গীপ্রিয়। শুধু শুধু মন খারাপ করে চুপচাপ বসে থাকার মেয়ে সে নয়। একটু একটু করে টারজন সম্পর্কে তার ভয় কেটে যেতে লাগল।

একদিন কাজ করতে করতে সে জানতে চাইল, কুটির ও চারদিকে বেড়া তৈরী শেষ হলে সে কি করবে। টারজন জবাব দিল, "পশ্চিম উপকূলের দিকে চলে যাব। সেখানেই আমি জন্মেছিলাম। অবশ্য কবে যাব তা জানি না।

যাবার আগে তোমার সব বিধি-ব্যবস্থা করে দিতে হবে তো। তাতে সময় লাগবে।"

মেয়েটি চেঁচিয়ে বলল, "তুমি আমাকে একলা ফেলে যাবে?"

টারজন বলল, "কেন যাব না? আমি তো তোমাকে এখানে আনি নি। তোমার জাতের কোন লোক কি একটি শত্রুপক্ষের মেয়ের জন্য এর বেশী কিছু করত?"

"নিশ্চয় করত। আমার জাতের কোন পুরুষ একটি অসহায় সাদা নারীকে এমন ভয়ংকর জায়গায় একলা ফেলে রেখে যেত না।"

টারজন দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিল। কোন কথা বলল না।

একদিন। টারজন শিকারে বেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। চুপচাপ বসে থেকে এক সময় উঠে দাঁড়াল বার্থা কির্চার। নদী থেকে জল আনবার জন্য লাউ দুটো হাতে নিয়ে কুটির থেকে বেরিয়ে গেল।

লাউতে জল ভরতে ভরতে নিজের দুর্ভাগ্যের কথাই সে ভাবছিল। আজ হোক কাল হোক টারজন তাকে ফেলে রেখে চলে যাবেই। এই ভয়ংকর জঙ্গলে অসভ্য মানুষ আর হিংস্র পশুর মাঝখানে একাকি বেঁচে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। আসন্ন মৃত্যুই তার একমাত্র পরিণাম।

নিজের দুশ্চিন্তায় সে এতই ডুবে গিয়েছিল যে তার চোখ-কান কোনটাই খোলা ছিল না। জল ভরে কুটিরের দিকে পা বাড়াতেই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটি অর্ধস্ফুট চীৎকার। পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে একটি ভয়ংকর প্রাণী। তার সম্মুখে গোরিলারাজ গো-লাট। দুটি নিষ্ঠুর রক্তলাল চোখ, চওড়া নাক, প্রকাণ্ড হাঁ, আর ঝুলন্ত হাতের বড় বড় থাবা।

কির্চার আতংকে চীৎকার করে উঠল। গো-লাটের মুখের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল গর্-গর্ আওয়াজ।

কুটির থেকেই টারজন শুনতে পেল নারী-কণ্ঠের চীৎকার। একলাফে বেড়াটা ডিঙিয়ে সে মেয়েটির দিকে ছুটে গেল। কির্চার সবিস্ময়ে শুনল, তার গলার ভিতর থেকেও বেরিয়ে এল গো-লাটের মতই গর্-গর্ আওয়াজ।

গো-লাট টারজনকে বলল, "তোমার মেয়েমানুষের কোন ক্ষতি আমি করব না।"

টারজন বলল, "আমি তা জানি, কিন্তু ও তো জানে না! তাই ভয় পেয়েছে।"

বার্থা কির্চারের পাশে গিয়ে টারজন বলল, "ও তোমার ক্ষতি করবে না। ভয় পেয়ো না। টারজনের মানুষের কোন ক্ষতি ও করবে না।"

মেয়েটি বলল, "তবু আমার ভয় করে। এ রকম ভয়ংকর জীব আমি আগে দেখি নি।"

টারজন হেসে বলল, "গো-লাটও তোমার সম্পর্কে ওই এক কথাই ভাবে।" গো-লাটের দিকে ফিরে বলল, "টারজন নিজের জন্য ও তার মেয়েমানুষের জন্য শিকারে যাচ্ছে। ও এখানেই থাকবে। দেখো, তোমার দলের কেউ যেন ওর কোন ক্ষতি না করে।"

গোরিলা মাথা নেড়ে বলল, "না, আমরা ওর ক্ষতি করব না।"

বার্থা কিরচারকে সঙ্গে নিয়ে টারজন কুটিরের দিকে উঠে গেল। বেড়ার কাছে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়ল। বার্থা ভিতরে ঢুকলে গাছপালা দিয়ে বেড়ার ফাঁকটা আটকে দিয়ে টারজন নীচে নেমে গেল। বার্থা কিরচার একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। অরণ্যপ্রান্তে পৌঁছে এক ঝুলে একটা গাছে উঠে টারজন অদৃশ্য হয়ে গেলে মেয়েটি ধীরে ধীরে কুটিরে ঢুকে মাটিতে শুয়ে পড়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

৮—অসভ্যদের খপ্পরে

জঙ্গলের ফাঁক-ফোকর সম্পর্কে অরণ্যরাজ টারজনের জ্ঞান প্রায় অলৌকিকতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়। তবু তার সব বিচার-বিবেচনা নির্ভুল হতে পারে না। গাছের বেশ মোটা ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতেই সে চলছিল। এক সময়ে যে ডালটা ধরে সে ঝুল দিল সেটাও বেশ মজবুত ও তাজা। সে কেমন করে জানবে যে বাকলের নীচে সে ডালটাকে পোকায় কেটে একেবারে ঝাঁঝরা করে রেখেছে।

তার দেহের ভারে হঠাৎ ডালটা সশব্দে ভেঙে পড়ল। নীচে কোন মোটা ডাল ছিল না যে ঝাপ্‌টে ধরবে। নীচে পড়তে পড়তে একটা লতার ফাঁসে পা আটকে গিয়ে সে হেট-মুণ্ড ঊর্দ্ধ-পদ হয়ে সপাটে ছিটকে পড়ল গ্রামের পথটার একেবারে মাঝখানে। ডাল ভাঙার মড়্‌-মড়্‌ শব্দে ও পড়ন্ত দেহের ছর্‌-ছরাৎ আওয়াজে চমকে উঠে গ্রামবাসীরা অস্ত্রশস্ত্র আনতে যার যার ঘরে ঢুকে গেল। ফিরে এসে দেখল, একটি প্রায় নগ্নদেহ সাদা মানুষ গাছ থেকে যেখানে পড়েছিল সেখানেই চুপচাপ পড়ে আছে। লোকটা নড়াচড়া করছে না দেখে সাহসে ভর করে সকলে এগিয়ে গেল। একজন তো বর্শা উঁচিয়ে ধরল তার বুক লক্ষ্য করে। সর্দার নুমাবো'বাধা দিয়ে বলল, "ওকে বেঁধে ফেল। আজ রাতে ভোজটা জমবে ভাল।"

শক্ত করে টারজনের হাত-পা বেঁধে তাকে নিয়ে হাজির করল সেই কুটিরে যেখানে লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক আসন্ন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে আছে। তারও হাত-পা বাঁধা।

ধীরে ধীরে টারজনের জ্ঞান ফিরে এল। চোখ মেলে তাকাল। অনেক

কষ্টে পাশ ফিরে উঠে বসল। সামনেই ইংরেজ যুবকটিকে পিছ-মোড়া করে বাঁধা অবস্থায় দেখে ম্লান হেসে বলল, "দেখছি আজ রাতে ওরা পেট ভরে খাবে।"

যুবকটি বলল, "তুমি কেমন করে ধরা পড়লে?"

টারজন আক্ষেপের সুরে বলল, "নিজের দোষে। আরে ভাই, ডালটা যে পোকায় খাওয়া তা কেমন করে জানব।"

যুবক বলল, "পালাবার কোন পথ কি নেই?"

টারজন বলল, "আগেও আমি এদের খপ্পর থেকে পালিয়েছি। অন্যকেও পালাতে দেখেছি। একজনকে তো দেখেছি ডজনখানেক বর্শায় বিদ্ধ হবার পরে পায়ের নীচে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তারপর দণ্ড থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

যুবক হতাশ হয়ে বলে উঠল, "হা ঈশ্বর! এমন বাঁচার চাইতে মৃত্যুই ভাল।"

টারজন হেসে বলল, "মরতে তোমার এত ভয় কেন? একদিন তো মরতে হবেই। আজ রাতে হোক, কাল রাতে হোক, আর এক বছর পর হোক—তাতে তফাৎটা কি হবে?"

যুবক বলল, "এ সব দার্শনিক কথাবার্তা শুনতেই ভাল গো দাদা, কিন্তু আমার ওতে সায় নেই। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। দেখাই যাক।"

অরণ্যরাজ টারজন ও লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইককে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে পাশাপাশি দুটো দণ্ডের সঙ্গে। ইংরেজ যুবকটি মুখ ঘুরিয়ে সঙ্গীর দিকে তাকাল। টারজন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে ভয় বা ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। পরিপূর্ণ উদাসিনতা।

যুবক লেফ্‌টেন্যান্ট ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "বিদায় গো দাদা।"

টারজনও মুখ ফিরিয়ে হেসে বলল, "বিদায়। যদি তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাও তো যত দ্রুত পারো প্রশ্বাসের সঙ্গে ধোঁয়া ও আগুন টেনে নিও।"

যুবক বলল, "ধন্যবাদ।"

চারদিক থেকে তাদের দুজনকে ঘিরে যোদ্ধারা গোল হয়ে এগিয়ে আসতে লাগল। কাছে—আরও কাছে। নুমাবোর তীক্ষ্ণ বর্শা-ফলকেই হবে প্রথম রক্তপাত। তারপরই শুরু হবে আঘাতের পর আঘাত। সবশেষে পায়ের নীচে দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠবে আগুন।

নুমাবোর হাতের বর্শা টারজনের বুক স্পর্শ করল। ফিন্‌কি দিয়ে রক্তের ছোট ধারা গড়িয়ে পড়ল তার বাদামী বুক বেয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই কৌতূহলী দর্শকদের পিছন দিক থেকে ভেসে এল নারী-কণ্ঠের আর্ত চীৎকার আর বহুকণ্ঠের বীভৎস হুংকার ও গর্জন। গোলমালটা কিসের তা দুজনের কেউই দেখতে পেল না। কিন্তু কিছু না দেখেই কেবল শব্দ শুনেই টারজন বুঝতে পারল ওটা

কাদের গর্জন ও হুংকার। কিন্তু সে ভেবেই পেল না কেমনকরে গোরিলারা এখানে এল, আর তাদের এই আক্রমণের উদ্দেশ্যই বা কি। ওরা যে তাকেই উদ্ধার করতে এসেছে তা সে ভাবতেই পারল না।

ততক্ষণে ঘটনাস্থল ছেড়ে নুমাবো তার যোদ্ধার দল নিয়ে ভিড়ের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল বাইরে। কী অশ্চর্য! যে সাদা মেয়েটি দিন কয়েক আগে তাদের কবল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল সেই যে এগিয়ে আসছে সকলের আগে, আর তার পিছনে পিছনে আসছে একদল ক্রুদ্ধ লোমশ বন-মানুষ।

যুবক গোরিলা জু-টাগ প্রচণ্ড দুই থাবায় আছাড় মেরে, থাবড়ে, কামড়ে সমবেত জনতাকে ছিন্নভিন্ন করে এগিয়ে এল। পিছন পিছন ধেয়ে এল তার কদাকার দলবল। টারজন সবিস্ময়ে দেখল, তাদের চালিয়ে এনেছে বার্থা কির্চার।

সে চীৎকার করে বলল, "জু-টাগ, আগে সর্দারের দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড। কির্চারকে বলল, "তুমি আমার বাঁধন খুলে দাও। তাড়াতাড়ি।"

বার্থা কির্চারের চেষ্টায় নিজেকে মুক্ত করে টারজন বলল, "এবার এই ইংরেজের বাঁধন খুলে দাও।" সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে গেল জু-টাগের পাশে। নুমাবো ও তার দলের সঙ্গে তখন গোরিলা দলের তুমুল যুদ্ধ চলেছে। ততক্ষণে তিনটে গোরিলা বর্শার আঘাতে হয় নিহত নয়তো মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে টারজন বুঝতে পারল, এতগুলি অস্ত্রধারী নিগ্রোর সঙ্গে লড়াইতে অল্পসংখ্যক গোলিরাকে নিয়ে তারা কিছুতেই শেষ পর্যন্ত জিততে পারবে না। যেমন করে হোক একটা কোন কৌশলের আশ্রয় নিতেই হবে। হঠাৎ এমন কতকগুলি অস্ত্রের উপর তার চোখ পড়ল যার সাহায্যে তার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে বলে তার নিশ্চিত ধারণা হল। আগুনের উপর অনেকগুলো পাত্রে জল ফোটানো হচ্ছিল। বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে টারজন তারই একটা পাত্র তুলে এনে নিগ্রো যোদ্ধাদের মুখে ছড়িয়ে দিল। যন্ত্রণায় ও আতংকে চীৎকার করতে করতে তারা পিছনে হটে গেল। সে পাত্রটা শেষ করে টারজন দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাত্র ফুটন্ত জল তাদের উপর ঢেলে দিল। আর্তনাদ করতে করতে নিগ্রোরা পালিয়ে গিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। নুমাবো অনেক চেষ্টা করেও তাদের ফেরাতে পারল না।

ততক্ষণে মেয়েটি ইংরেজ বৈমানিককে মুক্ত করে দিয়েছে। নিগ্রোদের পরিত্যক্ত বর্শা হাতে নিয়ে এবার তিন ইওরোপীয় মানুষ ও দু'টি অবশিষ্ট গোরিলা গ্রামের ফটক পার হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

টারজন সম্পূর্ণ নির্বাক। তার পাশেই চলেছে গোরিলা জু-টাগ। পিছনে বাকি গোরিলারা। সকলের শেষে ফ্রলিন বার্থা কির্চার ও লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক।

সারা জীবনে অরণ্যরাজ টারজন কখনও কারও কাছে ঋণী হয় নি। নিজের পেশীবহুল দেহ, সদাজাগ্রত পঞ্চ-ইন্দ্রিয় ও ঈশ্বরদত্ত বুদ্ধির জোরেই সে এতকাল অরণ্য-জগতে বিচরণ করে এসেছে। আজ রাতেই সব চাইতে বড় ঋণের বোঝা চেপেছে তার মাথায়—অন্য একজন আজ তার জীবন রক্ষা করেছে—আর সে এমন একজন যাকে সে সকলের চাইতে বেশী ঘৃণা করে।

৯—বিমান আবিষ্কার

হরিণ শিকার করে কাঁধে ঝুলিয়ে গাছের ডালে ডালে ফিরছিল টারজন। হঠাৎ থেমে নীচের বেড়া-ঘেরা কুটিরের দিকে এগিয়ে-চলা দুটি মনুষ্যমূর্তির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

এলোমেলো চুলেভর্তি মাথাটা নেড়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। কাতর চোখ মেলে তাকাল পশ্চিমের দিকে। মুহূর্তের মধ্যে মনটা চলে গেল অনেক দূরে হ্রদের ধারে একটা কাঠের ঘরে। সেটাই তার শৈশবের বাসভূমি; তার মৃত বাবার কাঠের বাড়ি; শৈশবের অনেক সুখ-স্মৃতি বিজড়িত। সঙ্গিনীটিকে হারাবার পর থেকেই তার মনে ইচ্ছা জেগেছে আবার ফিরে যাবে সেই অনাবিষ্কৃত নিস্তব্ধ অরণ্য-জীবনে যেখানে কেটেছে তার যৌবনের দিনগুলি। মনে আশা, সেখানে ফিরে গেলেই সে ফিরে পাবে হারানো দিনগুলিকে, ভুলে যেতে পারবে সব দুঃখ-জ্বালা।

কিন্তু বিস্তীর্ণ হ্রদের তীরে সেই কাঠের বাড়ি যে অনেক অনেক পথ দূরে। এদিকে তার মাথায় যে কর্তব্যের এক ভারী বোঝা—অগ্রসরমান দুটি মানুষের প্রতি এক অনস্বীকার্য কর্তব্য। তাদের একজন যুবক—পরনে বৃটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর শতছিন্ন ইউনিফর্ম; অপরজন যুবতী—পরনে একদা পরিচ্ছন্ন অশ্বারোহণ-পোশাকের এক শোচনীয় সংস্করণ।

ভাগ্যের খেয়ালে তিনটি ভিন্ন চরিত্রের মানুষ এক সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। একজন প্রায় নগ্নদেহ বর্বর, একজন ইংরেজ অফিসার, অপর জন এক ঘৃণিত জার্মান গুপ্তচর। এই দুটি প্রাণীকে পূর্ব উপকূল পর্যন্ত পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের হাত থেকে টারজনের মুক্তি নেই। কিন্তু তা করতে হলে তাকে যে নিজের স্বপ্নের দেশ থেকে অনেক অনেক দূরে সরে যেতে হবে। অথচ না গিয়েও তো উপায় নেই। এই দুটি যুবক-যুবতী তার সাহায্য ছাড়া এত দূরের অজ্ঞাত পথ কিছুতেই পার হতে পারবে না।

হঠাৎ গাছের পাতার খস্-খস্ শব্দ শুনে টারজন বুঝতে পারল কাছেই কোথাও ওৎ পেতে আছে চিতাবাঘ শীতা। দু'বার নাক টেনে গন্ধ নিয়েই সে বুঝল, নদী থেকে কুটিরের দিকে এগিয়ে যাবার পথেই শীতা অপেক্ষা করছে।

যুবক-যুবতী দুটি কুটিরের অর্ধেক পথ যেতেই টারজন তাদের থামতে বলল। তারা বিস্মিত হয়ে এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখতে পেল, আস্তে একটা গাছ থেকে নেমে টারজন তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

টারজন বলল, “ধীরে ধীরে আমার দিকে চলে এস। দৌড়লেই শীতা আক্রমণ করবে।”

ইংরেজ যুবক বলল, “কি বলছ তুমি? শীতা কে?”

মুহূর্তের মধ্যে টারজন কাঁধ থেকে হরিণটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এক-লাফে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। তার স্থির দৃষ্টি তাদের পিছন দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে দু'জন দেখতে পেল, একটা শয়তান-মুখো চিতাবাঘ তাদের উপর লাফিয়ে পড়ার উদ্যোগ করছে। বিদ্যুৎগতিতে তাদের দুজনকে পাশ কাটিয়ে টারজন লাফিয়ে পড়ল চিতাটার উপর। বাঁ হাতটা দিয়ে চিতার বাঁ কাঁধটা চেপে ধরে ডান হাতটা তার সামনের ডান পায়ের নীচ দিয়ে বাড়িয়ে দিয়ে চিতাটাকে সবলে জড়িয়ে ধরল। তারপর মানুষ ও পশুতে একাকার হয়ে ঘাসের উপর জড়াজড়ি করতে লাগল। মানুষ ও পশু দুয়ের মুখ থেকেই বের হচ্ছে একই ধরনের ফ্যাস-ফাঁস্ ও গর-র্—গর-র্ আওয়াজ।

প্রাথমিক আতংক কাটিয়ে উঠে মেয়েটি ইংরেজ যুবকের হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, “আমাদের কি কিছুই করবার নেই? জন্তুটা ওকে মেরে ফেলার আগেই কি আমরা ওকে সাহায্য করতে পারি না?”

চিতাটাকে আঘাত করবার মত একটা কিছুর খোঁজে যুবকটি চারিদিকে তাকাতে লাগল।

“তুমি এখানেই দাঁড়াও। ওর যে বর্শাটা আমার কাছে আছে সেটা নিয়ে আসছি।” বলেই মেয়েটি কুটিরের দিকে ছুটে গেল। ছোট বর্শাটা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে এসে নিজেই সুযোগ খুঁজতে লাগল কখন চিতাটাকে আক্রমণ করবে। দু'জন এমনভাবে উল্টোপাল্টি খাচ্ছে যে বার্থা কিরচার কিছুতেই বর্শাটা চালাতে পারছে না। কেন কে জানে জানোয়ারটা মুহূর্তের জন্য একটু থেমে যেতেই বার্থা কিরচারের হাতের বর্শার সুতীক্ষ্ণ ফলাটা আমূল বিঁধে গেল শীতার বুকের এক পাশে।

টারজন মৃত শীতার বুকের উপর পা রেখে উঠে দাঁড়িয়ে একটা হুংকার ছাড়ল। তারপর রহস্যময় দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটির মুখের দিকে। এই দ্বিতীয়বার তার কাছে টারজান ঋণী হল। অথচ একটা জার্মান গুপ্তচর মেয়ের কাছে ঋণী হতে সে চায় না।

শিকার নিয়ে তিনজন কুটিরে ফিরে গেল। টারজন হরিণটাকে কেটে টুকরো টুকরো করে কিছুটা নিজের জন্য রেখে বাকিটা দুজনকে দিয়ে বলল, “তোমরা তো আবার রান্না না করে খেতে পার না। টারজনের ওসব বালাই নেই।”

যুবকটি আগুন জালিয়ে দিল। যুবতীটি মাংস রান্নার কাজে মন দিল।

একটু দূরে বসে স্মিথ-ওল্ডউইক টারজনকে বলল, "আশ্চর্য মেয়ে। কি বল ?"

টারজন উত্তর দিল, "ও জার্মান এবং গুপ্তচর।"

"কি বলছ তুমি ?"

"ঠিকই বলছি। মেয়েটা জার্মান গুপ্তচর।"

"আমি বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস করো না ? তোমার বিশ্বাসে আমার কি যায়-আসে। আমি ভাল করেই জানি সে জার্মান গুপ্তচর। তবু সে একটি নারী, তাই আমি তাকে শেষ করে দিতে পারি নি।"

তরুণ লেফ্‌টেন্যাণ্টটি বলে উঠল, "হা ঈশ্বর। আমি যে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। মেয়েটি এত মিষ্টি, এত সাহসী, আর এত ভাল।"

টারজন দুই কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "মেয়েটি সাহসী সে কথা ঠিক। কিন্তু শীতাও তো সাহসী। আমি তাকে ঘৃণা করি। তোমারও উচিত তাকে ঘৃণা করা।"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক দুই হাতে মুখ ঢাকল। পরে বলল, "ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করুন। আমি ওকে ঘৃণা করতে পারব না।"

তীব্র ঘৃণার চোখে তার দিকে তাকিয়ে টারজন উঠে দাঁড়াল। বলল, "টারজন আবার শিকারে যাচ্ছে। যে মাংস আছে তাতে তোমাদের দু'দিন চলে যাবে। ততক্ষণে সে ফিরে আসবে।"

দু'জন একদৃষ্টিতে তার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। একলাফে একটা গাছের ডাল ধরে সে ডালপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুটিরে বসে দু'জন তাদের ভবিষ্যৎ কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগল।

স্মিথ-ওল্ডউইক বলল, "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা সাদা মানুষদের বস্তির সন্ধানে আমাদের বেরিয়ে পড়া উচিত।"

বার্থা কির্‌চার বলল, "কিন্তু সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তো যেতে পারি না। সে আমাদের জন্য অনেক করেছে। তাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে তার কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে আমরা চলে যেতে পারি না।"

"কিন্তু চলে যেতেই হবে," যুবকটি জোর দিয়ে বলল, "সে চায় না যে আমরা এখানে থাকি। বিশেষ করে তুমি।"

চমকে উঠে মেয়েটি বলল, "কি বলছ তুমি ?"

যুবকটি ইতস্তত করে বলল, "কথাটা তোমাকে বলতে চাই নি। আমাকে বিশ্বাস কর, তুমি এখানে থাক এটা সে চায় না।"

মেয়েটি বলল, "আমাকে বল সে কি বলেছে। সব কথা জানবার অধিকার আমার আছে।"

মেয়েটির চোখে চোখ রেখে স্মিথ-ওল্ডউইক বলল, "সে বলেছে তোমাকে ঘৃণা করে। তুমি একটি নারী বলেই কেবল কর্তব্যবোধে সে তোমাকে সাহায্য করছে।"

মেয়েটির মুখ ম্লান হয়ে গেল। পরক্ষণেই হয়ে উঠল রক্তিম। দৃঢ় গলায় বলল, "এই মুহূর্তেই আমি যাবার জন্য প্রস্তুত। কিছুটা মাংস সঙ্গে নিতে হবে। আবার কতদিনে জুটবে কে জানে।"

নদীর ভাটির পথে তারা দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল। যুবকটি হাতে নিল টারজনের ছোট বর্শাটা। মেয়েটির হাতে একটা লাঠিমাত্র। বার্থার কথামত যাবার আগে যুবকটি একটা চিরকুটে টারজনকে ধন্যবাদ ও বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে সেটাকে কুটিরের দেয়ালে সেঁটে দিল।

*

স্মিথ-ওল্ডউইককে মুমাবোর গ্রামে নিয়ে যাবার পরেই উসাঙ্গা বেরিয়ে পড়েছিল তার বিমানটার খোঁজে—কিছুটা কৌতূহলবশতঃ কিছুটা সেটাকে নষ্ট করে ফেলার বাসনায়। কিন্তু সেটাকে খুঁজে পাবার পরে তার মনোভাব পাল্টে গেল। সেটাকে কাজে লাগাবার ধান্দা ঢুকল তার মাথায়। প্রথম প্রথম সে ভয়ে ভয়ে যন্ত্রটার কাছে যেত। ক্রমে ভয় ভেঙে গেল। বিমানটির এটা-ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে একদিন তার মনে বাসনা জাগল—আহা, সে যদি যন্ত্রটাকে চালাতে পারত! গাছের মাথার অনেক উপর দিয়ে যদি পাখির মত উড়তে পারত! সঙ্গী-সাথীরা তাহলে কী ভয়-ভক্তিতেই না তার দিকে চেয়ে থাকত! তাদের চোখে সে তো হয়ে উঠত এক দেবতা!

কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বিমানটাকে চালাতে পারল না। অবশ্য আশা ছাড়ল না। তখন ভাবল, সাদা চালকটি যখন মুমাবোর গ্রাম থেকে পালিয়েছে তখন একদিন না একদিন সে তার বিমানের খোঁজে আসবেই, আর এলেই উসাঙ্গার হাতে ধরা পড়বে। তখন তার কাছ থেকেই সে বিমানে ওড়ার কৌশলটা জেনে নিতে পারবে। সেই আশায়ই সে যখন-তখন এসে বিমানটির চারদিকে ঘুর-ঘুর করে।

অবশেষে তার প্রতীক্ষার অবসান হল। এতদিনে বুঝি তার আশা সফল হবে। উত্তর দিক থেকে মানুষের স্বর ভেসে আসতেই উসাঙ্গা দলবল নিয়ে ঘন গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। দেখা দিল বহু প্রত্যাশিত বৃটিশ অফিসারটি। সঙ্গে সেই সাদা মেয়েটি। অনেক দিন থেকেই কালা সার্জেণ্টের নজর আছে তার দিকে।

দুই যুবক-যুবতী জঙ্গল পেরিয়ে একটা খোলা জায়গায় পড়তেই তাদের চোখের সামনে দেখা দিল বহু-বাঞ্ছিত যন্ত্রটি।

গভীর স্বস্তি ও আনন্দের উচ্ছ্বাস বেরিয়ে এল তাদের মুখ থেকে। আর

ঠিক সেই মুহূর্তেই উসাঙ্গা তার নিগ্রো যোদ্ধাদের নিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে তাদের দুজনকে ঘিরে ফেলল।

১০—কালো সওয়ার

মেয়েটি আতংকে ও হতাশায় একেবারে ভেঙে পড়ল। নিরাপত্তার এত কাছে এসে দুর্ভাগ্যের ঝড়ে এভাবে তরী ডুববে এটা তার কাছে অসহ্য। যুবকটিও হতাশ হয়েছে। কিন্তু হতাশার চাইতে তার রাগ হয়েছে বেশী। কালা আদমিদের গায়ে শতচ্ছিন্ন ইউনিফর্ম দেখে সে জানতে চাইল তাদের অফিসাররা কোথায়।

“ওরা তোমার ভাষা বুঝতেই পারবে না,” বলে মেয়েটি জার্মান ও স্থানীয় ভাষার একটা জগাখিচুড়ির সাহায্যে সে প্রশ্নটা তাদের কাছে রাখল।

মুখ বেঁকিয়ে উসাঙ্গা বলল, “সাদা মেয়ে, তুমি তো ভালই জান তারা কোথায়। সবাই মরেছে, আর এই সাদা মানুষটা যদি আমার কথামত কাজ না করে তাহলে সেও মরবে।”

“তুমি তাকে কি কাজ করতে বল?” বার্থা কির্চার জানতে চাইল।

উসাঙ্গা বলল, “কি করে পাখির মত ওড়া যায় সেটা আমাকে শেখাতে হবে।”

বার্থা কির্চার সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে লেফ্‌টেন্যান্টকে কথাটা বলল।

ইংরেজ যুবক মুহূর্তকাল চিন্তা করে বলল, “সে উড়তে চায়, এই তো? তাকে বল, উড়তে শেখালে সে আমাদের মুক্তি দেবে কি না।”

উসাঙ্গা মহাধূর্ত। কথা দিতে যেমন উদার, সে-কথার খেলাপ করতেও ততোধিক উদার। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, “সাদা লোকটা আমাকে উড়তে শেখাক, আমি তোমাদের সাদা মানুষদের একটা উপনিবেশের কাছাকাছি পৌঁছে দেব। কিন্তু বিনিময়ে ওই বড় পাখিটাকে আমি রেখে দেব,”—সে বিমানটার দিকে কালো হাত বাড়াল।

নিরুপায় হয়ে স্মিথ-ওল্ডউইক উসাঙ্গার প্রস্তাবে রাজী হল। বলল, “ঠিক আছে বড়ো দাদা, তোমাকে জন্মের মত শিক্ষা দিয়ে দেব।”

যুবকটি বার্থা কির্চারকে বলল, “ওকে বুঝিয়ে বল যাতে তোমাকেও আমাদের সঙ্গে বিমানে উঠতে দেয়। এই শয়তানদের মধ্যে তোমাকে রেখে যেতে আমার মন সরছে না।”

সে কথা জানাতেই উসাঙ্গার মনে সন্দেহ দেখা দিল। ভাবল, এরা নিশ্চয়ই ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে পূর্বতন জার্মান প্রভুদের হাতে ধরিয়ে দেবার মতলব করছে। তাই এ প্রস্তাবে সে আপত্তি করল।

"না, সাদা মেয়েটি এখানেই আমার লোকদের কাছে থাকবে।" তুমি আমাকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনলে তারা ওর কোন ক্ষতি করবে না।

অগত্যা সেই প্রস্তাবই মানতে হল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল উসাঙ্গার বিমান-চালনার প্রথম পাঠ। দু'জন আকাশে উড়ল।

স্মিথ-ওল্ডউইক বিমানে উঠে নানা রকম কৌশল দেখাতে লাগল। কখনও উপরে উঠে যায়; কখনও বা শাঁ করে নীচে নেমে আসে। উসাঙ্গা প্রথম প্রথম খুব ভয় পেলেও ক্রমেই বিমান বিহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠল।

দিনের পর দিন যায়। উসাঙ্গা একটু একটু করে বিমান চালানোর বিদ্যা আয়ত্ত করে। ক্রমে তার ধারণা হল যে সে একাই বিমান চালাতে পারবে। বৃটিশ বৈমানিককে আর দরকার হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা চিন্তা উসাঙ্গার মাথায় ঝিলিক দিয়ে উঠল। একবার যদি সে নিজে নিজে উড়তে পারে তাহলে আর তাকে পায় কে। সে সোজা উড়ে যাবে পাশের রাজ্যে। সেখানকার রাজা তাকে যন্ত্রটা থেকে নামতে দেখেই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাব কাছে আত্মসমর্পণ করবে। সেখানে সে রাজা হয়ে সিংহাসনে বসবে। পাশে থাকবে তার চব্বিশটি বৌ-রাণীর সাজে সেজে। আর সকলের মধ্যমণি হয়ে পাটরাণী সেজে বসবে নবাগতা শ্বেতাঙ্গিনী।

আহ্লাদে উসাঙ্গা একেবাবে আত্মহারা। ফন্দি-ফিকির তৈরী করতেও বিলম্ব হল না। কালা যোদ্ধাদের যথাযথ নির্দেশাদি দিয়ে পরদিনই সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল।

সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু কালা যোদ্ধা এসে স্মিথ-ওল্ডউইককে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল। সেই অবস্থায়ই সে দেখতে পেল, কিছু দূরে বার্থা কিরচারও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় উসাঙ্গার পাশে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ডভাবে মাথা নেড়ে কি যেন অস্বীকার করছে।

যুবকটি চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "ও কি বলছে?"

মেয়েটি উত্তর দিল, "ও আমাকে বিমানে চড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।"

"কোথায়? কেন?"

"ও বলছে, আমাকে অন্য একটা দেশে নিয়ে যাবে, সেখানে ও হবে রাজা, আর আমাকে করবে রাণী। তবে চিন্তার কিছু নেই, কারণ বিমান ওড়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমাদের দুজনের ভবলীলাই সাঙ্গ হবে।"

পরক্ষণেই উসাঙ্গার দিকে ফিরে বার্থা কিরচাব মিষ্টি হেসে বলল, "আমার একটা কথা তুমি রাখবে বল।"

"কি কথা?" উসাঙ্গা জানতে চাইল।

"তোমার লোকদের বল, আমরা আকাশে উড়বার পরেই তারা যেন আমার এই সঙ্গীটিকে মুক্ত করে দেয়। এটা আমার অনুরোধ। এ অনুরোধ যদি রাখ

তাহলে আমি স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে যেতে রাজী।"

উসাঙ্গা হুংকার দিয়ে উঠল। "স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, আমার সঙ্গে তোমাকে যেতেই হবে। আমি এবার মস্ত বড় রাজা হব। আমার সব হুকুম মানতে তুমি বাধ্য।"

বার্থা কির্চার বুঝল, এই জানোয়ারটার কাছে অনুনয়-বিনয় করা বৃথা। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের জন্য নয়, বেচারি স্মিথ-ওল্ডউইকের জন্য সত্যি তার দুঃখ হচ্ছে।

উসাঙ্গার হুকুমে কালা আদমিরা মেয়েটিকে বিমানে তুলে দিল। সেখানে তার হাতের বেড়ি খুলে দিয়ে আসনে বসিয়ে উসাঙ্গা তাকে পেটি দিয়ে ভাল করে বেঁধে দিল। তারপর নিজে বসল সামনের আসনে।

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে তাকাল ইংরেজ যুবকটির দিকে। চেঁচিয়ে বলল, "বিদায়!"

যুবকটি ভারী গলায় বলল, "বিদায়! ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। হ্যাঁ, যে কথাটা বলতে চেয়েও বলতে পারি নি, সেটা এখন বলা যায়: এই কি আমাদের পরিণতি?"

মেয়েটির ঠোঁট নড়ল, কিন্তু সে হাঁ বলল কি না বলল তা বোঝা গেল না। প্রপেলারের শব্দে তার গলা চাপা পড়ে গেল।

উসাঙ্গা বোধহয় বিমান-চালানোটা ভালই শিখেছে। একটা ধাক্কা খেয়ে বিমানটা মাটি ছাড়ল। বেশ ভাল ভাবেই উঠে গেল। লেফটেন্যাণ্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক ভাবল, ঘটনাক্রমে শুরুটা ভাল হয়েছে, হয়তো লোকটা গাছের উপরে উঠে ভালভাবেই উড়ে যাবে, কিন্তু যখনই বিমানটাকে নামাবার চেষ্টা করবে তখনই তার নিজের ও সুন্দরী সঙ্গিনীটির জীবনও শেষ হবে।

কিন্তু ওটা কি হল? তার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল।

১১—উসাঙ্গার পুরস্কার

দু'দিন ধরে শিকার করে টারজন ফিরে এল।

কুটির ও তার চারদিকের বেড়া যেমন ছিল তেমনই আছে। কিন্তু ভিতরে জনমানবের চিহ্নও নেই। ভাল করে চারদিকটা শুঁকেই সে বুঝতে পারল, দু'দিন আগেই তারা চলে গেছে। বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়াতেই ঘরের দেওয়ালে আঁটা একটুকরো কাগজের উপর তার চোখ পড়ল। তাতে লেখা:

মিস্ কির্চার সম্পর্কে তুমি আমাকে যা বলেছ তারপরে এবং তুমি যে তাকে অপছন্দ কর সেটা বুঝতে পেরে, আমার মনে হয়েছে যে আর বেশীদিন তোমার ঘাড়ে চেপে বসে থাকা তার বা তোমার কারও পক্ষেই উচিত হবে না। আমি

জানি, আমাদের জন্যই তুমি তোমার লক্ষ্যস্থল পশ্চিম উপকূলের দিকে অগ্রসর হতে পারছ না। তাই একটা কোন সাদা মানুষদের বসতি খুঁজে বের করার চেষ্টায় আমরা দুজনই বেরিয়ে পড়লাম। যে স্নেহের আশ্রয় তুমি আমাদের দিয়েছিলে সে জন্য আমরা দুজনই তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধের যদি কোন উপায় থাকত তাহলে আমি সানন্দে সে উপায় অবলম্বন করতে সর্বদাই প্রস্তুত।

চিরকুটের নীচে লেফ্টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইকের সাক্ষর।

টারজন কাঁধ ঝাঁকাল ; চিরকুটটাকে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দিল। দুটি মানুষের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে সে স্বস্তি বোধ করল ; বুঝি বা খুশিও হল। কিন্তু পরমুহূর্তেই একটা দুশ্চিন্তা তাকে পেয়ে বসল। ভাবল, "আমার সাহায্য ছাড়া তারা তো কিছুতেই সাদা মানুষদের বসতি খুঁজে পাবে না। মেয়েটিকে আমি নিজের হাতে খুন করি নি বটে, কিন্তু এভাবে তাদের একলা যেতে দেওয়া মানে তো নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে তাকে ঠেলে দেওয়া। নাঃ, দেখছি অরণ্যরাজ টারজন যেমন বোকা তেমনি দুর্বল।"

একটা অজানা প্রেরণায় টারজন ছুটতে শুরু করল। অনেক পথ পার হয়ে দক্ষিণ পথে কয়েক মাইল এগিয়ে হঠাৎ তার কানে একটা গুড়-গুড় শব্দ এল। ভাল করে কান পেতে হঠাৎ সে বলে উঠল, "একটা বিমানের শব্দ!"

দ্রুততর গতিতে ছুটতে ছুটতে সেই মাঠের প্রান্তে গিয়ে সে হাজির হল যেখানে মাটিতে নেমেছিল স্মিথ-ওল্ডউইকের বিমান। দ্রুত দৃষ্টি চালিয়ে চারদিকে যা দেখতে পেল তাতেই পরিস্থিতিটা বুঝতে পারলেও নিজের চোখকেই যেন সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। হাত-পা বাঁধা অসহায় অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে ইংরেজ অফিসারটি। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে জার্মান পক্ষত্যাগী এক দল কালা আদমি। একটা বিমান তার দিকেই এগিয়ে আসছে। বিমানের চালক কালা উসাঙ্গা, আর তার পিছনের আসনে সাদা মেয়ে বার্থা কির্চার। এই অশিক্ষিত বর্বর মানুষটা কেমন করে বিমান চালাবার কৌশল শিখল তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় তখন নেই। শুধু এইটুকু সে বুঝতে পারল যে কালা সার্জেন্ট উসাঙ্গা সাদা মেয়েটিকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে।

ততক্ষণে বিমানটা মাটি ছাড়বার উপক্রম করেছে। মুহূর্তের মধ্যেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। টারজন প্রথমে ভাবল, ধনুক থেকে তীর ছুঁড়ে উসাঙ্গাকে শেষ করে দেবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে চিন্তা ত্যাগ করল, কারণ সে জানে চালক নিহত হওয়া মাত্রই বিমানটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মেয়েটিসহ ধ্বংস হয়ে যাবে।

মেয়েটিকে উদ্ধার করার আর একটিমাত্র উপায় আছে—কিন্তু সে চেষ্টায় বিফল হলে তার নিজের মৃত্যু অনিবার্য। তবু সেই পথটাই টারজন অনুসরণ করল।

অনভ্যস্ত বিমান-চালানোর কাজে অতিমাত্রায় ব্যস্ত থাকায় উসাঙ্গা টারজনকে দেখতে পায় নি ; কিন্তু একদল কালা আদমির চোখের সামনে সে দ্রুতগতিতে ছুটে গেল বিমানটার দিকে। কাঁধ থেকে লম্বা ঘাসের দড়িটা তুলে নিয়ে তার ফাঁস-কল বসানো দিকটাকে সজোরে মাথার উপর ঘোরাতে লাগল। বিমান থেকে মুখ বের করে মেয়েটিও তাকে দেখতে পেল।

ছুটন্ত লোকটির মাথার বিশ ফুট উঁচু দিয়ে বিমান তখন উড়ে চলেছে। দড়ির ফাঁস-কলটা বিমানের কাছে যেতেই ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বার্থা কির্চার দুই হাতে সেটাকে লুফে নিল। সঙ্গে সঙ্গে টারজনের পা দুটো মাটি থেকে উপরে উঠে গেল, আর তার ভারে বিমানটা বাঁ দিকে কাৎ হয়ে পড়ল। উসাঙ্গা বেপরোয়াভাবে চাকাটাকে ঘুরিয়ে দিতেই বিমানটা খাড়া হয়ে উপরে উঠে গেল। দড়ির অপর প্রান্ত ধরে টারজন ঝুলতে লাগল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত।

ইংরেজ যুবকটি চিৎ হয়ে পড়ে সব কিছুই দেখল। টারজনের দোদুল্যমান অবস্থা দেখে তার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। লম্বা গাছগুলিতে ধাক্কা খেয়ে লোকটির শরীর যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটল না। বিমানটি গাছের মাথা ছাড়িয়ে আরও উপরে উঠে গেল। ফাঁস-কলটাকে দুই হাতে চেপে ধরে মেয়েটি প্রাণপণ শক্তিতে অপর প্রান্তের ভারী দেহটাকে টেনে রেখেছে। আর টারজনও দড়ি বেয়ে একটু একটু করে বিমানের দিকে উঠে যাচ্ছে।

উসাঙ্গা কিন্তু এসব কিছুই জানতে পারে নি। সে বিমানটিকে উঁচুতে—আরও উঁচুতে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

বার্থা কির্চারের হাতের আঙুলগুলি অসাড় হয়ে আসছে। তার আশংকা হল, যে কোন মুহূর্তে আঙুলের মুঠি আল্‌গা হয়ে যেতে পারে। সে বাঁচার সব আশা ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময় একটা বাদামী হাতে বিমানটির একপাশ আঁকড়ে ধরে টারজন ভিতরে উঠে এল। এক পলকে উসাঙ্গার দিকে তাকিয়ে মেয়েটির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "কখনও বিমান চালিয়েছ কি ?" মেয়েটি সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

"ঐ লোকটাকে জাপটে ধরে তুমি ওর পাশে উঠে যেতে পারবে কি ?"

উসাঙ্গার দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় মেয়েটি বলল, "পারব, কিন্তু আমার পা দুটো যে বাঁধা।"

খাপ থেকে শিকারী-ছুরিটা টেনে বের করে টারজন মেয়েটির পায়ের বেড়ি কেটে দিল। মেয়েটি কেটে দিল তার আসনের ফিতেটা। পরমুহূর্তেই একলাফে সে জায়গা করে নিল উসাঙ্গার পাশে। বেচারি কিছু বুঝবার আগেই ইস্পাত-কঠিন আঙুল চেপে বসল তার গলায়। একটা বাদামী হাতে ঝলসে উঠল তীক্ষ্ণ ছুরি। কোমরের ফিতেটা দুই খণ্ড হয়ে গেল। পেশীবহুল দুটো হাতে

তাকে তুলে ধরে নীচে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

নীচে ভূমি-শয্যায় শুয়ে লেফ্‌টেন্যাণ্ট স্মিথ-ওল্ডউইক যখন দেখল যে একটা মানুষের দেহ সবেগে নীচে নেমে আসছে তখন আতংকে সে শিউরে উঠল। শূন্যে পাক খেতে খেতে এসে দেহটা মাটিতে ছিটকে পড়ে একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেল। এই ভাবেই কালা সার্জেণ্ট তার যথোচিত পুরস্কার পেল।

বিমানটি স্বচ্ছন্দে নীচে নেমে এল। একলাফে বিমান থেকে নেমে টারজন ছুটে গেল যুবক লেফ্‌টেন্যাণ্টটির কাছে। কালা যোদ্ধারা কেউ সেখানে নেই। অলৌকিক সব কাণ্ড-কারখানা দেখে সকলেই পালিয়েছে।

টারজন যুবকটির বাঁধন খুলে দিল। ততক্ষণে মেয়েটিও নেমে এসেছে। মুখে ধন্যবাদের কথা উচ্চারণ করতেই টারজন ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি নিজেই নিজেকে বাঁচিয়েছ, কারণ তুমি যদি বিমান চালাবার ভার নিতে না পারতে তাহলে আমিও তোমাকে বাঁচাতে পারতাম না। যাই হোক, এবার তোমরা সহজেই কোন ইংরেজ বসতিতে ফিরে যেতে পারবে। এখনও অনেক বেলা আছে; যথেষ্ট পেট্রল থাকলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তোমরা সেখানে পৌঁছে যাবে।"

যুবকটির দিকে ঘুরে বলল, "এখনই যাত্রা কর। তোমরা কেউই জঙ্গলের লোক নও।" তার মুখে ঈষৎ হাসি ফুটল।

স্মিথ-ওল্ডউইক বলল, "আমাদের তো নয়ই, এই জঙ্গল কোন সাদা মানুষেরই বাসস্থান নয়। তুমিও কেন আমাদের সঙ্গে সভ্য জগতে ফিরে চল না?"

টারজন মাথা নাড়ল। "আমি জঙ্গলই ভালবাসি।"

তরুণ বৈমানিকটি পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে ইতস্তত করে বলল, "কিন্তু বেঁচে তো থাকতে হবে দাদা; মানে—টাকাপয়সা, মানে—বুঝতে তো পারছ—"

টারজন হেসে ফেলল। বলল, "তুমি যা বলতে চাইছ তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তার দরকার হবে না। কি জান, জঙ্গলেই আমি জন্মেছি। সারাটা জীবন জঙ্গলেই কাটিয়েছি। জঙ্গলেই মরতে চাই। আর কোথাও বাঁচতে বা মরতে চাই না।"

দুজনই মাথা নাড়তে লাগল। এই মানুষটিকে তারা বুঝতে পারে না।

টারজন বলল, "চলে যাও। যত তাড়াতাড়ি যাবে, তত তাড়াতাড়ি নিরাপদ হবে।"

দু'জন একসঙ্গে বিমানের দিকে গেল। স্মিথ-ওল্ডউইক টারজনের হাতটা চেপে ধরে দ্রুতপায়ে বিমানে উঠে গেল। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বার্থা কির্চার বলল, "বিদায়। যাবার আগে তুমি কি মুখ ফুটে বলবে যে আমাকে আর ঘৃণা কর না?"

টারজনের মুখে মেঘ জমল। কোন কথা না বলে মেয়েটিকে ধরে ইংরেজটির পাশে বসিয়ে দিল। বার্থা কিরচারের মুখখানা বেদনায় দীন হয়ে গেল। মোটরটা সশব্দে সক্রিয় হয়ে উঠল। মুহূর্তকাল পরে দু'জন উড়ে চলল পূবের দিকে।

তাদের দিকে তাকিয়ে মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল টারজন। ধীরে ধীরে বলল, "খুবই দুঃখের কথা যে মেয়েটি জার্মান গুপ্তচর, কারণ তাকে ঘৃণা করাও বড় কঠিন কাজ।"

১২—রহস্যময় পদচিহ্ন

লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক চালিত বৃটিশ বিমানটা যখন বার্থা কিরচারকে সঙ্গে নিয়ে বহুবিপদসংকুল জঙ্গলের অনেক উপরে উঠে গেল তখন হঠাৎই মেয়েটির মনে হতে লাগল কি একটা যেন তার গলার মধ্যে দলা পাকিয়ে উঠছে। সেটাকে গিলে ফেলতে চাইছে, কিন্তু তখন আর খুঁজে পাচ্ছে না। তার খুবই অবাক লাগল যে এতসব বিপদকে পিছনে ফেলে যেতেও এমন একটা মানুষকে সে পিছনে ফেলে যাচ্ছে যার প্রতি তার মনের টানের অন্ত নেই।

তার সামনেই পাইলটের আসনে বসে আছে একটি ইংরেজ অফিসার। সুপুরুষ, ভদ্র, তার প্রতি অনুরক্ত; তবু একটা বন্য মানুষের স্বস্থানকে ছেড়ে তার সঙ্গে যেতে মেয়েটির মনে বাজছে দুঃখের রাগিনী। আশ্চর্য!

লেফ্‌টেন্যান্ট স্মিথ-ওল্ডউইক কিন্তু তখন সপ্তম স্বর্গে। সে ফিরে পেয়েছে প্রিয় বিমানটিকে, দ্রুত উড়ে চলেছে সহকর্মীদের কাছে স্বীয় কর্তব্য পালন করতে, সঙ্গে ভাল-লাগা মেয়েটিও রয়েছে। এত সব ভালর মধ্যেও টারজনের একটি কথাই বার বার তার মনকে খুঁচিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটি নাকি জার্মান গুপ্তচর। কিন্তু না, তা হতে পারে না। টারজন নিশ্চয় ভুল জেনেছে।

নিজের নিজের চিন্তায় ডুবে থেকে দু'জন উড়ে চলেছে পূবের দিকে। নীচে ঘন অরণ্য: সম্মুখে দূর-বিস্তার অনুর্বর মরুভূমি। একটা পাহাড়ের চূড়াকে পার হবার পরক্ষণেই তাদের পথ আটকে উড়ে এল শকুন স্বা। এই নতুন ধরনের বিরাট দেহ পক্ষীটা যে আকাশ-রাজ্যে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে এটা তার কাছে অসহ্য। সবেগে এসে শকুনটা বিমানের উপর পড়তেই প্রপেলারের আঘাতে এক সঙ্গে অনেক কিছু ঘটে গেল। স্বার ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ দেহটা পালকের মত ছিটকে পড়ল মাটিতে। একটা ভাঙা টুকরো আঘাত করল চালকের কপালে। সে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আর বিমানটা গোত্তা খেয়ে খাড়া ঝাঁপ দিল পৃথিবীর বুকে।

পাইলট মুহূর্তের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিল; কিন্তু ক্ষতি যা হবার তার মধ্যেই হয়ে গেছে। জ্ঞান ফিরে আসতেই পাইলট বুঝতে পারল মোটরটা থেমে গেছে।

বিমানে সঞ্চারিত হয়েছে তীব্র গতিবেগ। নীচের পৃথিবী তখন এত কাছে এসে গেছে যে নিরাপদ অবতরণের চেষ্টা নিরর্থক।

নীচে চোখে পড়ল একটা সংকীর্ণ গিরি-খাত। অনেকটা সমতল ও বালুকাময়। মুহূর্তের মধ্যে স্মিথ-ওল্ডউইক মনস্থির করে ফেলল: ওই গিরি-খাতে অবতরণই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। তাই সে করল; অবশ্য তাতেও বিমানটির বেশ ক্ষতি হল, আর দু'জনে ঝাঁকি খেল প্রচণ্ড।

সৌভাগ্যবশতঃ দুজনের কেউই সেরকম আঘাত পেল না, কিন্তু তাদের অবস্থা দাঁড়াল শোচনীয়। যুবকটির পক্ষে বিমানটি মেরামত করা সম্ভব কি না তাই বা কে জানে। আর দু'জনে পায়ে হেঁটে এই দুস্তর মরুভূমি পার হবার আশা তো সুদূর পরাহত। কয়েক সেকেণ্ড তারা নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

মেয়েটি শুধাল, "এই কি পরিণতি?"

ইংরেজ যুবক মাথা নেড়ে বলল, "আপাতত তো বটেই।"

"তুমি কি যন্ত্রটা মেরামত করতে পারবে না?"

"চেষ্টা করে দেখতে হবে। আশা করি গুরুতর ক্ষতি কিছু হয় নি। টাঙ্গা রেলপথ তো এখান থেকে অনেক—অনেক দূরে।"

দু'দিন ধরে স্মিথ-ওল্ডউইক বিমানটাকে মেরামতের অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সে গোড়া থেকেই বুঝতে পেরেছিল তার সব চেষ্টাই বিফল হবে।

সব শুনে মেয়েটি বলল, "আমি আগেই জানতাম। এখন কি করব? পায়ে হেঁটে টাঙ্গা রেলপথের অর্ধেক পথ পার হবার আগেই ক্ষুধা-তৃষ্ণায় আমাদের মৃত্যু ঘটবে। আবার জঙ্গলে ফিরে গেলে কপালে যা জুটবে তা তো ততোধিক ভয়াবহ।"

মাথা নাড়তে নাড়তে যুবক বলল, "চেষ্টা তো করতেই হবে। এখানে বসে বসে মৃত্যুর অপেক্ষা করা কোন কাজের কথা নয়।"

স্মিথ-ওল্ডউইক বিমানে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার অসহায় দৃষ্টি পায়ের নীচে মাটিতে নিবদ্ধ। মেয়েটি তাকিয়েছিল নীচের গিরি-খাতের দিকে। ওটাই বাঁচবার একমাত্র পথ। হঠাৎ সে যুবকটির হাত চেপে ধরল।

ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "ওই দেখ।"

তার দৃষ্টি অনুসরণ করে দূরে পাহাড়ের বাঁকের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যুবক দেখতে পেল একটা বড় সিংহের মাথা।

সে বলে উঠল, "উঃ। ব্যাটারা সব জায়গায় হাজির।"

"আচ্ছা, সিংহরা তো জল থেকে বেশী দূরে যায় না।" মেয়েটির গলায় আশার সুর।

যুবক বলল, "তা যায় না বলে শুনেছি।"

"তাহলে তো ও নিয়ে এসেছে আশার বাণী।"

যুবক হেসে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, চতুর বাণীবহ। রবিন পাখি যেমন বয়ে আনে বসন্তের আগমন-বার্তা।"

মেয়েটি বলল, "হেসো না। ও যখন দেখা দিয়েছে তখন কাছেই জলের দেখা পাব।"

"কিন্তু তার আগে নিজেকে বাঁচাও। উঠে পড়।"

যুবক মেয়েটিকে নিয়ে বিমানে উঠে বসল।

মেয়েটি শুধাল, "ও কি এখানে ঢুকতে পারবে না?"

"তা বোধ হয় পারবে। ভয় কি। আমার সঙ্গে পিস্তল আছে।" বিমানের পকেট থেকে সে একটা পিস্তল বের করল।

"দোহাই তোমার, ওটা থেকে গুলি ছুঁড়ো না। তাতে হিতে বিপরীত হবে। সিংহটা রেগে যাবে।"

"আরে না, ওটাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ব না। তবে যদি এদিকে এগিয়ে আসে তো ভয় দেখাবার জন্য আকাশে গুলি করব। তাতে অনেক সময় কাজ হয়।"

সিংহ নুমা একটু একটু করে এগিয়ে আসছে। আক্রমণের উদ্দেশ্যে ততটা নয় যতটা কৌতূহলবশে। বিমানের একেবারে কাছে এসে উপরের দিকে তাকিয়েই সে একটা লাফ দিল। পাইলটও পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ল।

আর ঠিক সেই ক্ষণে অরণ্যরাজ টারজনের প্রবেশ ঘটল সেই দৃশ্যে। তাকে দেখেই নুমা মুখ ফিরিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল।

টারজন বর্শা হাতে তৈরীই ছিল। কিন্তু সে চিনতে পারল, এটা ওয়ামাবোর সুড়ঙ্গের ভিতরকার সেই নুমা। টারজন ভাবল, টারজনটা কি এরই মধ্যে আগেকার সব কথা ভুলে যাবে? তার মনে কি কৃতজ্ঞতার কণামাত্রও জাগবে না?

সত্যি, নুমা তাকে চিনতে পেরেছে। গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে এসে সিংহটা টারজনের পাশে দাঁড়াল বিশ্বস্ত ভৃত্যের ভঙ্গীতে।

টারজনের অ্যাংলো-স্যাক্সন রক্তে জেগে উঠল চিরন্তন শিকারের নেশা। মুহূর্তের মধ্যে অরণ্যরাজ টারজন রূপান্তরিত হল লর্ড গ্রে-স্টোক জন ক্লেটন-এ। বিমানের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, "তোমাদের খুঁজে পাবার আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। বড় ঠিক সময়ে এসে পড়েছি।"

ইংরেজ অফিসারটি শুধাল, "আমরা বিপদে পড়েছি জানলে কেমন করে?"

টারজন উত্তর দিল, "তোমাদের বিমানটাকে পড়তে দেখলাম। তোমরা যেখান থেকে বিমানে উঠেছিলে সেখানেই একটা গাছের আড়ালে থেকে

তোমাদের উপর নজর রেখেছিলাম। কিন্তু বিমানটা গোত্তা খেয়ে পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়ার পরে আর দেখতে পাই নি। ফিরেই যাব ভাবছি এমন সময় তোমার পিস্তলের শব্দ শুনতে পেলাম। বিমানটা কি একেবারেই অকেজো হয়ে গেছে?"

"হাঁ; কোন আশা নেই," স্মিথ-ওল্ডউইক বলল।

টারজন শুধাল, "তাহলে এখন কি করবে কিছু ভেবেছ?"

মেয়েটি উত্তর দিল, "আমরা উপকূলে পৌঁছতে চাই। কিন্তু এখন তো সেটা অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে।"

টারজন বলল, "কিছুক্ষণ আগে হলে আমিও তাই মনে করতাম। কিন্তু নুমাকে যখন এখানে পেয়েছি তখন জলভাগ নিশ্চয় খুব দূরে হবে না। তোমরা নেমে এস। সকলে মিলে চেষ্টা করে দেখা যাক নুমা আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে কি না।"

যুবক-যুবতী দুটি ভয়ে-ভয়ে বিমান থেকে নেমে এল। আগে আগে চলল নুমা। তার পিছন-পিছন বাকিরা। প্রথমে দেখা গেল শুধুই নুমার পায়ের ছাপ। বোঝা গেল এই পথেই সে উপকূল থেকে এসেছিল। কিন্তু বিকেলের দিকে অন্য অনেক সিংহের পুরনো পায়ের ছাপ টারজনের চোখে পড়ল। অন্ধকার নেমে আসার আগেই হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই সঙ্গী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে সে আঙুল বাড়িয়ে সামনের পথটা দেখাল।

বলল, "ওদিকে তাকাও।"

কতকগুলি এলোমেলো থাবার ছাপ ছাড়া প্রথমে আর কিছুই স্মিথ-ওল্ডউইক বা মেয়েটির চোখে পড়ল না। কিন্তু ভাল করে নজর করতেই মেয়েটি চেঁচিয়ে বলে উঠল, "মানুষের পায়ের ছাপ।"

টারজন মাথা নাড়ল।

মেয়েটি আঙুল বাড়িয়ে বলল, "কিন্তু পায়ের আঙুলের কোন ছাপ নেই।"

"পায়ে নরম স্যাণ্ডেল ছিল," টারজন বুঝিয়ে বলল।

'তাহলে তো নিশ্চয় কাছাকাছি কোন গ্রাম আছে," স্মিথ-ওল্ডউইক বলল।

টারজন বলল, "তা আছে; কিন্তু আফ্রিকার এইসব অঞ্চলে যে সব মানুষ বাস করে তারা তো পায়ে স্যাণ্ডেল পড়ে না। একমাত্র উসাঙ্গার দলত্যাগী কালা যোদ্ধারাই পরে জার্মানদের সৈনিক-জুতো। তোমাদের চোখে পড়েছে কি না জানি না, কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি স্যাণ্ডেলের ভিতরকার যে সব পায়ের ছাপ এখানে পড়েছে সেগুলি কোন নিগ্রোর পা নয়। নিগ্রোদের পায়ের চাপ সব চাইতে বেশী পড়ে মাঝখানে; কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি স্যাণ্ডেলের ভিতর থেকেও পায়ের ছাপ স্পষ্টতর হয়ে পড়েছে গোড়ালির দিকে।"

"তার মানে তুমি মনে কর যে এগুলো কোন সাদা মানুষের পায়ের ছাপ?"

"সেই রকমই তো মনে হচ্ছে," বলেই টারজন হঠাৎ মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে পথটা শুঁকতে শুরু করল। কয়েক গজ জায়গা শুঁকে উঠে দাঁড়াল। বলল, "এটা কোন গোমাঙ্গানির গন্ধ নয়, আবার ঠিক সাদা মানুষের গন্ধও নয়। এপথে এসেছিল তিনজন। তিনজনই পুরুষ, কিন্তু কোন্ জাতের তা বুঝতে পারছি না।"

তারা তিনজন গিরি-খাতটা ধরে যতই এগোতে লাগল সেটা ততই গভীরতর হয়ে নীচে নামতে লাগল। দু'পাশের দেয়ালে নানান উচ্চতায় জলের দাগ লেগে আছে। কাছেই একটা খিলানযুক্ত গুহা। নীচে বালির আস্তরণ।

টারজন বলল, "রাতটা এখানেই কাটানো যাক।" তারপর স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসি হেসে বলল, "আজ রাতে এটাই হবে আমাদের শিবির।"

যৎসামান্য খাবারে নৈশভোজন শেষ করে টারজন মেয়েটিকে ভিতরে ঢুকতে বলল।

"তুমি ভিতরে ঘুমবে। লেফ্টেন্যান্ট ও আমি শোব বাইরে গুহার মুখে।"

১৩—নৈশ আক্রমণ

মেয়েটি শুভরাত্রি জানাতে ঘুরে দাঁড়াতেই তার মনে হল, দূরে অন্ধকারের মধ্যে একটা কিছু যেন নড়াচড়া করছে। সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "ওটা কি? অন্ধকারে কাকে যেন দেখতে পাচ্ছি।"

"হ্যাঁ, একটা সিংহ" টারজন উত্তর দিল। "বেশ কিছুক্ষণ হল ওটা ওখানে আছে। তুমি আগে লক্ষ্য কর নি?"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল, "ওহো! ওটা তাহলে আমার সিংহ?"

টারজন বলল, "না, ওটা আমাদের সিংহ নয়। অন্য সিংহ; শিকারে বেরিয়েছে।"

"ও কি আমাদের পিছু নিয়েছে?"

"ঠিক তাই," টারজন বলল। স্মিথ-ওল্ডউইকের আঙুল তার পিস্তলকে স্পর্শ করল।

সেদিকে চোখ পড়াতে টারজন বলল, "ওটা যেখানে আছে সেখানেই রেখে দাও লেফ্টেন্যান্ট।"

অফিসার হকচকিয়ে গিয়ে হেসে বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পারি নি দাদা। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তির ব্যাপার আর কি।"

টারজন বলল, "সেটা যে অচিরেই আত্মহত্যার প্রবৃত্তি হয়ে দেখা দিত। বাইরে অন্তত তিনটে সিংহ আমাদের উপর চোখ রেখেছে। সঙ্গে যদি আগুন

থাকত, বা চাঁদ উঠত তাহলে তাদের চোখগুলো দেখতে পেতে।"

"যদি ওরা আক্রমণ করে?" মেয়েটির সভয় প্রশ্ন।

"তাহলে আমাদের লড়তে হবে," টারজন বলল।

"ওদের বিরুদ্ধে আমরা তিনজন কি করতে পারব?" মেয়েটি প্রশ্ন করল।

টারজন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "একদিন না একদিন মরতে তো হবেই। অবশ্য এ রকম মৃত্যু তোমাদের কাছে খুব ভয়ংকর; কিন্তু অরণ্যরাজ টারজন এই রকম মৃত্যুই আশা করে। জঙ্গলে খুব কম লোকই বুড়ো বয়সে মারা যায়; আমিও সে মৃত্যু চাই না। একদিন হয় নুমা আমাকে খাবে, নয়তো শীতা, নয়তো কোন কালা যোদ্ধা। যে কেউ। সে যেই হোক, আর যবেই হোক—আজ রাতে, এক বছর পরে, অথবা দশ বছরে—তাতে ফারাকটা কি? শেষ হয়ে গেলে সবই তো সমান।"

মেয়েটি শিউরে উঠল। "তা ঠিক, শেষ হয়ে গেলে সবই সমান।" কথা কয়টি আবৃত্তি করে গুহার ভিতর ঢুকে সে বালির উপর শুয়ে পড়ল। স্মিথ-ওল্ডউইক গুহার মুখে বসে পাহাড়ে হেলান দিল। টারজন বসল উল্টো দিকে।

অফিসার বলল, "একটু ধূমপান করতে পারি কি? আমার কাছে বেশ কয়েকটা আছে। তোমাকেও একটা দিতে পারি।" একটা সিগারেট এগিয়ে দিল।

টারজন বলল, "না, ধন্যবাদ। তুমি টানতে পার। কোন বুনো জানোয়ার তামাকের ধোঁয়া পছন্দ করে না। কাজেই ধোঁয়ার গন্ধ পেলে নুমা তোমার কাছে ঘেঁসবে না।"

স্মিথ-ওল্ডউইক সিগারেট ধরিয়ে প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, তিনটে সিংহ কি এক সঙ্গে আক্রমণ করতে পারে?"

টারজন বলল, "তিনটে কি বলছ? এখন বাইরে সাতটা এসে জড়ো হয়েছে।"

"হায় ঈশ্বর।" স্মিথ-ওল্ডউইকের ভয়ার্ত উক্তি।

টারজন বলল, "সিংহদের সঙ্গে এখন একটি মানুষও রয়েছে।"

স্মিথ-ওল্ডউইক চেঁচিয়ে বলে উঠল, "অসম্ভব। ওরা তো তাকে ছিঁড়ে খাবে।"

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। মাঝে মাঝে শুধু অন্ধকারে চলাফেরার শব্দ আসছে। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে টারজন উঠে দাঁড়িয়ে খাপ থেকে লম্বা ছুরিটা টেনে বের করল। স্মিথ-ওল্ডউইক পাথরে হেলান দিয়ে ঝিমুচ্ছে। সারাদিনের উত্তেজনা ও ক্লান্তিতে মেয়েটি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন।

মুহূর্তকাল পরেই পর পর ভয়ংকর গর্জন এবং অনেক পায়ের শব্দে যুবক-যুবতী দুটির ঘুম ভেঙে গেল।

গুহার মুখে খোলা ছুরি হাতে দাঁড়িয়েছে টারজন। অপ্রত্যাশিত হলেও সে বুঝতে পেরেছে যে একদল মানুষ ও একপাল সিংহ একযোগে এগিয়ে আসছে তাদের আক্রমণ করতে। ইচ্ছা করলেই সে পালিয়ে যেতে পারত; গুহার উপরকার পাহাড়টা পার হওয়া তার মত কুশলী পর্বতারোহীর পক্ষে কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু সে পালাল না। এতগুলি মানুষ ও পশুর বিরুদ্ধে সে একা কিছুই করতে পারবে না জেনেও কিসের টানে কে জানে বিফল আত্মত্যাগের পথটাই সে বেছে নিল। একটা পাল্টা আঘাত হানবার সুযোগও সে পেল না। বন্য জানোয়ারগুলো তার উপর দিয়ে জলোচ্ছ্বাসের মত এগিয়ে গেল। মাটিতে ছিটকে পড়ে মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে টারজন জ্ঞান হারাল।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন ভোরের আলো ফুটেছে। টারজন ধীরে ধীরে চোখ মেলল। কাত হয়ে শুয়ে থাকলেও সে বুঝতে পারল একটা বড় সিংহ দেহ দিয়ে তাকে আড়াল করে কার প্রতি যেন গর্-র্ গর্-র্ করছে।

জ্ঞান পুরোপুরি ফিরে আসতে গন্ধ শুঁকেই সে বুঝতে পারল এটা ওয়ামাবো গুহার সেই নুমা। ইসারা করতেই নুমা তার দেহের উপর থেকে সরে গেল। মাথা তুলে দেখল, মাথায় আঘাত লেগে সে গুহার মুখে যেখানে পড়েছিল সেখানেই শুয়ে আছে। দূরে দুটো সিংহ তার দিকে তাকিয়ে এদিক-ওদিক করছে। নুমাই তাদের আটকে রেখেছে দূরে।

গুহার ভিতরে তাকিয়ে দেখল, স্মিথ-ওল্ডউইক ও বার্থা কির্চার কেউই সেখানে নেই। তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে দেখে টারজন তীব্র রোষে মাথাটা ঝাঁকি দিল। নুমার দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা দু'জনে মিলে ও দুটোকে নিশ্চয় শায়েস্তা করতে পারব। চল, আক্রমণ করি।"

শুরু হল লড়াই। টারজন দক্ষ সিংহ-শিকারী। তার সঙ্গে যুক্ত হল নুমার দৈহিক শক্তি। টারজনের ছুরিকাঘাতে একে একে দুটো সিংহই ধরাশায়ী হল।

এবার খুঁজে বের করতে হবে বার্থা কির্চার ও স্মিথ-ওল্ডউইককে। কিন্তু তার আগে কিছু খাওয়া দরকার। ভীষণ খিদে পেয়েছে। ইসারায় তার কথা বুঝতে পেরে নুমা পথ দেখিয়ে এগিয়ে চলল খাদ্যের সন্ধানে। পথে অনেক সিংহের পায়ের ছাপ। তার সঙ্গে মিশে আছে স্যাণ্ডেল-পরা পায়ের ছাপ এবং একদল বিচিত্র মানুষের গন্ধ। চলতে চলতে তার নাকে এল মেয়েটির গন্ধ; একটু পরে স্মিথ-ওল্ডউইকের গন্ধ। পথ ক্রমেই সরু হয়ে এল। মেয়েটি ও ইংরেজটির পায়ের ছাপও স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

গিরি-খাতটা ক্রমেই বেশী রকম ঢালু হয়ে নেমে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই কিছু প্রাচীনতার নিদর্শন ও মানুষের হাতের কাজ চোখে পড়ছে। আরও আধা বা তিন-পো মাইল চলার পরে একটা মোড় ঘুরতেই টারজনের চোখে পড়ল একটা ছোট উপত্যকা। চারদিকে সুউচ্চ পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা। উপত্যকাটি সরস,

উর্বর—ঘন সবুজ গাছ-গাছালিতে ঢাকা।

নুমার পিছন পিছন টারজন সেই উপত্যকায় নেমে গেল। এবার অনেক বড় বড় গাছ। বিচিত্র রং-বেরংয়ের পালকে ঢাকা নানা রকম পাখি ডাকছে কর্কশ স্বরে। অসংখ্য বানর কিচির-মিচির করছে আর ফল ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে।

অরণ্য প্রাণী-সংকুল; তবু একটা অব্যক্ত নির্জনতার বোধ টারজনের মনের উপর চেপে বসেছে। জঙ্গল চিরদিনই তার প্রিয়; সেখানে এসে এ বোধ তো তার আগে কখনও হয় নি। সবই কেমন যেন অবাস্তবতায় ঘেরা—উর্বর পরিবেশের মধ্যে লালিত এই উর্বর সবুজ উপত্যকাটি পর্যন্ত। পাখি ও বানরের দল চেনা হলেও যেন ঠিক চেনা নয়। গাছ-গাছালির ধরনও অন্য রকম। টারজনের মনে হল সে যেন হঠাৎ অন্য একটা জগতে এসে পড়েছে। মনে জেগেছে একটা বিচিত্র চাঞ্চল্য। এ কি কোন আসন্ন বিপদের পূর্বাভাষ।

বানরদের দেখাদেখি গাছের ফল ছিঁড়ে খেয়েই টারজন আংশিকভাবে ক্ষিধে মেটাল। মাংস ছাড়া তার পেট ভরে না। তারপর চারদিকে তাকিয়ে নুমার খোঁজ করতেই বুঝল সিংহটা চলে গেছে।

১৪—প্রাচীর ঘেরা নগর

মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে আর একবার ভাল করে শুঁকে টারজন মেয়েটি ও তার অপহরণকারীদের পথের সন্ধান পেয়ে সেই পথে চলতে শুরু করল। অচিরেই একটা ছোট নদী পেয়ে প্রাণ ভরে জল খেয়ে নদীর তীর বরাবর পথটা ধরে চলতে লাগল। রাতের অন্ধকারের জন্যই হোক, আর সিংহদের আক্রমণের জন্যই হোক গত রাতের মানুষগুলো তাকে ঠিক ঠাহর করতে পারে নি; তাই তার সব অস্ত্রশস্ত্র—বর্শা ও লম্বা ছুরি, তীর ও ধনুক এবং ঘাসের দড়িটা তার কাছেই রয়ে গেছে।

চলতে চলতে একসময় হঠাৎ তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দেখা দিল গম্বুজ ও মিনারে শোভিত একটি প্রাচীর ঘেরা নগর।

তার ঠিক সামনেই প্রাচীরের গায়ে নীচু খিলানওয়ালা একটা ফটক। তার নীচ দিয়েই পথটা ভিতরে ঢুকেছে। জঙ্গল ও প্রাচীরের মাঝখানের খোলা জায়গায় মানুষের হাতে তৈরী সুন্দর বাগান, আর তারই মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে মানুষের হাতে কাটা ছোট ছোট জলের নালা। নগরের প্রাচীরটা প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু: ভালভাবে প্লাস্টার ও রং করা। প্রাচীর ছাড়িয়ে আকাশে মাথা তুলেছে কয়েকটি গম্বুজ ও অসংখ্য মিনার; কেন্দ্রস্থ গম্বুজটি সোনালী রং করা; বাকিগুলি লাল, নীল বা হলুদ।

একটা গন্ধ নাকে আসতেই সে বুঝতে পারল, পিছন থেকে একটা দল

আসছে। যে মানুষ ও সিংহদের সে এড়িয়ে এসেছে এ যে তাদেরই গন্ধ। তাড়াতাড়ি একটা গাছে চড়ে টারজন পশ্চিম দিকে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে, একটা ডাল দো-ডালায় বসে নীচের দিকে নজর রাখল।

তারা এসে পড়ল—একটি বিচিত্র মানুষ, আর তার পিছনে একপাল সিংহ। পোঁষা কুকুরের মত তারা লোকটির পিছন পিছন ফটকের দিকে এগিয়ে গেল।

লোকটি বর্শার হাতল দিয়ে ফটকে আঘাত করতেই সেটা খুলে গেল। চকিত দৃষ্টিতে টারজন ভিতরের যতটুকু দেখতে পেল তাতেই বুঝল আরও মানুষ সেখানে বাস করে। সে আরও বুঝল যে, যে দুটি মানুষের খোঁজে সে এসেছে তাদেরও এই ফটক দিয়েই নগরে ঢোকানো হয়েছে। তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে বা ঘটবে তা সে জানে না। তবে এটা জানে যে তাদের কোন রকম সাহায্য করতে হলে তাকে নগরে ঢুকতে হবে, বাইরে থেকে কিছুই করা যাবে না।

আকাশে সূর্য ঢলে পড়ল। বাগানের ছায়া দীর্ঘতর হল। পূবের মাঠ থেকে দলে দলে সব লোক নগরে ফিরতে লাগল। তাদের হাতে চাষের নানা রকম যন্ত্রপাতি, আর ঝুড়িভর্তি ফলমূল, আনাজপাতি। এত লোক যে নগরের বাইরের মাঠে কাজ করছিল টারজন সেটা আগে বুঝতে পারে নি।

সূর্য অস্ত গেল। অন্ধকারে ঢেকে গেল প্রাচীর-ঘেরা নগর। জানালায় জানালায় আলো জ্বলে উঠল। টারজন আগেই ভেবে রেখেছিল, কিছুটা দূরে পূব দিকের প্রাচীর যেখানে দ্রাক্ষালতায় ছেয়ে গেছে সেখান দিয়ে প্রাচীর টপকে নগরে ঢুকবে। জঙ্গল ও প্রাচীরের মাঝখানে প্রায় সিকি মাইলের ব্যবধান। নীচের খোলা জায়গাটায় হিংস্র পশুর অবাধ চলাফেরা। তার ভিতর দিয়ে ছুটে গিয়ে দ্রাক্ষালতা বেয়ে প্রাচীরের উপর উঠতে হবে। তার সাফল্য নির্ভর করছে কৌশল ও দ্রুতগতি এবং দ্রাক্ষালতার বহন ক্ষমতার উপর।

বাস্তবেও তাই ঘটল। টারজন গাছ থেকে নেমে ছুটে গেল প্রাচীরের দিকে। হিংস্র নুমা তাকে তাড়া করল। ছুটতে ছুটতে প্রাচীরের কাছে পৌঁছে একলাফে টারজন একটা মোটা দ্রাক্ষালতা ধরে ঝুলে পড়ল। নীচ থেকে নুমাও লাফ দিল।

১৭—উন্মাদের দেশে

সিংহগুলো যখন তার সঙ্গী দু'জনের উপর দিয়ে ছুটে এল তখন বার্থা কির্চার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গুহার এক কোণে কুঁকড়ে সরে গেল। সিংহের গর্জন ও লোকজনের হৈ-হল্লার মধ্যেই সে বুঝতে পারল কিছু মানুষও আছে তার মধ্যে। গুহার অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। কয়েকটা হাত এসে

তাকে চেপে ধরল। হাতের বর্শা দিয়ে সিংহকে সরিয়ে দিয়ে তাকে টানতে টানতে গুহার বাইরে টেনে আনা হল। খাদের বালুময় পথে পা দিয়েই সে দেখতে পেল, কয়েকজন মিলে একটা লোককে প্রায় টানতে টানতে নিয়ে চলেছে। বুঝল, এ লোক স্মিথ-ওল্ডউইক ছাড়া অন্য কেউ নয়।

তারা যখন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকল তখন সূর্য উঠেছে। তবু মনের মধ্যে আবছা আলোছায়া। চলতে চলতে বার্থা কির্চার একটা আশ্চর্য ঘটনা লক্ষ্য করল। যে লোকটি তার ঠিক আগে আগে চলছে সে বেশ এক জোয়ান পুরুষ। কিন্তু একটা বিচিত্র রঙের কাকাতুয়া তার দিকে উড়ে আসতেই সে হাঁটু ভেঙে মাটিতে বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢাকল। উবু হতে হতে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ল। অন্য লোকরা তাকে দেখে হাসতে লাগল। তারপর পাখিটা উড়ে গেলে সে আবার উঠে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করল।

সেখানে অল্পক্ষণ দাঁড়াবার ফাঁকে স্মিথ-ওল্ডউইকও তার পাশে এসে হাজির হল। সিংহের থাবায় শরীর রক্তাক্ত হলেও এখন সে একাই হাঁটতে পারছে।

মেয়েটি বলল, "তোমাকে খুব দুর্বল দেখাচ্ছে। বড়ই কষ্ট হচ্ছে কি?"

যুবক উত্তর দিল, "খুব না। কি জান, আরও খারাপ কিছুও তো ঘটতে পারত। কিন্তু এরা সব কেমন ধারা জীব বল তো।"

যুবক বলল, "বুঝতে পারছি না। এদের চেহারাই যেন কেমন অদ্ভুত।"

তাদের একজনের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে যুবক প্রশ্ন করল, "কখনও পাগলাগারদ দেখেছ?"

হঠাৎ কি মনে হতেই মেয়েটি সভয়ে বলে উঠল, "ঠিক ধরেছ!"

যুবক বলতে লাগল, "সব লক্ষণই মিলে যাচ্ছে। চোখের মণির চারপাশের সাদা অংশটা অনেক বেশী, মাথার তালু থেকে কপাল পর্যন্ত খাড়া-খাড়া চুল — হাবভাব, চালচলনও পাগলের মত।"

মেয়েটি ভয়ে শিউরে উঠল।

ইংরেজ যুবকটি আবার বলল, "আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? এরা কাকাতুয়া দেখে ভয় পায়, কিন্তু সিংহকে এতটুকু ভয় করে না। এটাও তো অস্বাভাবিক।"

এই সব আলোচনা করতে করতেই দু'জন পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

জঙ্গল পার হতেই সামনে চাষের ক্ষেত ও একটা প্রাচীর-ঘেরা নগর দেখতে পেয়ে তারা অবাক হয়ে গেল।

স্মিথ-ওল্ডউইক বলে উঠল, "আরে, এ যে রীতিমত ইঞ্জিনীয়ারের হাতের কাজ।"

মেয়েটি দূরে তাকিয়ে বলে উঠল, "আর ঐ গম্বুজ ও মিনারগুলি দেখ। প্রাচীরের ওপাশে নিশ্চয় সভ্য মানুষরা বাস করে। হয়তো ভাগ্যক্রমেই আমরা

তাদের হাতে পড়েছি।"

স্মিথ-ওল্ডউইক মাথা নেড়ে বলল, "হয়তো তাই। তবু আমার কেমন যেন ভাল বোধ হচ্ছে না। যে মানুষরা সিংহ নিয়ে বেড়ায় অথচ কাকাতুয়াকে ভয় পায় তাদের বিশ্বাস নেই। নিশ্চয় কিছু একটা গোলমাল আছে।"

খিলান-দেওয়া ফটক পার হয়ে তারা ভিতরে ঢুকল। সরু সরু পথ। দু'দিকে সারি সারি বাড়ি-ঘর। অধিকাংশই দোতলা। বহু প্রাচীনতার সাক্ষী।

এত সকালে পথে লোকজন খুব অল্প। ক্রমে কিছু কিছু উলঙ্গ ছেলেমেয়েকে পথে খেলা করতে দেখা গেল। তারা অবাক হয়ে নবাগতদের দেখছে।

স্মিথ-ওল্ডউইক বলল, "ওদের ভাষা যদি বুঝতে পারতাম।"

বার্থা কির্চার বলল, "আমিও তাহলে জিজ্ঞাসা করতাম, আমাদের নিয়ে ওরা কি করবে।"

যুবক বলল, "সে কথা আমিও ভেবেছি।"

মেয়েটি বলল, "ওদ্রের মুখের শ্ব-দন্তগুলো আমার মোটেই ভাল ঠেকছে না। ওদের দেখলেই আমার নরখাদকদের কথা মনে পড়ছে।"

যুবক বলল, "তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস কর না যে ওরা নরখাদক। শ্বেতাঙ্গ মানুষ কি কখনও নরখাদক হয়?"

মেয়েটি প্রশ্ন করল, "এরা কি শ্বেতাঙ্গ?"

"নিগ্রো যে নয় সেটা তো ঠিক। এদের চামড়া হলুদ, কিন্তু দেখতে ঠিক চীনাদের মত নয়। চোখ-মুখ-নাকও চীনাদের থেকে আলাদা।"

ঠিক সেই সময় তাদের চোখে পড়ল এ নগরের প্রথম নারী। অন্য সব দিক থেকে তাকেও দেখতে এখানকার পুরুষের মতই; কেবল একটু ছোটখাট, আর গড়নটা অপেক্ষাকৃত সুসমঞ্জস। মুখটা পুরুষদের চাইতেও খারাপ; হয়তো নারী বলেই দেখতে আরও খারাপ লাগে।

তার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্মিথ-ওল্ডউইক বলল, "দেহটা হুরীর, কিন্তু মুখটা অপদার্থের।"

এই সময় তার ক্ষতস্থানের যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল। ক্রমাগত রক্তক্ষরণের ফলে শরীরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। আর যেন চলতে পারছে না। ক্রমেই সে দল থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

তা দেখে স্থানীয় রক্ষীদের একজন হঠাৎ ভীষণ রেগে গেল। যুবকটির উপর নির্বিচারে ঘুষি চালিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তাতেও খুশি না হয়ে বাঁ হাতে তার গলা টিপে ধরে ডান হাতে উদ্যত করল তীক্ষ্ণ তরবারি। ভয়ংকরভাবে চীৎকার করতে করতে তরবারিখানাকে মাথার উপর ঘোরাতে লাগল।

এতসব কাণ্ড সত্ত্বেও বাকি লোকগুলি কিন্তু নির্বিকার। তারা দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

কিন্তু সঙ্গীর এ দুর্দশা সইতে পারল না বার্থা কিরচার। আক্রমণকারী লোকটির কবল থেকে যুবকটিকে বাঁচাবার জন্ম হিতাহিত বিবেচনা না করেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের সামনে। তরবারিসমেত লোকটির উদ্যত হাতটাকে চেপে ধরে সজোরে টান দিল। সেই আচমকা টানের বেগে লোকটি ছিটকে পড়ে গেল, আর তার হাতের তরবারিও ছিটকে পড়ল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে বার্থা কিরচার সেটা তুলে নিল। তীক্ষ্ণধার অস্ত্রটা হাতে নিয়ে ভূপাতিত ইংরেজ অফিসারটির পাশে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে আক্রমণকারী লোকটির মুখোমুখি দাঁড়াল।

লোকটিও তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। কিন্তু চোখের সামনে সেই রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে হঠাৎ তার মুখ-চোখের ভাব একেবারে বদলে গেল। কোথায় গেল তার সেই আচমকা অস্বাভাবিক ক্রোধ। হঠাৎ একটানা অট্টহাসিতে তার সারা শরীর কাঁপতে শুরু করল।

এতক্ষণে বার্থা কিরচার পরিষ্কার বুঝতে পারল, এ লোকটি বদ্ধ উন্মাদ। শুধু এই লোকটি নয়, এরা সকলেই। গোটা নগরটাই বুঝি একটা উন্মাদ-আশ্রম।

কি ভেবে হাতের তরবারি সেই হাস্যকর উন্মাদের পায়ের কাছেই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বার্থা কিরচার ইংরেজ যুবকটির পাশে নতজানু হয়ে বসে পড়ল। তার দিকে তাকিয়ে একটা খুশির আলো ছড়িয়ে পড়ল স্মিথ-ওল্ডউইকের সারা মুখে। এতদিনে কি দেবী তার প্রতি প্রসন্ন হল।

ঠিক তখনই একদল রক্ষী এগিয়ে বার্থা কিরচারকে ইসারায় তাদের অনুগমন করতে বলল। স্মিথ-ওল্ডউইকও তাদের সঙ্গে যেতে উদ্যত হতে একজন রক্ষী তাকে বাধা দিল। মেয়েটি পিছন ফিরে তাকিয়ে হতাশ স্বরে বলল, "তোমার ভাল হোক!" তারপরই সে রক্ষীদলের সঙ্গে চলে গেল।

একটু পরে দু'জন রক্ষী এসে যুবককেও নিয়ে গেল।

একটা করিডর বরাবর হাঁটতে হাঁটতে লোহার গরাদ দেওয়া একটা ফটকের সামনে তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। ফটক পার হয়ে তারা ভিতরের উঠোনে ঢুকল। উঠোনটা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা বাগানের মত। কিছু গাছপালা ও ঝোপঝাড় ইতস্তত ছড়ানো। মাঝে মাঝে বেঞ্চি পাতা। কিন্তু সব কিছুর আগে স্মিথ-ওল্ডউইক সবিস্ময়ে দেখল, পোষা জানোয়ারের মত একদল সিংহ সেখানে রয়েছে; কতক শুয়ে শুয়ে ঝিমুচ্ছে, কতক বা চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

রক্ষী দু'জন ফটক পার হয়ে করিডরে ফিরে গেল। পরিস্থিতি উপলব্ধি করে ইংরেজটি ভয়ে শিউরে উঠল। ছুটে গিয়ে ফটকে ধাক্কা দিল। ফটক তালাবন্ধ। চীৎকার করে সে রক্ষীদের ডাকল। একমাত্র উত্তর এল উন্মাদ অট্টহাসি।

রক্ষী দু'জন অদৃশ্য হয়ে গেল। সিংহপরিবৃত হয়ে সে একা সেখানে দাঁড়িয়ে।

১৬—রাণী কাহিনী

বার্থা কিয়্চারকে নিয়ে যাওয়া হলো নগরের সব চাইতে বড় ও বেশী জাঁকজমকপূর্ণ বাড়িটাতে। বেশ কয়েকতলা উঁচু। সোজা উঠে গেছে পাথরের সিঁড়ি। নীচে সারি সারি পাথরের সিংহ। দুই পাশে মস্ত বড় দুটো পাথরের কাকাতুয়া। সে দুটিকে বসানো হয়েছে নর-করোটির উপরে।

সিঁড়ি বেয়ে তারা উপরে উঠে গেল। দ্বারপথে রক্ষী দুজনকে ছেড়ে দেওয়া হল; তাদের জায়গা নিল আধা ডজন পীতবসনধারী সৈনিক।

পর পর অনেকগুলো দরজা পার হয়ে তারা একটা হলে ঢুকল। মেঝেতে পায়চারি করছে লাল পোশাকে সজ্জিত একটি মানুষ। তার বুক ও পিঠের উপর প্রকাণ্ড দুটো কাকাতুয়ার মূর্তি, আর শিরস্ত্রাণের উপর বসানো একটা ঘড়ভর্তি কাকাতুয়া।

ঘরের চারদেয়ালে শত শত, হাজার হাজার কাকাতুয়ার মূর্তি কাপড়ের উপর সেলাই করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। মেঝেতে সোনালী কাকাতুয়ার মূর্তি খোদাই করা, আর সিলিং-এ তীব্র ঘন রঙে আঁকা উড়ন্ত কাকাতুয়ার ছবি আঁকা।

অন্য যে সব মানুষকে বার্থা কিয়্চার এ নগরে দেখেছে এ লোকটি তাদের চাইতে উঁচু-লম্বা। বয়সের ভারে গায়ের চামড়া কাগজের কত কুঁকড়ে গেছে। বপুটাও বেশ স্থুল। তার দুই বাহু কিন্তু প্রভূত শক্তির সাক্ষ্য বহন করছে; চালচলনে বার্ধক্যের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু সারা মুখে বুদ্ধিহীনতার স্পষ্ট প্রকাশ। এ রকম একটা কিম্ভুত জীব বার্থা কিয়্চার আগে কখনও দেখে নি।

লোকটি ঘরময় হাঁটছে তো হাঁটছেই। একটি মেয়েকে সেখানে আনা হয়েছে সে খেয়ালই নেই। হঠাৎ পায়চারি থামিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে ছুটে এল মেয়েটির দিকে। তাকে ছুটে আসতে দেখে মেয়েটি তাকে রুখবার ভঙ্গীতে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সভয়ে পিছনে হটে গেল।

লোকটি কিন্তু খুব কাছে এসেও তাকে স্পর্শ পর্যন্ত করল না। হঠাৎ থেমে গেল। চোখ ঘুরিয়ে তাকে দেখতে লাগল, আর পরমুহূর্তেই পাগলের মত হো-হো করে হেসে উঠল। দু'তিন মিনিট ধরে একইভাবে হেঁটে আবার সে মেয়েটির সামনে থেমে গেল। তার চুল, চামড়া. পোশাক, বিশেষ করে তার দাঁতগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

তারপর আবার পায়চারি শুরু করল। এইভাবে পনেরো মিনিট কাটবার পরে রক্ষীদের কি যেন হুকুম করতেই তারা মেয়েটিকে নিয়ে ঘর থেকে বিরিয়ে গেল।

অনেকগুলি বারান্দা ও ঘর পার হয়ে তারা সিঁড়ি বেয়ে আরও একতলা উপরে উঠে গেল। সেখানে একটা ছোট ঘরে তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে রক্ষীরা দরজায়

তালা লাগিয়ে চলে গেল। ঘরের জানালাগুলো ভারী শিক দিয়ে আটকানো।

এক কোণে একটা নীচু আসনে বসে আছে একটি নারী। তার উপর চোখ পড়তেই বার্থা কির্চার চমকে উঠল। এ যে তারই মত এক শ্বেতাঙ্গিনী। বৃদ্ধ বয়স, বিবর্ণ নীল চোখ, তোবড়ানো দন্তহীন মুখ বলীরেখায় আকীর্ণ।

দুর্বলদেহ বৃদ্ধা দুই হাতে লাঠিতে ভর দিয়ে স্খলিত পায়ে মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "তুমি কি বাইরের জগৎ থেকে এসেছ? ঈশ্বর করুন, তুমি যেন আমার এই ভাষা বুঝতে ও বলতে পার।"

মেয়েটি সোল্লাসে বলে উঠল, "ইংরেজী ভাষা তো? সেটাই তো আমার ভাষা।"

বৃদ্ধা বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এ ভাষায় যে আর কোনদিন কারও সঙ্গে কথা বলতে পারব তা ভাবি নি। ষাট বছর ধরে শুধু এদের হ-য-ব-র-ল ভাষাই বলেছি। হায় বেচারি! তুমি ওদের হাতে পড়লে কেমন করে?"

বার্থা কির্চার সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, "তুমি একজন ইংরেজ? ষাট বছর এখানে আছ?"

"হ্যাঁ। ষাট বছর আমি এই প্রাসাদের বাইরে যাই নি।" হাড়-জিরজিরে হাতটা বাড়িয়ে বলল, "এস। অনেক বয়স হয়েছে। বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। এস। এই আসনে আমার পাশে বস।"

মেয়েটিকে নিয়ে আসনে বসে বৃদ্ধা বলল, "আহা, লক্ষ্মী মেয়ে! কিন্তু বড়ই বেচারি! এখানে আসার আগে তোমার মরাও ভাল ছিল। প্রথমে আমিও মরতে পারতাম, কিন্তু আশা করেছিলাম একদিন না একদিন কেউ এসে আমাকে উদ্ধার করবে। কিন্তু কেউ এল না। এবার বল, তুমি কেমন করে এদের খপ্পরে পড়লে।"

মেয়েটি সংক্ষেপে সব কথাই বলল। সব শুনে বৃদ্ধা শুধাল, "তাহলে তোমার সঙ্গে একটি ছেলেও আছে?"

"হ্যাঁ, কিন্তু সে যে কোথায় আছে, তাকে নিয়ে এরা কি করেছে, কিছুই আমি জানি না।"

'কোনদিন জানবেও না। কেউ জানতে পারে না।"

বৃদ্ধা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটু পরে মেয়েটি শুধাল, "এরা কারা? এরা তো আমাদের মত নয়। আর তুমিই বা এখানে এলে কেমন করে?"

আসনে দুলতে দুলতে বৃদ্ধা বলতে শুরু করল; সে অনেক—অনেক দিন আগেকার কথা। ওঃ, কতদিন আগে! আমার বয়স তখন মাত্র বিশ বছর। খুবই সুন্দরী ছিলাম। বাবা ছিল মধ্য আফ্রিকার একজন মিশনারী। একদিন সেখানে হানা দিল একদল আরব ক্রীতদাস-ব্যবসায়ী। ছোট গ্রামের অন্য নারী-

পুরুষের সঙ্গে তারা আমাকেও নিয়ে গেল।

"তারপর নদী, নালা, প্রান্তর, পাহাড় পেরিয়ে সে এক দীর্ঘ যাত্রা। ক্রমে দেখা দিল দিকচিহ্নহীন ঊষর মরুভূমি। তাদের হাবভাবে ও কথাবার্তায় বুঝলাম, তারা পথ হারিয়েছে।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কাতর হয়ে বন্দী নিগ্রোরা একে একে পথের মাঝখানেই মরতে লাগল। ক্ষিধে মিটতে লাগল ঘোড়ার মাংস কেটে কেটে। তারপর মড়ক লাগল আরবদের মধ্যেও। আর শেষ পর্যন্ত এই দেশে এসে পৌঁছলাম মাত্র দু'জন—আমি ও আরব সর্দার। আর পৌঁছেই বন্দী হলাম এদের হাতে—ঠিক যে ভাবে তুমি বন্দী হয়েছ।

"তোমার মতই আমাকেও তারা এই প্রাসাদে নিয়ে এল। আরব সর্দারকে নিয়ে গেল অন্য কোথাও। তার যে কি হয়েছে তা জানি না। তখন রাজা ছিল পঞ্চবিংশতি আগো। তারপর থেকে অনেক রাজা দেখলাম। সে বড় ভয়ংকর মানুষ। কি জান, এরা সকলেই ভয়ংকর।"

"কিন্তু এদের হয়েছে কি?" মেয়েটি শুধাল।

বৃদ্ধা বলল, "এরা এক পাগল জাত। তুমি কি তা বুঝতে পার নি? এদের মধ্যে ভাল কারিগর আছে, ভাল চাষী আছে, কিছুটা আইন-শৃংখলাও আছে।"

"এরা সব পক্ষীকে ভক্তি করে কিন্তু এদের প্রধান দেবতা কাকাতুয়া। এই প্রাসাদের একটা খুব সুন্দর ঘরে একটি কাকাতুয়া আছে। সেই এদের দেবাধিপতি। সে খুব বুড়ো। আগো আমাকে যা বলেছিল তা সত্যি হলে সেটার বয়স এখন তিনশ' বছরের বেশী হবার কথা। এদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত অদ্ভুত। আমার তো মনে হয় যুগ যুগ ধরে সেই সব অনুষ্ঠান পালনের ফলেই এরা এই রকম একটা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন উন্মাদ জাতিতে পরিণত হয়েছে।"

মেয়েটি সবিস্ময়ে বলল, "ষাট বছর তুমি এখানে আছ, অথচ এরা তোমার কোন ক্ষতি করে নি?"

"ক্ষতি করে নি তাতো বলি নি। এরা আমাকে মেরে ফেলে নি এই যা।"

মেয়েটি ইতস্তত করে বলল, "কিছু মনে করো না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। তোমাকে নিয়ে এরা কি করেছে? মানে—তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছে?"

বৃদ্ধা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "এদের কাছে তুমি ততক্ষণই নিরাপদ যতক্ষণ এখানকার মেয়েদের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারবে।"

"কি বলতে চাও তুমি?"

"এই ষাট বছর কোন নারীকে আমার কাছে ঘেঁসতে দেওয়া হয় নি। আজও আমাকে কাছে পেলে তারা মেরে ফেলবে। কেন জানি না এখানকার পুরুষরা ভীরু। কিন্তু মেয়েদের হাত থেকে ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।"

"তুমি বলতে চাও, পুরুষরা আমার কোন ক্ষতি করবে না ?"

একটু চুপ করে থেকে বৃদ্ধা বলতে লাগল, "পঞ্চবিংশতি আগো আমাকে তার রাণী করেছিল। অবশ্য তার আরও অনেক রাণী ছিল। আমি এখানে আসার দশ বছরের মধ্যে সে খুন হয়। তারপর আর এক রাজা এসে আমাকে রাণী করল। আজ আমি সকলের বড় রাণী। এখানকার স্ত্রীরা বেশী দিন বাঁচে না। খুন-খারাপি তো লেগেই আছে; তার উপর বিকৃত মানসিকতার জন'ই অনেকেই আত্মহত্যার পথটাই বেছে নেয়।"

কিছুক্ষণ দুজনই চুপ।

প্রথম কথা বলল বার্থা কির্চার, "এখান থেকে পালাবার কি কোন পথ নেই ?"

গরাদে-দেওয়া জানালার দিকে আঙুল বাড়িয়ে রাণী বলল. "দেখতেই তো পাচ্ছ। দরজার বাইরে আছে সশস্ত্র খোজা। তাকে পার হয়ে রাস্তায় যাবে কেমন করে ? যদি বা রাস্তায় গেলে, নগর পেরিয়ে সদর-ফটকে যাবে কেমন করে ? কোন অলৌকিক যোগাযোগের ফলে সে ফটক যদি বা পার হলে, কালো সিংহদের এড়িয়ে জঙ্গলের পথ পার হবে কেমন কবে ?" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল. "না, এখান থেকে পালাবার কোন উপায় নেই।"

ঠিক সেই সময় একটি পীতবসনধারী সৈনিক ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে কি যেন বলল।

বৃদ্ধা বার্থাকে বলল, "রাজার হুকুম হয়েছে তোমাকে ভালভাবে সাজিয়ে তার কাছে পাঠাতে হবে।"

"ভালভাবে সাজিয়ে মানে কি ?" মেয়েটি শুধাল।

"তোমাকে স্নান করিয়ে আমার মত এই রকম রাণীর পোশাক পরাতে হবে।"

মেয়েটি আকুল স্বরে বলল, "পালাবার কোন পথ কি নেই ?"

"আছে—একটিমাত্র পথ," বলে রাণী তার দিকে একখানা ছুরি বাড়িয়ে দিল।

স্নান সেরে সাজ-পোশাক পরে রক্ষীদের সঙ্গে বার্থা কির্চার চলল রাজদর্শনে।

সকলে যখন পাশের ঘরে রাজার জন্য অপেক্ষা করছে তখন আর একটি ঘর থেকে ঢুকল একটি সুন্দর যুবক। পরিধানে রাজকীয় পোশাক। তাকে দেখেই সৈনিকরা উঠে দাঁড়াল।

জনৈক সঙ্গী অস্ফুট স্বরে বলল, "যুবরাজ মেটাক।"

দরবার কক্ষের দিকে দু'পা এগোতেই যুবরাজের চোখ পড়ল বার্থা কির্চারের দিকে। হঠাৎ থেমে সে নিবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে এড়াবার জন্য বার্থা মুখটা ফিরিয়ে নিতেই হঠাৎ মেটাকের সমস্ত

শরীর থর্‌ থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। তীব্র স্বরে হুংকার দিয়ে একলাফে এগিয়ে এসে মেয়েটিকে কাছে টেনে নিল।

শুরু হয়ে গেল হট্টগোল। যে রক্ষীরা মেয়েটিকে রাজার কাছে নিয়ে যেতে এসেছিল তারা খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে যুবরাজকে ঘিরে নৃত্য শুরু করে দিল, যুবরাজের গায়ে হাত দেবার সাহস তাদের নেই। বাকি সব রক্ষীরাও পাগলা যুবরাজের প্রতি সহানুভূতি দেখাতে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে এল।

পাগলের কবল থেকে নিজেকে ছাড়াবার জন্য বার্থা প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু যুবরাজের বাহুর দৃঢ় বন্ধনে সে তখন শিশুর মত অসহায়। অনায়াসে তাকে বয়ে নিয়ে মেটাক উল্টো দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

১৭—টারজনের আবির্ভাব

সেইদিনই সন্ধ্যার ঠিক আগে একজন ক্লান্ত বৈমানিক দ্বিতীয় রোডেশীয় বিমান বাহিনীর কর্নেল ক্যাপেলের হেডকোয়ার্টারে ঢুকে স্যালুট করে দাঁড়াল।

কর্নেল জিজ্ঞাসা করল, "আরে টম্পসন, কি খবর? অন্য সকলেই তো ফিরে এসেছে। ওল্ডউইক বা তার বিমানের কোন পাত্তাই করতে পারে নি। মনে হচ্ছে, তোমারও যদি সেই দশা হয়ে থাকে তাহলে এ প্রচেষ্টা ছেড়েই দিতে হবে।"

যুবক অফিসার বলল, "তা করতে হবে না। আমি বিমানটির দেখা পেয়েছি।"

কর্নেল ক্যাপেল বলে উঠল, "বল কি হে! কোথায়? ওল্ডউইকের কোন হদিস পেয়েছ?"

"সে অনেক ভিতরে একটা জঘন্য গিরি-খাতের মধ্যে। বিমানটা দেখতে পেয়েছি ঠিকই কিন্তু সেখানে নামতে পারি নি। একটা সিংহ অনবরত সেটাকে চক্কর মারছে। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত চলে এসেছি"

"তোমার কি মনে হয় উল্ডউইক সিংহের পেটে গেছে?"

লেফ্‌টেন্যান্ট টম্পসন বলল, "না, সে রকম মনে হল না। বিমানের কাছাকাছি কোথাও সিংহটা শিকার ধরে খেয়েছে এমন কোন চিহ্ন দেখতে পাই নি। যখন দেখলাম কিছুতেই নীচে নামা সম্ভব নয় তখন গিরি-খাতের এদিক থেকে ওদিকে বার কয়েক উড়ে ভাল করে দেখলাম। একটা আশ্চর্য জিনিস দেখে এলাম। কয়েক মাইল দক্ষিণে একটা ছোটখাট উপত্যকা - গাছপালায় ঢাকা, আর তারই ঠিক মাঝখানে—আমার মাথা খারাপ হয়েছে বলে মনে করবেন না—একটা সুন্দর শহর: রাস্তাঘাট, বড় বড় বাড়ি, গম্বুজ, মিনার—সব কিছু।"

প্রবীণ অফিসার সহানুভূতির সঙ্গে বলল, "বুঝতে পারছি টম্পসন, তোমার

উপর দিয়ে খুব ধকল গেছে। যাও, আচ্ছা করে একটা ঘুম লাগাও। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

যুবকটি মাথা নেড়ে বলল, "মাফ করবেন স্যার, আমি সত্যি কথাই বলছি। আমার ভুল হয় নি। সে জায়গাটার উপর দিয়ে আমি বার কয়েক চক্কর মেরেছি। এমনও তো হতে পারে যে ওল্ডউইক সেখানেই গেছে—অথবা সেখানকার লোকরাই তাকে বন্দী করেছে।"

"শহরে লোকজন ছিল?" কর্নেলের প্রশ্ন।

"হ্যাঁ। রাস্তায় লোকজন দেখেছি।"

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা বড় ডকসন গাড়ি হেডকোয়ার্টারের সামনে এসে থামল। আর এক মিনিট পরেই জেনারেল স্নাট্‌স্ গাড়ি থেকে নেমে ভিতরে ঢুকল। কর্নেল ক্যাপেল চেয়ার থেকে উঠে স্যালুট করল। যুবক লেফ্‌টেন্যাণ্টটিও স্যালুট করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

জেনারেল বলল, "এই পথেই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম নেমে একটু গল্প করে যাই। ভাল কথা, লেফ্‌টেন্যাণ্ট ওল্ডউইকের খোঁজ-খবর কতদূর এগোল? এই তো টম্পসন দাঁড়িয়ে আছে। সেও তো অনুসন্ধানের কাজে গিয়েছিল বলে শুনেছি।"

ক্যাপেল বলল, "ঠিকই শুনেছেন। সেই ফিরেছে সকলের শেষে। লেফ্‌টেন্যাণ্টের বিমানটাকে সে দেখেছে।" তারপন টম্পসনের দেওয়া বিবরণ সবই তাকে শোনানো হল। তখন দুই অফিসার ও বৈমানিক মিলে টম্পসন-বর্ণিত শহরটার অবস্থানের একটা নক্সা তৈরী করে ফেলল।

স্নাট্‌স্ বলল, "এ দেশটা যেমন বিশাল তেমনি দুরধিগম্য; তবু ছেলেটিকে খুঁজে পেতে আমরা চেষ্টার কসুর করব না। একটা ছোট বাহিনীকে সেখানে পাঠাতে হবে। খাদ্য ও জলসহ বেশ কয়েকটা মোট লরিসহ একটা বা দুটো কোম্পানি পাঠাও। পশ্চিমে যতদূর পর্যন্ত লরি চলে সেখানে একটা 'বেস-ক্যাম্প' বসাও। গোটা দুই বিমানও পাঠাবে সেই সঙ্গে। তারাই 'বেস-ক্যাম্পে'র সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। তোমার বাহিনীকে কখন পাঠাতে পারবে?"

ক্যাপেল জবাব দিল, "আজ রাতেই লরি বোঝাই করা হবে, আর কাল সকাল একটা নাগাদ যাত্রা শুরু হবে।"

"খুব ভাল। আমাকে মাঝে মাঝে খবর জানিও।" বলে দু'জনের অভিবাদনের জবাব দিয়ে জেনারেল বেরিয়ে গেল।

একলাফে দ্রাক্ষালতাটা ধরে ঝুলে পড়েই টারজন বুঝতে পারল যে সিংহটাও কাছাকাছিই আছে, আর তার জীবন নির্ভর করছে লতাটার শক্তির উপরে। একটু পরেই সে যখন বুঝতে পারল যে দ্রাক্ষালতা তার হাতের মত মোটা আর

তার শিকড়-বাকড়গুলো পুরনো দেয়ালের গায়ে বেশ শক্ত হয়েই বসে গেছে তখন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আর এক ঝুলে প্রাচীরের উপরে উঠে গেল।

মাত্র কয়েক ফুট নীচেই বাড়ির ছাদটা দেখতে পেয়ে তার উপর লাফিয়ে পড়া-মাত্রই একটি ভারী দেহ পিছন থেকে তার উপর লাফিয়ে পড়ে বাদামী দুই বাহু দিয়ে তার কোমরটা জড়িয়ে ধরল।

অসুবিধাজনক অবস্থায় ধরা পড়ে প্রথমে টারজন খুবই অসহায় বোধ করল। কিন্তু বিপদে ভড়কে যাবার পাত্র সে নয়। মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। শরীরটাকে যতদূর সম্ভব সোজা করে পিছনের লোকটার শরীরের সঙ্গে একেবারে মিশে গিয়ে হঠাৎ এমনভাবে একটা ঝটকা মারল যে পিছনের লোকটা পাল্টি খেয়ে সামনে ছিটকে পড়ল, আর সেই ফাঁকে টারজন নিজেকে মুক্ত করে তার মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। লোকটি তার মতই বিশালবপু; কটিবন্ধে খাপেবদ্ধ তরবারি। কিন্তু তরবারি চালাবার সুযোগ টারজন তাকে দিল না। খাপ থেকে তরবারি টেনে বের করামাত্রই টারজন চকিতে তার পা ধরে একটা হেঁচকা টান মারতেই সে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে টারজন তার বুকের উপর বসে বাঁ হাতে চেপে ধরল তার তরবারিশুদ্ধ কব্জিটা আর ডান হাতে চেপে ধরল তার কণ্ঠনালি। গোঁ-গোঁ করতে করতে লোকটির জিভ বেরিয়ে এল, চোখের মণি ঠেলে উঠল। তার ভবলীলা সাঙ্গ হল।

যুবক অফিসার ও মেয়েটিকে খুঁজতে হলে তাকে শহরের পথে পথে ঘুরতে হবে। কিন্তু এ রকম প্রায় নগ্নদেহে পথে নামলে সে তো অচিরেই ধরা পড়ে যাবে। কাজেই একটা ছদ্মবেশ দরকার। তখনই পাশে পড়ে থাকা মৃতদেহটার দিকে চোখ পড়তেই একটা ফন্দি তার মাথায় এসে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পরাজিত রক্ষীর কাকাতুয়া-মার্কা পোশাকটা গায়ে চড়িয়ে কোমরবন্ধটা কোমরে জড়িয়ে নিল। অবশ্য পোশাকের তলে স্বর্গত বাবার শিকার-ছুরিটাকে লুকিয়ে রাখল। ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ভেবে নিজের অন্য অস্ত্রগুলিকে প্রাচীরের কাছে নিয়ে নীচের জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঘাসের দড়িটাকে ফেলে যেতে মন সায় দিল না। ঐ দড়ি আর ছুরিই যে তার চিরদিনের সঙ্গী। কোমরবন্ধটা খুলে দড়িটাকে কোমরে জড়িয়ে নিয়ে তার উপরে চাপিয়ে দিল তরবারিশুদ্ধ কোমরবন্ধটা। এইভাবে বেশ ভাল রকম ছদ্মবেশে টারজন শহরের পথে নামল।

রাতের অন্ধকারে এ-পথ সে-পথ ঘুরতে ঘুরতে একসময় হঠাৎ তার চোখে পড়ল, রাস্তার পুব দিকের বাড়ির ছাদ থেকে একটি মনুষ্যমূর্তি নীচে নামবার চেষ্টা করছে। তা দেখে টারজনের মনে কৌতূহল জাগল।

১৮—গুপ্ত ঘরে

স্মিথ-ওল্ডউইক যখন বুঝল, সিংহপরিবৃত এই বন্ধ বাগানে সে একেবারে একা, অসহায়, তখন একটা অসংযত ত্রাস যেন তাকে পেয়ে বসল। পিছন ফিরে সিংহের দিকে তাকাবার সাহস পর্যন্ত হল না। সেদিকে পিঠ দিয়ে ফটকের গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগল। মাথার মধ্যে কী যেন ঘুরতে শুরু করল। হঠাৎ চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেল। তার অসার দেহটা ফটকের নীচে এলিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল কে জানে। আবার যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন চোখ মেলেই সে দেখল, পাশে দাঁড়িয়ে একটা সিংহ তার মুখ চাটছে। অসহায় আতংকে তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল। অকরুণ ভাগ্য এমন নিষ্ঠুর খেলা বোধ হয় এর আগে আর কোন মানুষকে নিয়ে খেলে নি। তার মনে হল, এমন শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আরও কিছুক্ষণ থাকলে আতংকেই সে পাগল হয়ে যাবে। তার চাইতে অনেক ভাল দ্রুত মৃত্যু।

লেফ্‌টেন্যান্ট হ্যারল্ড পার্সি স্মিথ-ওল্ডউইক শুধুমাত্র একজন ইংরেজ ভদ্রলোক ও অফিসারই নয়, সে একটি সাহসী যুবক। যা থাকে কপালে, মৃত্যু হয় তো হোক, তবু এভাবে তিলে তিলে মৃত্যু-যন্ত্রণা আর নয়। ইংরেজ যুবকটি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। ফটকের গরাদ ধরে শ্বাস টানল। তা দেখে সিংহটা প্রথমে গর্‌-র্‌ গর্‌-র্‌ করলেও পরে কি মনে করে উদাসভাবে সেখান থেকে চলে গেল। যুবকও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়ে সামনে তাকাল। ঘেরা জায়গাটার এক কোণে একটা বড় গাছ ডাল-পালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ঠিক পাশেই রয়েছে একটা খোলা জানালা। কোন রকমে একবার সেখানে পৌঁছতে পারলেই গাছে চড়ে এই জানালা-পথে এখান থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। কিন্তু আশেপাশে যে অনেক সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের এড়িয়ে গাছের নীচে যাবে কেমন করে? সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, এখানকার সিংহরা মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত। হয়তো তাকে নিয়ে কোন রকম মাথাব্যথাই তাদের হবে না।

বাস্তবেও কিছু হল না। স্মিথ-ওল্ডউইক ভয়ে ভয়ে সিংহদের পাশ কাটিয়ে গাছের নীচে পৌঁছে গেল। তারা চোখ তুলেও তাকাল না। তারপরই গাছে চড়ে উপরে উঠে জানালা দিয়ে ঘরের মেঝেতে নেমে গেল।

তখন ঘরে ঢুকল একটি সুন্দরী তরুণী। বুকের নীচ থেকে জড়ানো হাল্কা পোশাকে তার দেহলতা প্রায় অনাবৃত। মুখে জড়বুদ্ধির সুস্পষ্ট প্রকাশ।

মেয়েটি তাদের নিজস্ব ভাষায় সুললিত কণ্ঠে কি যেন বলতে বলতে এগিয়ে এল। যুবকটি কোন রকম বাধা দেবার আগেই দুই বাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে মেয়েটি তীব্র আবেগে তাকে বার বার চুমো খেতে লাগল।

তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে যুবক সাধ্যমত চেষ্টা করল, কিন্তু তরুণী তাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরল। হঠাৎ যুবকের মনে পড়ল, মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষদের কোন কাজে বাধা না দিয়ে তাতে সায় দিলেই ভাল ফল পাওয়া যায়। তাই যদি এই তরুণীর সাহায্যে এখান থেকে পালাবার একটা ফন্দি করা যায় সেই আশায় যুবকও চোখ বুজে তাকে আরও কাছে টেনে নিল।

সেই অবস্থাতেই পাশের ঘর থেকে ঢুকল একটি লোক। স্মিথ-ওল্ডউইক তাকে দেখেই নিজেকে তরুণীর বাহু-বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নিতে সচেষ্ট হল। লোকটির দিকে পিছন ফিরে থাকায় তরুণী এতক্ষণ তার উপস্থিতি টের পায় নি। এবার ফিরে তাকাতে তার ক্রোধ-কষায়িত মুখের উপর চোখ পড়তেই ভয়বিহ্বলা হরিণীর মত সে চকিতে যুবককে ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল পাশের ঘরে। ভয়ে হতবাক যুবক সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

নবাগত লোকটি মুহূর্তের জন্য তীব্র রোষে দিশেহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরেই উন্মাদ-কণ্ঠে চীৎকার করে উঠে তরবারি কোষমুক্ত করে ছুটে গেল যুবকের দিকে। স্মিথ-ওল্ডউইকের বুঝতে দেরী হল না যে তার বাঁচবার মাত্র একটি পথই খোলা আছে—পিস্তল বের করে সে সরাসরি গুলি ছুঁড়ল আক্রমণকারীর বুক লক্ষ্য করে। লোকটির মুখ থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বের হবার আগেই তার প্রাণহীন দেহটা মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়ল স্মিথ-ওল্ডউইকের পায়ের কাছে। কয়েক সেকেণ্ড ঘরের মধ্যে কবরের নিস্তব্ধতা।

হঠাৎ বাইরের দরজায় জোর করাঘাতের শব্দ শোনা গেল। তরুণী চকিতে সরে এসে যুবকের হাত ধরে তাকে অনুসরণ করতে বলল। ঘরের পালংকের মাথার কাছে একটা ছোট দরজা ছিল। সেটা খুলে যুবকটিকে পাশের গুপ্তঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে পর্দাটা ভাল করে টেনে দিয়ে তরুণী ফিরে এসে দরজা খুলে দিল। পর্দার ফাঁক দিয়ে যুবক নিজে লুকিয়ে থেকে সবই দেখতে লাগল।

ঘরে ঢুকল একটি তরুণ। তার হাত ধরে এনে তরুণী তাকে সোফায় বসিয়ে দিল। নিজেও তার পাশে বসল। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে ধরল। চুমোর পর চুমো খেতে লাগল।

হঠাৎ কি মনে করে তরুণী প্রেমিকের বাহু-বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল। ভুরু কুঁচকে একবার পাশের গুপ্তঘরের দিকে তাকাল। তারপর প্রেমিকের কানে কানে কি যেন বলতে বলতে বার বার তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল গুপ্ত ঘরের দিকে।

স্মিথ-ওল্ডউইক পরিষ্কার বুঝতে পারল ঐ বুদ্ধিহীনা তরুণী তাকে ধরিয়ে দেবার মতলব করছে। সে তো বিশ্বাসঘাতিনী। কোন প্রেমিকের প্রতিই তার তিলমাত্র দরদ নেই। কিন্তু তাকে তো বাঁচতে হবে। যুবক মুখ ফিরিয়ে গুপ্তঘরের চারদিক খুঁজে ফিরতে লাগল।

বাইরে পুরুষ ও নারী কণ্ঠের ফিস্ ফিস্ শব্দ। তরুণের তরবারি কোষমুক্ত হল। পা টিপে টিপে দু'জন এগিয়ে এল। গুপ্ত ঘরের দরজায় এসে তরুণী এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে আঙুল বাড়িয়ে কি যেন ইঙ্গিত করল। তরুণ একলাফে এগিয়ে গিয়ে কোষমুক্ত তরবারিকে সজোরে আমূল বসিয়ে দিল পর্দার বুকে।

বাধা দেওয়া পণ্ডশ্রম বুঝতে পেরে বার্থা কির্চার যুবরাজ মেটাকের হাত থেকে ছাড়া পাবার চেষ্টা করল না। যুবরাজ তাকে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে লাগল। তার দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটার রকম দেখেই বার্থা বুঝতে পারল, রাজার ছেলে হলেও ধরা পড়লে তারও যে কঠোর সাজা হবে সেটা মেটাক ভাল করেই জানে।

আর এক পাগলা রাজার জন্য পাগলা কারিগর দ্বারা পরিকল্পিত "ভুলভুলাইয়া"র মত এই গোলক ধাঁধা প্রাসাদের মধ্যে ছুটতে ছুটতে একসময় পাগলের ছেলেও যে পথ হারিয়ে ফেলতে পারে, তাতেও তো বিস্ময়ের কিছু নেই।

বাস্তবে কিন্তু সেটাই ঘটল। তখন তারা প্রাসাদের কোন্ তলায় বা কোন্ অংশে আছে মেটাক সেটাও সঠিক ধারণা করতে পারে নি। হঠাৎ একটা বন্ধ দরজা খুলে উজ্জ্বল আলোকিত ঘরে ঢুকে পড়েই দেখতে পেল সৈনিকপরিবৃত হয়ে রাজা বসে আছে সিংহাসনে, আর তার পাশেই রাণীর মত বসে আছে একটা প্রকাণ্ড সিংহী। বার্থা কির্চারের মনে পড়ল, আগেই সে শুনেছিল যে রাজার অনেক রাণী আছে, আর তারা সকলেই মানব সন্তান নয়।

তাদের দুজনকে ঘরে ঢুকতে দেখেই অসংযত ক্রোধে চীৎকার করতে করতে রাজা সিংহাসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হুকুমের পর হুকুম জারি করতে লাগল। কিন্তু সে সব হুকুমের বয়ান কানে ঢোকার আগেই মেটাক মেয়েটিকে নিয়ে যেমন ঢুকেছিল তেমনই সবেগে বেরিয়ে গেল।

শত শত সৈনিক চীৎকার-চেঁচামেচি করতে করতে তার পিছনে ছুটল রাজাদেশে তাদের ধরতে। বার্থা কির্চারকে নিয়ে মেটাক সমানে ছুটছে। এক জায়গায় পৌঁছে একেবারে খাড়া উৎরাই একটা বারান্দা-পথ পেয়ে মেটাক সেটা ধরে সোজা নেমে গেল অনেক অনেক নীচে। সবেগে ঢুকল মাটির নীচেকার একটা আলোকিত ঘরে।

ঘরের মাঝখানে বেশ বড় একটা পুকুর। তার জল মেঝে থেকে কয়েক ইঞ্চি নীচে। পিছনে ধেয়ে-আসা সৈনিকরা ঘরে ঢুকে দেখল, বন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে মেটাক সেই পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সৈনিকরা উত্তেজিতভাবে অনেকক্ষণ পুকুরের চারধারে ঘুরল, কিন্তু দুজনের একজনকেও জল থেকে উঠতে দেখল না।

গুপ্ত ঘরের দেয়াল হাতড়াতে হাতড়াতে স্মিথ-ওল্ডউইক একটা কাঠের দরজা পেয়ে গেল। খুব সাবধানে নিঃশব্দে দরজার খিল খুলতেই চোখে পড়ল, বাইরে শুধু চাপ চাপ অন্ধকার। খুব সাবধানে পা ফেলে ফেলে বাইরে গিয়ে সে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

অন্ধকারে একটা সরু বারান্দা ধরে এগিয়ে কয়েক গজ যেতেই সে ধাক্কা খেল মইয়ের মত একটা বস্তুতে। ভাল করে হাতড়ে বুঝতে পারল সেটা মই-ই বটে, আর উঠে গেছে উপরের দিকে। সামনের পথ দেয়ালে অবরুদ্ধ। অগত্যা সে মই বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। মইয়ের দু'তিনটে ধাপ পার হতেই মাথায় একটা জোর ঠোক্কর খেয়ে একটা হাত মাথার উপর তুলেই বুঝতে পারল, ছাদের একটা চাপ-দরজার সঙ্গে তার মাথা ঠুকে গেছে। অল্প চেষ্টাতেই দরজাটাকে ঠেলে একটু উঁচু করতেই তার ফাঁক দিয়ে চোখের সামনে ফুটে উঠল রাতের আফ্রিকার তারায় ভরা আকাশ।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুকের ভিতর থেকে। ধীরে ধীরে পাল্লাটাকে একপাশে সরিয়ে দ্রুত চারদিকে তাকিয়ে বুঝল, ধারে-কাছে কেউ কোথাও নেই। ছাদের উপর উঠে পাল্লাটাকে আবার নামিয়ে দিল। এবার সে মুক্ত—স্বাধীন।

প্রাচীর বেয়ে একটা খিলানের নীচে নেমে গেল। প্রাথমিক সাফল্যে মনে বইল খুশির হাওয়া। আর তখনই পিছনে সামান্য শব্দ শুনে ফিরে তাকাতেই দেখল, পীতবসনধারী দীর্ঘদেহ একটি সৈনিক তার একেবারে সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

১৯—গুপ্ত ঘরের বাইরে

স্মিথ-ওল্ডউইকের প্রথম চিন্তাই হল, একটা গুলিতে সৈনিককে সাবার করে দিয়ে দুই পা যেদিকে যায় সেই দিকে ছুটে পালাবে, কারণ এর হাতে পড়া মানেই আবার বন্দী হওয়া এবং এক বিদেশী বন্দীর প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করা। সেই কথা ভেবে পিস্তলের জন্য পাশ-পকেটে হাত ঢোকাতেই একটা কঠিন মুঠি তার কব্জিটাকে চেপে ধরল, আর একটি নিম্নকণ্ঠ ইংরেজিতে বলে উঠল, "লেফ্‌টেন্যাণ্ট, আমি অরণ্যরাজ টারজন।"

দীর্ঘ শারীরিক কষ্ট ভোগের পর এই আকস্মিক গভীর স্বস্তিবোধ স্মিথ-ওল্ডউইককে হঠাৎ যেন এক দুর্বল শিশুতে পরিণত করল। টারজনের হাত ধরে কোন রকমে দাঁড়িয়ে থেকে বলে উঠল, "তুমি? তুমি! আমি তো ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ।"

টারজন বলল, "না, মরি নি। দেখছি তুমিও মর নি। কিন্তু মেয়েটির খবর কি?"

ইংরেজ যুবক উত্তর দিল, "এখানে আসার পর থেকে আর তাকে দেখি নি। শহরে আনার পরেই আমাদের আলাদা করে দিয়েছে। তাকে নিয়ে গেল রক্ষীরা, আর আমাকে ফেলে দিল সিংহের আস্তানায়। সেই থেকে তাকে দেখি নি।"

টারজন বলল, "তাকে তো খুঁজে বের করতেই হবে। হতে পারে সে একটি জার্মান গুপ্তচর, তবু সে নারী—শ্বেতাঙ্গিনী—তাকে আমরা এখানে ফেলে যেতে পারি না।"

"কিন্তু কেমন করে তার খোঁজ আমরা পাব ?" ইংরেজ যুবক প্রশ্ন করল।

টারজন জবাব দিল, "তার খোঁজেই এতদূর এসেছি। খুব বেশী ভুল যদি না করে থাকি, তাহলে তাকে খুঁজে পাবই।"

স্মিথ-ওল্ডউইক বলল, "আমিও তোমার সঙ্গে যাব। আমি হয়তো বিশেষ কোন কাজে লাগব না, তবু একজনের চাইতে দু'জন ভাল।"

"ঠিক আছে, চলে এস।" বলেই ইংরেজ যুবকটি কোন কিছু বুঝবার আগেই টারজন তাকে পিঠের উপর ফেলে নীচু খিলানটার দিকে ছুটে গেল। অতি অনায়াসে খিলান বেয়ে ছাদের উপর উঠে গেল। তারপর স্মিথ-ওল্ডউইকের নির্দেশমত যে গুপ্ত পথে সে পালিয়েছিল সেই পথ ধরেই দু'জন নীচে নেমে গেল।

দু'জন আবার হাজির হল সেই গুপ্ত ঘরে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখল, পাশের ঘরে সেই তরুণী ও তরুণ একটা নীচু টেবিলের দু'পাশে বসে আছে। একটি নিগ্রো খাবার পরিবেশন করছে।

টারজনের চোখ নিগ্রোটির উপর নিবদ্ধ। এর সাহায্য নিয়েই তাকে কার্যসিদ্ধি করতে হবে। এখন সুযোগের অপেক্ষা। একসময় কি একটা জিনিস নিতে নিগ্রোটি গুপ্ত ঘরের খুব কাছাকাছি এসে উপুড় হয়ে হাত বাড়াতে টারজন তার ভাষাতেই ফিস্ ফিস্ করে বলল, "ওয়ামাবোর দেশে যদি ফিরে যেতে চাও তো একটি কথা বলো না। আমি যা বলি তাই কর।"

ভয়ার্ত চোখে কালা আদমিটি পর্দার দিকে তাকাল। টারজন বুঝল, সে ভয়ে কাঁপছে। আবার বলল, "ভয় নেই। আমরা তোমার বন্ধু।"

এবার নিগ্রোটিও নীচু গলায় বলল, "এই নিরেট দেয়ালের ভিতর থেকে কে তুমি দেবতা কথা বলছ ? অসহায় ওটোবু তোমার জন্য কি করতে পারে ?"

টারজন বলল, "শুধু এইটুকু। আমরা দু'জন ঘরে ঢুকব। এই দুটি নর-নারী যাতে পালাতে না পারে, বা কোন রকম হল্লা না করতে পারে সে ব্যাপারে তুমি আমাদের সাহায্য করবে।"

ওটোবু বলল, "ওরা যাতে ঘর থেকে বের হতে না পারে সে ব্যবস্থা আমি করব। কিন্তু ওদের হল্লাকে ভয় করো না। এই দেয়াল এমনভাবে তৈরী যে তার ভিতর দিয়ে কোন শব্দ বাইরে যেতে পারে না। তাছাড়া, এখানকার

সর্বত্র সব সময় চলেছে পাগলদের চীৎকার-চেঁচামেচি। তার মধ্যে এদের চীৎকার কারও কানে ঢুকবে না। আমি যাই। তোমার কথা মত কাজ করি গে।"

টারজন দেখল, ওটোবু তরুণ-তরুণীকে আর এক পাত্র খাবার পরিবেশন করে তরুণটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ইসারায় যেন টারজনকেই বলতে চাইল, "কর্তা, আমি প্রস্তুত।"

সঙ্গে সঙ্গে টারজন পর্দা সরিয়ে ঘরের ভিতরে পা দিল। তাকে দেখে তরুণটি উঠে দাঁড়াতেই ওটোবু পিছন থেকে তাকে জাপটে ধরল। টারজন ও তার সঙ্গীর দিকে পিছন ফিরে থাকায় তরুণী প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। এবার ওটোবু তার প্রেমিককে জাপটে ধরায় সেও লাফ দিয়ে উঠে গেল তাকে সাহায্য করতে। টারজনও ছুটে গিয়ে তার হাতটা চেপে ধরল। প্রথমে প্রচণ্ড ক্রোধে তরুণীর মুখটা আগুনের মত জ্বলে উঠল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার মুখে ফুটে উঠল সেই বিরস হাসি যার পরিচয় স্মিথ-ওল্ডউইক আগেই পেয়েছে। আসলে এই উন্মাদিনী তরুণী মাত্র দুটি মনোবৃত্তিরই অধিকারিণী—তীব্র ক্রোধ ও অকারণ অনুরাগ; একটা থেকে আর একটায় তার পরিবর্তন বিদ্যুৎগতি।

টারজন ইংরেজ যুবকটিকে বলল, "এক মিনিট এর উপর নজর রাখ ত আমি ঐ লোকটাকে নিরস্ত্র করে ফেলি।" সহজেই সে তরুণের হাত থেকে তরবারি কেড়ে নিল। তারপর নিগ্রোকে বলল, "ওকে বলে দাও, আমাদের কোন ক্ষতি না করলে আমরাও ওর কোন ক্ষতি করব না।"

তরুণের সঙ্গে কথা বলে ওটোবু বলল, "ও জানতে চাইছে তুমি কি চাও।"

টারজন বলল, "আমি জানতে চাই বার্থা কির্চার কোথায়।"

তরুণ জানাল তাকে রাজার প্রাসাদে চালান করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কেন এই প্রশ্ন করায় সে জানল, "কেন আবার? রাজার তাকে চাই বলে।"

সকলেই চুপচাপ। সেই সুযোগে হঠাৎ চীৎকার করে বাইরের লোকজনদের ডাকতে লাগল। ওটোবু ছুটে গিয়ে তার মুখ চেপে ধরল। কিন্তু ততক্ষণে বাইরের লোক এসে দরজায় ধাক্কাধাক্কি শুরু করে দিয়েছে। টারজন সেই দিকে এগিয়ে গেল। তরুণ-তরুণীর পাহারায় রইল ওটোবু।

পাশের ঘরে ঢুকেই টারজন বুঝতে পারল দরজার পাল্লা এত ধাক্কায় অচিরেই ভেঙে পড়বে। স্মিথ-ওল্ডউইকের দিকে ফিরে বলল, "বাইরে ডজনখানেক লোক জমা হয়েছে। তাদের সঙ্গে আমরা দু'জন পেরে উঠব না। অতএব আমরা যে পথে এসেছি সেই পথেই পালাতে হবে। চলে এস, তুমি আগে থাক. আমি পিছনে।"

গুপ্ত ঘরে ঢুকে দুজনই হতবাক। মেঝের উপর পড়ে আছে নিগ্রো ক্রীতদাসের প্রাণহীন দেহ, আর দুই বন্দী হাওয়া হয়ে গেছে।

২০—এক্সুজা থেকে পলায়ন

মেটাক যখন বার্থা কির্‌চারকে ধরে পুকুরের পারে পৌছল তখনও মেটাকের মনোভাব সে বুঝতে পারে নি। কিন্তু মেটাক যখন সবেগে জলে ঝাঁপ দিল তখন সে বুঝতে পারল দুজনে একসঙ্গে মৃত্যু বরণ করাই তার অভিপ্রায়। কিন্তু বার্থা কির্‌চার এভাবে মরতে চায় না। চোখ বুজে সে নীরবে প্রার্থনা করতে লাগল। মেটাক তখনও তাকে নিয়ে জলের নীচে সাঁতার কেটে চলেছে।

একসময় বার্থা কির্‌চার বুঝতে পারস তারা একটা বড় হ্রদে এসে পড়েছে। মাথার উপরে তারাভরা আকাশ; দুই দিকের দিগন্তে গম্বুজ ও মিনারের সিলুয়েট।

একটা মই বেয়ে দু'জন তীরে উঠল। সেখানে অনেক মানুষের ভিড়। কিন্তু কেউ তাদের দিকে নজর দিল না। মেটাক বার্থাকে নিয়ে একটা বড় বাড়িতে ঢুকল। সেখানে অনেক সৈনিক তার সঙ্গী হল। সকলে মিলে হাজির হল একটা বন্ধ দরজার সামনে। সকলের ধাক্কাধাক্কিতে দরজা ভেঙে পড়ল। সৈনিকরা ঘরে ঢুকল। পিছনে যুবরাজ। কিন্তু ভিতরে যা দেখল তাতে ব্যর্থ আক্রোশে ও হতাশায় তারা ফুঁসতে লাগল। মেঝেতে পড়ে আছে প্রাসাদের মালিকের রক্তাক্ত মৃতদেহ আর নিগ্রো ক্রীতদাস ওটোবুর নিষ্প্রাণ দেহ।

যুবরাজ ছুটে গেল জানালায়। নীচেই সিংহদের আস্তানা। সে পথে কারও পক্ষে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাহলে? কোথায় গেল আততায়ী? রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে সে সৈনিকদের বিদায় দিল। কেন কে জানে, বার্থা কির্‌চারই এ সবের জন্য দায়ী। সঙ্গে সঙ্গে তার মুখটা বিকৃত হয়ে গেল, চোখ দুটো গোল গোল হয়ে ঘুরতে লাগল, সারা শরীর কুঁকড়ে যেতে লাগল। ধারালো নখরের মত আঙুলগুলো বেঁকিয়ে সে এগিয়ে গেল বার্থা কির্‌চারের দিকে। সেও আতংকে পিছু হটতে লাগল।

ওটোবুর মৃতদেহের পাশ দিয়ে পিছিয়ে যাবার সময় তার বর্শাটা পায়ে ঠেকতেই বার্থা সেটাকে হাতে তুলে নিল। বিদ্যুৎ গতিতে সেটাকে বাগিয়ে ধরল মেটাকের বুকের দিকে। ফল হল অদ্ভুত। মেটাক হঠাৎ পাগলের মত হো-হো করে হেসে উঠল। হাতের তরবারি উঁচিয়ে ধিন্-ধিন্ করে নাচতে লাগল বার্থাকে ঘিরে।

ধীরে ধীরে সেই উন্মাদ হাসি আবার পরিণত হল ক্রুদ্ধ গর্জনে। হাতের কাছে একটা নীচু টুল পেয়ে সেটাই ছুঁড়ে দিল মেয়েটির মাথা লক্ষ্য করে।

বার্থা বর্শা দিয়ে সেটাকে ঠেকাতে চেষ্টা করল, কিন্তু সম্পূর্ণ সফল হল না; ভারী টুলের ধাক্কায় সে ছিটকে পড়ল পিছনের কোচের উপর, আর সঙ্গে সঙ্গে মেটাক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

স্মিথ-ওল্ডউইক চলেছে আগে আগে, টারজন তার পিছনে। মই বেয়ে উপরে উঠে সে টারজনের দিকে ফিরে বলল, "নীচে নামবার সময় আমরা কি চাপ-দরজার পাল্লাটা টেনে দিয়েছিলাম?"

টারজন বলল, "না তো। ওটা খোলাই ছিল।"

"কিন্তু এখন বন্ধ। তালা দেওয়া। আমি ওটাকে ঠেলে তুলতে পারছি না। চেষ্টা করে দেখ, তুমি হয়তো পারবে।"

সে মই বেয়ে নেমে এল। টারজন অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু চাপ-দরজার ঢাকনা খুলল না। অগত্যা তারা অন্য পথে বের হবার আশায় আবার মই বেয়ে নেমে গেল।

এবার টারজনই আগে চলেছে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। গুপ্তঘরের ওপাশ থেকে ভেসে এল নারী-কণ্ঠের আর্তনাদ: "হে ঈশ্বর, আমাকে দয়া কর।"

চিন্তা-ভাবনার সময় নেই। একলাফে পদা সরিয়ে সে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। পায়ের শব্দ শুনেই পাগল লোকটা মুখ তুলে তাকাল। তার বাবার সৈনিকদের পোশাক-পরা একটি লোককে দেখে সে তাকে জোর এক ধমক লাগাল। কিন্তু পরক্ষণে তার মুখটা ভাল করে দেখতে পেয়ে নারী-দেহটাকে কোচের উপর ফেলে রেখে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাতের তরবারিটা যে পাশেই রাখা ছিল সেটার কথা ভুলেই গেল। দুই হাতে আগন্তুককে জড়িয়ে ধরে তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে তার গলা কামড়ে ধরার চেষ্টা করতে লাগল।

হেরগের পুত্র মেটাক শক্তিধর পুরুষ। টারজনও প্রথম ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে যেতে মেঝেতে পড়ে থাকা মৃতদেহে পা লেগে চিত হয়ে মেঝেতে পড়ে গেল, আর সেই সুযোগে মেটাক তার বুকের উপর চেপে বসল।

টারজন চীৎকার করে স্মিথ-ওল্ডউইককে বলল মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যেতে। বার্থা কির্চার ততক্ষণে কোচ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার শরীর থর্ থর্ করে কাঁপছে। সে চীৎকার করে বলে উঠল, "না। সে যদি এখানে মারা যায় তো আমিও তার সঙ্গে মরব। ইচ্ছা হয় তুমি চলে যাও। আমি—আমি যাব না।

মেয়েটি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলল, "তোমার তো পিস্তল আছে। পাগলটাকে গুলি করছ না কেন?"

পিস্তল বের করে ইংরেজ যুবক এগিয়ে গেল। কিন্তু তারা দু'জন এত দ্রুত নড়াচড়া করছে যে একের বদলে অন্যকে গুলি করার ভয়ে পিস্তলের ঘোড়াই টিপতে পারছে না। বার্থা কির্চারও যুবরাজের তরবারি হাতে নিয়ে তাদের চারদিকে ঘুরছে, কিন্তু আঘাত করার সুযোগ পাচ্ছে না।

বার বার দু'জন মেঝেতে পড়তে ও উঠতে লাগল। একবার সুযোগ পেয়ে টারজন মেটাকের গলাটা চেপে ধরল। ধীরে ধীরে দৈত্যের মুঠি বসে গেল

তার গলায়। তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল। চোয়াল হাঁ হয়ে গেল। টারজন তখন তার মৃতপ্রায় দেহটাকে দুই হাতে মাথার উপর তুলে সবেগে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নীচের সিংহের আস্তানার মধ্যে।

বিজয়গর্বে সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাকিয়ে টারজন দেখল দু'জন হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বলল, "এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হলে একমুহূর্ত সময় নষ্ট করা চলবে না। আবার আমরা একত্র হয়েছি। ফিরে যেতেই হবে।"

সেই সময় ওটোবু মেঝেতে উঠে বসল। টারজন বলে উঠল, "আরে! তুমি তাহলে মারা যাও নি।"

নিগ্রো উঠে দাঁড়াল। হাত-পা টান-টান করল। মাথায় হাত দিল। বলল, "ওটোবুর খুব বেশী লাগে নি বাওয়ানা। শুধু মাথায় খুব ব্যথা করছে।"

টারজন বলল, "খুব ভাল। তুমি কি ওয়ামাবো দেশে ফিরে যেতে চাও?"

"চাই বাওয়ানা।"

"তাহলে নিরাপদ পথ ধরে আমাদের শহরের বাইরে নিয়ে চল।"

নিগ্রো বলল, "নিরাপদ পথ তো নেই। তবে সকলের গায়েই এ দেশী পোশাক আছে। তাই ফটক পর্যন্ত আমরা নির্বিঘ্নেই যেতে পারব। তবে বিপদ দেখা দেবে সেখানেই, কারণ রাতের বেলা কাউকে শহর ছেড়ে যেতে দেওয়া হয় না।"

টারজন বলল, "সে দেখা যাবে। এখন তো চল।"

দুটি পুরুষ, একটি নারী, ও একটি কালা ক্রীতদাস এ শহরের পথে কোন অসাধারণ দৃশ্য নয়। তাছাড়া এই গভীর রাতে পথও জনবিরল।

চলতে চলতে একটা কর্কশ শব্দ কানে আসতেই ওটোবু দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পা কাঁপতে লাগল।

"কি হল?" টারজন শুধাল।

"কাকাতুয়া বাওয়ানা।"

সকলে মাথার উপরে তাকিয়ে দেখল একটা কাকাতুয়া পাখা ঝটপটিয়ে উড়ে চলেছে।

ওটোবু বলল, "সর্বনাশ হয়েছে বাওয়ানা। আর রক্ষা নাই।"

টারজন বিরক্ত গলায় বলল, "এতদিন পাগলদের সঙ্গে থেকে তুমিও কি পাগল হয়ে গেলে ওটোবু?"

"না বাওয়ানা, আমি পাগল হই নি। তুমি জান না, ঐ ভয়ংকর পাখিগুলোও এখানকার মানুষদের মতই। ওদের মন বা আত্মা বলে কিছু নেই। এক্সুজা শহরের ভাষাতেই ওরা কথা বলে। ওরা শয়তান বাওয়ানা। দল বেঁধে এসে আমাদের মেরে ফেলতেও পারে।"

টারজন বলল, "আমরা ফটক থেকে কতদূরে আছি?"

"বেশী দূরে নয়। কিন্তু পাখিটা আমাদের আগেই সেখানে পৌঁছে রক্ষীদের সব খবর দিয়ে দেবে। তারা দলে দলে ছুটে এসে আমাদের শেষ করে ফেলবে।"

সত্যি তাই। দূর হতে ভেসে এল বহুকণ্ঠের কোলাহল।

আরও কয়েক পা এগোতেই পূব দিক থেকে একটা সরু গলি এসে বড় রাস্তায় পড়েছে। সেখানেই হঠাৎ দেখা দিল একটা বড় সিংহ। ওটোবু টারজনের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলে উঠল, "ওই দেখ বাওয়ানা, একটা বুনো কালো সিংহ!"

টারজন তরবারি কোষমুক্ত করে বলল, "ফিরে যাওয়া চলবে না। সিংহ হোক, কাকাতুয়া হোক, মানুষ হোক, আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে।" সে দৃঢ় পদক্ষেপে ফটকের দিকে এগিয়ে চলল।

বাতাস বইছে টারজনের দিক থেকে সিংহের দিকে। টারজন পশুরাজের আরও কাছাকাছি পৌঁছতেই সিংহটা নিঃশব্দে তার দিকে তাকিয়ে রইল। গর্জনের পরিবর্তে তার গলা থেকে একটা বিচিত্র শব্দ বের হল। টারজন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, "এটা নুমা। তোমরা ভয় পেয়ো না। এ সিংহ আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।"

নুমা এগিয়ে এসে টারজনের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।

আর একটা মোড় ঘুরতেই ফটকটা চোখে পড়ল। সেখানে অন্তত বিশজন সশস্ত্র সৈনিক তাদের বন্দী করতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

টারজন ইংরেজ যুবকের দিকে ফিরে বলল, "তোমার সঙ্গে কত গুলি আছে?"

স্মিথ-ওল্ডউইক উত্তর দিল, "পিস্তলে আছে সাতটা, আর পকেটে আছে আরও একডজন।"

টারজন বলল, "ওটোবু, তুমি থাক এই মেয়ের পাশে। ওল্ডউইক, তুমি আর আমি এগিয়ে যাব। নুমা কি করবে সেটা তাকে বলতে হবে না। সকলে তৈরী? এগিয়ে চল।"

শুরু হল আক্রমণ। স্মিথ-ওল্ডউইকের পিস্তল গর্জে উঠল। গর্জে উঠল সিংহ নুমা। সে আক্রমণের মুখে বিপক্ষের সৈন্যরা হঠাৎ অপস্মার রোগগ্রস্ত হয়ে চীৎকার করে নাচতে শুরু করে দিল। অনেকেই থর্ থর্ করে কাঁপতে কাঁপতে ধরাশায়ী হল। সেই সুযোগে টারজন তার দলবল নিয়ে ফটক পার হয়ে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগল।

দু'বার তারা বন্য সিংহের মুখে পড়ল। দু'বারই নুমার প্রচণ্ড গর্জনে তারা রণে ভঙ্গ দিল। পথে অনেকবার তাদের বিশ্রাম নিতে হল। কারণ বার্থা কির্চার ও স্মিথ-ওল্ডউইক পথের ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছিল। ভোরের দিকে সমতল উপত্যকা থেকে উৎড়াই ভেঙে ওঠার পথে টারজন অনন্যোপায় হয়ে ইংরেজ যুবকটিকে কাঁধে নিয়ে চলতে লাগল।

২১—যুদ্ধ

একটা গিরি-খাতে ঢোকার পরে দিনের আলো ফুটল। টারজন ছাড়া বাকি সকলেই ক্লান্ত; তবু তারা বুঝতে পারছে খাতের খাড়া পাহাড়ি দিকটা বেয়ে উপরের মালভূমিতে না ওঠা পর্যন্ত যে ভাবে হোক তাদের এগিয়ে যেতেই হবে। টারজন ও ওটোবু দু'জনেরই দৃঢ় বিশ্বাস এক্স্‌জার অধিবাসীরা গিরি-খাত ছাড়িয়ে আসবে না। কিন্তু যতই পথ হাঁটছে গিরি-খাতেই বাঁয়ে বা ডাইনে কোন দিকেই বের হবার কোন পথ তারা খুঁজে পাচ্ছে না।

ক্রমে দুপুর হ'ল। সারাটা পথ টারজন হয় কাঁধে করে নয়তো গলা জড়িয়ে ধরে স্মিথ-ওল্ডউইককে সঙ্গে নিয়ে চলেছে। কিন্তু এবার যে বার্থা কির্চারের পাও টলতে শুরু করেছে। তাকেও তো দোষ দেওয়া যায় না। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে যে বিপদ ও কষ্টের ভিতর দিয়ে সে চলেছে সেটাও তো দুর্বিসহ।

তার অবস্থা দেখেই দুপুরের পরে ইংরেজ যুবক হঠাৎ বালির উপর বসে পড়ে বলল, "আমি আর হাঁটতে পারছি না। মিস কির্চারও ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। আমাকে ফেলেই তোমাদের এগোতে হবে।"

মেয়েটি বলল, "না, তা হতে পারে না। এত বিপদ-আপদের মধ্যেও আমরা একসঙ্গে আছি, আর কপালে যাই থাকুক, একসঙ্গেই থাকব।" টারজনের দিকে মুখ তুলে বলল, "অবশ্য তুমি যদি আমাদের এখানে রেখে এগিয়ে যাও সেটা স্বতন্ত্র কথা। অন্তত আমি তো মনে করি তোমার যাওয়াই উচিত। দু'জনকে কাঁধে নিয়ে এই দুস্তর মরুভূমি পার হওয়া তোমার পক্ষেও সম্ভব নয়।"

ঈষৎ হেসে টারজন বলল, "তুমি এখনও মর নি; লেফ্‌টেন্যান্ট বা ওটোবু, বা আমিও মরি নি। হয় মরব না হয় বাঁচব, তবু যতদিন না মরি ততদিন বাঁচার চেষ্টাই করব। এতদিন যখন আসতে পেরেছি তখন এগিয়েই যাব। আপাততঃ এখানেই বিশ্রাম করা যাক, কারণ তোমার ও লেফ্‌টেন্যান্ট স্মিথ-ওল্ডউইকের বিশ্রাম দরকার। তোমরা একটু সুস্থ হলে আবার আমরা পথ চলব।"

"কিন্তু এক্স্‌জার লোকরা—?" বার্থা প্রশ্ন করল, "তারা কি আমাদের তাড়া করে এখানে আসতে পারে না?"

টারজন বলল, "তা আসতে পারে। সে যখন আসে তখন দেখা যাবে।"

মেয়েটি বলল, "তোমার এই জীবন-দর্শনকে আমিও যদি মেনে নিতে পারতাম। কিন্তু সে আমার সাধ্যাতীত।"

"তুমি তো কোন জঙ্গলে বন্য পশুদের মধ্যে জন্মে তাদেরই হাতে বড় হও নি; তাহলে জঙ্গলের এই অদৃষ্টবাদকে তুমিও আমার মতই মেনে নিতে পারবে।"

একটা ঝুলন্ত পাথরের ছায়ায় সকলে শুয়ে পড়ল। নুমা অশান্তভাবে এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে একসময় দূরের মোড়ের কাছে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পরে টারজন হঠাৎ উঠে বসল। ইসারায় সকলকে চুপ করতে বলে কান পাতল।

বার্থা বলল, "কি হল?"

"ওরা আসছে। এখনও অনেক দূরে আছে। কিন্তু তাদের স্যাণ্ডেল-পরা পায়ের শব্দ ও সিংহের চলার শব্দ আমার কানে আসছে।"

স্মিথ-ওল্ডউইক বলল, "আমরা কি করব? আরও এগোব? মনে হচ্ছে এবার আমি কিছুক্ষণ হাঁটতে পারব।"

বার্থা বলল, "আমিও পারব।"

টারজন বুঝল এরা কেউই সত্যি কথা বলছে না। এত তাড়াতাড়ি এত বেশী ক্লান্তি কাটতে পারে না। তবু এগিয়ে চলা ছাড়া উপায় নেই। কে জানে, হয়তো আর একটা মোড় ঘুরলেই গিরি-খাত থেকে বের হবার পথ পাওয়া যাবে।

বলল, "ওটোবু, তুমি লেফ্‌টেন্যান্টকে ধর। আমি মিস কিরচারের ভার নিলাম।"

তার আপত্তি সত্ত্বেও টারজন মেয়েটিকে বগল-দাবা করে হাঁটতে শুরু করল। পিছনে চলল ওটোবু ও ইংরেজ যুবক।

বার্থা বলল, "এখনও কি আশা আছে?"

"আমরা এখনও বেঁচে আছি। তবে একটা ব্যারিকেডের মত জায়গা পেলে ভাল হয়। স্মিথ-ওল্ডউইকের পাকা হাত। অনেকে একসঙ্গে আক্রমণ করতে না পারলে সে তাদের মোকাবিলা করতে পারবে।"

আর একটু এগিয়েই সে বলে উঠল, "এই তো পেয়ে গেছি। এই রকম একটা গর্তই খুঁজছিলাম।"

সামনেই বালির পথ থেকে কয়েক ফুট উঁচুতে একটা পাথরের চাঙর ভেঙে পড়ে গুহার মত সৃষ্টি হয়েছে। তার ভিতর দিয়ে একটা সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ চলে গেছে পিছনের পাহাড় পর্যন্ত। গুহাটার দু'দিক খোলা হলেও ওরা সকলে একসঙ্গে আক্রমণ করতে পারবে না।

সকলে সেখানে উঠে দেখল গুহাটা দু'ফুট চওড়া আর দশ ফুট লম্বা। তাড়াতাড়ি সকলে সেখানে লুকিয়ে পড়ল।

টারজন পিস্তলসহ স্মিথ-ওল্ডউইককে রাখল গুহার উত্তর মুখে। ওটোবুকে বলল বর্শা হাতে তার পাশে দাঁড়াতে। নিজে নিল দক্ষিণ মুখের দায়িত্ব। দু'য়ের মাঝখানে মেয়েটিকে শুইয়ে দিয়ে বলল, "ওরা বর্শা ছুঁড়লেও এখানে তুমি নিরাপদে থাকবে।"

মিনিটের পর মিনিট কাটতে লাগল। বার্থা কিরচারের মনে হল, এ প্রতীক্ষা বুঝি অনন্তকালের।

প্রথম আক্রমণে এক্সুজার লোকরা সুবিধা করতে পারল না। স্মিথ-ওল্ডউইকের গুলির মুখে তারা পিছু হটল। কিন্তু একটু পরেই তারা আবার এল। এবার আধা ডজন মানুষ আর আধা ডজন সিংহ।

মেয়েটি বলল, "এই কি আমাদের শেষ?"

"না," টারজন চীৎকার করে বলল, "এখনও আমরা বেঁচে আছি।"

আক্রমণকারীরা এবার দু'দিক থেকে বর্শা ছুঁড়তে লাগল। মেয়েটিকে আড়াল করতে গিয়ে একটা বর্শা সজোরে এসে বিঁধল টারজনের কাঁধে। তার প্রচণ্ড ধাক্কায় সে সপাটে মাটিতে পড়ে গেল। স্মিথ-ওল্ডউইক দু'বার গুলি ছুঁড়ল; কিন্তু একটা বর্শা এসে বিঁধল তার উরুতে। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। হাতের পিস্তলটা খসে পড়ল। শত্রুর মোকাবিলা করতে রইল শুধু ওটোবু।

টারজন ওঠার চেষ্টা করতেই একটি সৈনিক ঝাঁপিয়ে পড়ল তার বুকের উপর। তার হাতের খোলা তলোয়ার ঝিলিক দিয়ে উঠল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বার্থা কির্চার পিস্তলটা তুলে নিয়ে শয়তানটার বুক লক্ষ্য করে ঘোড়া টিপল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আক্রমণকারী ও আক্রান্ত উভয় দলের কানেই ভেসে এল গুলির শব্দ—গিরি-খাতের দিক থেকে। আকাশ থেকে বুঝি ভেসে এল দেবদূতের মধুর কণ্ঠস্বর—শ্বেতাঙ্গদের কানে বাজল একজন নন-কমিশণ্ড ইংরেজ-অফিসারের হুকুমের চীৎকার।

টারজন অতি কষ্টে উঠে দাঁড়াল। বর্শাটা তখনও তার কাঁধে বিঁধে রয়েছে। একটানে সেটাকে খুলে ফেলে টারজন বাইরে এসে দাঁড়াল। পিছনে বার্থা কির্চার।

গিরি-খাতের ভিতরে যে খণ্ড-যুদ্ধ বেঁধেছিল তা শেষ হয়েছে। সিংহরা বেশীর ভাগই পালিয়ে গেছে। এক্সুজার সৈনিকরা সবই মারা পড়েছে। টারজন ও বার্থাকে ভাল করে দেখে নিয়ে একটি বৃটিশ টমি হাতের রাইফেলটা তাক করল টারজনের দিকে। চোখের পলকে বার্থা বুঝে নিল, টারজনের গায়ের পীতবসনই এই বিভ্রান্তির কারণ। একলাফে দু'জনের মাঝখানে পৌঁছে সে হাত তুলে চীৎকার করে বলল, "গুলি করো না; আমরা দুজনই বন্ধু।"

টমি তখন টারজনকে হুকুম করল, "তাহলে হাত তুলে দাঁড়াও। হলুদ তকমাধারীদের বিশ্বাস নেই।"

এই সময় টমি দলের অধিনায়ক বৃটিশ সার্জেন্টটি সেখানে হাজির হল। টারজন ও বার্থা ইংরেজিতে তাকে বুঝিয়ে বলল তাদের ছদ্মবেশের কারণ ও অন্য সব বিবরণ। সার্জেন্ট সহজেই তাদের কথা বিশ্বাস করল। স্মিথ-ওল্ডউইক ও টারজনের ক্ষতস্থান বেঁধে দেওয়া হল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সকলে যাত্রা করল উদ্ধারকারী দলের শিবিরের দিকে।

রাতে স্থির হল, পরদিন স্মিথ-ওল্ডউইক ও বার্থা কির্চারকে বিমানযোগে

পাঠানো হবে উপকূলবর্তী বৃটিশ হেডকোয়ার্টারে। সেজন্য দুটো বিমানের ব্যবস্থাও করা হল। বৃটিশ ক্যাপ্টেন প্রস্তাব করল, ফিরতি-যাত্রায় তার বাহিনীর সঙ্গে স্থলপথেই যাবে টারজন ও ওটোবু। কিন্তু টারজন আপত্তি জানিয়ে বলল, তার ও ওটোবুর দেশ পশ্চিম দিকে ; কাজেই তারা দু'জন একসঙ্গে সেইদিকেই যাবে।

বার্থা বলল, "তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছ না ?"

"না। আমার বাড়ি পশ্চিম উপকূলে। আমি সেখানেই যাব।"

মিনতি-ভরা চোখ তুলে মেয়েটি বলল, "সেই ভয়ংকর জঙ্গলেই ফিরে যাবে ? আর কোনদিন তোমার দেখা পাব না ?"

নীরবে তার দিকে তাকিয়ে থেকে টারজন বলল, "কোন দিন না।" আর একটি কথাও না বলে সেখান থেকে চলে গেল।

সকালে কর্নেল ক্যাপেল বেস-ক্যাম্প থেকে বিমানযোগে এসে নামল। টারজন একটু দূরেই দাঁড়িয়েছিল। সে দেখল, হাসি মুখে দুই হাত বাড়িয়ে কর্নেল বার্থা কির্চারের দিকে এগিয়ে গেল। টারজন তো অবাক। একটি জার্মান গুপ্তচরের সঙ্গে এত মাখামাখি কেন ? দূর থেকে তাদের কথাবার্তা কানে না এলেও সে বুঝতে পারল, দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব।

বার্থা কির্চার বিমানে ওঠার আগে টারজনের সঙ্গে তার আর দেখা হয় নি। স্মিথ-ওল্ডউইকের সঙ্গেও সেখানেই দেখা হল। যথারীতি বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সে তাকে বার বার ধন্যবাদ দিল। ছোট হতে হতে তাদের বিমান পূর্ব দিগন্তের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মালপত্র কাঁধে ফেলে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে টমিরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কর্নেল ক্যাপেলও স্থির করেছে তাদের সঙ্গেই যাবে। টারজনের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলল, "তুমিও আমাদের সঙ্গে গেলে খুব খুশি হতাম গ্রেস্টোক। আমার কথায় মন না গললেও হয়তো স্মিথ-ওল্ডউইক ও তরুণীটির কথা তুমি রাখবে। তারা আমাকে বার বার তোমাকে সভ্যজগতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে গেছে।"

টারজন বলল, "না, আমি আমার পথেই যাব। মিস্ কির্চার ও লেফ্‌টেন্যান্ট স্মিথ-ওল্ডউইক আমার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশতই আমার ভালর জন্যে ওকথা বলেছে।"

"মিস্ কির্চার ?" ক্যাপেলের বিস্মিত প্রশ্ন। পরক্ষণেই হেসে উঠে সে বলল, "তাহলে তুমি তাকে জার্মান গুপ্তচর বার্থা কির্চার বলেই জান ?"

টারজন এক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "হ্যাঁ, আমি জানি সে বার্থা কির্চার—একজন জার্মান গুপ্তচর।"

"বাস্—শুধু এইটুকুই জান ?" ক্যাপেলের প্রশ্ন।

"হ্যাঁ—এইটুকুই," টারজনের উত্তর।

"তিনি হচ্ছেন মাননীয়া প্যাট্রিসিয়া ক্যান্‌বি; পূর্ব আফ্রিকা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের একজন মূল্যবান কর্মী। ওর বাবা ও আমি ভারতবর্ষে একসঙ্গে কাজ করেছি। জন্মের পর থেকেই ওকে আমি চিনি। আরে! এই তো দেখ একবাণ্ডিল কাগজপত্র যা সে জনৈক জার্মান অফিসারের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছিল আর অনেক বিপর্যয়ের মধ্যেও হাতছাড়া করে নি—এমনি অবিচল তার কর্তব্যবোধ। এগুলো ভাল করে দেখার মত সময় এখনও পাই নি, কিন্তু এর মধ্যে আছে একখানি সামরিক মানচিত্র, একবাণ্ডিল প্রতিবেদন, আর কে এক হাউটম্যান ফ্রিজ স্নাইডারের দিনপঞ্জী।"

চাপা গলায় টারজন বলল, "হাউটম্যান ফ্রিজ স্নাইডারের দিনপঞ্জী। একবার ওটা দেখতে পারি ক্যাপেল? সেই তো লেডি গ্রেস্টোককে খুন করেছে।"

ক্যাপেল বিনা বাক্যব্যয়ে একটা ছোট বই টারজনের হাতে দিল। খুব দ্রুত পাতা উল্টে টারজন একটা বিশেষ তারিখ খুঁজতে লাগল—যে তারিখে ঘটেছিল একটি ভয়ংকর ঘটনা। সেই তারিখটা পেয়েই পড়তে শুরু করে দিল। হঠাৎ অবিশ্বাসের একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল তার ঠোঁট থেকে। ক্যাপেল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল।

টারজন বলে উঠল, "ঈশ্বর! এ কি সত্যি? শোন।" ঠাসাঠাসি লেখা একটা পাতা থেকে সে পড়তে লাগল:

"ইংরেজ শুয়োরটার সঙ্গে একটু মস্করা করা গেল। বাড়ি ফিরে স্ত্রীর শোবার ঘরে তার অগ্নিদগ্ধ দেহটাই সে দেখতে পাবে—কিন্তু তাকে সে স্ত্রী বলেই ভুল করবে। আসলে একটা নিগ্রো রমণীর মৃতদেহকে পুড়িয়ে ভন গস্‌ তার আঙুলে পরিয়ে দিয়েছিল লেডি গ্রেস্টোকের আংটি—জার্মান হাই কম্যাণ্ডের কাছে মৃত অপেক্ষা জীবিত লেডি জি-র মূল্য অনেক বেশী।"

"সে বেঁচে আছে?" টারজন চীৎকার করে বলল।

ক্যাপেল বলল, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এখন তুমি কি করবে?"

"অবশ্যই তোমার সঙ্গে ফিরে যাব। মিস্‌ ক্যান্‌বির প্রতি কী অবিচারই না করেছি! কিন্তু আমি জানব কেমন করে? স্মিথ-ওল্ডউইক তাকে ভালবাসে। তাকেও তো আমি বলেছি যে সে একটি জার্মান গুপ্তচর। স্ত্রীর খোঁজে আমাকে তো ফিরে যেতেই হবে। মিস্‌ ক্যান্‌বির প্রতি এই অবিচারের প্রতিকারও আমাকে করতেই হবে।"

ক্যাপেল বলল, "ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। মিস্‌ ক্যান্‌বি নিশ্চয় তার প্রেমিককে বোঝাতে পেরেছে যে সে শত্রুর গুপ্তচর নয়, কারণ আজ সকালে আকাশে উড়বার আগে স্মিথ-ওল্ডউইক আমাকে বলে গেছে, মেয়েটি তাকে বিয়ে করবে বলে কথা দিয়েছে।"

টারজন ট্রায়াম্ফ্যাণ্ট

বিজয়ী টারজন

প্রাক-বাক

জীবন যদি হয় বুটিদার বস্ত্র তাহলে সময় তার টানা। সময় চিরন্তন, স্থির, অপরিবর্তনীয়। সুদক্ষ শিল্পী ভাগ্যদেবী তার পোড়েন সংগ্রহ করে পৃথিবীর চার কোণ ও অষ্টবিংশতি সমুদ্র থেকে, আকাশ থেকে আর মানুষের মন থেকে। তারপর যে নক্সা সে ফুটিয়ে তুলতে থাকে তা কোন দিন শেষ হয় না।

একটা সুতো এখান থেকে, একটা ওখান থেকে, আর একটা সুতো আসে সুদূর অতীত থেকে—যে অতীত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে আছে সঙ্গী সুতোটির জন্য যাকে না পেলে ছবিটি সম্পূর্ণ হবে না।

কিন্তু ভাগ্যদেবী বড়ই ধৈর্যশীলা। যে বুটিদার বস্ত্রটি সে তৈরী করতে চায়, যে অনাদি ও অনন্ত নক্সাটি সে ফুটিয়ে তুলতে চায়, তার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় দুটি সুতোর মিলন ঘটানোর জন্য সে একশ' বছর, হাজার বছর অপেক্ষা করে থাকে।

এক হাজার আটশ' পঁয়ষট্টি বছর আগেকার কথা (সঠিক তারিখ সম্পর্কে পণ্ডিতরা একমত নয়)। টার্সাসের পল রোমে শহিদ হয়েছিল।

দূর অতীতের সেই শোকাবহ ঘটনাটি যে একজন ইংরেজ বিমান-চালিকা ও আমেরিকান একজন ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের অধ্যাপকের জীবন ও ভাগ্যের উপর এতখানি প্রভাব বিস্তার করবে সেটা আমাদের কাছে আশ্চর্য মনে হলেও ভাগ্যদেবীর কাছে তা নয়। যে ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে আমি বসেছি, প্রায় দু'হাজার বছর ধরে সে তো ধৈর্য সহকারে তারই অপেক্ষা করে ছিল।

কিন্তু পল এবং এই দুটি যুবক-যুবতীর মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। সে ইফেসাসের অ্যাঙ্গাস্টাস। অ্যাঙ্গাস্টাস ছিল ওনেসিফোরাস পরিবারের ছেলে। খেয়ালী ও অপস্মার রোগগ্রস্ত যুবক। টার্সাসের পল যখন প্রাচীন আইওনিয়ার ইফেসাস শহরে প্রথম এসেছিল তখন যে সমস্ত লোক নবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছিল তাদের অন্যতম ছিল অ্যাঙ্গাস্টাস।

ছেলেবেলা থেকেই সে অপস্মার রোগগ্রস্ত। ধর্মের ব্যাপারেও অত্যধিক উন্মাদনাপ্রিয়। যীশুর অন্যতম প্রধান শিষ্যটিকে মর্ত্যে ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপেই পূজা করে। তাই পলের শহিদ হবার সংবাদ তাকে এতই অভিভূত করে যে সে

মানসিক ভারসাম্যই হারিয়ে ফেলে।

পাছে তার উপরেও অত্যাচার হয় এই ভয়ে সে আলেক্সান্দ্রিয়ার জাহাজ ধরে ইফেসাস থেকে পালিয়ে যায়। ছোট জাহাজটার ডেকের উপর ভয়ার্ত রুগ্ন অবস্থায় কোন রকমে ঢাকাঢুকি দিয়ে পড়ে থাকা অবস্থায় রেখেই তার কথা আমরা শেষ করতে পারতাম। কিন্তু আরও একটা ঘটনা ঘটল। জাহাজটা রোডাস দ্বীপে থামলে অ্যাঙ্গাস্টাস সেখানে নেমে পড়ে এবং (ধর্মান্তরের পথেই হোক আর অর্থের বিনিময়েই হোক) সুদূর উত্তর থেকে আগত বর্বর জাতির একটি সুকেশী ক্রীতদাসীকে সংগ্রহ করে।

এখানেই আমরা অ্যাঙ্গাস্টাস ও সিজারের কালকে বিদায় জানাই, আর কল্পনা করি, অ্যাঙ্গাস্টাস ও সুকেশী ক্রীতদাসী মেয়েটি আলেক্সান্দ্রিয়া বন্দর থেকে মেম্ফিস ও থিবির ভিতর দিয়ে আফ্রিকায় পালিয়ে গেল।

১—সুতোর পর সুতো

আমি যতদূর জানি হুইম্‌জির প্রথম আর্লের সঙ্গে এই কাহিনীর কোন যোগ নেই। তাই তার ব্যাপারে আমরা বিশেষ আগ্রহী নই। শুধু এইটুকু জানি যে প্রথম শ্রেণীর হুইস্কি প্রস্তুত করে প্রভূত ধনসম্পত্তি অর্জন করে বেশ কিছুদিন আগে তৎকালীন ক্ষমতাসীন লিবারেল দলকে উদার হাতে অর্থসাহায্য করার ফলেই সে আর্ল উপাধিটি লাভ করেছিল।

আমি একজন সাধারণ ইতিহাসকার, ভবিষ্যদ্বক্তা নই। কাজেই ভবিষ্যতে হুইম্‌জির আর্লের সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে কি না তা আমি জানি না। কিন্তু আর্লকে নিয়ে আমাদের বিশেষ কোন আগ্রহ না থাকলেও তার সুন্দরী কন্যা লেডি বারবারা কলিস সম্পর্কে সে কথা বলতে পারছি না।

আফ্রিকার সূর্য অস্ত যেতে তখনও ঘন্টাখানেক বাকি। নিষিদ্ধ ঘেঞ্জি পর্বতমালার রহস্যময় দুরারোহ সুউচ্চ শিখরশ্রেণী ঘন কালো মেঘে আচ্ছন্ন। পড়ন্ত সূর্যও ঢাকা পড়েছে সে মেঘের আড়ালে।

সেই ঘন মেঘের ভিতর থেকে ভেসে আসছে ভয়াল বিচিত্র ভ্রমরের গুঞ্জন। ঘেঞ্জি বন্ধুর শিখরগুলিকে ঘিরে ভ্রমরটা পাক খাচ্ছে। শব্দটা কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে। ঘন বাষ্পের আবরণে ঢাকা পড়ায় মাটি থেকে সেটাকে দেখা যাচ্ছে না, আবার সেটাও মাটির কোন কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

লেডি বারবারা কলিস চিন্তিত হয়ে পড়েছে। পেট্রল ফুরিয়ে আসছে। এই সংকটকালে কম্পাসটাও অকেজো হয়ে পড়েছে। মেঘের ভিতর দিয়ে সে অন্ধের মত উড়ে চলেছে

সে জানত একটা উত্তুঙ্গ পর্বতমালা পার হতে হবে। তাই সে মেঘ ছাড়িয়ে অনেকটা উঁচু দিয়েই উড়ছিল। কিন্তু এবার পাহাড়ের উচ্চতা এত বেশী বেড়ে গেছে যে মাথার উপর দিয়ে তাকে পার হওয়া অসম্ভব। এই পরিস্থিতিতে কায়রো থেকে "অন্তরীপ" পর্যন্ত একটানা উড়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা ত্যাগ করে ফিরে না গিয়ে বোকার মতই সে পর্বতমালার ভিতরে ঢুকে বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

জ্বালানি নিঃশেষ হবার মুখে। মেঘের নীচে পাহাড়ের উপর নামবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। তাই শেষ পথটিই সে বেছে নিল। ক্ষণিক প্রার্থনা সেরে দশ গুণতে গুণতেই প্যারাসুটের দড়িতে টান দিল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে ভাগ্যদেবীও তার একটি ছোট বুটিদার বস্ত্রখণ্ডের জন্য বেরিয়ে পড়েছে অন্য সুতোগুলির সন্ধানে।

ঘেঞ্জি পর্বতমালার বহুদূর দক্ষিণে বুঙ্গালো উপজাতির সর্দার কাবারিগা অরণ্য-রাজ টারজনের সামনে নতজানু হয়ে বসেছে।

মস্কোতে লাল রাশিয়ার ডিক্টেটর স্তালিনের কার্যালয়ে ঢুকল লিওন্স্তাবুচ।

নিগ্রো সর্দার কাবারিগা, অথবা লিওন্ স্তাবুচ বা লেডি বারবারা কলিসের কথা কিছুমাত্র না জেনেই ফিল শেরিডন মিলিটারি একাডেমির ভূতত্ত্ববিজ্ঞানের অধ্যাপক লাফায়েৎ স্মিথ, এ. এম., পি-এইচ. ডি., এস-সি. ডি. নিউ ইয়র্কের বন্দর থেকে একটা স্টিমশিপে চেপে বসল।

মিঃ স্মিথ একজন শান্ত, বিনয়ী, পণ্ডিতদর্শন যুবক। চোখে সিংএর ফ্রেমের চশমা। তার চোখের কোন দোষ নেই, তবু সে চশমা পরে কারণ তার বিশ্বাস চশমা পড়লে তাকে মর্যাদাসম্পন্ন ও বয়স্ক দেখায়। তার চশমায় যে সাদা কাঁচ বসানো এটা জানে শুধু সে নিজে আর তার চক্ষু চিকিৎসক।

সতেরো বছর বয়সে গ্রাজুয়েট হবার পরে আরও চার বছরে আরও অনেক ডিগ্রি সে লাভ করেছে। কিন্তু কী দুঃখের কথা, তার চেহারা সতেরো বছর বয়সে যেমন যুবজনোচিত ছিল, একুশ বছরেও ঠিক তেমনটি আছে। আর এটাই হয়েছে লাফায়েৎ স্মিথের জীবনের আকাংখা পূরণের পথে সব চাইতে বড় বাধা—সে আকাংখা কোন খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-বিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপকের আসনটি লাভ করা। তীক্ষ্ণ মেধা, প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তি, সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহ—সবই তার আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুতেই সে নিজেকে ততটা পরিণত-বয়স্ক ও পণ্ডিতজনোচিত দেখাতে পারে না যাতে কোন কলেজ-বোর্ডের মনের উপর রেখাপাত করতে পারে। গোঁফ রাখবার চেষ্টা করে দেখেছে; তাতে ফল হয়েছে হাস্যকর। তারপরেই শিং-এর ফ্রেমের চশমা পরার ধারণাটা তার মাথায় এসেছে; আর আপাতত তার উচ্চাকাংখাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নামিয়ে এনেছে।

এক বছর হল পশ্চিমের একটা অখ্যাত মিলিটারি একাডেমিতে সে পড়াচ্ছে।

সেই সুযোগে জীবনের আর একটি ইচ্ছাকে পূরণ করতে সে আফ্রিকাতে যাচ্ছে সেই অন্ধকার মহাদেশের পাহাড়ের বড় বড় ফাটলের গঠন-রীতি নিয়ে গবেষণা করতে।

যাই হোক, ধনী বাবার আর্থিক সহায়তায় আর টেনিস-খেলা ও সাঁতারের দক্ষতাকে সম্বল করেই লাফায়েৎ স্মিথ চলেছে আফ্রিকার পথে।

বইপত্র ও সামুদ্রিক অসুস্থতার মধ্যে তাকে ভাগ্যদেবীর হাতে ছেড়ে দিয়ে এখানেই আমরা স্মিথের কাছ থেকেও বিদায় নিচ্ছি। দুর্জয় আকর্ষণে ভাগ্যদেবী তাকে যে দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ভূতত্ত্বের জ্ঞান, বা সাঁতার ও টেনিসের দক্ষতা তার হাত থেকে স্মিথকে রক্ষা করতে পারবে না।

নিউ ইয়র্কে সময় যখন মধ্যাহ্নের দু'ঘণ্টা আগে, মস্কোতে তখন সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা বাকি। কাজেই লাফায়েৎ স্মিথ যখন সকালবেলা জাহাজে চাপল, ঠিক সেই সময় পড়ন্ত অপরাহ্নে লিওন স্তাবুচ রুদ্ধদ্বার কক্ষে স্তালিনের সঙ্গে আলোচনায় রত।

স্তালিন বলল, "এই কথা রইল। সব বুঝেছ তো?"

স্তাবুচ বলল, "সব বুঝেছি। পিটার জাভেরির হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে, আর যে কারণে আফ্রিকায় আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে তা দূর করতে হবে।"

স্তালিন বলল, "শেষেরটাই বেশী দরকারি। প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছোট করে দেখো না। একটা গোরিলা-মানব হলেও একটি সুসংগঠিত লাল অভিযানকে সে সম্পূর্ণ পরাভূত করেছে। সে না এসে পড়লে আবিসিনিয়া ও মিশরে অনেক কিছুই ঘটতে পারত। তোমাকে আরও জানিয়ে রাখছি কমরেড, আরও একটা অভিযান আমরা চালাব। তবে তোমার রিপোর্ট হাতে আসার এবং সেই বাধা দূর হবার আগে নয়।"

স্তাবুচ বুক ফুলিয়ে বলল, "আমি কি কখনও ব্যর্থ হয়েছি?"

স্তালিন উঠে দাঁড়িয়ে তার কাঁধে হাত রেখে বলল, লাল রাশিয়া OGPU-র কাছে পরাজয় আশা করে না।" কথা বলার সময় শুধু তার ঠোঁট দুটি হাসল।

সেই রাতেই লিওন স্তাবুচ মস্কো ত্যাগ করল। ভেবেছিল, সে যাচ্ছে একা গোপনে, কিন্তু রেলের কামরায় তার পাশেই বসেছিল ভাগ্যদেবী।

পায়ের কাছে নতজানু নিগ্রো সর্দারের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে টারজন বলল, "উঠে দাঁড়াও। তুমি কে? কেনই বা টারজনের কাছে এসেছ?"

"মহান বাওয়ানা! আমি কাবারিগা— বুঙ্গালো উপজাতির সর্দার। মহান বাওয়ানার কাছে আমি এসেছি আমার লোকজনদের দুঃখ-দুর্দশা মোচনের আশায়।"

"তোমার লোকজনদের কিসের দুঃখ? কার জন্য দুঃখ?" টারজন জানতে চাইল।

কাবারিগা বলল, "দীর্ঘকাল ধরে আমরা সকলের সঙ্গে শান্তিতে বাস করছি। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোনরকম যুদ্ধ-বিগ্রহ করি না। কিন্তু একদা আবিসিনিয় থেকে একদল লোক আমাদের দেশে এসে বাসা বেঁধেছে। তারা আমাদের গ্রাম আক্রমণ করে, আমাদের ফসল, ছাগল ও লোকজনদের চুরি করে নিয়ে যায়, তারপর দূর দেশে সে সব বিক্রি করে দেয়।"

"কিন্তু তুমি আমার কাছে এসেছ কেন? আমার দেশের সীমানার বাইরে কোন জাতির ব্যাপারে আমি তো হস্তক্ষেপ করি না।"

নিগ্রো-সর্দার বলল, "মহান বাওয়ানা, আমি তোমার কাছে এসেছি কারণ তুমি একজন সাদা মানুষ, আর যারা আমাদের উপর উৎপীড়ন করছে তাদের সর্দারও একজন সাদা মানুষ। সকলেই জানে, তুমি খারাপ সাদা মানুষদের যম।"

টারজন বলল, "সে কথা আলাদা। আমি তোমার সঙ্গে তোমাদের দেশে যাব।"

এইভাবে নিগ্রো-সর্দার কাবারিগার কাজের ভার চাপিয়ে দিয়ে ভাগ্যদেবী টারজনকে নিয়ে গেল উত্তরের দিকে। তার নিজের লোকরা জানলও না সে কোথায় গেল, কেন গেল—এমন কি তার একান্ত বন্ধু ছোট্ট নকিমাও জানল না।

২—মিডিয়ানের দেশ

অনেক উঁচু একটা পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছে আব্রাহামের ছেলে আব্রাহাম। পাহাড়টা অনেক কাল আগে নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরির একটা প্রাচীর। তার পিছনে ও মাথার উপরে গড়ে উঠেছে তার লোকজনদের বাড়িঘর। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তার জাতির নর-নারী ও শিশুরা।

সকলেই দাঁড়িয়ে আছে আকাশের দিকে মুখ করে। সকলের মুখেই ফুটে উঠেছে বিস্ময়, জিজ্ঞাসা, ভয়। সকলেই কান পেতে শুনছে, আগ্নেয়গিরির মুখ-বিবরের উপরে নেমে আসা ঘন কালো মেঘের আড়াল থেকে ভেসে আসছে এমন একটা বিচিত্র বিপজ্জনক গুঞ্জন-ধ্বনি যা তারা আগে কখনও শোনে নি।

আগ্নেয়গিরির মুখ-বিবরের অপর দিকে অনুরূপ আর একটি দল সেই একই ভয় ও জিজ্ঞাসা নিয়ে নোয়ার ছেলে এলিজাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

প্রথম দলের একটি নারী আব্রাহামকে জিজ্ঞাসা করল, "ওটা কি বাবা? আমার ভয় করছে।"

লোকটি জবাব দিল, "যারা প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখে তাদের কোন ভয় থাকে না। তুমি অবিশ্বাসিনী।"

নারীর মুখ ভয়ে সাদা হয়ে গেল। কাঁপতে কাঁপতে বলল, "বাবা, তুমি তো

জান আমি অবিশ্বাসিনী নই।"

আব্রাহাম ধমক দিল, "চুপ কর মার্থা। হয়তো স্বয়ং প্রভুই এসেছে সকলের বিচার করতে। পলের মুখে তো সেই বাণীই ঘোষিত হয়েছিল।"

সমবেত নর-নারীর একেবারে পিছনে দাঁড়িয়েছিল একটি কিশোর। হঠাৎ সে মাটিতে পড়ে গোঙাতে লাগল; তার মুখ দিয়ে ফেনা গড়াতে লাগল। একটি নারীও আর্তনাদ করে মূর্চ্ছা গেল।

আব্রাহাম প্রার্থনার ভঙ্গীতে বলে উঠল, "হে প্রভু, সত্যি যদি তুমি এসে থাক তাহলে তোমার অনুগত জনরা তোমার আশীর্বাদ ও নির্দেশ শুনবার জন্য অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু তুমি যদি আমাদের প্রভু না হও, তাহলেও তোমার কাছে আমাদের প্রার্থনা—তুমি আমাদের সকলকে বিপদ থেকে রক্ষা কর।"

"এ হয়তো গেব্রিয়েল," লম্বা দাড়িওয়ালা একজন বলল।

একটি নারী কেঁদে বলল, "ওই শোন তার শিঙার আওয়াজ—শেষের দিনের শিঙাধ্বনি।"

"চুপ কর।" আব্রাহাম কর্কশ গলায় বলল।

কিশোরটি তখনও মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। আরও একজন পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যেতে লাগল। তারও মুখ দিয়ে ফেনা গড়াতে লাগল।

এবার চারদিকে অনেকেই পড়ে যেতে লাগল। কারও শরীর কাঁপছে। কেউ মূর্চ্ছা যাচ্ছে। কিন্তু সেদিকে কারও নজর নেই।

আবার সেই ভয়ংকর শব্দ তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। শব্দটা ক্রমেই বাড়ছে। একেবারে মাথার উপর এসে গেছে। এমন সময়—

মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটি ভৌতিক মূর্তি—একটা প্রকাণ্ড সাদা বস্তু আর তার নীচে এদিক-ওদিক দুলছে একটা ছোট্ট পুতুল। সেটা ধীরে ধীরে নেমে আসছে। তা দেখে আরও ডজনখানেক মানুষ মাটিতে পড়ে গোঙাতে লাগল, তাদের মুখ থেকেও ফেনা গড়াতে লাগল।

প্রায় পাঁচ'শ নর-নারী ও শিশুর চোখের সামনে লেডি বারবারা কলিস ভাসতে ভাসতে নেমে এল। সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে সকলে নতজানু হয়ে বসে পড়ল।

কী আশ্চর্য, তারা সকলেই সাদা মানুষ। আফ্রিকার বুকের মধ্যে সে নেমেছে একটি সাদা মানুষদের উপনিবেশে।

লেডি বারবারা ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। মানুষগুলির দুটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে তার চোখে পড়ল—সকলেরই বড় বড় নাক আর ছোট থুত্নি। নাকটা এত বড় যে মুখটাই কদাকার দেখায়, আর অনেকেরই থুত্নি বলে কিছু নেই বললেই চলে।

আরও দুটি পরস্পরবিরোধী জিনিস তার চোখে পড়ল—প্রায় এককুড়ি অপস্মারগ্রস্ত মানুষ মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে, আর একটি স্বর্ণকেশী সুন্দরী উঠে

দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ মেলে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

লেডি বারবারা কলিস মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হাসল। মেয়েটিও হাসল, কিন্তু পরক্ষণেই সভয়ে চারদিকে তাকাল।

লেডি বারবারা শুধাল, "আমি কোথায় এসেছি? এটা কোন্ দেশ? এরা সব কারা?"

মাথা নেড়ে মেয়েটি শুধাল, "তুমি কে? তুমি কি প্রভুর দেবদূত?"

এবার বারবারার মাথা নাড়ার পালা। মেয়েটির ভাষা সে কিছুই বুঝতে পারে নি।

সাদা লম্বা দাড়িওয়ালা লোকটি এবার সাহস করে এগিয়ে এসে মেয়েটিকে বলল, "চলে যাও জেজেবেল! এই স্বর্গীয় অতিথির সঙ্গে কথা বলার দুঃসাহস তোমার হল কেমন করে?"

মেয়েটি ভয়ে পিছিয়ে গেল। কিন্তু লেডি বারবারা এগিয়ে গিয়ে তার হাতটা ধরে বলল, "তুমি আমার কাছেই থাকবে।"

বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, "ও কি বলল জেজেবেল?"

মেয়েটি বলতে যাচ্ছিল যে সে কিছু বুঝতে পারে নি, হঠাৎ কি মনে করে সে থেমে গিয়ে লেডি বারবারার দিকে তাকাল। বারবারার ঠোঁটে সেই মিষ্টি হাসি। তা দেখে মেয়েটির সাহস বেড়ে গেল। দুষ্টুমি করে বলল, "জান জাবোব, ও বলল যে স্বর্গ থেকে তোমাদের জন্য বার্তা নিয়ে এসেছে, আর সে বার্তা জানাবে শুধু আমার মুখ দিয়ে, আর কাউকে নয়।"

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল। সরল মনে সকলেই কথাটা বিশ্বাস করল। ফলে লেডি বারবারার সঙ্গে জেজেবেলের প্রতিও সকলের শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। তাদের দুজনের একত্রে থাকার সব রকম ব্যবস্থা করে দেওয়া হল।

রাতে শুয়ে লেডি বারবারা এখানকার লোকদের লম্বা নাক, ছোট থুত্নি ও অপস্মার রোগের কথাই ভাবতে লাগল। কিন্তু কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যাই খুঁজে পেল না। পাবেই বা কেমন করে? কেউ তো তাকে বলে নি অ্যাঙ্গাস্টাস ও সুকেশী ক্রীতদাসী মেয়েটির প্রাচীন কাহিনী। আসলে এখনকার কেউ জানেই না যে অ্যাঙ্গাস্টাসের ছিল বড় নাক, ছোট থুত্নি ও অপস্মার রোগ। প্রায় উনিশ শতাব্দী আগে যে ক্রীতদাসী মেয়েটি মারা গেছে তার যে ছিল সুস্থ মন ও উজ্জ্বল স্বাস্থ্য যার জন্য আজও এদের মধ্যে জেজেবেলের মত সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে জন্মায় সে কথাও এরা কেউই জানে না।

৩—বন্দুকবাজ

"বন্দুকবাজ" ড্যানি প্যাট্রিক ডেক চেয়ারে হেলান দিয়ে আরামে শুয়ে আছে। তার পোশাকের মধ্যে নিরাপদে লুকানো আছে ২০ জি.। বাঁ বগলের নীচে বিশেষভাবে তৈরী খাপের মধ্যে লুকানো আছে একটা '৪৫। বন্দুকবাজ প্যাট্রিক জানে, বেশ কিছুদিন এটাকে ব্যবহার করতে হবে না, তবু তৈরী থাকা ভাল। "বন্দুকবাজ" শিকাগোর লোক। সেখানে যে সমাজে সে চলাফেরা করে তারা সকলেই তৈরী থাকার ব্যাপারটায় বিশ্বাসী।

সে কখনই বড় মস্তান ছিল না। তাই বলে তার উচ্চাশা কিছু কম নয়। অনেক বছর ধরে সে তার "গুরু"-র দক্ষিণ হস্ত অর্থাৎ পিস্তল-হস্ত হয়েই ছিল। তার চোখের সামনেই "গুরু"-কে বেশ মাল-কড়ি গুছিয়ে নিতে দেখে তার মনেও ঈর্ষা জেগেছিল।

তাই ড্যানি "গুরুর" দল ছেড়ে আর এক "গুরুর"-র দলে ভিড়েছে। কাজও কিছুটা গুছিয়ে নিয়েছে। কিন্তু "বন্দুকবাজ" ড্যানি প্যাট্রিক তার সাবেক গুরুর মন-মেজাজ ভালই জানে। তাই দল বদলের পুরস্কার স্বরূপ পাওয়া ২০ জি. নিয়ে নিঃশব্দে শহর থেকে কেটে পড়েছে। সেখানেই থামে নি, এ যুগের বুদ্ধিমান ছেলের মত দেশ থেকেই সরে পড়েছে। ফলে ভাগ্যদেবীর বুটিদার বস্ত্রে আর একটা সুতো সংযোজিত হয়েছে।

কোথায় বাসা বাঁধবে না জানলেও সে এটুকু জানে যে অন্তত ইংলণ্ড পর্যন্ত সে যাবে; আর তার ভূগোলের জ্ঞানমতে ইংলণ্ড দেশটা লণ্ডনেরই কোথাও অবস্থিত।

আপাতত জাহাজের ডেক চেয়ারে বসে সে রোদ পোয়াচ্ছে। একটানা তিন দিনের সমুদ্রযাত্রায় ড্যানি বিরক্ত হয়ে উঠেছে। সহযাত্রীরা কেউ তার সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বলে না। কেন বলে না তাও সে বুঝতে পারে না।

যাই হোক আজ তৃতীয় দিনে একটি যুবক এসে তার পাশে বসল। তার দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'সুপ্রভাত। আবহাওয়াটা ভারি সুন্দর।"

ড্যানি নিরুত্তাপ নীল চোখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "তাই বুঝি?" তারপর আবার চোখ ফেরাল তরঙ্গমুখর অসীম সমুদ্রের বুকে।

লাফায়েৎ স্মিথ হেসে একটা বই খুলে চেয়ারে হেলান দিল। ধীরে ধীরে অভব্য প্রতিবেশীটির কথা ভুলেই গেল।

সেদিন বিকেলে ড্যানি যুবকটিকে আবার দেখতে পেল সুইমিং পুলে। একটি জিনিস তাকে মুগ্ধ করল। কি সাঁতারে, কি ডাইভিং-এ, যুবকটি অন্য সকলের চাইতে অনেক বেশী দক্ষ। তার রোদে-পোড়া তামাটে রং দেখেই বুঝল, যুবকটি দীর্ঘ সময় সুইমিং পুলে কাটাতে অভ্যস্ত।

পরদিন সকালে ডেকে এসেই ড্যানি দেখল, যুবকটি তার আগেই এসে চেয়ারে বসে আছে। নিজের চেয়ারে বসে সে বলল, "সুপ্রভাত। সকালটা বড় ভাল।"

বই থেকে মুখ তুলে যুবকটি বলল, "তাই বুঝি?" তারপর আবার বইয়ের পাতায় চোখ রাখল।

ড্যানি হেসে বলল, "আমার কথাটাই আমাকে ফিরিয়ে দিলে? কি জান, আমি ভেবেছিলাম তুমিও ওই সব উঁচু টুপিওয়ালাদের একজন। কিন্তু কাল তোমাকে পুকুরে দেখেছি। তুমি বেশ ভাল লাফাতে পার।"

লাফায়েৎ স্মিথ, এ. এম., পি-এইচ. ডি., এস-সি., ডি. বইটা কোলের উপর রেখে যুবকটির দিকে তাকাল। মুখে দেখা দিল বন্ধুত্বের হাসি।

"প্রমোদ ভ্রমণে চলেছ বুঝি?" ড্যানি প্রশ্ন করল।

"আশা করি, ভ্রমণটা সুখেরই হবে। তবে এটাকে ব্যবসায়িক ভ্রমণও বলা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা। আমি একজন ভূ-তত্ত্ববিদ।"

"ইংলণ্ডে যাচ্ছ কি?"

"দিন দুই মাত্র লণ্ডনে থাকব," স্মিথ জবাব দিল।

"আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি ইংলণ্ডে যাচ্ছ।"

লাফায়েৎ স্মিথ বিব্রত বোধ করল। তারপর হেসে বলল, "দেখ, লণ্ডন হচ্ছে ইংলণ্ডের রাজধানী। কাজেই লণ্ডনে থাকা মানেই ইংলণ্ডেও থাকা।"

ড্যানি চেঁচিয়ে বলল, "গীজ্। কি জান, আমি কোনদিন আমেরিকার বাইরে যাই নি।"

"তুমি কি ইংলণ্ডে বেশ কিছু দিন থাকবে?"

"আগে দেখি তো কেমন লাগে," ড্যানি জবাব দিল।

স্মিথ বলল, "আমার তো মনে হয় লণ্ডন তোমার ভালই লাগবে।"

এবার ড্যানি পাল্টা প্রশ্ন করল, "তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"আফ্রিকা।"

"সেই বাঘ-হরিণ-সিংহ-হাতির দেশে যাচ্ছ কেন? শিকারে?"

"শিকারেই বটে, তবে জন্তু-জানোয়ার নয়, পাথর শিকারে।"

"গীজ্। পাথর শিকারে কে না যাচ্ছে? তা নিয়ে কত রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটছে।"

স্মিথ হেসে বলল, "সে পাথর নয়।"

"তার মানে তুমি হীরের খোঁজে যাচ্ছ না?"

"না। আমি যাচ্ছি পাহাড়ের গঠন-রীতি জানতে।"

"সেটা বাজারে বিক্রি করতে পারবে?"

"না।"

কি ভেবে মাথা নাড়তে নাড়তে ড্যানি শুধাল, "আচ্ছা, আফ্রিকা কত বড় দেশ ?"

"তা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় চারগুণ হবে।"

"আচ্ছা, আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই তো কি বল মিস্টার ?"

লাফায়েৎ স্মিথ অবাক হল। এই যুবকটিকে তার ভাল লেগেছে। হয়তো সঙ্গী হিসাবে সে ভালই হবে। আফ্রিকার জঙ্গলে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাতে আর একজন শ্বেতকায় সঙ্গী পেলে সময়টাও ভাল কাটবে। তবু সে ইতস্তত করতে লাগল। এই লোকটি সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। কোন পলাতক আসামীও তো হতে পারে। যা কিছু হতে পারে। তা হোক। সে মনস্থির করে ফেলল।

তাকে ইতস্তত করতে দেখে ড্যানি বলল, "খরচের কথা নিয়ে ভেবো না। আমার খরচটা আমিই দেব।"

"না, না, খরচ নিয়ে আমি ভাবছি না। কি জান, আমরা কেউ কাউকে জানি না। দুজনের মতের মিল নাও হতে পারে।"

ড্যানি এবার জোর দিয়ে বলল, "আমি কিন্তু আফ্রিকা যাবই। আর তুমিও যখন সেখানেই যাবে তখন দু'জন একসঙ্গে গেলে ক্ষতি কি ? তাতে খরচ কম পড়বে, আর একজন সাদা মানুষের বদলে দু'জন সাদা মানুষ নিশ্চয়ই ভাল। এখন ভেবে বল, আমরা একসঙ্গে যাব, না আলাদা-আলাদা ?"

লাফায়েৎ স্মিথ হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, "একসঙ্গে।"

বন্দুকবাজ প্যাট্রিক হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সোল্লাসে বলল, "পাঁচ দাও।"

"পাঁচ কি ?" প্রশ্ন করল লাফায়েৎ স্মিথ, এ. এম., পি-এইচ. ডি., এস-সি. ডি.।

৪—গুণের পর গুণ

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটল। ট্রেনের ঝক্-ঝক্। স্টিমারের ধ্বক্-ধ্বক্। পুরনো পথে অনেক কালো মানুষের পায়ের ছাপ। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত সাদা মানুষদের নেতৃত্বে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সাফারি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে ঘেঞ্জি পর্বতমালার অরণ্য-অঞ্চলের দিকে। কেউ কারও খবর রাখে না, কার কি উদ্দেশ্য তাও জানে না।

পশ্চিম দিক থেকে এল লাফায়েৎ স্মিথ ও "বন্দুকবাজ" প্যাট্রিক; দক্ষিণ থেকে এল বড় ইংরেজ শিকারী লর্ড পাস্‌মোর; পূব থেকে লিওন স্তাবুচ।

ঘেঞ্জি পর্বতমালার সানুদেশের ঢালু জমিতে স্তাবুচরা থেমেছে দুপুরের বিশ্রামের

জন্ত। তার লোকজনদের মধ্যে কিছুটা গোলমাল চলেছে। একদল কুলি গোল হয়ে বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। তাদের দেখিয়ে স্তাবুচ সর্দারকে জিজ্ঞাসা করল, “ওরা কি করছে?”

সর্দার বলল, “ওরা ভয় পেয়েছে বাওয়ানা।”

জেনেশুনেও স্তাবুচ বলল, “কিসের ভয়?”

“দস্যুর ভয় বাওয়ানা। কাল রাতে আরও তিনজন পালিয়েছে। আরও পালাবে। সকলেই ভয় পাচ্ছে।”

স্তাবুচ ধমক দিয়ে বলল, “এবার ওরা আমাকে ভয় করবে। আর কেউ পালালে আমি—আমি—”

“কিন্তু ওরা ভয় পাচ্ছে দস্যুদল ও তাদের সাদা সর্দারকে। নিজেদের দেশ থেকে অনেক দূরে কেউ ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রিত হতে চায় না।”

স্তাবুচ চেঁচিয়ে বলল, “ও সব গাঁজা-খুরী গল্প রাখ। আমি যা বলি তাই শোন।”

কিন্তু সে কথা আর বলা হল না। একটি কুলি হঠাৎ দাঁড়িয়ে সভয়ে চীৎকার করে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে বলল, “ঐ দেখ! দস্যুরা আসছে!”

দূরে আকাশ-পটে কালো ছায়ার মত দেখা দিল একদল অশ্বারোহী। তারা সবেগে ধেয়ে আসছে। সাদা আলখাল্লা বাতাসে উড়ছে, রাইফেলের নল ও বর্শার ফলা রোদ্দুরে চকচক করছে।

হঠাৎ একটা কুলি ছুটে গিয়ে একটা তল্পি কাঁধে তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই ছুটে গেল স্তূপ করা তল্পিতল্পার দিকে।

স্তাবুচ চীৎকার করে বলল, “কি করছে ওরা? ওদের থামাও!”

সর্দার ও আস্কারিরা ছুটে গেল। কুলিরা ততক্ষণে তল্পিতল্পা নিয়ে পিছনের পথ ধরে পালাতে ব্যস্ত। সর্দার বাধা দেওয়াতে একটা কুলি ঘুষি মেরে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর সকলেই পালাতে লাগল—কুলিরা, আস্কারিরা, এমন কি সর্দার পর্যন্ত।

স্তাবুচ একা। সেও পালাতে যাচ্ছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল পালাবার চেষ্টা বৃথা। হুংকার দিতে দিতে অশ্বারোহীরা ছুটে আসছে শিবির লক্ষ্য করে। একেবারে তার সামনে এসে তারা ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। বদখৎ চেহারাতেই তাদের স্বভাব পরিস্ফুট।

দস্যু-সর্দার স্তাবুচকে কি যেন বলল, কিন্তু সে তার কিছুই বুঝতে পারল না। একজন দস্যু রাইফেল তুলে স্তাবুচকে তাক করতেই সর্দার নিজের রাইফেলের আঘাতে তার রাইফেলটাকে ছিটকে ফেলে দিয়ে কি যেন হুকুম করল। অমনি দু'জন দস্যুকে স্তাবুচের পাহারায় রেখে বাকিরা শিবিরে ঢুকে সব কিছু লুটপাট করে এনে ঘোড়ার পিঠে চাপাল। তারপর স্তাবুচকে নিরস্ত্র ও বন্দী করে সব

কিছু নিয়ে যে দিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই ঘোড়া চালিয়ে দিল।

ঘন জঙ্গলের আড়ালে থেকে দুটি তীক্ষ্ণ ধূসর চোখ কিন্তু সব কিছুই দেখল। স্তাবুচরা দুপুরের বিশ্রামের জন্য থামার পর থেকেই সে শিবিরের উপর নজর রেখেছিল।

দস্যুরা চলে যেতেই একলাফে গাছে চড়ে সে দুলতে দুলতে চলল উল্টো পথে অর্থাৎ যে পথে স্তাবুচের লোকরা পালিয়েছে।

দলের সর্দার গোলোবা সদলে ছুটছে বনের পথ ধরে। কিন্তু যখন দেখল যে দস্যুরা তাদের তাড়া করছে না, তখন সে থামল। দস্যুর ভয় কিছুটা কেটে যেতেই আর একটা ভয় তার মনকে জুড়ে বসল—সর্দার হিসাবে সে যে মনিবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার শাস্তির ভয়।

এমন সময় গাছের আড়াল থেকে একটি ব্রোঞ্জ-কঠিন সাদা মানুষ পথের সামনে হঠাৎ দেখা দিল। একটুকরো কটি-বস্ত্র ছাড়া সে প্রায় নগ্নদেহ। তাকে দেখেই ভয়ে ও বিস্ময়ে সকলে থেমে গেল।

লোকটি নিজের ভাষায় প্রশ্ন করল, "তোমাদের সর্দার কে?" সকলেরই চোখ ঘুরে গেল গোলোবার দিকে।

নিগ্রো-সর্দার বলল, "আমি।"

"তোমার বাওয়ানাকে রেখে চলে এলে কেন?"

উত্তর দিতে গিয়েও গোলোবা থেমে গেল। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "সর্দার গোলোবাকে সে কথা শুধোবার তুমি কে হে? পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও।"

সাদা লোকটি নড়ল না। নীচু গলায় বলল, "কোন সাদা মানুষের সঙ্গে এ ভাবে কথা বলার ফলাফল গোলোবার জানা উচিত।"

গোলোবা একটু ইতস্তত করে বলল, "বড় বাওয়ানারা কখনও উলঙ্গ হয়ে একা একা জঙ্গলে ঘোরে না। তোমার সাফারি কোথায়?"

সাদা লোকটি বলল, "অরণ্যরাজ টারজনের কোন সাফারি লাগে না।"

গোলোবা বজ্রাহত। অরণ্যরাজ টারজনকে সে কখনও চোখে দেখে নি, কিন্তু এই বড় বাওয়ানার কীর্তি-কাহিনী সবই শুনেছে। প্রশ্ন করল, "তুমি টারজন?"

সে মাথা নাড়ল। গোলোবা সভয়ে নতজানু হয়ে বলল, "দয়া কর বড় বাওয়ানা। গোলোবা জানত না।"

টারজন বলল, "এবার আমার কথার জবাব দাও। তোমাদের বাওয়ানাকে ছেড়ে এসেছ কেন?"

গোলোবা দস্যুদের সঙ্গে লড়াইয়ের একটা গল্প ফেঁদে বসতেই টারজন ধমক দিয়ে উঠল, "থাক। আমি সব জানি। এবার ভালয় ভালয় ফিরে যাও।"

গোলোবা ভয়ে ভয়ে বলল, "দস্যুরা যদি আবার তাড়া করে?"

"করবে না। তারা পশ্চিম দিকে চলে গেছে। তোমার বাওয়ানাকেও

সঙ্গে নিয়ে গেছে। ভাল কথা। লোকটা কে? এখানে কি করছে?"

"অনেক দূরে উত্তরের দেশ থেকে সে এসেছে। সে বলে দেশটার নাম রুশা।"

টারজন বলল, "হ্যাঁ। আমি সে দেশের কথা জানি। সে এখানে এসেছে কেন?"

"তা জানি না। তবে শিকার করতে আসে নি, কারণ খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া সে শিকার করে না।"

"সে কি টারজনের কথা কখনও বলেছে?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই বলে। সব গ্রামেই সে টারজনের কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কেউ বলতে পারে না।"

টারজন বলল, "ঠিক আছে। তুমি যেতে পার।"

৫—সিংহের মুখে

জঙ্গলের উত্তর প্রান্তের কয়েক মাইল দক্ষিণে ছোট নদীর ধারে একটা খোলা জায়গায় লর্ড পাস্‌মোর তাঁবু ফেলেছে। তার দীর্ঘদেহ কুলি ও আস্কারিরা উনোনের পাশে বসে হাসি-ঠাট্টা করছে। ঘণ্টা দুই হল সূর্য অস্ত গেছে। লর্ড পাস্‌মোর ডিনারের পোশাকে ফিটফাট হয়ে খেতে বসেছে। ছোকরা চাকরটা ফরমাস খাটার জন্য চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে।

একটি শক্ত-সমর্থ নিগ্রো এসে বলল, "আমাকে ডেকেছ বাওয়ানা?

লর্ড পাস্‌মোর নিগ্রোটির বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, "কোন খবর আছে?"

"না বাওয়ানা, পূবে বা পশ্চিমে কোন দিকেই শিকার দেখা যায় নি।"

"তাহলেও কাল আমি—" লর্ড পাস্‌মোর হঠাৎ থেমে গেল। জঙ্গলের নৈশ শব্দকে ছাপিয়ে একটা অস্পষ্ট শব্দ কয়েক সেকেণ্ডের জন্য কানে এল।

নিগ্রোটি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে মনিবের দিকে তাকিয়ে বলল, "শুনতে পাচ্ছ বাওয়ানা?" লর্ড পাস্‌মোর মাথা নাড়ল। "ওটা কিসের শব্দ বাওয়ানা?"

"শব্দটা তো মেসিনগানের মত। দক্ষিণ দিক্ থেকে এল। কিন্তু এখানে মেসিনগান চালাবে কে? তাও রাতের বেলা?"

"জানি না বাওয়ানা। গিয়ে দেখে আসব কি?"

"না। কাল-সকালে দেখা যাবে। এখন যাও, ঘুমিয়ে পড়গে।"

"ঠিক আছে বাওয়ানা। শুভরাত্রি।"

"শুভরাত্রি। কর্তব্যরত শান্ত্রীকে সজাগ থাকতে বলে দাও।"

নিগ্রোটি নীচু হয়ে অভিবাদন করে চলে গেল।

বন্দুকবাজ প্যাট্রিক বলে উঠল, "এই তো জীবন। সপ্তাহের পর সপ্তাহ একটাও পুলিশ চোখে পড়ে নি।"

লাফায়েৎ স্মিথ হেসে বলল, "একমাত্র পুলিশকেই যদি তোমার ভয় হয় ড্যানি, তাহলে আরও বেশ কয়েক সপ্তাহ তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

ড্যানি বলল, "কে বলেছে আমি পুলিশকে ভয় পাই। ভয় পাবার মত একটা পুলিশও তো আজ পর্যন্ত চোখে পড়ল না। সব তো কাঠের পুতুল। যত সব—"

স্মিথ বলল, "খুব হয়েছে। এদিকে ওগোনিও কি বলেছে জান? আমরা নাকি সিংহের দেশে এসে পড়েছি। হয়তো এখানেই তাদের দেখা মিলে যাবে।"

বলতে বলতেই দূরের জঙ্গলের অন্ধকারের ভিতর থেকে একটানা কাশির শব্দ, আর তার পরেই একটা বজ্র-গর্জনে মাটি কেঁপে উঠল।

"সিম্বা!" একটি নিগ্রো চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আধ ডজন মানুষ ছুটে গিয়ে ধুনিতে আরও কাঠ ফেলে দিল।

বন্দুকবাজ প্যাট্রিক একলাফে তাঁবুতে ঢুকে গেল। একটু পরেই বেরিয়ে এল একটা টম্‌সন সাবমেসিনগান হাতে নিয়ে।

আবার সিংহের গর্জনে বাইরের স্তব্ধ অন্ধকার যেন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। এবার এত কাছে যে দুজনই চমকে উঠল।

কুলিরা ভয় পেয়ে আগুনের আরও কাছে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে বসল। আস্কারিরা রাইফেলের ঘোড়ায় আঙুল রাখল। বন্দুকবাজ এগিয়ে গিয়ে বলল, "কোথায়?"

সর্দার ওগোনিও বলল, "ওই তো, ওখানে কি যেন নড়ছে বলে মনে হচ্ছে।"

ড্যানি অন্ধকারে ভাল করে তাকাল। কিছুই দেখতে পেল না। এমন সময় দূর থেকে একটা খস্‌-খস্‌ শব্দ কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু ভেঙে বসে শব্দ লক্ষ্য করে মেসিনগানটা তাক করল। তারপরেই—রাট্‌-আ-টাট্‌—টাট্‌। সে শব্দ থামলেই শোনা গেল, কে যেন গাছপালা ভেঙে অনেক দূরে চলে গেল।

স্মিথের দিকে ফিরে ড্যানি বলল, "ঠিক মেরেছি।"

"মার নি, আহত করেছ," স্মিথ বলল।

ওগোনিও বলল, "সিম্বা আহত হয় না বাওয়ানা।"

ড্যানি বলল, "কি করে জানলে? তুমি তো দেখতে পাও নি।"

সর্দার বলল, "আহত হলে সে আক্রমণ করত। শব্দ শুনেই ওটা পালিয়ে গেছে।"

স্মিথ বলল, "ও কি ফিরে আসবে বলে মনে হয়?"

সর্দার বলল, "তা জানি না বাওয়ানা। সিম্বা কখন কি করবে তা কেউ বলতে পারে না।"

ড্যানি জোর গলায় বলল, "ফিরে আর আসবে না। আমার টাইপরাইটারের এক খোঁচাতেই পগার পাড় হয়েছে।"

ধীরে ধীরে শিবিরের হৈ-চৈ থেমে গেল। দুই বাওয়ানা তাঁবুতে ঢুকল। অধিকাংশ কুলিই শুয়ে পড়ল। শিবিরের দুই দিকে ধুনির পাশে পাহারায় রইল দুই আস্কারি।

সকলের ঘুমের সুযোগে বাদামী-দেহ পশুটা ধীরে ধীরে এগোতে লাগল ধুনি লক্ষ্য করে। তার হলুদ-সবুজ চোখ দুটি একজন আস্কারির উপর নিবদ্ধ। রাইফেলের উপর ভর রেখে সে ঘুম-ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছে। একবার হাই তুলে ঘুরে দাঁড়াল। ধুনিতে আরও কিছু কাঠ ফেলে দিতে সে পিছনে রাখা শুকনো ডালপালার দিকে ঘুরল। সেই সুযোগে নুমা গোঁ-গোঁ শব্দ করে তার উপর লাফিয়ে পড়ল।

খাটিয়ায় শুয়ে বন্দুকবাজ প্যাট্রিক জেগেই ছিল। শব্দটা কানে আসতেই "টমসন" টাকে হাতে নিয়ে একলাফে বাইরে বেরিয়ে গেল। নুমার হিংস্র নখর প্রথমে আস্কারিটির কাঁধে, তারপর তার মুখের উপর বসে গেছে। সে প্রাণপণে চীৎকার করছে। সে চীৎকার শুনে শিবিরের লোকজন ছুটে এল। সকলের ভয়ার্ত চোখের সামনে ক্ষুধার্ত নুমা তখন তার শিকারের কাঁধে থাবার নখর বসিয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলেছে অন্ধকার জঙ্গলের দিকে। হাঁটু ভেঙে বসে "পজিশন" নেবার মত সময়টুকুও না নিয়ে প্যাট্রিক মেশিনগানটাকে কাঁধে তুলে নিল। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। পশুটাকে গুলিবিদ্ধ করতে পারলেই লোকটা বেঁচে যাবে। সকলে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু বিপত্তি ঘটল। গুলিতে নুমা আহত হল মাত্র। তবু আগ্নেয়াস্ত্রটির কান ফাটানো শব্দ, আহত হবার ফলে জাগ্রত ক্রোধ, আর শিকার হারাবার আশংকায় নুমা শিকারকে মাটিতে ফেলে দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা রুখে এল ড্যানি প্যাট্রিকের দিকে।

আরও সঠিক নিশানার জন্য প্যাট্রিক ততক্ষণে হাঁটু ভেঙে বসেছে। তার পিছনেই লাফায়েৎ স্মিথ—হাতে একমাত্র অস্ত্র অনেক দিনের পুরনো একটা '৩২ ক্যালিবারের রিভলবার। তবু সে নির্ভয়, কারণ সে জানে যতক্ষণ ড্যানির হাতে সাবমেশিনগান আছে ততক্ষণ কোন ভয় নেই। ওটাতে পর পর একশ' গুলি সাজানো আছে। কিন্তু হায়! ঘোড়া টেপার সঙ্গে সঙ্গে একটা আগুনের ঝিলিক বেরিয়েই যন্ত্রটা থেমে গেল। ভিতরে কোথাও জাম হয়ে গেছে।

বন্দুকবাজের মাথা খারাপ হবার মত অবস্থা। সম্মুখে সাক্ষাৎ মৃত্যু। সে কী করবে? পাগলের মত যন্ত্রের ভিতর থেকে ফাঁকা কার্তুজটাকে তুলে

নেবার চেষ্টা করবে? লাফায়েৎ স্মিথই বা কি করবে?

কাউকে কিছুই করতে হল না। বুঝিবা তাদের করবার কিছু ছিলও না। কটি-বস্ত্রমাত্র পরিহিত একটি সুকঠিন ব্রোঞ্জ-দেহ প্রায়-উলঙ্গ মানুষ মাথার উপরকার গাছের ডাল থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল আক্রমণকারী নুমার পথের মাঝখানে। তার হাতে একটি ভারী বর্শা। নুমার ক্রুদ্ধ থাবা এসে পড়ল সেই বর্শার উপর।

নুমার সে ধাক্কায় অন্য যে কোন মানুষ ধরাশায়ী হত; কিন্তু এ লোক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, আর তার বর্শাটা হিংস্র জন্তুটার বুকে পুরো দু' ফুট বিঁধে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি এক পাশে সরে দাঁড়াল। ক্ষণিকের জন্য নুমাও কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল; কি করবে ঠিক বুঝে ওঠার আগেই লোকটা একলাফে তার পিঠের উপর চড়ে বসল; এক হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল তার গলা, ইস্পাতের মত শক্ত দুই পা দিয়ে চেপে ধরল তার কোমর, আর ডান হাতে মস্ত বড় ছুরির ফলাটা বিঁধিয়ে দিল তার পেটে। আবার—আবার। হিংস্র জন্তুটা রক্তাক্ত দেহে গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে মাটিতে এলিয়ে পড়ল।

নুমার গলাটা এক পায়ে চেপে ধরে লোকটি তার বর্শাটা একটানে খুলে নিল। তারপরই ঘুরে দাঁড়াল সাদা মানুষ দুটির দিকে। বুঝিয়ে দিল যে তাদের উপস্থিতির কথাটা সে ভুলে যায় নি।

বন্দুকবাজ প্যাট্রিকের মুখ দিয়ে শুধু একটা শব্দই বের হল—"গীজ্‌!"

শান্ত চোখে তাদের দিকে তাকিয়ে লোকটি শুধাল, "তোমরা কারা? এখানে কি করছ?"

কথাগুলো ইংরেজিতে বলায় লাফায়েৎ স্মিথ যেমন বিস্মিত হল, তেমনি স্বস্তিও পেল। বলল, "আমি একজন ভূ-বিজ্ঞানী। আমার নাম স্মিথ—লাফায়েৎ স্মিথ। আমার সঙ্গীর নাম মিঃ প্যাট্রিক। আমি এখানে এসেছি সরেজমিনে কিছু গবেষণার কাজ করতে—একান্তভাবেই একটা বৈজ্ঞানিক অভিযান।"

মেসিনগানটা দেখিয়ে নবাগত প্রশ্ন করল, "ওটাও কি ভূ-তত্ত্ব গবেষণার একটা অঙ্গ?"

উত্তর দিল স্মিথ, "বিচিত্র স্বভাবের সব মানুষজনে ভর্তি এই দেশে আসতে আমি কোনরকম ঝুঁকি নিতে চাই নি। কি জান, জাহাজে কেউ কেউ আমাকে বলেছে, এখানকার অনেক বাসিন্দাই মানুষ খায়।"

একটু হেসে লোকটি স্মিথকে বলল, "তুমি কোথায় গবেষণা চালাতে চাও?"

স্মিথ জবাব দিল, ' আপাতত চলেছি ঘেঞ্জি পর্বতমালার দিকে।"

লোকটি বলল, "ঘেঞ্জিতে খুব সাবধানে চলাফেরা করো। শুনেছি, বর্তমানে একদল ক্রীতদাস-শিকারী সেখানে ঘাঁটি পেতেছে। তোমার লোকজন সে কথা জানতে পারলে তোমাদের ফেলে পালাবে।"

স্মিথ বলল, "তুমি আমাদের সতর্ক করে দিলে, সে জন্য অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু কার কাছে আমরা এতটা ঋণী হলাম সেটা জানতে ইচ্ছা করছে—" কিন্তু ততক্ষণে লোকটি উধাও। যেমন নিঃশব্দে রহস্যের মত সে এসে হাজির হয়েছিল, ঠিক সেই ভাবেই একলাফে একটা ডাল ধরে ঝুলে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। দুটি সাদা মানুষ সবিস্ময়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ড্যানি বলল, "গীজ্‌! আচ্ছা ওগোনিও, লোকটা কে? তোমরা কেউ ওকে চেন?"

সর্দার জবাব দিল, "হ্যাঁ বাওয়ানা। এই হল অরণ্যরাজ টারজন।"

৬—চিন্নেরেথ হ্রদের জলে

মিডিয়ান দেশের উপত্যকার একেবারে নীচে অবস্থিত হ্রদটার দিকে এগিয়ে চলেছে লেডি বারবারা কলিস ধূলি-ধূসরিত পথ ধরে। তার ডান দিকে চলেছে আব্রাহামের ছেলে আব্রাহাম, বাঁদিকে চলেছে স্বর্ণ-কেশিনী জেজেবেল। তাদের পিছনে বিষণ্ণমুখ একটি তরুণীকে ঘিরে এগিয়ে চলেছে শিষ্যের দল। তারও পিছনে সর্দারদের নেতৃত্বে চলেছে বাকি গ্রামবাসীরা।

লেডি বারবারার মনে আশংকা দেখা দিয়েছে। একটা বিচিত্র ধর্মীয় পরিবেশের মধ্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাবার ফলে সে অনেক কিছু শিখেছে। শিখেছে তাদের ভাষা। আর তাই সে বুঝতে পারছে যে তার দেবী-মহিমা সম্পর্কে ইদানিং আব্রাহামের ছেলে আব্রাহামের মনে সন্দেহ জেগেছে।

শোভাযাত্রীরা হ্রদের তীরে এসে হাজির হল। এখানকার লোকরা মনে করে হ্রদটা অতলান্ত। যে জায়গাটায় এসে তারা থামল সেখানে জমাট লাভা-পাথরের কয়েকটা বড় চাঁই হ্রদের উপর ঝুলে আছে। আব্রামের পুত্র আব্রাহাম শিষ্যদের নিয়ে তারই একটা পাথরের উপর বসল। তাদের মাঝখানে সেই তরুণীটি। জিহোবার একটিমাত্র ইঙ্গিতে আধা ডজন যুবক এগিয়ে এল। তাদের একজনের হাতে শক্ত সুতোর একটা জাল, অপর দুজনের হাতে একটা ভারী জমাট লাভার চাঁই। দ্রুতগতিতে তারা ভীত, ত্রস্ত, আর্তনাদকারী তরুণীটির উপর জালটাকে ছড়িয়ে দিয়ে লাভা-পাথরটাকে তার সঙ্গে বেঁধে দিল।

আব্রাহামের পুত্র আব্রাহাম মাথার উপর হাত তুলে সংকেত করতেই অন্য সকলে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল। সে তখন অতিপরিচিত হযবরল-র মত এমন কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করতে লাগল যেটা মিডিয়ান ভাষা নয়, কোন ভাষাই নয়। জেজেবেলের কাছেই লেডি বারবারা জেনেছে, যে শিষ্যদের উদ্দেশে কথাগুলি বলা হয় তারা তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারে না।

মেয়েটি ততক্ষণে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এলিয়ে পড়েছে। যুবকরা

জালটাকে শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

সহসা আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম অর্থহীন মন্ত্র ছেড়ে স্থানীয় ভাষায় বলতে লাগল, "মেয়েটি পাপ করেছে, তাই তাকে শাস্তি পেতেই হবে। তবে অপার করুণাময় জিহোবার ইচ্ছায় তাকে আগুনে পোড়ানো হবে না, চিন্নেরেথের জলে তাকে তিনবার ডোবানো হবে যাতে তার শরীর থেকে সব পাপ ধুয়ে যায়।"

কথা শেষ করে ইঙ্গিত করতেই চারটি যুবক দু'দিক থেকে জালটাকে তুলে ধরল, আর বাকি দু'জন ধরে রইল জালের লম্বা দড়িটার দুই প্রান্ত। এবার তারা দুই প্রান্ত থেকে মেয়েটিকে দোলাতে লাগল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত। চেন্নেরেথ হ্রদের শান্ত জলরাশির উপর দোদুল্যমান মেয়েটির আর্ত চীৎকারের সঙ্গে মিশে গেল সেই সব দর্শকদের চীৎকার ও আর্তনাদ যাদের দুর্বল স্নায়ু এই চরম উত্তেজনা সহ্য করতে না পেরে আকস্মিক অপস্মার রোগের প্রকোপে মাটিতে পড়ে গোঙাতে শুরু করেছে।

ভীত ত্রস্ত মেয়েটিকে যুবকরা ক্রমেই দ্রুততর বেগে দোলাতে লাগল। হঠাৎ তাদের একজনও মাটিতে এলিয়ে পড়ল। তার ফেনায়িত মুখ থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ বের হতে লাগল। মেয়েটির নরম দেহটা শক্ত লাভা-পাথরের উপর আছড়ে পড়ল। জেহোবার ইঙ্গিতে আর একটি যুবক এসে তার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটি অবিরাম দুলতে লাগল একবার চিন্নেরেথের জলের উপর, একবার শক্ত লাভা-পাথরের উপর।

জাল দোলানোর তালে তালে আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম মন্ত্রের মত উচ্চারণ করতে লাগল, "জিহোবার নামে। আর তার পুত্র পলের নামে!"

এটাই বোধ হয় সংকেত। চার যুবক সঙ্গে সঙ্গে জালের দড়িতে ঢিলে দিল, আর জালশুদ্ধু মেয়েটি সটান ডুবে গেল হ্রদের জলে। খানিকটা জল ছল্‌কে উঠল। তার ঢেউ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ল হ্রদের বুকে। কয়েক সেকেণ্ড সব চুপ-চাপ। শুধু শোনা যেতে লাগল মিডিয়ানদের অনিবার্য নিয়তির শিকার আরও অনেক অপস্মারগ্রস্ত মানুষের আর্তনাদ ও গোঙানির শব্দ।

কয়েক সেকেণ্ড পরে আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম আবার সংকেত দিতেই ছয় যুবক জালশুদ্ধু মেয়েটিকে টেনে তুলল জলের উপরে। কিছুক্ষণ সেইভাবে রেখে পয়গম্বরের নির্দেশে আবার তাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে ধরল।

লেডি বারবারা আর ক্রোধ সংযত করতে পারল না; চেঁচিয়ে বলে উঠল, "খুনী কোথাকার! ডুবে মরবার আগে মেয়েটিকে ডাঙায় তোলার হুকুম দাও!"

আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম এমন উন্মাদের মত ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল যাতে তার বুকের রক্ত বুঝি জমে হিম হবার যোগাড়। চীৎকার করে বলল, "চুপ কর, নাস্তিক কোথাকার। কাল রাতে আমি জেহোবোর পাশাপাশি হেঁটেছি। সেই আমাকে বলেছে, তুমিই হবে পরবর্তী শিকার।"

লেডি বারবারার আস্তিন ধরে টেনে জেজেবেল ফিস্ ফিস্ করে বলল, "দোহাই তোমার, ওকে আর রাগিও না ; তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।"

পয়গম্বরের নির্দেশে মেয়েটিকে আবার জলের উপরে তুলে ধরা হল। উত্তেজনায় ঝুঁকে পড়ে লেডি বারবারা দেখল, মেয়েটি ভীষণ হাঁপাচ্ছে। তখনও মরে নি, কিন্তু আর একটা চুবুনি খেলে তার মৃত্যু অনিবার্য।

পয়গম্বরের দিকে তাকিয়ে মিনতি-ভরা গলায় বলল, "দয়া কর! ওকে আর জলে ডোবাবার আদেশ দিও না।"

আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহামের কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হল সংকেত। অচেতন মেয়েটিকে আবার জলে ডোবানো হল। নিরুপায় লেডি বারবারা নতজানু হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগল। একটা পুরো মিনিট প্রার্থনার পরে মেয়েটিকে জলের নীচ থেকে তোলবার নির্দেশ দিল পয়গম্বর। চীৎকার করে বলল, "এবার যদি সে জেহোবার চোখে নিষ্পাপ হয়ে থাকে তাহলে সে জাল থেকে জীবন্ত বেরিয়ে আসবে। আর যদি সে মরে গিয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে সেটাই জোহোবার ইচ্ছা।"

ছয় যুবক জালটাকে তুলে মেয়েটির অসার দেহটাকে পাথরের উপর নামিয়ে দিল ঠিক সেইখানে যেখানে লেডি বারবারা নতজানু হয়ে প্রার্থনায় রত।

পয়গম্বর তার দিকে ফিরে বলল, "কি করছ তুমি?"

"অসহায় মেয়েটির জীবন রক্ষার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।"

মুখ বিকৃত করে পয়গম্বর বলল, "ওই দেখ তোমার প্রার্থনার জবাব। মেয়েটি মরে গেছে। এর দ্বারা জেহোবা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহামই তার পয়গম্বর, আর তুমি একটি ধাপ্পাবাজ।"

জেজেবেল অস্পষ্ট গলায় বলল, "আর আমাদের রক্ষা নেই!"

সেটা লেডি বারবারাও বুঝতে পারল ; তবু সংকটকালে আত্মহারা না হয়ে পয়গম্বরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বলল, "হ্যাঁ, মেয়েটি মারা গেছে, কিন্তু জেহোবা তাকে নতুন জীবন দান করতে পারে।"

আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম বলল, "তা পারে, কিন্তু দেবে না।"

"তোমার কথায় দেবে না, কারণ সে তোমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে ; তার পয়গম্বর হয়েও তুমি তাকে অমান্য করেছ।" দ্রুতপায়ে প্রাণহীন দেহটার পাশে এগিয়ে গিয়ে লেডি বারবারা আবার বলল, "কিন্তু আমার প্রার্থনায় জেহোবা ওকে নতুন জীবন দেবে। এস জেজেবেল, আমাকে সাহায্য কর।"

আধুনিক খেলা-ধূলায় অভিজ্ঞ অন্য অনেক নারীর মতই লেডি বারবারাও জলমগ্ন মানুষের চিকিৎসা-পদ্ধতি বেশ ভালই জানে। সেই সব প্রক্রিয়াই সে মেয়েটির উপর প্রয়োগ করতে লাগল। কিন্তু তার সঙ্গে একটু ভড়ংও যোগ করল সমবেত নর-নারীদের মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগাতে। তার নানা রকম

নির্দেশমত জেজেবেল কাজ করতে লাগল, আর লেডি বারবারা মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে গড় গড় করে আবৃত্তি করতে লাগল কখনও "চার্জ অব্ দি লাইট বিগ্রেড" থেকে, কখনও "এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড" থেকে, আবার কখনও কিপ্লিং বা ওমর খৈয়াম থেকে। এইভাবে দশ মিনিট চিকিৎসার পরে মেয়েটির দেহে যখন জীবনের লক্ষণ দেখা দিল তখন সে লিংকনের "গেটিসবুর্গ ভাষণ"-এর অংশবিশেষ আবৃত্তি করে তার মন্ত্র পাঠ শেষ করল।

পয়গম্বর, শিষ্যবৃন্দ, প্রধানগণসহ সমবেত জনতা মুগ্ধ বিস্ময়ে এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করল।

উঠে দাঁড়িয়ে লেডি বারবারা তখনও আবৃত্তি করে চলেছে, "জনগণের কল্যাণে জনগণকে নিয়ে গঠিত জনগণের এই সরকার কখনও পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবে না।" মুখ ফিরিয়ে জালধারী ছয় যুবককে আদেশ করল, "মেয়েটিকে ওই জঙ্গলের মধ্যে শুইয়ে তার বাবা-মার কাছে নিয়ে যাও। এস জেজেবেল!" আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহামের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না।

সেদিন রাতে দুটি মেয়ে তাদের গুহার মুখে বসে মিডিয়ানের সীমাহীন বিস্তারের দিকে তাকিয়েছিল। ভরা চাঁদের রূপোলি আলো পড়ে সব কিছু চকচক করছে মাঝখানে চিন্নেরেথের নিঃশব্দ জলরাশি একটা বার্ণিশ-করা ঢালের মত দেখাচ্ছে।

জেজেবেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "কী সুন্দর।"

লেডি বারবারা শিউরে উঠে বলল, "কিন্তু মানুষ তাকে কী ভয়ংকর করে তুলেছে।"

স্বর্ণকেশিনী বলল, "রাতের বেলায় যখন একা থাকি তখন কেবল সুন্দরকেই দেখি, মানুষের কথা একেবারে ভুলে থাকি। আচ্ছা বারবারা, তুমি যে দেশ থেকে এসেছ সেখানেও কি এত নিষ্ঠুরতা ও দুর্ব্যবহার আছে?'

বারবারা বলল, "কি জান, যেখানে মানুষ আছে সেখানেই নিষ্ঠুরতা ও দুর্ব্যবহার আছে, তবে আমাদের দেশের অবস্থা এখানকার মত এত খারাপ নয়।"

তারা দু'জন খোশমেজাজে এই সব আলোচনায় মেতে উঠল। হঠাৎ খাড়াই পথে পায়ের শব্দে তারা কান খাড়া করল। জেজেবেল বলল, "কে যেন আসছে।"

লেডি বারবারা বলল, "এত রাতে কেউ আমাদের গুহায় আসবে না।" তবু পকেট থেকে একটা ছোট ছুরি বের করে তার ফলাটা খুলে ফেলল।

পায়ের শব্দ ক্রমেই এগিয়ে আসছে। গুহার মুখে একটু ভিতরে বসে থাকার জন্য মেয়েটি খাড়া পথ বেয়ে উঠে-আসা লোকটিকে দেখতে পাচ্ছে না। একটু পরেই গুহার মুখে একটা ছায়া পড়ল, আর পরমুহূর্তে গুহার মুখে পা রাখল একটি দীর্ঘকায় বৃদ্ধ। আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম।

লেডি বারবারা তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, "এত রাতে আমার গুহায় কেন এসেছ ?"

তার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আব্রাহাম পুত্র আব্রাহাম বলল, "চাঁদের আলোয় জেহোবার সঙ্গে হাঁটছিলাম। তার কথামতই আমি এখানে এসেছি।"

"তার নির্দেশমত তুমি কি এখানে এসেছ আমার সঙ্গে সন্ধি করতে ?"

"মোটেই না। বরং জেহোবা তোমার উপর খুব রেগে গিয়েছেন।"

"কারণ ?"

"কারণ তার পয়গম্বরকে তুমি ঠকিয়েছ। ঠকিয়েছ তোমার চালাকি দিয়ে, তোমার যাদুবিদ্যা দিয়ে। জেহোবার ইচ্ছায় যার মৃত্যু হয়েছিল তাকে তুমি জীবন দান করেছ।"

লেডি বারবারা এবার কঠিন কণ্ঠে জবাব দিল, "নিজের কানে তুমি আমার প্রার্থনা শুনেছ, নিজের চোখে দেখেছ কেমন করে সে জীবন ফিরে পেল। তুমি কি মনে কর যে আমি জেহোবার চাইতেও শক্তিশালী ? তা নয়। জেহোবাই তাকে নতুন জীবন দিয়েছে।

বাঁকা হাসি হেসে পয়গম্বর বলল, "তুমি যে এসব কথা বলবে তা জেহোবা আগেই বলে দিয়েছে। কিন্তু তুমি যে মিথ্যাবাদী সেটা প্রমাণ করার হুকুমই জেহোবা আমাকে দিয়েছে।"

"তুমি মিথ্যা কথা বলছ।"

লোকটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, "তোমার এত সাহস যে পয়গম্বরের কথায় সন্দেহ কর ? কালই তোমার বিচার হবে। বিচার করবে স্বয়ং জেহোবা। কালই একটা পাথর-বাঁধা জালে করে তোমাকে ডুবিয়ে দেওয়া হবে চিন্নেরেথের জলে। পুনরায় টেনে তুলবার মত কোন দড়িই থাকবে না সে জালে।"

৭—ক্রীতদাস-শিকারী

একজন অশ্বারোহী লুঠেরার পিছনে বসে বন্দী লিওন স্তাবুচ অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছে। ঘটনাচক্রে একবার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলেও যে কোন দ্বিতীয় সুযোগেই লুঠেরারা যে তাকে শেষ করে ফেলবে তা সে বুঝতে পারছে।

একটা পাহাড়ি খাড়ি-পথ ধরে লুঠেরারা এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ পরেই দূরে একটা প্রাচীর-ঘেরা গ্রাম দেখতে পেল স্তাবুচ।

লুঠেরারা সেই গ্রামে ঢুকে পড়ল। প্রাচীরের পিছনে পাহারারত শান্ত্রীরা এবং অন্য গ্রামবাসীরা চীৎকার করে তাদের অভ্যর্থনা জানাল। সকলে একটা বড় মাঠে সমবেত হল। মাঠের চারদিক ঘিরে অধিবাসীদের ছোট ছোট ঘর-

বাড়ি। একজন এসে স্তাবুচকে টেনে-হিঁচড়ে ঘোড়া থেকে নামিয়ে আনল।

সেই সময় একটা ভাঙা ঘর থেকে বেরিয়ে এল একটি বেঁটে দাড়িওয়ালা সাদা মানুষ। তাকে দেখেই স্তাবুচ যেন কিছুটা স্বস্তি পেল।

দলের সর্দার সেই দাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে সব কথা বলতে লাগল। সেই ফাঁকে স্তাবুচকে সেখানে নিয়ে আসা হল।

সর্দারের সব কথা শুনে দাড়িওয়ালা হাসিমুখে স্তাবুচকে কি যেন বলল। স্তাবুচ বুঝল যে লোকটি ইতালীয় ভাষায় কথা বলছে। কিন্তু সে ভাষা তো সে বুঝতেও পারে না। সেই কথাটাই সে রুশ ভাষায় তাকে বোঝাতে চেষ্টা করল। দাড়িওয়ালা কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে মাথা নাড়ল। তখন স্তাবুচ ইংরেজিতে কথা বলল।

দাড়িওয়ালা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বলল, "এটা বরং ভাল। ইংরেজি ভাষা আমি একটু-একটু বুঝি। তুমি কে? প্রথমে কোন্ ভাষায় কথা বলেছিলে? কোন্ দেশ থেকে এসেছ তুমি?"

স্তাবুচ বলল, "আমি একজন বিজ্ঞানী। আগে কথা বলেছিলাম রুশ ভাষায়।"

"রাশিয়া কি তোমার দেশ?"

"হ্যাঁ।"

লোকটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল; মনে হল, সে যেন স্তাবুচের মনের সব কথা জানতে চেষ্টা করছে। লোকটির শরীর শক্ত ও মজবুত, দুটি ঠোঁটের নিষ্ঠুরতার ছাপ কালো দাড়িতে কিছুটা ঢাকা পড়েছে, চোখ দুটি অনুসন্ধিৎসু। এবার স্তাবুচের মনে হল, এর চাইতে কালো লুঠেরাদের হাতে পড়াই বুঝি ভাল ছিল।

লোকটি শুধাল, "তুমি বলছ তুমি রুশ। তা লাল না সাদা?"

কি যে জবাব দেবে, লাল না সাদা কোন্‌টা বলা তার পক্ষে ভাল হবে, কিছু বুঝতে না পেরে স্তাবুচ বলে ফেলল, "আমি লাল।"

এক মুহূর্তের জন্য নীরবে তার দিকে তাকিয়ে থেকে লোকটি এমন একটা ভঙ্গী করল যেটা একমাত্র একজন লাল কমুনিষ্টই বুঝতে পারে। লিওন স্তাবুচ নিঃশব্দে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

এবার পরিবর্তিত সুরে দাড়িওয়ালা শুধাল, "তোমার নাম কি কমরেড?"

"আমার নাম লিওন স্তাবুচ। আর তোমার নাম কি কমরেড?"

"দোমিনিক কাপিয়েত্রো। এস, ভিতরে গিয়ে সব কথা হবে। আমার কাছে একটা বোতল আছে। সেটা দিয়েই শুভ-সূচনা করা যাবে।"

"তাই চল কমরেড। শ্রান্তি-অপহারক কিছু আমারও বড়ই দরকার। বেশ কিছু সময় বড় কষ্টে কেটেছে।"

ঘরের ভিতরে যেতে যেতে কাপিয়েত্রো বলল, "আমার লোকদের হাতে তোমার যে হেনস্তা হয়েছে সেজন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আবার সব ঠিক

হয়ে যাবে। বস। দেখতেই পাচ্ছ, আমি খুব সাদাসিদে জীবন-যাপন করি। কিন্তু ধরিত্রী মায়ের কোল থেকে কোন্ রাজ-সিংহাসন বড় তা বলতে পার ?"

"কিছু না, কিছু না কমরেড, বিশেষ করে সে কোল যদি হয় কোন বন্ধুর ছাদের তলায়।"

কাপিয়েত্রো পুরনো থলে হাতড়ে একটা বোতল বের করল। কর্ক খুলে স্তাবুচের হাতে বোতলটা দিয়ে বলল, "সোনার পাত্র তো অত্যাচারী রাজাদের জন্য, আমাদের মত লোকদের জন্য নয় ; না কি বল কমরেড ?"

স্তাবুচ বোতলটা তুলে গলায় ঢেলে দিল। সেই জ্বালাময় তরল পদার্থটি পেটে পড়তেই তার ধোঁয়া উঠে গেল তার মাথায়। সঙ্গে সঙ্গে তার মন থেকে সব ভয়, সব সংশয় দূর হয়ে গেল। বোতলটা গৃহস্বামীর হাতে দিয়ে বলল, "এবার বল কেন আমাকে ধরে এনেছে, তুমিই বা কে, আর এখন আমার কি হবে ?"

"সর্দার আমাকে বলেছে, লোকজন পরিত্যক্ত অবস্থায় সে তোমাকে দেখতে পায়। তুমি বন্ধু কি শত্রু বুঝতে না পেরে তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছে। তোমার ভাগ্য ভাল যে দোঙ্গো সর্দারের হাতে পড় নি। আমার এই লোকগুলো সব খুনে, চোর। অবশ্য ওদেরও দোষ দেওয়া যায় না। সারা জীবন মনিবদের হাতে অনেক অত্যাচার ওরা সহ্য করেছে। কিন্তু ওরা লোক ভাল। ওরাই তো আমার বল-ভরসা। আমি ওদের মাথা। যা কিছু জোটে, দু'দলে ভাগ করে নিই ; এক ভাগ ওদের, এক ভাগ আমার।"

স্তাবুচ বলল, "তুমি নিজে কাজকর্ম কি কর ?"

কাপিয়েত্রোর মুখে ভ্রূকুটি দেখা দিল। পরমুহূর্তেই হেসে বলল, "তুমি একজন কমরেড, কিন্তু তবু বলছি কৌতূহল সব সময় ভাল নয়।"

স্তাবুচ কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "বেশ তো, কিছুই বলো না। ওটা তো আমার কোন ব্যাপারই নয়।"

ইতালীয় ভদ্রলোক বলল, "খুব ভাল কথা। তুমি কেন আফ্রিকায় এসেছ সেটাও আমার কোন ব্যাপার নয়। এস, আর এক হাত বসা যাক।"

পাত্রের পর পাত্র মদ ফুরোতে লাগল। ক্রমে দুজনের মেজাজও দিল-দরিয়া হয়ে উঠল। সামনে দুটো খালি বোতল ; আর একটা নতুন খোলা হয়েছে। মদের ঝোঁকে স্তাবুচের গলা জড়িয়ে ধরে ভদ্রলোকটি নিজে থেকেই বলতে শুরু করল, "কমরেড, তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। দোমিনিক কাপিয়েত্রো পুরুষ মানুষকে পছন্দ করে না। তার জীবনের মূলমন্ত্র : কোন পুরুষকে পছন্দ করো না, ভালবাসো সব নারীকে।" বলেই সে হো-হো করে হেসে উঠল।

সে হাসিতে যোগ দিয়ে স্তাবুচ বলল, "সত্যি, 'কোন পুরুষকে পছন্দ করো না, ভালবাসো সব নারীকে।' একটা কথার মত কথা বটে।"

কাপিয়েত্রো আবার বলল, "তোমাকে দেখেই বুঝেছি তুমি আমার মনের মত মানুষ। অতএব দুই কমরেডের মধ্যে গোপন কিছু থাকতে পারে না।

স্তাবুচ বলল, "কেনই বা থাকবে ?"

"অতএব আমাকে বলতেই হবে কেন আমি এই নোংরা গলা-কাটা লোকগুলোর সঙ্গে হাত মিলিয়েছি। আমি ছিলাম ইতালীয় বাহিনীর একজন সৈনিক। আমার রেজিমেণ্ট তখন ইরিত্রিয়াতে অবস্থিত। একজন সাচ্চা কমুনিস্ট হিসাবে সেখানেই বিভেদ ও বিদ্রোহের উস্কানি দিতে শুরু করলাম, আর একটা ফ্যাসিস্ট কুকুর কম্যাণ্ডিং অফিসারকে কথাটা বলে দিল। আমি গ্রেপ্তার হলাম। আমাকে নির্ঘাৎ গুলি করে মারা হত, কিন্তু তার আগেই আমি আবিসিনিয়াতে পালিয়ে গেলাম।

"একটা চাকরিও জুটে গেল। একজন শক্তিশালী উজিরের সেনাদলকে ইওরোপীয় প্রথায় শিক্ষা দেবার কাজ। সেখানেই ভালভাবে শিখে ফেললাম সে দেশের সরকারী ভাষা আম্‌হারিক আর সেখানকার অধিকাংশ মানুষের ভাষা গালাস। স্বভাবতই আমার রাজতন্ত্রবিরোধী মন বুড়ো উজিরের লোকজনদের মধ্যে কমুনিজমের বাণী প্রচার করতে শুরু করে দিল। এবারও এক গুপ্তচর আমার সব ব্যবস্থা পণ্ড করে দিল। নিজে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালালাম।

"অবশ্য এবার তাদের ভিতর থেকে একদল সৈন্যকে ভুলিয়ে দলে টেনে নিয়ে এলাম। কিছু ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্রও চুরি করলাম। পথে একদল ডাকাতকেও দলে ভিড়িয়ে নিলাম।

"তাদের নিয়েই শুরু করলাম পথে পথে চুরি-ডাকাতি। কিন্তু তাতে মালকড়ি সামান্যই জুটত। কাজেই সুদূর ঘেঞ্জি অঞ্চলে গিয়ে শুরু করে দিলাম কালো হস্তিদন্তের ঢালাও লাভের ব্যবসা।"

"কালো হস্তিদন্ত ? এরকম কোন জিনিসের নাম তো শুনি নি।"

কাপিয়েত্রো হেসে বলল, "আরে, দু-পেয়ে হাতি।"

স্তাবুচ শিস্‌ দিয়ে বলে উঠল, "এবার বুঝতে পেরেছি। তুমি একজন ক্রীতদাস-শিকারী। কিন্তু পুঁজিবাদী দেশগুলি ছাড়া ক্রীতদাসের বাজার আর কোথায় আছে ?"

"আছে কমরেড, আছে ! বিশ্ব-সম্মেলনে ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধে আনীত প্রস্তাব স্বাক্ষরকারী অনেক সভ্য দেশেই এখনও দাস-ব্যবসায়ের রমরমা বাজার। হ্যাঁ, আমি একজন দাস-ব্যবসায়ী—বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট ও সংবাদপত্রের প্রাক্তন সম্পাদকের পক্ষে একটা উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থানই বটে।"

"তবু এটাই তুমি বেছে নিয়েছ ?"

"আমার সামনে কোন বিকল্প ছিল না। বাঁচতে তো হবে। হ্যাঁ,

আমাকে বাঁচতে হবেই। থাক, ওসব কথা। এবার তোমার কথা বল কমরেড—সোভিয়েত সরকার আফ্রিকাতে এসে কিসের ‘বৈজ্ঞানিক’ গবেষণা চালাচ্ছে ?”

“বলা যেতে পারে নৃতত্ত্ব। আমি একটি লোকের সন্ধান করছি।”

“আফ্রিকার উপকূল অঞ্চলে তো অনেক লোক আছে। তার জন্য এই সুদূর ঘেঞ্জি অঞ্চলে এসেছ কেন ?”

স্তাবুচ উত্তরে বলল, “আমি যার খোঁজ করছি তাকে ঘেঞ্জির দক্ষিণেই কোথাও পাওয়া যাবে বলে আমার ধারণা।”

“হয় তো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি। এ অঞ্চলের অনেককেই আমি অন্তত নামে চিনি।”

নেশার ঘোরে না থাকলে হয় তো একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে নামটা বলত না। সে নির্দ্বিধায় বলল, “অরণ্যরাজ টারজন নামে একজন ইংরেজকে আমি খুঁজছি।”

কাপিয়েত্রোর চোখ দুটো কুঁচকে গেল। প্রশ্ন করল, “সে কি তোমার বন্ধু ?”

“তাকে কখনও দেখিও নি,” স্তাবুচ জবাব দিল।

কাপিয়েত্রো বলল, “তার দেশ ঘেঞ্জির অনেক দক্ষিণে।”

“তুমি তাকে চেন ?”

“হ্যাঁ। কে না চেনে ? কিন্তু অরণ্যরাজ টারজনের সঙ্গে তোমার কি কাজ ?”

“আমি মস্কো থেকে এসেছি তাকে হত্যা করতে।” কথাটা বলে ফেলেই স্তাবুচের মনে হল, কাজটা ভাল হয় নি।

কাপিয়েত্রো বলল, “যাক, আশ্বস্ত হলাম।”

“কেন ?”

“আমি ভয় করেছিলাম সে তোমার বন্ধু। তাহলে তো আমরা দুজন বন্ধু হতে পারতাম না।”

স্তাবুচ বলল, “তাহলে তার প্রতি তুমিও বিরূপ ? তোমার অভিযোগটা কি ?”

“কালো হস্তিদন্ত সংগ্রহের ছোটখাট কাজে সেই আমার পথে সব চাইতে বড় বাধা। সে আমার পথ থেকে সরে গেলেই আমি বেঁচে যাই।”

স্তাবুচ বলল, “কিন্তু আমি তার খোঁজে যাব কেমন করে ? আমার লোকজন সব পালিয়েছে ; জিনিসপত্র সব নিয়ে এসেছে তোমার লোকজন।”

কাপিয়েত্রো বলল, “তাও তো বটে। যাক, সেজন্য তুমি ভেব না। তোমার জিনিসপত্র সব নিরাপদেই আছে। আর লোকজন আমি নতুন

করে যোগাড় করে দেব। দোমিনিক কাপিয়েত্রো বন্ধু থাকতে তোমার ভাবনা কি?”

লর্ড পাস্‌মোরের সাফারি ঘেঞ্জি পর্বতমালার পশ্চিম দিক ধরে এগিয়ে চলেছে দক্ষিণ দিকে। তার দীর্ঘদেহ কুলিরা সুশিক্ষিত সেনাদলের মত সঠিক পদক্ষেপে এক তালে এগিয়ে চলেছে। সর্বত্র শৃংখলার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। কেবল লর্ড পাস্‌মোরের একাধারে রাঁধুনি ও ভৃত্য আইসাজা তার ব্যতিক্রম।

আইসাজা হাঁটছে তার খুশিমত। এই এর কাছে, এই ওর কাছে গিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করছে। হো-হো করে হাসছে—গোটা দলকে যেন একেবারে মাতিয়ে রেখেছে।

পুব দিকে কয়েক মাইল এগিয়ে একটা চড়াই বেয়ে উঠবার সময় দুটি সাদা মানুষ একটি মাত্র ভৃত্য ও একটি বন্দুকবাহককে নিয়ে দল ছেড়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে চলেছে।

লাফায়েৎ স্মিথ বন্দুকবাজকে বলল, “তুমি সাফারির সঙ্গে এইখানে থাক। জায়গাটা ভাল, এখানে একটা শিবির বসাবার ব্যবস্থা কর। চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে আমি আরও কিছুটা দেখে আসি। এখনও অনেক বেলা আছে।”

বন্দুকবাজ বলল, “খুব ভাল কথা। আর চড়াই ভাঙতে পারছি না। যাবে যাও, কিন্তু দেখো যেন পথ হারিয়ে না ফেল। বরং আমার এই বন্দুকবাহকটিকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।”

স্মিথ বলল, “আমি তো শিকারে যাচ্ছি না, ওকে দরকার হবে না।”

কোমরের পিস্তলটা দেখিয়ে বন্দুকবাজ বলল, “তাহলে এই নলটা নিয়ে যাও। এটার দরকার হতে পারে।”

“ধন্যবাদ, আমার সঙ্গেও একটা আছে,” বলে স্মিথ তার ’৩২-টাতে টোকা মারল। “এতেই আমার কাজ চলবে। চলে এস ওবাম্বি।” চাকরটিকে অনুসরণ করতে বলে স্মিথ চড়াই বেয়ে উঠতে লাগল।

খোলা জায়গা পেরিয়ে লাফায়েৎ স্মিথ জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পথ ক্রমেই আরও দুরারোহ; যেমন চড়াই, তেমনি ঝোপ-ঝাড়ে ভর্তি। বেশ কষ্ট করে সে উপরে উঠতে লাগল। পায়ে পায়ে চলেছে ওবাম্বি। একটা উঁচু জায়গায় উঠে চারদিক ভাল করে দেখে আবার মোড় ঘুরে সোজা চলতে লাগল।

এক সময় একটা পাহাড়ের মাথায় উঠল। সামনে দূরে মাইলের পর মাইল জুড়ে উঁচু-নীচু পাহাড়ের সারি। এ পাহাড় থেকে সামনের পাহাড়ে যাবার পথে একটা বড় খাড়ি।

স্মিথ থামতেই ওবাম্বি শটান শুয়ে পড়ল মাটিতে। ক্লান্তিতে নয়, বিরক্তিতে। বাওয়ানা কি একেবারেই পাগল হয়ে গেছে! পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে এগিয়েই চলেছে।

ওবাম্বির দিকে তাকিয়ে স্মিথের মনে হল, অকারণেই বেচারিকে এতটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এর চাইতে তার একলা চলাই ভাল। চাকরকে বলল, "তুমি শিবিরে ফিরে যাও ওবাম্বি। তোমাকে আর আমার দরকার নেই।

কথাটা ওবাম্বির ভাল লাগল না। এবার বাওয়ানা সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছে। বিস্মিত গলায় বলল, "আমাকে বাওযানার দরকার নেই? হয়তো দরকার হবে।"

"না, দরকার হবে না। তুমি শিবিরে ফিরে যাও। আমি অচিরেই ফিরে আসব।"

"ঠিক আছে বাওযানা।" ওবাম্বি পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল।

লাফারেৎ স্মিথ খাঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। যতটা ভেবেছিল খাঁড়িটা তার চাইতেও বেশী গভীর। তবু গভীর আগ্রহে নীচে নেমে সে আবার উপরে উঠতে লাগল পরের পাহাড়টা বেয়ে। কৌতূহল তাকে এতই অভিভূত করে রেখেছে যে সময়ের দিকে কোন খেয়ালই রইল না।

খাঁড়ির উপরে উঠেই তার খেয়াল হল, দিনের আলো বেশ কমে গেছে; রাত আসন্ন। তবু পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছোবার আশায় সে ক্রমাগত উপরে উঠতে লাগল।

রাত নেমে এল। তবু সে ধীরে ধীরে উঠতে লাগল। আরও কয়েক ঘণ্টা পার হবার আগে স্মিথ বুঝতেই পারে নি যে সে পথ হারিয়ে ফেলেছে।

৮—বেবুনের দল

দেখা দিল নতুন দিন। পূবের পাহাড় শ্রেণীর পিছনকার গুহার ভিতর থেকে "কুডু"-র আত্মপ্রকাশের বহু প্রাচীন অলৌকিক ঘটনাটিকে নতুন করে অভ্যর্থনা জানাল সারা আফ্রিকা। রাতের জীবরা একে একে উধাও হয়ে গেল। জগৎটাকে যেন ছেড়ে দিয়ে গেল দিনচারী মানুষদের হাতে।

বেবুন টাঙ্গানি পাহাড়ের উপর শুয়ে সেই দৃশ্যই দেখছে। এই পাহাড়েই বাস করে রাজা জুগাস-এর দলবল। বাচ্চা-পিঠে মেয়ে বেবুনরা খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে; অন্য সকলেও তাই করছে।

দলের শান্ত্রী টোঙ্গানির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পড়ল নীচের দিকে। ছোট ছোট

পাহাড়গুলির ভিতর দিয়ে কে যেন আসছে। প্রথমে মাথা, তারপর গোটা শরীরটাই চোখে পড়ল। একজন টারমাঙ্গানি। তবু সে কোন সোরগোল তুলল না, কারণ টারমাঙ্গানিটি এখনও অনেক দূরে আছে, আর সে যে বেবুনদের রাজ্যেই আসছে তাও সঠিক বলা যায় না।

তাছাড়া, সে একটু বিব্রত বোধ করছে। এরকম টারমাঙ্গানি সে আগে কখনও দেখে নি—টারমাঙ্গানি হলেও এতো তার মতই প্রায় নগ্ন দেহে হেঁটে আসছে। চামড়া সাদা না হলে সে তো ওকে গোমাঙ্গানি বলেই ধরে নিত। তবু সে ভয় পেয়েছে; টারমাঙ্গানিদের হাতে থাকে এক ভয়ংকর বজ্র-নল।

আরে, টারমাঙ্গানি তো সোজা তাদের দিকেই আসছে। টোঙ্গানি জোর চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বেবুনদের দলে হৈ-চৈ পড়ে গেল। যে যেখানে ছিল ভিড় করে ছুটে এল। রাজা জুগাস রাগে ফেটে পড়ে চীৎকার করে বলল, “চলে যাও এখান থেকে! আমি জুগাস। আমি তোমাকে শেষ করে দেব।”

আগন্তুক দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, “আমি অরণ্যরাজ টারজন। টোঙ্গানিদের দেশে সে কাউকে মারতে আসে নি। এসেছে বন্ধুর মত।”

জুগাসের দল চুপ করে গেল। কোন টারমাঙ্গানি বা গোমাঙ্গানিকে তারা কখনও বেবুনদের ভাষায় কথা বলতে শোনে নি। অরণ্যরাজ টারজনের নামও তারা শোনে নি, কারণ তার দেশ এখান থেকে আরও অনেক দক্ষিণে। তবু সে অপরিচিত; তাই জুগাস আবার তাকে চলে যেতে হুকুম করল।

টারজন বলল, “টারজন টোঙ্গানিদের দেশে থাকতে আসে নি। সে তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চায়।”

জুগাস হুংকার দিল, “চলে যাও! নইলে মেরে ফেলব। আমি জুগাস।”

বেবুনদের মতই অতি সহজে গাছ থেকে গাছে ঝুলতে ঝুলতে টারজন পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল। তীব্র কণ্ঠে চেঁচাতে চেঁচাতে বেবুনরাও সেই দিকে ছুটে গেল। পাহাড়ের মাথাটা পেরিয়েই টারজন পড়ে গেল একদল ক্রুদ্ধ বেবুনের মুখে। তাদের সমবেত শক্তি ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে সে একা কতক্ষণ লড়বে। কিন্তু টারজন জানে এরা কখনও অকারণে আক্রমণ করে না, বা কেবলমাত্র হত্যার আনন্দেই কাউকে হত্যা করে না। তাই আর একবার সে চেষ্টা করল তাদের বন্ধুত্ব অর্জন করতে।

ক্রুদ্ধ বেবুন-রাজকে বলল, “বল তো জুগাস, সম্প্রতি অনেক টারমাঙ্গানি কি তোমাদের দেশে এসেছে? তাদের মধ্যে একজন খুব খারাপ টারমাঙ্গানি আছে। টারজন তারই খোঁজে চলেছে। তারা খুব খারাপ লোক। সব্বাইকে মেরে ফেলে। বজ্র-নল দিয়ে মারে। তারা টোঙ্গানিদের মেরে ফেলবে। তাদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতেই টারজন এসেছে।”

জুগাস তবু হুংকার ছাড়তে লাগল। অন্য বেবুনরাও লেজ বাঁকিয়ে মাথা উঁচু করে ছট্‌ফট্‌ করতে লাগল। অপেক্ষাকৃত তরুণ বেবুনরাও তাদের সর্দারের মত হুংকার করে চ্যালেঞ্জ জানাতে লাগল। একটা সংঘর্ষ আসন্ন হয়ে উঠল।

ঠিক তখনই ঘটল একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা। নীচের খাদের ভিতর থেকে বাতাসে ভেসে এল চিতাবাঘ শীতার গায়ের গন্ধ। একটা বেবুনের আতংকিত চীৎকার কানে এল। নীচে তাকিয়ে টারজন দেখল, বাচ্চাকে পিঠে নিয়ে একটা অল্পবয়সী মেয়ে-বেবুন তার দিকেই ছুটে আসছে; তাকে ধাওয়া করে আসছে শীতা।

মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে হাতের বর্শা বাগিয়ে ধরে টারজন নীচে লাফিয়ে পড়ল। মেয়ে-বেবুনটির আর্ত চীৎকার শুনে জুগাসের দলবলও ছুটে গেল।

চিতাটা বেবুন-মার প্রায় মাথার উপর এসে পড়েছে। কালবিলম্ব না করে টারজন হাতের বর্শাটা ছুঁড়ে দিল অব্যর্থ লক্ষ্যে। খাঁড়ির উপর থেকে জুগাসের দলবল সভয়ে দেখল টারজনের হাতের বর্শা বেবুন-মায়ের মাথার মাত্র কয়েক ইঞ্চি দূর দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে শীতার বুকে আমূল বিদ্ধ হল। তারাও ছুটতে লাগল খাঁড়ির ঢাল বেয়ে। আর তাদের সঙ্গে চলল এক ইংরেজ ভাইকাউন্ট যন্ত্রণা-পাগল আহত চিতাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে।

বেবুনরা এদিক-ওদিক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে শীতাকে আক্রমণ করতে লাগল; টারজন তার শিকারী-ছুরি দিয়ে বার বার তাকে আঘাত করে চলল; আর শীতা যন্ত্রণায় পাগলের মত একবার এদিকে একবার ওদিকে থাবা উঁচিয়ে তাড়া করতে লাগল। দুটো বেবুন রক্তাক্ত দেহে ধরাশায়ী হল, টারজন কিন্তু সুকৌশলে তার থাবাকে এড়িয়ে গেল।

এই অসম সংঘর্ষ বেশীক্ষণ চলল না। কাঁপতে কাঁপতে শীতার দেহটা নিথর হয়ে মাটিতে পড়ে গেল। টারজন তার দেহ থেকে বর্শাটা টেনে বের করে দাঁড়াল।

এবার জুগাস তার কাছে এগিয়ে এসে নরম গলায় বলল, "জুগাস ও তার দলদল অরণ্যরাজ টারজনের বন্ধু।"

টারজন জবাব দিল, "সেও তাদের বন্ধু।"

জুগাস বলল, "একটি টারমাঙ্গানিকে আমরা দেখেছি। তার সঙ্গে আছে অনেক গোমাঙ্গানি। তাদের হাতে আছে বজ্র-নল। তারা খারাপ। টারজন হয় তো তাদেরই খুঁজছে।"

টারজন বলল, "তা হতে পারে। তারা কোথায়?"

জুগাস নখ বাড়িয়ে পাহাড়টা দেখাল।

টারজন আবার প্রশ্ন করল, "কোথায় ?"

এবার জুগাস পাহাড়ের দক্ষিণ সানুদেশ দেখিয়ে দিল।

৯—বিরাট ফাটল

প্রাতঃসূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে চিন্নেরেথের বুকে। বায়ুতাড়িত ঢেউগুলি ঝিলমিল করছে। মনে হচ্ছে একটা বিরাট সেনাবাহিনীর হাতের অসংখ্য বর্শা যেন সূর্য-কিরণে ঝিকমিক করছে। কী এক ভীষণ সুন্দর দৃশ্য।

কিন্তু লেডি বারবারা কলিসের কাছে তার অর্থ অন্য রকম—ঝলমলে বহিরাবরণে ঢাকা এক নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতক জলধি—এই তো সত্যিকারের চিন্নেরেথ! হ্রদটাকে ঘিরে আছে ভক্তবৃন্দ; সকলের আগে আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম। তাদের পিছনে আছে সেনাদল ও গ্রামবাসীগণ। তাদের দেখেই লেডি কলিস শিউড়ে উঠল। তাদের মধ্যেই তো রয়েছে সেই ছয় জোয়ান, তাদের হাতে মস্তবড় জাল আর দড়ি।

এরা সকলেই তো চিন্নেরেথেরই অনুরূপ—দেবত্বের পাতলা আবরণে ঢাকা তাদের নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা। পাশের লোকদের দিকে তাকিয়ে লেডি কলিস আর একবার শিউরে উঠল। মনে মনে বলল: "ঈশ্বর তো মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিজের মত করে; তাহলে এদের সৃষ্টি করেছে কে ?"

ভাগ্যের টানে বেশ কয়েক সপ্তাহ সে এই সব মিডিয়ানদের দেশে কাটিয়েছে। বার বারই এই বিচিত্র জাতিটার উৎপত্তির কথা সে ভেবেছে। তাদের মুখ-চোখ ও আকৃতির বিশেষ ধরন আর সকলের মধ্যেই অপস্মার রোগের শিকার হবার সহজ প্রবণতা দেখে তার মনে হয়েছে এরা সকলেই হয় তো কোন বিকলাঙ্গ অপস্মার-রোগগ্রস্ত পূর্বপুরুষের বংশধর।

তার এই অনুমান হয় তো ঠিকই। কিন্তু তাহলে জেজেবেল এল কোথা থেকে ? সে তো বার বারই বলছে সেও এদেরই এক দম্পতির সন্তান, আর তার জ্ঞানমতে অন্য কোন জাতির রক্ত কোন দিন মেশে নি মিডিয়ানদের রক্তের সঙ্গে। কিন্তু লেডি বারবারার নিশ্চিত বিশ্বাস এ রকম একটা রক্তের মিশ্রণ অবশ্যই ঘটেছিল। বহুদূর অতীতের একটা ছোট্ট কালো ক্রীতদাসী মেয়ের কাহিনী তো সে জানত না!

আর তাদের ধর্ম! আবার সে শিউরে উঠল। খৃস্টের বাণীর কী জঘণ্য বিকৃতি! এ যেন প্রাচীন খৃস্টধর্ম এবং আরও প্রাচীন জুডাবাদের এক জগাখিচুড়ি! শিষ্য পলকে এরা বানিয়েছে প্রভু খৃস্ট; সম্পূর্ণ ভুলে গেছে তাঁর শিক্ষা; কে আর তার বদলে প্রবর্তন করেছে নিজেদের মন-গড়া এক অসভ্য

বর্বরতা।

শোভাযাত্রা পৌঁছে গেল হ্রদের তীরে। মাত্র গতকালই ছয় জোয়ান একটি আর্তনাদমুখরা অসহায় মেয়েকে বলি দিয়েছে এই হ্রদেরই জলে। অথচ কলিসের মনে হচ্ছে সে যেন কতকাল আগেকার ঘটনা। আজ তার পালা। পয়গম্বর ভক্তবৃন্দ গতকালের মতই শুরু করে দিল তাদের অর্থহীন মন্ত্রোচ্চারণ ও নানান অনুষ্ঠান। আবার যেন সে শুনতে পেল গতকালের সেই মেয়েটির আর্ত চীৎকার। কিন্তু লেডি বারবারা কলিস আর্তনাদ করল না। করবেও না কোন দিন। সেটুকু মনের জোর তার আছে।

পয়গম্বর দুই হাত মাথার উপরে তুলল। সমবেত সকলে নতজানু হল। লেডি বারবারার চোখে পড়ল স্বর্ণকেশী জেজেবেলের মুখ। সুন্দর মুখখানি দুশ্চিন্তায় কালো হয়ে গেছে; দুটি চোখে অশ্রুর বিন্দু টলমল করছে। এখানে অন্তত একটি মানুষ আছে যার অন্তরে আছে ভালবাসা ও সহানুভূতি।

আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম চীৎকার করে বলল, "জিহোবার সঙ্গে আমি হেঁটেছি।" কথাগুলি শুনে লেডি বারবারার ঠোঁট ব্যঙ্গের হাসিতে বংকিম হয়ে উঠল। তা দেখে পয়গম্বর বলল, "তুমি হাসছ, অথচ তোমার তো গলা ছেড়ে কাঁদবার কথা। কেন হাসছ তুমি?"

"কারণ আমি ভয় পাই নি," লেডি বারবারা জবাব দিল।

"কেন ভয় পাও নি নারী?"

"কারণ জিহোবার পাশাপাশি আমিও হেঁটেছি, তিনিই আমাকে বলেছেন ভয় না পেতে কারণ তুমি তো এক নকল পয়গম্বর, আর—"

"চুপ!" আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম গর্জে উঠল। "বন্ধ কর এই মিথ্যা ভাষণ। মুহূর্তের মধ্যেই জিহোবার বিচারের পরিচয় তুমি পাবে।" ছয় জোয়ানের দিকে ঘুরে বলল, "ওকে জালে ফেল!"

অতি দ্রুত তার আদেশ পালিত হল। ছয় জোয়ান তাকে জালের মধ্যে ফেলে দোলাতে শুরু করল। পয়গম্বরের মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে অর্থহীন মন্ত্র। সমবেত সকলের চীৎকার ও আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

লেডি বারবারা পকেট থেকে কলম-কাটা ছোট ছুরিটা বের করে ফলাটা খুলে এক হাতে সজোরে চেপে ধরল। একটা ছোট ছুরি নিয়ে সে কী করতে চাইছে?

হঠাৎ আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহামের কণ্ঠে ধ্বনিত হল আদেশ। লেডি বারবারা রুদ্ধশ্বাস। জোয়ানরা হাতের দড়ি ছেড়ে দিল। ভিড়ের মধ্যে গ্রামবাসীরা আর্তনাদ করে উঠল—তার মধ্যে একটি নারী-কণ্ঠও শোনা গেল। কালো জলরাশির বুকে ডুবে যেতে যেতেও লেডি বারবারা বুঝল সে আর্তকণ্ঠ জেজেবেলের। মাথার উপরে রহস্যময় চিম্নেরেথের মুখটা বন্ধ হয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়ে লাফায়েৎ স্মিথ, এ. এম., পি-এইচ. ডি., এস-সি. ডি. পাহাড়ের সেই অঞ্চলটা ধরে সমানে হেঁটে চলেছে যেটা একটা খাড়া প্রাচীরের মত দাঁড়িয়ে আছে মিডিয়ানদের দেশ ও চিন্নেরেথ হ্রদের সীমানা হয়ে। পাহাড়ের ঠিক অপর দিকেই যে তখন ঘটে চলেছে একটি শোকাবহ ঘটনা তার কিছুই সে জানে না। সে আরও জানে না যে যত এগোচ্ছে ততই সে মূল শিবির থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

পাহাড়ের ঢালু পথ বেয়ে উত্তর সানুদেশের দিকে চলতে চলতে ভূতত্ত্ববিদ ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে গেল। এখানকার পাহাড়ের গায়ে প্রকৃতি নিজের হাতে যে পার্বত্য কাহিনী লিখে রেখেছে তার মধ্যেই সে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। শিবিরে ফেরার কথাটা পর্যন্ত ভুলে গেছে। সে যখন শিবির থেকে দূরে সরে যাচ্ছে সেই সময়ে একটা প্রকাণ্ড সিংহও তার পিছু নিয়েছে।

পশুরাজ কেন যে এই মানুষটির পিছু নিয়েছে তা সে নিজেই জানে না। সে ক্ষুধার্ত নয়, কারণ সবেমাত্র একটি শিকারকে সে খেয়ে শেষ করেছে। সে মানুষ-খেকো নয়। হতে পারে কৌতূহলবশত বা নেহাৎই খেয়ালের বশেই নুমা লোকটিকে অনুসরণ করে চলেছে।

মাথার উপরে খাড়া উঠে-যাওয়া পাহাড়ের বুকে একটা সংকীর্ণ ত্রিকোণ ফাটলের সম্মুখে লাফায়েৎ স্মিথ দাঁড়িয়ে পড়ল। এ যেন প্রকৃতির মহাগ্রন্থের একটি আকর্ষণীয় প্রবেশ-পথ! এই বিরাট পর্বতের নিরেট পাথরকে এমন ভাবে বিদীর্ণ করেছে কোন্ মহাশক্তি ? নিশ্চয় এর কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে। কিন্তু সেটা কি ? সুউচ্চ পর্বত শ্রেণীর দিকে তাকিয়ে লাফায়েৎ স্মিথ আর একবার পিছন ফিরে তাকাতেই সিংহটাকে দেখতে পেল।

দীর্ঘ মুহূর্ত ধরে পরস্পরের দিকে তারা তাকিয়ে রইল। মানুষটির চোখে বিস্ময় ও আগ্রহ। নুমার চোখে সন্দেহ ও বিরক্তি।

কিন্তু লাফায়েৎ স্মিথের সারা মন তখন পাহাড়ের বিরাট ফাটলটা নিয়েই মগ্ন। ফাটলটা কয়েক ফুট চওড়া, আর দৈর্ঘ্যে যতদূর চোখ যায় ততখানি। কিন্তু সেটা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত সেটা সে অনুমান করতে পারল না। তাই সেটা সরে-জমিনে পরীক্ষা করে দেখতে সেই গহ্বরের মুখে সে পা বাড়াল। সিংহটার কথা একেবারেই ভুলে গেল। গহ্বরটা বাঁ দিকে মোড় নিয়ে ক্রমাগত উপরের দিকে উঠে গেছে। আর ক্রমেই সেটা অধিকতর চওড়া হবার দরুণ মুখের তুলনায় ভিতরে আলো আর হাওয়াও অনেক বেশী। লাফায়েৎ স্মিথ এই নতুন আবিষ্কারে এতই উত্তেজিত ও গর্বিত বোধ করল যে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শিবির, সিংহ—সবকিছু ভুলে গেল।

কিন্তু নুমা তো ভূতত্ত্ববিদ নয়। পাহাড়ের ফাটলের প্রতি তার কোন আগ্রহ থাকবার কথা নয়। সে শুধু অবাক হয়ে ভাবল, মানুষটা গেল কোথায়।

ফাটলের কাছে গিয়ে ভিতরে তাকাল। টারমাঙ্গানিকে দেখতে পেল না। বিরক্তিতে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন বেরিয়ে এল তার গলা থেকে।

ফাটলের একশ' গজ ভিতর থেকে সে গর্জন শুনতে পেয়ে লাফায়েৎ স্মিথ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল, "সেই ব্যাটা সিংহ! তার কথা তো ভুলেই গিয়েছিলাম!" তার মনে হল, এটা কি তবে ঐ সিংহের আস্তানা! তাহলে তো ব্যাপার সুবিধার নয়। নিজের অজ্ঞাতেই '৩২ রিভলবারটাকে দৃঢ় মুঠিতে চেপে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, এখনই গুহার মুখে ফিরে যাওয়া বুদ্ধির কাজ হবে না। তাতে বিপদ দেখা দিতে পারে। বরং দেরী হলে হয় তো পশুরাজ বিরক্ত হয়ে চলে যেতেও পারে।

এই সব ভেবেচিন্তে লাফায়েৎ স্মিথ ধারালো পাথর ছড়ানো গুহা-পথ ধরেই এগোতে লাগল। পাথরের খোঁচায় তার পোশাক ছিঁড়ল, মাংস কেটে রক্ত ঝরল। গুহা-পথের যেন শেষ নেই। চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে এক সময় সে পাথরের প্রাচীরে হেলান দিয়ে গুহা-মুখের দিকে ফিরে তাকাল। প্রায় একশ' ফুট দূরে পথটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানেই সহসা দর্শন দিল সেই পশুরাজ।

১০—শত্রুর কবলে

"বন্দুকবাজ" উদ্বিগ্ন। সকাল হল। তবু লাফায়েৎ স্মিথের দেখা নেই। তারা আগের দিন অনেক রাত পর্যন্ত তার খোঁজ করেছে। সকালে আবার খোঁজা শুরু হল। "বন্দুকবাজের" নির্দেশমত দলের সর্দার ওগোনিও দুজন-দুজন করে দলটাকে ভাগ করে দিল। মাত্র চারজনকে শিবিরের পাহারায় রেখে বাকি সকলকে চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেওয়া হল হারানো মানুষটির খোঁজে।

ড্যানি তার সঙ্গী হিসাবে বেছে নিয়েছে ওবাম্বিকে। তাতে এই কালো ছেলেটির বিরক্তির অন্ত নেই, কারণ গতকাল বিকেলে সে স্মিথকে একাকি পাহাড়ে রেখে চলে এসেছে একথা জানবার পর থেকেই ড্যানি তাকে অনবরত বকেই চলেছে।

বন্দুকবাজ বলল, "সে তোমাকে কি বলেছে না বলেছে সেটা কোন কথাই নয়। তুমি কোন্ আক্কেলে তাকে একা রেখে চলে এলে? এবার চল আমার সঙ্গে। তাকে যদি খুঁজে না পাই তাহলে তুমিও আর এখানে ফিরে আসবে না।"

খুব গরম পড়েছে। দুপুর নাগাদ "বন্দুকবাজ" ঘেমে নেয়ে উঠল। বিরক্তিকর। বলল, "আফ্রিকা যেন একটা নরক!"

"যা বলেছ বাওয়ানা!" ওবাম্বি মাথা নাড়ল।

"থাম!" "বন্দুকবাজ" হুংকার দিল।

পাহাড়ের কিনারে একটা গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিতে নিতে তারা লাঞ্চ খাচ্ছিল। কিছুটা দূরেই পাহাড়টা প্রায় পঞ্চাশ ফুট খাড়া নেমে গেছে। তারা যেখানে বসেছে সেখান থেকে এই খাড়াইটা দেখতে পাচ্ছে না; বা নীচেকার পাঁচিল-ঘেরা গ্রামটাও দেখতে পাচ্ছে না। পাহাড়ের একেবারে শেষ প্রান্তে যে লোকটি ঝোপের পাশে তাদের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে তাকেও তারা দেখতে পাচ্ছে না। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে সে কিন্তু নীচেকার গ্রামটির দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সে লোকটির বিশ্বাস, যাকে সে খুঁজছে সে ওখানেই আছে। কিন্তু সে বিষয়ে সে নিশ্চিত হতে চায়, আর তার জন্য তাকে হয় তো দিনের পর দিন গ্রামটার উপর নজর রাখতে হবে। অবশ্য টারজনের কাছে সময়টা কোন ব্যাপারই নয়। মাঝে মাঝেই এই সুবিধাজনক স্থানটিতে এসে সে গ্রামটার উপর নজর রাখবে। তার মনে সন্দেহ জেগেছে—যে ক্রীতদাস-শিকারীর খোঁজে সে এই উত্তরাঞ্চলে এসেছে সে নীচেকার ঐ গ্রামের সাদা মানুষদেরই একজন। আজ হোক কাল হোক তার সন্দেহ সত্য কি মিথ্যা তার প্রমাণ সে পাবেই। কাজেই একটা বড় সিংহের মতই টারজনও ছুব্‌নি পেতে শিকারের উপর নজর রাখছে।

তার ঠিক নীচেই দোমিনিক কাপিয়েত্র আর লিওন স্তাবুচ ক্রীতদাস-শিকারীর তাঁবুর পাশে একটা গাছের ছায়ায় বসে ধীরে সুস্থে প্রাতরাশ খাচ্ছে। আধা ডজন ক্রীতদাসী তাদের পরিচর্যা করছে।

এক সময় কাপিয়েত্র বলল, "এবার দক্ষিণ দিকে এগোতে হবে। যতদূর বুঝতে পারছি এ অঞ্চলে টারজনের খোঁজ করে কোন লাভ হবে না।"

কাপিয়েত্র শুধাল, "তাকে খোঁজার এত তাড়া কিসের তোমার? আমার সঙ্গ কি ভাল লাগছে না?"

আপোষের সুরে স্তাবুচ ইতালীয়টিকে সম্বোধন দিল, "তুমি তো জান কমরেড, আমোদের চাইতে কর্তব্য বড়।"

"তা ঠিক।"

স্তাবুচ বলল, "দক্ষিণ থেকে ফিরে এসে আবার তোমার সঙ্গে দেখা করব।"

"না ফিরতেও তো পার।"

"আমাকে ফিরতে হবেই। পিটার জাভেরির বদলা নিতে হবে। কমুনিজমের পথের কাঁটাকে অপসারিত করতেই হবে।"

"সেই নর-বানরই কি জাভেরিকে খুন করেছিল?"

"না, খুন করেছিল একটি নারী, কিন্তু তোমরা যাকে নর-বানর বল সেই প্রত্যক্ষভাবে জাভেরির সব পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্য দায়ী, আর সেই হেতু জাভেরির মৃত্যুর জন্যও অপরোক্ষভাবে সেই দায়ী।"

"অর্থাৎ তুমি আশা করছ, জাভেরির চাইতে ভাল কাজ করতে পারবে? তোমার সৌভাগ্য কামনা করলেও তোমার উদ্দেশ্যকে আমি ঈর্ষা করি না। এই টারজন যেন মানুষের মস্তিষ্কসম্পন্ন একটি সিংহ। নিজের দেশে সে খুব শক্তিশালীও বটে।"

দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে স্তাবুচ বলল, "তথাপি তাকে আমার চাই। সম্ভব হলে দেখামাত্রই আমি তাকে খুন করব। আর তা যদি না পারি তাহলে প্রথমে তার বিশ্বাস ও বন্ধুত্ব অর্জন করব এবং তারপরে তাকে ধ্বংস করব।"

গলার স্বর উপরের দিকে অনেক দূর পর্যন্ত যায়। আর তাই স্তাবুচ স্বাভাবিক গলায় কথা বললেও পাহাড়ের মাথায় বসে টারজন তা শুনতে পেল। একটা কঠিন হাসি খেলে গেল তার ঠোঁটে।

আচ্ছা, তাহলে এইজন্যই সর্দার গোলোনা তাকে বলেছিল যে "বাপ্পা" থেকে আগত একটি লোক তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছে। হয় তো সন্দেহটা টারজনের মনেও উঁকি দিয়েছিল, কিন্তু এবার সে পেল নিশ্চিত প্রমাণ।

কাপিয়েত্র বলল, "তাকে যদি মেরে ফেলতে পার তাহলে আমিও খুশি হব। আমার কথা জানতে পারলে সে আমার ব্যবসাকে লাটে তুলে ছাড়বে। ব্যাটা মহা শয়তান, কাউকে সৎপথে উপার্জন করতেও দেবে না।"

স্তাবুচ বলল, "এ নিয়ে আর মাথা ঘামিও না কমরেড। ধরে নাও সে মারাই গেছে। কিছু লোকজন যোগাড় করে দাও, তাহলেই আমি দক্ষিণে যাত্রা করতে পারি। আশা করছি—কি হল?" একলাফে সরে গিয়ে স্তাবুচ প্রশ্নটা করল। হঠাৎ একটা পাথর ও মাটির চাঙড় তাদের পিছনে সশব্দে ভেঙে পড়ল।

কাপিয়েত্রও সরে দাঁড়িয়ে বলল, "ধ্বস্ নেমেছে! পাহাড়ের একটা অংশ ভেঙে পড়েছে। দেখ! ওটা কি?" পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটা মূর্তিকে দেখিয়ে সে প্রশ্ন করল। একটি নগ্নদেহ সাদা মানুষ একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলছে। ছোট গাছটা লোকটির ভারে নুয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে ডালটা বেঁকে গিয়ে সশব্দে ভেঙে পড়ল, আর মূর্তিটা ছিটকে পড়ল নীচের গ্রামের মাঝখানে। একটা কুটিরের আড়াল পড়ায় পাহাড়ের মাথায় উপবিষ্ট সাদা মানুষ দুটি দৃশ্যটা দেখতে পেল না।

যার খোঁজে স্তাবুচ সুদূর মস্কো থেকে এখানে এসেছে তার বিবরণের সঙ্গে এই দৈত্যাকার প্রায়-নগ্ন মূর্তিটাকে মিলিয়ে নেবার মত যথেষ্ট সময় ধরেই

তাকে সে দেখতে পেল। এরকম মানুষ যে দুজন হয় না সে বিষয়ে সে নিশ্চিত। চেঁচিয়ে বলল, "এই সেই নর-বানর। চলে এস কাপিয়েত্র, এবার তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়েছি!"

সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয়টি ডাকাতদের কয়েকজনকে হুকুম করল, ছুটে গিয়ে নর-বানরটিকে কব্জা কর।

ভাগ্যদেবী যে সাহসী বা ধার্মিক জনের পক্ষ নেবেই এমন কোন কথা নেই। অনেক সময় সে অসৎ মানুষের পতাকাতেও ভর করে। আজ সে টারজনকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছে। পাহাড়ের একেবারে কিনারায় বসে সে যখন দোমিনিক কাপিয়েত্রর গ্রামের দিকে তাকিয়ে ছিল, তখন হঠাৎ তার পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেল। বিপদ বুঝে দুই হাত মাথার উপর তুলে দেহের ভারসাম্য বজায় রেখে সে বিড়ালের মত লাফ দিল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য একটা গাছ তার পতনকে রোধ করল। তার মনে আশা জাগল, হয় তো এবারের মত বেঁচে গেল। নীচের গ্রামে ছিটকে পড়ার পরে প্রাণে বেঁচে গেলেও শত্রুর হাতেই তাকে জবাই হতে হবে। কিন্তু সে আশা মরীচিকামাত্র। ডালটা ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সব আশা মিলিয়ে গেল। টারজন নীচে ছিটকে পড়ল।

"বন্দুকবাজ" ড্যানি প্যাট্রিক লাঞ্চ শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে সম্মুখে প্রসারিত দৃশ্যপটের দিকে তাকাল। জায়গাটার নির্জনতাই তাকে বেশী করে আকর্ষণ করল। বলে উঠল, "গীজ! কী চমৎকার আত্মগোপনের জায়গা! কেউ কোন দিন আর খোঁজ পাবে না।" হঠাৎ সামনের একটা বস্তুর উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হল। ফিস্ ফিস্ করে ওবাম্বিকে শুধাল, "এই—ওটা কি?"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বস্তুটাকে একনজর দেখেই ওবাম্বি তাকে চিনতে পারল। বলল, "একটা মানুষ বাওয়ানা। সে রাতে এই লোকটিই আমাদের শিবিরে সিম্বাকে মেরেছিল। এই তো অরণ্যরাজ টারজন।"

"কি করে জানলে?"

"মাত্র একজন টারজনই তো আছে। এ লোক আর কেউ হতে পারে না, কারণ সমস্ত জঙ্গল, পাহাড় বা সমতল অঞ্চলে আর কোন সাদা মানুষ এরকম নগ্ন হয়ে চলাফেরা করে না।"

"বন্দুকবাজ" উঠে দাঁড়াল। টারজনের সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার। হয় তো সে লাফাযেৎ স্মিথের খবর দিতে পারে। কিন্তু—ওকি? লোকটি যে দুই হাত মাথার উপর তুলে লাফ দিল। তারপর এমনভাবে উধাও হয়ে গেল যেন পৃথিবী তাকে গিলে ফেলল। "বন্দুকবাজে"র ভুরু কুঁচকে উঠল। নিজের "টমসন"টাকে ভাল করে দেখে নিয়ে যেখান থেকে টারজন উধাও হয়ে গেল সেই জায়গাটার দিকে সে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল।

গ্রামের মধ্যে টারজনের দেহটা যেখানে পড়বার কথা ডাকাতরা সেই স্থানটাকে লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে। স্তাবুচ ও কাপিয়েত্র চলেছে স্থানে। হঠাৎ একেবারে শেখের কুটিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সেই লোকটি যাকে তারা খুঁজছে। তারা জানত না যে এই ঘরের খড়ের চালের উপর থেকেই সে পড়েছিল ঘরের মেঝেতে। ফলে কোন গুরুতর আঘাত সে পায় নি।

এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে সকলেই হতবাক। প্রথম সম্বিত ফিরে পেল স্তাবুচ। খাপ থেকে রিভলবারটা টেনে বের করে টারজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে উদ্যত হল। কিন্তু কাপিয়েত্র তার হাতটা ঠেলে উপরে তুলে দিয়ে বলল, "থাম। অতটা তাড়াহুড়া করো না। এখানে সর্দার আমি।"

"কিন্তু এ যে টারজন," স্তাবুচ চেঁচিয়ে উঠল।

কাপিয়েত্র বলল, "তা জানি। আর সেই জন্যই আমি চাই তাকে জীবিত ধরতে। সে ধনবান। অনেক টাকা মুক্তি-পন পাওয়া যাবে।"

স্তাবুচ বলে উঠল, "গুলি মার মুক্তি-পনে। আমি চাই তার জান।"

কাপিয়েত্র জবাব দিল, "মুক্তি-পন না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তারপর তোমার পালা।"

দুজনের উপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে টারজন। আসন্ন বিপদ সম্পর্কে সে সজাগ। দুজনই তার প্রাণ নিতে উন্মুখ।

কাপিয়েত্র তার লোকজনদের আদেশ করল টারজনকে জীবিত ধরতে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপও না করে টারজন সোজা এগিয়ে গেল সাদা মানুষটির দিকে; তার গলা থেকে এমন একটা পশুসুলভ গর্জন বেরিয়ে এল যা শুনলে যে কোন মানুষেরই মাথাটা ঘুরে যায়।

এক্ষেত্রেও তাই হল। ভ্যাবাচেকা খেয়ে স্তাবুচ কয়েক পা পিছিয়ে গেল; আর কাপিয়েত্র একলাফে সরে গিয়ে লোকজনদের বলল টারজনকে ধরতে। শুরু হয়ে গেল হৈ-চৈ, হল্লা, লড়াই।

পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে "বন্দুকবাজ" প্যাট্রিক সে দৃশ্য দেখে বলে উঠল, "ওরা তাকে ঘিরে ধরেছে। এবার দেখছি আমাকে হাত লাগাতে হবে।"

"টমসন"-এর কুঁদোটাকে কাঁধে তুলে ঘোড়ায় আঙুল রাখল। মেসিনগানের গর্জনের সঙ্গে মিশে গেল ভীত, আহত মানুষদের আর্তনাদ ও অভিসম্পাত। বসন্ত কালের বর্ষণে যেমন বরফ গলে যায়, টারজনকে ঘিরে-ধরা ভিড়ও তেমনি পাতলা হয়ে গেল। প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে কেউ ঢুকল কুটিরের মধ্যে, আর কেউ বা ছুটল অপেক্ষমান ঘোড়ার দিকে।

শেখের দলে যোগ দিল কাপিয়েত্র ও স্তাবুচ। আসল ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই টারজন দেখল, গ্রামের খোলা ফটকের ভিতর দিয়ে তীরগতিতে

তারা ছুটে পালাচ্ছে।

নিজের মেসিন-গানের সাফল্য দেখে খুশি হয়ে "বন্দুকবাজ" নীচে তাকিয়ে দেখল, একটা সিংহের মতই টারজন দাঁড়িয়ে আছে গ্রামের পথে, আর চোখ তুলে খুঁজছে—কোথা থেকে হল এত গুলিবর্ষণ।

"বন্দুকবাজ" চেঁচিয়ে বলল, "আমি এখানে গো!"

চোখ তুলেই টারজন ড্যানিকে দেখতে পেয়ে হাঁক দিল, "দাঁড়াও। আমি এখনই উপরে যাচ্ছি।"

১১—ক্রুশবিদ্ধ

চিন্নেরেথের জলরাশি দুদিক থেকে এসে লেডি বারবারার মাথার উপরে এক হয়ে মিশে গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণকেশী জেজেবেল দ্রুত ছুটে গেল হ্রদের তীরে। ভক্তদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল একেবারে জলের ধারে। দুই চোখে জলের ধারা; চাপা কান্নায় কণ্ঠ অবরুদ্ধ। মরিয়া হয়ে হ্রদের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই পয়গম্বর আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম তাকে টেনে ধরল।

আহত ব্যাঘ্রীর মত জেজেবেল ঝাঁপিয়ে পড়ল বুড়োটার উপরে। তাকে আঁচড়াল, কামরাল, লাথি মারতে লাগল নিজেকে ছাড়াবার জন্য। হয় তো ছাড়িয়ে নিতেও পারত, কিন্তু পয়গম্বরের ডাকে ছুটে এল ছয় জোয়ান, দুজন তাকে চেপে ধরল। নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ায় এবার তার সব রাগ গিয়ে পড়ল আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহামের উপর। চীৎকার করে বলতে লাগল, "খুনী! শয়তানের বাচ্চা! এর জন্য জিহোবা তোকেই খুন করবেন! দলবলসহ তোর মাথায় নেমে আসুক অভিশাপ। আজ এখানে যে অপরাধ তোরা করেছিস তার জন্য তোরা সকলেই উচ্ছন্নে যাবি।"

আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম চীৎকার করে বলল, "চুপ কর্ ধর্মদ্বেষিণী! জিহোবার করুণা ভিক্ষা কর্, কারণ আজ রাতেই হবে তোর অগ্নি-পরীক্ষা। ওকে গ্রামে নিয়ে যাও। একটা গুহায় বন্দী করে রাখ। খুব সাবধান, যেন পালাতে না পারে।"

জেজেবেলকে টানতে টানতে নিয়ে চলল। মেয়েটি বলতে লাগল, "আগুন আর জল দুই-ই এখন আমার কাছে সমান। মিডিয়ানদের এই অভিশপ্ত দেশ থেকে আর জিহোবার পয়গম্বরের ভেকধারী একটা উন্মাদ পশুর কাছ থেকে যতদূরে যেতে পারি ততই মঙ্গল।"

জলস্পর্শ করামাত্রই প্রায় হতচেতন হয়ে পড়লেও লেডি বারবারা চেতনা

হারায় নি, বা মানসিক ও দৈহিক শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ হারায় নি। এ পরিস্থিতি যে দেখা দেবে তা সে আগেই বুঝতে পেরেছিল, আর তার প্রতিকারের পথটাও ভেবে রেখেছিল।

সে দক্ষ সাঁতারু। জলে ডুবে থাকতে ও ওস্তাদ। কাজেই চিন্নেরেথের জলে কয়েক মিনিট ডুবে থাকাটা তার কাছে কোন সমস্যাই নয়। ঠাণ্ডা মাথায় সে কাজ শুরু করে দিল। ছোট পকেট-ছুরিটা বের করে একের পর এক জালের সুতো কাটতে লাগল।

জলটা তাকে নিয়ে দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছে। সেও কাজ করে চলেছে। আর মনে মনে যেন জপ করছে—“মাথা ঠাণ্ডা রাখ! মাথা ঠাণ্ডা রাখ!’

হ্রদটা যেন অতলান্ত, জালের সুতো অসংখ্য, ছুরির ধার ক্রমেই ভোঁতা হয়ে আসছে, তার নিজের শক্তিতেও দ্রুত নেমে আসছে ভাঁটার টান।

“মাথা ঠাণ্ডা রাখ! মাথা ঠাণ্ডা রাখ!” ফুসফুসটা বুঝি ফেটে যাবে। “আর এক মুহূর্তে! মাথা ঠাণ্ডা রাখ!” মনে হচ্ছে বুঝি তার চেতনা হারিয়ে যাচ্ছে। কাটা জালের ফাঁক দিয়ে নিজেকে টেনে তুলতে চেষ্টা করছে। সব ইন্দ্রিয়গুলি যেন পাক খাচ্ছে। বুঝি বা সব চেতনা সে হারাল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে তীরগতিতে সে ভেসে উঠল জলের উপরে।

হ্রদের তীরে সমবেত সকলেরই দৃষ্টি তখন জেজেবেলের উপর নিবদ্ধ। সে তখন জিহোবার পুত্র পলের পয়গম্বরের পাছায় অবিরাম লাথি চালিয়ে যাচ্ছে। লেডি বারবারার পক্ষে এটা ভালই হল। হ্রদের ভিতর থেকে তার পুনরভ্যুত্থান কারও নজরে পড়ল না। সকলের অলক্ষ্যে সাঁতার কেটে সেই ঝুলন্ত লাভা-পাথরটার নীচে সে পৌছে গেল যার উপর থেকে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল হ্রদের জলে।

সেখানে উঠে বসতেই তার কানে এল দুটি ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর—জেজেবেল অভিশাপ দিচ্ছে পয়গম্বরকে, আর বুড়ো পয়গম্বর শাসাচ্ছে মেয়েটিকে।

মেয়েটির সাহস দেখে লেডি বারবারার বুকটা গর্বে ভরে উঠল। এমন একটি অনুরাগী বন্ধুকে পেয়েছে বলেও তার খুশির সীমা রইল না।

সেই সঙ্গে একটা নতুন চিন্তাও দেখা দিল তার মনে। আগে সে ভেবে রেখেছিল সকলের অলক্ষ্যে এই পাথরের নীচে লুকিয়ে থেকে দিনটা কাটিয়ে রাতের অন্ধকারে সে মিডিয়ানদের দেশ থেকে পালিয়ে যাবে। হ্রদের জলেই তার মৃত্যু হয়েছে ধরে নিয়ে কেউ তখন তাকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

কিন্তু সে পরিকল্পনা এখন বদলে গেছে। তার প্রতি বন্ধুত্ব ও অনুরাগের ফলেই জেজেবেলের জীবন এখানে বিপন্ন। তাই তাকে এখানে ফেলে সে একা পালাতে পারবে না। কিন্তু সে কি করবে? কেমন করে মেয়েটিকে বাঁচাবে তা সে জানে না। তবে এটা জানে—সে চেষ্টা তাকে করতেই হবে।

মাথার উপরকার গলার স্বরগুলি থেমে গেছে। পুরো দলটাই ক্রমে ক্রমে গ্রামে ফিরে গেছে। পাথরের নীচটা খুব ঠাণ্ডা, কারণ এখানে রোদ পড়ে না। গায়ের পোশাক ভিজে শপ্-শপ্ করছে। আবার সে জলে নামল। তীর বরাবর সাঁতার কেটে এমন একটা জায়গায় গিয়ে তীরে উঠল যেখানে প্রচুর রোদ এসে পড়েছে। সেখানে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে আতপ্ত রোদে কয়েক মিনিট বিশ্রাম করে ভিজে পোশাক খুলে রোদে শুকোতে দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে আরাম করে রোদ পোহাতে লাগল।

সূর্য পশ্চিম আকাশে চলে পড়ার আগেই তার পোশাক শুকিয়ে গেল। সেগুলি পরে নিয়ে অন্ধকারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

রাত নামল। উত্তরের গ্রামে ছোট ছোট আলো ফুটে উঠল। নিশ্চয় রান্নার উনোনের আলো। লেডি বারবারা উঠে দাঁড়াল। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহামের, জোবাবের, টিমোথি ও জেজেবেলের গ্রামের দিকে—নিশ্চিত বিপদ ও সম্ভাবিত মৃত্যুর দিকে।

গ্রামের পথ ধরে সে হাঁটতে লাগল। পাছে পথে কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তাই সে একটু দূর দিয়ে গ্রামটাকে পাক দিয়ে পাহাড়ের নীচেকার গুহাগুলির কাছে পৌছে গেল। হয় তো সেখানেই জেজেবেলের দেখা পাবে, আর খুঁজে পাবে তাকে উদ্ধারের কোন উপায়।

গুহার আশেপাশে কোন লোকজন নেই। হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের গুহাটা পেয়ে গেল। এইখানে একসঙ্গে থাকত সে আর জেজাবেল। ঘরে জেজাবেল নেই, থাকার কথাও নয়। ভিতরে ঢুকে সে খড়ের বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল।

শেষ পর্যন্ত বাড়িতে! বন্য পশুর আবাস ছাড়া কিছু নয়; তবু যে লেডি বারবারা কলিসের জীবন কেটেছে আর্ল অব হুইম্‌জির শ্বেত মর্মরের প্রাসাদে এখন এটাই তার বাড়ি। দুটি বিচিত্র চরিত্রের মেয়ের বিস্ময়কর বন্ধুত্ব ও অনুরাগের নানা স্মৃতিতে ভরা।

কিন্তু এখন লেডি বারবারা এখানে একা। জেজেবেল কোথায়? এ-প্রশ্নের উত্তরই তো ইংরেজ মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে হবে। মনে পড়ল পয়গম্বরের ভীতি-প্রদর্শন: "আজ রাতে তোমার অগ্নি-পরীক্ষা হবে।" জেজেবেলকে উদ্ধার করতে হলে আর দেরী নয়। কিন্তু কেমন করে? কোন্ পথে?

বিছানা থেকে উঠে নীচে গ্রামের দিকে তাকাল। ঐ তো জেজেবেল। দুটি রক্ষীর মাঝখানে সে দাঁড়িয়ে আছে। চারদিকে মানুষের ভিড়। এক সময় ভিড়টা দুই ভাগ হয়ে গেল। কিছু লোক ঢুকল একটা বোঝা কাঁধে

নিয়ে। ওটা কি ? জেজেবেলের সামনে খোলা জায়গায় সেটাকে নামানো হল। লেডি বারবারা অবাক হয়ে দেখল—একটা প্রকাণ্ড কাঠের ক্রুশ।

একটা লোক খোলা জায়গার মাঝখানে একটা গর্ত খুঁড়তে লাগল। অন্যরা বয়ে আনল জ্বালানি কাঠ। রক্ষী দুজন জেজেবেলকে ধরে মাটিতে নামাল। কাঠের উপর শুইয়ে দিয়ে হাত দুটো এলিয়ে দিল ক্রুশ-কাঠের হাতের উপরে।

লেডি বারবারা ভয়ে কাঠ। ওরা কি মেয়েটিকে ক্রুশে বিদ্ধ করবে ? কপট ধর্মের প্রতীক আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম দাঁড়িয়েছে ক্রুশের মাথার কাছে। ইংরেজ মেয়েটি জানে, কোন জঘন্য নিষ্ঠুরতাই তার নাগালের বাইরে নয়। সে আরও জানে, এই পাপ-কাজ পূর্ণ করাকে রোধ করতে সে সম্পূর্ণ অক্ষম। তবু সব বিচার-বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়ে সে হঠাৎ আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল। সে চীৎকার রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে খান্‌খান্‌ হয়ে গেল। লেডি বারবারা খাড়াই পথ বেয়ে গ্রামের দিকে দ্রুত ছুটতে লাগল—বন্ধুত্বের বেদীমূলে এ এক অপূর্ব আত্মাহুতি।

তার আর্তকণ্ঠ শুনে চমকে উঠে সকলেই উপরের দিকে তাকাল। অন্ধকারে তাকে চেনা গেল না, কিন্তু সকলের মনেই জাগল প্রশ্ন ও আতংক। কে যেন দ্রুতপায়ে নেমে আসছে পাহাড় থেকে। সেই দৃশ্য দেখেই উত্তেজনা ও আতংকে অপস্মারগ্রস্ত হয়ে অনেকেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

আরও কাছে এলে তাকে চিনতে পেরে আরও অনেকে মাটিতে এলিয়ে পড়ল। এ যে অলৌকিক ব্যাপার। মরা মানুষ বেঁচে উঠেছে।

সকলকে ঠেলে সরিয়ে লেডি বারবারা চত্বরের একেবারে মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল। তাকে দেখে আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহামের মুখও কালো হয়ে গেল। সে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। তারও অপস্মারের আক্রমণ হয় বুঝি।

চেঁচিয়ে বলল, "কে তুমি ? এখানে এসেছ কেন ?"

লেডি বারবারা উত্তর দিল, "আমি কে তা তুমি ভালই জান। আমি যে জিহোবার দূত সে কথা না জানলে তুমি কাঁপছ কেন ? আমি এসেছি জেজেবেলকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে। পরে জিহোভার ক্রোধানলে পুড়ে মরবে আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম এবং মিডিয়ানের সব মানুষ—নিষ্ঠুরতা ও পাপের শাস্তি তারা পাবে।"

পয়গম্বর বলে উঠল, "আমি এ সব জানতাম না। জিহোবাকে বলো আমি কিছুই জানতাম না। জিহোবা যাতে আমাকে ক্ষমা করে তার ব্যবস্থা কর। আমার সাধ্যায়ত্ত সব কিছু আমি তোমাকে দেব।"

অবস্থা দেখে লেডি বারবারা তো অবাক। এত সহজেই কার্যসিদ্ধি হবে তা সে ভাবতেও পারে নি। হো-হো করে হেসে উঠে সে আদেশ দিল,

"জেজেবেলকে মুক্ত করে দাও। তারপর তার ও আমার খাবারের আয়োজন কর।"

পয়গম্বর বলল, "শিগ্‌গির! মেয়েটিকে তুলে ধরে মুক্ত করে দাও।"

"থাম!" পিছন থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে যেন বলে উঠল। "জিহোবার সঙ্গে আমি হেঁটেছি।" সকলে মুখ ফিরিয়ে বক্তার দিকে তাকাল। কথা বলছে ভক্তশিষ্য জোবাব।

লেডি বারবারা হুকুম করল, "শিগ্‌গির! ওকে মুক্ত করে দাও!"

জোবাব চীৎকার করে বলল, "থাম! জিহোবা আমাকে বলেছে: 'দেখ ভক্ত জোবাব, চিন্নেরেথের বুকে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটবে; কিন্তু তা দেখে প্রতারিত হয়ো না, কারণ আমি বলছি সেটা শয়তানের কীর্তি; যে তাতে বিশ্বাস করবে সেই মরবে।'"

"হাল্লেলুজা!" একটি নারী চীৎকার করে বলে উঠল। অন্য সকলের মুখে তা প্রতিধ্বনিত হল: বাঁয়ে-ডাইনে উত্তেজিত গ্রামবাসীরা একের পর এক তাদের দুর্ভাগ্যের শিকার হতে লাগল। গোটা বিশেক দেহ মাটিতে পড়ে তীব্র আক্ষেপের সঙ্গে গোঙাতে লাগল—তাদের কণ্ঠ অবরুদ্ধ, মুখভর্তি গাঁজলা। অপস্মারগ্রস্ত রোগী সব।

আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম মুহূর্তের জন্য কি যেন ভাবল। হঠাৎ তার দুই ধূর্ত চোখে জ্বলে উঠল তীক্ষ্ণ স্ফুলিঙ্গ। মুখে বলল, "আমেন! ভক্ত জোবারের মুখ দিয়ে জিহোবার যে ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে তাই পূর্ণ হোক। প্রকাশ করে বল জোবাব জিহোবার বাণী।"

জোবাব বলতে লাগল, "আরও একটি ক্রুশ নিয়ে এস। দুটো অগ্নিকুণ্ডের আলোয় আলোকিত হোক জিহোবার স্বর্গের পথ। এই দুজনের যে কেউ যদি তাঁর সন্তান হয় তাহলে সে আগুন তাদের স্পর্শ করবে না।"

লেডি বারবারার আবেদনে মিডিয়ানবাসীদের রক্ত-তৃষ্ণা প্রশমিত হল না। দ্বিতীয় ক্রুশটি আনা হল; দ্বিতীয় গর্তটা খোঁড়া হল; দুটি নারীকে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করে নিয়ে যাওয়া হল প্রেমের প্রতীক দুটির কাছে; ঠিকমত তাদের দাঁড় করানো হল। অনেক হাতে হাতে এনে জমা করা হল জ্বালানি-কাঠ। তৈরী হল দুটি যজ্ঞ-বেদী।

সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে লেডি বারবারা তাকাল জেজেবেলের দিকে। মেয়েটি বলল, "এখানে ফিরে আসা তোমার উচিত হয় নি। তুমি তো পালাতে পারতে।" লেডি বারবারা মাথা নাড়ল। "জানি আমার জন্যই তুমি এ কাজ করেছ। আমার তো ধন্যবাদ ছাড়া আর কিছু দেবার নেই; জিহোবা যেন তোমাকে যথোচিত পুরস্কার দেন!"

লেডি বারবারা বলল, "চিন্নেরেথে তুমিও তো আমার জন্য এই কাজই

করতে চেয়েছিলে। তোমার সব কথা আমি শুনেছি।"

জেজেবেল হেসে বলল, "আজ পর্যন্ত একমাত্র তোমাকেই আমি ভালবেসেছি, আর একমাত্র তোমার ভালবাসাই পেয়েছি। তোমার জন্ত আমি মরতে প্রস্তুত।"

আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম প্রার্থনা করছে। জ্বলন্ত মশাল হাতে যুবকরা প্রস্তুত। সমবেত দর্শকদের বীভৎস মুখের উপর, দুটি ক্রুশ-কাঠের উপর, এবং দুটি নারীর সুন্দর মুখের উপর পড়েছে মশালের আলোর ভৌতিক নৃত্য।

"বিদায় জেজেবেল," লেডি বারবারা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল।

"বিদায়," বলল স্বর্ণকেশিনী।

১২—কবর থেকে বেরিয়ে

সিংহটাকে এত কাছে দেখেই লাফায়েৎ স্মিথের মাথা ঘুরে গেল। আচমকা রিভলবারটা বের করে গুলি ছুঁড়ল। কিন্তু আসলে সিংহটা তাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে না এসে ছুটছিল ঠিক উল্টো দিকে। আর অত্যন্ত হকচকিয়ে যাওয়ায় লাফায়েৎ স্মিথের গুলিও তার গায়ে লাগল না। তবু গুলির শব্দ গুহার কাটলে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে পশুরাজ যেমন বিব্রত হয়ে ছুট দিল, তার ভয়ে স্মিথও ছুটল তার পথে।

কিছুক্ষণ ছোটার পর সে থামল। যত না ভয়ে তার চাইতে বেশী ক্লান্তিতে। ঠাণ্ডা মাথায় রিভলবারে নতুন করে গুলি ভরল। একটা চওড়া পাথরের উপর বসে সিংহটার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। সিংহ এল না।

আবার শুরু হল পাথরের কাটলের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ। ক্রমে ভূতাত্ত্বিক আগ্রহ যত বাড়তে-লাগল সিংহের ভয় তত কমতে লাগল। একটু একটু করে সে এগিয়ে চলল সুড়ঙ্গ-পথ ধরে। আবিষ্কারের নেশায় ভুলে গেল ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও নিরাপত্তার কথা।

সুড়ঙ্গটা ক্রমেই সরু হয়ে আসছে। এক সময় দু'দিকের দেয়াল এত বেশী চেপে এসেছে যে কোন রকমে একটা মানুষ তার ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারে। হঠাৎ মাথার উপরটাও অন্ধকারে ঢেকে গেল। উপরে তাকিয়ে দেখল, অনেক উপরে পাথরের প্রাচীর দুটো প্রায় মিশে যাবার মত অবস্থা হয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে আকাশের একটা সংকীর্ণ রেখামাত্র চোখে পড়ছে।

অন্ধকার ক্রমেই বাড়ছে। এক সময় সে হাতে-পায়ে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগল। মনে সর্বদাই ভয়—না জানি কি আছে এ পথের

শেষে।

এক সময় একটুকরো দিনের আলো হঠাৎ ঝলমলিয়ে উঠল গুহার মুখে। হামাগুড়ি দিয়ে বের হতেই সামনে পড়ল একটা উপত্যকা। অভিজ্ঞ চোখে সহজেই বুঝতে পারল সেটাও দীর্ঘলুপ্ত একটা আগ্নেয়গিরির মাথা। সম্মুখে প্রসারিত ঝোপঝাড়ে ভর্তি বিস্তীর্ণ প্রান্তর ; মাঝখানে একটা নীল হ্রদ পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ঝিলমিল করছে।

মনটা খুশিতে ভরে উঠলেও একটা আতংকও তাকে পেয়ে বসল। সিংহটা যদি তার পিছু নিয়ে থাকে তাহলে তো সেটাও অচিরেই এখানে এসে হাজির হবে। তখন ? শ' খানেক গজ দূরে একটা গাছ চোখে পড়ল। সিংহের হাত থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র আশ্রয় হিসাবে লাফায়েৎ স্মিথ সেই দিকেই এগিয়ে গিয়ে গাছে চড়ে বসল।

সেখান থেকে চার দিকে তাকিয়ে একটা আশ্চর্য দৃশ্য তার চোখে পড়ল। কুঁড়ে ঘরে সাজানো একটা গ্রাম। কিন্তু না, সে নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছে। এই পরিত্যক্ত জায়গায় গ্রাম আসবে কোথা থেকে ? নিশ্চয় এটা তার চোখের ভুল।

ঘুমবার ইচ্ছা তার ছিল না ; তবু গভীর ক্লান্তিতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে দেখল সূর্য নেমে এসেছে। সারাটা বিকেল সে ঘুমিয়েছে। এতক্ষণে মনে পড়ল, তার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। তৃষ্ণাও পেয়েছে। গাছ থেকে নেমে হ্রদের জল আকণ্ঠ পান করল। তারপর এগিয়ে চলল গ্রামটার দিকে—আশ্রয় ও আহার্যের আশায়।

হ্রদের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় সে গ্রামে পৌঁছে গেল। সমবেত লোকজনদের আরও স্পষ্ট করে দেখতে পেয়ে সে অবাক হয়ে গেল। সকলেই যে সাদা মানুষ। পরমুহূর্তেই একটা দৃশ্য চোখে পড়তেই সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। দুটো ক্রুশ-কাষ্ঠের সামনে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মেয়ে। আগুনের আভা পড়েছে তাদের মুখে। দুজনই সুন্দরী।

লাফায়েৎ স্মিথ বুঝতে পারল একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলছে। ক্রুশ দুটোর নীচে স্তূপিকৃত করা হয়েছে শুকনো ঘাস-পাতা ও জ্বালানি-কাঠ। একদল যুবকের হাতে জ্বলন্ত মশাল। জ্বালানি-কাঠে আগুন ধরাবার আয়োজন চলছে।

একটি বৃদ্ধ মন্ত্রপাঠ করছে। এখানে-ওখানে মাটিতে পড়ে আছে কিছু মানুষ। নিশ্চয় "দশা" পড়েছে। বুড়ো লোকটি সংকেত করতেই শুকনো কাঠে আগুন ধরানো হল।

আর দেরী করা চলে না। একলাফে এগিয়ে গিয়ে গ্রামবাসীদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে লাফায়েৎ স্মিথ ক্রুশ-কাষ্ঠের কাছে হাজির হল। পায়ের বুট

দিয়ে জ্বলন্ত কাঠগুলিকে লাথি মেরে সরিয়ে দিল। তারপর '৩২-টাকে উঁচিয়ে ঘুরে দাঁড়াল বিস্মিত ক্রুদ্ধ জনতার দিকে।

আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম হতচকিত। কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য। সম্বিত ফিরে পেয়ে সে চীৎকার করে বলল, "কে এই মহাপাপী? ওকে আক্রমণ কর! ওর হাত-পা-মুণ্ডু ছিঁড়ে ফেল!"

স্মিথের পিছন থেকে ভেসে এল একটি ইংরেজ-কণ্ঠ: "এই মুহূর্তে গুলি চালাও; নইলে ওরা তোমাকে শেষ করে ফেলবে।"

লাফায়েৎ স্মিথের বিস্ময়ের শেষ নেই। এ যে এক ইংরেজ মহিলার কণ্ঠস্বর। একজন মশালধারী এগিয়ে আসতেই স্মিথ গুলি করল। আর্তনাদ করে বুক চেপে ধরে সে স্মিথের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। তা দেখে আর যারা এগিয়ে আসছিল তারা পিছিয়ে গেল। অতি-উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে এগাস্টাসের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অপস্মার রোগগ্রস্ত বাকি লোকগুলো মাটিতে পড়ে গোঙাতে লাগল।

তাদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সেই সুযোগে লাফায়েৎ স্মিথ দুই বন্দিনীর হাত-পায়ের বাঁধন কেটে দিল। দুইজনকে দুই হাতে তুলে ধরল। জেজেবেলকে ক্রুশে বাঁধা হয়েছিল অনেকক্ষণ আগে। সে কোনমতেই একাকি দাঁড়াতে পারছিল না। লেডি বারবারা ও স্মিথ দুজনেই তাকে ধরে রইল যতক্ষণ না তার পায়ের স্বাভাবিক রক্ত-চলাচল ফিরে আসে।

পয়গম্বরের দিকে পিছন ফিরে তারা দাঁড়িয়েছিল। সেই সুযোগে বুড়ো পয়গম্বর বলির খড়্গটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল তাদের দিকে। তার সব রাগ পড়ল লেডি বারবারার উপর। সেই তো যত নষ্টের গোড়া। চুপি চুপি এগিয়ে লেডি বারবারার পিছনে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পয়গম্বর খড়্গসমেত ডান হাতটা মাথার উপর তুলল আঘাত হানার উদ্দেশ্যে। সমবেত দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে। সহসা তাদের কানে এল পয়গম্বরের রুদ্ধশ্বাস আকস্মিক আর্তনাদ; তার অবশ মুঠি থেকে খড়্গটা পড়ে গেল; সে নিজেও ভূতলশায়ী হল। নবাগতদের দৃঢ় মুষ্টি তার গলা চেপে ধরেছে।

দু'হাজার বছর আগে যে কবর খোঁড়া হয়েছিল এফেসীয় অগাস্টাস কি লেডি বারবারার জীবন বাঁচাতে সেই কবর থেকে উঠে এল। অন্তত এটা সত্য যে এই ঘটনাটা জানতে পেরে থাকলে সেই কবরেও সে একবার পাশ ফিরে শুয়েছে।

১৩—বিপাকে "বন্দুকবাজ"

একটা বড় বিড়ালের মত অরণ্যরাজ টারজন একলাফে গ্রামের পাচিলটাকে পার হয়ে ওপাশে নেমে পাহাড়ের অপেক্ষাকৃত অল্প খাড়াই জায়গাটা বেয়ে

উঠে গেল।

"বন্দুকবাজ" পাহাড়ের উপরে তার জন্তই অপেক্ষা করছিল। তুটি বিপরীত চরিত্রের মানুষ এই দ্বিতীয়বার মিলিত হল।

টারজন হেসে বলল, "মেসিন-গানের তাক একেবারে মোক্ষম।"

"ওরা তোমাকে বেশ বেকায়দায় পেয়েছিল," বলল "বন্দুকবাজ।"

টারজন বলল, "আমি অবশ্য ঠিক বেরিয়ে যেতাম ওদের হাত থেকে, তবু তোমাকে ধন্যবাদ। হঠাৎ তুমি এখানে এসে পড়লে কেমন করে?"

"এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎই তোমাকে দেখতে পেলাম। এই ওবাম্বিই বলে দিল যে তুমি আমাকে সেদিন সিংহের হাত থেকে বাঁচিয়েছ,—তাই আমিও কাজে নেমে পড়লাম।"

"তুমি কার খোঁজ করছ?"

"বন্ধু স্মিথের।"

"সে কোথায়?"

"সেটা জানলে আর খুঁজে বেড়াব কেন? বেড়াতে বেরিয়ে সে হারিয়ে গেছে। গতকাল বিকেল থেকে তার পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না।"

টারজন বলল, "সব কথা খুলে বল; হয়তো আমি কিছুটা সাহায্য-করতে পারব।"

লাফায়েত স্মিথের উধাও হবার ব্যাপারটা সে সংক্ষেপে জানাল।

"সে কি সশস্ত্র ছিল?" টারজন শুধাল।

"তার ধারণা তাই ছিল।"

"তার মানে?"

"সঙ্গে ছিল একটা ঝকঝকে খেলনা পিস্তল।"

"খাদ্য যোগাড় করার পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। তোমার তাঁবুটা কোথায়?"

"বন্দুকবাজ" দক্ষিণ দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল, "এখান থেকে হাজার-খানেক মাইল ওদিকে।"

"তুমি বরং সেখানে গিয়েই অপেক্ষা করগে, যাতে সে কোন রকমে ফিরে গেলে তোমাকে দেখতে পায় আর আমিও তার সন্ধান পেলে তোমাকে জানাতে পারব।"

"এ ব্যাপারে আমিও তোমাকে সাহায্য করতে চাই।"

"আমি একা হলে অনেক বেশী তাড়াতাড়ি চলতে পারব।"

"বন্দুকবাজ" ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, "বেশ, আমি শিবিরেই ফিরে যাচ্ছি। শিবিরটা কোথায় জান কি?"

"সে আমি খুঁজে নেব।" বলে কোনরকম বিদায়-সম্ভাষণ না জানিয়েই টারজন পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।

সেদিকে তাকিয়ে “বন্দুকবাজ” বলে উঠল, “গীজ! লোকটি দেখছি মানুষের সঙ্গ পছন্দ করে না।”

“কি বললে বাওয়ানা?” ওবাম্বি প্রশ্ন করল।

“চুপ,” ড্যানি ধমকে উঠল।

“বন্দুকবাজ” ও ওবাম্বি যখন শিবিরে পৌছল তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

কিছুটা দূরে থাকতেই ওবাম্বি বলল, “শিবিরে কিছু সাদা মানুষ এসেছে বাওয়ানা, আর অনেক ঘোড়া। হয়তো তারা পাগলা বাওয়ানাকে খুঁজে পেয়ে ফিরিয়ে এনেছে।”

“সাদা মানুষ আবার দেখলে কোথায়?”

“শিবিরের মাঝখানে আগুনের পাশে,” ওবাম্বি বলল।

ড্যানি মাথা নেড়ে বলল, “ঠিক, এবার আমিও দেখতে পেয়েছি। ওরা তাহলে বুড়ো স্মিথকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু তাকে তো দেখতে পাচ্ছি না; তুমি দেখতে পাচ্ছ?”

“না বাওয়ানা; সে হয় তো তাঁবুর মধ্যে আছে।”

প্যাট্রিক ও ওবাম্বিকে দেখামাত্রই শিবিরে একটা হুলুস্থুলু পড়ে গেল। সাদা মানুষরা উঠে দাঁড়িয়ে রিভলবার বের করল। তাদেরই একজনের হুকুমে কালা আদমিরাও রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়াল।

ড্যানি বলল, “গুলি করার দরকার হবে না। শুধু তো আমি আর ওবাম্বি।”

ড্যানির টমসন মেসিন-গানের দিকে নজর পড়তেই একজন রিভলবার তাক করে বলল, “হাত তোল।”

“বন্দুকবাজ” তাই করল।

অপরিচিত সাদা লোকটি শুধাল, “সে কোথায়?”

“কার কথা বলছ?”

“কার কথা বলছি তা তুমি ভালই জান—টারজন।”

“বন্দুকবাজ” দ্রুত চারদিকে তাকাল। আলখাল্লা-পরা বদখত্ চেহারার কালা আদমিরা তার লোকজনদের একসঙ্গে বেঁধে রেখেছে। তাদের পাশে অনেকগুলি ঘোড়া। লাফায়েত স্মিথ তাদের মধ্যে নেই। একটু ভেবে ড্যানি বলল, “তাকে আমি চিনি না।”

দাড়িওয়ালা সাদা লোকটি বলল, “আজই তুমি তার সঙ্গে ছিলে। তুমিই তো আমার গ্রাম লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছ।”

“বন্দুকবাজ” অবাক হবার ভান করে বলল, “কে, আমি? তুমি ভুল করছ মিস্টার। আমি তো সারাদিন শিকার করে বেড়িয়েছি। কাউকে

দেখি নি। এবার আমি প্রশ্ন করি। এই কু ক্লুক্স ক্লামারদের দলের সঙ্গে তোমরা দুজন এখানে কি করছ? তোমাদের যা করবার করে আমাকে ছেড়ে দাও। খুব খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে হবে।"

কাপিয়েত্র গাল্লা ভাষায় বলল, "ওর মেসিন-গানটা কেড়ে নাও। পিস্তলটাও।"

ড্যানি প্যাট্রিক নিরুপায় হয়ে মাথার উপরে হাত তুলেই দাঁড়িয়ে রইল। এবার তারা ওবাম্বিকে পাঠিয়ে দিল তার দলের লোকদের কাছে। তারপর "বন্দুকবাজকে" নিয়ে চলল তার ও স্মিথের তাঁবুর সামনেকার বড় আগুনটার কাছে।

"এবার বল তোমার সঙ্গী কোথায়," কাপিয়েত্র প্রশ্ন করল।

"কোন্ সঙ্গী?" ড্যানির পাল্টা প্রশ্ন।

"যে তোমার সঙ্গে ছিল, আবার কে?"

"বন্দুকবাজ" বলল, "আমাকে তল্লাসি করে দেখ।"

"তার মানে? তোমার শরীরে কি কিছু লুকোন আছে নাকি?"

"যদি টাকা-পয়সার কথা বল তো কিছুই নেই।"

কাপিয়েত্র রেগে বলল, "আমার প্রশ্নের জবাব এখনও তুমি দাও নি।"

"কোন্ প্রশ্নের?"

"তোমার সঙ্গী কোথায়?"

"আমার কোন সঙ্গী নেই।"

"তোমার সর্দার বলেছে তোমরা দুজন ছিলে। তোমার নাম কি?"

"ব্লুম," ড্যানি জবাব দিল।

কাপিয়েত্র বিব্রত হল। "তোমার সর্দার বলেছে তোমাদের একজন স্মিথ, অপরজন প্যাট্রিক।"

ড্যানি বলল, "ও রকম নামই কোন দিন শুনি নি। সে বোধ হয় তামাসা করেছে। আমি একাই শিকারে এসেছি, আর আমার নাম ব্লুম।"

"তাহলে অরণ্যরাজ টারজনকে তুমি আজ দেখ নি?"

"ও রকম নামের কোন লোকের কথা শুনি নি।"

স্তাবুচ বলল, "হয় এ লোকটা মিথ্যে বলছে আর না হয় তো গুলি চালিয়েছে অন্য লোক।"

ড্যানি সায় দিয়ে বলল, "ঠিক তাই। নিশ্চয় অন্য একজোড়া মানুষ এখানে এসেছিল। কিন্তু—আমাকে খাবার দিচ্ছ কখন?"

"যখন টারজনের খবরটা বলবে," স্তাবুচ জবাব দিল।

ড্যানি হেসে বলল, "নামটাই শুনি নি কখনও তো খবর বলব কেমন করে?"

তার হাসি দেখে কাপিয়েত্রর পিত্তি জ্বলে গেল। রেগেমেগে বলে উঠল, "ঠিক আছে। এটার দুই হাত পিছমোড়া করে বাঁধ। আজ রাতেই ওকে নিয়ে আমরা শিবির ছেড়ে চলে যাব। বলা তো যায় না; টারজন যে কোন সময় এসে আক্রমণ করতে পারে।"

১৪—পলায়ন

আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহামের অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা মাত্রই লেডি বারবারা ও স্মিথ চকিতে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল, তার দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে আর হাতের খড়্গটা অবশ মুঠি থেকে সশব্দে ছিটকে পড়েছে মাটিতে। জোবাব দলবল নিয়ে বিকৃত মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

লেডি বারবারা বলল, "এখনই পালাও। মুহূর্তের মধ্যে ওরা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

স্মিথ বলল, "তোমার বন্ধুটিকে সঙ্গে নিতে আমার সঙ্গে তোমাকেও হাত লাগাতে হবে। সে একা হাঁটতে পারবে না।"

লেডি বারবারা বলল, "তুমি ওকে বাঁ হাত দিয়ে ধর। তাহলে ডান হাতে পিস্তল চালাতে পারবে। আমি অপর দিকটা ধরছি।"

জেজেবেল মিনতি করে বলল, "আমাকে রেখে যাও। আমার জন্য তোমরাও পালাতে পারবে না।"

স্মিথ বলল, "বাজে কথা রাখ। আমার গলা জড়িয়ে ধর।"

লেডি বারবারা আশ্বাস দিয়ে বলল, "রক্ত-চলাচল স্বাভাবিক হলেই তুমি হাঁটতে পারবে। চলে এস। যত তাড়াতাড়ি পারি পালাই এখান থেকে।"

বাধা দিল জোবাব। নোংরা জামার ভিতর থেকে একটা ছুরি বের করে চীৎকার করে বলল, "ওদের আটকাও।"

জোবাবের দিকে পিস্তল তাক করে স্মিথ হুকুম করল, "এক পাশে সরে দাঁড়াও!"

মিডিয়ান ভাষায় লেডি বারবারা বলল, "জিহোবার অভিশাপ নেমে আসবে তোমার মাথায়।"

টিমোথি কর্কশ গলায় বলল, "এ সব শয়তানের কাজ। ওদের কথায় তুমি দুর্বল হয়ো না জোবাব। ওদের যেতে দিও না।"

কিন্তু তার মনের উপর যে চাপ পড়েছে বুড়োটা তা সহ্য করতে পারল না। কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে গোঙাতে লাগল। কিন্তু জোবাব তখনও স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে উদ্যত ছুরি।

তাদের ঘিরে ভিড়টা ক্রমেই চারদিক থেকে এগিয়ে আসছে। হাতের পিস্তল তুলে জোবাবের দিকে নিশানা করে স্মিথ বলল, "এ কাজটাকে আমি ঘৃণা করি।" জোবাব একেবারে সামনা-সামনি এসে পড়ায় লাফায়েত স্মিথের পিস্তল গর্জে উঠল।

এ কী হল! আক্রমণকারী ও আক্রান্ত দুজনই অবাক। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। এ যে অবিশ্বাস্য—নিশ্চয় পিস্তলের কোন গোলমাল আছে।

কিন্তু এর ফলে জোবাবের মুণ্ডুটাই ঘুরে গেল। সে ভাবল, জিহোবার কৃপায় গুলির আগুন ও বজ্র সে হজম করে ফেলেছে। জিহোবাই তাকে রক্ষা করেছে। আর যাবে কোথায়? সে ঝাঁপিয়ে পড়ল লাফায়েত স্মিথের উপর। আকস্মিক ধাক্কায় পিস্তলটা ছিটকে পড়ে গেল স্মিথের হাত থেকে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীরা তাকে ঘিরে ফেলল। পিস্তলের ভয়কে তারা জয় করেছে।

লাফায়েত স্মিথও দুর্বল নয়। শুরু হল দুপক্ষের ধ্বস্তাধ্বস্তি। লেডি বারবারা কলিস বুঝতে পারল, এই অসম লড়াইতে তাদের তিনজনেরই সমান ক্ষতি হবে। পিস্তলটা তার পায়ের কাছেই পড়ে ছিল। মুহূর্তের মধ্যে সেটাকে তুলে নিয়ে জোবাবের পাঁজরে নলটা ঠেকিয়ে ঘোড়া টিপল। বিকৃতস্বরে চীৎকার করে সে মাটিতে পড়ে যেতেই লেডি বারবারা নলের মুখটা জনতার দিকে ঘুরিয়ে আবার গুলি করল। ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে মিডিয়ানরা পালিয়ে গেল।

লাফায়েত স্মিথ বলল, "তুমি খুব সাহসী মেয়ে।"

ঈষৎ হেসে লেডি বারবারা বলল, "তোমার মত সাহসী নই, তবে তোমার চাইতে ভাল পিস্তল চালাতে পারি।"

জেজেবেল বলল, "যে কোন মুহূর্তে ওরা আবার আসতে পারে। এই সুযোগে আমাদের পালাতে হবে।"

স্মিথ বলল, "আমার পিছনে পিছনে এস। আমি যে পথে এসেছি সেই পথে তোমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাব।"

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চলার পরে লাফায়েত স্মিথই প্রথম মুখ খুলল। বলল, "তোমাদের দুজনের পরিচয়টা কিন্তু এখনও জানা হয় নি।"

লেডি বারবারা বলল, "জেজেবেল এখানকারই মেয়ে।"

"আর তুমি? তুমিও কি এখানকার মেয়ে?"

লেডি বারবারা জবাব দিল, "না, আমি ইংরেজ।"

"অথচ কোন্ পথে এখানে এসেছ তাও জান না?"

"জানি—আমি এখানে নেমেছি প্যারাসুটে।"

স্মিথ হঁা করে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, "তুমি লেডি

বারবারা কলিস !”

“তুমি কি করে জানলে ? তুমি কি আমাকেই খুঁজছ ?”

“না, কিন্তু লণ্ডন হয়ে আসার সময় খবরের কাগজে তোমার বিমানে ওড়া ও নিখোঁজ হবার খবর অনেক পড়েছি—ছবি-ছাপাও বেরিয়েছিল। বুঝলে তো ?”

“আর ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে। আশ্চর্য যোগাযোগ ! কী সৌভাগ্য আমার।”

স্মিথ মুখ নীচু করে বলল, “কি জান, আসলে আমিও পথ হারিয়ে ঘুরছি। ফলে তোমার ভাগ্যের বিশেষ হেরফের কিছু হয় নি।”

“তা কেন ? তুমিই তো আমাকে কবরে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছ।”

“ওরা কি সত্যি তোমাকে পুড়িয়ে মারত না কি ? আজকের সভ্য জগতেও কি তা সম্ভব ?”

“মিডিয়ানরা দু'হাজার বছর আগেকার যুগে বাস করে। তাছাড়া, তারা যেমন ধর্মভীরু তেমনি জন্মগত উন্মাদ।”

স্মিথ জেজেবেলের দিকে তাকাল। সন্থ-উদিত চাঁদের আলো পড়েছে তার মুখে। স্মিথের মনোভাব বুঝতে পেরে লেডি বারবারা বলল, “জেজেবেলের কথা আলাদা। কারণটা বুঝিয়ে বলতে পারব না, কিন্তু সে তার দেশের অন্য লোকদের মত নয়। সেই আমাকে বলেছে, মাঝে মাঝে নাকি তার মত দু'একটি ছেলেমেয়েও এদেশে জন্মায়।”

“কিন্তু সে তো ইংরেজিতে কথা বলে,” স্মিথ বলল ; “গ্রামের অন্য সকলের সঙ্গে একই রক্ত তো তার শিরায় বইতে পারে না।”

“আমি ওকে ইংরেজি শিখিয়েছি,” লেডি বারবারা বলল।

“বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে ও কি সত্যি আমাদের সঙ্গে যাবে ?”

এবার কথা বলল জেজেবেল। “নিশ্চয় যাব। এখানে থাকব কি খুন হবার জন্যে ? আজ রাতে আমার বাবা, মা, ভাই-বোনরা সকলেই ছিল ক্রুশকাঠের কাছে। তারা আমাকে ঘৃণা করে। জন্মের মুহূর্ত থেকেই ঘৃণা করে। আমি তাদের মত নই। তাছাড়া, মিডিয়ানদের দেশে ভালবাসা বলে কিছু নেই—আছে শুধু ধর্ম। তারা মুখে ধর্মের কথা বলে আর কার্যক্ষেত্রে ছড়ায় শুধু ঘৃণা।”

জেজেবেলের পায়ের অবশ ভাবটা কেটে গেছে। এখন সে একাই হাঁটতে পারছে। নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে তিনটি প্রাণী। আফ্রিকার ভরা চাঁদ উঠেছে আকাশে। তারই আলোয় পথচলা সুগমতর হয়েছে। চিন্নেরেথের নীল জলরাশিকে ডাইনে রেখে তারা এগিয়ে চলেছে।

মাঝরাতের কিছু পরেই স্মিথ প্রথমবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। তাড়া-

তাড়ি উঠে আবার হাঁটতে লাগল। পিছন থেকে জেজেবেল বুঝতে পারল, তার পা টলছে। স্মিথ আবার পড়ে গেল। অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে যখন তৃতীয়বার পড়ে গেল তখন লেডি বারবারা ও জেজেবেল তাকে ধরে তুলল।

লেডি বারবারা বলল, “তুমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।”

“না, না, আমি ঠিক আছি।”

“তুমি শেষবার কখন খেয়েছ?” লেডি বারবারা শুধাল।

স্মিথ বলল, “সঙ্গে কিছু চকোলেট ছিল। বিকেলের দিকে তাই খেয়েছি।”

লেডি বারবারা তবু প্রশ্ন করল, “আমি জানতে চাইছি, পুরো খাবার কখন খেয়েছ?”

“দেখ, হাল্কা লাঞ্চ খেয়েছি গতকাল দুপুরে, বরং বলতে পার তার আগের দিন।”

লেডি বারবারা সবিস্ময়ে বলল, “আর এখন মাঝ রাত পার হয়ে গেছে। অথচ সেই থেকে তুমি হেঁটেই চলেছ?”

দুর্বল হাসি হেসে স্মিথ বলল, “কিছুক্ষণ দৌড়তেও হয়েছে; একটা সিংহ তাড়া করেছিল যে।”

ইংরেজ মেয়েটি বলল, “তুমি একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমরা এখানেই বিশ্রাম নেব।”

স্মিথ মাথা নেড়ে বলল, “না, না, তা করো না। দিনের আলো ফুটবার আগেই আমাদের এই উপত্যকাটা পার হতে হবে। সূর্য উঠলেই তারা আমাদের খুঁজতে বের হবে।

লেডি বারবারা কঠিন গলায় বলল, “সে যা হয় হবে। তোমাকে বিশ্রাম নিতেই হবে।”

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লাফায়েত বসে পড়ল। বলল, “আমার দ্বারা তোমাদের বিশেষ কোন সাহায্য হবে বলে তো মনে হয় না। এ সময় ড্যানি থাকলে খুব ভাল হত।”

“কে ড্যানি?”

“আমার বন্ধু; এই অভিযানে আমার সঙ্গী।”

“তার কি আফ্রিকা-অভিযানের অভিজ্ঞতা আছে?”

“তা নেই, তবে সে কাছে থাকলেই যে ভরসা পাওয়া যায়। তাছাড়া গুলি-গোলা ছুঁড়তে খুব ওস্তাদ।”

চিৎ হয়ে শুয়ে স্মিথ চাঁদের দিকে তাকাল। এখন সে অনেকটা সুস্থ বোধ করছে। শুয়ে শুয়ে গত ত্রিশ ঘণ্টার ঘটনাবলীই তার মনের মধ্যে নড়াচড়া

করতে লাগল। এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

পাছে তার ঘুম ভেঙে যায় তাই লেডি বারবারা ইসারায় জেজেবেলকে ডেকে নিয়ে খানিকটা দূরে গিয়ে বসল। বলল, "আহা বেচারি! অনেক ধকল গেছে ওর উপর দিয়ে।"

"ও কি তোমার দেশের মানুষ?" জেজেবেল প্রশ্ন করল।

"না, ও মার্কিনী। কথা শুনেই বুঝেছি।"

"ও খুব সুন্দর," দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেজেবেল বলল।

"কয়েক সপ্তাহ ধরে কেবল আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহামকে দেখলে তোমার সঙ্গে আমাকেও একমত হতে হবে যে সন্ত গান্ধীও একটি এডোনিস," লেডি বারবারা বলল।

তারপর একটা হাই তুলে বলল, "ও সব কথা পরে হবে। এস, একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক।"

লেডি বারবারা মাটির উপর শুয়ে অচিরেই ঘুমিয়ে পড়ল। সারাটা দিন তার উপর দিয়েও তো অনেক ধকল গেছে।

১৫—মেষপালক এশবাল

মুখের উপর রোদ এসে পড়ায় লাফায়েত স্মিথের ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে কিছুই মনে পড়ল না, কিন্তু কিছুটা দূরে ঘুমন্ত মেয়ে দুটিকে দেখেই সব কিছু রূঢ় বাস্তব হয়ে দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার মন খারাপ হয়ে গেল। এত বড় দায়িত্ব সে কি পালন করতে পারবে? কে জানে? কি খাবে তারা? কেমন করে আসবে সে খাবার?

খাবারের কথা মনে হতেই পেটের ভিতরটা ক্ষিধেয় জ্বলতে লাগল। হ্রদের তীরে গিয়ে উপুড় হয়ে বেশ খানিকটা জল খেয়ে উঠে দেখল, মেয়ে দুটি বসে তাকেই দেখছে।

সে বলে উঠল, "গুড মর্নিং। প্রাতরাশ খাচ্ছিলাম। হ্রদের জল খানিকটা খেয়ে দেখ, ভারি উপাদেয়।"

মেয়েরাও জল খেল। তারপর আবার শুরু হল যাত্রা কিন্তু কোন্ দিকে যাবে? কোন্ দিকে আছে এই গুহা-পথের মুখ? হতাশ হয়ে স্মিথ বলল, "আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা। বরং এক কাজ করা যাক। সকলে মিলে খোঁজাখুঁজি না করে তুমি আর জেজেবেল এখানে বসে অপেক্ষা কর, আর আমি খুঁজে দেখি।"

"আমার তো মনে হয় আমাদের এক সঙ্গে থাকাই ভাল," জেজেবেল বলল।

"সর্বতোভাবে," লেডি বারবারা সায় দিল।

স্মিথ বলল, "বেশ, তাই হোক। প্রথমে উত্তর দিকে যাওয়া যাক। সেখানে মুখটা পাওয়া না গেলে তখন দক্ষিণ দিকে খোঁজ করা যাবে।"

চড়াই-উৎরাই পথ বেয়ে সকলে উত্তর দিকে চলতে লাগল। একটা পাহাড়ের মাথায় উঠেই স্মিথ হতাশ ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে পড়ল।

"কি হল?" জেজেবেল শুধাল।

স্মিথ বলল, "এই যে বনটা—গুহার মুখে তো কোন বন ছিল না।"

"পাহাড় থেকে গ্রামে আসার পথে তুমি কোন বনের ভিতর দিয়ে আস নি?" লেডি বারবারা জানতে চাইল।

স্মিথ মাথা নাড়ল। ভগ্নোৎসাহ গলায় বলল, "আবার সবটা পথ হেঁটে গিয়ে দক্ষিণ দিকে এগোতে হবে। তোমরা আমাকে ক্ষমা কর।"

"বোকার মত কথা বলো না," লেডি বারবারা বলল। "ভুল সকলেরই হতে পারে।" হঠাৎ সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "দেখ—দেখ। বনের মধ্যে কি যেন নড়াচড়া করছে। দেখতে পাচ্ছ? মনে হচ্ছে হরিণের দল।"

জেজেবেল বলল, "না, ওগুলি ছাগল। উত্তর মিডিয়ানরা ছাগল পোষে। এই দিকেই চরাতে আনে।"

লেডি বারবারা বলল, "উঃ, দেখেই আমার খেতে ইচ্ছা করছে। চল, নীচে গিয়ে একটাকে ধরি।"

"ছাগল ধরা অত সোজা নয়," লাফায়েত বলল।

"তোমার তো পিস্তল আছে," ইংরেজ মেয়েটি স্মরণ করিয়ে দিল।

"তাও তো বটে। একটাকে তো আমি গুলি করে নামাতে পারি।"

"তাই চল।"

"না আমি একাই যাই। তিনজনকে দেখলে ওরা ভয় পেয়ে যাবে।"

লাফায়েত স্মিথ গাছের আড়ালে-আড়ালে বুকে ভর দিয়ে এগিয়ে গেল। মেয়ে দুটিও নিজেদের আড়াল করার জন্য মাটিতে শুয়ে পড়ে তার উপর নজর রাখল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে জেজেবেল বলল, "ও কী সুন্দর!"

লেডি বারবারা বলল, "এই মুহূর্তে আমার কাছে সব চাইতে সুন্দর ওই ছাগলগুলো। খুব কাছে গিয়ে যদি ওর গুলি ফসকায় তাহলে আমি মরেই যাব—আমি জানি ওর গুলি ফস্কাবেই।"

আর ঠিক সেটাই ঘটল। স্মিথের গুলি লক্ষভ্রষ্ট হল। তবু ছেড়ে দেবার পাত্র সে নয়। একলাফে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল একটা ছাগলছানার উপর।

ছানাটা পা ছুঁড়তে লাগল। সেই অবস্থায় সেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে সে হাঁপাতে হাঁপাতে মেয়ে দুটির কাছে গিয়ে হাজির হল।

খাবার হাতে পেয়ে সকলেই মহাখুশি। যেন উৎসবের মেজাজ। তিনজনই ক্ষুধার্ত। ছাগলছানাটাকে মেরে ছাল ছাড়িয়ে টুকরো টুকরো করে কাটা হল। রান্নার ভার নিল লেডি বারবারা। গাছের ডাল কেটে তার সাহায্যে টুকরোগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে শিক-কাবাব বানাতে শুরু করে দিল।

ওদিকে মেষপালক এশ্‌বাল পিস্তলের শব্দ শুনে কান খাড়া করল। কাল রাতেও বারকয়েক এই শব্দ সে শুনেছে। আজ আবার। এমন সময় দলের ছাগলগুলো ছুটতে ছুটতে সেখানে এসে হাজির হল। এশ্‌বালের অভিজ্ঞ চোখ সহজেই ধরে ফেলল যে একটা ছাগলছানা খোয়া গেছে। সেটার খোঁজেই সে বেরিয়ে পড়ল।

অধৈর্য গলায় স্মিথ বলল, "রান্না শেষ হতে আর কত দেরী? আমি কাঁচাই খেতে পারব। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।"

লেডি বারবারা বলল, "তা তো জ্বলতেই পারে। নাও। হয়ে গেছে। এবার শুরু করা যাক।"

মহা উৎসাহে তিনজন খেতে বসে গেল। গাছের আড়াল থেকে এশ্‌বাল যে তাদের উপর নজর রেখেছে সেটা তারা দেখতেই পায় নি।

জেজেবেলকে দেখেই সে চিনতে পারল; হঠাৎ তার নীল চোখে যেন আগুন ঝিলিক দিয়ে উঠল। কিন্তু বাকি দুজন কারা? হারানো ছাগলছানাটার দশা দেখে তার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। মুহূর্তের জন্য তিনজনকে দেখে নিয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দেই এশ্‌বাল ফিরে গেল। আহার-পর্ব শেষ করে বাকি মাংসটা চামড়ায় মুড়ে নিয়ে তিনজন আবার বেরিয়ে পড়ল গুহা-মুখের খোঁজে।

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল স্মিথ। উত্তরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ফিসফিসিয়ে বলল, "ওই দেখ।"

দলবল নিয়ে এগিয়ে আসছে এশ্‌বাল। তাদেরই একজন প্রশ্ন করল, "তোমরা কে? মিডিয়ানদের দেশে কি করছ?"

সামনে এগিয়ে গিয়ে জবাব দিল ইংরেজ মেয়েটি, "মিডিয়ানে আমরা নবাগত। পথ হারিয়ে ফেলেছি। তোমাদের দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজছি।"

লোকটি বলল, "মিডিয়ান থেকে বেরিয়ে যাবার কোন পথ নেই। তোমরা এশ্‌বালের একটা ছাগলছানাকে মেরেছ। সেজন্য তোমাদের শাস্তি হবে। চল আমাদের সঙ্গে।"

লেডি বারবারা বলল, "আমরা খুবই ক্ষুধার্ত হয়েছিলাম। ছাগলছানাটার দাম দিতেও রাজী আছি। যাহোক একটা ফয়সালা করে নাও।"

মিডিয়ানরা চুপি-চুপি কি যেন বলাবলি করল। তারপর লোকটি বলল, "আমাদের সঙ্গে তোমাদের যেতেই হবে—অন্তত মেয়ে দুটিকে তো বটেই। পুরুষ মানুষটি যদি চলে যেতে চায়, আমরা বাধা দেব না; আমরা চাই মেয়ে দুটিকে।"

সব কথা শুনে স্মিথ কঠিন কণ্ঠে বলল, "ওদের বলে দাও, আমাদের উপর জোর খাটালে আমি ওদের খুন করে ফেলব।"

লেডি বারবারা কথাটা শোনাতেই তারা হো-হো করে হেসে উঠল। একজন বলল, "আমাদের বিশ জনের বিরুদ্ধে ও একা কি করবে?" হাতের গদা ঘোরাতে ঘোরাতে অসভ্যদের রণ-হুংকার উচ্চারণ করে ওরা সদলে এগিয়ে গেল।

লেডি বারবারা বলে উঠল, "গুলি কর। ওরা অন্তত বিশজন আছে। তোমার গুলি ফুরাবে না।"

স্মিথ ঘোড়া টিপল। পিস্তলের শব্দ শুনে মিডিয়ানরা চমকে থেমে গেল। কিন্তু কেউ মাটিতে পড়ল না। বরং দ্বিতীয়বার গুলি ছুঁড়বার আগেই স্মিথকে লক্ষ্য করে সবেগে ছুটে এল দল-নেতার হাতের গদা। স্মিথ এক পাশে সরে গেল, কিন্তু গদার আঘাতে তার হাত থেকে পিস্তলটা ছিটকে পড়ে গেল—মিডিয়ানরা ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর।

১৬—পথে পথে

বন্য পশুরা হয় তো এক চোখ খুলে ঘুমতে পারে না, কিন্তু প্রায়ই মনে হয় তারা দুই কান খাড়া রেখেই ঘুময়। যে কোন বিপদসূচক শব্দ কানে এলেই তাদের ঘুম ভেঙে যায়। মাঝ রাতের পরে সেরকম একটা শব্দ শুনেই টারজনের ঘুম ভেঙে গেল।

মাথা তুলে কান পাতল; তারপর মাথা নীচু করে মাটিতে কান রাখল। উঠে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই বলল, "অশ্ব ও অশ্বারোহী"। আবার কান পাতল। বেবুন, সিংহী, হাতি—অনেক রকম গন্ধই বাতাসে ভেসে এল; কিন্তু তাকে আকর্ষণ করল কেবল ঘোড়া ও তার সওয়ারের গন্ধ :

এত রাতে অশ্বারোহী আসছে কেন? তারা কারা?

অন্ধকারে "বন্দুকবাজ" টলতে টলতে চলেছে। বিশ বছরেরও বেশী

কালের জীবনে এত ক্লান্তি সে কোনদিন অনুভব করে নি। প্রতিটি পদক্ষেপই মনে হচ্ছে শেষ পদক্ষেপ।

কিন্তু যত দীর্ঘই হোক সব পথই এক সময় শেষ হয়। শেষ পর্যন্ত ডাকাতের দলটা ডোমিনিক কাপিয়েত্রর গ্রামের ফটক দিয়ে ঢুকল। "বন্দুকবাজ"কে নিয়ে যাওয়া হল একটা কুটিরে। হাতের বাঁধন কেটে দিতেই সেখানকার কঠিন মাটিতেই তার দেহটা এলিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে কোন রকমে কিছু পেটে দিয়েই সে আবার ঘুমিয়ে পড়ল। একটা ক্লান্ত ডাকাত কুটিরের মুখে পাহারায় বসে ঘুমে ঢুলতে লাগল।

ডাকাতরা যখন সারি দিয়ে গ্রামের ভিতর ঢুকছিল টারজন তখন নেমে এসেছিল উপরকার পাহাড়ের মাথায়। ভরা জ্যোৎস্নায় অশ্বারোহীদের বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। কাপিয়েত্র ও স্তাবুচকে দেখেই সে চিনতে পারল; মার্কিন ভূতত্ত্ববিদের দলের সর্দার ওগোনিয়োকেও দেখতে পেল; আরও দেখল, "বন্দুকবাজ" অত্যন্ত কষ্টে টলতে টলতে চলেছে।

ক্রমে রাত বাড়ল। হৈ-চৈ থেমে গেল। চারদিক নিঃস্তব্ধ। পাহাড়ের উপর থেকে সব কিছু দেখে-শুনে-বুঝে টারজন নিঃশব্দে নেমে এল গ্রামের পাঁচিলের পাশে। একলাফে উঠে গেল পাঁচিলের মাথায়। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখল, চারদিক চুপচাপ শুন্‌শান্।

আর একলাফে পাঁচিল থেকে নামল। এগিয়ে গেল সেই কুটিরটার দিকে যেখানে ঘুমিয়ে আছে সাদা যুবকটি। দরজার পাশে বসে আছে পাহারাদার। রাইফেলটা হাঁটুর নীচে। ধীরে ধীরে সে পা ছড়িয়ে বেড়ার গায়ে হেলান দিল। একসময় তার মাথাটা ঢলে পড়ল; থুত্‌নিটা বুকে ঠেকল, মুখটা হাঁ হল, আর শ্বাস-প্রশ্বাসের ধরণ পাল্টে গেল। প্রহরী ঘুমিয়ে পড়েছে।

নিঃশব্দে টারজন এগিয়ে গেল লোকটার দিকে। দুই হাত বাড়াল। মট্‌ করে একটা শব্দ হল। ইস্পাত-কঠিন মুঠোর এক মোচরে গলার হাড়টা ভেঙে গেল।

অন্ধকারেই মৃতদেহটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে টারজন ঘরের ভিতর ঢুকল। খুব সাবধানে ঘুমন্ত "বন্দুকবাজ"কে ঠেলে দিল। কিন্তু তার ঘুম ভাঙল না। আরও জোরে ঠেলা দিয়েও যখন কোন কাজ হল না তখন এক চড় কসিয়ে দিল তার গালে।

"বন্দুকবাজ" নড়েচড়ে বলে উঠল, "গীঞ্জ! তোমরা কি একটু ঘুমতেও দেবে না। বলেছি তো মুক্তি-পণ পাবে।"

মুচ্‌কি হেসে টারজন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "উঠে পড় হে। হৈ-চৈ করো না। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"তুমি আবার কে?"

"অরণ্যরাজ টারজন।"

"গীজ!" বন্দুকবাজ উঠে বসল।

টারজন বলল, "আমাকে অনুসরণ কর। যাই ঘটুক না কেন আমার খুব কাছে কাছেই থেকো। আমি তোমাকে ছুঁড়ে দেব পাঁচিলের মাথায়। কোন রকম শব্দ করো না, আর খুব সাবধানে ও-পাশে নেমো,—ওদিকের মাটি অনেকটা নীচু।"

"কি বললে? তুমি আমাকে ছুঁড়ে দেবে পাঁচিলের মাথায়?"

"হ্যাঁ।"

"আমার ওজন কত জান?"

"না; জানবার কোন দরকার নেই। চুপচাপ আমার পিছনে এস।"

পাঁচিলের কাছে পৌঁছে "বন্দুকবাজ" উপরে তাকাল। তার সন্দেহ ঘনীভূত হল। তার এক শ' আশি পাউণ্ড ওজনের দেহটাকে ছুঁড়ে দেবে পাঁচিলের উপরে—পাগল না কি!

"বন্দুকবাজে"র কলার ও ব্রীচেস চেপে ধরে তাকে কয়েকবার ঝুলিয়ে টারজন ছুঁড়ে দিল পাঁচিলের উপরে। পর মুহূর্তে ড্যানি প্যাট্রিকের প্রসারিত আঙুলগুলি পাঁচিলের মাথাটাকে আঁকড়ে ধরল।

"বন্দুকবাজ" ড্যানি প্যাট্রিক তো হতবাক। কী মানুষ রে বাবা! জীবনে কখনও সে এ রকমটি দেখে নি, দেখার আশাও করে না।

পাঁচিল থেকে নেমে দুজন নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। পাহাড়ের অনেক উপরে যেখানে সে গত রাতটা কাটিয়েছে; সেখানেই দুজন পৌঁছে গেল। টারজন বলল, "ভোর পর্যন্ত যতটা পার বিশ্রাম করে নাও। তুমি খুব ক্লান্ত।"

"গীজ! আহা, এ রকম দরদভরা কথা কতকাল শুনিনি," ড্যানি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

একটু দূরে টারজনও শুয়ে পড়ল। ঘুমিয়েও পড়ল। কিন্তু ভোর হবার সাথে সাথেই তার ঘুম ভেঙে গেল। সঙ্গীটি তখনও ঘুমচ্ছে। নিঃশব্দে সে কাছাকাছি একটা জলার দিকে এগিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ড্যানির ঘুম ভাঙল। উঠে দেখে টারজন নেই। কোথায় গেল? তাকে ফেলে পালিয়েছে? তাকে তো সেরকম মানুষ বলে মনে হয় নি। তবু—কিছুই বলা যায় না।

"বন্দুকবাজ" ভাবতে লাগল; "এখন আমি কি করি? গীজ! ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। তার জন্য অপেক্ষা করব, না চলতে শুরু করব? যাবই বা কোথায়? কি খাব? মহা মুস্কিল!"

যতদূর দৃষ্টি যায় চারদিকে তাকাল। কোথায় টারজন? তার বদলে কয়েক শ' গজ দূরে দেখতে পেল চিতবাঘ শীতাকে।

ড্যানি প্যাট্রিক ভবঘুরে, মাতাল, ডাকাত, বন্দুকবাজ, খুনী। তবু সে ভয়ে কাঁপতে লাগল। সারা দেহ ঘামে ভিজে গেল। প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠল। একবার ভাবল, ছুটে পালাবে, কিন্তু তার ভাগ্য ভাল যে পা দুটো নড়ল না। সে যেন কাঠ হয়ে গেছে। বন্দুকহীন "বন্দুকবাজে"র অবস্থা কাহিল।

চিতাটা এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কি ভেবে একবার গর্জন করে মুখব্যাদান করল। ড্যানির পা দুটি কাঁপতে শুরু করল। হাঁটু ভেঙে বসে যা সে অনেকদিন করে নি তাই করল—প্রার্থনা করতে লাগল।

সামনের লম্বা ঘাসকে দু' ভাগ করে দেখা দিল টারজন। তার কাঁধে একটা মরা শুয়োর। আজকের খাদ্য।

অদূরে চিতাটাকে দেখতে পেয়ে মরা শুয়োরটাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে টারজন একটা বন্য জন্তুর মত তীব্র স্বরে গর্জন করে উঠল। শীতা ও ড্যানি প্যাট্রিক দুজনই হকচকিয়ে গেল। তীরবেগে এক পাক ঘুরে শীতা প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে গেল। মরা শুয়োরটাকে কাঁধে তুলে উপরে উঠে এসে টারজন ড্যানিকে শুধাল, "তুমি নতজানু হয়েছ কেন ?"

"জুতোর ফিতেটা বাঁধছিলাম," ড্যানি কোন রকমে জবাব দিল।

টারজন শুয়োরটাকে নামিয়ে রেখে বলল, "এই নাও, প্রাতরাশ এনেছি। এবার শুরু করে দাও।"

ড্যানি বলল, "খুব ভাল করেছ ; আমি এটাকে কাঁচাই খেয়ে ফেলব।"

"খুব ভাল কথা।" টারজন বসে পড়ল। দু' টুকরো মাংস কেটে একটা টুকরো ড্যানিকে দিয়ে বলল, "খাও।"

খানিকটা মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে ড্যানির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, "কি হল ? তুমি খাচ্ছ না যে ? এই বললে খুব ক্ষিধে পেয়েছে।"

"বন্দুকবাজ" বলল, "রান্না করে তবে তো খাব।"

"সে কি ? এইমাত্র যে বললে কাঁচাই খাবে।"

"ওটা কথার কথা। হয় তো কাঁচাও খেতে পারি, তবে কখনও চেষ্টা করে দেখি নি।"

টারজন বলল, "তাহলে আগুন জ্বালিয়ে নিজেরটা সেঁকে নাও।"

আহারাদি শেষ করে দুজন পথে নামল লাফায়েত স্মিথের খোঁজে। টারজন অচিরেই তার পায়ের দাগ দেখতে পেয়ে সেই পথ ধরে এগোতে লাগল; কিন্তু ড্যানির চোখে এমন কিছু পড়ল না যাকে মানুষের পায়ের দাগ বলে মনে হতে পারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা ফাটলটার মুখে পৌঁছে গেল। টারজন দেখল,

একটা মানুষ ও একটা সিংহ দুইই সুড়ঙ্গের ভিতরে ঢুকেছে, কিন্তু ফিরে এসেছে শুধু সিংহটা।

টারজন বলল, "আমি ভিতরে ঢুকে স্মিথের খোঁজ করব। তুমি এখানে অপেক্ষা করতে পার, বা আমার সঙ্গেও যেতে পার। যতক্ষণ এই ফাটলের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ তুমি হারিয়ে যাবে না।"

ড্যানি বলল, "চল, আমি তোমার পিছনে আছি।"

টারজন ফাটলের ভিতরকার পথটা যত লম্বা ভেবেছিল আসলে তার চাইতে অনেক বেশী লম্বা। কিছুদূর এগিয়েই বুঝতে পারল নুমা সেখান থেকেই ফিরে গেছে কিন্তু মানুষটি এগিয়েই গেছে। কাজেই তারা মুখোমুখি হয় নি।

দ্রুত পায়ে হেঁটে চিন্নেরেথের তীরে পৌঁছে দেখল স্মিথের পায়ের দাগের সঙ্গে মিশে গেছে ইওরোপীয় বুট-পরা একটি মেয়ের পায়ের ছাপ এবং স্যাণ্ডেল-পরা একটি মেয়ের পায়ের ছাপ।

অদূরে একটা গ্রাম দেখতে পেয়ে কৌতূহলবশে টারজন স্মিথের পায়ের দাগ ছেড়ে সেই গ্রামের দিকে হাঁটতে লাগল। ড্যানি প্যাট্রিক তখনও ফাটলের পথের পাথরে ঠোকর খেতে খেতে কোন রকমে এগিয়ে চলেছে।

এই ভাবে ক্লান্ত দেহে সে যখন ফাটলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটি আশ্চর্য উপত্যকার সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল ততক্ষণে টারজন তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

"বন্দুকবাজ" বলে উঠল, "গীজ! কে জানত যে এমন একটা জায়গা এখানে আছে? আর টারজনই বা কোন্ পথে গেল?"

খানিক ভেবেচিন্তে ভুল পথ ধরে সে এগোতে লাগল।

১৭—ও আমার!

নোয়ার পুত্র এলিজার সাহসী সৈনিকরা লাফায়েত স্মিথ ও তার দুই সঙ্গিনীকে অতি দ্রুত ঘিরে ফেলে আটক করল। এলিজা পিস্তলটা তুলে নিয়ে ভাল করে দেখে কোমরে ঝোলানো চামড়ার বটুয়ার মধ্যে রেখে দিল।

জেজেবেলকে দেখিয়ে এশ্বাল বলল, "ও আমার।"

"কেন?" নোয়ার পুত্র এলিজা প্রশ্ন করল।

"আমি ওকে প্রথম দেখেছি," এশ্বাল জবাব দিল।

জেজেবেল লেডি বারবারাকে শুধাল, "ওদের কথা শুনতে পেয়েছ?"

ইংরেজ মেয়েটি ঘাড় নাড়ল। পরিস্থিতি দেখে সে সত্যি ভয় পেয়েছে।

জেজেবেল বলল, "ও আমাকে চাইছে। ও খুব সুন্দর নয় কি?"

লেডি বারবারা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। তারপর নিজের মনেই বলে উঠল, "বেচারি জেজেবেল।"

"কি বলছ বারবারা? ঐ সুন্দর মানুষটি আমাকে চাইছে তাতে কি তুমি খুশি নও?"

লেডি বারবারা বলল, "দেখ জেজেবেল, তুমি জান আমি তোমার বন্ধু; কেমন কি না?"

"আমার একমাত্র বন্ধু। একমাত্র প্রিয়জন।"

"তাহলে—এদের হাত থেকে যদি আমরা পালাতে না পারি তাহলে আমি যেমন নিজেকে খুন করব তেমনি তুমিও নিজেকে খুন করবে—আমার এই কথাটা মনে রেখো।"

"কেন? এরা কি দক্ষিণ মিডিয়ানদের চাইতে সুন্দর নয়?"

লেডি বারবারা জবাব দিল, "ওদের মারাত্মক রূপকে ভুলে যাও, কিন্তু আমি যা বললাম সেটা কখনও ভুলো না।"

উত্তর মিডিয়ানরা এলোমেলোভাবে হাঁটতে লাগল। তাদের কোনরকম শৃংখলা-বোধ নেই। আর অনবরত বকর-বকর আর তর্কাতর্কি করতে লাগল। ফলে বন্দীদের কথা প্রায় ভুলেই গেল। তারা কখনও তাদের সঙ্গে, কখনও বা আগে আগে হাঁটতে লাগল। একবার তো তিন বন্দী বেশ কিছুটা পিছিয়েই পড়ল।

এই সুযোগের জন্যই অপেক্ষা করছিল লেডি বারবারা। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, "এই সুযোগ! ওরা আমাদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।" সে ঘুরে দাঁড়াল। বন-পথের গাছ-গাছালি তাদের কিছুটা আড়াল করেও দাঁড়াল। অপস্রিয়মান সৈনিকদের দিকে তাকিয়ে লেডি বারবারা বলল, "এবার ছুটতে শুরু কর! যে যেদিকে পার। পাহাড়ের নীচে গিয়ে আবার আমরা মিলিত হব।"

ইংরেজ মেয়েটি ছুটল পুব-দক্ষিণ দিকে; জেজেবেল এগিয়ে চলল দক্ষিণ-পশ্চিমে; আর স্মিথ ইংরেজ মেয়েটির পথ ধরে এগিয়ে চলল চিন্নেরেথের দিকে।

লেডি বারবারা কলিস একটানা ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে উঠল। কয়েক মিনিট ধরেই পিছনে একটি পুরুষের ভারী পায়ের শব্দ সে শুনতে পাচ্ছে। একান্ত অসহায়ভাবে জ্যাকেটের পকেট থেকে ছোট ছুরিটা বের করে তার ফলাটা খুলে চকিতে ঘুরে দাঁড়াল।

কী আশ্চর্য! লাফায়েত স্মিথ ছুটে আসছে তার দিকে। হঠাৎ সে মাটিতে নেতিয়ে পড়ে একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসল। লাফায়েত স্মিথও

হাঁপাতে হাঁপাতে এসে তার পাশেই বসল। কারও মুখেই কথা নেই।

প্রথম কথা বলল লেডি বারবারা, "আমি বলেছিলাম আমরা আলাদা-আলাদা ছুটব।"

"তোমাকে একা ফেলে যেতে পারলাম না," স্মিথ বলল।

"আর জেজেবেল? তাকে তো একা ছেড়ে দিয়েছ।"

"আমি তো আর দুজনের সঙ্গে যেতে পারিনা। তাছাড়া তুমিও জান জেজেবেল এখানে পরমানন্দেই আছে।"

লেডি বারবারা মাথা নেড়ে বলল, "বন্দী হবার ফল দুজনের কাছেই এক। কিন্তু জেজেবেলের চাইতে আত্মরক্ষায় আমি অধিকতর সক্ষম। আর জেজেবেল তার বিপদের স্বরূপটা বুঝতেই পারে নি।"

স্মিথ বলল, "ও সব কথা থাক। আপাতত রাতের মত একটা নিরাপদ আশ্রয় তো চাই।"

লেডি বারবারা বলল, "হয় তো হ্রদের ধারে সে রকম একটা জায়গা পাওয়া যেতে পারে। শীঘ্রই আমরা সেখানে পৌঁছে যাব। আরে! ওটা কিসের শব্দ?"

লাফায়েত স্মিথ বলল, "ওরা আমাদের খোঁজ পেয়েছে। এগিয়ে যাও—যত তাড়াতাড়ি পার ছুটে যাও। আমি ওদের ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করব।"

লেডি বারবারা বলল, "না, তাতে কোন লাভ হবে না। আমি তোমার সঙ্গেই থাকব। তাতে যা হয় হবে।"

স্মিথ বলল, "দোহাই তোমার! তুমি যদি সুযোগটাই না পাও তাহলে আমি ওদের বাধা দিতে যাব কেন? তাই বলছি, তুমি পালাও, আমি ওদের সঙ্গে লড়ব। আমি যা বলছি তাই কর।"

স্মিথের কথায় চূড়ান্ত নির্দেশের সুর। তা মেনে নিয়ে লেডি বারবারা চিরেরেথের পথ ধরল। সঙ্গে সঙ্গেই থেমে ঘুরে দাঁড়াল। তিনজন একসঙ্গে স্মিথের দিকে এগিয়ে আসছে। একজন ছুঁড়ে মারল হাতের গদা। গদাটা কিছুটা আগেই স্মিথের পায়ের কাছে এসে পড়ল। সেটা তুলে নিয়ে স্মিথ পাল্টা ছুঁড়ে দিল নিক্ষেপকারীর মাথা লক্ষ্য করে। বলি-দেওয়া ষাঁড়ের মত লোকটা ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। গদাটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে স্মিথ লাফিয়ে পড়ল শত্রুদের উপর: গদার আঘাতে আরও এক শত্রুর মাথা ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

কিন্তু ইতিমধ্যে আরও নতুন সৈন্যদল এসে যোগ দিল। স্মিথ একা তাদের সঙ্গে কতক্ষণ লড়বে? সে ধরা পড়ল।

লেডি বারবারা কিছুতেই তাকে এই বিপদের মধ্যে রেখে একা পালাতে পারল না। সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

শত্রুপক্ষ যখন তাদের দুজনকেই ধরে নিয়ে চলল উত্তর মিডিয়ানদের গ্রামের দিকে তখন লেডি বারবারা স্মিথকে বলল, "তোমাকে ফেলে আমি পালাতে পারলাম না। ভাবলাম ওরা হয় তো তোমাকে মেরেই ফেলবে। অথচ আমি তোমাকে এতটুকু সাহায্য করতে পারছি না। উঃ, কী যে খারাপ লাগছিল। সে অবস্থায় তোমাকে ফেলে আমি কি পালাতে পারি?"

তার দিকে তাকিয়ে থেকে স্মিথ বলল, "না, তা তুমি পার না।"

১৮—একটি পুরুষ, একটি নারী

"বন্দুকবাজ" ড্যানি প্যাট্রিক ক্লান্ত, বিরক্ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে হেঁটেছে, কিন্তু বন্ধুর কোন হদিশ পায় নি। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। বারবার তাকাচ্ছে হ্রদের দিকে।

নিজের মনেই বলল, "ঠিক আছে। জল না খেয়ে আর এক পাও নড়ছিনা। মুখের যা অবস্থা—মনে হচ্ছে এক সপ্তাহ ধরে কেবল তুলোই খেয়েছি।"

সে হ্রদের দিকে চলতে লাগল। পথময় বড় বড় পাথর ছড়ানো। গোটা আফ্রিকাকে শাপান্ত করতে করতে চলল। একটা বড় পাথরের চাঁই ঘুরে হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখ দুটো বড়-বড় হয়ে উঠল। তার দিকেই এগিয়ে আসছে একটি স্বর্ণকেশী মেয়ে। সেও দাঁড়িয়ে পড়ল।

মৃদু হেসে বলল, "আরে, তুমি আবার কে?" তার মিডিয়ান ভাষা "বন্দুকবাজ" কিছুই বুঝতে পারল না।

ড্যানি বলল, "এতদিনে আমার আফ্রিকা আসার একটা মানে পাওয়া গেল। এবার বলতো খুকি, তুমি ভাল আছ তো?"

জেজেবেল ইংরেজিতে বলল, "ধন্যবাদ। আমাকে তোমার ভাল লেগেছে জেনে খুশি হলাম।"

ড্যানি বলল, "গীজ, তুমি দেখছি যুক্তরাষ্ট্রের ভাষায় কথা বলছ? তুমি কোন্ দেশের মেয়ে?"

"আমি মিডিয়ান থেকে আসছি।"

"সে দেশের নাম তো কখনও শুনি নি। তা তুমি এখানে কি করছ?"

"আমি অপেক্ষা করছি লেডি বারবারার জন্য; আর স্মিথের জন্য।"

"স্মিথ! কোন্ স্মিথ?" ড্যানির সাগ্রহ প্রশ্ন।

"ওঃ, সে খুব সুন্দর," জেজেবেল খোলাখুলি বলল।

"তাহলে আমি যাকে খুঁজছি এ সেই স্মিথ নয়। কিন্তু সে এখানে কি করছে ?"

"সে এসে না বাঁচালে আব্রাহাম-পুত্র আব্রাহাম লেডি বারবারা ও জেজেবেলকে মেরে ফেলত। সে খুব সাহসী।"

ড্যানি বলল, "তাহলে সে আমার স্মিথ নয়। সে একজন ভূতত্ত্ববিদ।"

"তুমি কে ?" জেজেবেল শুধাল।

"আমাকে ড্যানি বলে ডেকো খুকি।"

"আমার নাম খুকি নয়, জেজেবেল।"

"ও. কে.—জেজেবেলই হল।"

হাঁটতে হাঁটতে তারা ফাটলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেল। সামনে বিস্তীর্ণ অরণ্য।

খুশিতে দুই হাত এক করে জেজেবেল উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল, "ওঃ ড্যানি, দেখ কী সুন্দর !"

"কি ?" ড্যানি প্রশ্ন করল।

"ওঃ, সব কিছু। তোমার কি মনে হচ্ছে না ড্যানি যে এখানে সবই সুন্দর ?"

ড্যানি বলল, "এখানে তো একমাত্র সুন্দর তুমি জেজেবেল।"

বড় বড় নীল চোখ তুলে জেজেবেল বলল, "ড্যানি, তুমি কি সত্যি মনে কর আমি সুন্দরী ?"

"নিশ্চয় মনে করি।"

নিজেদের কথা নিয়ে তারা এতই মশগুল হয়ে পড়েছিল যে অন্য কোন দিকেই তাদের নজর ছিল না।

হঠাৎ জেজেবেল চেঁচিয়ে বলে উঠল, "ওই দেখ, কারা যেন আসছে ? অনেকগুলি কালো মানুষ। কেমন এক অদ্ভুত জানোয়ারের পিঠে চেপে তারা আসছে। ওঃ ড্যানি, আমার ভয় করছে।"

একনজর দেখেই "বন্দুকবাজ" তাদের চিনতে পারল। বলল, "ওরা ডাকাত জেজেবেল, পালাও।"

দুজন ছুটতে শুরু করল। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ডাকাতরা সহজেই তাদের ধরে ফেলল। ড্যানি দ্রুতগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা ডাকাতের পা ধরে টেনে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তার হাতের ছিটকে-পড়া রাইফেলটা তুলে নিয়ে তারই মাথায় সজোরে আঘাত করল। ডাকাতের মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

এইভাবে তিনটে ডাকাতকে ঘায়েল করার পরে ড্যানি নিজেই ঘায়েল হল। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গিয়েও একটা ডাকাত ড্যানির পা ধরে টেনে

তাকে মাটিতে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য ডাকাতরা সজোরে আঘাত করল তার মাথায়।

জেজেবেল সভয়ে দেখল, ড্যানির মাথা ফেটে রক্ত ঝরছে। সে ছুটে গেল তার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে তারা তাকে ধরে ফেলল। একটা ঘোড়ার পিঠে তাকে তুলে নিয়ে ডাকাতরা জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

"বন্দুকবাজ" ড্যানি প্যাট্রিকের নিশ্চল দেহটা তার নিজের রক্তের মধ্যেই পড়ে রইল।

১৯—এলিজার গ্রামে

ওদিকে লেডি বারবারা ও লাফায়েত স্মিথের কি হল? কড়া পাহারায় তাদের নিয়ে যাওয়া হল নোয়ার পুত্র এলিজার গ্রামে।

মেয়েটির মন খুব খারাপ। এবার আর পালাবার পথ নেই।

স্মিথ তবু আশ্বাস দিয়ে বলল, "একবার যখন পালিয়েছিলাম এবারও পালাতে পারব।"

"সেটা তোমার বৃথা আশা।"

উত্তর মিডিয়ানদের গ্রামটা অনেক বেশী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কয়েকটা পাথরের বাড়িও আছে। আর গ্রামবাসীরাও দক্ষিণ মিডিয়ানদের মত রোগগ্রস্ত নয়। তারা স্বাস্থ্যবান, বুদ্ধিমান, দেহ-গঠন সুঠাম, অনেকে বেশ রূপবান। সকলেরই নীল চোখ, সোনালী চুল।

গ্রামে পৌঁছেই লেডি বারবারা ও স্মিথকে আলাদা ঘরে রাখা হল। লেডি বারবারাকে রাখা হল একটিমাত্র মেয়ের হেপাজতে, আর স্মিথের পাহারায় রইল বেশ কয়েকজন পুরুষ।

রক্ষিনীটি বলল, "তুমি তো অন্য দক্ষিণ মিডিয়ানদের মত দেখতে নও; তোমার সঙ্গীটি তো একেবারেই নয়।"

লেডি বারবারা বলল, "আমরা এসেছি পাহাড়ের ও পারের দেশ থেকে; আবার সেখানেই ফিরে যেতে চাই।"

"আমার মনে হয় এলিজা তোমাদের যেতে দেবেনা। দক্ষিণ মিডিয়ানদের বেলায় আমরা যা করে থাকি তোমাদের নিয়েও তাই করা হবে।"

"সেটা কি?"

"ধর্ম-বিরোধিতার জন্য পুরুষদের মেরে ফেলা হয় আর মেয়েদের করা হয় ক্রীতদাসী।"

"কিন্তু আমি তো মিডিয়ান নই," বারবারা বলল।

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, "সত্যি সত্যি তুমি তাদের মত দেখতে নও, কিন্তু এলিজা যদি সেটা বুঝতে পারে তাহলে তুমি মরেছ।"

"কেন?"

"অন্য অনেকের মতই এলিজাও বিশ্বাস করে যে পাহাড়ের ওপারে যারা বাস করে তারা দানব; কাজেই তুমি যদি দক্ষিণ মিডিয়ান না হও তাহলেই তুমি দানব। আর সেই কারণেই এলিজা তোমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে।"

"আমার সঙ্গীটির অপরাধ?"

"এলিজা তাকে দক্ষিণ মিডিয়ান বলে ধরে নেবে, আর সেই কারণেই তাকে মেরে ফেলবে।"

"তোমরা দক্ষিণ মিডিয়ানদের এত ঘৃণা কর কেন?"

"কারণ তারা ধর্মদ্বেষী।"

লেডি বারবারা বলল, "কিন্তু তারা তো খুব ধার্মিক। সব সময় জিহোবার কাছে প্রার্থনা করে। কখনও হাসে না। তাহলে কেন তোমরা তাদের ধর্মদ্বেষী মনে কর?"

"তারা বলে পলের চুল ছিল কালো, কিন্তু আমরা জানি তার চুল ছিল হলুদ। মানুষ যতদূর অতীতকে স্মরণ করতে পারে তারও আগে একসময় আমরা এক জাতিই ছিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে কিছু বদলোক ছিল, যাদের চুল কালো হওয়ায় তারা হলুদ চুলের লোকদের মেরে ফেলতে চাইল। ফলে তারা পালিয়ে এসে উত্তরে বাসা বাঁধল। সেই থেকে উত্তর মিডিয়ান ও দক্ষিণ মিডিয়ানদের মধ্যে কাটাকাটি চলছেই। তুমি কি মনে কর পলের হলুদ চুল ছিল?"

"নিশ্চয় করি," লেডি বারবারা বলল।

"এই কথাটা তোমার স্বপক্ষে যাবে।"

ঠিক সেই সময় একটি লোক এসে লেডি বারবারাকে ডেকে নিয়ে গেল।

একটা বড় পাথরের বাড়ির সামনে গ্রামপ্রধানদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বসে আছে এলিজা। অর্ধবৃত্তাকারে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে অনেক গ্রামবাসী।

পয়গম্বর এলিজা বেঁটে-খাটো মাঝবয়সী মানুষ। শরীর পেশীবহুল, মুখে মোটা সোনালী গোঁফ।

এলিজা লেডি বারবারাকে শুধাল, "এ লোকটি কথা বলছে না কেন? সে বকবক করছে, কিন্তু সে সব অর্থহীন।"

লেডি বারবারা বলল, "সে তো মিডিয়ানদের ভাষা জানে না।"

"তাহলে সে নিশ্চয় দানব," এলিজা বলল।

কি মনে করে লেডি বারবারা বলল, "হয় তো সে একজন দেবদূত; সে বিশ্বাস করে যে পলের চুল ছিল হলুদ।"

একথায় সকলেই বিব্রত হয়ে পড়ল। কথা বলতে বলতে এলিজা দলবল নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকল গোপনে পরামর্শ করতে।

কিছুই না বুঝতে পেরে স্মিথ বলল, "এসব কি লেডি বারবারা?"

"তুমি বিশ্বাস কর যে পলের চুল ছিল হলুদ।"

"তুমি কি বলছ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"আমি ওদের বলেছি, তুমি একান্তভাবে বিশ্বাস কর যে পলের চুল ছিল সাদা।"

"পল আবার কে?" স্মিথ শুধাল।

"তুমি দেখছি বাইবেলও ভুলে গেছ।"

"ওঃ, শিষ্য পল; কিন্তু তার চুলের রং কি ছিল তাতে কি যায়-আসে?"

"অনেক কিছু যায়-আসে; এমন কি হয় তো এর দ্বারাই তুমি এ যাত্রায় বেঁচে যাবে।"

লেডি বারবারা সব কথা খুলে বলল।

এলিজা যখন সদলবলে ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। দীর্ঘ ভূমিকার শেষে এলিজা বলল, "অনেক আলোচনার পরে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে এই লোকটি দেবদূত হতে পারে না, কারণ তার পাখা নেই।" কাজেই সে হয় দক্ষিণ মিডিয়ান, না হয় দানব। উভয়তই তার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

লেডি বারবারা ম্লান মুখে স্মিথের দিকে তাকাল।

স্মিথ বলল, "কি ব্যাপার? ওরা কি তোমার কোন ক্ষতি করবে?"

"ক্ষতি করবে তোমার বন্ধু। তুমি পালাও।"

"কেমন করে পালাব?"

"জানি না, আমি জানি না," লেডি বারবারা আর্ত কণ্ঠে বলল। "শুধু এইটুকু জানি, এই মুহূর্তেই তোমাকে পালাতে হবে।

স্মিথ মাথা নাড়ল। "না। হয় এক সঙ্গেই পালাব, নইলে পালাব না।"

"দোহাই তোমার, এরপরে অনেক দেরী হয়ে যাবে," লেডি বারবারার গলায় মিনতি ঝরে পড়ল।

শোনা গেল এলিজার গম্ভীর কণ্ঠস্বর: "পাছে আমরা ভুল করে বসি তাই এই লোকটিকে জিহোবার করুণার উপরেই ছেড়ে দেওয়া হবে। জিহোবার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। একটা কবর বানাও। সে যদি সত্যি দেবদূত হয় তাহলে অক্ষত দেহে উঠে আসবে।"

লেডি বারবারা আর্তকণ্ঠে বলল, "তুমি চলে যাও; দোহাই তোমার, চলে যাও।"

"ওরা কি বলল," স্মিথ জানতে চাইল।

"ওরা তোমাকে জীবন্ত কবর দেবে।"

"আর তোমাকে?"

"আমাকে ক্রীতদাসী করে রাখবে।"

শুরু হয়ে গেল কবর খোঁড়ার কাজ। গলার বেড়ির সঙ্গে ঝোলানো স্মিথের পিস্তলটা নিয়ে এলিজা অন্যমনস্কভাবে খেলা করতে লাগল।

লেডি বারবারার একান্ত অনুরোধে মার্কিনীটিও পালাবার উপায় খুঁজছে।

গ্রামের বাইরে বনের অন্ধকারে বসে একজোড়া চোখ সব কিছুই লক্ষ্য করছে। ধীরে ধীরে চোখ দুটি এগিয়ে এসে গ্রাম-প্রান্তের একটা কুটিরের ছায়ায় দাঁড়াল।

হঠাৎ লেডি বারবারার হাত চেপে ধরে স্মিথ ছুটতে লাগল গ্রামের উত্তর সীমানার দিকে। এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও সকলে এক সঙ্গে পলায়মান জুটির পশ্চাদ্ধাবন করল। কুটিরের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সেই দুটি চোখ পলায়মান মূর্তি দুটির দিকে তীক্ষ্ন নজর রাখল। মেয়েটির হাত শক্ত করে চেপে ধরে স্মিথ প্রাণপণে ছুটছে। একবার জঙ্গলে ঢুকতে পারলেই তারা নিরাপদ। তখনও চাঁদ ওঠে নি, তাই অন্ধকারে সকলের চোখ এড়িয়ে তাদের পালাতে সুবিধাই হয়েছে।

সাফল্যের একেবারে দোরগোড়ায় পৌঁছেই ঘটল বিপত্তি। অন্ধকারে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে লেডি বারবারাকে নিযে স্মিথ মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। উঠে দাঁড়াবার আগেই মিডিয়ানরা এসে তাদের ঘিরে ফেলল।

স্মিথ ঘুষির পর ঘুষি চালিয়ে দু'একজনকে কাবু করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে ধরা পড়ল। টানতে টানতে দুজনকে নিয়ে হাজির করল সেই কবরের পাশে।

দুটি দশাসই লোক তাকে দু'দিক থেকে চেপে ধরল। এলিজা প্রার্থনা শুরু করল। বাকি সকলে নতজানু হয়ে মাঝে মাঝেই "হাল্লেলুজা" ও "আমেন" বলে চীৎকার করতে লাগল।

প্রার্থনা শেষ করে এলিজা থামল। কি যেন ভাবল। গলার বেড়ির সঙ্গে ঝোলানো পিস্তলটাই তার ভাবনার বিষয়। সেটা দিয়ে কি করে তা সে জানে না; আর যে লোকটা তা জানে তাকেই সে শেষ করে দিতে চলেছে। গলা থেকে বেড়িটা খুলে পিস্তলটা হাতে নিল।

"এটা কি?" লেডি বারবারাকে জিজ্ঞাসা করল।

সে বলল, "একটা অস্ত্র। খুব সাবধানে ধর, নইলে কেউ খুন হয়ে যেতে

পারে।”

“কেমন করে খুন করবে ?”

স্মিথ শুধাল, “ও কি বলছে ?”

লেডি বারবারা বলল, “ও জানতে চাইছে পিস্তল দিয়ে কেমন করে খুন করে।”

হঠাৎ স্মিথের মাথায় একটা বুদ্ধি ঝিলিক দিল। বলল, “ওকে বল পিস্তলটা আমাকে দিতে ; আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কেমন করে খুন করে।”

সে কথা এলিজাকে বুঝিয়ে বলতেই সে চোখ পাকিয়ে বলল, “হুম্‌, আমি এটা দিয়ে দেই আর সে আমাকে খুন করুক।”

সে কথা শুনে স্মিথ বলল, “তাহলে তাকে বলে দাও কেমন করে পিস্তল ধরতে হয়।” লেডি বারবারার নির্দেশমত এলিজা ডান হাতের মুঠোয় পিস্তলটা ধরল। “এবার তর্জনীটাকে পিস্তলের উপর রাখতে বল, কিন্তু সতর্ক করে দাও যেন ঘোড়াটা না টেপে।”

এলিজার তথাকরণ। স্মিথ বলতে লাগল, “এবার বন্দুকের মুখে এক চোখ রেখে নল দিয়ে তাকাতে বল।”

সেইভাবে চোখ রেখে এলিজা বলল, “কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। ছোট গর্তটার মধ্যে তো সবই অন্ধকার।”

তা শুনে স্মিথ বলল, “তাকে বল যে এবার ঘোড়া টিপলেই নলের মধ্যে আলো জ্বলে উঠবে।

“কিন্তু তাহলে তো সে খুন হবে,” মেয়েটি আঁৎকে উঠে বলল।

স্মিথ গম্ভীর গলায় বলল, “এটা যুদ্ধ ; এর ফলে যে গোলমাল শুরু হবে সেই সুযোগে আমরা পালাতে পারব।”

লেডি বারবারা মনটাকে শক্ত করল। তার কথামত এলিজা নলের মুখে চোখ রেখে ঘোড়া টিপল। পিস্তলের শব্দে অপেক্ষমান গ্রামবাসীরা সচকিত হয়ে ওঠার আগেই নোয়ার পুত্র এলিজা মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে লেডি বারবারা ছুটে গেল স্মিথের দিকে। সে তখন প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে দুটি শক্ত মুঠি থেকে ছাড়াতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। ওদিকে গ্রামবাসীরা হৈ-হৈ করে তাদের নেতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে এগিয়ে আসার মুখেই এক লাফে তাদের সামনে এসে দাঁড়াল একটি বিচিত্র প্রাণী। অতি দ্রুত মৃত মানুষটির হস্তচ্যুত পিস্তলটা তুলে নিয়ে স্মিথের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

এ রকম মানুষ তারা কেউ কখনও আগে দেখে নি—দৈত্যের মত প্রকাণ্ড দেহ ; এলোমেলো কালো-চুল, দুটি চোখের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ ও মর্মভেদী যে সে দিকে তাকালে শরীরের ভিতরে কাঁপন ধরে। প্রায় নগ্নদেহ, পরনে কেবল

একখণ্ড চামড়ার কটি-বস্ত্র। বাদামী চামড়ার নীচে মাংসপেশীগুলি ঢেউয়ের মত ওঠা-নামা করছে।

স্মিথ নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েই লাফিয়ে পড়ল একটি মিডিয়ানের উপর ; সে তখন লেডি বারবারার হাত ধরে তাকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। স্মিথের এক ঘুষিতে সে মাটিতে ছিটকে পড়ল। একজন রক্ষী তাকে লক্ষ্য করে গদা ছুঁড়বার উদ্যোগ করতেই টারজনের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল।

দ্বিতীয় গুলির শব্দ শুনে এবং তাদের একজন সঙ্গীকে মাটিতে ঢলে পড়তে দেখে গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে রইল তিনটিমাত্র প্রাণী।

টারজন স্মিথকে বলল, "শিগ্‌গির! ওরা নতুন করে আক্রমণ করার আগেই মেয়েটিকে নিয়ে পালাও। আমিও আসছি। ওই দিকে," সে দক্ষিণ দিকটা দেখিয়ে দিল।

লাফায়েত স্মিথ ও লেডি বারবারা অতি দ্রুত সেখান থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। গ্রামবাসীদের দিকে পিস্তলটা তাক করে টারজন ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে লাগল। তার হাতের যাদু-অস্ত্রের ভয়ে গ্রামবাসীরা এগোতে সাহস করল না। তাদের হাতের গদার আওতার বাইরে গিয়েই সহসা মুখ ঘুরিয়ে টারজন রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

২০—পাঁচের মধ্যে সেরা তিন

ক্রীতদাস-শিকারীরা যেখান থেকে জেজেবেলকে হরণ করেছে তাদের গ্রামটা সেখান থেকে দূরে নয়। নতুন সুন্দরী বন্দিনীকে নিয়ে তারা গ্রামে ঢুকতেই সকলে হৈ-চৈ করে তাদের অভ্যর্থনা জানাতে লাগল। তা শুনে কাপিয়েত্র ও স্তাবুচও তাদের কুটিরের দরজায় এসে দাঁড়াল।

"কালো শয়তানরা কি এনেছে?' কাপিয়েত্র শুধাল।

"মনে হচ্ছে একটি সুন্দরী," স্তাবুচ জবাব দিল।

ডাকাতরা আরও কাছে এলে কাপিয়েত্র বলল, "আরে, তাই তো। একে কোথায় পেলে?"

"খুব কাছেই। সঙ্গে একটা পুরুষও ছিল। নর-বানরের সঙ্গে যে পালিয়েছিল সেই।"

"সে কোথায়? তাকেও ধরে আনলে না কেন?"

"সে আমাদের সঙ্গে লড়ল ; তাই তাকে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছি।"

কাপিয়েত্র বলল, “বেশ করেছ। এই সুন্দরী একাই ওরকম দুটোর সমান। এস তো চাঁদ, মুখটা তোল, তোমার চাঁদ-বদনখানি একবার দেখি।”

স্তাবুচ বলল, “ও বোধ হয় তোমার ইতালি ভাষা বোঝে না।”

স্তাবুচের ভাষা বুঝতে পেরে জেজেবেল মুখ তুলল।

“কী সুন্দরী!” স্তাবুচ উচ্ছ্বসিত।

কাপিয়েত্র বলল, “তুমি দেখছি এক নজরেই প্রেমে পড়েছ। ওকে কিনতে চাও নাকি?”

“কত দাম চাও?”

“আরে, বন্ধুর সঙ্গে আবার দর-দাম কি? এসগো।”

কাপিয়েত্র জেজেবেলের হাত ধরে কুটিরের ভিতর নিয়ে গেল। স্তাবুচও পিছন-পিছন গেল।

জেজেবেল বলল, “আমাকে এখানে এনেছ কেন? আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করি নি। আমাকে ড্যানির কাছে ফিরে যেতে দাও। সে গুরুতর আহত।”

“আহত নয়, মৃত,” কাপিয়েত্র বলল। “তার জন্য দুঃখ করো না। এক বন্ধু গেছে, দুই বন্ধু পেয়েছ। অচিরেই তাকে ভুলে যাবে। মেয়েরা সহজেই ভুলে যায়।”

“আমি তাকে কোনদিন ভুলব না। আমি তার কাছেই ফিরে যেতে চাই। হয়তো সে মারা যায় নি।” জেজেবেল কান্নায় ভেঙে পড়ল।

ক্ষুধার্ত চোখে স্তাবুচ মেয়েটিকে দেখছিল। তার রূপ-যৌবন তাকে পাগল করেছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, ওকে পেতেই হবে। বলল, “কেঁদো না। আমি তোমার বন্ধু। সব ঠিক হয়ে যাবে।”

সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চোখ তুলে জেজেবেল বলল, “তুমি যদি আমার বন্ধু, তাহলে আমাকে ড্যানির কাছে নিয়ে চল।”

“একটু পরেই সব হবে।” বলে স্তাবুচ কাপিয়েত্রকে শুধাল, “কত চাও?”

কাপিয়েত্র বলল, “প্রিয় বন্ধুটির কাছে ওকে বিক্রী করব না। এস, একটু পান করা যাক, তারপর সব বুঝিয়ে বলব।”

বোতল থেকে দুজনই বেশ খানিকটা করে মদ গিলল। কাপিয়েত্র তার থলি থেকে একজোড়া ময়লা তাস বের করে বলল, “এস, পাঁচ হাত খেলা হোক, যে প্রথম তিনটে জিতবে সেই মেয়েটাকে পাবে।”

“বেশ, তাই হোক!”

খেলা শুরু হল। প্রথম দানটা স্তাবুচ জিতল। দ্বিতীয়টা জিতল কাপিয়েত্র। ক্রমে দুজনই দুটো করে দান জিতল। এবার শেষ খেলা। বোতলের তরল পদার্থ গলায় ঢেলে কাপিয়েত্র সেটা এগিয়ে দিল স্তাবুচের দিকে। স্তাবুচ তার

হাতটা ঠেলে দিয়ে বলল, "আমি খাব না।"

কাপিয়েত্র হেসে বলল, "এঃ, বন্ধু দেখছি হারের ভয়ে মদ ছোঁবে না। আমি মদও খাব, খেলাও জিতব।"

"বাজে কথা রাখ। খেলা শুরু কর।" স্তাবুচ খাঁজিয়ে উঠল।

শেষ খেলায় জিতল কাপিয়েত্র। উঠে দাঁড়িয়ে জেজেবেলের হাত ধরে টেনে তুলে বলল, "এস তো চাঁদ। একটা চুমো দাও।"

জেজেবেল পিছিয়ে গেল। কাপিয়েত্র এক ঝট্‌কায় তাকে কাছে টেনে এনে তার ঠোঁটের উপর মুখ নামাল।

গর্জে উঠল স্তাবুচ. "ওকে ছেড়ে দাও। দেখছ না ও তোমাকে দেখে ভয় পাচ্ছে?"

কাপিয়েত্র বলল, "ওকে জিতেছি কি ছেড়ে দেবার জন্য। মাইরি আর কি।"

স্তাবুচ এক পা এগিয়ে জেজেবেলের একটা হাত ধরে বলল, "ও আমার।"

"তার মানে?"

"শেষ খেলায় তুমি জোচ্চুরি করেছ।"

"মিথ্যে কথা!" চীৎকার করে উঠে কাপিয়েত্র এক ঘুষি কসাল স্তাবুচের চোয়ালে। স্তাবুচও পাল্টা ঘুষি চালাল। ঘুষোঘুষি থেকে জড়াজড়ি। দুজন দুজনের গলা টিপে ধরল

ডান হাত দিয়ে বার কয়েক কাপিয়েত্রর বজ্র-মুঠি আল্‌গা করার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে স্তাবুচ তার কোটের নীচ থেকে একটা সরু ছুরি বের করল। কাপিয়েত্র তা দেখতে পেল না।

জেজেবেল আতংকিত চোখে তাকিয়ে আছে। স্তাবুচের ডান হাতের ছুরিটা সজোরে বসে গেল কাপিয়েত্রর পিঠে। কাপিয়েত্র আর্তনাদ করে উঠল। তারপরই কাঠ হয়ে পড়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল।

স্তাবুচের ঠোঁটে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। বাইরের গলা-কাটা ডাকাতদের কথা সে ভুলেই গিয়েছিল। তারা তো একেই সর্দার বলে মানে। কথাটা মনে হতেই সে ভীষণ ভয় পেল। তারা যখন ব্যাপারটা জানতে পারবে তখন তার কপালে কি ঘটবে তা ভাবতেই তার শরীর শিউরে উঠল।

হঠাৎ মেয়েটি বলল, "তুমি ওকে খুন করলে?"

"চুপ!" স্তাবুচ ধমকে উঠল। "তুমি কি মরতে চাও? ওরা জানতে পারলে আমাদের দুজনকেই শেষ করে ফেলবে।"

"আমি তো কিছু করি নি," জেজেবেল ভয়ে ভয়ে বলল।

"তবু ওরা তোমাকেও খুন করবে। ওরা তো জানোয়ার।"

হঠাৎ সে উবু হয়ে মৃতদেহের টেংরি ধরে টানতে টানতে ঘরের এক কোণে নিয়ে গেল। ছেঁড়া কম্বল ও পোশাক দিয়ে তাকে চাপা দিল।

জেজেবেলকে বলল, "চুপ করে বসে থাক। চেঁচামেচি করলে ওদের আগে আমিই তোমাকে খুন করে ফেলব।"

কুটিরের এক কোণ হাতড়ে বেল্ট ও খাপসমেত একটা রিভলবার কোমরে জড়িয়ে নিল; আর রাইফেলটাকে ঠেসান দিয়ে রাখল দেয়ালে।

বলল, "আমি ফিরে এলেই আমার সঙ্গে যাবার জন্য তৈরী থেকো।"

স্তাবুচ বেরিয়ে গেল।

কিছুটা দূরেই ঘোড়াগুলি বাঁধা ছিল। কিছু লোকও সেখানে বসে বিশ্রাম করছিল। স্তাবুচ তাদের জানাল, সর্দার দুটো ঘোড়া নিয়ে যেতে বলেছে।

"সঙ্গে কাউকে যেতে বলেছে?" একজন জানতে চাইল।

"না।"

"তাহলে দুটো ঘোড়া কেন?"

"মেয়েটি আমার সঙ্গে যাবে তার সঙ্গীকে খুঁজতে। তার ধারণা, সঙ্গীটি মরে নি।"

দুটো ঘোড়া নিয়ে স্তাবুচ কুটিরে ফিরে এসে বলল, "শিগ্‌গির চলে এস।"

ঘোড়া দেখে জেজেবেল ভয় পেয়ে গেল। বলল, "ওর পিঠে আমি চড়তে পারব না।"

স্তাবুচ ফিস ফিস করে বলল, "পারতেই হবে—নইলে মরবে।"

তাকে ধরে একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে স্তাবুচ নিজে উঠল আর একটা ঘোড়ায়। তারপর প্রায় পঞ্চাশজন ডাকাতের চোখের সামনে দিয়ে তারা গ্রামের ফটকটা পার হয়ে গেল।

তারা যখন ঘোড়ার মুখ পাহাড়ের উপরের দিকে ঘুরিয়ে দিল ততক্ষণে অস্তগামী সূর্যের শেষ আলো মিলিয়ে গেল। রাতের আঁধার নেমে এসে তাদের ঢেকে দিল।

২১—জাগরণ

"বন্দুকবাজ" ড্যানি প্যাট্রিক চোখ মেলে আফ্রিকার সুনীল আকাশের দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে জ্ঞান ফিরে এল। মাথায় তীব্র যন্ত্রণা। হাতটা তুলে মাথায় রাখল। একি! হাতটা রক্তে লাল হয়ে গেছে।

আপন মনেই বলে উঠল, "গীজ! ওরা আমাকে খুব ঠেঙিয়েছে!" অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই মনে করতে পারল না।

একটু একটু করে কিছু কিছু কথা মনে পড়তে লাগল। উঠে দাঁড়াল। না:! গুরুতর আঘাত লাগে নি। হাত ও পা ভালই আছে। আর মাথা? ওটা তো কোন দিনই ভাল ছিল না।

হঠাৎ তার মনে পড়ল—শিবিরে ফিরতে হবে। সে না ফিরলে স্মিথ খুব চিন্তা করবে। ওবাম্বিই বা কোথায়? চারদিকে তাকাল। জীবিত অথবা মৃত—তাকে কোথাও দেখতে পেলনা। অগত্যা সে একাই শিবিরের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

চলতে চলতে পাহাড়ের শেষ প্রান্তে পৌছে গেল। সেখান থেকে নীচের গ্রামটা দেখা যায়। সেখানে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েই সে ডাকাতদের গ্রামের উপর চোখ রাখল।

ডাকাতদের চলাফেরা করতে দেখে বলে উঠল, "ব্যাটা উকুনের দল! আমার 'টাইপরাইটারটা' হাতে থাকলে দিতাম সব ব্যাটাকে উড়িয়ে।"

দেখল, স্তাবুচ কুটির থেকে বেরিয়ে ঘোড়াগুলির কাছে গেল। ফিরে এল দুটো ঘোড়া নিয়ে। কুটিরের ভিতর ঢুকে বেরিয়ে এল জেজেবেলকে সঙ্গে নিয়ে।

হঠাৎ 'বন্দুকবাজ' ড্যানি প্যাট্রিকের মাথার মধ্যে একটা অদ্ভুত খেলা শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ কেউ যেন জানালার পর্দাটা তুলে দিল, আর আলোর বন্যা বয়ে গেল। সব কথা মনে পড়ে গেল। জেজেবেলকে দেখামাত্রই তার স্মৃতি ফিরে এল।

চীৎকার করে জেজেবেলকে ডাকতেই যাচ্ছিল; অনেক কষ্টে নিজেকে সংযত করল। শুয়ে শুয়েই দেখল, ঘোড়ায় চড়ে দুজন গ্রামের ফটক পার হয়ে গেল।

উঠে দাঁড়িয়ে সেও পাহাড়েব ধার ধরে ছুটতে লাগল দুই অশ্বারোহীর সমান্তরালে থেকে। গোধূলি নেমে এসেছে। একটু পরেই অন্ধকার হবে। সব ক্লান্তি ভুলে সে ছুটতে লাগল। তবু এক সময় ঘন অন্ধকারে তারা দৃষ্টির আড়ালে হারিয়ে গেল।

"ওদের ধরতে হবে—ধরতে হবেই।" হোচট খেতে খেতে সে ছুটে চলল। বার বার বলতে লাগল, "বেচারি খুকি! বেচারি খুকি! ঈশ্বর! আমার সাহায্য হও। ওকে যেন—"

ড্যানি আবার হোচট খেল। তবু ছোটার শেষ নেই। মাত্র কয়েকটি ঘণ্টার জন্য জেজেবেল এসেছিল তার জীবনে, কিন্তু তার অন্তর-পটে যে লিখন লিখে গেছে তা কোন দিন মুছবে না!

২২—নির্জন হ্রদের তীরে

রাত নেমেছে। লেডি বারবারা কলিস ও লাফায়েত স্মিথকে নিয়ে অরণ্যরাজ টারজন চলেছে মিডিয়ান দেশের উপত্যকা পেরিয়ে। কিন্তু জেজেবেল ও "বন্দুকবাজে"র কোন চিহ্নই খুঁজে পাচ্ছে না।

সঙ্গী দুটি ক্লান্তির শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। কিন্তু কেউই টারজনকে সে কথা বলে নি, কারণ তারা জানে, তাতে জেজেবেল ও ড্যানির অনুসন্ধানে বাধা পড়বে।

হোঁচট খেতে খেতে লেডি বারবারা একবার মাটিতে পড়ে গিয়ে অস্ফুট চীৎকার করে উঠল। তা শুনে পিছন ফিরে তাকে ঐ অবস্থায় দেখে টারজন ঘুরে এসে তাকে কোলে তুলে নিল।

বলল, "আর বেশী দূর নয়।"

ঘন বনের ভিতর দিয়ে একটা পুরনো পায়ে-চলা পথ ধরে তারা এগিয়ে চলল। এক সময় দূরে আলোর শিখা দেখতে পেয়ে লেডি বারবারা বলে উঠল, "ওই তো শিবির। তাই না?"

"হ্যাঁ," বলে টারজন দেশী ভাষায় কাকে যেন ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে এল পাল্টা ডাক। শিবিরের প্রান্তে গিয়ে টারজন দাঁড়িয়ে পড়ল।

কয়েকজন অস্কারি ছিল পাহারায়। তাদের সঙ্গে কিছু কথা বলে টারজন লেডি বারবারাকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল, "ওদের বলে দিলাম, তাদের বাওয়ানাকে যেন বিরক্ত না করে। এখানে একটা বাড়তি তাঁবু আছে; লেডি বারবারা সেটাতে থাকতে পারবে। সর্দার নিজেই স্মিথের থাকার ব্যবস্থা করে দেবে। এখানে তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ। ওরা বলছে, ওদের বাওয়ানা লর্ড পাস্‌মোর। সেই তোমাদের রেল-স্টেশনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করবে। আপাতত আমি চললাম—তোমাদের বন্ধুদের খোঁজে।

কথা শেষ হল। তারা মৌখিক ধন্যবাদ জানাবার আগেই টারজন রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

মেয়েটি বলল, "ও কোথায় চলে গেল? একটা ধন্যবাদও দেওয়া হল না।

স্মিথ বলল, "আমি তো ভেবেছিলাম রাতটা এখানেই কাটাবে। সেও তো ক্লান্ত।"

"এ মানুষের ক্লান্তি নেই," লেডি বারবারা বলল; "অতি-মানব বলে যদি কেউ থাকে তো সে এই।"

সর্দার বলল, "এস। এটাই তোমার তাঁবু। বাওয়ানার জন্য ছেলেরা

একটা ব্যবস্থা করে দেবে।"

মেয়েটি বলল, "শুভ রাত্রি মিঃ স্মিথ। আশা করি, ভাল মত ঘুমতে পারবে।"

স্মিথ বলল, "শুভরাত্রি লেডি বারবারা। আশা করি একসময় আমাদের ঘুম ভাঙবে।"

ওদিকে স্তাবুচ ও জেজেবেল সারা রাত ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে। স্তাবুচ পথ হারিয়ে নাস্তানাবুদ।

ভোরের দিকে একটা বনের প্রান্তে তারা থামল। স্তাবুচের আর চলবার শক্তি নেই। ঘোড়া থেকে নেমে বলল, "একটু না ঘুমিয়ে আর পারছি না।"

জেজেবেলও ঘোড়া থেকে নামল। ঘোড়া দুটোকে গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে মাটিতে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ল স্তাবুচ। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে জেজেবেল বলল, "এই সুযোগে পালাতে হবে।" কিন্তু তখনও ভোরের আলো ভাল করে না ফোটায় অন্ধকারে পা বাড়াতে সাহস পেল না। অপেক্ষা করতে লাগল।

সময় কাটছে। দূরে পাহাড়ের মাথায় পূবের আকাশে আলো ফুটছে। স্তাবুচ ঘুম থেকে উঠে বসল, "বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে। তুমি ঐ গাছটাতে উঠে বস। আমি বনের মধ্যে ঢুকে দেখি একটা শিকার পাই কি না। তারপর খেয়ে দেয়ে গায়ে জোর এনে আবার যাত্রা শুরু করা যাবে।"

জেজেবেল গাছে চড়ে বসল; স্তাবুচ শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে গেল।

একটা ছোট হ্রদ দেখতে পেয়ে স্তাবুচ একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। কোন জন্তু জল খেতে এলেই তাকে গুলি করবে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। হঠাৎই একটি প্রাণী এসে আবির্ভূত হল হ্রদের অপর তীরে।

স্তাবুচের শয়তানী চোখ দুটি সংকুচিত হল। এই তো সেই লোক যাকে খুন করতে সে মস্কো থেকে এত দূরে এসেছে। সুবর্ণ সুযোগ! ভাগ্য সুপ্রসন্ন। সহজেই কার্যোদ্ধার করে মেয়েটাকে নিয়ে পালাতে পারবে। এমন সুন্দরী নারী সে জীবনে দেখে নি; এবার সে হবে একান্তভাবে তার।

হাতের রাইফেল তুলে খুব সাবধানে তাক করল। ঝোপের আড়াল পড়ায় টারজন বন্দুকের নলটা দেখতে পেল না।

স্তাবুচ বুঝতে পারল, উত্তেজনায় তার হাত কাঁপছে। শিকারও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখনি গুলি করতে হবে। লোকটা তো চিরকাল এক-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না। সে ঘোড়ায় আঙুল রাখল।

রাইফেল গর্জে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শিকার একলাফে একটা নীচু ডাল ধরে মুহূর্তের মধ্যে পাতার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। স্তাবুচ লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।

এবার সে ভয় পেল। মনে হল, একটা ফাঁস যেন তার গলায় চেপে বসেছে। ছুটে পালিয়ে গেল। মন থেকে মুছে গেল সুন্দরী জেজেবেল। এখন চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!

বনের ভিতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে হাঁপ ধরে গেল। হঠাৎ বাহুতে একটা যন্ত্রণা বোধ করায় তাকিয়ে দেখল, একটা তীরের পালক-লাগানো দিকটা বাহুর সঙ্গে ঝুলছে।

তীরটা বাহুতে বিঁধে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে গেছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সে আরও জোরে ছুটতে লাগল। মাথার উপরেই রয়েছে তার যম! কিন্তু সে তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কোন শব্দও শুনতে পাচ্ছে না। যেন একটা ভৌতিক হত্যাকারী নিঃশব্দ পাখায় তাকে অনুসরণ করছে।

আর একটা তীর এসে বিঁধল তার অপর বাহুর মাংস-পেশীতে। আতংকে ও যন্ত্রণায় স্তাবুচ নতজানু হয়ে বসে পড়ল। দুই হাত তুলে বলল, "বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও। আমি তোমার কোন ক্ষতি করি নি।"

আর একটা তীর সোজা এসে তার গলায় বিঁধে গেল। আর্তনাদ করে সেটাকে চেপে ধরে স্তাবুচ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

অরণ্যরাজ টারজন নীরবে গাছ থেকে নেমে মুমূর্ষু লোকটির দিকে এগিয়ে গেল। যন্ত্রণায় কাৎড়াতে কাৎড়াতে স্তাবুচ পাশ ফিরেই ধনুর্ধর টারজনকে দেখতে পেল। যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে এতদূর এসেছে সেটা সম্পূর্ণ করার জন্য সে কোমরের রিভলবারটার দিকে হাত বাড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে অরণ্যরাজের হাত থেকে ছুটে এল আর একটা তীর। বিদ্ধ হল স্তাবুচের বুকে। হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হল। একটা আর্তনাদও ফুটল না মুখে। লিও স্তাবুচের মাথাটা ঢলে পড়ল। মুহূর্তকাল পরে একটি গোরিলা মানুষের বিজয়-হুংকার জঙ্গলের মধ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

সেই হুংকার শুনে জেজেবেলের বুকটা কেঁপে উঠল। সভয়ে গাছ থেকে নেমে সে ছুটতে শুরু করল। কোথায় চলেছে তা জানে না—তার একমাত্র লক্ষ্য এই নির্জনতার আতংক থেকে দূরে চলে যেতে হবে।

২৩—বন্দী

দিনের আলোয় "বন্দুকবাজ" দেখল কাছেই একটা বন। সারারাত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ কানে আসে নি। এখন দিনের আলোয় চারদিকে ভাল করে তাকাল। স্তাবুচ ও জেজেবেলের চিহ্নও নেই।

নিজের মনেই বলল, "গীজ! কোন আশা নেই। আর পারছি না। একটু বিশ্রাম করে নি।"

বনের দিকে এগোতেই মাইল দুইয়েক উত্তরে দেখতে পেল, দুটো ঘোড়া প্রাণপণে বন থেকে ছুটে আসছে, আর তাদের তাড়া করে আসছে একটা সিংহ।

"বন্দুকবাজ" চেঁচিয়ে বলল, "গীজ! এতো তাদেরই ঘোড়া। তারা কি তাহলে সিংহের পেটে গেছে!"

সব ক্লান্তি ভুলে আবার সে উত্তর দিকে ছুটতে লাগল। হয় তো এখনও জেজেবেলকে বাঁচাতে পারবে।

একটু পরেই সিংহটা থমকে দাঁড়িয়ে উত্তর-পূর্ব দিকের ঢাল বেয়ে নেমে গেল। ড্যানি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। নিজের জন্য নয়—জেজেবেলের নিরাপত্তার আশায়।

দূর থেকে একটা গুলির আওয়াজ কানে এল। স্তাবুচের রাইফেলের শব্দ। "বন্দুকবাজ" আরও জোরে পা চালিয়ে দিল। কয়েক মিনিট পরেই কানে এল রুশীয়টির আর্তনাদ, আর পরক্ষণেই ভেসে এল টারজনের বিজয়-হুংকার।

আরও জোরে ছুটবার চেষ্টা করেও পারল না। তার পা টলছে; বার বার হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে।

হতাশ হয়ে বলে উঠল, "আমার দ্বারা কিছু হবে না। আমি একটা অকর্মার ধাড়ি!"

নতুন করে বনের দিকে এগোতে গিয়েও হঠাৎ সে থেমে গেল। বন-বাদাড় ভেঙে কে যেন ছুটে আসছে। সিংহের কথা মনে পড়তেই পকেট-ছুরিটা বের করে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

দেখা দিল সেই ছুটন্ত মূর্তি।

তার সামনে লাফিয়ে পড়ে ড্যানি চেঁচিয়ে ডাকল, "জেজেবেল!" তার গলা আবেগে কাঁপছে।

আর্তনাদ করে মেয়েটি থেমে গেল। "ড্যানি!" উত্তেজনায় তার স্নায়ুর সব শক্তি উবে গেল। মাটিতে বসে পড়ে সে পাগলের মত কেঁদে উঠল।

"বন্দুকবাজ"ও কয়েক পা এগিয়ে টলতে টলতে বসে পড়ল। তারপরই ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। তার চোখ ফেটে জল এল। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে সেও ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

কয়েক মিনিট তারা তেমনি পড়ে রইল। জেজেবেলই প্রথম উঠে বসল। নিজেকে সংযত করে বলল, "ওঃ ড্যানি, তোমার খুব লেগেছে, না? আর

তোমার মাথা কেমন আছে? দোহাই তোমার ড্যানি, তুমি মরে যেয়ো না।"

শার্টের আস্তিনে চোখ মুছে ড্যানি বলল, "আমি মরব না, কিন্তু আমার মরাই উচিত। একটা বুড়ো মদ্দ হয়ে কাঁদতে লেগেছি!"

"আঘাতের জন্যই তুমি কেঁদেছ ড্যানি," জেজেবেল সান্ত্বনার সুরে বলল।

"মোটেই না। আঘাত তো আরও কতবার পেয়েছি। এতটুকু বয়সে যখন মা মারা গেল তখনও আমি কাঁদি নি। আসলে অপ্রত্যাশিতভাবে তোমাকে সুস্থ দেখেই আমার সব স্নায়ু এই ভাবে ভেঙে পড়েছে।" নিজের আঙুল মটকে দেখাল। "আসলে কি জান, আমি বোধ হয় তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।"

"আমিও ড্যানি।"

নতুন দিনের উষ্ণ আরামে শুয়ে দুজনে অনেক কথাই বলতে লাগল। জেজেবেল বলল, মিডিয়ান দেশের কথা, তার ছেলেবেলার কথা, লেডি বারবারার আগমন ও তার নিজের জীবনের আশ্চর্য পরিবর্তনের কথা। ড্যানি শোনাল শিকাগোর কথা, কিন্তু নিজের জীবনের অনেক কথাই লজ্জায় বলতে পারল না। আবার কিসের এই লজ্জা তাও বুঝতে পারল না।

তারা যখন গল্পে মত্ত, অরণ্যরাজ টারজান তখন বন ছেড়ে তাদের খোঁজে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ও'দিকে দিন হতেই একশ' ডাকাত ঘোড়ায় চেপে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ল। কাপিয়েত্রর মৃতদেহ দেখে বুঝতে পারল যে রুশীয়টি তাদের ধোঁকা দিয়ে সর্দারকে মেরে পালিয়ে গেছে।

পাহাড়ের সানুদেশ অনেকগুলি খাড়িতে ভাগ হয়ে গেছে। তারই একটা ধরে ডাকাতরা এগিয়ে চলল। ফলে তারাও যেমন বেশী দূর দেখতে পাচ্ছে না, তেমনি অন্য কেউও দূর থেকে তাদের দেখতে পাবে না। তাদের সর্দার একটা নীচু পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখল একটি মানুষ বনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে।

টারজানও সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতের সর্দারকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সে পাহাড়ের পথ ধরল। ঐ অশ্বারোহীর সঙ্গে যদি একটা পুরো অশ্বারোহী দল থাকে তাহলে তাদের সঙ্গে সে একা পেরে উঠবে না। কাজেই আক্রমণের জন্য তাকে একটা সুবিধাজনক জায়গা বেছে নিতে হবে।

হুংকার ছেড়ে ডাকাত-সর্দার জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল টারজানের দিকে। বাকি দলটাও হৈ-হৈ রবে তার পিছু নিল।

টারজান বুঝতে পারল, পাহাড়ে উঠবার আগেই ওরা তাকে ধরে ফেলবে। তবু সে সমান বেগে ঘোড়া ছোটাতে লাগল।

অসভ্য চীৎকার করতে করতে ডাকাতদল ধেয়ে আসছে। সকলের আগে

সর্দার। সে আরও কাছে আসতেই মুখ ফিরিয়ে টারজন একটা তীর ছুঁড়ল। তীরটা বুকে বিঁধতেই আর্তনাদ করে সে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে গেল।

মুহূর্তের জন্য ডাকাতরা ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল। কিন্তু শত্রু একা। তার হাতে অস্ত্র বলতে সেকেলে তীর-ধনুক। রাইফেলধারী ডাকাতরা তাকে ভয় পাবে কেন? তারা আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

ততক্ষণে টারজন অনেকটা পথ এগিয়ে গেছে। পাহাড় আর বেশী দূরে নয়। সেও প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

অর্ধবৃত্তাকারে ডাকাতরা এগিয়ে আসছে। তাদের অভিপ্রায়, দুদিক থেকে ঘিরে ধরে টারজনের পথ আটকে দেবে। টারজন আবার একটা তীর ছুঁড়ল। আর এক ডাকাত আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল।

ডাকাতদের অর্ধবৃত্ত পূর্ণ বৃত্ত হয়ে এল। টারজন তীরের পর তীর ছুঁড়ছে। তূণ শূন্য হয়ে গেল। আর তীর নেই। ডাকাতরা তাকে ঘিরে ধরল।

পিছন থেকে একজন চীৎকার করে উঠল, “মেরো না! ওকে মেরো না! ও যে অরণ্যরাজ টারজন। ওর জন্য অনেক টাকা মুক্তি-পণ মিলবে।”

অনেক প্রাণের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত ডাকাতরা টারজনকে বন্দী করল। হাত-পা বেঁধে তাকে একটা ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিল। চার ডাকাত তাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল গ্রামে। বাকিরা স্তাবুচ ও জেজেবেলের খোঁজে এগিয়ে গেল।

২৪—দীর্ঘ রাত

একটা লম্বা ঘুম দিয়ে লেডি বারবারা যখন লর্ড পাস্মোরের শিবিরের তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সূর্য তখন মধ্য গগনে। একটি কালো ছোকরা হাসি মুখে ছুটে এসে বলল, “প্রাতরাশ হাজির করছি। লর্ড পাস্মোর খুবই দুঃখিত। শিকারে বেরিয়ে গেছে।”

একটু পরেই এল লাফায়েত স্মিথ। দুজন একসঙ্গে প্রাতরাশ সারল। গল্প করতে করতে স্মিথ বলল, “এবার তো আমাদের বিদায়ের পালা। মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।”

“কেন?”

“তোমার সঙ্গে তো আর দেখা হবে না।”

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে লেডি বারবারা বলল, “সত্যি কথা—আর আমাদের দুজনের দেখা হবে না—তবে এটা তো চিরকালের ব্যবস্থা নয়। নিশ্চয়

তুমি লণ্ডনে ফিরে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। কী আশ্চর্য দেখ, মাত্র দুদিন আগে আমাদের দেখা হয়েছে, অথচ মনে হচ্ছে আমরা কত কালের পুরনো বন্ধু। জানি না, তোমার কি মনে হচ্ছে।"

স্মিথ বলল, "আমারও ঐ একই কথা। মনে হচ্ছে আমরা দুজন যেন চির পরিচিত," একটু ইতস্তত করে বলল, "আর ভবিষ্যতেও তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না।" বলতে বলতে স্মিথের মুখটা লজ্জারুণ হয়ে উঠল।

হঠাৎ দূর থেকে ভেসে এল রাইফেলের শব্দ। শিবিরের কালা আদমিরা সজাগ হয়ে উঠল। কোথাও সশস্ত্র লড়াই বেঁধেছে।

দেখতে দেখতে শান্ত শিবিরটা রণ-সাজে সেজে উঠল। যেন যাদুর স্পর্শে প্রত্যেকের হাতে উঠে এল আধুনিক রাইফেল ও কার্তুজের মালা; সাদা পালক-লাগানো শিরস্ত্রাণ উঠল মাথায়; মুখে লাগানো হল চকচকে রংয়ের প্রলেপ।

স্মিথ এগিয়ে গিয়ে সর্দারকে শুধাল, "ব্যাপার কি?"

সর্দার বলল, "তা তো জানি না বাওয়ানা; কিন্তু আমরা প্রস্তুত থাকছি।"

"কোন বিপদ ঘটবে কি?"

সর্দার মাথা তুলে খাড়া হয়ে বলে উঠল, "আমরা রয়েছি না?"

জেজেবেল ও "বন্দুকবাজ" হাতে হাত ধরে এগিয়ে চলেছে।

ড্যানি বলল, "আশ্চর্য এই দুনিয়া। ভাব তো জাহাজে যদি স্মিথের সঙ্গে আমার দেখা না হত তাহলে তোমার সঙ্গেও এখানে আমার দেখা হত না। সেই থেকেই তো শুরু।" একটু থেমে আবার বলতে লাগল, "এখান থেকে আমরা এমন কোথাও চলে যাব যেখানে কেউ আমাদের চেনে না। নতুন করে জীবন শুরু করব। একটা গ্যারেজ নেব, অথবা একটা ফিলিং-স্টেশন; আর একটা ফ্ল্যাট। গীজ, সেখানে তোমাকে এমন সব জিনিস দেখাব যা কোন দিন চোখে দেখ নি—মুভি, রেল, জাহাজ! গীজ! তুমি তো কিছুই দেখ নি। আর আমি ছাড়া দেখাবেই বা কে?"

জেজেবেল বলল, "সত্যি ড্যানি, কী যে ভাল লাগছে!"

ভেসে এল রাইফেলের গর্জন। চমকে জেজেবেল বলল, "ওটা কি?"

"কোথাও লড়াই হচ্ছে। চল, লুকিয়ে পড়ি," বলে জেজেবেলের হাত ধরে ড্যানি একটা ঝোপের ভিতর ঢুকে গেল। আরও কাছে এগিয়ে এল ডাকাত-দলের অশ্বক্ষুরের শব্দ। তাদের পাশ দিয়েই ডাকাতরা একে একে ছুটে গেল। হঠাৎ এক ডাকাতের চোখ পড়ল তাদের উপর। তার চীৎকারে অন্য ডাকাতরা ঘুরে এসে দুজনকে ঘিরে ফেলল।

বেচারি "বন্দুকবাজ!" বেচারি জেজেবেল! বড় ক্ষণস্থায়ী তাদের

সুখের জীবন। আবার তারা বন্দী হল। দুই কালা শয়তানের পাহারায় দুজন এগিয়ে চলল গ্রামের দিকে।

যে কুটিরে কাপিয়েত্রর মৃতদেহটা চীৎ হয়ে পড়ে ছিল সেখানেই ডাকাতরা ঢুকিয়ে দিল ড্যানি ও জেজেবেলকে।

ড্যানি বলল, "হয়ে গেল আমাদের গ্যারেজ, ফিলিং-স্টেশন আর ফ্ল্যাট।"

জেজেবেল বলল, "তা হোক, তুমি তো আমার কাছে আছ; আর কিছু আমি চাই না।"

"কথাটা শুনতে ভালই। কিন্তু এই হাত-পা-বাঁধা ঠুঁটো হয়ে আমি তোমার কোন্ কাজে লাগব?"

জেজেবেল বলল, "কে জানে হয় তো তোমার বন্ধু এসে আমাদের উদ্ধার করবে।"

"কে! স্মিথ? সে উদ্ধার করবে কি দিয়ে—ওই খেলনা পিস্তল দিয়ে?"

"আমি বলছি তোমার অন্য বন্ধুর কথা।"

"ওঃ, টারজনের কথা! সে এখানে থাকলে তো সব কিছু ভেঙে-চুরে আমাদের নিয়ে যেত এখান থেকে।"

গ্রাম-প্রান্তের আর একটা ঘরে হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় তখন বসেছিল "বন্দুকবাজে"র একমাত্র ভরসা টারজন। অবিরাম হাত-পায়ের বেড়ি ভাঙবার চেষ্টা করে চলেছে।

সন্ধ্যায় নতুন সর্দার ডাকাতদলকে নিয়ে ফিরে এল। স্যাবৃচকে তারা খুঁজে পায় নি, তবে লর্ড পাস্‌মোরের শিবিরটা দেখে এসেছে। সকলে মিলে পরদিন সেটা আক্রমণ করার শলা-পরামর্শ করতে লাগল।

নতুন সর্দার বলল, "সাদা মানুষটাকে খুন করে দুটি মেয়ে ও টারজনকে সঙ্গে নিয়ে যাব। টারজনের জন্য মিলবে প্রচুর মুক্তিপণ, আর মেয়ে দুটির জন্যও ভাল দাম পাওয়া যাবে।"

একজন বলল, "মেয়ে দুটিকে বরং আমরাই রেখে দি।"

"তাদের বিক্রি করেই দেব।"

অপরজন বলল, "তুমি হুকুম করার কে হে? তুমি তো সর্দার নও।"

"সর্দার নই!" নতুন সর্দার একলাফে তার উপর চড়াও হয়ে তরবারির এক কোপে তার ভব-লীলা সাঙ্গ করে দিল। চারদিকের ভ্রূকুটি-কুটিল মুখগুলির দিকে তাকিয়ে বলল, "আমিই সর্দার! কারও আপত্তি আছে?" কেউ মাথা তুলল না। নতালে ডাকাতদলের সর্দার হয়ে গেল।

অন্ধকার কুটিরে টারজন প্রাণপণে বন্ধন-মুক্তির চেষ্টা করে চলেছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে তার কপালে।

অবশেষে চেষ্টা সফল হল। বেড়ির ভিতর দিয়ে একটা হাত গলে বেরিয়ে এল। তারপর বাকি বেড়ি খুলতে দেরী হলনা। টারজন মুক্ত হল।

নীচু গলায় গর্জন করে সে উঠে দাঁড়াল। দরজার কাছে এগিয়ে গেল। উঠোনে ডাকাতরা বসে আছে। ক্রীতদাসরা রাতের খাবার তৈরী করছে। পাঁচিলটা কাছেই। সেখানে যেতে গেলেই সকলে দেখতে পাবে।

তা পাক। টারজন বাইরে পা বাড়াল। ঠিক সেই সময় পাশের কুটির থেকে একটি কালা আদমি বেরিয়ে এসে তাকে দেখতে পেয়েই চীৎকার করে সকলকে জানিয়ে দিল। আর নিজে লাফিয়ে পড়ল তার উপর।

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে টারজন তাকে দুই হাতে লুফে নিয়ে ঢালের মত উঁচু করে ধরে পাঁচিলের দিকে দৌড় দিল। নতালে দলবল নিয়ে এগিয়ে গেল। হাতের লোকটিকে তাদের উপর ছুঁড়ে দিয়ে টারজন এক লাফে পাঁচিলে উঠে গেল। কয়েকটা গুলি ছুটে এল তাকে লক্ষ্য করে; ততক্ষণে সে লাফিয়ে ও-পারে পড়েই রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

"বন্দুকবাজ" ও জেজেবেলের বন্দী-রাতের যেন শেষ নেই। খাদ্য নেই, পানীয় নেই, মুক্তিও নেই। কাপিয়েত্রর নিষ্প্রাণ দেহটা সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে আছে পলকবিহীন চোখে।

এক সময় ড্যানি বলল, "এ ভাবে কখনও মানুষকে রাখা যায়। আমি হলে তো একটা ইঁদুরকেও এভাবে রাখতে পারতাম না।"

জেজেবেল উঠে বসে ফিস্‌ফিসিয়ে বলল, "একবার চেষ্টা করে দেখলে হয় না?"

"কি চেষ্টা করবে? আমি সব কিছু করতে রাজি।"

জেজেবেল বলল, "তুমি ইঁদুরের কথা বলাতেই কথাটা আমার মনে পড়ে গেল। মিডিয়ানে প্রচুর ইঁদুরের উৎপাত। তবে খেতে খুব ভাল। আমরা মাঝে মাঝেই ফাঁদ পেতে ইঁদুর ধরি! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেরে না ফেললে তারা দাঁত দিয়ে ফাঁদের জাল কেটে বেরিয়ে যায়।"

"তা তো বুঝলাম, কিন্তু তার সঙ্গে আমাদের বর্তমান সংকটের কি সম্পর্ক?" ড্যানি জানতে চাইল।

"আরে আমরাও তো এখন ইঁদুর বনে গেছি। দেখতে পাচ্ছ না? আমরাও তো ইঁদুরের মতই জালে আটকে গেছি। এবার যে দড়ি দিয়ে তোমার হাত বাঁধা আছে তাকে দাঁত দিয়ে কেটে তোমাকে মুক্ত করব।"

"ঠিক আছে। আমিও তোমার সঙ্গে দাঁত লাগাব," বলে ড্যানি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। জেজেবেল উপুড় হয়ে তার হাতের বাঁধন দাঁত দিয়ে কাটতে শুরু করল।

২৫—ওয়াজিরিরা

দুজন উঠে দাঁড়াল।

"বাঁচা গেল," বলে উঠল "বন্দুকবাজ।"

"এবার মুক্তি," বলল জেজেবেল।

কি মনে পড়ায় "বন্দুকবাজ" বলল, "প্রথমেই দেখতে হবে আজ আমি কিসের উপর শুয়েছিলাম। কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছিল।"

কুটিরের এককোণে রাখা ছেঁড়া কম্বলগুলো হাতড়ে একটু পরেই সে উঠে দাঁড়াল। একহাতে টমসন মেসিনগান ও রিভলবার, অন্য হাতে একটা খাপ ও বেল্ট।

"এগুলো কি?" জেজেবেল শুধাল।

"'বন্দুকবাজ' প্যাট্রিকের জান" ড্যানি বলল। "এবার নিয়ে এস হতচ্ছাড়া ইঁদুরগুলোকে।"

তার কথা শেষ হবার আগেই পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল সর্দার নতালে। ভিতরটা অন্ধকার বলে সে ভিতরকার নারী-পুরুষ দুজনকে ঠিক ঠাহর করতে পারল না। কিন্তু ভোরের আলোর প্রেক্ষাপটে নতালেকে তারা স্পষ্ট দেখতে পেল। তার হাতে উদ্যত রিভলবার।

ততক্ষণে "বন্দুকবাজ" বেল্টটাকে কোমরে জড়িয়ে নিয়েছে। মেসিনগান-টাকে বাঁ হাতে নিয়ে খাপ থেকে রিভলবারটা টেনে বের করল। একটা গুলি ছুটে এসে নতালেকে ধরাশায়ী করল।

ঠিক সেই মুহূর্তে ভেসে এল বহু কণ্ঠের হুংকার ও ফটকে পাহারারত শাস্ত্রীর রাইফেল থেকে গুলির শব্দ। অস্পষ্ট দিনের আলোয় সে দেখতে পেয়েছে একটা শত্রু-বাহিনী নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে গ্রামের দিকে।

দরজার কাছে ছুটে এসে বাইরে তাকিয়ে ড্যানি প্যাট্রিক অবস্থা কিছুটা বুঝতে পারল। দু'পক্ষ থেকেই গুলি-বিনিময় চলছে। কিন্তু সে বুঝতে পারল না—ডাকাতদলের এই শত্রু কারা। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দুটি সম্ভাবনার কথা তার মনে এল—এরা হয় কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ডাকাতদল, নয় তো পুলিশ।

জেজেবেলকে বলল, "তুমি এখানেই থাক খুকি; আমি পুলিশদের সঙ্গে একটু মোলাকাত করে আসি।"

ফটকে অনেক ডাকাত জমায়েত হয়েছে। দূরের শত্রুপক্ষকে লক্ষ্য করে তারা রাইফেল চালাচ্ছে। "বন্দুকবাজ" হাঁটু গেড়ে বসে মেসিনগান কাঁধে তুলে নিল। একটা বিরাট ময়াল সাপ যেন বরর্-বরর্ শব্দে গর্জন করে

উঠল। ডজনখানেক ডাকাত মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ল।

বেশ কিছুটা দূরে যে সব বন্দী ও ক্রীতদাস জটলা করে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের মধ্যে ওগনিয়োকে দেখতে পেয়ে “বন্দুকবাজ” চেঁচিয়ে বলল, “হেই গো দাদা! এদিকে চলে এস। সব্বাইকে সঙ্গে নিয়ে এস। তাদের বল, যদি মুক্তি পেতে চায় তো হাতের কাছে যা অস্ত্র পায় তাই নিয়ে যেন লড়াইতে নামে।”

ওগনিয়ো সদলে এসে ড্যানির পিছনে দাঁড়াল। ড্যানির “টাইপরাইটার” গর্জন করে উঠতেই দূরবর্তী আক্রমণকারী দলের গুলিবর্ষণ কিছুটা স্তিমিত হল। তারা বুঝতে পেরেছে, গ্রামের বন্দীরাও প্রতি-আক্রমণে তাদের সঙ্গী হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তাদের প্রবল গুলিবর্ষণে গ্রামের ভিতরকার শ্বেতকায় বন্দীদের যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে।

নেতাবিহীন ডাকাতদল নিজেদের মধ্যেই গণ্ডগোল বাধিয়ে বসল; সেই সুযোগে ড্যানি তার দলবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর।

সামনে-পিছনে দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে বাদবাকি ডাকাতরা রাইফেল ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করল।

“বন্দুকবাজ” ও জেজেবেলকে অক্ষতদেহে দেখতে পেয়ে টারজন তাদের সাদর সম্ভাষণ জানাল। ড্যানি বলল, “ভাগ্যিস ঠিক সময়ে তুমি এসে পড়লে। কিন্তু তোমার এই বন্ধুরা কারা? এদের কোথায় পেলে?”

“ওরা সবাই আমার লোক।”

“বন্দুকবাজ” সোৎসাহে বলে উঠল, “বহুৎ আচ্ছা! কিন্তু—বুড়ো স্মিথকে দেখেছ কি?”

“সে আমার শিবিরে নিরাপদেই আছে।”

“আর বারবারা? সে কোথায়?”

“সে স্মিথের সঙ্গেই আছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের সঙ্গে দেখা হবে।”

ডাকাতদলের বন্দীদের সঙ্গে কথা বলতে টারজন সেইদিকে চলে গেল।

“ও খুব সুন্দর, নয়?” জেজেবেলের প্রশ্ন।

“বন্দুকবাজ” বাধা দিয়ে বলল, “হেই, এখন থেকে তোমার চোখে একমাত্র আমিই সুন্দর, বুঝলে?”

বন্দীদের নানা দলে ভাগ করে তাদের একজন করে দলপতি স্থির করে টারজন সকলকে যার যার গাঁয়ে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল। গালাদের নেতৃত্বে বন্দী ডাকাতদের পাঠানো হল আবিসিনিয়ার পথে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রামটা খালি হয়ে গেল। গ্রামের নানান অঞ্চলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে

লাগল নীল আকাশের দিকে। নানা দলে ভাগ হয়ে বন্দীরা সকলেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত। যাবার আগে সব দলপতি অরণ্যরাজের সম্মুখে নতজানু হয়ে তাকে ধন্যবাদ জানাল।

২৬—শেষ গেরো

লাফায়েত স্মিথ ও লেডি বারবারার বিস্মিত চোখের সামনে লর্ড পাস্‌মোরের শান্ত শিবিরটি কর্ম-কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল। সারাটা দিন সৈনিকরা তৈরী হয়ে নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে রইল। সে অপেক্ষা চলল রাত পর্যন্ত। সর্বত্র চাপা উত্তেজনা। শিবিরে আগেকার মত গান নেই, হাসি নেই। যোদ্ধারা বসে আছে আগুনের ধুনিকে ঘিরে। হাতে-হাতে রাইফেল মজুদ।

ডাক এল অনেক রাতে। কালো কালো মানুষগুলোর ছায়া মিলিয়ে গেল জঙ্গলের অন্ধকারে। মাত্র চারজন রইল পাহারায়, আর রইল দুই সাদা অতিথি।

সকালে তাঁবু থেকে বেরিয়ে লেডি বারবারা দেখল, শিবির প্রায় পরিত্যক্ত। আছে শুধু রাঁধুনি ছোকরা আর তিনটি কালা আদমি।

দিন গড়িয়ে বিকেল হল। অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটল না। লর্ড পাস্‌মোর বা তার যোদ্ধারা কেউ ফিরল না।

হঠাৎ ছোকরাটি উঠে দাঁড়িয়ে কান পাতল। বলে উঠল, “ওরা আসছে।”

ক্রমে সৈন্যদের পায়ের শব্দ স্পষ্টতর হল। সেদিকে তাকিয়ে লাফায়েত স্মিথ উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল, “ঐ তো ‘বন্দুকবাজ’! সঙ্গে জেজেবেল। কী আশ্চর্য! ওরা দুজন এক সঙ্গে।”

লেডি বারবারা চীৎকার করে বলল, “সঙ্গে আবার অরণ্যরাজ টারজন! সেই ওদের দুজনকে উদ্ধার করেছে।”

অবশেষে চারজনকে মিলিত হতে দেখে টারজনের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি খেলে গেল।

লেডি বারবারা বলল, “বড়ই দুঃখের কথা যে এই সুখের ক্ষণে লর্ড পাস্‌মোর এখানে নেই।”

“আছে,” বলল টারজন।

চারদিকে তাকিয়ে লেডি বারবারা প্রশ্ন করল, “কোথায়?”

“আমিই লর্ড পাস্‌মোর,” টারজন জবাব দিল।

“তুমি ?”

“হ্যাঁ। কাপিয়েত্র ও তার দলবলের কথা শুনেই আমি এই ভূমিকাটি নিয়েছিলাম। আমি জানতাম কাপিয়েত্রর দল আমার শিবিরও আক্রমণ করতে আসবে।”

“বন্দুকবাজ” বলে উঠল, “গীজ! ব্যাটারা নিশ্চয় জোর ঠেঙানি খেয়েছে।”

লেডি বারবারা হেসে বলল, “তাই আমাদের আশ্রয়দাতা লর্ড পাস্‌মোরকে কখনও চোখে দেখতে পাই নি।”

টারজন বলল, “আমি কিন্তু তোমাদের কাছাকাছিই ছিলাম। তোমার বন্ধুদের খুঁজতে গিয়ে নিজেই বন্দী হয়েছিলাম। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সব বিপদ কেটে গেছে। এবার আশা করি তুমি আমার বাড়িতে গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম নিতে আপত্তি করবে না। ওদিকে অধ্যাপক স্মিথ ও তার বন্ধু হয় তো তাদের ভূতাত্ত্বিক গবেষণাই চালাতে থাকবে।”

লাফায়েত স্মিথ তো-তো করে বলল, “তা ঠিক নয়; আমি প্রায় স্থির করেই ফেলেছি যে আফ্রিকার কাজকর্ম আপাতত গুটিয়ে নিয়ে ইংলণ্ডের ভূতত্ত্ব নিয়েই গবেষণা চালাতে থাকব। আর আমরা—মানে—লেডি বারবারা—”

“পুনরায় আফ্রিকায় ফিরবার আগে আমি তাকে লণ্ডনে নিয়ে যাব, ভাল করে বন্দুক চালানোর তালিম দেব।” ড্যানি প্যাট্রিকের দিকে ফিরে বলল, “আর প্যাট্রিক, তুমি কি শিকার করতে এখানেই থেকে যাচ্ছ ?”

ড্যানি মাথা নেড়ে বলে উঠল, “মোটেই না। আমরা কালিফোর্নিয়ায় ফিরে যাচ্ছি। সেখানে একটা গ্যারাজ ও ফিলিং-স্টেশন কিনব।”

“আমরা ?” লেডি বারবারা প্রশ্ন করল।

“নিশ্চয়; আমি আর জেজ,” ড্যানি বলল।

“সত্যি ?” লেডি বারবারা উচ্ছ্বসিত। “ও কি সত্যি বলছে জেজেবেল ?”

“সবই ও. কে.,” স্বর্ণকেশিনী উত্তর দিল।

টারজন এ্যাণ্ড দি কাষ্টএ্যাওয়েজ

টারজন ও দলচ্যুতরা

সেদিন সাইগন নামে একটা মালবাহী ছোট জাহাজ আমেরিকার যাবার পথে জীবজন্তু বোঝাইএর জন্য অপেক্ষা করছিল মোম্বাসা বন্দরে। ডেকের ভিতর থেকে সিংহ, হাতি, হায়েনা প্রভৃতি বিভিন্ন জীবজন্তুর বিচিত্র সুর ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

জাহাজের রেলিংএর ধারে দুজন লোক কথা বলছিল। তাদের মধ্যে একজন বলছিল, জাহাজ ছাড়ার জন্য আমরা প্রায় প্রস্তুত। আর এক সপ্তার মধ্যেই আমাদের সব মাল উঠে যাবে জাহাজে, কেনাকাটা সব হয়ে যাবে। প্রতিদিন আমার খরচ বেড়ে যাচ্ছে। যদি তাকে ধরতে পায় তাহলেও তাকে আনতে এক মাস লেগে যাবে।

আবদুল্লা আবু নেজিম বলল, শোন ক্রাউজ সাহেব, একাজ আমি পারবই। সে এখন নদালোদের দেশেই আছে এবং নদালোর কাছ থেকে আমি শুনেছি সে এখন আহত। ফলে তাকে ধরা সহজ হবে। তার কথাটা একবার ভেবে দেখ সাহেব। একটা আসল বন্য লোক, ছোট থেকে বাঁদরদের কাছে মানুষ হয়েছে। সে কত সিংহ মেরেছে. বুনো হাতিরা তার খেলার সাথী। তুমি জাহাজে বোঝাই করে যত জীবজন্তু নাসারায় নিয়ে যাবে, তার একার দাম হবে সেই সব জীবজন্তুর থেকে বেশী। তার থেকে তুমি ধনী হয়ে উঠবে সাহেব।

ক্রাউজ সাহেব বলল, আমি যতদূর জানি লোকটা বৃটিশদের মতই ইংরেজি বলতে পারে। কয়েক বছর ধরে লোকটার কথা শুনে আসছি। তুমি কি ভাব আবদুল্লা, ইংরিজিতে কথা বলতে পারে এমন একটা লোককে কতদিন খাঁচায় ভরে রেখে আমেরিকার লোকদের আমি দেখাতে পারব? তুমি প্রায়ই বল নাসারার লোকরা পাগল। কিন্তু আমার মনে হয় তুমিই পাগল।

আবদুল্লা বলল, তুমি বুঝতে পারছ না সাহেব, যে আঘাত সে পেয়েছে তার ফলে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। সেদিক দিয়ে তোমার হাতে বন্দী অন্যান্য পশুদের মতই তার অবস্থা হয়ে উঠবে অসহায়। পশুদের মতই কারো কাছে কোন অভিযোগ জানাতে পারবে না সে। কারো কথারও কোন

উত্তর দিতে পারবে না।

ক্রাউজ বলল, আফাসিয়া।

তার মানে ?

এটা একটা রোগ। মাথায় আঘাত লাগলে এই রোগ হয় যার ফলে ওর বাকশক্তি হারিয়ে যায়। এর সুযোগ নিয়ে একটা কাজ করা যেতে পারে। তবে—

আবদুল্লা বলল, তুমি ইংরেজদের নিশ্চয় পছন্দ করো না ?

আমি সত্যিই তা করি না। কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করলে কেন ?

লোকটা একজন ইংরেজ।

তাকে আমার কাছে আনার জন্য কি চাও তুমি ?

একটা শফরির খরচ দিতে হবে। খরচটা এমন কিছু বেশী হবে না। আর একটা সিংহের দাম দিতে হবে।

এত বড় একটা কাজ করার জন্য খুব একটা বেশী চাইছ না কেন ? আমি ত ভেবেছিলাম তুমি আমাকে নিঃস্ব করে ফেলবে।

আরবের চোখ দুটো শঙ্কুচিত হয়ে উঠল। তাতে স্পষ্ট একটা ঘৃণার ভাব ফুটে উঠল। বলল, সে আমার শত্রু।

কতদিন লাগবে একাজ করতে ?

একমাসেরও কম।

ক্রাউজ বলল, আমি মাত্র তিরিশ দিন অপেক্ষা করব। তারপর তুমি না এলেও জাহাজ ছেড়ে দেব।

মেয়েটি ক্রাউজকে বলল, আমার বিরক্তি লাগছে। আমি এটা ঘৃণা করি। মোম্বাসা আমার কাছে আর ভাল লাগছে না।

ক্রাউজ বলল, তুমি সব সময় অভিযোগ করছ। কেন যে তোমায় এখানে এনেছিলাম তা বুঝতে পারছি না আমি। যাই হোক তিন দিনের মধ্যে আরবটা ফিরে না এলেও জাহাজ ছেড়ে দেব। তারপর তুমি আবার কোন ব্যাপারে একটা অভিযোগ তুলবে।

মেয়েটি বলল, আবদুল্লা তোমাকে নিশ্চয় একটা মূল্যবান জিনিস এনে দেবে।

হ্যাঁ, ঠিক তাই।

কিন্তু সেটা কি ? একটা গোলাপী হাতি না লাল সিংহ ?

একটা বন্য লোক। তবে কথাটা গোপন রাখবে। ইংরেজ শুয়োরগুলো একবার জানতে পারলে জাহাজে তুলতে দেবে না।

একটা বুনো লোক ! লোকটা দেখতে কেমন ?

লোকটাকে এখনো পর্যন্ত দেখিনি আমি।

ঐ দেখ আবদুল্লা এসে গেছে।

এমন সময় আরবটা এসে গেল। সে এগিয়ে এল তাদের কাছে। কিন্তু তার কাজে সে সফল না বিফল হয়েছে তা বোঝা গেল না তার মুখ দেখে।

আবদুল্লা বলল, ভাল খবর আছে সাহেব। আমি লোকটাকে ধরেছি। শহরের বাইরে একটা কাঠের খাঁচার মধ্যে ভরা আছে। খাঁচাটা মাদুর দিয়ে ঢাকা আছে যাতে কেউ দেখতে না পায়। কিন্তু লোকটাকে ধরতে কি কষ্টই না হয়েছে আমাদের। ধরা পড়ার আগে নদালোর তিনজন যোদ্ধাকে হত্যা করেছে সে। ধরার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটার হাত দুটো বেঁধে রাখা হয়েছে। খোলা থাকলে কাঠের খাঁচাটাকে ভেঙ্গে দিত ও। টুকরো টুকরো করে দিত এক মুহূর্তে।

ক্রাউজ বলল, আমার একটা লোহার খাঁচা আছে যা ও ভাঙতে পারবে না।

আবদুল্লা বলল, তাতেও সন্দেহ আছে আমার। ওর হাতদুটো বেঁধে রাখাই ভাল। খাঁচাটা ওর দেহের থেকে শক্ত হওয়া উচিত।

আমার খাঁচাটা শক্ত খুবই।

তবু ওর হাত বেঁধে রাখব আমি।

ক্রাউজ প্রশ্ন করল, ও কোন কথা বলেছে?

না, একটা কথাও বলেনি। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। ভয় বা ঘৃণা কিছুই নেই ওর চোখে। ওকে দেখে আফ্রিকার এক ধরনের সিংহের কথা মনে পড়ে যায় আমার। ওকে হাত দিয়ে খাওয়াতে হয়। খাবার সময় সিংহের মত গর্জন করে সে।

আবেগের সঙ্গে ক্রাউজ বলে উঠল, চমৎকার। সে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করবে শহরে। আমি বেশ বুঝতে পারছি আমেরিকার বোকা লোকগুলো ওকে দেখার জন্য মোটা টাকা দেবে। এখন শোন, বিকালের মধ্যে সব কাজ সেরে রাখব আমি। সন্ধ্যার পর তোমরা খাঁচাটা শহরের বাইরে থেকে নিয়ে আসবে। আমি জাহাজ থেকে তিনবার আলো দেখাব। তখন তোমরাও একটা আলো দেখাবে।

রাত্রিতে খাঁচাটা তোলার সময় আবদুল্লা তদারক করতে লাগল। জাহাজটা একবার জোরে নড়ে উঠতেই আবদুল্লা সমুদ্রে পড়ে যেত আর একটু হলে।

ক্রাউজ বলল, তোমার ভাগ্য ভাল যে তুমি বেঁচে গেলে। আমি আমেরিকায় তোমাকেও দেখাব। তুমিও টাকা পাবে। বলব মরুভূমি থেকে আনা একজন আরব বুনো লোকটাকে ধরেছে। তোমাকে একটা উট কিনে

দেব। উটের পিঠে চড়ে তুমি শহরের রাস্তা দিয়ে যাবে। উপরে একটা পতাকায় সব লেখা থাকবে।

আবদুল্লা বলল, না, কখনই না। আবদুল্লাকে বন্য জন্তুর মত দেখানো চলবে না।

ক্রাউজ বলল, কিন্তু মনে রেখো, তোমাকে যেতে হবে এবং আমেরিকায় খেজুর গাছ নেই। আমেরিকায় না যাওয়া পর্যন্ত তোমাকে আমাকেই খাওয়াতে হবে। সেখানে যাওয়ার পর যা খুশি তুমি করবে।

আবদুল্লা আপন মনে বিড়বিড় করে বলল, নাসারার একটা কুকুর।

২

পরদিন সকাল থেকে আবহাওয়াটা ভালই ছিল। অনুকূল বাতাসে সাইগন জাহাজটা ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে উত্তর পূর্বদিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ডেকের উপর জন্তু-জানোয়ারগুলো শান্ত ও নীরব হয়েই ছিল। মাদুর-ঢাকা কাঠের বিরাট খাঁচাটা থেকে কোন সাড়াশব্দ আসছিল না।

জেনেভে লাঁও নামে মহিলাটি ক্রাউজের সঙ্গে ডেকের উপর এসে হাজির হলো। বাতাসে উড়ছিল তার কালো চুলের রাশ। হালকা ধরনের পাতলা পোশাকটা গায়ে চিটিয়ে ছিল বাতাসের চাপে। পাতলা পোশাকের হালকা আবরণে তার দেহসৌন্দর্যটা প্রকটিত ও লোভনীয় হয়ে উঠেছিল অনেকখানি।

সাইগনের দু নম্বর মেট উইলহেম স্মিৎস রেলিংএর ধার ঘেষে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিল আধখোলা চোখে।

মহিলাটি তাকে বলল, বন্য লোকটাকে দেখতে পারি?

স্মিৎস বলল, মনে হয় লোকটা এখনো বেঁচেই আছে। গতকাল জাহাজে তোলার সময় লোকটাকে প্রচুর মারা হয়েছে। আবদুল্লা আমাকে যা বলল তাতে বোঝা গেল লোকটাকে পোষ মানানো কষ্টকর হবে। চল, লোকটাকে দেখে আসি।

এই বলে সে জাহাজের লস্কর নাবিককে ডেকে বলল, খাঁচা থেকে মাদুরটা সরাও।

খাঁচার উপর থেকে যখন মাদুরটা সরাচ্ছিল তখন স্মিৎস এসে ক্রাউজকে জিজ্ঞাসা করল, খাঁচার ভিতরে কি আছে মিস্টার ক্রাউজ?

একটা বুনো লোক। এমন লোক কখনো দেখেছ?

স্মিৎস বলল, আমি একটা ফরাসীকে দেখেছিলাম, যার স্ত্রী ড্রাইভারের সঙ্গে পালিয়ে যায়। সে লোকটাও পাগলা ছিল।

খাঁচার উপর থেকে মাতুরের ঢাকনাটা সরাতেই খাঁচার ভিতরে দৈত্যাকার একটা লোককে দেখা গেল। লোকটা তাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে লাগল।

মেয়েটি বলল, লোকটা ত শ্বেতাঙ্গ।

ক্রাউজ বলল, হ্যাঁ তাই।

তুমি পশুর মত একটা লোককে খাঁচায় ভরে রাখবে?

লোকটা ইংরেজ।

স্মিৎস কথাটা শুনে ঘৃণাভরে থুতু ফেলল খাঁচার ভিতরে।

জেনেত্তে রাগের সঙ্গে পা ঠুঁকে বলল, এমন কাজ কখনো করো না।

ক্রাউজও চড়া গলায় বলল, তোমার তাতে কি? আমি বলেছি না লোকটা একটা নোংরা ইংরেজ শুয়োর?

লোকটা একজন মানুষ এবং শ্বেতাঙ্গ।

লোকটা মানুষের একটা মূর্তিমাত্র। কোন একটা কথাও বলতে বা বুঝতে পারে না। একজন জার্মান তার উপর থুতু ফেলেছে এটা তার পক্ষে সম্মানের কথা।

তা হলেও স্মিৎসকে একাজ আর কখনো করতে দেব না।

ঘণ্টা বাজতেই তার কাজে চলে গেল স্মিৎস। তার পিছন পানে তাকিয়ে জেনেত্তে বলল, লোকটা একটা শুয়োর।

এই সময় হ্যান্স ভ্য শ্রুত্তে নামে এক ওলন্দাজ নাবিক এসে দাঁড়াল তাদের কাছে। হ্যান্স কুড়ি বাইশ বছরের এক সুদর্শন যুবক। ও হলো জাহাজের প্রথম মেট। স্মিৎস তাকে হিংসা করে।

জাহাজের ক্যাপ্টেন লার্সেল তখন প্রবল জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ে ছিল তার কেবিনে। ক্রাউজ জাহাজটা ভাড়া করলেও ক্যাপ্টেন লার্সেল তার সঙ্গে কথা বলত না। নাবিকদের বেশীর ভাগ ছিল লস্কর আর চীনা। তাদের মধ্যে প্রায়ই ছুরি মারামারি চলত। সে তুলনায় ডেকের ভিতরে বন্দী পশুগুলো ছিল বেশ শান্ত।

হ্যান্স খাঁচাটার দিকে তাকিয়েই বলে উঠল, লোকটা শ্বেতাঙ্গ! ওকে বনের পশুর মত এভাবে আটকে রাখতে পারেন না।

জেনেত্তের মত সেও প্রতিবাদ করল।

ক্রাউজ সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি তাই করব। আমি কি করি না করি সেটা তোমাদের কাউকে দেখতে হবে না।

কথাটা বলার সময় জেনেত্তের উপর কটাক্ষপাত করল ক্রাউজ।

হ্যান্স বলল, অন্তত: ওর হাতদুটোর বাঁধন খুলে দিন। এইভাবে বেঁধে রাখাটা এক অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতা।

ক্রাউজ বলল, আমি ওর হাতের বাঁধন খুলে দিতে পারি যদি কেউ একটা লোহার খাঁচা এনে দিতে পারে এখানে। এই অবস্থায় ওকে খাওয়ানো একটা কঠিন কাজ।

জেনেত্তে বলল, গতকাল থেকে কোন খাদ্য বা পানীয় পেটে পড়েনি ওর। ও যেই হোক, তুমি একটা অসহায় মানুষের উপর যে ব্যবহার করছ আমি একটা কুকুরের সঙ্গেও তা করব না।

এমন সময় পিছন থেকে আবদুল্লা এসে বলল, লোকটা কুকুরের থেকেও হীন।

এই বলে খাঁচার কাছে গিয়ে থুতু ফেলল সে। সঙ্গে সঙ্গে তার গালের উপর জোরে একটা চড় বসিয়ে দিল জেনেত্তে। আবদুল্লা রাগের মাথায় তার ছোরাটা বার করতে যেতেই হ্যান্স ছুটে এসে তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আবদুল্লার হাতটা ধরে ফেলল।

ক্রাউজ বলল এটা তোমার করা উচিত হয়নি জেনেত্তে।

আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছিল জেনেত্তের চোখ থেকে। আমি লোকটাকে এভাবে অপমান করতে কিছুতেই দেব না। তোমাদের কাউকেই না।

হ্যান্স বলল, আর আমি ওঁকে সাহায্য করব এ বিষয়ে। আপনি ওকে খাঁচায় ভরে রাখবেন কিনা তা আমি দেখতে যাব না। কিন্তু ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছেন কি না সেটা অবশ্যই আমি দেখব।

ক্রাউজ জোর গলায় বলল, আমি আমার খুশিমত ওর সঙ্গে ব্যবহার করব। কি করতে চাও তোমরা?

হ্যান্স বলল, প্রথমে তোমাকে মেরে ফাটিয়ে দেব, তারপর এর পরেই যে বন্দরে থামবে আমাদের জাহাজ সেখানকার কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব তোমায়।

জেনেত্তে বলল, লোহার খাঁচা এসে গেছে। ওকে ওটার মধ্যে ঢুকিয়ে ওর হাতের বাঁধন খুলে দাও।

হ্যান্স কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবার কথা বলায় ভয় পেয়ে যায় ক্রাউজ। তাই সে তার সুরটা নরম করে বলল, ঠিক আছে, ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহারই আমি করব। ওর পিছনে অনেক টাকা ঢেলেছি আমি। সে টাকা আমার তুলতে হবে। ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার না করাটা বোকামি হবে আমার পক্ষে।

একটা বড় লোহার খাঁচা কাঠের খাঁচাটার পাশে এনে রাখা হলো। দরজাদুটো মুখোমুখি রইল। দুটো খাঁচারই দরজা খুলে দেওয়া হলো। ক্রাউজ হাতে একটা রিভলবার নিয়ে খাঁচার ভিতরকার লোকটাকে বলল, এই খাঁচাটায় ঢুকে পড়। বোকা বোবা কোথাকার।

কিন্তু লোকটা ক্রাউজের দিকে একবার তাকালও না।

ক্রাউজ তার লোকদের বলল, একটা রড্ এনে ওকে খুঁচিয়ে দাও।

জেনেত্তে বলল, আমাকে দেখতে দাও।

এই বলে সে খাঁচার কাছে গিয়ে বলতেই ভিতরের লোকটা কাঠের খাঁচা থেকে গুড়ি মেরে লোহার খাঁচায় এসে ঢুকল। হ্যান্সের কাছ থেকে ছুরিটা নিয়ে সে লোকটার হাতের বাঁধনটা কেটে দিল।

মুখে কোন কথা না বললেও নীরবে মুখটা তুলে দৃষ্টির মাধ্যমে কৃতজ্ঞতা জানাল জেনেত্তের প্রতি।

হ্যান্স জেনেত্তের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, লোকটির চেহারাটা এক সত্যিকারের পুরুষের মত।

জেনেত্তে বলল, আবার সুন্দরও বটে।

এরপর ক্রাউজের দিকে তাকিয়ে সে বলল, কিছু খাদ্য আর পানীয় নিয়ে এস।

ক্রাউজ বলল, তুমি দেখছি নার্সগিরি করতে চলেছ।

আমি কিছুই করতে চাই না, শুধু দেখতে চাই ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হচ্ছে। ও কি খায়?

ক্রাউজ আবদুল্লাকে বলল, ও কি খায় আবদুল্লা?

আবদুল্লা বলল, কুকুরটা দুদিন কিছু খায়নি। এখন ও হাতের কাছে যা পাবে তাই খাবে। জঙ্গলে থাকার সময় ও পশুবধ করে কাঁচা মাংস খেত পশুর মত।

ক্রাউজ বলল, আমরা সেটা পরীক্ষা করে দেখব। ও যদি কাঁচা মাংস খেতে পারে তাহলে ভালই হবে। কোন জন্তু জানোয়ার মরে গেলে ওকে তা খাওয়ানো যাবে।

একজন নাবিককে কিছু মাংস আর জল আনতে বলল ক্রাউজ।

আবদুল্লা খাঁচার ভিতরে থুতু ফেলার পর থেকে বন্দী লোকটি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তার দিকে।

ক্রাউজ আবদুল্লাকে বলল, যদি সে খাঁচা থেকে বেরিয়ে যায় তাহলে আমি কিন্তু তোমাকেই ধরব।

আবদুল্লা বলল, ওর হাতের বাঁধন খুলে দেওয়া উচিত হয়নি। ও সিংহের থেকেও ভয়ঙ্কর।

একজন নাবিক মাংস আর জল নিয়ে এলে জেনেত্তে তা নিয়ে বন্দীর হাতে দিল। বন্দী লোকটা মাংস নিয়ে খাঁচার এক কোণে গিয়ে দাঁত দিয়ে একটা বড় মাংসখণ্ড কামড়ে কামড়ে খেতে লাগল আর গর্জন করতে লাগল।

আবদুল্লা বলল, এল আত্রিয়া জাতীয় সিংহেরা এইভাবে খায়।

ক্রাউজ বলল, ও সিংহের মত গর্জন করে। আদিবাসীরা ওকে কি নামে ডাকে আবদুল্লা?

আবদুল্লা বলল, বাঁদরদলের টারজন বলে ডাকে ওকে।

৬

ভারত মহাসাগর পার হয়ে সুমাত্রা দ্বীপে গিয়ে থামল সাইগন। সেখানে আরো কিছু পশু বোঝাই করল ক্রাউজ। সে নিল একটা গণ্ডার, তিনটে ওরাং ওটাং, দুটো বাঘ, একটা চিতাবাঘ, আর একটা হাতি।

হান্স তাকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবে বলে ভয় দেখিয়েছিল বলে বাটাভিয়াতে নামল না ক্রাউজ। সুমাত্রা থেকে সে এগিয়ে যেতে লাগল সিঙ্গাপুরের দিকে। সাইগন যাবে দক্ষিণ চীন সমুদ্র দিয়ে ম্যানিলায়।

ক্রাউজ খুশি হলো। এতক্ষণ পর্যন্ত তার পরিকল্পনা ভালভাবেই কাজ করেছে। সে যদি একবার নিউ ইয়র্কে জাহাজটা নিয়ে যেতে পারে তাহলে মোটা লাভ করবে। তবে সে এত খুশি হত না যদি সে জানত কি ব্যাপার চলছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন সার্সেল তখনো তার কেবিনে শয্যাগত ছিল। হান্স দ্য গ্রোত্তে একজন ভাল অফিসার হলেও সে নতুন। সাইগন জাহাজে কি গোপন ষড়যন্ত্র চলছিল সে বিষয়ে তারও কোন জ্ঞান ছিল না। রাত্রিবেলায় ডেকের উপর সামনের দিকে জাহাজের দ্বিতীয় মেট স্মিৎস আর আবু সিং ও অন্যান্য লস্কর বা নাবিকদের মধ্যে কি সব গোপন কথাবার্তা হত, ক্রাউজের মত সেও তার কিছুই জানত না।

একদিন লস্কর অবু সিংকে চাঁদ নামে এক লস্কর জিজ্ঞাসা করল, পশুগুলোর কি হবে?

অবু সিং বলল, স্মিৎস বলেছে পশুগুলোকে আমরা সমুদ্রে ফেলে দেব জাহাজ থেকে।

চাঁদ আপত্তির সুরে বলল, কিন্তু ওগুলোর অনেক দাম। আমরা পশুগুলোকে রেখে দিয়ে পরে বিক্রি করতে পারি।

অন্য একজন লস্কর বলল, আমরা ধরা পড়ে যাব এবং আমাদের ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে তার জন্য।

অবু সিং বলল, আমরা যখন সিঙ্গাপুরে ছিলাম তখন স্মিৎস জানতে পারে ইংলণ্ড ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধ চলেছে। এটা এক ইংরেজ জাহাজ। স্মিৎস বলেছে একজন জার্মান হিসাবে ইংরেজ জাহাজ দখল করার অধিকার

আছে তার। আমরা তাহলে পুরস্কার হিসাবে কিছু করে টাকা পাব। তবে তার মতে এক্ষেত্রে জন্তু জানোয়ারগুলোর কোন দাম হবে না, ওগুলো শুধু এক আবর্জনা মাত্র।

চাঁদ বলল, ইল্লিনি দ্বীপে একজন লোক আছে সে পশুগুলোকে কিনবে। সুতরাং স্মিংসকে তাদের সমুদ্রে ফেলে দিতে দেব না।

নাবিকরা এইভাবে তাদের নিজেদের ভাষায় কথা বলত। তারা ভাবত জাহাজের চীনা নাবিকরা বুঝতে পারবে না তাদের কথা। কিন্তু তাদের এ ধারণা ভুল ছিল। সাইগন জাহাজে লুম চিপ নামে এক চীনা নাবিক ছিল। সে চীন উপসাগরে ফেলুকা নামে একটা জাহাজে কাজ করেছে। তখন সে লস্করদের ভাষা শেখে। সে লস্করদের বিশ্বাস করত না, বরং তাদের ঘৃণা করত। কারণ তারা একবার ফেলুকা জাহাজটা দখল করে তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। তারা যা যা লুঠ করে তার ভাগ দেয়নি তাকে।

তবে নাবিকদের ষড়যন্ত্রের কথাগুলো শোনার সময় উদাসীনভাবে পাইপ খেয়ে যাচ্ছিল সে। তার মুখ দেখে বোঝাই যাচ্ছিল না সে তাদের সব কথা শুনেছে কিনা।

এদিকে খাঁচার ভিতরে বন্দী লোকটা খাঁচার ভিতরে ইতস্ততঃ পায়চারি করতে করতে মাথার উপর লোহার রড্‌টা ধরে প্রায়ই ঝুলত। খাঁচার কাছে কেউ এলে সে থেমে যেত। এটা কিন্তু আমোদের জন্য করত না। বন্দী অবস্থায় তার দেহের শক্তি ব্যবহার করার কোন সুযোগ না থাকায় পাছে সে শক্তি বিকল হয়ে যায় তার জন্যই সে এইরকম করত।

জেনেত্তে লাঁও প্রায়ই তার খাঁচাটার কাছে এসে দেখত তার খাওয়া হয়েছে কিনা। তারপর তাকে ফরাসী ভাষা শেখাবার চেষ্টা করত। কিন্তু বন্দী টারজনের তাতে বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। সে মুখে কোন কথা কারো সঙ্গে না বললেও মনে মনে ঠিক সঙ্গতভাবেই চিন্তা করে যেত। তার একমাত্র চিন্তা ছিল সে কিভাবে উদ্ধার করবে নিজেকে এই অবস্থা হতে। তাকে নিয়ে ভবিষ্যতে এরা কি করবে তা সে সব বুঝতে পেরেছে। তবে সে যে এই খাঁচা থেকে যেমন করে হোক পালাবেই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তার। জাহাজের ডেকে ওরাং ওটাংগুলোকে দেখে তার মনে একটা দুঃখ হয় যে কোন মনু বা বাঁদর অথবা কোন মাঙ্গানী বা বড় বাঁদরের সঙ্গে কথা বলতে পারে না।

খাঁচার লোহার রেলিংগুলোকে পরীক্ষা করে সে দেখে সেগুলোকে বাঁকিয়ে তার দেহটাকে খাঁচা থেকে বার করতে এমন কোন কষ্ট হবে না। কিন্তু জাহাজ থেকে সমুদ্রে সে ঝাঁপ দিলেই তাকে গুলি করা হবে। কারণ ওরা তাকে ভয় করে। গুলির কথা ভেবেই সে নীরবে বন্য পশুর মত ধৈর্য ধরে

থাকে।

আবদুল্লা বা স্মিৎস যখন ডেকের উপর আসে টারজান তখন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে। কারণ তারা দুজনই তার উপর থুতু ফেলে। তাকে ঘৃণা করার কারণ ছিল আবদুল্লার। আবদুল্লার দাস ব্যবসা আর হাতির দাঁতের কারবারের সে-ই অবসান ঘটায়। আর স্মিৎসের সে জাতীয় শত্রু।

আবদুল্লা ক্রাউজ আর জেনেত্তেকে ঘৃণার চোখে দেখত আর হ্যান্স তাকে ঘৃণা করত। সে তাই স্মিৎসের পক্ষে চলে আসে। ক্রমে তারা অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে পরস্পরের। আবদুল্লা ক্রাউজের উপর প্রতিশোধ নেবার সুযোগ খুঁজছিল বলে সে স্মিৎসের দ্বারা পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে ফেলে নিজেকে।

স্মিংস একদিন আবদুল্লাকে বলে, লস্কররা সব আমার দিকে আছে। তবে চীনাদের আমরা কোন কথা বলিনি। লস্করদের সঙ্গে তাদের শত্রুতা আছে। জবু সিং বলে তার লোকেরা চীনাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।

আবদুল্লা বলে, চীনারা কিন্তু সংখ্যায় বেশী নেই। ঝামেলা করলে তাদের জাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে।

স্মিৎস বলে, জাহাজ চালানোর কাজে তাদের দরকার আছে। তাই জাহাজ থেকে তাদের ফেলে না দিয়ে তাদের যুদ্ধবন্দী করে রাখলেই হলো। এবিষয়ে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। তারপর তাদের যদি মারতেই হয় তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে হত্যার কোন অভিযোগ আসবে না।

আবদুল্লা বলল, ক্যাপ্টেন লার্সেল আর হ্যান্স ড গ্রোত্তে ছাড়া জাহাজ চালাতে পারবে তুমি ?

স্মিৎস উত্তর করে, নিশ্চয় পারব। লালমুখো রুশ নাবিক উবালোউস্ভ আমার পক্ষে আছে। সে ক্রাউজকে ঘৃণা করে। আমি তাকে প্রথম মেট করব। আর জবু সিংকে করব দ্বিতীয় মেট। আমি সব ঠিক করে ফেলেছি।

আরব জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি ক্যাপ্টেন হবে ?

নিশ্চয়।

আর আমি ?

তুমি হবে জাহাজের এ্যাডমিরাল বা অধিনায়ক।

সেদিন বিকালবেলায় লুম চিপ হ্যান্সের কাছে এসে বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের কথা সব বলল। বলল, বিদ্রোহীরা আজ রাতেই জাহাজ দখল করবে। তারা লার্সেলকে, ক্রাউজকে, তোমাকে খুন করবে। শুধু চীনাদের বাদ দেবে।

হ্যান্স বলল, তুমি কি স্বপ্ন দেখছিলে লুম ?

স্বপ্ন নয়, অপেক্ষা করলেই সব দেখতে পাবে।

হ্যান্স চিন্তান্বিত হয়ে বলল, কিন্তু চীনা নাবিকরা ? তারা কি করবে ?

তারা তোমাদের মারবে না। তারা ষড়যন্ত্রে যোগ দেয়নি।

তারা কি বিদ্রোহী নাবিকদের সঙ্গে লড়াই করবে ?

তাদের হাতে বন্দুক দাও। তাহলেই লড়াই করবে।

তারা বন্দুক পারে না। রড্ আর ছুরি দিয়ে লড়াই করতে বল। তোমাকে ধন্যবাদ লুম। তোমার কথা কখনো ভুলব না।

হ্যান্স সঙ্গে সঙ্গে লার্সেলের কেবিনে চলে গেল। কিন্তু দেখল লার্সেল জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে। তারপর ক্রাউজের কেবিনে চলে গেল। সেখানে ক্রাউজ আর জেনেত্তের কাছে লুম চিপের কথাগুলো সব বলল।

ক্রাউজ বলল, চীনার কথা বিশ্বাস করো ?

বিশ্বাস না করার কোন কারণ থাকতে পারে না। সে নিজের কাজ ছাড়া কিছু জানে না। সে এমন আজগুবি গল্প বানাতে যাবে কেন ?

ক্রাউজ বলল, এখন আমরা কি করব ?

হ্যান্স বলল, আমি এখনি স্মিৎসকে গ্রেপ্তার করব।

হঠাৎ কেবিনের দরজাটা খুলে গেল। দেখা গেল স্মিৎস একটা স্বয়ংক্রিয় রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। তার পিছনে ছয়জন বিদ্রোহী ছিল।

স্মিৎস হ্যান্সকে বলল, তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করবে না ? চীনাটা যখন তোমার সঙ্গে কথা বলছিল তখন আমি তা দেখি। সে যা বলেছে তা আমি জানি।

এর পর সে লস্করদের বলল, ওদের সবাইকে বেঁধে ফেল।

বিদ্রোহী নাবিকরা কেবিনের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ক্রাউজ কাপুরুষের মত বিনা প্রতিবাদে আত্মসমর্পণ করল। হ্যান্স জেনেত্তের সামনে গিয়ে লস্করদের বলল, খবরদার, মেয়েছেলের গায়ে হাত দেবে না। লস্কর বা বিদ্রোহী নাবিকরা জেনেত্তেকে বাঁধতে গেলে ঘুষি মেরে দুজনকে ফেলে দিল হ্যান্স। জেনেত্তেও তার ভারী একজোড়া বায়নাকুলার দিয়ে মেরে ফেলে দিল দুজনকে।

তবে লড়াই শেষে দেখা গেল আঘাতে অচেতন হয়ে পড়েছে হ্যান্স। বাকি সবাইকে বেঁধে ফেলেছে বিদ্রোহীরা।

ক্রাউজ অবশেষে স্মিৎসকে বলল, এটা বিদ্রোহ স্মিৎস। মনে রেখো, আমাকে যদি ছেড়ে না দাও তাহলে এর জন্য ফাঁসিতে মরতে হবে তোমায়।

স্মিৎস বলল, এটা বিদ্রোহ নয়, আমি আমাদের রাষ্ট্রের নামে এই ইংরেজ জাহাজটিকে দখল করলাম।

ক্রাউজ বলল, আমিও জার্মান। আমি জাহাজটিকে ভাড়া করি। সুতরাং এটা জার্মান জাহাজ, ইংরেজ জাহাজ নয়।

স্মিৎস বলল, তা নয়, এটা ইংলণ্ডেই রেজেষ্ট্রী করা হয় এবং এই জাহাজ

ইংরেজ পতাকা বহন করেই ভেসে চলেছে। তুমি যদি জার্মান হও তাহলে তুমি বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী। তোমাকে কি করতে হবে তা আমরা জানি।

৪

টারজন বুঝতে পারল জাহাজে রীতিমত একটা গণ্ডগোল হয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি তা জানতে পারেনি সে। জেনেত্তে নামে সেই মেয়েটিকে ও ছোকরা অফিসার হ্যান্সকে দুদিন দেখেনি সে। দেখছে যে মেটটা তার উপর থুতু ফেলেছিল একদিন জাহাজটা এখন তারই দখলে। এখন তাকে নিয়মিত খাবার বা জল দেওয়া হয় না।

চীনা নাবিকরা মুখ বুজে জাহাজ চালানোর কাজ করে যাচ্ছে। আবদুল্লা তার ভয়ে খাঁচার কাছে আসে না।

এখন বিদ্রোহী নাবিকরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় জাহাজে। চীনা নাবিকরা সব কাজ করলেও অল্প কোন ত্রুটি অথবা বিনা দোষেই স্মিৎস তাদের লাথি মারে। একদিন এক চীনাকে বেত মেরে লঘু দোষে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়া হয়।

স্মিৎস খাঁচার কাছে এসে টারজনকে গালাগালি দেয় দাঁত খিঁচিয়ে। তার প্রতি স্মিৎসের এই ঘৃণার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পায় না টারজন।

একদিন স্মিৎস একটা হারপুন নিয়ে এসে খাঁচার ধারঘেঁষে দাঁড়িয়ে টারজনকে মারার জন্য সেটা খাঁচার ভিতর ঢুকিয়ে দেয়। টারজন সেটা ধরে সঙ্গে সঙ্গে এক হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নেয় স্মিৎসের হাত থেকে। সেই থেকে সশস্ত্র টারজনের কাছে আসতে ভয় পায় স্মিৎস।

একদিন একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখল নিজের চোখে। নিচের থেকে কয়েকজন নাবিক একটা কাঠের আর একটা লোহার খাঁচা উঠিয়ে এনে তার খাঁচাটার পাশে রাখল। তারপর জেনেত্তে নামে সেই দয়ালু মেয়েটাকে কাঠের খাঁচাতে আর ক্রাউজ ও হ্যান্সকে লোহার খাঁচাটাতে ভরে রাখা হলো।

হ্যান্স স্মিৎসকে প্রশ্ন করল, এ সবের অর্থ কি স্মিৎস?

স্মিৎস বলল, নিচের তলায় তালাবদ্ধ থাকার জন্য অভিযোগ করছিলে তোমরা। তাই এখানে এনে রাখা হলো। অনেক আলো হাওয়া পাবে। এজন্য আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তোমাদের।

এই বলে হাসতে লাগল স্মিৎস।

হ্যান্স বলল, আমাদের নিয়ে যা খুশি করো। কিন্তু একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে এভাবে লস্করদের চোখের সামনে রাখা উচিত কি?

রাগ চেপে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল হ্যান্সের। তবু উপায় নেই। বুঝল, লোকটা পাগল। বেশী কিছু বলতে গেলে তার ফল আরো খারাপ হবে।

স্মিৎস হ্যান্সের আগেকার কথাটার উত্তরে বলল, জেনেত্তে চাইলে আমার কেবিনে এসে থাকতে পারে। লার্সেনকে অন্য জায়গায় রাখা হয়েছে।

জেনেত্তে এমন সময় পিছন থেকে বলে উঠল, তার থেকে জেনেত্তে থাকবে বন্য লোকটির সঙ্গে একই খাঁচায়।

বিদ্রূপের সঙ্গে স্মিৎস হেসে বলল, তা খুব ভাল কথা। ক্রাউজের সিংহের সঙ্গে তার খাঁচায় অথবা ইচ্ছা করলে এক বাঘের খাঁচাতেও থাকতে পার।

জেনেত্তে বলল, তোমার থেকে বাঘ সিংহ দুটোই ভাল।

স্মিৎস বলল, আমি তোমাদের সবাইকে বন্য পশুদের সঙ্গে বার্লিনে নিয়ে গিয়ে সবাইকে দেখাবার জন্য এক প্রদর্শনীর আয়োজন করব। তুমি যদি তোমার প্রিয় বন্য লোকটির সঙ্গে এক খাঁচাতে থাক তাহলে সে দৃশ্য দেখে লোকে অনেক আনন্দ পাবে। আবদুল্লা বলেছে লোকটা নাকি নরখাদক। তোমাকে ওর কাছে রাখলে ও তোমাকেই খাবে। আমাকে খাবার দিতে হবে না।

হ্যান্স স্মিৎসকে দেখে আপন মনে হাসতে হাসতে বলল, লোকটা পাগল। আমি জানতাম লোকটার মাথাটা একটু খারাপ। কিন্তু ও যে একেবারে পাগল তা জানতাম না।

জেনেত্তে জিজ্ঞাসা করল, স্মিৎস যা বলল তা কি সত্যি ?

হ্যান্স বা ক্রাউজ কেউ একথার উত্তর দিতে পারল না। তাদের নীরবতা ভয়টা বাড়িয়ে দিল জেনেত্তের।

জেনেত্তে এর আগে লোকটাকে খাবার ও জল দিয়েছে। কিন্তু পাছে সে তাকে ধরে ফেলে এই ভয়ে তার খুব একটা কাছে যায়নি। লোকটাকে সত্যি সত্যিই ভয় করত জেনেত্তে। তবে স্বাভাবিক দয়া মায়ার বশবর্তী হয়েই তার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করত।

জেনেত্তের সঙ্গে ক্রাউজের প্রথম দেখা হয় বাটাভিয়ায়। ক্রাউজ তাকে নিউ ইয়র্ক শহরে নিয়ে যেতে চায়। আমেরিকার বড় বড় শহরে সুন্দরী মেয়েরা কত আদর পায় এবং ধনরত্নের অধিকারিণী হয় তা শুনে প্রলুব্ধ হয় সে। ভাগ্যের সন্ধানে সে তাই ক্রাউজের জাহাজে চড়ে বসে।

একটু পরেই পিস্তল হাতে লোকজন সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল স্মিৎস। প্রথমে জেনেত্তের খাঁচার দরজা খুলে দেওয়া হলো, তারপর টারজনের খাঁচার দরজা খোলা হলো। শেষে স্মিৎস জেনেত্তেকে হুকুম করল, যাও, লোহার খাঁচার মধ্যে চলে যাও।

হ্যান্স চীৎকার করে বলতে লাগল, একাজ করো না স্মিৎস।

ধমক দিয়ে হ্যান্সকে থামিয়ে দিয়ে স্নিৎস আবার বলল, যাও বলছি।

এর পর তার লোকদের বলল, রড্ দিয়ে ওকে খুঁচিয়ে ঢুকিয়ে দাও।

কিন্তু একজন জেনেভ্রেকে লোহার রড্ দিয়ে খোঁচাতে গেলে টারজন গর্জন করতে করতে এগিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তিনটে পিস্তল তার দিকে ধরা হলো। লোহার রড্গুলোও তাকে লক্ষ্য করে উঁচিয়ে তুলে ধরা হলো।

জেনেভ্রে ভয় পেয়ে গেলেও সে ওদের পীড়নের ভয়ে ঢুকে পড়ল খাঁচার মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে খাঁচার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

হ্যান্স, স্নিৎস, ক্রাউজ, নাবিকরা সবাই স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখতে লাগল ব্যাপারটাকে।

খাঁচার ভিতর ঢুকেই দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কি হয় তা দেখতে লাগল। সে টারজনের মুখপানে তাকাল এবং টারজনও তার মুখপানে তাকাল। জেনেভ্রে দেখল টারজনের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে এককালি। হাসিটা দেখে আশ্বস্ত হলো জেনেভ্রে। তার মনে হলো টারজনের হাসিটা বন্ধুত্বপূর্ণ। তা দেখে সে নিজেও হাসল।

টারজন এবার স্নিৎসের দেওয়া হারপুনটা তুলে নিয়ে জেনেভ্রের হাতে দিল সেটা।

হ্যান্স প্রথমে ভাবল টারজন হয়ত খুন করতে যাচ্ছে জেনেভ্রেকে। তাই সে চীৎকার করে উঠেছিল ভয়ে। স্নিৎসকে বলেছিল, লোকটাকে গুলি করো স্নিৎস।

কিন্তু টারজন কিছুই করল না দেখে সকলেই আশ্বস্ত হলো। একটা বড় রকমের ভয় থেকে মুক্ত হলো জেনেভ্রে। সমস্ত শরীর ঘেমে উঠল তার। তার পাদুটো কাঁপছিল। অকস্মাৎ কোন বড় ভয়ের চাপ থেকে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র মুক্ত হলে এই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। খাঁচার ভিতরে বসে পড়ল জেনেভ্রে।

জেনেভ্রের প্রতি টারজনের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখে হতাশ হয়ে পড়ল স্নিৎস। সে ভেবেছিল তাকে হয়ত ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে টারজন। তাই সে আবদুল্লাকে বলল, ভুল বলেছিল আবদুল্লা। লোকটা আসলে বন্য নয়। ওর বেশ টনটনে জ্ঞান আছে। আবদুল্লা তুমি একটা মিথ্যাবাদী।

আবদুল্লা স্নিৎসকে বলল, তুমি যদি মনে করো লোকটা বন্য বর্বর নয়, তাহলে তুমি নিজে তার খাঁচায় গিয়ে ঢুকতে পার।

স্নিৎসের দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইল টারজন। স্নিৎসের কথা সে বুঝতে না পারলেও তার মুখের ভাব দেখে স্নিৎসের চরিত্রটা বুঝতে বাকি রইল না তার।

পরদিন সকালে লোহার খাঁচার দুজন বন্দী হাসিখুশিতে মেতে উঠল। যে

বন্য লোকটিকে আবদুল্লা নরখাদক বলে অভিহিত করেছে, যে কাঁচা মাংস খাবার সময় সিংহের মত গর্জন করে, যে তিনজন আফ্রিকার যোদ্ধাকে হত্যা করেছে সেই লোকটির সঙ্গে এক খাঁচার ভিতরে একটি রাত্রি কাটানো সত্ত্বেও জেনেত্তে দেখল তার দেহ অক্ষত আছে। কোন ক্ষতি হয়নি তার।

তা দেখে জেনেত্তে সকালে উঠেই এত খুশি হলো যে আনন্দের আবেগে একটা জনপ্রিয় ফরাসী গান গাইতে লাগল।

এদিকে টারজন খুশি হলো মেয়েটির ফরাসী বুঝতে পারার জন্য। সকালে ঘুম থেকে উঠেই টারজন দেখল আর কোন দুঃখের বোঝা নেই তার বুকের মধ্যে।

ফরাসী ভাষায় টারজন জেনেত্তেকে বলল, সুপ্রভাত!

বহুদিন আগে একজন ফরাসী লেফটন্যাণ্টের কাছে ফরাসী ভাষা শেখার সময় কথাটা শেখে টারজন।

জেনেত্তে তাকে সুপ্রভাত জানিয়ে আশ্চর্য হয়ে টারজনের মুখপানে তাকাল। তারপর বলল, ওরা যে বলেছিল তুমি নাকি কথা বলতে পার না।

টারজন বলল, একটা দুর্ঘটনায় আমি বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন ঠিক হয়ে গেছি।

এতে আমি আনন্দিত।

টারজন বলল, তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই।

ওরা কত ভয়ঙ্কর কথা বলেছিল। তুমি হয়ত শুনেছ তাদের কথা।

আমি কোন কথা বলতে পারিনি। তাদের কথা বুঝতেও পারিনি। তারা কি কি বলেছিল?

তারা বলেছিল তুমি বড় হিংস্র। তুমি নাকি মানুষ খাও।

টারজনের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। বলল, তারা তাই তোমাকে আমার খাঁচায় ভরে দেয়। ভেবেছিল আমি তোমাকে খেয়ে ফেলব। কে তোমাকে খাঁচায় ভরেছিল?

স্মিৎস, যে বিদ্রোহী হয়ে উঠে জাহাজ দখল করে।

টারজন বলল, ঐ লোকটাই আমার উপর থুতু ফেলেছিল।

টারজনের গলার মধ্যে সিংহগর্জনের একটা আভাস পেল জেনেত্তে। আবদুল্লা ঠিকই বলেছে। লোকটা সিংহের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। তবে এখন আর কোন ভয় পায় না সে।

জেনেত্তে বলল, তুমি স্মিৎসকে হতাশ করেছ। সে যখন দেখে আমি তোমার খাঁচার ভিতর ঢুকলে তুমি আমার হাতে হারপুনটা তুলে দিয়ে খাঁচার অন্য প্রান্তে গিয়ে বসে পড় তখন সে ক্ষেপে যায়। আমার নিরাপত্তা দেখে

যে পরিমাণ হতাশাবোধ করে সে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

স্মিৎস কেন তোমায় ঘৃণা করে ?

জেনেত্তে বলল, আমি তা জানি না। সে এক মর্ষকামী বা দুঃখবাদী বাতিকগ্রস্ত লোক। সে বেচারা লুম চিপের কি অবস্থা করেছে তা তুমি দেখেছ। সে অন্যান্য চীনা নাবিকদের কথায় কথায় লাথি মারে ও আঘাত করে।

আমি আশা করি জাহাজে কি কি ঘটেছে তা তুমি আমায় বলবে। আমি তা বুঝতে পারিনি। ওরা আমাকে নিয়ে কি করতে চায় তা যদি জেনে থাক তাও বলবে।

ক্রাউজ তোমাকে তার অন্যান্য পশুদের সঙ্গে একজন লোক হিসাবে শহরের লোকদের দেখাবার জন্য আমেরিকায় নিয়ে যাচ্ছিল।

ক্রাউজই ত এখন প্রথম মেটের সঙ্গে একটা খাঁচায় বন্দী হয়ে আছে। তাই না ?

হ্যাঁ।

এবার তুমি ওদের বিদ্রোহের কথাটা ভেঙে বল। স্মিৎসের পরিকল্পনাটাই বা কি সে সম্বন্ধে যা জান বল।

জেনেত্তের সব কথা বলা শেষ হলে টারজন বুঝতে পারল সাইগন জাহাজে কি নাটক চলছে। সে বুঝল জেনেত্তে, খাঁচায় ভরা হ্যান্স ও শ্রুডে, ক্রাউজ আর চীনা নাবিকরা তাদের দিকে।

হ্যান্স ঘুম থেকে উঠেই জেনেত্তেকে ডেকে বলল, তুমি ভাল আছ ত ? ও তোমার কোন ক্ষতি করেনি ত ?

জেনেত্তে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, না, কোনভাবে কোন ক্ষতি করেনি।

হ্যান্স বলল, আমি আজ স্মিৎসের সঙ্গে কথা বলব। আমি ও ক্রাউজ যদি তাকে কথা দিই তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনব না তাহলে সে হয়ত তোমাকে খাঁচা থেকে মুক্ত করে দিতে পারে।

জেনেত্তে বলল, জাহাজের মধ্যে এইটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। স্মিৎস যতদিন জাহাজের কর্তা হয়ে থাকবে ততদিন আমি খাঁচা থেকে বেরোব না।

হ্যান্স বলল, কিন্তু লোকটা আধা-মানুষ, আধা-পশু। এখনো পর্যন্ত তোমার কোন ক্ষতি করেনি ঠিক, কিন্তু স্মিৎস যদি ওকে খাবার না দেয় তাহলে ও কি করবে তা বলা যায় না :

জেনেত্তে হেসে বলল, আমার জন্য ভাবতে হবে না। তোমরা যদি ওর সম্বন্ধে এই সব কথা বল তাহলে ও খাঁচা থেকে বার হলে নিজেদের কি করে বাঁচাবে সেই কথা ভাব।

হ্যান্স বলল, ও আমাদের কথা বুঝতে পারবে না আর খাঁচা থেকেও কোনদিন বার হতে পারবে না।

ওদের কথাবার্তা শুনে ক্রাউজ উঠে হ্যান্সের পাশে এসে বলল, ও যাতে খাঁচা থেকে বার হতে না পারে স্মিৎস সেদিকে কড়া নজর রাখবে। ও যে তোমাদের কথা বুঝতে পারছে না এবিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পার। ও আবার কথা বলতেও পারে না।

জেনেত্তে এবার টারজনের মুখপানে তাকাল। হ্যান্স আর ক্রাউজের কথার কি প্রতিক্রিয়া হয় টারজনের মধ্যে তা দেখার চেষ্টা করল সে। সে ক্রাউজ আর হ্যান্সকে বলতে যাচ্ছিল টারজন তাদের কথা বুঝতে পারে এবং কথা বলতেও পারে। সে যদি তাদের কথাগুলো শুনে থাকে তাহলে সব বুঝেছে। কিন্তু স্মিৎস এসে পড়ায় সে কিছু বলল না।

স্মিৎস এসে দেখল টারজন খাঁচার ভিতর শুয়ে ঘুমোচ্ছে। সে সত্যি সত্যিই ঘুমোচ্ছে না ঘুমের ভান করছে তা বুঝতে পারল না জেনেত্তে।

স্মিৎস জেনেত্তেকে বলল, তুমি এখনো বেঁচে আছ দেখছি। আমার মনে হয় বাঁদরটার সঙ্গে রাতটা ভালভাবেই কাটিয়েছ এবং ওকে কিছু খেলা শিখিয়েছ। আমি তাহলে তোমার ওর প্রশিক্ষক হিসাবে প্রদর্শনীতে দেখাতে পারব।

এরপর স্মিৎস খাঁচাটার কাছে এসে টারজনকে ভাল করে দেখে বলল, ও কি ঘুমোচ্ছে না কি ওকে খুন করেছ তুমি?

সহসা টারজন তার একটা হাত খাঁচা থেকে বার করে স্মিৎসের হাঁটুটা ধরে ফেলল। টারজন তখন স্মিৎসের হাঁটুটা ধরে খাঁচার ভিতর টেনে আনতে স্মিৎস পড়ে গেল। সে চীৎকার করে উঠতে টারজন আর একটা হাত দিয়ে তার পিস্তলটা নিয়ে নিল।

স্মিৎস চীৎকার করতে লাগল, বাঁচাও, বাঁচাও। আবদুল্লা, জবু সিং, চাঁদ, বাঁচাও।

আবদুল্লা, জবু সিং, চাঁদ স্মিৎসের চীৎকার শুনে ছুটে এল। কিন্তু টারজন তাদের দিকে পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরতে তারা থেমে গেল।

টারজন বলল, খাবার আর জল এনে দাও, তা না হলে তোমার হাঁটুটা ভেঙ্গে দেব।

আবদুল্লা বিড় বিড় করে বলে উঠল, একটা ইংরেজ কুকুর কথা বলছে।

ক্রাউজ আর হ্যান্স স্ত গ্রোত্তে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

ক্রাউজ বলল, ও হয়ত আপনাদের কথা বুঝতে পেরেছে।

এই বলে সে কি কি বলেছে মনে করে দেখল। লোকটা চিরদিন খাঁচার ভিতরে থাকবে না। লোকটার হাতে এখন পিস্তল রয়েছে। ওকে খুন করা

সহজ হবে না। এখন তার আর স্মিৎসের স্বার্থ এক। তাদের উভয়ের স্বার্থেই লোকটাকে সরাতে হবে।

স্মিৎস খাবার আর জল আনার জন্য চীৎকার করতে লাগল। সহসা হ্যান্স টারজনকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, দেখ, তোমার পিছনে কি।

কিন্তু টারজন পিছন ফিরে দেখার আগেই একটা পিস্তল গর্জে উঠল এবং টারজন পড়ে গেল। জবু সিং খাঁচার পিছন দিক দিয়ে চুপি চুপি গিয়ে গুলি করে তার পিস্তল থেকে।

স্মিৎস ছাড়া পেয়ে সরে গেল। জবু সিং টারজনের উপর আবার গুলি করতে গেলে জেনেত্তে টারজনের পিস্তলটা তুলে নিয়ে জবু সিংকে লক্ষ্য করে গুলি করল। গুলিটা তার ডান হাতে লাগল। তার পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে যেতে জেনেত্তে খাঁচার ধার থেকে সেটা তুলে নিল।

জেনেত্তে এবার হাঁটু গেড়ে বসে টারজনের বুকের উপর কান পেতে তার হৃৎস্পন্দন শোনার চেষ্টা করতে লাগল।

স্মিৎস দাঁড়িয়ে এক নিস্ফল আক্রোশে চেঁচামিচি করছিল। এমন সময় সে একটা জাহাজ দেখতে পেয়ে ভাল করে সেটা দেখার জন্য উপরে উঠে গেল। সাইগন জাহাজের উপর কোন পতাকা ছিল না তখন। দরকারমত যে কোন একটা জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দেবে সে।

দেখা গেল দূরে দেখতে পাওয়া জাহাজটা এক ইংরেজ জাহাজ। সে সঙ্গে সঙ্গে সাইগনের উপর একটা ইংরেজ পতাকা উড়িয়ে দিল। তারপর বেতারে সেই জাহাজের কাছে খবর পাঠিয়ে একজন ডাক্তার পাঠাতে বলল। কারণ তাদের এই জাহাজে দুজন আহত লোক আছে।

সেই অচেনা জাহাজটা জানাল তাদের সঙ্গে একজন ডাক্তার আছে। স্মিৎস জানাল, সে এখনি একটা নৌকো পাঠাচ্ছে।

স্মিৎস তখন বেশ কিছু পিস্তল, রাইফেল, ছোরা, রড্ প্রভৃতি অস্ত্র গোপনে একটা নৌকোর উপর তুলে নিয়ে সে নিজে কয়েকজন নাবিককে নিয়ে নৌকোটায় উঠে বসল।

জাহাজটার কাছে গিয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা জাহাজে উঠে পড়ল। এমন সময় দেখা গেল সাইগনে জার্মান পতাকা উড়ছে।

জাহাজটাতে ছিল পঁচিশ তিরিশজন লোক আর দুজন মহিলা। স্মিৎসের জলদস্যুসুলভ কারবার দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল জাহাজের ক্যাপ্টেন। স্মিৎসকে বলল, এ সবের মানে কি?

স্মিৎস তার সাইগন জাহাজে উড়তে থাকা জার্মান পতাকাটা দেখিয়ে বলল, এর মানে হলো আমি জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে তোমাদের গ্রেপ্তার করলাম। এ জাহাজ এখন আমাদের দখলে। তোমাদের এঞ্জিনীয়ার এবং

জাহাজ চালক জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাবে। আমার প্রথম মেট জবু সিং দেখাশোনা করবে। সে কিছুটা আহত। তোমাদের ডাক্তার তার ক্ষতটা বেঁধে দেবে। বাকি তোমরা সবাই আমার সঙ্গে আমার জাহাজে গিয়ে উঠবে। মনে রাখবে এখন তোমরা যুদ্ধবন্দী। সেইমত আচরণ করবে।

দখল করা জাহাজের ক্যাপ্টেন স্মিৎসকে বলল, কিন্তু আমাদের জাহাজ ত যুদ্ধ জাহাজ নয়, কোন পণ্যবাহী জাহাজও নয়। এটাকে কি জন্য দখল করবেন?

লম্বা চেহারার একজন যুবক বলল, হ্যাঁ, এটা দখল করতে পারেন না।

স্মিৎস তাকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ করো। তোমরা ইংরেজ। এই টাই জাহাজ দখল করার যথেষ্ট কারণ। এখন এস। তোমাদের ডাক্তার কই?

ডাক্তার যখন জবু সিংএর ক্ষতটা বেঁধে দিচ্ছিল তখন স্মিৎস আর তার লোকজন জাহাজের ভিতরটা খোঁজাখুঁজি করে কতকগুলা পিস্তল আর শিকারের রাইফেল পেল। সেগুলো নিয়ে তার লোকজনকে কিছু নির্দেশ দিয়ে সে বন্দীদের নিয়ে তার জাহাজে চলে গেল।

বন্দীদের মধ্যে একটি মেয়ে এক যুবককে বলল, আর তোমাকে বিয়ে করতে হবে না আলজি।

যুবকটি বলল, তার থেকেও খারাপ হলো।

৫

জবু সিংএর গুলিটা টারজনের মাথার একটুখানি চামড়া ছিঁড়ে দিয়ে চলে যায়।

সে তাই কিছুক্ষণের জন্য অজ্ঞান হয়ে থাকে। আঘাতটা জোর হয়নি। তাই সে কিছুক্ষণ পরেই উঠে বসল।

অন্য জাহাজ থেকে স্মিৎস একজন লোককে বন্দী করে নিয়ে এলে জেনেত্তে বলল, স্মিৎস জলদস্যু হয়ে গেছে। ঐ সব লোকগুলোকে নিয়ে ও কি করবে তা বুঝতে পারছি না। ওরা সংখ্যায় প্রায় পনেরজন হবে।

বন্দীদের মধ্যে থেকে আটজনকে স্মিৎস জাহাজ চালানোর কাজে পাঠিয়ে দিল। তারপর দুটো খাঁচা এনে বন্দীদের বলল, কে কার সঙ্গে কোন খাঁচায় থাকবে বেছে নাও।

একটি মেয়ে তার কাকা কাকিমাকে নিয়ে ছোট খাঁচাটায় ঢুকল। অন্য খাঁচাটায় ঢুকল দখলকরা জাহাজের ক্যাপ্টেন বোল্টন, দ্বিতীয় মেট টিবেট, ডাক্তার ক্রোক আর এ্যালজারনন নামে এক যুবক।

বন্দীরা সবাই খাঁচায় ঢুকলে শ্মিৎস বড়াই করে বলতে লাগল, চমৎকার হলো! একটি ফরাসী মেয়ে, এক জার্মান বিশ্বাসঘাতক, এক ওলন্দাজ কুকুর, সাতটা ইংরেজ শুয়োর আর তার সঙ্গে আছে আমার বাঁদর, সিংহ, বাঘ আর হাতি—বার্লিনে এই সব নিয়ে গেলে এক দারুন উত্তেজনার সৃষ্টি হবে।

যে খাঁচাটায় কর্নেল উইলিয়ম সিসিল লে, তার স্ত্রী পেনিলোপ লে আর ভাইঝি প্যাট্রিসিয়া ছিল সেই খাঁচাটা ছিল টারজনদের খাঁচাটার ঠিক পাশে।

পেনিলোপ লে টারজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাইঝিকে বলল, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! লোকটা প্রায় উলঙ্গ।

প্যাট্রিসিয়া বলল, লোকটা কিন্তু দেখতে খুব সুন্দর কাকিমা।

পেনিলোপ লে বলল, ওই মেয়েটা কি ওর স্ত্রী? তাকিও না লোকটার দিকে। মেয়েটাকে দেখে মনে হচ্ছে বাজে মেয়ে।

প্যাট্রিসিয়া বলল, আমাদের মতই হয়ত জোর করে খাঁচাটায় ভরে রাখা হয়েছে।

শ্মিৎস এবার চীৎকার করে বলতে লাগল, এবার এই সব জন্তুদের খাবার দেওয়া হবে। যাদের ডিউটি নেই তারা এখানে দেখাশোনা করতে পার।

কয়েকজন নাবিক ও লস্কর খাবার ও জল নিয়ে এল বন্দীদের জন্য।

খাবারগুলো ছিল পরিমাণে কম এবং বাজে। টারজনকে একখণ্ড কাঁচা মাংস দেওয়া হলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টারজনের গলা থেকে বেরিয়ে আসা সিংহের গর্জনের মত একটা শব্দ শুনতে পেয়ে পেনিলোপ বলে উঠল আশ্চর্য হয়ে, দেখ, দেখ, লোকটা কাঁচা মাংস খাচ্ছে আর সিংহের মত গর্জন করছে।

প্যাট্রিসিয়া বলল, আমার ত দেখতে ভালই লাগছে।

টারজন জেনেত্তের মুখপানে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

জেনেত্তে তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি ইংরেজিও বোঝ? আমি ওদের নিয়ে কিছু মজা করব?

টারজন বলল, তোমার যা খুশি করো।

ওরা দুজনে ফরাসী ভাষায় চুপি চুপি কথা বলছিল। জেনেত্তে হাসিমুখে টারজনকে জিজ্ঞাসা করল, ক্যাপ্টেনের মাংসটা তোমার ভাল লাগছে খেতে?

টারজন বলল, গত সপ্তায় সুইডেনের লোকটার মত নয়।

তার কথা শুনতে পেয়ে পেনিলোপ বলল, আমার নুনের শিশিটা দাও। শুঁকব।

পাশের খাঁচা থেকে এ্যালজারনন নামে যুবকটি বলল, কি হলো কর্নেল?

কর্নেল বলল, এই শয়তানটা কোন এক ক্যাপ্টেনের মাংস খাচ্ছে।

এ্যালজারনন বলল, তাই নাকি ?

টারজন তখনো তার দাঁত দিয়ে মাংসখণ্ডটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছিল।

প্যাট্রিসিয়া বলল, ভুল করছ, ওরা আমাদের বোকা বানিয়ে মজা করছে। আজকের সভ্য জগতে কেউ চাইলেও তাকে মানুষের মাংস খেতে দেওয়া হয় ? দেখছ না মেয়েটি হাসছে।

নিচের তলার ডেক থেকে আসা একটা সিংহের গর্জন শুনতে পেয়ে পেনিলোপ তার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, ও কিসের শব্দ উইলিয়ম ?

সিংহ, বাঘ, হায়েনা, হাতি, বানর প্রভৃতি নিচের তলার খোলে রাখা জন্তু জানোয়ারগুলো ক্ষুধার্ত হয়ে গর্জন করছিল।

মিসেস লে অধৈর্য হয়ে বলল, ওদের গর্জন এখনি থামাও উইলিয়ম।

এমন সময় নাবিকরা পশুদের খাবার দিতে তারা চুপ করে গেল।

রাত্রিতে মেঘে মেঘে আকাশটা কালো হয়ে উঠল। ক্রমে ঝড় উঠল।

একজন লস্কর এসে প্রতিটি খাঁচার দরজা খুলে এক বালতি করে জল দিয়ে গেল। কিন্তু টারজনের খাঁচার দরজা খুলল না। জলের বালতিও দেওয়া হলো না। শ্মিৎস ভয়ে টারজনের খাঁচার দরজা খুলতে নিষেধ করে দিয়েছিল। জলের বালতিটা খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা করে ঝাঁটা দিচ্ছিল লস্করটা। সেই ঝাঁটা দিয়ে খাঁচার বন্দীরা পরিষ্কার করে ফেলছিল খাঁচাগুলোকে।

টারজন প্রতিদিন লক্ষ্য করত রাতের একজন প্রহরী রোজ রাত চারটের সময় খাঁচার বন্দীদের পরিদর্শন করে যায়। সে তখন একাই আসে। তখন খাঁচা খোলা হত না। তবে শ্মিৎস তার নিরাপত্তার জন্য একটা পিস্তল দিয়েছিল তাকে।

সেদিন বিকালে একজন নাবিক খাঁচায় জল দিতে এলে কর্নেল লে তাকে পাঁচ পাউণ্ডের একটা নোট দিয়ে বলল, আমাদের দু তিনটে চেয়ার আর কম্বল এনে দিতে পার ?

নাবিকটা নোটটা হাতে নেওয়ার পর বলল, ওসব কিছু নেই।

কর্নেল তাকে জিজ্ঞাসা করল, এখন এ জাহাজের ক্যাপ্টেন কে ?

এখন এ জাহাজের ক্যাপ্টেন হচ্ছে শ্মিৎস সাহেব। আগে লার্সেল ছিল ক্যাপ্টেন। তিন চারদিন তাকে দেখতে পাইনি। মরল কি না জানি না।

এই বলে চলে গেল নাবিকটা।

পেনিলোপ লে আশ্চর্য হয়ে বলল, সেই লোকটাই তাহলে ক্যাপ্টেন ?

৬

রাত গভীর হলে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। ঝড়ের বেগ হয়ে উঠল প্রবল। ভয়ানকভাবে দুলতে লাগল সাইগন জাহাজটা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল আর বজ্রগর্জন শোনা যাচ্ছিল।

টারজন তার খাঁচার মধ্যে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে এই দুর্যোগটা দেখছিল। সে দেখল তাদেব পাশের খাঁচাটায় সেই ইংরেজ মেয়ে প্যাট্রিসিয়াও দাঁড়িয়ে আছে।

টারজন অপেক্ষা করছিল পরিদর্শনকারী সেই পাহারাদারটার জন্য। কিন্তু সে রাতে পাহারাদার এল না। জেনেত্তে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করছিল।

ইংরেজ মেয়েটিকে পায়চারি করতে দেখে টারজনের মনে হলো, সত্যিই কাজের। যে কোন অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে সাহসের সঙ্গে। মুখ বুজে সব দুঃখকষ্ট সহ্য করতে পারে।

টারজন বুঝতে পারল মেয়েটি সুযোগ আসার অপেক্ষায় আছে। সুযোগ এলেই সাহস আর বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কাজ করে যাবে সে।

টারজন প্যাট্রিসিয়ার খাঁচার কাছে এসে দেখল, মেয়েটি ঝড় বৃষ্টির বেগ ও জাহাজের দোলানিটাকে সহজভাবে মেনে নিচ্ছে।

রসিকতা করে প্যাট্রিসিয়া বলল, ক্যাপ্টেনের মাংস আপনার কেমন লাগল?

টারজন বলল, কিছুটা নোনা।

সুইডেনের মাংস বোধ হয় ভাল ছিল?

হ্যাঁ, অনেক ভাল। কালো মাংস।

আপনি আমাদের ভয় দেখাতে চাইছিলেন কেন?

আপনার কাকা ও কাকিমা আমাদের প্রতি যে সব শ্রদ্ধাজনক মন্তব্য করছিলেন তার জন্য।

মেয়েটি বলল, আমি তা জানি। তবে তাঁরা খুব বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কারণ এ ধরনের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তাঁদের জীবনে এই প্রথম। আমি তাঁদের জন্য খুবই চিন্তিত। তাঁরা বৃদ্ধ, এসব সহ্য করতে পারছেন না। শ্মিৎস আমাদের নিয়ে কি করতে চায়? এ বিষয়ে আপনার কি মনে হয়?

লোকটা পাগল। সে আমাদের বার্লিনে নিয়ে গিয়ে একটা প্রদর্শনী করতে চায়। তবে আমাদের একবার বার্লিনে নিয়ে যেতে পারলে আমরা ইংরেজ বলে আমাদের অন্তরীণ থাকতে হবে।

আপনি একজন ইংরেজ?

হ্যাঁ, আমাদের পিতামাতা দুজনেই ইংরেজ ছিলেন।

আমার নাম প্যাট্রিসিয়া লে বার্ডেল। আপনার নামটি জানতে পারি কি?

আমার নাম টারজন।

শুধু টারজন?

হ্যাঁ, শুধু টারজন। আর কিছু না।

আপনাকে কিভবে খাঁচায় ভরা হলো তা বলবেন কি মিস্টার টারজন?

মিস্টার না, শুধু টারজন। আবদুল্লা আবু নেজিম আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমাকে এই খাঁচায় এনে ভরে। সে আমাকে আফ্রিকার এক সর্দারের সহাযতায ধবে। আবদুল্লা আমাকে ক্রাউজ নামে একটা লোকের কাছে বিক্রি করে। ক্রাউজ আমেরিকায় বিক্রি করার জন্য কিছু জন্তু জানোয়ার সংগ্রহ করে। আমার খাঁচার পাশে একটা খাঁচায় বন্দী আছে ক্রাউজ। স্মিৎস একদিন ক্রাউজের এই জাহাজের দ্বিতীয় মেট ছিল। সে ক্রাউজের জাহাজ দখল করার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ও তার জন্তু জানোয়ারগুলো সব তার দখলে আসে। ক্রাউজও এখন তার হাতে বন্দী।

তবে সমুদ্রের অবস্থা যদি আরো খারাপ হয় তাহলে সে আমাদের বেশীদিন আটকে রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।

প্রচণ্ড ঝড়ে ও তুফানে জাহাজটা তখন দুলছিল ভীষণভাবে।

টারজন বলল, তবে মনে হয় সাইগন জাহাজটা ঝড় তুফান সব কাটিয়ে উঠতে পারবে। আর একবার আমরা এইরকম ঝড়ের কবলে পড়েছিলাম। তবে অবশ্য তখন লার্সেল ক্যাপ্টেন ছিল আর হান্স ডু গ্রোত্তে ছিল প্রথম মেট। এখন স্মিৎস হলো হর্তাকর্তা।

হঠাৎ একবার বিদ্যুৎ চমকাতে চকিত আলোয় প্যাট্রিসিয়া দেখল, জাহাজটা একদিকে কাৎ হয়ে যেতে তার কাকীমার ভারী দেহটা খাঁচার রেলিংএ জোর ধাক্কা খেল।

প্যাট্রিসিয়া তার কাকিমা মিসেস লেকে বলল, তোমার কি খুব লেগেছে কাকিমা?

মিসেস লে বলল, আমার দেহের হাড়গোড় সব ভেঙে গেছে। তোমার কাকার মনোবাসনা পূর্ণ হলো। আমি এইজন্যই এই অভিযানে আসতে বাধা দিয়েছিলাম। সমুদ্রের তলায় কি আছে তা জেনে আমাদের কি হবে? আর হয়ত লণ্ডনে ফিরে যেতেই পারব না। জাহাজ গেল। এখন জীবন নিয়ে টানাটানি।

কর্ণেল চুপ করে রইল।

রাত্রি শেষ হলো অবশেষে। কিন্তু ঝড়ের বেগ কমল না। মাঝে মাঝে এক একটা ঢেউ এসে জাহাজের ডেকটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছিল। যারা খাঁচার

ভিতর বন্দী ছিল তারা সবাই ভিজে গেল।

মিসেস লে অভিযোগ করলেন তার স্বামীর কাছে তিনি নাকি তিনবার ডুবে গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, উইলিয়ম, খবরের কাগজে কোন দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী পড়লেই তোমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। সেদিন আর্কতারাদের অভিযানের কাহিনীটা খবরের কাগজে না পড়লে আমরা বাড়িতে নিরাপদে এখন বসে থাকতাম। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সজ্জিত কতকগুলো ভয়ঙ্কর প্রাণীর কথা পড়ে তুমিও তা ধরতে আস।

প্যাট্রিসিয়া বলল, আমার কাকাকে ভুল বুঝো না কাকিমা। কাকা কিছু খ্যাতি অর্জনের জন্যই এই অভিযানে আসেন।

সেদিন বন্দীদের কেউ খাবার দিয়ে গেল না। ডেকের নিচে ক্ষুধার্ত পশুগুলো গর্জন করতে লাগল। দুর্যোগের তৃতীয় দিনের বিকালের দিকে দুজন চীনা নাবিক বন্দীদের কিছু খাবার দিয়ে গেল। খাবার বলতে ছিল ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে বিস্কুট। ক্ষুধাত বন্দীরা তাই ক্ষুধিত নেকড়ের মত গোগ্রাসে খেতে লাগল।

মিসেস লেকে একেবারে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে তাঁর স্বামী ও ভাইঝি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। তিনি কোন অভিযোগ করছেন না দেখে তারা ভাবল সত্যি সত্যিই হয়ত কোন গোলমাল হয়েছে তাঁর শরীরে।

সেদিন রাত নটার সময় হঠাৎ ঝড়টা থেমে গেল। জেনেত্তে বলল, এটা কুলক্ষণ।

টারজন বলল. আবহাওয়ার অবস্থাটা আবার খারাপ হবে:

জেনেত্তে বলল, কিকরে আরো খারাপ হবে আমি ত বুঝতে পারছি না।

অপেক্ষা করুন, দেখতে পাবেন।

টারজন ধৈর্য ধরে তার শিকারের প্রতীক্ষা করতে লাগল।

সমুদ্র তখনো উত্তাল থাকলেও সাইগন ঠিক এগিয়ে যেতে লাগল। স্মিৎস একবার ডেকের উপর খাঁচাগুলোর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, জন্তুগুলো সব কেমন আছে ?

হ্যান্স তাকে বলল, মেয়েদের এখানে এইভাবে রাখলে তারা মারা যাবে। খাঁচা থেকে বার করে তাদের একটা কেবিনে নিয়ে গিয়ে রাখছ না কেন ? ডেকের তলাতে থাকলেও এই ঝড়ের কবল থেকে অন্ততঃ রক্ষা পাবে তারা।

স্মিৎস বলল, তুমি যদি আবার এই ধরনের অভিযোগ করো তাহলে তোমাদের সবাইকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেব। তোমাদের বিনা ভাড়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জাহাজে করে, খাবার দেওয়া হচ্ছে, আলাদা করে রাখা হয়েছে, তিন দিন ধরে বিনা খরচে স্নান করতে পাচ্ছ। আবার কি চাও ?

কর্ণেল লে বললেন, কিন্তু আমার স্ত্রীকে এই ফাঁকা জায়গায় রাখলে সে

মারা যাবে।

স্মিৎস বলল, তাকে মরতে দাও। সে মারা গেলে আমার জন্তুদের ও এই বন্য লোকটার জন্য কিছু কাঁচা মাংস পাওয়া যাবে অন্ততঃ।

এই বলে সে উপরে চলে গেল।

মিসেস কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কর্ণেল লে অভিশাপ দিতে লাগলেন ভাগ্যকে। এদিকে টারজন যার জন্য অপেক্ষা করছিল সে এসে গেল অবশেষে। অশোকা নামে এক লস্কর খাঁচাগুলো পরিদর্শন করতে এল। ইংরেজ সাহেবদের রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সে নিযুক্ত আছে বলে গর্ববোধ করছিল সে।

অশোকা ডেকের উপর এলে জাহাজের আলোয় তাকে দেখতে পেল টারজন।

অশোকা যখন খাঁচাগুলোর সামনে দিয়ে চলে গেল টারজন তখন খাঁচার ছুটো রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। জেনেত্তেও তার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বুঝতে পারল কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটবে।

জেনেত্তে দেখল টারজন খাঁচার রেলিং ছুটোর উপর তার গায়ের সব শক্তি প্রয়োগ করছে। তার পেশীগুলো ফুলে উঠছে। দেখল খাঁচার রেলিং ছুটো বেঁকে একটা ফাঁক হয়ে গেল।

টারজন বেরিয়ে পড়ল খাঁচা থেকে।

অশোকা যখন শেষ খাঁচাটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল তখন তার পিছন থেকে কে এসে তার গলাটা টিপে ধরল। তার বন্দুকটা ছিনিয়ে নিল।

জেনেত্তে দেখল কি ভয়ঙ্কর শক্তি দিয়ে খাঁচার রেলিং বাঁকিয়ে বেরিয়ে এল, কিভাবে লস্করটাকে ঘায়েল করে তার কাছ থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিল।

তা দেখে সেও খাঁচার সেই ফাঁক দিয়ে ছুহাতে ছুটো পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে এল।

অশোকা চীৎকার করার চেষ্টা করলে টারজন তাকে বলল, চেঁচালে মেরে ফেলব।

টারজন পিছন ফিরে দেখল জেনেত্তে তার পিছু পিছু আসছে। সে তখন অশোকার কাছ থেকে খাঁচাগুলোর চাবির গোছাটা নিয়ে জেনেত্তের হাতে দিল। দিয়ে বলল, সব খাঁচার দরজাগুলো খুলে দাও।

টারজন নিচু গলায় বন্দীদের বলল, তোমরা আমার সঙ্গে চলে এস। শুধু কর্নেল আর মেয়েরা থাকবে।

মিসেস লে ঝড়টা থামার সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রায় ঢলে পড়েছিল। এমন সময় টারজনকে খাঁচার বাইরে দেখেই চীৎকার উঠল, বন্য লোকটা খাঁচা ভেঙে পালিয়ে এসেছে।

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, থাম পেনিলোপ। ও আমাদের মুক্ত করবে খাঁচা থেকে।

টারজন মিসেস লে-কে বলল, আপনারাও আসতে পারেন। তবে আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত মেয়েরা এখানে থাকলেই ভাল হয়।

এই বলে সে জেনেত্তেকে সঙ্গে নিয়ে ক্রাউজদের খাঁচাটার সামনে গিয়ে হ্যান্সকে বলল, তুমি বেরিয়ে এস। ক্রাউজ এখন থাক।

তারপর অশোকাকে খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে জেনেত্তেকে বলল, খাঁচাটায় চাবি দিয়ে দাও। একটা পিস্তল আমাকে দিয়ে একটা পিস্তল রেখে দাও। যদি এরা চেঁচায় তাহলে গুলি করবে ওদের। পারবে ত?

জেনেত্তে বলল, আমি জবু সিংকে গুলি করেছিলাম।

নাইয়াদ জাহাজ থেকে আসা লোকগুলোকে পিছন ফিরে দেখে চিনতে পারল। অশোকার কাছ থেকে উদ্ধার করা পিস্তলটা হ্যান্স ভ গ্রোত্তেকে দিল টারজন। তারপর জেনেত্তেকে বলল, দখল করা নাইয়াদ জাহাজের দ্বিতীয় মেট টিবেটকে একটা পিস্তল দিতে বল।

টারজন টিবেটকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে এস। হ্যান্স জাহাজ চালাবে।

এর পর সে অন্যান্য লোকদের বলল, তোমরা যে যা পার যা হোক একটা করে অস্ত্র তুলে নিয়ে আমার সঙ্গে এস। কারণ লড়াই হবেই।

ঝড়টা আবার নতুন করে এল। সাইগন জাহাজটা আবার দুলতে লাগল আগের মত। টারজন তার দলবল নিয়ে মই বেয়ে ব্রিজের উপর উঠল। সেখানে লস্কর চাঁদ চাকা ধরে ছিল আর স্মিংস পাহারা দিচ্ছিল।

টারজনকে দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে চাঁদকে সাবধান করে দিয়ে বন্দুকের ঘোড়াটা টিপে দিল। গুলিটা ছাদে লাগল। টারজন তার বন্দুকটা আর টিবেট চাঁদের বন্দুকটা ছিনিয়ে নিল।

এর পর স্মিংস আর চাঁদকে টারজন একটা খালি খাঁচার কাছে এনে তার চাবি খুলে দিতে বলল জেনেত্তেকে। তারপর বন্দী স্মিংস আর চাঁদকে তার মধ্যে ঢুকতে বলল।

এমন সময় ঝড়ের গর্জনকে ছাপিয়ে একটা গুলির শব্দ নিচের থেকে কানে এল টারজনের। সে তখন সেই শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গেল। সে মই বেয়ে তাড়াতাড়ি নিচেতে নামতেই আরো দুটো গুলির শব্দ শুনতে পেল। সেই সঙ্গে শুনতে পেল কয়েকজন মানুষের আর্ত চীৎকার।

ঘটনাস্থলে গিয়ে টারজন দেখল কয়েকজন সশস্ত্র লস্কর তার লোকদের আক্রমণ করেছিল। কিন্তু কোন ক্ষতি করতে পারেনি। একজন লস্করই আহত হয়েছে এবং সে যন্ত্রণায় চীৎকার করছিল। এছাড়া উভয় পক্ষেরই

কোন ক্ষতি হয়নি।

টারজন দেখল তিনচারজন লস্কর পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। টারজন দুটো পিস্তল হাতে তাদের পিছন দিকে গিয়ে বলল, পিস্তলগুলো ফেলে দাও। তা না হলে গুলি করব।

মুখ ঘুরিয়ে টারজনের দুহাতে দুটো পিস্তল দেখে দুজন লস্কর তাদের পিস্তল দুটো ফেলে দিল। কিন্তু তৃতীয় জন গুলি করল। টারজন গুলি করল সঙ্গে সঙ্গে। লস্করটা মুখ থুবড়ে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

এর পর হ্যান্স দ্য গ্রোত্তে স্মিৎসের কেবিন থেকে নাইয়াদ জাহাজ থেকে যে সব পিস্তল, রাইফেল, গুলি-বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র দখল করা হয়েছিল সেগুলো উদ্ধার করে নিয়ে এল।

উবানোভিচ ও অন্যান্য লস্করেরা কোন বাধা দিল না। প্রতিপক্ষদের সকলকে নিরস্ত্র করা হল। যার কাছে যা কিছু ছিল সব কেড়ে নেওয়া হলো। সাইগনের চীনা নাবিকরা ও নাইয়াদ জাহাজের নাবিকরা কোন বাধা না দিয়ে খুশি হয়ে চলে এল টারজনের দলে। আধপাগলা স্মিৎসের অধীনে তারা আর কাজ করতে চাইছিল না।

জাহাজটাকে সম্পূর্ণরূপে দখল করার পর টারজন একটা সেলুনের মধ্যে সবাইকে ডাকল। পেনিলোপ লের মন থেকে অবশ্য তার প্রতি ভয়টা যায়নি তখনো। তখনো তার মনে হচ্ছিল টারজন লোকটা বন্য যে ক্যাপ্টেন ও সুইডেনের একটি লোকের মাংস খেয়েছে এবং পরে একে একে তাদের সকলকে খাবে। অন্যেরা সবাই অবশ্য টারজনের সাহস ও বুদ্ধির প্রশংসা করতে লাগল।

টারজন দখলকরা নাইয়াদ জাহাজের ক্যাপ্টেন বোল্টনকে বলল, তুমি এই জাহাজে ক্যাপ্টেন হবে। হ্যান্স দ্য গ্রোত্তে হবে তোমার প্রথম মেট আর টিবেট হবে দ্বিতীয় মেট। হ্যান্স বলেছে এ জাহাজে দুটো কেবিন আছে। একটাতে থাকবে কর্নেল আর তার স্ত্রী আর অন্যটাতে থাকবে প্যাট্রিসিয়া আর জেনেত্তে। আগে এই কেবিনে মেটরা থাকত।

মিসেস লে রেগে গেলেন। তিনি চুপি চুপি তাঁর স্বামীকে বললেন, লোকটা আমাদের হুকুম করছে। আমি একটা বন্য লোকের হুকুমের ধার ধারি না। উইলিয়ম, তুমি জাহাজের ক্যাপ্টেন হতে পার না?

প্যাট্রিসিয়া তার কাকিকে বোঝাল, ঐ বন্য লোকটির কাছে আমরা আমাদের মুক্তির জন্য ঋণী। ও কিভাবে লোহার খাঁচার রেলিংগুলোকে বাঁকিয়ে দেয় যদি তা একবার দেখতে!

মিসেস লে তবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, লোকটাকে কি কেউ একটা পায়জামা ধার দিতে পারে না।

কর্নেল বললেন, আমি একটা দিতে পারি। কিন্তু আমার তা হলে আর

বাড়তি কিছু থাকবে না।

মিসেস তখন ধমকে উঠলেন, খুব হয়েছে, পাগলামি করো না।

টারজন এবার হান্স ভ গ্রোত্তের কাছে গিয়ে সব কথা বলল। হান্স তখন বলল, আমার পরিবর্তে বোল্টনকে ক্যাপ্টেন করে ভালই করেছ। এ বিষয়ে আমার বেশী অভিজ্ঞতা নেই। বোল্টন 'রিয়াল নেভি'তে আগে কাজ করত। মানুষ হিসাবেও সে ভাল। উবানোভিচের খবর কি?

আমি তাকে ডেকে পাঠিয়েছি। এখনি এসে পড়বে।

গ্রোত্তে বলল, লোকটা কোন পক্ষেই নেই। ও সবার বিপক্ষে। লোকটা হাড়ে হাড়ে কমিউনিস্ট। এই যে এসে গেছে।

উবানোভিচকে দেখে রাগান্বিত আর সন্দিগ্ধ মনে হলো। সে রুষ্ট হয়ে বলল, তোমরা এখানে সব দাঁড়িয়ে কি করছ? স্মিৎস কোথায়?

টারজন বলল, যদি তুমি আমাদের কথা না শোন তাহলে সে যেখানে আছে সেখানে তোমাকেও নিয়ে যাওয়া হবে।

সে কোথায়?

সে আছে ক্রাউজের সঙ্গে একই খাঁচাতে। যাই হোক, বিদ্রোহের সঙ্গে তোমার কোন যোগাযোগ ছিল কি না তা আমি জানি না তা জানতে চাই না। এখন তুমি যদি জাহাজের এঞ্জিনীয়ার হিসাবে আগের মত কাজ করে যেতে চাও তাহলে কেউ কোন প্রশ্ন করবে না।

উবানোভিচ বলল. ঠিক আছে; তাই হবে। পাগলা স্মিৎসের থেকে তুমি খুব একটা খারাপ লোক হবে না।

টারজন বলল, বোল্টন এখন এ জাহাজের ক্যাপ্টেন; তার কাছে বল যে তুমি এঞ্জিনীয়ার। আরবটা কোথায়? আমি তাকে কয়দিন দেখিনি।

উবানোভিচ বলল, সে সব সময় শরীরটাকে গরম রাখার জন্য এঞ্জিন ঘরে থাকে।

তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও।

এমন সময় তাদের পিছন থেকে একটা গুলির শব্দ এল। ডকের সামনের কাঁচের জানালাটা ভেঙ্গে গেল সেই গুলিটা লাগায়। তারা মুখ ঘুরিয়ে দেখল আবদুল্লা মইএর সবচেয়ে উপরের ধাপে একটা ধূমায়িত পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে।

৭

আবদুল্লা আবার একটা গুলি করল। কিন্তু জাহাজটা প্রবলভাবে দুলছিল বলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল তার গুলি। সঙ্গে সঙ্গে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজন।

টাল সামলাতে না পেরে মইএর উপর থেকে পিছন দিকের ডেকে চিৎ হয়ে পড়ে গেল আবদুল্লা। তার উপর টারজন পড়ে গেল।

ক্যাপ্টেন বোল্টন যে দুজন লোককে টারজনের কাছে পাঠিয়েছিল তারা এই ঘটনা দেখতে ছুটে গেল। দেখল টারজনের গায়ে কোন আঘাত লাগেনি। সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল। কিন্তু আবদুল্লা অচেতন হয়ে পড়ে আছে।

জেনেত্তের কাছ থেকে খাঁচার চাবি আনতে পাঠিয়ে দিল টারজন। তারপর যে খাঁচাতে ক্রাউজ আর স্মিৎস ছিল সেটা খুলতে বলে আবদুল্লার অচেতন দেহটাকে টানতে টানতে এনে সেই খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল।

ঝড়ের বেগ প্রচণ্ড হয়ে উঠল আবার। টারজন বুঝতে পারল নির্দিষ্ট পথ হতে অন্য দিকে সরে যাচ্ছে সাইগন। মাস্তুল ঝড়ে উড়ে গেছে।

তখন ভোর হয়ে আসছিল। বোল্টনের কথায় টারজন দূরে তাকিয়ে দেখল ঝড় আর স্রোতের আঘাতে মাস্তুলহারা সাইগন দুর্বার বেগে পাহাড়-ঘেরা এক দ্বীপের দিকে ভেসে চলেছে।

বোল্টন বলল, জাহাজটা জোরে গিয়ে ঐ সব পাহাড় প্রাচীরের গায়ে ধাক্কা লাগলে ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। আমরা কেউ বাঁচব না। তার থেকে এখন থেকে নৌকো নামিয়ে সবাইকে পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ডান দিকে একটা ফাঁক আছে খাড়ির মত। সেখান থেকে কূলে ওঠা সহজ হবে।

বোল্টন নৌকো নামানোর হুকুম দিতেই কয়েকজন লস্কর একটা নৌকো নামিয়ে তারা কূলের দিকে চলে গেল। হাল্ফ স্ত্র ত্রোত্তে বাধা দেবার সুযোগ পেল না। সে তখন অন্যান্য লস্করেরা নৌকো নামানের চেষ্টা করতেই তাদের বোঝাতে লাগল। বোল্টন ও টিবেট পিস্তল উঁচিয়ে তাদের সামনে দাঁড়াতেই তারা থেমে গেল।

বোল্টন বলল, যে আমাদের কথা মানবে না তাকেই গুলি করবে। এখন আমরা দেখব ওরা কোথায় কিভাবে গিয়ে কূলে ওঠে। তারপর নৌকো নামাব।

সাইগন অসহায়ভাবে পাহাড়প্রাচীর দিয়ে ঘেরা দ্বীপটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ওদিকে লস্করদের নৌকোটাও উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এগোতে লাগল। জাহাজের রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা সবাই দেখতে লাগল।

কর্ণেল লে বললেন, সাইগন যত এগিয়ে যাবে ততই নৌকো নামিয়ে আমাদের যাওয়া কঠিন হয়ে পড়বে।

প্যাট্রিসিয়া টারজনকে বলল, জাহাজটা গিয়ে ধাক্কা খাওয়ার আগেই নৌকো নামিয়ে আমাদের কূলে ওঠার চেষ্টা করা উচিত নয় কি। ধাক্কা

লাগলে আমরা একসঙ্গে সবাই মরব। নৌকোয় অন্ততঃ আমরা বাঁচার চেষ্টা করতে পারব।

টারজন বলল, ঝড় আর সমুদ্রের তুফান দুটোই শান্ত হয়ে আসছে। দ্বীপের কাছে সমুদ্র অনেক শান্ত। সেখানে গেলে নৌকো নামালে কূলে ওঠা সহজ হবে।

বোল্টন বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে ক্যাপ্টেন হিসাবে আমি একা জাহাজে থাকব। আমাদের সকলের জীবন যেখানে বিপন্ন তখন চারটে নৌকো নামিয়ে যাত্রীদের যেতে বলব।

কিন্তু সকলেই লস্করদের নৌকোটার কি হয় তা দেখার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠল। কেউ নৌকোয করে যাবার ঝুঁকি নিতে চাইল না।

ওরা দেখল লস্করদের নৌকোটা খাড়ির কাছে যেতে পারল না। দ্বীপটার কাছে ঢেউএর সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একসময় উল্টে গেল। লস্করেরা সাঁতার কাটতে কাটতে এগোতে লাগল।

জেনেত্তে বলে উঠল, ওরা আর সাঁতার কাটছে না। ঐ দেখ, দাঁড়িয়ে পড়েছে। জল ঠেলে হেঁটে যাচ্ছে।

বোল্টন বলল, এখানকার জল অগভীর।

ঝড় আর তুফানের বেগ কমে যাওয়ায় সাইগন ধীর গতিতে এগোচ্ছিল দ্বীপের পাহাড়ের দিকে। পাহাড়ে গিয়ে ধাক্কা লাগার আর দেরী নেই। তাই এবার নৌকো নামাবার হুকুম দেওয়া হলো। তিনটে নৌকো দেওয়া হলো মেয়েদের। বাকি নৌকোগুলো দেওয়া হলো তাদের যারা সাঁতার জানে না। কতকগুলো ভেলাও নামানো হলো।

নাবিকরা যখন নৌকো নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিল তখন ক্রাউজ চীৎকার করে উঠল খাঁচা থেকে, শোন গ্রোত্তে, তোমরা কি আমাদের ফেলে চলে যাবে? আমরা কি খাঁচার মধ্যে ইঁদুরের মত ডুবে মরব?

গ্রোত্তে টারজনের মুখপানে তাকাল। টারজন জেনেত্তের কাছ থেকে চাবি নিয়ে খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে বলল, তোমাদের ছেড়ে দিলাম। এর বেশী কিছু করতে পারব না। তোমরা তোমাদের জীবন রক্ষা করবে। তোমাদের আচরণ যেন ভাল হয়। তোমাদের হত্যা করার যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু করব না।

খাঁচা খুলে দিতে ক্রাউজ, স্মিংস আর আবদুল্লা বেরিয়ে এল রাগে গর্জন করতে করতে।

বোল্টন চীৎকার করে উঠল, নৌকো ও ভেলা সব ঠিক করে রাখ। এবার জাহাজে ধাক্কা লাগবে।

জাহাজের যাত্রীরা সবাই এক গভীর ভয় আর উদ্বেগের সঙ্গে শেষ মুহূর্তের

মত্ত অপেক্ষা করতে লাগল। কূলের কাছে পাহাড়গুলোর মাঝখানে হ্রদের মত একটা জলাশয় ছিল। সেই জায়গাটায় একবার গিয়ে পড়তে পারলে আর ভয় নেই, কারণ সেখানকার জল অগভীর। তার ওপারে জঙ্গল।

পাহাড়ের উপর সাইগন জাহাজটা সরাসরি ধাক্কা লাগল না। এক একটা বিশাল ঢেউ এসে জাহাজটাকে একবার পাহাড় থেকে দূরে নিয়ে যেতে থাকে, আবার পাহাড়ের কাছে টেনে আনতে থাকে।

মিসেস লে তার স্বামীকে বললেন, এই আমার শেষ দেখা তোমার সঙ্গে। আবার আমাদের স্বর্গে দেখা হবে। আমি অনেক অপরাধ করেছি তোমার কাছে। ক্ষমা করো।

তাকে ধমক দিয়ে কর্ণেল লে বললেন, চুপ করো, আমার দোষের জন্যই এমনি হলো, যাই হোক একটা কিছু উপায় হয়ে যাবে।

অবশেষে জাহাজটা একসময় পাহাড়ের কাছে এক জায়গায় আটকে গেল আপনা থেকে। আর কোন ঢেউএর আঘাত তাকে সরাতে পারল না। সেখান থেকে নৌকোয় করে কূলে উঠতে বেশী দূরে যেতে হবে না।

কিন্তু লাইফ বোট নিয়ে জাহাজের রেলিং থেকে ঝাঁপ দিতে হবে। মিসেস লে তা পারবে না।

মিসেস লে জাহাজের রেলিংএর ধার থেকে জলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি এখান থেকে ঝাঁপ দিতে পারব না। উইলিয়ম, তুমি যাও। আমার কথা ভাবতে হবে না। মৃত্যুর পর স্বর্গে আমাদের মিলন হবে আবার।

কর্ণেল তাঁকে ধমকে দিয়ে বললেন, বাজে কথা বলো না। যেমন করে হোক তোমাকে নামাব আমরা।

টারজন বলল, আমি আগে নিচে নেমে যাব। তোমরা একটা চেয়ারে বসিয়ে ওঁকে নামিয়ে দাও। আমি ধরে নিয়ে একটা ভেলার উপর চাপিয়ে দেব।

টারজন এবার বোল্টনকে বলল, আমি ওখানে গিয়ে দেখি জল কতটা। যাঁরা সাঁতার জানে না আমি তাদের কোন নৌকো বা ভেলায় চাপিয়ে দিয়ে কূলে উঠতে সাহায্য করব।

রেলিংএর উপর জলে ঝাঁপ দিল টারজন। সকলে জাহাজের উপর রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতে লাগল টারজনকে। টারজন প্রথমে ডুবে গিয়ে জলের উপর মুখ তুলে বলল, জল এখানে বেশ গভীর।

প্যাট্রিসিয়াও জলে ঝাঁপ দিয়ে টারজনের পাশে গিয়ে বলল, আমি সাঁতার জানি, আমি আপনাকে সাহায্য করব।

জেনেত্তেও ঝাঁপ দিল। কিন্তু সে সাঁতার জানত না। টারজন তাকে ধরে একটা নৌকোর উপর চাপিয়ে দিল।

মিসেস লেকে চেয়ারে বসিয়ে জালের দড়ি ধরে নামিয়ে দিতেই টারজন তাঁকে একটা ভেলার উপর চাপিয়ে দিল।

মিসেস লে তখনো বাধা দিচ্ছিলেন। তিনি টারজনকে চেয়ার থেকে নামার সময় প্রভুত্বের সঙ্গে বললেন, মনে রেখো ছোকরা, যদি কোন অঘটন ঘটে তাহলে হবে সেটা তোমার দোষে।

টারজন বলল, এখন কোন কথা না বলে চেয়ার থেকে নেমে আসুন।

মিসেস লে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঝুঁকতেই টারজন তুহাত বাড়িয়ে ধরে নিল তাঁকে। তারপর একটা ভেলার উপর চাপিয়ে দিল।

টারজন এবার ঝুলতে থাকা চেয়ারটাতে চেপে ডেকের উপর উঠে এল। তারপর বোল্টনকে বলল, এখন যাত্রীরা কূলে নিরাপদে পৌঁছে গেছে। এবার আমার জনা পনের লোকের দরকার। কারণ জন্তু জানোয়ারগুলোকে নামাতে হবে। ওদের জলে একবার নামিয়ে দিলে ওরা কূলে উঠে যাবে। তারপর জঙ্গলে চলে যাবে। আমি ওদের মুক্তি দিতে চাই।

কর্ণেল বললেন, ওদের অনেকেই হিংস্র এবং বিপজ্জনক।

টারজন বলল, তা হোক। আমার প্রথম জীবন আফ্রিকার জঙ্গলে ওদের মত হিংস্র জন্তুদের মাঝেই কেটেছে। আমি ওদের এখানে শুকিয়ে মরতে দিতে পারি না।

বোল্টন বলল, এসব ক্ষেত্রে ওদের মেরে ফেলা উচিত।

টারজন বলল, কেউ কখনো বিপদে পড়ে তার আত্মীয় বন্ধুকে মেরে ফেলতে পারে না। ওরা আমার বন্ধু।

বোল্টন বলল, ঠিক আছে। আমি আপনার সঙ্গে আছি।

এর পর অনেকেই এগিয়ে এল টারজনের সাহায্যে। হান্স, টিবেট, ক্রোচ, চীনা নাবিকরা আর নাইয়াদ জাহাজের অনেকেই এগিয়ে এল। বাকি সবাই জাহাজ থেকে নেমে কূলে উঠে গেছে।

টারজন প্রথমে ওরাং ওটাংদের ছেড়ে দিল। টারজন তাদের সঙ্গে তাদের ভাষায় কি সব কথা বলল, তারা ভয়ে টারজনকে জড়িয়ে ধরল। টারজন তাদের নামিয়ে দিল।

তারপর বড় বড় জন্তুর খাঁচাগুলো খুলে দেওয়া হলো। প্রথমে তিনটে পোষা ভারতীয় হাতিকে ছেড়ে দেওয়া হল। মাহুত একটা হাতির পিঠে চেপে রইল। হাতিটা সাঁতার কেটে কূলে গিয়ে পৌঁছলে তা দেখে বাকি হাতি-দুটোও তাই করল, তা দেখে আফ্রিকার বুনো হাতিগুলোও তাই করল।

এরপর বাঘ আর সিংহদের খাঁচাগুলো খুলে দেওয়া হল। বিপদ বুঝে তারাও নির্বিবাদে জল কেটে কূলে গিয়ে উঠল।

সকলে দেখতে লাগল। জন্তুগুলো ছাড়া পেয়ে কূলে উঠে জঙ্গল দেখতে

পেয়ে একে একে সেই জঙ্গলে চলে গেল।

বাকি রইল শুধু সাপগুলো। টারজন বলল, ওরা আমার চিরকালের শত্রু, ওরা মরে মরুক।

যাত্রীদের সকলকে কূলে নামিয়ে দিয়ে নাবিকরা খালি নৌকো আর ভেলাগুলো নিয়ে আবার জাহাজে ফিরে এল। বোল্টন তাই আদেশ দিয়েছিল।

হ্রদের ওপারে যে জঙ্গল শুরু হয়েছে তা ক্রমশ উঁচু হয়ে পাহাড়ের গা পর্যন্ত উঠে গেছে।

এরপর দুদিন ধরে জাহাজের মালপত্র সব নৌকোয় করে কূলে নিয়ে যাওয়া হলো। একদল লোক যখন মালপত্র নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছিল, অন্য একদল কূলের কাছে স্বচ্ছ জলের একটা নদী দেখে তার পারে জঙ্গলের মাঝে একটা জায়গা পরিষ্কার করতে লাগল স্থায়ীভাবে একটা শিবির গড়ে তোলার জন্য।

তৃতীয় দিন বিকালের দিকে যখন শিবির তৈরীর সব কাজ হয়ে গেল তখন সকলের অলক্ষ্যে পাহাড়ের মাথা থেকে একডজন লোক বেলাভূমিতে বসে থাকা একদল অচেনা বিদেশী লোকদের দেখতে লাগল। এই প্রথম তারা তাদের দ্বীপে বিদেশী মানুষ দেখল।

৮

পাহাড় থেকে যারা সাইগন জাহাজের বিপন্ন যাত্রীদের লক্ষ্য করছিল তারা ছিল সেই দ্বীপের আদিবাসী যোদ্ধা। তাদের কোমরে এক ধরনের লাল ছোট কাপড় জড়ানো ছিল, পায়ে ছিল চামড়ার চটি। মাথায় পালক, হাতে গয়না। তাদের সর্দার জালন দিনের বেশভূষা ছিল সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ। তাদের মুখগুলো ছিল বাদামি রঙের।

তাদের হাতে ছিল তীর ধনুক। প্রত্যেকের পিঠে ছিল দুটো করে তূণ। আর ছিল একটা বর্শা আর পাথর ছোঁড়ার গুলতি। এছাড়া ছিল একটি করে কাঠের তরোয়াল, বর্শা আর চামড়া দিয়ে মোড়া কাঠের ঢাল।

সেদিন দুপুরবেলায় জাহাজ থেকে আনা মানচিত্রটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল ক্যাপ্টেন বোল্টন। কিন্তু দেখল মানচিত্রে সমুদ্রের একশো মাইলের মধ্যে কোন দ্বীপের উল্লেখ নেই। দেখল তারা মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের এক জায়গায় আছে। একশো মাইলের মধ্যে কোন দ্বীপ নেই।

হান্স ভ গ্রোত্তে বলল, আমাদের দেখার বা গণনার মধ্যে কোন ভুল

নেই ত ?

বোল্টন বলল, এমন হতে পারে যে এই দ্বীপটা এখনো পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।

গ্রোত্তে বলল, যদি কোনদিন বাইরে থেকে জাহাজ না আসে তাহলে আমরাই হব এ দ্বীপের আবিষ্কারক।

বোল্টন বলল, তাহলে আইনতঃ এ দ্বীপের অধিকারী হব আমরাই। তুমি ঠিকই বলেছ।

কর্নেল আর তার স্ত্রীর জন্য শিবির দুটো বেশ আরামদায়ক করে গড়ে তুলেছিল টারজন।

দলের সবাইকে ডেকে টারজন বলতে লাগল, এই শিবিরে স্মিংস, ক্রাউজ, আবদুল্লা আর উবানোভিচকে থাকতে দেব না। ক্যাপ্টেন বোল্টন বলেছে, এ দ্বীপে হয়ত আমাদের সারাজীবন কাটাতে হবে। ওরা থাকলে আবার গোলমাল বাধাবে।

এর পর সে ক্রাউজ, আবদুল্লা, স্মিংস আর উবানোভিচকে বলল, তোমরা এখান থেকে উত্তর দিকে চলে যাও। এখান থেকে দশ মাইলের মধ্যে আসতে পাবে না তোমরা। এলে হত্যা করব আমি তোমাদের।

উবানোভিচ বলল, ঠিক আছে, আমরা যাব। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র ও খাবারের ভাগ নিয়ে যাব আমাদের সঙ্গে।

টারজন বলল, তোমরা জীবন নিয়ে যেতে পারছ এটাই যথেষ্ট।

কর্নেল বলল, তুমি ওদের এই অজানা দেশের জঙ্গলে খাদ্য ও অস্ত্রহীন অবস্থায় ছেড়ে দেবে ?

টারজন বলল, হ্যাঁ, তাই দেব। ওদের ভাগ্য ভাল যে এর থেকে খারাপ কিছু করিনি।

উবানোভিচ চীৎকার করে বলল, তা তুমি করতে পার না। তুমি কতকগুলো গরীব খেটে খাওয়া মানুষকে পদদলিত করে কতকগুলো ধনী পুঁজিপতিকে আরামে রাখবে। তোমরা ধনীদের তোষণ করে সুবিধা পেতে চাও। তোমরা সুবিধাবাদী তোষামোদকারী।

এ্যালজারনন বলল, একজন রুশ কমিউনিস্ট বক্তৃতা দিচ্ছে।

প্যাট্রিসিয়া বলল, হাইড পার্কে যেমন দেয়।

উবানোভিচ বলল, ধনী বুর্জোয়া যুবক একজন সৎ শ্রমিককে উপহাস করছে।

টারজন ধমক দিয়ে তাকে বলল, বেরিয়ে যাও বলছি।

আবদুল্লা উবানোভিচের জামার আস্তিন ধরে টানল। বলল, তুমিও আমাদের সঙ্গে এস। লোকটা শয়তান। সে আমাদের হত্যা করবে।

ক্রাউজ উত্তর দিকে চলে গেল। উবানোভিচকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ওরা। যেতে যেতে চীৎকার করে বলতে লাগল উবানোভিচ, আমি যাচ্ছি বটে, তবে আবার ফিরে আসব। ফিরে আসব সেইদিন যেদিন গরীব ক্রীতদাসরা বুঝতে পারবে আসলে সব কিছুর মালিক তারা, তুমি নও।

পেনিলোপ লে টারজনের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, ওর যাওয়াতে আমি খুশি।

শিবিরের চারদিকে প্রচুর নারকেল, কলাগাছ ও ফলের গাছ ছিল। হ্রদে ছিল প্রচুর মাছ। সুতরাং না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে না তাদের। টারজন অবশ্য মাংস চায়।

শিবির গড়ার কাজ শেষ হয়ে গেলে অস্ত্র তৈরীর কাজে মন দিল টারজন। একটা ছুরি আর দড়ি বেছে নিল সে। তারপর কাঠ থেকে তীর, ধনুক, তূণ ও বর্শা তৈরী করে নিল।

একদিন খুব সকালে অন্যরা ঘুম থেকে না উঠতেই তার অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল টারজন। নদীটার গতিপথ ধরে এগিয়ে চলল সে। কিন্তু নিচে অনেক ঘন ঝোপঝাড় থাকায় গাছের ডালে এগিয়ে চলল সে।

কিছুদূর এইভাবে যাবার পর টারজন দেখল দুটো ওরাং ওটাং তার পিছু পিছু আসছে। তারা ওর ভাষা বুঝত এবং শিবিরেই ছিল। টারজন তাদের বলল, গোলমাল করো না। টারজন শিকার করবে।

তারা তাই গাছে চড়ে ডালে ডালে বনের গভীরে চলে গেল।

পাহাড়ের ঢালু জায়গায় টারজন দেখল কয়েকটা হাতি গাছের ডালপালা খাচ্ছে। হাতিদের সঙ্গে সে কথা বলতেই তারা শুঁড় নেড়ে এবং গলায় এক ধরনের আওয়াজ করে অভ্যর্থনা জানাল তাকে। হাতিকে ট্যাণ্টর বলত টারজন। একটা হাতির গায়ে হাত বুলোতে সে টারজনকে শুঁড় দিয়ে তার পিঠে চাপিয়ে নিল।

টারজন তখন 'নালা নালা' বলে চীৎকার করতেই সে তাকে নামিয়ে দিল।

এরপর সে কিছুদূরে গিয়ে হাতিটাকে ডাকতেই সে উত্তর দিল।

পাহাড়টা তার সামনে খাড়া হয়ে উপরে উঠে গেছে। এক জায়গায় জলপ্রপাত দেখতে পেল।

ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় ঘন জঙ্গল আর কাছে জল দেখে টারজন বুঝল এটা শিকারের একটা ভাল জায়গা।

সকাল হতেই নাকে শুয়োরের গন্ধ পেল টারজন। এর পরই সে পেল আরো দুটো গন্ধ—একটা সিংহের আর একটা মানুষের।

টারজন বুঝল, যেহেতু মানুষ সংখ্যায় মাত্র একজন তখন নিশ্চয় সিংহটাই মানুষটাকে ধরার জন্য অনুসরণ করছে তাকে।

টারজন এবার গাছের উপর ডালে ডালে সেই গন্ধের সূত্র ধরে এগোতে লাগল।

এদিকে যে লোকটা একটা সিংহ ধরতে যাচ্ছিল সে হলো ঠাক চান। ঠাক চান সিংহ শিকার করতে আসেনি। জীবনে সে সিংহ দেখেনি কখনো। সে এসেছিল একটা শুয়োর শিকার করতে। কিন্তু শিকার করতে এসে হঠাৎ একটা সিংহকে দেখে ছুটে পালাতে থাকে সে।

চাক টুটুল জিউ নামে ঠাক চানের এক পূর্বপুরুষ জুকাতান থেকে এই দ্বীপে এসে চিচেন ইৎজা নামে এক নগর স্থাপন করে। তার আগে সমুদ্রের মধ্যে এই দ্বীপটা দেখে সে তার নাম দেয় উকজান বা উক্সমাল।

ঠাক চান শিকারে এসেছিল সেই চিচেন ইৎজা নগর থেকে।

সিংহটা দেখে ভয়ে পালাতে থাকে ঠাক চান। ক্ষুধিত সিংহটার গতির সঙ্গে পেরে ওঠেনি সে। তাই একটা ফাঁকা জায়গা দেখে সেখানে হতাশ হয়ে বসে পড়ে সে। দেবতাদের কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করতে করতে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকে।

সিংহটা তার কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বর্শাটা উঁচিয়ে বসে থাকে ঠাক চান। এক দুর্বল অসহায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করতে হয়ত লজ্জা পায় পশুরাজ।

এমন সময় ঠাক চানের মনে হলো তার প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে একজন দেবতা যেন নেমে এসেছে মর্ত্যে। নেমে এসেছে তার প্রাণ রক্ষা করার জন্য। দেখল দেবতার মত দেখতে গৌরবর্ণ এক নগ্ন মানুষ গাছ থেকে হঠাৎ সিংহটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সিংহটা মাটিতে পড়ে যেতেই তার গলাটা একটা হাত দিয়ে ধরে আর একটা হাতে ধরা ছুরিটা সিংহটার পাঁজরে বসিয়ে দিতে লাগল বারবার। সিংহটা কিছুতেই পেরে উঠল না। অবশেষে বারবার ছুরির আঘাতে লুটিয়ে পড়ল সিংহটা। বারকতক তার দেহটা কেঁপে উঠে হঠাৎ নিথর নিস্তব্ধ হয়ে গেল সে দেহটা।

সিংহটা মরে যেতেই লোকটা তার মৃতদেহের উপর একটা পা রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে এমন ভয়ঙ্করভাবে চীৎকার করে উঠল যা শুনে ভয় পেয়ে গেল ঠাক চান। লোকটা আসলে দেবতা না শয়তান তা বুঝতে পারল না। একই আশা আর ভয়ে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তার মনটা।

ঠাক চান অনেক দেবতার নাম জানত। একটু আগে সে যাকে সিংহটাকে বধ করতে দেখল তাকে কোন্ দেবতা বলবে তা বুঝতে পারল না সে। সে জানত হুইজ হক হচ্ছে তাদের পাহাড়ের দেবতা, চে হলো বনদেবতা, ইৎজামলা হলো আকাশের দেবতা। ইৎজামলা হলো আদিদেবতা হুনাব কুহুর পুত্র। আর হুল আহাউ হলো পাতাল প্রদেশ বা নরকের দেবতা যে নরকে পাপী মানুষেরা মৃত্যুর পর গিয়ে থাকে। এ ছাড়া আছে যুদ্ধের দেবতা আচুইকাক।

ঠাক চানের মনে হলো যে লোকটা একটু আগে সিংহটাকে মারল সে হলো নিশ্চয় বনদেবতা চে।

টারজনকে বনদেবতা ভেবে মধুর সম্ভাষণে কৃতজ্ঞতা জানাল তাকে। তার জীবন বাঁচাবার জন্য ধন্যবাদ দিল অকুণ্ঠ ভাষায়। কিন্তু তার উত্তরে টারজন যা বলল তার কিছুই বুঝতে পারল না সে। ভাবল দেবতারা হয়ত এই ভাষাতেই কথা বলে।

ঠাক চান টারজনের কথা বুঝতে না পারায় টারজন মাটির উপর একটা তীর দিয়ে একটা বনশুয়োরের ছবি আঁকল। তখন তা দেখে ঠাক চান তাকে অনুসরণ করতে বলল উৎসাহিত হয়ে।

টারজন ভাবল ঠাক চান যেখানে শুয়োর আছে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। এই ভেবে তার পিছু পিছু যেতে লাগল সে। পথে ওরাং ওটাং দুটোকে দেখতে পেল টারজন। দেখে তাদের ডাকল।

ঠাক চান ভয় পেয়ে একটা বর্শা ছুঁড়তে গেল তাদের লক্ষ্য করে। কিন্তু টারজন তার হাতটা ধরে ফেলল। ওরাং ওটাং দুটো টারজনের কাছে এলে টারজনের সঙ্গে তারা কথা বললে ঠাক চান ভাবল তারাও হয়ত দেবতা। বনদেবতা চে-র সহচর।

সে তখন ভাবল এই তিনজন দেবতাকে সে তাদের নগরে নিয়ে যাবে। তাক লাগিয়ে দেবে সকলকে। সে একা গিয়ে এই সব দেবতার কথা বললে বিশ্বাস করবে না কেউ।

এই ভেবে টারজনকে সঙ্গে করে সে চিচেন ইৎজা নগরের প্রান্তে এসে হাজির হলো। ঠাক চান হাত বাড়িয়ে নগরটাকে দেখিয়ে বলল, চিচেন ইৎজা।

নগরের বাইরের মাঠে অনেক নারী পুরুষ চাষের কাজ করছিল। নগরদ্বারে যোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছিল।

টারজন দেখল এক বিরাট প্রাচীর দিয়ে গোটা নগরটা ঘেরা। নগরের মাঝখানে আছে পিরামিডের মত একটা উঁচু মন্দির। নগরের মধ্যে অনেক বড় বড় বাড়ি আছে। বাড়িগুলোর নিচের দিকটা ঢাকা পড়ে গেছে প্রাচীরে। নগরের লোকগুলো ঠাক চানের মত বেঁটে খাটো আর বাদামী রঙের।

চাক টুটুল জিউ চারশো বছর আগে ফুকাতান থেকে এসে এই নগর গড়ে তোলে।

টারজনের নগ্ন ও দৈত্যাকার মূর্তির পানে তাকিয়ে সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। ঠাক চান নগরদ্বারের প্রহরীদের কাছে গিয়ে বনদেবতা চে হিসাবে টারজনের পরিচয় দিল। বলল, একটা বিরাট আকারের হিংস্র জন্তুর কবল থেকে এই দেবতা বাঁচিয়েছে তাকে।

কিছুদিন আগে পাহাড় থেকে যে একদল আদিবাসী সাইগন জাহাজের বিপন্ন যাত্রীদের দেখতে পায় সেই দলের সর্দার জালন দিনও নগরদ্বারের প্রহরীদের মধ্যে ছিল।

জালন দিন টারজনকে বলল, তুমি যদি বনদেবতা চে হও তাহলে তার প্রমাণ দাও। তাহলে আমাদের রাজা তোমাকে ভক্তি ও সম্মানের সঙ্গে বরণ করে নেবে।

ঠাক চান বলল, দেবতারা মানুষের ভাষা বুঝতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলে না।

ঠাক চানের কথায় আর টারজনের দেবতার মত চেহারাটা দেখে কিছুটা মুগ্ধ হলো জালন দিন। সে তাই তাদের সঙ্গে করে রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন মন্দিরে নিয়ে গেল তাদের।

সেখানে অনেক যোদ্ধা, পুরোহিত ও সর্দার ছিল। জালন দিন একজন পুরোহিতকে ঠাক চানের সব কথা বুঝিয়ে বলল।

টারজন যোদ্ধাদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে ভাবল এই নগরে প্রবেশ করা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। তাকে তারা ফাঁদে ফেলতে পারে এবং তার থেকে মুক্তি পাওয়া কঠিন হয়ে উঠতে পারে।

একজন সর্দার প্রধান পুরোহিত চান ইপ জিউকে খবর দিল। তাকে জানাল একজন লোক দাবি করছে সে বনদেবতা চে। সে মন্দিরে দেখা করতে এসেছে তার সঙ্গে।

অন্যান্য প্রধান পুরোহিতদের মত চান ইপও দেবতাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। দেবতাদের যত কিছু অস্তিত্ব সাধারণ মানুষদের কাছে সে অস্তিত্বে তার কোন প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া সে নিজেকেই দেবতার এক মূর্ত প্রতীক বলে ভাবত। নগর মধ্যে সে যে ক্ষমতা ভোগ করত তা তার এই বিশ্বাসকে বাড়িয়ে দেয়।

চান ইপ সর্দারকে বলল, যাও সেই শিকারী ঠাক চান আর তার সঙ্গীকে আমার সামনে নিয়ে এস।

এরপর প্রধান পুরোহিতের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো টারজনকে। ঠাক চানও তার সঙ্গে ছিল। প্রধান পুরোহিতের কাছে কয়েকজন যোদ্ধা আর সর্দার দাঁড়িয়ে ছিল।

প্রধান পুরোহিত চান ইপ প্রথমে টারজনের চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তাকে সম্মানের সঙ্গে সম্বোধন করল। কিন্তু সর্দার জালন দিন তাকে জানাল এই দেবতা কোন মর্ত্য মানবের সঙ্গে কথা বলেন না।

চান ইপ তাকে বলল, তুমি সমুদ্রের বেলাভূমিতে একদল বেদেশীকে দেখেছিলে। এ তাদেরই একজন নয় ত ?

সর্দার জালন দিন বলল, তা হতে পারে হুঁজুর।

চান ইপ বলল, এ যদি দেবতা হয় তাহলে তারাও সবাই দেবতা। কিন্তু তুমি বলেছিলে এক ভগ্ন জাহাজ কূলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল।

জালন দিন বলল, এ কথা সত্য।

প্রধান পুরোহিত বলল, তাহলে এরা সবাই মানুষ। কারণ দেবতা হলে তারা ঝড তুফানকে জয় করতে পারত। তাদের জাহাজ ভাঙ্গত না।

এ কথা খুব সত্য।

চান ইপ তখন বলল, তাহলে এই লোকটাকে দেবতার কাছে বলি দেওয়া হবে। একে নিয়ে যাও।

ঘটনার স্রোত এইভাবে প্রতিকূলে যাওয়ায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল ঠাক চান। তবু সে প্রতিবাদের স্বরে বলল, এঁর কাজ আপনি দেখেননি হুজুর। আপনি দেখেননি একটা জন্তু আমাকে গ্রাস করতে এলে ইনি তার পিঠের উপর লাফ দিয়ে পড়ে তাকে মেরে ফেলেন! দেবতা ছাড়া কোন মানুষ সে কাজ করতে পারে না। এঁর সঙ্গে আরো দুজন দেবতা ছিল। এই সব দেখলে আপনিও বুঝতে পারতেন ইনি নিশ্চয় বনদেবতা চে।

প্রধান পুরোহিত ঠাক চানকে বলল, তুমি কে ?

আমি শিকারী ঠাক চান।

তাহলে শিকারের কাজে মাথা ঘামাও গে। চলে যাও, তা না হলে তোমাকেও বলি দেওয়া হবে অথবা কূয়োর জলে ডুবিয়ে মারা হবে।

ঠাক চান কুকুরের মত ভয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

প্রধান পুরোহিতের কথা টারজন বুঝতে না পারলেও তার হাবভাব এবং ঠাক চানের চলে যাওয়ার অর্থ সে বুঝতে পেরেছিল।

চারদিকে তাকিয়ে টারজন বুঝতে পেরেছিল, মন্দিরের বাইরে একটা বাগান ছিল। তার ওপারে নগরপ্রাচীরের ওধারে শুরু হয়েছে গভীর বন।

টারজন দেখল সেখান থেকে নগর প্রাচীর খুব একটা দূরে নয়!

টারজন এবার প্রধান পুরোহিতকে ফেলে দিয়ে যোদ্ধাদের হাতগুলো সরিয়ে দিয়ে মন্দিরের পাঁচিলে উঠে লাফ দিয়ে বাগানে পড়ল। তারপর বাগান থেকে একটা বড় বাড়ির ছাদে উঠে ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নগরের রাজপথে পড়ল।

রাজপথে যে সব মানুষ ছিল তারা টারজনের নগ্নপ্রায় বাদামী রঙের চেহারাটা দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। নগরপ্রাচীরের দিকে লোকের ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন।

রাজপথের প্রান্তে ছিল নগরদ্বার। সে দ্বারে কয়েকজন প্রহরী পাহারা দিচ্ছিল। নগরদ্বারের ওপারেই ছিল বন। নগরদ্বারটা কোনরকমে পার হয়ে গেলেই মুক্ত হয়ে গেল টারজন। কিন্তু প্রহরীরা তাকে বাধা দিল।

টারজন তখন তাদের একজনকে ধরে তার দেহটা দিয়ে ঠেলে অন্যদের সরিয়ে পার হয়ে এগিয়ে যেতে থাকল। কিন্তু হঠাৎ পিছন থেকে একটা পাথরখণ্ড এসে সজোরে তার মাথার পিছন দিকে লাগতেই অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেল টারজন।

চেতনা ফিরে পেয়ে টারজন দেখল সে একটা ঘরে একটা কাঠের খাঁচার মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। ঘরের মধ্যে ছিল একটামাত্র জানালা। সেই জানালা দিয়ে অল্প কিছু আলো আসছিল বাইরে থেকে।

টারজন দেখল তার খাঁচার রেলিংগুলো কাঠের এবং সে চেষ্টা করলেই খাঁচা থেকে মুক্ত করতে পারে নিজেকে। কিন্তু খাঁচা থেকে মুক্ত হয়ে ঘর থেকে কি করে বেরোবে সেইটাই হলো সমস্যা। সে দেখল জানালাটা ঘরের অনেক উপরে, একেবারে ছাদের কাছে। ঘরের দরজাটা কাঠের। তার খিলটা বাইরে থেকে আটকানো। দুটো পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া আছে দরজার হুকটা।

খাঁচার দুটো কাঠের রেলিং খুলে খাঁচা থেকে বার হলো টারজন। একটি রেলিং হাতে লাঠির মত ধরে দরজার কাছে অপেক্ষা করতে লাগল।

বাইরে অনেক লোকের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিল। বুঝল নগরের অনেক লোক সমবেত হয়েছে সেখানে।

সহসা দরজা খুলে একজন যোদ্ধা ঘরের মধ্যে ঢুকতেই টারজন তাকে এমনভাবে মেরে ফেলল যে সে কোন শব্দ করতেই পারল না। খোলা দরজা দিয়ে মুখ বার করে সে দেখল বাইরে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। কতকগুলো জয়ঢাক রয়েছে একজায়গায়। তাদের কোন একটা উৎসব হচ্ছে।

এমন সময় টারজনের চোখ পড়ল সেই ঘরের দরজার বাইরে, একটা মেয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে আছে চারজন পুরোহিত। একজন

পুরোহিত একটা ছুরি ধরে আছে শায়িত মেয়েটির বুকের উপর। মেয়েটিকে তারা হয়ত বলি দেবে। তারই জন্য এই উৎসবের আয়োজন। সেই উৎসব দেখার জন্যই এত লোকের ভিড়।

যে পুরোহিতের হাতে ছুরি ছিল সে তার ছুরিটা মেয়েটির বুকে বসিয়ে দেবার জন্য হাতটা তুলতেই তার হাত থেকে ছুরিটা কেড়ে নিল টারজন। জীবনে অনেক মৃত্যু নিজের চোখে দেখেছে সে। সুতরাং মেয়েটির মৃত্যু এমন কিছু একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। মানবতার খাতিরে মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্যও নয়, পুরোহিতদের নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে না পেরেই ছুরিটা কেড়ে নিল সে।

তারপর সেই পুরোহিতটাকে দুহাতে ধরে তুলে অন্য দুজন পুরোহিতের উপর এমনভাবে ফেলে দিল যে তারা মন্দিরের মেঝের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। বাকি দুজনকে সে তার হাতের লাঠি দিয়ে মেরে ধরাশায়ী করে দিল।

সমবেত জনতা টারজনের কাণ্ড দেখে ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে গেল। তারা তাকে কোনরকম বাধা দিতে পারল না।

টারজন তখন বন্দিনী মেয়েটিকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে যে পথে এসেছিল সেই পথে নগরপ্রাচীরের দিকে এগিয়ে চলল।

ইৎজল চা নামে যে মেয়েটিকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিল সে নিজেকে মুক্ত করার কোন চেষ্টা করল না। টারজনকে কোন বাধা দিল না। সে ভাবল বনদেবতা চে তাকে উদ্ধার করে যখন বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন তাকে বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না। বনদেবতা কোথায় নিয়ে যাবে তাকে তা সে জানে না।

টারজন একবার পিছন ফিরে দেখল একদল লোক তাকে ধরার জন্য চীৎকার করতে করতে তার পিছু পিছু আসছে। তারা বেশ কিছুটা দূরে আছে। সাহস করে কেউ কাছে আসতে পারছেনা তারা।

পথের শেষে টারজন দেখল তার সামনে খাড়া উঁচু নগরপ্রাচীর। সেখানে বার হবার কোন দরজা নেই। সে একা হলে সে প্রাচীরের মাথায় উঠতে পারত। কিন্তু একটি মেয়েকে কাঁধে নিয়ে প্রাচীরে ওঠা সম্ভব নয়।

টারজন দেখল প্রাচীরের কাছে কতকগুলা ছোট বড় বাড়ি রয়েছে। সে প্রথমে একটা ছোট বাড়ির ছাদে উঠে সেখান থেকে আর একটা বড বাড়ির ছাদে উঠল। তারপর সেই বাড়ির ছাদ থেকে নগরপ্রাচীরে উঠে সেখান থেকে লাফ দিয়ে নগরের বাইরে গিয়ে পড়ল। সেখানে শ্রমিকদের কিছু কুঁড়ে ঘর ছিল। শ্রমিকরা কেউ কিছু বলল না তাকে।

ঘরগুলো পার হয়ে মাঠে গিয়ে পড়ল টারজন। মাঠের ওপারেই বন। অবাধে বনের ভিতরে চলে গেল টারজন।

১০

এদিকে সমুদ্রের ধারে বিপন্ন জাহাজযাত্রীদের শিবিরে শৃংখলা এসেছে। কর্নেল লে শিবিরের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় সামরিক কায়দায় শিবিরের জীবনযাত্রা পরিচালনা করতে শুরু করেছেন। নির্ধারিত সময়ে চলতে থাকে সব কাজকর্ম।

একজন বনের ফলমূল সংগ্রহ করতে যায়। একজন হ্রদে মাছ ধরতে যায়। আর একজন শিকার করতে যায় বনে। মেয়েরা শিবিরের কাজকর্ম করে।

টারজনের রহস্যময় অন্তর্ধান সম্বন্ধে প্রায়ই কথা হয় শিবিরে।

পেনিলোপ লে টারজনের সব উপকারের কথা ভুলে গিয়ে একদিন বলেন, লোকটা চলে যাওয়ায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। লোকটাকে চোখে দেখার পর থেকে ভয়ে ভয়ে ছিলাম।

তাঁর ভাইঝি প্যাট্রিসিয়া বলল, এমন কথা কি করে বলতে পারলে তুমি? আমার ত মনে হয় উনি এখানে থাকলে আমরা আরও নিরাপদ হতাম।

মিসেস লে বললেন, লোকটার মাথায় কখন কি খেয়াল হয় বলা যায় না। আমাদের কাউকে একদিন হয়ত সে মেরে ফেলতে পারত।

জেনেত্তে বলল, আমি দিনের পর দিন তার সঙ্গে এক খাঁচায় ভরা ছিলাম। সে আমার কোন ক্ষতি করেনি।

কিন্তু মিসেস লে মনে করতেন জেনেত্তে ভাল মেয়ে নয়, তাই তার কথায় কোন গুরুত্ব দিতেন না।

প্যাট্রিসিয়া বলল, যাবার আগে তিনি কিছু কাঠের অস্ত্র বানান। বনে জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে বাঘ বা সিংহের কবলে পড়েছেন।

মিসেস লে বললেন, ভাল হয়েছে। হিংস্র জন্তুগুলোকে জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়ার প্রতিফল পেতে হবে না? আমাদের যে এখনো খেয়ে ফেলেনি এটাই আশ্চর্যের কথা।

কর্নেল বললেন, লোকটা গেল গেল, কিন্তু কেন যে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে গেল না তা বুঝতে পারি না।

মিসেস লে আবার বললেন, মনে হয় লোকটা আধ পাগলা। বন্য লোকগুলো ঐরকমই হয়।

সেদিন বিকালের দিকে বোল্টন, ক্রোচ আর আলজি শিকারে বার হলো। তারা উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল একটা অস্পষ্ট পথের রেখা ধরে।

বোল্টন আগে আগে যাচ্ছিল। ওরা যাচ্ছিল কোন একটা শুয়োর মেরে

তার মাংস নিয়ে আসতে।

বোল্টন একসময় বলল, একটা বাঘ অথবা সিংহের পায়ের ছাপ। একটু আগে এই পথে গেছে।

এ্যালজারনন ও ক্রোচ ছাপটাকে পরীক্ষা করে দেখল। ক্রোচ বলল, এটা বাঘের পায়ের দাগ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আলজিও বলল, এটা বাঘের পায়ের দাগ।

বোল্টন বলল, আমার মতে ফিরে যাওয়া উচিত। বাঘটা দেখতে পেলেই আক্রমণ করবে আমাদের। আমাদের মধ্যে একজনকে খাবে।

ক্রোচ বলল. ঠিক বলেছ তুমি। চল, আমরা শিবিরে ফিরে যাই।

এমন সময় কিছু দূরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা শব্দ হলো। আলজি বলল, হা ভগবান! বাঘটা এসে পড়েছে।

এই বলেই সে তার বন্দুকটা ফেলে দিয়ে একটা গাছে উঠে পড়ল।

অন্য দুজনও বন্দুক ফেলে রেখে গাছে উঠল। তারা গাছে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে পড়ল সেই গাছের তলায়। ওরা গাছের উপরের ডালে উঠে পড়েছে।

বাঘটা গাছের উপর তিনটে মানুষকে দেখে গর্জন করতে লাগল।

ক্রোচ হাসতে লাগল। বোল্টন বলল, আমরা তিনটে বন্দুক দিয়েও কিছু করতে পারতাম না।

আলজি বলল, ভাগ্য ভাল যে গাছগুলো কাছে ছিল। আমরা বন্দুক থেকে গুলি করতে না করতেই ঝাঁপিয়ে পড়ত আমাদের উপর।

বাঘটা দুবার লাফ দিল ওদের লক্ষ্য করে। কিন্তু ওদের নাগাল না পেয়ে হতাশ হয়ে কিছু দূরে গিয়ে শুয়ে পড়ল এক জায়গায়।

ক্রোচ বলল, ও ত চিরকাল ওখানে শুয়ে থাকবে না?

বোল্টন বলল, আমি জানি ওদের ধৈর্য অসীম। আমি একজন লোকের কথা জানি সে বাঘের ভয়ে সারারাত গাছে উঠে বসে ছিল। ও ভাবছে আমরা গাছের ফল। পাকলে ঝরে পড়ব গাছ থেকে।

আলজি বলল, এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে থাকা যায় না। বন্দুকটা থাকলে ভাল হত।

ক্রোচ বলল, গাছের তলাতেই রয়েছে বন্দুকটা। নেমে গিয়ে নিয়ে এস না।

আলজি সঙ্গে সঙ্গে তার গায়ের জামাটা খুলে ছিঁড়ে লম্বা দড়ির মত করে তার শেষে একটা ফাঁস তৈরী করে সেটা বন্দুকের উপর নামিয়ে দিল। ফাঁসটা ঘোড়াটায় লেগে গেলে আলজি বন্দুকটা আস্তে আস্তে তুলতে লাগল। বন্দুকটা যখন প্রায় উঠে গিয়েছিল তখন বাঘটা তা দেখতে পেয়ে ছুটে এসে লাফ

দিল। একটুর জন্য আলজির পাটা ধরতে পারল না বাঘটা। সঙ্গে সঙ্গে সেটা ফেলে দিয়ে গাছের উপরডালে উঠে গেল।

আলজি বলল, একবার যদি বন্দুকটা তুলতে পারতাম তাহলে মজা দেখিয়ে দিতাম বাঘটাকে।

ক্রোচ বলল, লাভের মধ্যে তোমার শার্টটাও গেল। তোমার এঞ্জিনীয়ার হওয়া উচিত ছিল।

আলজি বলল, আমার মা চেয়েছিল ধর্ম ও চার্চের বিষয়ে পড়াশুনো করতে। আমার বাবা চেয়েছিল আমি রাষ্ট্রদূত হই। আমার কিন্তু কোন বিষয়েই পড়াশুনো করতে ভাল লাগত না। আমি শুধু টেনিস খেলতাম।

ক্রোচ হাসতে হাসতে বলল, তুমি তাতেও খারাপ।

বাঘটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে চলে গেল। সে যেখানে আগে শুয়ে ছিল সেইখানে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

আলজি বলল, মনে হচ্ছে বাঘটা আমাদের এখানে সারারাত আটকে রাখবে।

১১

এদিকে ক্রাউজ, স্মিৎস আর আবদুল্লা উবানোভিচকে সঙ্গে নিয়ে মাইল চারেক দূরে গিয়ে একটা নদীর ধারে শিবির স্থাপন করে। অল্প কিছু লস্কর ছিল তাদের সঙ্গে।

তাদের নিজেদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হত। তাদের মধ্যে মাত্র একটা বিষয় ছাড়া আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না। তারা সবাই টারজনকে ঘৃণা করত—এইটাই ছিল তাদের মিলের একমাত্র বিষয়বস্তু। টারজন তাদের কোন রসদ বা অস্ত্রশস্ত্র না দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে শিবির থেকে। এজন্য তারা সবাই ক্ষেপে উঠেছে টারজনের উপর।

উবানোভিচ তাদের পরামর্শ দিল, রাত্রিবেলায় লুকিয়ে গিয়ে আমরা ওদের শিবির থেকে অস্ত্রশস্ত্র চুরি করে আনবে।

স্মিৎস বলল, আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। উবানোভিচ, তুমি গিয়ে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে শিবিরের পাশ থেকে দেখে আসবে কোনখানে ওদের অস্ত্রশস্ত্র থাকে।

উবানোভিচ রেগে গিয়ে বলল, তুমি নিজে যাও না কেন? তুমি আমাকে হুকুম করার কে?

স্মিৎস বলল, আমি হচ্ছি এই শিবিরের অধিকর্তা।

স্মিৎস উঠে দাঁড়াতেই উবানোভিচ তার সামনে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, কি করবে আমায় ?

ক্রাউজ তখন বলল, নিজেদের মধ্যে লড়াই করে কোন লাভ হবে ? তার থেকে একজন লস্করকে পাঠাও না কেন।

স্মিৎস বলল, আমার হাতে একটা বন্দুক থাকলে নোংরা কমিউনিস্টটাকে দেখিয়ে দিতাম আমার কথা না শোনার ফল।

এর পর সে চুলড্রুপ নামে একজন লস্কর নাবিককে ডেকে বলল, তুমি লুকিয়ে সেই শিবিরে চলে যাও। সেখানে গিয়ে শিবিরের কাছ থেকে দেখে আসবে ওদের বন্দুক পিস্তল ও গুলি-বারুদ সব ঠিক কোথায় থাকে। দেখে এসে আমাদের বলবে।

চুলড্রুপ বলল, আমি যাব না। বনে বাঘ আছে।

স্মিৎস তার মুখে একটা ঘুষি মেরে বলল, যাবে না ? আমি তোমাকে উচিত শিক্ষা দেব।

ভয় পেয়ে গিয়ে চুলড্রুপ আর স্মিৎসের বিরোধিতা করার সাহস পেল না। সে শ্বেতাঙ্গদের সব সময় ভয় করে চলত। অবশেষে সে যেতে রাজী হলে স্মিৎস বলল, খবর না নিয়ে ফিরে আসবে না তুমি।

চুলড্রুপ চলে গেল।

এদিকে বোল্টনরা যে গাছের উপর উঠে বসে ছিল তার অদূরে এখনো ওৎ পেতে বসে ছিল বাঘটা।

আলজি বলল, এখনো ও ওখানে বসে বসে কি করছে ?

এমন সময় বাঘটা সহসা উঠে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে কি শুনতে লাগল।

বোল্টন বলল, ও হয়ত কারো পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে।

ক্রোচ বলল, ঐ দেখ চলে যাচ্ছে।

আলজি বলল, এই আমাদের সুযোগ। নেমে পড় গাছ থেকে।

বোল্টন বলল, এখন নয়। এখনো আমি দেখতে পাচ্ছি বাঘটাকে।

ক্রোচ বলল, ও হয়ত আমাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করছে।

জঙ্গলকে খুব ভয় করত চুলড্রুপ। তাই জঙ্গলের মধ্যে পথ হাঁটতে খুবই ভয় করছিল তার। কিন্তু খবর না নিয়ে ফিরতে পাবে না সে। স্মিৎসকে সবচেয়ে বেশী ভয় করত সে।

সহসা মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার। সে ভাবল শিবিরে গিয়ে টারজনকে স্মিৎসের পরিকল্পনার কথা বলে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে তাদের কাছেই থেকে যাবে। আর সে ফিরবে না।

ক্রোচ বলল, একটা লোক আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা চুলড্রপকে দেখতে পেয়ে তিনজনই চীৎকার করে তাকে বাঘটা থেকে সাবধান করে দিতে চাইল। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেল।

চুলড্রপ তাদের চীৎকার শুনে হতবুদ্ধি হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তেই বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

কিছুক্ষণ ধরে চুলড্রপের চীৎকার শোনা গেল। তারপর সব চুপ হয়ে গেল।

বোল্টন বলল, এইবার আমাদের সুযোগ। ও যতক্ষণ মৃতদেহটাকে খেতে থাকবে ততক্ষণ কেউ ওকে বিরক্ত না করলে আর কোন দিকে তাকাবে না।

এবার ওরা গাছ থেকে নীরবে নেমে রাইফেলগুলো তুলে নিয়ে শিবিরের দিকে চলে গেল।

শিবিরে গিয়ে ওরা দেখল সারাদিনের যত কাজ সব শেষ হয়ে গেছে। কাউকে দেবার মত আর কোন কাজ খুঁজে পাচ্ছেনা কর্নেল। হ্যান্স ভ গ্রোভে আর জেনেত্তে সমুদ্রের বেলাভূমিতে বসে কথা বলছিল দুজনে।

এমন সময় প্যাট্রিসিয়া চীৎকার করে উঠল, আলজি, তোমার শার্টটা কোথায়?

শিকার করে বাসায় ফিরেছে শিকারীর দল। তাদের কথা শোনার জন্য সবাই ঘিরে দাঁড়াল তাদের। শিকারীরা তাদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলে কর্নেল বললেন, আর জঙ্গলে শিকার করতে বার হওয়া চলবে না। আর কাউকে বাঘ বা সিংহের কবলে পড়তে হবে না। আমার মনে হয় হতভাগ্য টারজন কোন বাঘ বা সিংহের কবলে পড়েই প্রাণ হারিয়েছে

মিসেস লে বললেন, ঠিক হয়েছে। যারা মেয়েদের সামনে অমন করে নগ্ন হয়ে বেড়ায় তাদের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই।

কর্নেল বললেন, ভুলে যেও না:পেনিলোপ, সে না থাকলে আমাদের ভাগ্যে কি হত। ভুলে যেও না সে-ই তোমাকে সাইগন জাহাজ থেকে উদ্ধার করে।

মিসেস লে বললেন, আমি তা ভুলে যাবার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করছি।

১২

ইৎজল চাকে কাঁধে করে টারজন যখন বনের ভিতর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন সে তার অনুভূতির কথা নিজেই বুঝতে পারল না। চিচেন ইৎজা নগরে সে যদি ফিরে যায় তাহলে অবশ্যই বলি দেওয়া হবে দেবতাদের কাছে। এদিকে বনদেবতা চে তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাও জানে না সে তবে আর যাই হোক বনদেবতা কখনই বধ করবেন না তাকে।

বনের গভীরে ঢুকে চে এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল। সে একটা গাছে উঠে তার মুখ দিয়ে জোর গলায় এক বিকট চীৎকার করল। সেই চীৎকার সমগ্র বনভূমি জুড়ে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো। সেই চীৎকার শুনে দুটো কিম্ভূতকিমাকার জন্তু এসে বনদেবতা চে-র সঙ্গে মিলিত হলো। তারা অদ্ভুত ভাষায় কি সব কথা বলতে লাগল। ইৎজল চা ভাবল ওই দুটো জন্তুও দুটো দেবতা; বনদেবতার সহচর। তাদের ভাষা ইৎজল চা কিছু বুঝতে পারল না।

ইৎজল চাকে কাঁধে নিয়ে গাছের ডালে ডালে টারজন যখন যাচ্ছিল তখন টারজন এক সময় থামতে চা উপর থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা ফাঁকা জায়গায় একটা ভয়ঙ্কর জন্তু দাঁড়িয়ে আছে। সে বুঝল এই জন্তুর আক্রমণ থেকেই বনদেবতা চে বাঁচায় ঠাক চানকে।

ইৎজল চার মনে হলো তাদের নগরের লোকেরা ও পুরোহিতরা মিথ্যা সন্দেহ করে। তার উদ্ধারকর্তা সত্যিই দেবতা। এই দৃশ্য দেখলে তারা আশ্চর্য হয়ে যেত।

এবার টারজন চাকে বন থেকে এক পার্বত্যপথে নিয়ে নামিয়ে দিল। ইশারায় তাকে হাঁটতে বলল। এই সময় টারজনের দিকে ভাল করে তাকিয়ে চা দেখল, তার বনদেবতা চে কত সুন্দর। এই সব দেবতাদের সাহচর্য পেয়ে গর্ববোধ করতে লাগল সে। ধন্য মনে করল নিজেকে।

যেতে যেতে পথে এক জায়গায় দুদিকে খাড়াই পাহাড়ওয়ালা একটা খাদ দেখতে পেল ইৎজল চা। সে ভয়ে চোখ বন্ধ করল। টারজন তাকে আবার কাঁধে তুলে নিয়ে অবলীলাক্রমে পার হয়ে গেল খাদটা।

তারপর টারজন 'ট্যান্টর ট্যান্টর' বলে ডাকতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকার এক পুরুষ হাতি ডালপালা ভেঙে ছুটে এল। তার বিরাট চেহারা দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল ইৎজল চা।

চেতনা ফিরে পেয়ে চা দেখল তারা এক বিরাটকায় জন্তুর পিঠে চেপে আছে। তাদের দেশে এ জন্তু কখনো দেখেনি। বনদেবতা তার পিছনে বসে আছে তাকে ধরে। তার সঙ্গী দুজন অপদেবতা জন্তুটার পাশে পাশে পথ চলছে।

এইভাবে মাত্র দু এক ঘণ্টার মধ্যে জীবনে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা লাভ করল ইৎজল।

তখন বিকাল শেষ হয়ে আসছিল। শিবিরে রাতের খাবার রান্না করছিল লুম কিপ। লুম কিপ রান্নার কাজ করতে ভালবাসত। ইউরোপীয় সাহেবরা ভালবাসত তাকে।

প্যাট্রিসিয়া ও জেনেত্তে কয়েকজন লোকের সঙ্গে শিবিরের উঠোনে বসে

বোল্টনদের শিকারের গল্প করছিল। টারজনের কথাটা প্রথমে তুলল প্যাট্রিসিয়া। বলল, টারজনকে আর হয়ত কখনই দেখতে পাব না আমরা।

টারজনের কথাটা তখন সকলেই আলোচনা করতে লাগল। কর্ণেল তার ঘরের মধ্যে দাড়ি কামাচ্ছিলেন আর তাঁর স্ত্রী সেলাইএর কাজ করছিলেন। হঠাৎ বনের দিকে নজর পড়তেই কর্ণবিদারক এক চীৎকার করে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন তিনি। তখন সকলেই সচকিত হয়ে উঠল। কর্ণেল দাড়ি কামাতে কামাতে মুখে সাবান নিয়ে ছুটে এলেন ঘর থেকে।

প্যাট্রিসিয়া বলল, ঐ দেখ।

সকলে দেখল, বনের ভিতর থেকে এক বিরাট হাতি এগিয়ে আসছে তাদের শিবিরের দিকে। হাতির পিঠে ছিল টারজন। সে নগ্নপ্রায় একটি মেয়েকে ধরে ছিল। দুটো ওরাং ওটাং হাতিটার দুপাশে হেঁটে আসছিল।

হাতিটা শিবিরের সামনে থামতেই টারজন মেয়েটিকে ধরে নামাল হাতির পিঠ থেকে। তারপর তাকে ধরে শিবিরে নিয়ে এল।

ইৎজল চা ভাবল এরা সবাই দেবতা। তবে তার আর ভয় হলো না। কারণ এরা কেউ কোন ক্ষতি করেনি তার। বনদেবতা চে, তার দুই সহচর অপদেবতা, ঐ বিরাট জন্তুটা কেউ তার কোন ক্ষতি করেনি।

প্যাট্রিসিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল টারজনের মুখপানে।

শিবিরের সকলে বিস্ময়ে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে কেউ কোন কথা বলতে পারল না। কেউ অভ্যর্থনা জানাল না টারজনকে।

কর্ণেলের চেষ্টায় চোখ মেলে তাকালেন তাঁর স্ত্রী। তাকিয়েই বললেন, উইলিয়ম, ঐ লোকটাকে আর মেয়েটাকে তাড়িয়ে দাও এখনি শিবির থেকে। সেই সঙ্গে ঐ জন্তুটাকেও। মনে হয় লোকটা কোথা থেকে চুরি করে এনেছে মেয়েটাকে। ওদের পরনে কোন পোশাক নেই।

কর্ণেল তাঁর স্ত্রীকে বললেন, চুপ করো পেনিলোপ। তুমি বা আমি এই ঘটনার কিছুই জানি না।

মিসেস লে বললেন, ঠিক আছে, সব কিছু জান। ওদের সঙ্গে এক শিবিরে আমি থাকব না। প্যাট্রিসিয়াকেও থাকতে দেব না।

টারজন প্যাট্রিসিয়ার কাছে গিয়ে বলল, আমি আশা করি এই মেয়েটির তুমি দেখাশোনা করবে।

প্যাট্রিসিয়া প্রতিবাদের সুরে প্রশ্ন করল, আমি ?

হ্যাঁ তুমি।

কর্ণেল তখন টারজনকে বললেন, এ সবের মানে কি স্যার ?

টারজন বলল, আমাদের দক্ষিণে এক নগর আছে। নগরটা বেশ বড়। ওখানকার লোকেরা নরবলি দেয় ওদের দেবতার কাছে। এই মেয়েটিকে

ওরা বলি দিতে যাচ্ছিল। হঠাৎ আমি সেখানে গিয়ে পড়ি। আমি তখন ওকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। ও ফিরে গেলে ওকে ওরা বলি দেবে। তাই মেয়েটিকে রেখে দিতে হবে এখানে। আপনার ভাইঝি ওর দেখা-শোনা করতে না পারলে জেনেস্তে ওকে দেখবে।

প্যাট্রিসিয়া বলল, আমিই ওকে দেখব। কে বলল আমি তা পারব না।

মিসেস লে বলল, ওকে কিছু পোশাক দাও। দেখতে খুব খারাপ লাগছে।

টারজন মিসেস লের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার নোংরা মনটাকে পোশাক দিয়ে ঢাকা দরকার।

মিসেস লে হাঁ করে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

আলজি টারজনকে বলল, তোমাদের বয়ে আনার জন্য এই আফ্রিকার হাড্ডিটা কোথায় পেলে ?

টারজন তাকে বলল, তুমি তোমার বন্ধুদের সাহায্য কিকরে পাও ?

আমার ও ধরনের কোন বন্ধু নেই।

টারজন এবার কর্ণেলকে বলল, সম্ভাব্য আক্রমণের জন্য আমাদের সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। ঐ নগরে অনেক যোদ্ধা আছে। আমার মনে হয় ওরা মেয়েটির খোঁজ করতে করতে এই শিবিরে এসে পড়তে পারে। অবশ্য ওরা আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার জানে না। আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে সব সময়। যখন তখন শিকারে যাওয়া চলবে না।

কর্ণেল বলল, আমি হুকুম দিয়েছি, কেউ শিকারে যাবে না। ক্যাপ্টেন বোল্টন, ডক্টর ক্রোচ, আর মিস্টার এ্যালজারনন আজই তোমার ছেড়ে দেওয়া এক বাঘের কবলে পড়েছিল।

এর পর ছসপ্তা ধরে শিবিরের জীবনযাত্রা একভাবে চলতে লাগল। কোন বৈচিত্র্য দেখা গেল না। প্যাট্রিসিয়া ইংজল চাকে ইংরেজি শেখাতে লাগল। টারজনও ইৎজলের কাছ থেকে তাদের ভাষা শিখতে লাগল।

টারজন মাঝে মাঝে বনের মধ্যে শিকারে গিয়ে একটা করে বনশুয়োর শিকার করে আনত। সে ছাড়া অন্য কেউ শিকারে যেত না।

হয়ত নিরাপত্তার অভাববোধ করে টারজনের অনুপস্থিতিতে রেগে যেতেন মিসেস লে। তিনি তাঁর স্বামীকে বলতেন, তোমার হুকুম ও মানবে না কেন ? কেউ যখন যায় না ও-ই বা যাবে কেন ?

কর্ণেল বলেন, তা না হলে টাটকা শুয়োরের মাংসটা আসবে কোথা হতে ?

আমি পছন্দ করি না শুয়োরের মাংস। তাছাড়া শিবিরে কি চলছে দেখ। ঐ গ্রোভে আর ফরাসী মেয়েটা ঘনিষ্ঠ হয়ে মেলামেশা করছে। টারজন ঐ জংলী মেয়েটার সঙ্গে প্রায়ই কথা বলে।

কর্ণেল বলল, ওর ভাষা আমাদের শিখে নেওয়া উচিত। ওদের দেশের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ঘটলে ঐ ভাষা কাজে লাগবে।

মিসেস লে বললেন, তাছাড়া ওদের কোন পোশাক নেই। প্রায় নগ্ন হয়ে আছে। প্যাট্রিসিয়া ওদের দুজনের সঙ্গে প্রায়ই কথা বলে। এইসব নোংরামি বন্ধ করা উচিত।

কর্ণেল ভাবলেন, এখন শিবিরের অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। বোল্টন, আলজি, ক্রোচ, হান্স, টিবেট—এরা সব ঠিক আছে। কিন্তু নাবিকদের মনে অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে। তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলে টারজনই একমাত্র ভরসা। টারজনের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোন উপায় নেই তাঁর। অথচ তাঁর স্ত্রী সেটা বুঝবে না।

প্যাট্রিসিয়া একদিন টারজনকে জিজ্ঞাসা করল, ওদের ভাষা কেমন শিখছেন? ওদের সভ্যতাকে মায়া সভ্যতা বলে।

টারজন বলল, ইৎজল বলছে, আমি নাকি ওদের ভাষা অনেক শিখে গেছি। এখন তার সঙ্গে অনেক কিছু আলোচনা করতে পারি। সে আমাকে অনেক কথা বলেছে, কেন তারা ওকে বলি দিতে গিয়েছিল তা জানেন?

টারজন বলল, হয়ত কোন দেবতার কাছে বলি দিতে গিয়েছিল।

ওদের নগরের একটা লোক আপনাকে বনদেবতা চে বলে দাবি করেছিল। তাতে বনদেবতার অপমান হয়। তাই তারা ইৎজলকে বলি দিয়ে তুষ্ট করতে চেয়েছিল বনদেবতা চেকে। ওর বাবা স্বেচ্ছায় বলি দেবার জন্য ছেড়ে দিয়েছে ওকে। মেয়েটির অবশ্য ধারণা আপনিই হচ্ছেন বনদেবতা চে এবং আপনি নিজে আবির্ভূত হয়ে তাঁর বলির বস্তুকে জীবন্ত নিয়ে গেছেন।

প্যাট্রিসিয়া বলল, ইৎজল আরও বলেছে, এই দ্বীপটার নাম উক্সমান। কয়েকশো বছর আগে যুকাতান থেকে একদল লোক এসে এই নগর পত্তন করে।

ডক্টর ক্রোচ বলল, আপনার অভিজ্ঞতা আর ইৎজলের কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে মায়া সভ্যতার লোকেরা তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে শত শত বছর ধরে বহু যত্নের সঙ্গে রক্ষা করে আসছে। ওরা বড় রক্ষণশীল। ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারলে আমরা অনেক লাভবান হতাম।

প্যাট্রিসিয়া বলল, আমরা ত আর ফিরতেই পারব না, লাভবান হয়ে কি হবে?

ক্রোচ টারজনকে বলল, আপনি যে গ্রামটায় গিয়েছিলেন সেই গ্রামে ছাড়া এই দ্বীপে কি আর কোন গ্রাম বা নরবসতি নেই?

টারজন বলল, ইৎজল বলে উত্তর দিকে আর একটা গ্রাম আছে আদিবাসীদের। তারা নাকি মানুষ খায়। ইৎজলদের নগরের অধিবাসীদের

সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসীদের কোন যোগাযোগ বা মেলামেশা নেই। আমি অবশ্য তাদের দেখিনি বা তাদের সেখানে যাইনি।

প্যাট্রিসিয়া বলল, কি ভয়ঙ্কর জায়গায় আটকা পড়ে গেছি আমরা। একদিকে নরখাদক জংলী আর একদিকে আপনার ছেড়ে দেওয়া নরখাদক বাঘ সিংহ।

হান্স ভ গ্রোত্তে টারজনকে বলল, নাবিকদের কেউ কেউ আমাকে বলছে আমাদের সাইগন জাহাজটা আর একটা ঝড় এলেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। তাই এরা বলছে এটাকে ভেঙ্গে আমরা যদি একটা বড় নৌকো বানাই তাহলে তা সমুদ্রে ভাসিয়ে এই দ্বীপ থেকে মুক্তি পাবার একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি।

বোল্টন বলল, কিন্তু জাহাজের উপরে ত ওরা নৌকো তৈরী করতে পারবে না।

টারজন বলল, মাইল খানেক দূরে একটা ফাঁকা জায়গা আছে।

ক্রোচ বলল, কথাটা মন্দ নয়।

আলজি বলল, জাহাজের কাঠে না হলে আমাদের সামনে অনেক গাছ আছে। সেই সব গাছ থেকে অনেক ভাল কাঠ পাওয়া যাবে।

১৩

চুলড্রপ স্মিৎসদের শিবিরে ফিরে না আসায় আর একজন লস্করকে টারজনদের শিবিরে পাঠায় স্মিৎস। কিন্তু সেও ফিরে না আসায় তৃতীয় দিনে সে আরো দুজন লস্কর নাবিককে যেতে বলে।

স্মিৎসদের শিবির থেকে একটু দূরে নাবিকরা আর একটা শিবির খাড়া করেছিল। সেখানে প্রায় পনেরজন লস্কর ও নাবিক থাকত। তারা দিনকতকের মধ্যে কাঠ থেকে তীর, ধনুক, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র তৈরী করে।

দুজন লোক ফিরে না আসায় স্মিৎস যখন ওদের শিবিরে গিয়ে আবার দুজনকে যেতে বলে তখন বেঁকে বসে লস্করেরা। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দিল স্মিৎসকে তারা যাবে না। যদি যেতে হয় তুমি নিজে যাও।

পনেরজন সশস্ত্র বিক্ষুব্ধ লোক স্মিৎসের সামনে রুখে দাঁড়াল।

স্মিৎস বলল, এটা বিদ্রোহ।

লস্করেরা একযোগে বলল, চলে যাও এখান থেকে।

একজন লস্কর ধনুকে তীর জুড়ে তাকে লক্ষ্য করতেই রাগে গজগজ করতে করতে চলে গেল স্মিৎস।

তাদের শিবিরে গিয়ে সবাইকে এই কথা জানাল স্মিৎস। উবানোভিচ লস্করদের বিদ্রোহের কথা শুনে উৎসাহিত হয়ে বলল, একেই বলে সর্বহারা শ্রমিকদের অভ্যুত্থান। আমি গিয়ে ওদের অভিনন্দন জানাব। আমিও ওদের দলে যাব। ওদের সঙ্গে আমি পুঁজিপতিদের শিবিরে গিয়ে তাদের সব অস্ত্র ও রসদ দখল করে আনব ।

কিন্তু উবানোভিচ বিদ্রোহী লস্করদের কাছে তাদের 'সহকর্মী' বলে অভিনন্দন জানালে তারা কিছুই বুঝল না। তারা কোন শ্বেতাঙ্গকেই বিশ্বাস করতে চায় না। তারা তাড়িয়ে দিল উবানোভিচকে।

উবানোভিচ ফিরে এসে স্মিৎসকে বলল, ওরা নোংরা বর্বর মাথামোটা।

রোজ রাত্রিতে লস্কররা তাদের শিবিরে আগুন জ্বেলে রাখত। টারজনের ভয়ে পাহারা দিত। কিন্তু তাদের চালনা করার মত কেউ না থাকায় কোন শৃংখলাবোধ ছিল না। একদিন রাতে তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ায় আগুনটা নিবে যায়। তখন একটা সিংহ এসে একজনকে ধরে নিয়ে যায়। তার কাতর চীৎকারে তারা জেগে ওঠে। কিন্তু তখন কোন উপায় নেই।

সে চীৎকার ক্রাউজরাও শুনতে পায় তাদের শিবির থেকে। তারা আগুন জ্বেলে রাখল।

পরদিন সারারাত একেবারেই আগুন জ্বালাল না লস্কররা। সে রাতেও একজনকে ধরে নিয়ে গেল সিংহ।

তা শুনে ক্রাউজ ভয় পেয়ে পরদিন একটা গাছের উপর খাঁচা বেঁধে তাতে শুল সে। তার দেখাদেখি তার সঙ্গীরাও তাই করল। লস্কররাও তাদের অনুসরণ করল। ফলে সে রাতে কোন শিবিরেই কোন লোক পেল না সিংহ।

অবশেষে ক্রাউজ একদিন বলল, আর এভাবে থাকা যাচ্ছে না। আমি টারজনদের শিবিরে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করব। আমি তার যে কোন শর্ত মেনে নিয়ে তাদের শিবিরে আশ্রয় চাইব।

স্মিৎস বলল, আমিও যাব। কিন্তু জঙ্গল দিয়ে যেতে পারব না।

ক্রাউজ বলল, জঙ্গল দিয়ে নয়, আমরা যাব সমুদ্রের ধার দিয়ে। বিপদ বুঝলে জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে যেতে পারব।

আবদুল্লা বলল, টারজনের থেকে সিংহের মনে দয়া আছে।

উবানোভিচ বলল, আমি তার কোন ক্ষতি করিনি। আমাকে নিশ্চয় থাকতে দেবে।

পরদিন সকালে তারা সবাই টারজনদের শিবিরের অভিমুখে যাত্রা শুরু করল।

চাঁদ নামে একটা লস্কর ক্রাউজ ও তার সঙ্গীদের সমুদ্রের ধার দিয়ে যেতে

দেখে অন্যান্য লস্করদের বলে, ওরা ঠিক সাইগনের শিবিরে যাচ্ছে। চল, আমরাও যাই।

এই কথা শুনে অন্যান্য লস্কররাও সেই পথ ধরে টারজনদের শিবিরের দিকে এগোতে লাগল।

এদিকে টারজন ভোরে উঠে শিবির সাইগনে তখন তার প্রাতরাশ খেতে শুরু করেছে। লুম কিপ প্রাতরাশ তৈরী করছিল।

এমন সময় প্যাট্রিসিয়া এসে টারজনকে জিজ্ঞাসা করল, এত সকালে উঠলেন ?

টারজন বলল, আমি রোজই খুব সকালে উঠি। তবে আজ একটা বিশেষ কারণ আছে। আজ আমি দ্বীপের অন্য দিকে কি আছে তা দেখতে যাব।

প্যাট্রিসিয়া টারজনের হাঁটুতে হাত রেখে বলল, আমিও যাব আপনার সঙ্গে।

ইৎজল চা তার ঘর থেকে তা দেখতে পেয়ে রেগে গেল।

টারজন বলল, যেভাবে আমি বনের মধ্যে যাওয়া আসা করি তুমি তা পারবে না প্যাট্রিসিয়া।

আমি ভারতবর্ষের বহু জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি।

কিন্তু বহু হিংস্র জন্তু আছে এখানকার জঙ্গলে।

তাহলে আপনি সামান্য একটা তীর ধনুক নিয়ে যাচ্ছেন কিকরে ? আমি একটা রাইফেল নিয়ে আপনার সঙ্গে যাব। আমার লক্ষ্য ভাল। ভারতে আমি গুলি করে অনেক বাঘ মেরেছি।

টারজন উঠে দাঁড়াল। প্যাট্রিসিয়াও দাঁড়িয়ে টারজনের কাঁধে হাত রেখে বলল, দয়া করে যাবেন না। আপনার জন্য ভয় হচ্ছে আমার।

কিন্তু টারজন কোন কথা না বলে মৃদু হেসে জঙ্গলের দিকে এগিয়ে গেল।

প্যাট্রিসিয়া তার ঘরে গিয়ে তখনি একটা রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর ছোট নদীটার ধার থেকে যেখানে টারজন যাত্রা শুরু করেছিল সেখান থেকে সেও যাত্রা শুরু করল।

তা দেখে ইৎজল চা ঠোঁট কামড়াতে লাগল। হতাশা আর রাগ ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

এদিকে চিচেন ইৎজা নগরের প্রধান পুরোহিত চান ইপ জিউ তখনো রেগে ছিল প্রচণ্ডভাবে। মন্দির থেকে বলি চুরি হয়ে গেছে। মন্দির অপবিত্র হয়ে গেছে। দেবতারা রেগে যাবেন।

রাজা চিৎ কং জিউ বলল, মনে হয় বনদেবতা চেই তোমার বলিকে নিয়ে গেছে।

প্রধান পুরোহিত বলল, না না বনদেবতা নয়, সেদিন জালন দিন সমুদ্রের ধারে যে সব বিদেশীদের দেখেছিল ও তাদেরই একজন। যদি তুমি দেবতাদের রুষ্ট করতে না চাও তাহলে একশোজন যোদ্ধা পাঠিয়ে বিদেশীদের শিবির থেকে ইৎজল চাকে ধরে আনাও। একশোজন যোদ্ধা পাঠালে অনেক বিদেশী মারা যাবে আর অনেক বিদেশীকে বন্দী করে আনা যাবে।

সেদিন সকালে টিবেট কয়েকজন নাবিককে নিয়ে সাইগন জাহাজ থেকে নৌকোর জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে যাচ্ছিল। তখন শিবিরের অন্য সকলে প্রাতরাশ খাবার জন্য একজায়গায় জড়ো হয়েছিল।

কর্ণেল বলল, প্যাট্রিসিয়া কোথায় ?

জেনেত্তে বলল, আমি উঠে তাকে দেখতে পাইনি। তার আগেই সে কোথায় চলে গেছে।

পেনিলোপ লে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন প্যাট্রিসিয়ার জন্য। তিনি বললেন, সেই বন্য লোকটাও চলে গেছে। আমি জানতাম এমনি সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটবে। উইলিয়ম, তুমি যদি লোকটাকে তখন শিবিরে থাকতে না দিতে তাহলে ভাল হত।

কর্ণেল বলল, কি হলো পেনিলোপ ?

হবে আর কি, বুনো লোকটা তাকে ফুঁসলে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

লুম কিপ বলল, টারজন আর প্যাট্রিসিয়া ঐ পথে গেছে।

আলজি বলল, প্যাট্রিসিয়া তাকে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

পেনিলোপ লে তাকে ধমক দিয়ে বলল, হাস্যাস্পদ কথা বলো না। লোকটাই তাকে ভুলিয়ে জঙ্গলে নিয়ে গেছে।

ইৎজল চা বলল, ওরা দুজনে আলাদা আলাদা সময়ে বেরিয়ে গিয়ে জঙ্গলে মিলিত হয়।

মিসেস লে বললেন, উইলিয়ম, তুমি বসে আছ ? এর একটা বিহিত করবে না ?

কর্ণেল বললেন, প্যাট্রিসিয়া যদি জঙ্গলে যায় তাহলে আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব টারজন যেন তার পাশে থাকে।

এদিকে প্যাট্রিসিয়া নদীটা ধরে উত্তর-পূর্ব দিকে এগোতে লাগল। তারপর নদী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে মোড় ঘুরলে সেও সেই দিকে যেতে লাগল। ভাবল টারজনও গাছের ডালে ডালে সেই দিক দিয়েই দ্বীপটার অন্য প্রান্তে এগিয়ে চলেছে।

প্যাট্রিসিয়া দেখল তার পাহাড়ী পথটা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে গেছে সামনে। সে ভাবল পাহাড়টায় উঠে দ্বীপটার কোথায় কি আছে ভাল করে দেখবে। কিন্তু পাহাড়টার মাথায় ওঠা খুবই শক্ত। তাছাড়া গাছপালায় তার দৃষ্টি

অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে। উঠতে উঠতে এক জায়গায় একটুখানি সমতল জায়গায় গিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল প্যাট্রিসিয়া।

এদিকে শিবিরে মিসেস লে ব্যস্ত হয়ে বললেন, তোমরা কয়েকজন বাইরে বেরিয়ে গিয়ে প্যাটের খোঁজ করো।

আলজি বলল, আমি যাব তার খোঁজ করতে।

এমন সময় ক্রোচ বলল, সমুদ্রের বেলাভূমি দিয়ে কারা আসছে?

বোল্টন বলল, এ যে দেখছি ক্রাউজ আর স্মিৎস আসছে। হঁ্যা হঁ্যা, তাদের সঙ্গে উবানোভিচ আর আবদুল্লাও আছে।

তারা সকলেই তখন খাপ থেকে পিস্তল বার করে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

তারা প্রাতরাশের টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। অবাঞ্ছিত আগন্তুকদের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল নীরবে।

ক্রাউজ শিবিরে তাদের সামনে এসে বলল, আমাদের কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই। দুজন লোককে আমরা আপনাদের এখানে পাঠিয়েছিলাম। তারা ফিরে যায়নি। আমাদের আরো দুজন লোককে সিংহতে ধরে নিয়ে গেছে। আপনার হৃদয় আছে কর্ণেল। আপনারা আমাদের এভাবে বিপদের মধ্যে ছেড়ে দেবেন না। দয়া করে আমাদের এই শিবিরে থাকতে দিন। আমরা আপনাদের সব আদেশ মেনে চলব।

কর্ণেল বলল, টারজন ফিরে এলে গোলমাল ও অশান্তির সৃষ্টি হবে।

মিসেস লে বললেন, তুমি ওদের থাকতে দাও উইলিয়ম। তুমিই হচ্ছ এই শিবিরের কর্তা।

ক্রোচ বলল, আমার মনে হয় ওদের তাড়িয়ে দেওয়া অমানুষিকতার কাজ হবে।

জেনেত্তে বলল, ওরাও আমাদের সঙ্গে অমানুষিক ব্যবহার করেছিল।

মিসেস লে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, তুমি তোমার নিজের কাজ করো মেয়ে। তোমার এবিষয়ে বলার কিছু নেই। কর্ণেল যা ভাল বোঝে করবে।

জেনেত্তে তখন গ্রোভের দিকে তাকাল। মিসেস লে তা দেখে বললেন, তোমাকে ঐ আদিবাসী মেয়েটাকে আর টারজনকে ভদ্রলোকদের সঙ্গে এই শিবিরে থাকতে দেওয়া উচিত হয়নি।

কর্ণেল বললেন, তুমি থাম পেনিলোপ। আমি কারো সাহায্য ছাড়াই ব্যাপারটার নিষ্পত্তি করতে পারব।

পেনিলোপ বললেন, আমার কথা হলো এখানে ওদের থাকতে দেবে।

ক্রোচ বলল, টারজন না আসা পর্যন্ত ওদের থাকতে দেওয়া হোক। কারণ ওরা আমাদের থেকে টারজনেরই বেশী শত্রু।

জেনেত্তে বলল, আমাদের সকলেরই শত্রু।

কর্ণেল বললেন, অন্ততঃ টারজন ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা এখানে থাক ক্রাউজ। আশা করি ভদ্র ব্যবহার করবে।

ক্রাউজ বলল, ধন্যবাদ কর্ণেল। আমরা সত্যিই ভাল ব্যবহার করব।

প্যাট্রিসিয়া কিছুক্ষণ সেখানে বসে থাকার পর আবার কিছুটা এগিয়ে চলল। সেখান থেকে সমুদ্র দেখা যাচ্ছিল। জায়গাটা বড শান্ত আর সুন্দর। কত ফুলের গাছে ফুল ফুটে আছে দেখল। হলুদ পাখাওয়ালা কত পাখি উড়ে বেড়াচ্ছিল। সে ভাবল শিবির থেকে মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবে এখানে।

হঠাৎ ঝোপ থেকে একটা বাঘ বেরিয়ে পড়ল তার সামনে। তার লেজটা নাড়ছিল।

তার কাঁধ হতে রাইফেলটা নামিয়ে পর পর দুবার গুলি করল প্যাট্রিসিয়া।

১৪

শিবিরে তখন জেনেত্তে বলছিল, আমার কিন্তু ভাল মনে হচ্ছে না। আমার ভয় করছে, বিশেষ করে ক্রাউজকে। ওদের থাকতে দেওয়া মোটেই উচিত হয়নি।

হ্যান্স ভ্য গ্রোস্তে বলল, আমি ওদের দিকে নজর রাখব।

জেনেত্তে বলল, আবার দেখ, সমুদ্রের বেলাভূমি দিয়ে সব লস্করেরা আসছে।

এমন সময় ওরা সকলে রাইফেলের দুটো গুলির শব্দ শুনতে পেল। কর্ণেল বলল, প্যাট্রিসিয়া নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে।

এই বলে তিনি ঘর থেকে তাঁর রাইফেলটা এনে যেদিক থেকে গুলির শব্দ এসেছিল সেইদিকে ছুটে গেলেন। তাঁর পিছু পিছু রাইফেল হাতে হ্যান্স, ক্রোচ, আলজি ও বোল্টনও ছুটে বেরিয়ে গেল।

ওরা সবাই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলে স্পিৎস ক্রাউজের দিকে ঘুরে বলল, কি মজা। এবার দেখা যাক অস্ত্রশস্ত্র কি আছে। এটা আমাদের সুবর্ণ সুযোগ।

মিসেস লে চীৎকার করে বললেন, কি করছ তোমরা? ওঘরে যেও না।

জেনেত্তে তার ঘরে ছুটে গিয়ে তার রাইফেলটা তুলে নিতেই স্পিৎস তাকে বাধা দিল।

ওরা চারজন তখন একে একে সব অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ বার করল। তারপর

পিস্তল উঁচিয়ে ওদের লস্করদের বাধ্য করল ওদের সব মালপত্র বয়ে নিয়ে যেতে। ক্রাউজ বলল, আমাদের যা যা দরকার সব পেয়ে গেছি।

এরপর সে জেনেত্তেকে বলল, এস প্রিয়তমা, আমাদের ছিঁড়ে যাওয়া সম্পর্কটা নতুন করে শুরু করা যাক।

জেনেত্তে সরে গিয়ে বলল, না, কখনই না।

জেনেত্তের হাত ধরে ক্রাউজ বলল, তোমার কিসে ভাল হবে সেটা তোমার বোঝা দরকার। গোলমাল করো না।

জেনেত্তে বাধা দিতে ক্রাউজ তাকে আঘাত করল। পেনিলোপ লে জেনেত্তেকে বললেন, চলে যাও তুমি ওদের সঙ্গে।

জেনেত্তেব সব বাধাদানকে অগ্রাহ্য করে তাকে টানতে টানতে নিয়ে গেল ক্রাউজ।

জালন দিন আর তার একশোজন যোদ্ধা যখন সমুদ্রতীরবর্তী বিদেশীদের শিবিরের দিকে এগিয়ে আসছিল বনের মধ্য দিয়ে তখন তারা দুটো রাইফেলের গুলির আওয়াজ পায়। কিন্তু বন্দুকের গুলি সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না তাদের, জালন দিন ছিল সবার আগে।

হঠাৎ একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়াল জালন দিন। দেখল তাদের সামনে কিছু দূরে বিরাট একটা জন্তু পড়ে রয়েছে। জন্তুটা মৃত আর তার উপর একটা পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অদ্ভুত একটা অস্ত্র হাতে এক আশ্চর্য পোশাকপরা এক নারীমূর্তি।

জালন বুদ্ধিমান। সে বুঝতে পারল যে শব্দটা একটু আগে সে শুনেছিল সে শব্দটা এসেছে ঐ মেয়েটির হাতের অস্ত্রটার মুখ থেকে। সে আরও ভাবল যে নারী এতবড আর ভয়ঙ্কর একট জন্তুকে মারতে পারে সে মানুষও মারতে পারবে। সে তাই সামনে না গিয়ে বনের আড়াল থেকে লুকিয়ে ঘিরে ফেলতে বলল সেই নারীকে।

তারপর একদিক থেকে জালন দিন তার তরোয়ালে একটা শব্দ করতে সেদিকে তাকাল প্যাট্রিসিয়া আর সঙ্গে সঙ্গে জালন দিনের দুজন যোদ্ধা গিয়ে তার পিছন থেকে এক টানে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল তার রাইফেলটা।

এরপর এক মুহূর্তে চারদিক থেকে একশোজন যোদ্ধা এসে ঘিরে ফেলল তাকে।

প্যাট্রিসিয়া তাদের দেখে তারা কারা তা বুঝতে পারল। সে শুধু টারজন-এর মুখ থেকে এই ধরনের লোকদের কথা শোনেনি সে প্রাচীন মায়া সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক বইও পড়েছে। তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু

জানে সে।

প্যাট্রিসিয়ার মনে হলো সহসা কে যেন তাকে শত শতাব্দীর আগেকার এক সুদূর অতীতের এক মৃত্যুপুরীতে বয়ে নিয়ে এসেছে তাকে। সে পুরীতে এই সব বেঁটেখাটো বাদামী রঙের লোকগুলো কিলবিল করছে। তাদের হাতে বন্দী হবার অর্থ সে বোঝে। সে জানে তার ভাগ্যে কি আছে। তবে তার একমাত্র আশা ভরসা টারজনের উপর। একমাত্র টারজনই তাকে মুক্ত করতে পারে।

ইৎজল চার কাছ থেকে শেখা মায়াদের ভাষায় ভাঙ্গা ভাঙ্গা ভাবে সে বলল, তোমরা আমাকে নিয়ে কি করবে?

জালন দিন বলল, সেটা আমাদের প্রধান পুরোহিত জিউ ঠিক করবে। আমি তোমাকে এখান থেকে সোজা আমাদের রাজার প্রাসাদে পাঠিয়ে দেব।

এই বলে সে তার চারজন যোদ্ধাকে চিচেন ইৎজা নগরে বন্দিনীকে বয়ে নিয়ে যেতে বলল।

প্যাট্রিসিয়াকে চারজন যোদ্ধা ধরে নিয়ে গেলে জালন দিন তার বাকি যোদ্ধাদের নিয়ে শিবির সাইগনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। জালন দিন খুশি হলো। যদিও সে ইৎজল চাকে ধরে নিয়ে যেতে পারল না, তবু সে অন্তত তার পরিবর্তে আর একজন বন্দিনীকে দেবতার উদ্দেশ্যে বলি দেবার জন্য পাঠিয়ে দিতে পেরেছে। এতে নিশ্চয় তাদের রাজা ও প্রধান পুরোহিত দুজনই সন্তুষ্ট হবে।

এদিকে কর্নেল লে ও তাঁর সঙ্গীরা যে পথে প্যাট্রিসিয়া নেমে এসেছিল পাহাড থেকে সেই পথে দ্রুতবেগে এগিয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ তারা মাথায় পালকের পোশাকপরা একদল আদিবাসী যোদ্ধার সম্মুখীন হলো।

আদিবাসী যোদ্ধারা তাদের দেখতে পেয়েই পাথর ছুঁড়তে লাগল চীৎকার করতে করতে।

কর্নেল তাঁর সঙ্গীদের বললেন, এমনভাবে গুলি করো যাতে গুলিগুলো ওদের মাথার উপর দিয়ে চলে যায়।

কিন্তু জালন দিন যখন দেখল ওদের অস্ত্রগুলো শুধু শব্দ করছে, আঘাত করতে পারছে না তখন সে তার যোদ্ধাদের আক্রমণ চালিয়ে যেতে বলল।

কর্নেল তখন হুকুম দিলেন, ওদের হত্যা করার জন্য গুলি করো। ওরা তরবারি নিয়ে আমাদের কাছে আসার আগেই ওদের থামিয়ে দিতে হবে।

ওদের রাইফেলগুলো গর্জে উঠল। একঝাঁক গুলি ছুটে গেল। তাতে চারজন যোদ্ধা মারা গেল।

জালন দিন তবু এগিয়ে যেতে থাকলেও তার যোদ্ধারা গুলির ভয়ে পালাতে লাগল। আহতদের তারা বয়ে নিয়ে গেল। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে

বিভিন্ন দিকে বনের মধ্য দিয়ে ছুটে পালাতে লাগল।

কর্নেলরা প্রথমে পথ হারিয়ে উল্টোদিকে যাচ্ছিল। তারপর কিছুটা ঘোরাঘুরি করার পর অবশেষে তারা সমুদ্রের বেলাভূমিতে তাদের শিবিরের কাছে এসে পড়ল।

তারা শিবিরের কাছে এলে টিবেট বিষণ্ণ মুখে এগিয়ে এসে একটা দুঃসংবাদ দিল।

কর্নেল বললেন, মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে। তাই না টিবেট ?

টিবেট বলল, বড়ই দুঃসংবাদ স্যার। আমি এইমাত্র শিবির থেকে আসছি। স্মিৎস আর তার বন্দীরা আমাদের শিবির থেকে সব অস্ত্রশস্ত্র এবং বেশ কিছু রসদ নিয়ে পালিয়ে গেছে।

কর্নেল বললেন, এক একটা আস্ত শয়তান।

টিবেট বলল, শুধু তাই নয়, ওরা জেনেত্তেকে ধরে নিয়ে গেছে।

হ্যান্স ভ গ্রোত্তের মুখখানা সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে টিবেটকে বলল, কোন্ পথে তারা গেছে টিবেট ?

সমুদ্রের তীর দিয়ে তাদের পুরনো শিবিরে বোধ হয়।

হ্যান্স মর্মাহত ও ক্রুদ্ধ হয়ে সেই পথে যেতে লাগল।

কর্নেল বললেন, কোথায় যাচ্ছ ?

হ্যান্স বলল, আমি তাদের ধরব।

কিন্তু তাদের হাতে এখন অনেক অস্ত্রশস্ত্র। তুমি একা কিছু করতে পারবে না। এখন আমাদের হাতে বাড়তি লোক নেই। শিবিরে মিসেস লে-কে একা রেখে আমরাও যেতে পারব না। কারণ ওরা যে কোন সময় আমাদের শিবির আক্রমণ করতে পারে।

গ্রোত্তে অনমনীয়ভাবে বলল, আমি যাবই।

তখন টিবেট বলল, আমিও যাব।

নাইয়াদ জাহাজের দুজন নাবিকও যেতে চাইল তাদের সঙ্গে। কর্নেল ওদের সাবধান করে দিলেন, খুব সাবধান। সামনের দিকে ওদের শিবিরে না গিয়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লুকিয়ে ওদের শিবিরে যাবে।

ওরা চারজন তখনি সমুদ্রের ধার দিয়ে যাত্রা শুরু করল।

১৫

আদিবাসীদের সঙ্গে কর্ণেলদের যখন যুদ্ধ হয় তখন রাইফেলের গুলির যে শব্দ হয় সেই শব্দ বনের মধ্যে শুনতে পেয়েছিল টারজন। সেই শব্দ লক্ষ্য

করে এগিয়ে আসতে থাকে সে। কিন্তু শব্দটা ঠিক কোন্ দিক থেকে আসছিল তা ধরতে না পেরে ভুল পথে গিয়ে পড়ে সে।

টারজন দেখল সে শিবির সাইগনের পরিবর্তে স্মিৎসদের শিবিরের কাছে এসে পড়েছে। সে অতি সাবধানে বনের ভিতর দিয়ে ওদের শিবিরের কাছে এসে পড়ল। দেখল স্মিৎসরা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে কোথা হতে ফিরল শিবিরে। তাদের সঙ্গে লস্কররা অনেক মালপত্র বয়ে নিয়ে এল। সে আরও দেখল ক্রাউজ জেনেভ্তেকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। সে তখন বুঝল স্মিৎসদের সঙ্গেই তার শিবিরের লোকদের যুদ্ধ হয়েছে এবং স্মিৎসরাই জয়ী হয়েছে। তবে কি তাদের শিবিরের সব লোক নিহত হয়েছে?

প্যাট্রিসিয়া কোথায়? ইৎজল চারই বা কি হলো? তবে মিসেস পেনিলোপ লের কথা একবারও মনে হলো না তার।

এদিকে উভয় সংকটে পড়লেন কর্নেল। এখন তাঁর হাতে মাত্র চারজন সশস্ত্র লোক। এই লোক দিয়ে শিবির রক্ষা করা সম্ভব নয়। মিসেস লে-কে একা ফেলে রেখে প্যাট্রিসিয়াকে খুঁজতে যাওয়া চলে না। আবার যারা আছে তাদের দুভাগে ভাগ করা যায় না। স্মিৎসরা অথবা আদিবাসী যোদ্ধারা আবার শিবির আক্রমণ করতে পারে। এ অবস্থায় প্যাট্রিসিয়ার খোঁজে চিচেন ইৎজা নগরেও যাওয়া সম্ভব নয়।

কর্নেল যখন এই সব ভাবছিলেন তখন প্যাট্রিসিয়াকে চারজন যোদ্ধা উক্সমাল দ্বীপের রাজা আর প্রধান পুরোহিতের সামনে হাজির করল।

যোদ্ধারা রাজাকে বলল, জালন দিন এই বিদেশিনী বন্দিনীকে পাঠিয়ে দিল। জালন দিন বাকি যোদ্ধাদের নিযে বিদেশীদেম শিবিরের দিকে এগিয়ে গেছে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে। আমরা শব্দ শুনতে পেয়েছি।

রাজা বলল, জালন দিন ভাল কাজই করেছে।

প্রধান পুরোহিত জিউ বলল, এই নারীকেই বলি দেওয়া হবে দেবতার কাছে।

এই বলে প্যাট্রিসিয়াকে সে খুঁটিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল। জীবনে এই প্রথম এক শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে দেখল সে। দেখল বন্দিনী খুবই সুন্দরী। তার মত মেয়েকে দেবতার কাছে বলি দেবার কোন অর্থ হয় না।

এদিকে রাজা বলল, এই মেয়েটিকে আমি আমার প্রাসাদে রেখে দেব কিছুকাল দাসী হিসাবে।

প্রধান পুরোহিত জিউ একথা শুনে রেগে গেল মনে মনে। সে তাদের রাজাকে চেনে। এইভাবে তাদের রাজা অনেক দেবতার বলিকে ছিনিয়ে নিয়ে দাসী করে রেখেছে। সে তাই বলল, দেবতা যাকে বলি হিসাবে বেছে নিয়েছেন তাকে রাজা দাসী হিসাবে রেখে দিলে রাজার উপর রেগে যাবেন

দেবতা।

রাজা বলল, আমার মনে হয় দেবতারা এখনি তাকে চান না।

ওদের কথাবার্তার সারমর্ম বুঝতে পারল প্যাট্রিসিয়া। বুঝতে পেরে বলল, একজন দেবতা আমাকে বলিরূপে আগেই বেছে নিয়েছেন। তোমরা আমার ক্ষতি করলে তিনি রেগে যাবেন।

বন্দিনী মায়াদের ভাষা বুঝতে পারায় আশ্চর্য হয়ে গেল রাজা। সে তার প্রধান পুরোহিত জিউকে বললে জিউ বলল, খুব একটা ভাল জানে না।

প্যাট্রিসিয়া বলল, দেবতারা সব ভাষা বুঝতে পারে, তবে মানুষদের ভাষা খুব কম ব্যবহার করে।

রাজা প্রধান পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করল, মেয়েটা কি কোন দেবী ?

প্যাট্রিসিয়া বলল, আমি বনদেবতা চের জীবনসঙ্গিনী। তিনি যখন এর আগে এই নগরে এসেছিলেন তখন তোমরা তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করায় তিনি রেগে আছেন তোমাদের উপর। তোমরা যদি বুদ্ধিমান হও তাহলে আমাকে পাঠিয়ে দাও তাঁর কাছে। যদি তা না করো তাহলে তিনি তোমাদের ধ্বংস করবেন।

রাজা মাথা চুলকাতে চুলকাতে জিউকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা ত দেবতাদের চেন। বনদেবতা চে কি চিচেন ইৎজাতে এসেছিল ? তোমরা কি সে দেবতাকে কাঠের খাঁচায় ভরে রেখেছিলে ? আর সেই দেবতাই বলির মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে যায় ?

প্রধান পুরোহিত জিউ বলল, না, সে ছিল একজন মানুষ।

তথাপি আমাদের তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ করা উচিত হবে না। মেয়েটাকে এখন কুমারীদের মন্দিরে রেখে দাও কিছুকালের জন্য।

এই বলে রাজা দুজন পুরোহিতকে ডেকে বন্দিনী প্যাট্রিসিয়াকে কুমারীদের মন্দিরে নিয়ে যেতে বলল, সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দিল, তার সঙ্গে যেন ভাল ব্যবহার করা হয়।

প্যাট্রিসিয়া কিছুটা খুশি হলো এই ব্যবস্থায়। সে ভাবল তার কথাগুলো প্রধান পুরোহিত বিশ্বাস না করলেও কিছুটা রেখাপাত করেছে রাজার মনে। যাই হোক কিছুদিনের জন্য অন্তত অব্যাহতি।

অব্যাহতি পেয়েছে সে। তাতে টারজন তাকে উদ্ধার করার কিছুটা সময় পাবে অন্ততঃ। রাজার প্রাসাদ থেকে তাকে যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন প্যাট্রিসিয়া দেখল লাভার পাথর দিয়ে গাঁথা পিরামিডের মত মন্দিরটার উপরতলায় কুমারীদের মন্দির। সেখানে আছে পঞ্চাশজন কুমারী আর তাদের দেখাশোনার জন্য আছে একজন প্রধানা পুরোহিত।

সে জানতে পারল এই সব কুমারীরা স্বেচ্ছায় মন্দিরে থেকে মন্দিরের

কাজকর্ম করে এবং দেবতাদের সেবা করে। তারা কখনো ইচ্ছা করলে মন্দিরের কাজ ছেড়ে দিয়ে বিয়ে করে ঘর-সংসার করতে পারে।

মন্দিরের জানালা দিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে প্যাট্রিসিয়া দেখল শহরটা গড়ে উঠেছে মন্দিরটার চারপাশে। শহরের চারদিকে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের ওপারে শ্রমিক ও ক্ষেতমজুরদের বসবাসের জন্য অনেক কুঁড়ে ঘর রয়েছে। তার ওপারে চাষের জমি। জমির ওপার থেকে জঙ্গল শুরু হয়েছে।

টারজন বনের ভিতর থেকে স্মিৎসদের শিবিরটার অবস্থা দেখতে লাগল। সে ভাবল চারজন সশস্ত্র লোকের সামনে যাওয়া ঠিক হবে না। এমনভাবে গোপনে কাজ করতে চায় সে যাতে জীবনের ঝুঁকি খুব কম নিতে হয়। তার হাতে শুধু তীর ধনুক ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো জেনেত্তেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া।

গাছপালার আড়ালে লুকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। ওরা আরো কাছে এলে এবং লস্কররা মালপত্র নামিয়ে রাখলে টারজন প্রস্তুত হলো তার তীর ধনুক নিয়ে।

সহসা টারজনের ধনুক থেকে একটা তীর ছুটে গিয়ে ক্রাউজের বুকে বিঁধল। তীরটা বুকে গাঁথা অবস্থাতেই সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়ে ক্রাউজ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে মরে গেল।

অন্য সকলে ভয় পেয়ে গেল। উবানোভিচ বলল, কি হলো ?

স্মিৎস বলল, ক্রাউজ মৃত। কেউ তীর মেরেছে বন থেকে।

আবতুল্লা বলল, টারজন ছাড়া আর কে ?

স্মিৎস বলল, কোথায় সে ?

টারজন বলল, এই যে এখানে আমি। আমার আরো অনেক তীর আছে। জেনেত্তে, তুমি সোজা আবার বনের ভিতরে চলে এস। কেউ তোমাকে বাধা দিতে এলে তার অবস্থা ক্রাউজের মত হবে।

জেনেত্তে তাড়াতাড়ি শিবির থেকে বনের ভিতরে চলে এল। তাকে বাধা দেবার জন্য কেউ হাত তুলল না।

স্মিৎস চীৎকার করতে লাগল, আমি তাকে দেখে নেব।

এই বলে সে রাইফেল তুলে টারজনের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে গুলি করল।

আবার একটা তীর গিয়ে স্মিৎসের বুকটাকে বিদ্ধ করল। সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বুকে হাত দিয়ে।

জেনেত্তে তার কাছে আসতেই গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ল টারজন। তাকে বলল, শিবিরের অবস্থা কি ?

জেনেত্তে যা যা ঘটেছিল সব বলল। টারজন তখন বলল, ওরা তাহলে

স্মিৎস আর তার সঙ্গীদের শিবিরে থাকতে দিয়েছিল। কর্ণেলের নির্বুদ্ধিতায় আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি।

জেনেত্তে বলল, দোষটা হচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর মহিলাটার।

টারজন বলল, এখন আমরা তাড়াতাড়ি শিবিরে ফিরে যাব।

এই বলে জেনেত্তেকে কাঁধে তুলে নিয়ে গাছের উপরে উঠে গাছে গাছে ডাল ধরে ধরে এগিয়ে চলল টারজন।

এদিকে বনের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে হ্যান্স আর টিবেট যখন স্মিৎসদের শিবিরের কাছে পৌছল তখন সে দেখল শিবিরের সামনে দুজন লোক মরে পড়ে আছে।

আবদুল্লা হ্যান্স আর টিবেটকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল থেকে গুলি চালাল। কিন্তু কোন গুলিই লাগল না।

হ্যান্স তখন হাঁটু গেড়ে বসে টিবেটকে বলল, তুমি উবানোভিচকে আর আমি আবদুল্লাকে মারব।

এই বলে তারা গুলি চালাতেই উবানোভিচ ও আবদুল্লা পড়ে গেল। লস্কররা এক জায়গায় ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে ছিল। তারা এই লড়াইয়ে কোন অংশগ্রহণ করেনি।

কিন্তু জেনেত্তেকে দেখা গেল না শিবিরে। হ্যান্স দেখল, ক্রাউজ, আবদুল্লা আর উবানোভিচ মরে গেছে। কিন্তু স্মিৎস তখনো যন্ত্রণায় ছটফট করছে। হ্যান্স তাকে বলল, জেনেত্তে কোথায়?

স্মিৎস কোনরকমে বলল, বন্য লোকটা তাকে নিয়ে গেছে। জাহান্নামে যাক সে।

হ্যান্স বলল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সে এখন নিরাপদ।

হ্যান্স আর টিবেটের সঙ্গে যে তিনজন নাবিক এসেছিল তারা সবাই মিলে অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিল। বাকি সব মালপত্র স্মিৎসদের লস্করদের শিবির সাইগনে নিয়ে যেতে বলল।

এইভাবে তারা শিবির সাইগনের দিকে রওনা হলো।

১৬

টারজন জেনেত্তেকে নিয়ে বন থেকে বেরিয়ে শিবিরের দিকে আসতেই পেনিলোপ লে বললেন, তাহলে প্যাট্রিসিয়া লোকটার সঙ্গে যায়নি।

আলজি বলল, এখন তাহলে আপনি বলবেন টারজন আর জেনেত্তে পরিকল্পনা করে জঙ্গলে গিয়ে মিলিত হয়েছিল।

মিসেস লে বললেন, যে লোক একটা আদিবাসী মেয়েকে নিয়ে কষ্টিনষ্টি করতে পারে সে সব পারে।

এদিকে শিবিরের অবস্থা দেখে বিরক্ত হয়ে উঠল টারজন। তার কথা মেনে চলা হয়নি।

টারজন বলল, শিবিরে ওদের ঢুকতে দেওয়া উচিত হয়নি।

কর্ণেল বললেন, দোষটা আমার। ওরা নিরস্ত্র, একটা নরখাদক সিংহ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাই মানবতার খাতিরে আমি ওদের থাকতে দিই।

জেনেত্তে বলল, সব দোষ ঐ মহিলার। ওঁকে বাধ্য করা হয়েছিল। এরই জন্য হ্যান্সের জীবন আজ বিপন্ন।

এমন সময় স্মিৎসদের শিবির থেকে গুলি বিনিময়ের আওয়াজ শোনা যেতে লাগল। জেনেত্তে চীৎকার করে মিসেস লেকে বলল, হ্যান্সের যদি কিছু ঘটে তাহলে তোমার রক্ত আমি দেখব।

টারজন বলল, যা হয়ে গেছে যেতে দাও। তা আর ফিরবে না। এখন প্যাট্রিসিয়াকে খুঁজে বার করতে হবে। তোমরা ঠিক জান আদিবাসীরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে তাদের নগরে ?

কর্ণেল বললেন, আমি দুটো গুলির শব্দ পেয়ে ছুটে যাই সেইদিকে। কিন্তু একশোজন আদিবাসী যোদ্ধা ঘিরে ফেলে আমাদের। ওদের চারজন আমাদের গুলিতে মারা যেতে ওরা পালিয়ে যায়। তখন আমরা তাদের আর অনুসরণ করতে পারিনি। আমরা প্যাটকে দেখতে পাইনি বটে, তবে মনে হয় আমাদের সঙ্গে ওদের দেখা হওয়ার আগেই ওকে ওদের একটা দল তাকে ধরে নিয়ে যায়।

মিসেস লে বললেন, উইলিয়ম, তোমার মনোবাসনা এবার পূর্ণ হলো। তুমি অভিযান করতে না বেরোলে এসব কিছুই হত না।

কর্ণেল বললেন, স্বীকার করছি পেনিলোপ, সব আমার দোষ। কিন্তু বারবার একথা বললে কোন ফল হবে কি ?

এরপর টারজন ইৎজল চাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের নগরের লোকেরা প্যাট্রিসিয়াকে কি করবে বলত ?

ইৎজল বলল, দুতিন দিন পর অথবা মাসখানেক পরে ওকে বলি দেবে।

প্যাট্রিসিয়াকে কি তারা আমার মত খাঁচায় ভরে রাখবে অথবা অন্য কোথাও রাখবে ?

আমার মনে হয় ওকে পিরামিডের উপরে কুমারীদের মন্দিরে রাখবে। ভাল পাহারার ব্যবস্থা থাকবে।

আমি ওখানে যাব।

তুমি ওখানে যাবে না।

আজ রাতেই যাব।

ইৎজল চা এবার তার দু'হাত দিয়ে টারজনের গলাটা জড়িয়ে ধরে অনুনয় বিনয়ের সুরে বলল, তুমি যেও না। মেয়েটাকে তুমি উদ্ধার করতে পারবে না। ওরা তোমায় মেরে ফেলবে।

তা দেখে মিসেস পেনিলোপ লে তার স্বামীকে বলল, দেখ দেখ উইলিয়ম, এমন নোংরা জীবনে আমি কোথাও কখনো দেখিনি। এসব তোমার বন্ধ করা উচিত।

টারজন তার গলাটা ছাড়িয়ে নিয়ে ইৎজলকে বলল, আমায় ছাড় ইৎজল। ওরা আমায় কিছুতেই মারতে পারবে না।

ইৎজল বলল, হে বনদেবতা চে, আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমাকে বনে নিয়ে যাও। এখানে আমার কাউকে ভাল লাগে না।

টারজন বলল, ওরা ত সবাই তোমাকে দয়া করে।

ওদের দয়া আমি চাই না। আজ রাতে তুমি চিচেন ইৎজায় যেও না।

তার কাঁধে হাত বুলিয়ে টারজন বলল, আজ রাতেই আমি যাচ্ছি।

ইৎজল চা তখন রেগে বলল, আসলে তুমি তাকে ভালবাস এটাই হলো তোমার যাওয়ার কারণ। সেই মেয়েটার জন্যই আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ তুমি।

টারজন বলল, একথা আর কখনো যেন বলো না।

এই বলে সে অন্য সকলের কাছে চলে গেল।

ইৎজল চা প্রচণ্ড রাগে গজগজ করতে করতে নিজের ঘরে চলে গেল। মাটিতে পড়ে সে নিস্ফল আক্রোশে ছটফট করতে লাগল। এক প্রতিহিংসা জাগল তার মনে।

এই সময় সে দরজার দিকে তাকাতেই দেখল হ্যান্সের দল ফিরে আসছে জয়ী হয়ে। শিবিরের সকলের দৃষ্টি তাদের উপরে পড়তেই তার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে বনের ভিতর চলে গেল ইৎজল চা।

হ্যান্স দেখতে পেয়েই ছুটে গিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল জেনেস্তে। বলল, আমি ভেবেছিলাম তুমি আর বেঁচে নেই।

হ্যান্স বলল, না না, আমি বেঁচে আছি। আর তোমাকে স্মিৎস বা তার দলকে ভয় করতে হবে না। ওরা সবাই এখন মৃত।

টারজন বলল, শুনে খুশি হলাম। ওরা অত্যন্ত পাজী লোক ছিল।

এদিকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চিচেন ইৎজা নগরের দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল ইৎজল চা। তখন অন্ধকার হয়ে আসছিল বলে ভয় করছিল তার। তার ধারণা অন্ধকার রাত্রিতে অনেক ভূত প্রেত বার হয় বনের ভিতরে। কিন্তু একই সঙ্গে ঘৃণা, প্রতিহিংসা আর প্রতিশোধ বাসনায় উন্মত্ত হয়ে সব ভয়

ঝেড়ে ফেলে ছুটছিল সে।

ইৎজল চা চিচেন ইৎজাতে পৌছল সন্ধ্যার অন্ধকারটা ঘন হয়ে ওঠার পর। নগরদ্বারের প্রহরীরা প্রথম আটকাল তাকে। পরে সে যখন বলল প্রধান পুরোহিত ও রাজার সঙ্গে তার দরকার আছে তার তখন ছেড়ে দিল তাকে।

প্রধান পুরোহিতের কাছে গিয়ে তার পায়ে পড়ে গেল ইৎজল চা। তাকে চিনতে পেরে প্রধান পুরোহিত জিউ বলল, আবার কেন ফিরে এলি ?

আমি এই কথা তোমাদের জানাতে এসেছি, যে লোকটা আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সে আজ রাতে শ্বেতাঙ্গ মেয়েটাকে উদ্ধার করতে আসবে।

প্রধান পুরোহিত জিউ বলল, এই কথা আমাদের জানানোর জন্য তোমাকে এক বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে। তোমার সম্মানের জন্যই বলি দেওয়া হবে তোমাকে দেবতাদের উদ্দেশ্যে।

এরপর ইৎজল চাকে বন্দিনী হিসাবে বলির জন্য একটা খাঁচায় রাখা হলো।

টারজন সন্ধ্যের সময় চিচেন ইৎজা নগরের কাছাকাছি এসে পড়লেও মধ্য রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল। নগরের সকলে ঘুমিয়ে না পড়লে সে নগরে ঢুকবে না।

বাতাসে গন্ধ শুঁকে টারজন বুঝল, তার বন্ধু হাতিটা নগরের আশে পাশেই আছে। টারজন হাতিটাকে ডাকতেই সে তার কাছে এল। তারপর তাকে পিঠে চাপিয়ে নগরদ্বার পর্যন্ত পৌছে দিল।

নগরপ্রাচীরে উঠে প্রাচীর থেকে লাফ দিয়ে ওদিকের রাস্তার উপর পড়ল টারজন। রাস্তাগুলো তখন ছিল একেবারে ফাঁকা। টারজন অবাধে পিরামিডের মত দেখতে সেই মন্দিরটার তলায় এসে দাঁড়াল।

এদিকে কুমারীদের মন্দিরের দ্বারপথে বারোজন যোদ্ধা ছায়ায় গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে ছিল। তারা জানত আজ রাতে টারজন আসবে।

কিন্তু টারজন কাউকে দেখতে না পেয়ে মন্দিরের ভিতরে পা দিতেই একটা বড় জাল এসে ঢেকে ফেলল তাকে। সে তখন অসহায়।

দুজন পুরোহিত তখন ভেরী বাজাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠল সমস্ত শহর। অসংখ্য মানুষ চারদিক থেকে আলো হাতে ছুটে আসতে লাগল।

টারজনকে ধরে সিঁড়ি বেয়ে নিচেতে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। তারপর প্যাট্রিসিয়াকে আনানো হলো কুমারী মন্দির থেকে।

তারপর প্রধান পুরোহিত চান ইপ জিউএর নেতৃত্বে টারজন ও প্যাট্রিসিয়াকে নিয়ে এক বিরাট মিছিল বার হলো। টারজনকে একটা চতুর্দোলায় চাপিয়ে চারজন পুরোহিত কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সেই চতুর্দোলাটাকে।

টারজনের চতুর্দোলার পিছনে ছিল রক্ষীপরিবৃত প্যাট্রিসিয়া, তার পিছনে ছিল কাঠের খাঁচায় ভরা ইৎজল চা।

মিছিলটা সমস্ত নগর পরিক্রমা করে নগরসীমানার বাইরে পাহাড়ের দিকে চলে গেল। অবশেষে একটা মৃত আগ্নেয়গিরির গহ্বরের পাশে উঠে গিয়ে থামল মিছিলটা। সেই গহ্বরের তলায় অনেক জল ছিল।

ঢাক, ঢোল, ভেরী প্রভৃতি বাজনার সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগল। তারপর একসময় তারা টারজনকে ধরে ফেলে দিল সেই গহ্বরের মধ্যে।

ইৎজল চা প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে টারজনের আসার কথা ফাঁস করে দিয়ে যে অন্যায় করেছে তার জন্য এখন অনুতপ্ত। সে টারজনের উপর রাগ করেছিল। কিন্তু মৃত্যু চায়নি তার। তাই সে অনেক অনুনয় বিনয় করে টারজনের জীবনভিক্ষা চাইল চান ইপ জিউএর কাছে।

১৭

প্যাট্রিসিয়া এই ঘটনাতে মর্মাহত হলেও ভেঙ্গে পড়ার মত মেয়ে সে নয়। টারজনকে গহ্বরের জলে ফেলে দেওয়ার পর সে গহ্বরের উপর মুখ বাড়িয়ে বলল, টারজন, তুমি কোনরকমে জলে ভেসে থাক। আমি মায়া সভ্যতার লোকদের প্রথা জানি। যদি কোন অপরাধীকে এই পবিত্র কূয়োর জলে ভোরবেলায় ফেলে দিলে সে দুপুর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে কোন রকমে তাহলে তাকে উঠিয়ে ফেলা হয়। তাহলে তাকে দেবতা হিসাবে দেখে ওরা।

টারজন হাসিমুখে হাত নাড়ল। প্যাট্রিসিয়ার ভাষা বুঝতে পারল না পুরোহিতরা।

প্যাট্রিসিয়া আবার বলল, তুমি দুপুর পর্যন্ত জলের উপর ভেসে থাকতে পারবে ত টারজন? তোমাকে পারতেই হবে। কারণ আমি তোমাকে ভালবাসি।

টারজন কোন কথা বলল না। একশো ফুট চওড়া গহ্বরটার জলে ধীরে ধীরে সাঁতার কেটে যেতে লাগল।

সমবেত জনতা তাদের জন্য খাদ্য ও পানীয় এনেছিল। সকাল হবার কিছু পরে তারা সেই খাদ্য ও পানীয় খেতে লাগল।

অবশেষে সূর্য মধ্য আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অবস্তিবোধ করতে লাগল প্রধান পুরোহিত চান ইপ জিউ। দুপুর হলেও যদি লোকটা বেঁচে থাকে তাহলে এটাই প্রমাণিত হবে যে সে-ই বনদেবতা চে। সেটা তার পক্ষে ক্ষতিকর হবে। তখন বনদেবতাই হয়ে উঠবে সর্বেসর্বা।

দুপুর গত হতেই জনতা এক প্রবল উল্লাসে ফেটে পড়ল। কারণ তারা নিজের চোখে দেখল বন্দী তখনো বেঁচে আছে পবিত্র কূয়োর জলে।

একটা দড়িতে ফাঁস লাগিয়ে সেটা ফেলে দেওয়া হলো টারজনের কাছে। টারজন ফাঁসটা ছাড়াই দড়ি ধরে উঠে এল।

টারজন উঠেই রাজা ও প্রধান পুরোহিতের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, আমিই বনদেবতা চে, আমি একজন মানুষের বেশ ধারণ করে মর্ত্যে নেমে এসেছিলাম কিভাবে তোমরা রাজ্যশাসন করছ তা দেখার জন্য। কিন্তু তোমাদের শাসনকার্যে সন্তুষ্ট নই আমি। এখন আমি যাচ্ছি। দিনকতক পর আবার এসে দেখব তোমরা কোন উন্নতি করতে পেরেছ কি না। এখন আমি এই মেয়েটিকে নিয়ে যাচ্ছি। ইৎজল চাকে ছেড়ে দাও। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত কাউকে যেন বলি দেওয়া না হয়।

এই বলে টারজন প্যাট্রিসিয়ার হাত ধরে পাহাড় থেকে নামতে লাগল। তাদের পিছনে এক বিরাট জনতা গান গাইতে গাইতে আসতে লাগল। নগরদ্বারের কাছে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল টারজন।

টারজন তখন প্যাট্রিসিয়াকে বলল, এবার এমন একটা ঘটনা দেখাব ওদের যা ওরা ওদের বংশধরদের বলতে পারবে।

এই বলে এক অদ্ভুত চীৎকার করল সে। একটা হাতির নাম ধরে ডাকতে লাগল। তার ডাক শুনে হাতিও চীৎকার করতে করতে ছুটে এল।

প্যাট্রিসিয়া ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু টারজন বলল, ও আমার বন্ধু। ভয়ের কিছু নেই।

এই বলে হাতিটার শুঁড়ের উপর হাত রাখল টারজন। তারপর সে তাদের একে একে শুঁড় দিয়ে তুলে নিতে বলল।

তারা হাতির পিঠে চাপলে হাতিটা ঘুরে যাত্রা শুরু করতেই ওরা দুজনেই পিছন ফিরে দেখল চিচেন ইৎজার সব লোক নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছে এবং তাদের মাথাগুলো মাটিতে ঠেকানো আছে।

এদিকে শিবির সাইগনে তখন সকলেই টারজনের আশা একরকম ছেড়েই দিয়েছে। তারা ভাবছিল টারজন আর প্যাট্রিসিয়াকে আর তারা দেখতে পাবে না কখনো।

পেনিলোপ লে বললেন, প্যাট্রিসিয়ার খোঁজে টারজনকে একা পাঠানো উচিত হয়নি তোমাদের। যদি সে তার দেখা পায় ত তার এখন কি যে হচ্ছে তা কে বলতে পারে।

কর্ণেল বললেন, কেন তুমি লোকটার বিরুদ্ধে শুধু শুধু তিক্ত হয়ে উঠছ। সে ত আমাদের সঙ্গে মিত্রতা ছাড়া কখনো শত্রুতা করেনি।

তোমার মাথাটা মোটা উইলিয়ম। ও প্যাট্রিসিয়াকে ভুলিয়ে বিয়ে করতে চায়। কারণ সে জানে প্যাট্রিসিয়া তার ধনী বাপের সব টাকা সে একা পেয়েছে।

হ্যান্স বলল, শুনুন ম্যাডাম, আপনি যাকে এতটা হীন ভাবছেন আসলে সে ইংলণ্ডের জন ক্লেটন, লর্ড গ্রেস্টোক। তার মানে এক ইংরাজ সামন্ত।

'দূর' বলে কথাটা উড়িয়ে দিতে চাইলেন মিসেস লে।

হ্যান্স বলল, 'দূর' নয়, একথা সত্য, ক্রাউজ নিজে বলেছে আমায়। আবার ক্রাউজ শুনেছিল আরবটার কাছ থেকে।

হঠাৎ মিসেস লের কথার সুর পাল্টে গেল। তিনি বললেন, হাঁ হ্যাঁ, আমি তা আগেই জানতাম। আমি শুধু ওর নগ্নতার জন্য সমালোচনা করতাম। একথা আমাকে আগে বলনি কেন হে ছোকরা ?

উনি কথাটা কাউকে জানাতে চান না বলেই আমি তা বলিনি।

এমন সময় জেনেত্তে বলল, উনি এসে গেছেন। সঙ্গে প্যাট্রিসিয়া।

এক আশ্চর্য আন্তরিকতার সঙ্গে মিসেস পেনিলোপ বলতে লাগলেন, আমার ভাইঝি আর লর্ড গ্রেস্টোককে কি চমৎকার মানিয়েছে দেখ।

হাতির পিঠ থেকে নেমে ছুটে শিবিরে চলে এল প্যাট্রিসিয়া।

এমন সময় দূরে সমুদ্রের উপর একটা জাহাজ দেখা গেল।

কয়েকজন নাবিককে নিয়ে গ্রোত্তে একটা নৌকোয় করে জাহাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এগিয়ে গেল।

ক্রোচ বলল, আবার হয়ত একশো বছর পরে একটা জাহাজ দেখা যাবে।

ক্যাপ্টেন বোল্টন চোখে বাইনাকুলার দিয়ে দেখে বলল, আরে এটা ত শাইয়াদ জাহাজ, ভাসতে ভাসতে এইদিকেই আসছে।

টারজন এ্যাণ্ড দি চ্যাম্পিয়ন

টারজন ও চ্যাম্পিয়ন

"ছয়—সাত—আট—নয়—দশ।"

এই বলে রেফারি এগিয়ে এসে মুলারগানের ডান হাতটি তুলে ধরল। তারপর চীৎকার করে বলল, ইনিই হলেন বিজয়ী বীর।

যে দর্শকমণ্ডলী ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেনে সমবেত হয়েছিল তারা প্রথমে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বসে পড়ল। তারপর তারা হাততালি দিতে দিতে উল্লাস করতে লাগল। তারা কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলল না। তারা শুধু কুখ্যাত মল্লযোদ্ধা মুলারগানকে দেখতে পারত না। তাকে তারা মোটেই পছন্দ করত না।

মুলারগানের ম্যানেজার জো মার্কস ও অন্য কয়েকজন লোক দড়ি দিয়ে ঘেরা গোল জায়গাটার মধ্যে গুঁড়ি মেরে দড়িটার তলা দিয়ে এসে মুলারগানের পিঠ চাপড়ে অভিনন্দন জানাল। সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফাররাও সকলে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। প্রতীক্ষিত জগৎকে এই বিরাট সংবাদটা পরিবেশন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল তারা।

আগেকার বিজয়ী বীর ঘেরা জায়গাটার মধ্যে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে হাত বাড়িয়ে অভিনন্দন জানাল মুলারগানকে। কিন্তু মুলারগান সে হাত না ধরে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

প্রায় বছরখানেক আগে বহুদূর থেকে সে আসে। একজন সৌখীন কুস্তিগির ও হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হিসাবে এখানে আসে এবং এসেই নাম করে। তারপর ধীরে ধীরে সুযোগ পেয়ে এগিয়ে আসে খেলার জগতে।

মুলারগান নয় রাউণ্ড কুস্তি লড়ে চ্যাম্পিয়ন হিসাবে তার সাফল্য অক্ষুণ্ণ রাখে। ছয় বারে তিনটি লোকের চোয়াল ভেঙ্গে দেয় এবং একজন লোকের মাথার খুলির হাড় ভেঙ্গে যায়।

একবার হাতে বেশ কিছুদিনের লম্বা ছুটি পেয়ে দেশভ্রমণে বেড়িয়ে পড়ায় মনস্থ করে মুলারগান। সখটা তার বহুদিন আগে হতেই ছিল। কিন্তু সুযোগ পায়নি। কোন না কোন বাধা পেয়ে সখটা পূরণ করতে পারেনি।

বিদেশভ্রমণে বার হবার সব ঠিকঠাক করে মুলারগান একদিন তার ম্যানেজার জো মার্কসকে বলে, আমরা আফ্রিকা যাচ্ছি।

জো মার্কস বলে, ওটা একটা নরক এবং বহু দূরে। দক্ষিণ আমেরিকার নিচের দিকে কোন একটা জায়গা। কিজন্য সেখানে যেতে চাইছেন ?

মুলারগান বলে, শিকারের জন্য। একদিন রাত্রিতে একটা লোকের বাড়িতে সিংহ, হাতি, বুনো মোষ প্রভৃতি জন্তু জানোয়ারের মাথা দেখনি ? মাথাগুলো দেওয়ালে টাঙানো ছিল।

অনুনয় বিনয়ের সুরে জো মার্সি বলল, আমার কথা শোন। এখান থেকে আরো কিছু রাউণ্ড লড়ো। তারপর আফ্রিকা বা যেখানে খুশি যেতে পার। তবে আমি যাব না। আমি সিংহের পেটে যেতে চাই না।

কিন্তু আমরা আফ্রিকা যাচ্ছি এবং তুমিও আমার সঙ্গে যাচ্ছ। যদি তুমি প্রচার চাও তাহলে সাংবাদিকদের খবর দিতে পার।

দশদিন পর একটি অপেক্ষমান জাহাজের ডেকে বীর চ্যাম্পিয়ন মুলারগানকে ঘিরে দাঁড়াল খেলার জগতের সাংবাদিকরা। অনেকে ক্যামেরা হাতে ছবি তুলল মুলারগানের। যাত্রীরা সাংবাদিকদের ভিড় ঠেলে ঘাড়গুলো বাড়িয়ে দেখতে লাগল মুলারগানকে। একটি মেয়ে কনুই দিয়ে ভিড় সরিয়ে তার একটা অটোগ্রাফ নেবার জন্য তার এ্যালবামটা বাড়িয়ে দিল।

'ডেইলি নিউজ' এর একজন সংবাদদাতা প্রশ্ন করল মেয়েটিকে, উনি আবার লিখতে শিখলেন কবে ?

মুলারগান কড়া গলায় বলল, তুমি খুব পণ্ডিত।

আর একজন ভিড়ের মধ্য থেকে মুলারগানকে বলল, আফ্রিকায় গিয়ে টারজনকে আমার ভালবাসা জানিও।

'ডেইলি নিউজ' এর সেই সংবাদদাতা বলল তার সঙ্গে বেশী মেলামেশা করো না। সে তোমার হাড় ভেঙে দেবে।

আমি তাকে আগেও অনেকবার দেখেছি। সে কারো হাড় ভাঙ্গে না।

সাংবাদিক বলল, তার সঙ্গে লড়তে গেলে প্রথম রাউণ্ডেই সে তোমাকে হারিয়ে ভূত করে দেবে।

এক বিশাল প্রান্তরের এক প্রান্তে বনটা যেখানে থেমে গেছে সেখানে একটা মাল বোঝাই ভারী ট্রাক এগিয়ে যাচ্ছিল বনের দিকে। বনের গাছগুলো আর কেন এগিয়ে আসেনি তা বোঝা যায় না।

ট্রাকটা যেদিকে যাচ্ছিল তার উল্টো দিকে প্রান্তরের উপর দূরে একজন পথিক দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রাকটা দেখে অবাক হয়ে গেল পথিকটি। এ পথে কখনো কোন ট্রাক আসে না।

হেলমেট মাথায় একজন শ্বেতাঙ্গ ট্রাকটা চালাচ্ছিল। তার পাশে বসে ছিল একজন নিগ্রো। ট্রাকের উপর যে সব মাল বোঝাই করা ছিল তার উপর আরো কয়েকজন নিগ্রো ছিল। বনের দীর্ঘায়িত ছায়া বিষুবরেখা অঞ্চলের এক অপরাহ্নের আগমন ঘোষণা করছিল।

পথিকটি ধীর গতিতে ট্রাকটা যেদিক থেকে আসছিল সেই দিকে এগোতে লাগল। তার পরনে পোশাক বলতে ছিল মাত্র একটা কৌপীন। হাতে ছিল আদিম যুগের অস্ত্র—একটা তীর ধনুক, তূন আর একটা বর্শা। তার কাঁধের উপর ছিল একটা ছোট বাঁদর। লোকটি জাতিতে শ্বেতাঙ্গ হলেও আফ্রিকায় দীর্ঘকাল থাকার জন্য রোদে পুড়ে পুড়ে গায়ের চামড়াটা তামাটে হয়ে যায়। বাঁদরটা একটা হাত দিয়ে লোকটির ঘাড়টা জড়িয়ে ধরে বসেছিল তার কাঁধের উপর। বাঁদরটার নাম কিমা।

ট্রাকটাকে এগিয়ে আসতে দেখে বাঁদরটা **'টারমাঙ্গানী'** বলে চীৎকার করে উঠল। বলল, কিমা আর টারজন টারমাঙ্গানীকে মেরে ফেলবে। টারজন কাছে থাকলে কিমার সাহস বেড়ে যায়। মুখে খুব বড় বড় কথা বলে। কিন্তু আসলে সে ছিল একটা ভীরু কাপুরুষের হদ্দ।

ট্রাকের ড্রাইভার দূরে টারজনকে দেখতে পেয়ে আদিবাসী ভেবে পিস্তলটা খাপ থেকে বার করল। সে এ অঞ্চলে কখনো আসেনি এর আগে এবং এখানকার আদিবাসীদের মন মেজাজের খবর সে জানত না। সে তাই সতর্কতা অবলম্বন করল। সে দেখল তার পাশে বসা যুবকটির হাতে একটা রাইফেল রয়েছে।

ড্রাইভার তার পাশের কৃষ্ণকায় নিগ্রো যুবকটিকে বলল, লোকটা কে ?

যুবকটি উত্তর করল, একজন শ্বেতাঙ্গ মালিক।

আমার মনে হয় ঠিক বলেছ। আমার মনে হয় লোকটা শ্বেতাঙ্গ, শুধু তার বেশভূষা আদিবাসীদের মত।

টারজনের কাছে এসে ট্রাকটা থামাল শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভার।

কিমা টারজনের কাঁধের উপর থেকে দাঁত বার করে কিচমিচ করে ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু কেউ তাকে গ্রাহ্য করল না। তারপর টারজন ট্রাকটার কাছে এলে কিমা ভয়ে মাটিতে লাফ দিয়ে নেমে একটা গাছের উপর উঠে পড়ল।

টারজন ট্রাকটার পাশে দাঁড়িয়ে ড্রাইভারকে বলল, এখানে তোমরা কি করছ ?

মেলটন তার সামনে একজন নগ্ন লোককে দেখে তার এই প্রশ্নটাকে একটা বেয়াদবি বলে মনে করল। দেখল লোকটার হাতে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই।

মেলটন বলল, দেখছ ত, একটা লরী চালাচ্ছি।

টারজন এবার তীক্ষ্ণ- কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

কয়েকদিন ধরে মেলটনের খুব খাটুনি হচ্ছিল। মনে ছিল দারুন উদ্বেগ। তার মাথার স্নায়ুগুলো ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সে পিস্তলটা হাতে ধরে একটা কড়া কথা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু কথাটা বলতে পারল না।

টারজন তখন তার একটা হাত বাড়িয়ে মেলটনের হাতের কব্জিটা ধরে তাকে জোর করে নামাল ট্রাক থেকে। তারপর তার পিস্তলটা কেড়ে নিল।

কিমা গাছের উপর নাচতে লাগল। সে টারজনকে বারবার শ্বেতাঙ্গ শত্রুটাকে বধ করতে বলতে লাগল। কিন্তু তার কথা কেউ শুনল না। সে এত ছোট যে তার কথায় কেউ কান দেয় না।

ট্রাকের উপরে যে সব নিগ্রো বসেছিল তারা হতবুদ্ধি হয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। তারা দেখল মেলটনকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তার ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দিতে লাগল লোকটা। টারজন তার অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছিল কোন মানুষকে ধরে জোরে নাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি বশ করা যায় তাকে।

মেলটনের গায়েও শক্তি ছিল। কিন্তু টারজনের সঙ্গে পেরে উঠল না সে। তাছাড়া সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। লোকটার মধ্যে দেহের শক্তি ছাড়াও এমন একটা কিছু ছিল যার জন্য তাকে দেখলেই ভয় করে। মেলটনের মনে হলো, কোন মানুষ নয়, সে যেন কোন বন্য জন্তুর কবলে পড়েছে। তাই সে অমোঘ অপরিহার্য নিয়তির কাছে নীরবে আত্মসমর্পণ করল।

টারজন এবার মেলটনকে ছেড়ে রাইফেল হাতে নিগ্রো যুবকটার দিকে তাকিয়ে বলল, রাইফেল ফেলে দাও।

যুবকটি ইতস্ততঃ করছিল। মেলটন বলল, ফেলে দাও

মেলটন এরপর টারজনকে বলল, আমার কাছে কি জানতে চাও তুমি?

আমি জানতে চাই তোমরা এখানে কি করছ।

আমি কয়েকজন আমেরিকান লোককে খুঁজতে যাচ্ছি।

তারা কোথায় ?

মেলটন বলল, ঈশ্বর জানেন। আজ সকালে তারা একটা ছোট গাড়িতে করে বেরিয়ে যায়। আমাকে বলেছিল বনটার প্রান্তে এসে অপেক্ষা করতে। সেখানে তাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে দিনের শেষে। হয়ত তাদের কোন বিপদ ঘটেছে।

এখানে কি করতে এসেছিল তারা ?

শিকার করতে।

এটা ত নিষিদ্ধ এলাকা। এদিকে কেন তারা এল ?

মুলারগান কোন কথা শুনবে না। সে নিজেকে সবজান্তা ভাবে। সে

ভাবে সে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে নামকরা হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন। এমন লোক জীবনে আমি দেখিনি কখনো। মুলারগানের ম্যানেজার লোকটা তত খারাপ নয়। কিন্তু লোকটা আধপাগলা, তার কথা শুনে হাসি পায়। কথায় কথায় সে শুধু 'ইয়েস কিড,' 'ওকে কিড' এই সব বলবে। সে শুধু নিউ ইয়র্কে ফিরে যেতে চায়। এখানে খুব ভয়ে ভয়ে আছে। ওরা দুজনে নিউ ইয়র্কে চলে গেলে আমি বাঁচি।

টারজন বলল, আর কেউ তাদের সঙ্গে নেই ?

না।

তাহলে তাদের আশা ছেড়ে দিতে পার। এটা সিংহের রাজ্য।

মেলটন বলল, তাহলেও আমার উপর যখন দায়িত্ব আছে তখন তাদের একবার খুঁজে দেখি, তুমি আবার বাধা দেবে না ত ?

না: যাও, খুঁজে দেখ। তবে বলবে তারা যেন এ অঞ্চল ছেড়ে চলে যায়।

এই বলে টারজন বনের মধ্যে চলে গেল।

মেলটন চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে, পরিচয়টা দিলে না ?

টারজন বলল, আমার নাম টারজন।

মেলটন এবার ট্রাকের উপর উঠে ট্রাক ছেড়ে দিল।

সূর্য তখন পশ্চিমে প্রায় ঢলে পড়েছে। বনের ছায়াটা অনেকটা এগিয়ে এসেছে প্রান্তরের উপর। একটা হালকা মোটর গাড়ি অসমতল মাটির উপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে যাচ্ছিল। গাড়ির ভিতরে ছিল দুজন লোক। একজন গাড়ি চালাচ্ছিল। আর একজন বসেছিল তার পাশে।

একসময় মার্কস কাতর কণ্ঠে বলে উঠল, দয়া করে গাড়ির গতিটা একটু কম করতে পারছ না ? কম না করলে তোমার গাড়ি ভেঙ্গে যাবে। কোন পার্টস বা যন্ত্রপাতিও পাবে না আর কোন ম্যানেজারও পাবে না।

মুলারগান রসিকতা করে বলল, আমি ম্যানেজার চাই না। তাকে আফ্রিকায় ছেড়ে দিয়ে যাব।

জো মার্কস বলল, এমন বোকামির কথা মাথায় এনো না। আমার মত একজন চটপটে লোক তোমার সব সময় দরকার।

মুলারগান গাড়ির গতিটা একটু কম করল। তখন অন্ধকার ঘন হয়ে আসছিল। সে গাড়ির আলো জ্বালল সুইচ টিপে।

এবার তারা দুজনেই চুপ করে রইল। মার্কস বাঁদিকে ডানদিকে দুদিকেই তাকাতে লাগল ভয়ে ভয়ে। সন্ধ্যা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ অঞ্চলের চেহারা একেবারে পাল্টে যায়। অন্ধকার বিশাল প্রান্তরটায় আকাশের তারার অস্পষ্ট

জুতুড়ে আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই। বনভূমির অন্ধকার একেবারে সূচীভেদ্য, একেবারে নিরন্ধ্র।

মুলারগান বলল, আমি তাকে এত করে বুঝিয়ে বললাম এখানে থাকার জন্য। কিন্তু ইংরেজ লোকটা গ্রাহ্য করে না আমার কথা। সে যেন নিজে সব ভাল বোঝে। ঠিক আছে, আমিও দেখিয়ে দেব সারা পৃথিবীর এক চ্যাম্পিয়ন হিসাবে নিজের নিরাপত্তার নিজেই ব্যবস্থা করব।

একটা সিংহের গর্জনে সেই বিশাল প্রান্তরের নিস্তব্ধতাটা ভঙ্গ হলো। সিংহটা তখনো অবশ্য দূরে ছিল। কিন্তু গাড়িতে বসে থাকা মুলারগান ও তার ম্যানেজারের কানে আসতে লাগল গর্জনটা।

মুলারগান বলল, ওটা কিসের শব্দ ?

মার্কস বলল, একটা শুয়োর।

দিনের আলো থাকলে শুয়োরটাকে মারা যেত। এখন গোটাকতক শুয়োরের চপ হলে ভাল হত। এখন দেখছি ঐ ইংরেজটা ছাড়াই আমরা চালিয়ে নিতে পারব।

কিন্তু ট্রাকটা কে চালাবে ?

মুলারগান বলল, তা অবশ্য বটে। কিন্তু লোকটা আমাদের বাচ্চা ছেলে ভাবে, যেন সে আমাদের ধাত্রী। আমার বিরক্তিটা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ সামনে একটা আলো দেখতে পেয়ে মার্কস বলল, ঐ দেখ আলো। মনে হয় আমাদের ট্রাকটা।

দুটো গাড়ি এক জায়গায় হলে সকলে গাড়ি থেকে নেমে হাত পা ছড়িয়ে বসল। তারা সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

মুলারগান ট্রাকের ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

মেলটন বলল, শিবির থেকে বেরিয়ে আমরা ত সোজা আসছি। আপনাদের হালকা গাড়ির মত এই ভারী ট্রাকটা এত খারাপ রাস্তায় তাড়াতাড়ি যেতে পারে না। যাই হোক, কোন শিকার পেলেন ?

না। আমার মনে হয় এখানে শিকারের মত কোন জীবজন্তু নেই।

শিকার যথেষ্টই আছে। এখানকার কোন জায়গায় স্থায়ীভাবে শিবির স্থাপন করলে শিকার পাওয়া যাবে।

মার্কস বলল, আমরা আজ কিছু বুনো মোষ দেখেছিলাম। কিন্তু মোষগুলো পালিয়ে গেল।

মুলারগান বলল, আমি পায়ে হেঁটে কিছুদূর তাদের অনুসরণ করেছিলাম। কিন্তু তারা পালিয়ে যায়।

আপনার ভাগ্য ভাল যে পালিয়ে গেছে।

তার মানে ?

আপনি যদি তাদের একটাকে গুলি করতেন তাহলে আপনি নিজেই মারা পড়তেন। আহত মোষের থেকে সিংহের সামনে পড়া ভাল।

মুলারগান বলল, তুমি যা খুশি বলতে পার। কিন্তু আমি গবাদি জাতীয় কোন পশুর ভয়ে ভীত নই।

মেলটন নিগ্রোদের সাহায্যে সেখানেই শিবির গড়তে লাগল। মুলারগান ও মার্কসকে বলল, আজকের মত এখানেই রাত কাটানো যাক। কাল সকালে ত ফিরে যেতেই হবে।

মুলারগান চীৎকার করে বলল, ফিরে যাব মানে? কে বলল ফিরে যাবার কথা? এখানে আমি শিকার করতে এসেছি। শিকার করব।

মেলটন বলল, আজ পথে একটা লোকের সঙ্গে আমার দেখা হলো। সে বলল এটা নিষিদ্ধ অঞ্চল। আমাদের চলে যেতে হবে।

সে আমাদের চলে যেতে বলার কে ? সে কে তা বলেছিল তোমায় ?

তার নাম টারজন।

তাকে বলেছিলে আমি কে ?

হ্যাঁ বলেছিলাম। কিন্তু সেটা সে গ্রাহ্য করেনি ততটা।

সে কি ভাবে, আমাকে আফ্রিকা থেকে তাড়িয়ে দেবে সে ?

মেলটন বলল, সে যখন বলেছে তখন চলে যাওয়া উচিত।

মার্কস হেসে বলল, আমি এখনি চলে যাবার জন্য প্রস্তুত। এই জরসর্দি নিয়ে আফ্রিকায় থাকা উচিত নয়।

মুলারগান বলল, আমি ভাল শিকার না পাওয়া পর্যন্ত যাব না।

নিগ্রোরা ট্রাক থেকে মালপত্র নামাতে লাগল। একজন রাতের রান্নার জন্য আগুন জ্বালাল। অনেকে হাসিঠাট্টা ও গান করতে লাগল। একজন নিগ্রো মাথায় করে ভারী একটা বোঝা ট্রাক থেকে নামিয়ে শিবিরে ঢুকতে গিয়ে মুলারগানের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। মুলারগান পড়ে যায়। সে উঠে একটা চড় মারে নিগ্রোটাকে।

মেলটন এগিয়ে এসে মুলারগানকে বলল, আর তুমি কখনো ওদের গায়ে হাত দেবে না, আমি অনেক সহ্য করেছি এতদিন। আর কারো গায়ে হাত দেবে না।

মুলারগান তখন রেগে গিয়ে বলল, তাহলে তোমারও একটা চড় খাবার মন হয়েছে।

কিন্তু সে মেলটনকে চড় মারতে উদ্যত হতেই পিস্তল উচিয়ে ধরল মেলটন। বলল, বাঁচতে চাও ত দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাও।

মুলারগান মুখ ঘুরিয়ে চলে গিয়ে মার্কসকে বলল, ইংরেজরা রসিকতা

বোঝে না।

ওদের সকলের রাতের খাওয়া হয়ে গেলে একটা সিংহের গর্জন শুনতে পেল ওরা। মনে হলো সিংহটা ওদের শিবিরের খুব কাছেই আছে।

মুলারগান বলল, সেই শুয়োরটা।

মেলটন বলল, কোথায় শুয়োর ?

শব্দ শুনতে পাচ্ছ না।

মুলারগান ট্রাকের পাশে গিয়ে স্পটলাইট ঘোরাতেই দেখল একটা বড় সিংহ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিংহের চোখটায় জোর আলো পড়তে সে চলে গেল।

আফ্রিকায় বাবাঙ্গো নামে এক ধরনের আদিবাসী আছে। তাদের দেহগুলো খুবই বলিষ্ঠ। মাথাগুলো কামানো। দাঁতগুলো খুব সাদা ঝকঝকে না হলেও তারা নরখাদক। কিন্তু তাদের মানুষ খাওয়ার পিছনে ধর্মগত কোন কুসংস্কার নেই। অন্যান্য জীবজন্তুর থেকে মানুষের মাংস খেতে তাদের ভাল লাগে বলেই তারা মানুষ খায়। তারা জীবজন্তু শিকারের মতই খাবার জন্ত মানুষ শিকার করে। অন্য সব অঞ্চলের লোকেরা তাদের ভয় করে।

সম্প্রতি টারজনের কাছে একটা খবর যায়, বাবাঙ্গোরা দখলিভুক্ত এক অঞ্চলের অধিবাসীদের আক্রমণ করেছে। টারজন তাই বহু দূর থেকে বহু পথ হেঁটে এ বিষয়ে তদন্ত করতে এসেছে। তার পিছনে সর্দার মুভিরোর অধীনে একদল ওয়াজিরি যোদ্ধা আসছে।

মেলটনের সঙ্গে টারজনের যেদিন দেখা হয় তার পরদিন সকালে টারজন সেই প্রান্তরের কাছাকাছি বনের ভিতর দিয়ে পথ হাঁটছিল সচকিতভাবে। পথের ঘাসের ভিতর বিষাক্ত পোকা, গাছের উপর ওৎ পেতে থাকা চিতা, কালো পিঁপড়ে প্রভৃতি সব কিছুর উপর সমানে কড়া নজর রেখে চলেছিল সে।

সহসা একটা মোটর গাড়ির শব্দ শুনতে পেল টারজন। তারপরই দেখল একদল জেব্রা ছুটে পালাচ্ছে আর একটা চলন্ত মোটর গাড়ি থেকে একটা লোক একটা সাব-মেশিনগান থেকে গুলি করছে। গুলি করতে করতে চলে গেল গাড়িটা। সেই গুলিতে অনেকগুলো জেব্রা মারা গেল, অনেকগুলো আহত হলো। কিন্তু অকারণে নিরীহ জন্তুগুলোকে মেরে চলে গেল গাড়িটার আরোহীরা। গাড়িটাতে ছিল মাত্র দুজন লোক।

গাড়িটা যেদিকে গেল সেইদিকেই এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। সে ভাবল, ঘটনাক্রমে লোকদুটোর সঙ্গে দেখা তার হবেই। তখন দেখা যাবে।

এদিকে মুলারগান তার মোটরগাড়িটা আরো কিছুদূর নিয়ে গিয়ে একটা খাদের কাছে থামাল। তারপর মার্কসকে বলল, যদি এমনি করে একদল সিংহের দেখা পেতাম জো, তাহলে কেমন মজা হত ?

মার্কস বলল, চমৎকার হয়েছে। তোমার লক্ষ্য ভাল। সব তাড়িয়ে দিয়েছ ঝাঁকের মধ্যে গুলি করে।

খাদের কাছে এসে বনটা থেমে গেছে। ওরা বসে কথা বলছিল। মুলারগান বলল, আমাদের এখন থামলে চলবে না। এমন সব জিনিস শিকার করে নিয়ে গিয়ে তার নমুনা দেখাতে হবে যা দেখে তাক লেগে যাবে সাংবাদিকদের।

সহসা একটা হাতি দেখতে পেয়ে তার সাব-মেশিনগানটা তুলে নিল মুলারগান। সে গুলি করল। কিন্তু একটা নয়, পর পর অনেকগুলো হাতি এগিযে আসছে এই দিকে। গুলিটা কোন হাতির গায়ে লাগেনি।

হাতিদের চোখ ছোট বলে তারা ওদের গাড়িটার কাছে এসে চারদিকে তাকাতে লাগল। বিপদটা কোনদিকে তা দেখতে কিছুটা সময় লেগে গেল হাতিগুলোর। এই অবসরে আবার গুলি ভরে গুলি করল মুলারগান। একটা হাতি পড়ে গেল। অন্যগুলো পালিয়ে গেল। কিন্তু একটা পুরুষ হাতি পাগলা হয়ে ছুটে এল। মুলারগান আর মার্কস গাড়িটার উল্টো দিকে চলে গেল। হাতিটা উল্টে দিল গাড়িটাকে। চাকাগুলো উল্টে গেল উপর দিকে।

হাতিটা আগেই গুলি খেয়েছিল। এবার উল্টে পড়ে গেল।

মুলারগান বলল, আমাদের হাতের পিস্তল ছাড়া আর সব অস্ত্র গাড়িটার মধ্যে চাপা পড়ে গেল।

মার্কস বলল, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাকে এই বন থেকে এমন এক রাজপথে নিয়ে যান যেখানে কোন হাতি নেই।

এদিকে টারজন বন্দুকের গুলির আওয়াজের সঙ্গে হাতিদের আর্তনাদ শুনতে পায়। সে বুঝতে পারল যে দুজন শ্বেতাঙ্গ জেব্রাদের ঝাঁকে গুলি করেছে তারাই হাতিদেরও মারছে।

এক প্রচণ্ড রাগে অভিভূত হয়ে সেই শব্দ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। খাদের কাছে গিয়ে সে থামতেই তাকে দেখতে পেল মুলারগান আর মার্কস।

কিমা মারপিটের আশঙ্কায় টারজনের কাঁধ থেকে নেমে একটা গাছের উপর বসে দেখতে লাগল কি হয়।

টারজন তাদের কাছে গেলে মুলারগান তাকে বলল, কি চাও তুমি ?

মরা হাতিটাকে দেখিয়ে টারজন বলল, তোমরা এটাকে মেরেছ ?

মেরেছি ত কি হয়েছে।

পিস্তলটা হাতে ধরে বলল মুলারগাম।

টারজনও তোমাদের মারবে।

মুলারগান তার পিস্তল থেকে গুলি করতে না করতেই পা দিয়ে লাথি মেরে তার হাত থেকে পিস্তলটা ফেলে দিল টারজন। মার্কসএর হাত থেকেও পিস্তলটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

মুলারগান বলল তুমি টারজন না ?

এই বলে টারজনের মুখে একটা ঘুষি মারতে গেলে সরে গেল টারজন। তারপর মুলারগানের মাথার পাশে এমন একটা চড় মারল যাতে সে পড়ে গেল মাটিতে।

মার্কস ভয়ে লাফাতে লাফাতে চীৎকার করে মুলারগানকে বলতে লাগল, উঠে পড়। ওকে মেরে ফেল।

মুলারগান আবার উঠে দাঁড়িয়ে টারজনকে ঘুষি মারতে লাগল। কিন্তু তাতে কিছুই হলো না তার। টারজন এবার মুলারগানকে ধরে উপরে উঠিয়ে মাটিতে জোরে ফেলে দিল। তারপর তার বুকের উপর বসে তার গলাটা দুহাত দিয়ে টিপে ধরল।

মুলারগান অস্পষ্টভাবে মার্কসকে বলতে লাগল, আমাকে বাঁচাও। আমাকে মেরে ফেলছে।

এমন সময় কিমা চীৎকার করে উঠল অন্য কারণে। কিমা চীৎকার করে টারজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল। কিন্তু টারজন তখন একমনে লড়াই করাতে শুনতে পায়নি তা সময়ে।

মার্কসও দেখতে পায়। কিন্তু তখন বড় দেরী হয়ে গেছে। খাদের ওপার থেকে প্রায় একশোজন বাবাঙ্গো এসে কখন ওদের ঘিরে ফেলেছে তা বুঝতে পারেনি ওরা। বাবাঙ্গোরা ওদের জীবন্ত ধরে নিয়ে যেতে চাইল। তাই ওরা ওদের কোনরকম আঘাত না করেই বেঁধে ফেলল পিছন থেকে।

টারজন কিছুটা লড়াই করল প্রথমে। কিন্তু সংখ্যায় ওরা অনেক বেশী ছিল বলে পেরে উঠল না। সেও বন্দী হলো।

বন্দীদের পিছনে বর্শা দিয়ে খোঁচা দিতে দিতে বাবাঙ্গোরা তাদের গাঁয়ে নিয়ে গেল তাদের। কিমা তখন হতাশ হয়ে বনের শেষে সেই প্রান্তরটার দিকে ছুটে গেল।

চারদিকে শুধু গাছ আর গাছ আর শুধু বনের অন্ধকার। প্রায় দুশো ফুট করে উঁচু গাছগুলো ডালপালা ছড়িয়ে লম্বা লম্বা দড়ির মত লতা ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মাথা উঁচু করে। সেই বনের মধ্য দিয়ে একটা পায়ে চলা পথের উপর দিয়ে তিনজন শ্বেতাঙ্গ বন্দীকে তাদের গাঁয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল বাবাঙ্গোরা।

মার্কস একসময় ভয়ে ভয়ে মুলারগানকে জিজ্ঞাসা করল, ওরা আমাদের

নিয়ে কি করবে ?

মুলারগান বলল, ঐ লম্বা চওড়া টারজন নামের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করো।

মার্কস বলল, লোকটা মানুষ নয়, পশু। ওর গর্জন শুনেছিলে? ও তোমাকে ফ্লাইওয়েটের মত তুলেছিল আর হেভিওয়েটের মত মাটিতে ফেলেছিল। খুব ভাগ্য ভাল যে বেঁচে গেছ।

অবশেষে একটা ছোট নদী যেখানে একটা বড় নদীতে গিয়ে পড়েছে সেইখানে এলোমেলোভাবে গড়ে ওঠা একটা অস্থায়ী বড় শিবিরে গিয়ে থামল বাবাঙ্গোরা।

শিবিরের সামনে গিয়ে ওরা দাঁড়াতেই অনেক নারী ও শিশু ছুটে এল চীৎকার করতে করতে। নারীরা থুতু ফেলতে লাগল বন্দীদের উপর আর ছেলেরা ছড়ি দিয়ে মারতে লাগল। তখন যোদ্ধারা তাদের সরিয়ে দিল।

এরপর বন্দীদের গলায় দড়ি দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা ছোট গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হলো।

মার্কস অতিশয় ক্লান্ত হয়ে পড়ায় মাটিতে শুয়ে পড়ল। মুলারগান গাছটায় ঠেস দিয়ে বসে রইল। টারজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারদিকের পরিবেশ খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সে একমনে শুধু মুক্তির কথা চিন্তা করতে লাগল।

সহসা কি একটা আর্তনাদ শুনে মার্কস তার সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বলল, ওটা কিসের শব্দ? শুনতে পাচ্ছ না?

নদীর দিক থেকে একটা আর্তনাদ আসছিল। কিন্তু নদীর ধারে গাছপালা থাকার জন্য ওরা কিছু দেখতে পাচ্ছিল না।

মুলারগান বলল, হয়ত কারো পেটব্যথা করছে।

মার্কস বলল, আমি বুঝতে পারছি ওরা আমাদের নিয়ে কি করবে। কেন যে তুমি আফ্রিকায় এলে।

মুলারগান টারজনের দিকে তাকিয়ে বলল, ও কোন কিছুতেই বিচলিত হচ্ছে না। ও নিশ্চয় জানে ওরা কি করতে চায় আমাদের নিয়ে। ও নিজেই ত একটা বুনো বর্বর লোক।

ওরা কথাগুলো চুপি চুপি বললেও টারজন তা সব শুনতে পেল। সে বলল, তোমরা জানতে চাও ওরা আমাদের কি করবে।

মার্কস বলল, হ্যাঁ, আমরা তাই জানতে চাই।

ওরা আমাদের খাবে।

মার্কস সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল। তার গলা শুকিয়ে গেল। সে জিব দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগল। তারপর বলল, তুমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছ। ওরা নরখাদক নয়। আর কোথাও নরখাদক মানুষ নেই, আছে শুধু ছবিতে আর

গল্পের বইয়ে।

টারজন বলল, তাই নাকি? নদী থেকে আসা আর্তনাদের শব্দ শুনতে পাচ্ছ?

হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।

ওটা হচ্ছে খাওয়ার থেকে আরও খারাপ। ওরা খাবার মাংসগুলোকে নরম করছে। যারা আর্তনাদ করছে তারা হলো কিছু নরনারী আর শিশু। তিন চারদিন আগে ওদের হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে। ওদের মাথাগুলোকে বাঁশের লাঠির সঙ্গে বেঁধে এমনভাবে নদীর জলে ঝুলিয়ে রেখেছে যাতে ওরা ডুবে না যায় বা আত্মহত্যা করতে না পারে। ওরা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। এইভাবে তিন চারদিন ওদের মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখে তারপর ওদের কেটে সেই মাংস খাবে।

একথা শুনে মুলারগানের মুখ সাদা হয়ে গেল। ভয়ে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল মার্কস।

টারজন বলল, তোমরা ভয় পেয়ে গেছ। কষ্টভোগ করতে চাও না। কিন্তু জেব্রা আর হাতিগুলো তোমাদের আঘাতে অনেক কষ্ট অনেক যন্ত্রণা ভোগ করেছে।

মুলারগান বলল, ওরা পশু। কিন্তু আমরা মানুষ।

টারজন বলল, তোমরাও একদিক দিয়ে জন্তু। আহত হলে জন্তুদের মতই তোমাদেরও কষ্ট হয়। বাবাঙ্গোরা তোমাদের খাবার জন্য তোমাদেরও কষ্ট দেবে—এতে আমি খুশি। তোমরা বাবাঙ্গোদের থেকেও খারাপ। হাতি ও জেব্রাগুলোকে মারার কোন কারণ ছিল না তোমাদের। তোমরা তাদের মাংস খাবে না। কিন্তু বাবাঙ্গোরা খাবার জন্যই মানুষ মারে, অকারণে মারে না। তোমরা জীবহত্যা করে আনন্দ পাও। তাই তাদের থেকেও খারাপ।

এরপর তিনজনেই চুপ করে রইল। সবাই ভাবতে লাগল। মার্কস ভয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। মুলারগানও ভেঙ্গে পড়ল। সব সাহস হারিয়ে ফেলল।

মুলারগান অবশেষে বলল, আমি তোমার কথাটা ভাবছি। সত্যিই আমরা জীবহত্যা করে আনন্দ পাই। একথাটা কোনদিন ভেবে দেখিনি। এখন বুঝছি এসব কাজ না করলেই ভাল হত।

কিমা উত্তপ্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়ে পালাতে লাগল। যে ট্রাকটা শিকারীদের খোঁজ করতে যাচ্ছিল সেটা এড়িয়ে গেল সে।

পথে জেব্রাদের মৃতদেহ দেখে মেলটন বুঝতে পারল মুলারগানরা কোন্ পথে গেছে। আরো এগিয়ে গিয়ে একটা খাদের ধারে মুলারগানের মোটরটা

উল্টোন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখল। কিন্তু শিকারীদের কোন হদিশ না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গেল সে।

সে রাত্রিতে বন্দী তিনজনকে এক জায়গায় শুতে দেওয়া হলো। সে রাত্রিতে উৎসবে মেতে রইল বাবাঙ্গোরা। তাদের কথাবার্তা থেকে টারজন বুঝতে পারল পরদিন রাত্রিতে বন্দী শ্বেতাঙ্গদের হাত পা ভেঙ্গে জলে ভাসিয়ে দেবে।

টারজন মুলারগানকে বলল, আমি তোমার হাতের বাঁধন খুলে দেব প্রথমে। তারপর তুমি আমার বাঁধন খুলে দেবে।

মুলারগান বলল, ঠিক আছে।

বন্দীদের কাছে কোন প্রহরী ছিল না। টারজন জানত ওদের উন্মত্ত নাচগান বন্ধ হলেই ওরা পাহারার ব্যবস্থা করবে। সে প্রথমে মুলারগানের বাঁধনটা খুলে দিল। মুলারগান তারপর টারজনের হাতের বাঁধন খুলে দিল। মার্কসএর বাঁধন আরো সহজে খোলা হয়ে গেল।

তিনজনেই এইভাবে মুক্ত হলে টারজন চুপি চুপি তাদের বলল, আমার পিছু পিছু তোমরা বুকে হেঁটে এস। কোন গোলমাল করবে না।

মুলারগান পশুহত্যার ব্যাপারে তার দোষ স্বীকার করায় টারজন তাদের একটা সুযোগ দিতে চায় তাদের মুক্ত করে।

টারজন বুকে হেঁটে বনের দিকে ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগিয়ে গেল। সে একা ওদের সামনে দিয়েই ছুটে পালাতে পারত বনে। কারণ ওর গতিবেগ অবিশ্বাস্যভাবে দ্রুত। ওরা ধরতে পারত না ওকে। কিন্তু সঙ্গে আরও দুজন লোক আছে; তাদের নিয়ে কোনরকমে ওদের অলক্ষ্যে অগোচরে বনের মধ্যে চলে যাওয়াই হলো ওর একমাত্র লক্ষ্য।

ওরা এইভাবে প্রায় একশো ফুট যাওয়ার পর কয়েকবার হাঁটতে থাকে মার্কস। সেই শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে বাবাঙ্গোরা।

টারজন তখন ওদের বলে, এবার উঠে পড়ে বনের দিকে ছুটতে থাক।

ওরা সবাই বনের দিকে ছুটতে থাকলে বাবাঙ্গোরাও ওদের ধরার জন্ম ছুটতে থাকে। প্রথমে মার্কসকে ওরা সহজেই ধরে ফেলল। তারপর মুলারগানকে। টারজনকে ওরা ধরতে পারল না। মুলারগানও হয়ত পালাতে পারত। কিন্তু সে মার্কসকে ফেলে রেখে উদারতার বশবর্তী হয়ে পালাতে চায়নি।

মুলারগানকে ওরা ধরে ফেললেও সহজে কিন্তু ধরা দিতে চায়নি সে। সে পর পর ঘুষি চালিয়ে কয়েকজনকে মাটিতে ফেলে দেয়। কিন্তু পিছন থেকে একজন বাবাঙ্গো এসে বর্শার লম্বা বাঁটটা দিয়ে তার মাথায় এমনভাবে

মারল যে সে পড়ে গেল মাটিতে।

ফাঁকা জায়গাটার শেষ প্রান্ত থেকে বনটা শুরু হয়েছে। একটা গাছের উপরে উঠে টারজন দেখতে লাগল। মুলারগানের বীরত্ব ও সাহসের জন্য মনে মনে প্রশংসা করতে পারল না সে। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে সে তার আত্মত্যাগ ভিত্তিক যে বীরত্বের পরিচয় দিল সে আজ সে বীরত্ব বনের পশুদের মধ্যে দেখাই যায় না। তবে তাদের প্রতি তার বিশেষ কোন নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে না সে। সে শুধু তাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করবে যথাসাধ্য এবং বাবাঙ্গোদের বিব্রত করে তুলবে যথাসম্ভব।

কিমা আবার প্রান্তর পার হচ্ছে। কিন্তু এবার একা একা নয় বা টারজনের কাঁধে চড়ে নয়, এবার সে ওয়াজিরিসর্দার মুভিরোর কাঁধে চড়ে সেই প্রান্তরটার উপর দিয়ে যাচ্ছিল। টারজনের মত মুভিরোর কাঁধের উপর থাকলেও কিমার সাহস দারুণ বেড়ে যায়। তার হৃদয়টা হয়ে ওঠে সিংহের মত।

মেলটন তার লরী নিয়ে মুলারগানদের দেখতে না পেয়ে বন থেকে ফিরে আসার পথে মুভিরোর নেতৃত্বে ওয়াজিরিদলটাকে দেখতে পেল।

সে তার বাইনাকুলার দিয়ে ভাল করে দেখল দলটাকে। তারা আদিবাসী যোদ্ধা হলেও তাদের হাবভাব মোটামুটি বন্ধুত্বপূর্ণ মনে হলো। তবু সে লরীর উপর বসে থাকা নিগ্রোদের সব বাড়তি রাইফেলগুলোকে ঠিক করে রাখতে বলল।

কিন্তু একজন নিগ্রো বলল, ওরা কিছু করবে না। ওদের গুলি করবেন না। তাহলে আমাদের সকলকে মেরে ফেলবে। ওরা হলো বিরাট যোদ্ধা, ওদের বলে ওয়াজিরি। এই অঞ্চলের কোন একটা জায়গা বাবাঙ্গোরা আক্রমণ করেছে তাই ওরা বাবাঙ্গোদের তাড়িয়ে দিতে যাচ্ছে। তবে ওরা আমাদের কোন ক্ষতি করবে না।

মুভিরো ট্রাকের সামনে এসে হাত তুলে ট্রাক থামাল।

মেলটন গাড়ি থামাল। মুভিরো তাকে জিজ্ঞাসা করল, কোথা হতে আসছ?

মেলটন খাদের কাছে গিয়ে যা যা দেখেছিল এবং যাদের খোঁজে সে গিয়েছিল তা বলল সব।

মুভিরো বলল, তোমাদের বন্ধু দুজন ছাড়া আর কোন শ্বেতাঙ্গকে দেখেছিলে?

গতকাল টারজন নামে এক শ্বেতাঙ্গকে দেখেছিলাম।

তোমাদের লোকের সঙ্গে তিনিও কি ধরা পড়েছেন?

মেলটন বলল, তা ত জানি না।

মুভিরো বলল, আমাদের সঙ্গে এসে বনের প্রান্তে শিবির স্থাপন করো। তোমার বন্ধুরা যদি বেঁচে থাকে তাহলে তাদের আমরা ফিরিয়ে আনবই।

কারণ কিমার ব্যাপার দেখেই মুভিরো বুঝতে পেরেছিল টারজন নিশ্চয় কোন বিপদে পড়েছে। তাই তার মনে হলো দুজন শ্বেতাঙ্গ বিদেশীর সঙ্গে টারজনও ধরা পড়েছে বাবাঙ্গোদের হাতে।

যাই হোক ওয়াজিরি যোদ্ধারা বেশ জোর কদমে চলতে লাগল। মেলটন তার ট্রাকটা ধীর গতিতে চালিয়ে তাদের পিছু পিছু যেতে লাগল।

এদিকে বাবাঙ্গোরা সারারাত উৎসবে মেতে থাকার পর গভীরভাবে সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। তারা দুপুরের আগে উঠবে না। তাদের একজন বন্দী পালিয়ে গেছে। তার উপর মুলারগানের আঘাতে তাদের কয়েকজনের চোয়াল আর নাক ভেঙ্গে গেছে।

বাবাঙ্গোদের সঙ্গে লড়াইয়ে মুলারগানের মাথাটা ব্যথা করছিল। মার্কস-এর সর্বাঙ্গ ব্যথা করছিল। সে বলল, নোংরা লোকগুলো আমাদের দেহের তিন চার জায়গার হাড়গোড় ভেঙ্গে জলে তিন চার দিন ডুবিয়ে রাখবে। তারপর খাবে।

মুলারগান তাকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ করো। আমি এসব কথা ভুলে যেতে চাইছি।

টারজন ওয়াজিরিদের সন্ধানে বন পার হয়ে সেই প্রান্তরের কাছে গেল। কিন্তু তাদের দেখা না পেয়ে আবার সে বনের মধ্য দিয়ে গাছে গাছে বাবাঙ্গোদের বস্তীর সামনে এসে হাজির হলো। সে বুঝতে পারল সে একা কখনো তাদের কবল থেকে বন্দী দুজনকে মুক্ত করতে পারবে না।

অন্য পথ দিয়ে সে শিবিরে পৌছল। সেই নদীটার ধারে এসে দেখল নদীর জলে ভিজিয়ে রাখা বন্দীরা তখনো তেমনিভাবে আছে। শিবিরের কাছে সে সিংহের গন্ধ পেল। গন্ধ শুঁকে সে বুঝল একটা সিংহ আর সিংহী ক্ষুধার্ত অবস্থায় শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রায় একডজন বাবাঙ্গো যোদ্ধা মুলারগান আর মার্কসএর কাছে এসে তাদের বাঁধন কেটে দিল। তারপর তাদের দেহদুটোকে জোরে নাড়া দিয়ে তাদের দাঁড় করিয়ে দিল।

এরপর তারা তাদের বস্তীর মধ্যভাগে নিয়ে গেল। সেখানে একটা গাছের তলায় তাদের সর্দার আর যাদুকর ডাক্তার বসে ছিল। যোদ্ধারা অর্ধ বৃত্তাকারে তাদের সর্দারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের পিছনে ছিল নারী আর শিশুরা।

তখন রাত্রিকাল বলে শিবিরের ধারে আগুন জ্বলছিল।

বন্দী দুজনকে মাটিতে চিৎ করে ফেলে দেওয়া হলো। দুজন যোদ্ধা তাদের প্রতিটি হাত পা ধরে ছিল।

অদূরে একটা গাছের উপরে ঘন পাতার আড়াল থেকে সব কিছু লক্ষ্য করছিল এক নগ্নপ্রায় শ্বেতাঙ্গ। বন্দীদের উদ্ধার করার একটা সুযোগ খুঁজছিল সে। সুযোগ না পেলে সে কিছুই করতে পারবে না। সে ওদের বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবন দিতে পারবে না।

এদিকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের কাছ থেকে দুটো সিংহ এক নিমেষহারা চোখে তাকিয়ে ছিল ঘটনাস্থলের দিকে। তাদের লেজদুটো নড়ছিল।

এমন সময় নদী থেকে একটা আর্তনাদের শব্দ পেয়ে সিংহীটা সেইদিকে চলে গেল। কিন্তু সিংহটা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাবাঙ্গোদের দিকে।

যাদুকর ডাক্তার বন্দী দুজনের দিকে এগিয়ে এল। তার এক হাতে ছিল একটা জেব্রার লেজ। সে লেজের উপর পালক লাগানো ছিল। আর এক হাতে ছিল একটা লাঠি।

প্রার্থনার কথাগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করল মুলারগান। তাদের দুজনের উপর জেব্রার লেজটা বুলিয়ে তাদের চারদিকে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল সে আর কি সব বিড় বিড় করে বলতে লাগল।

এরপর হঠাৎ একসময় সে একটা লাফ দিয়ে মুলারগানের শায়িত দেহটার উপর তার লাঠিটা ঘোরাতে লাগল। দুজন যোদ্ধা তাকে আলগা করে ধরে ছিল।

যোদ্ধাদের হাতগুলো এক ঝটকায় সরিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুলারগান। তারপর যাদুকর ডাক্তারের মুখের উপর এমন জোরে একটা ঘুষি মারল যার ফলে তার চোয়াল ভেঙ্গে গেল আর সে মাটিতে পড়ে গেল।

সমবেত যোদ্ধারা চীৎকার করে ঘিরে ধরল মুলারগানকে।

এদিকে সিংহীটা নদীর ধার থেকে তার ধারাল নখওয়ালা একটা থাবা বাড়িয়ে বাবাঙ্গোদের বলি একজন নারীর ভেসে থাকা মাথাটাকে ধরে ফেলল। মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠতেই বাবাঙ্গোরা সেদিকে মনোযোগের সঙ্গে তাকাতেই সিংহটা তাদের আক্রমণ করল। তার ভয়ঙ্কর গর্জনে মাটি কাঁপতে লাগল।

বাবাঙ্গোরা তখন বন্দী দুজন আর আহত যাদুকর ডাক্তারকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল যে যেদিকে পারল।

মুলারগান উঠে দাঁড়াবার আগে সিংহটা তার কাছে গিয়ে পড়ল। শায়িত লোকটির ভীত সন্ত্রস্ত চোখপানে তাকিয়ে রইল সিংহটা। মুলারগান তার নিঃশ্বাসের গন্ধ পাচ্ছিল। তার হলুদ চোয়াল আর দাঁত দেখতে পাচ্ছিল।

এমন সময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল মুলারগান। এ দৃশ্য সত্যিই অভূতপূর্ব।

দেখল টারজন গাছ থেকে নেমে লাফিয়ে পড়ল সিংহটার উপর।

মুলারগান একবার পালিয়ে যাবার ইচ্ছা করল। কিন্তু পারল না। সে মাটির উপর স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে দুচোখ ভরে দেখতে লাগল এই অবিশ্বাস্য ঘটনাটাকে। দেখল টারজনের পাদুটো সিংহের ছোট ছোট পা দুটোকে জড়িয়ে ধরেছে। তার বেশীবহুল লৌহকঠিন হাতদুটো সিংহের গলাটা জড়িয়ে ধরে আছে। টারজন তার দেহের সমস্ত ভার দিয়ে চেপে আছে সিংহটার পিঠে।

সিংহটা তার পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে খাড়া টারজনের দেহটাকে ফেলে দিতে চাইছে আর ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করছে। কিন্তু কিছুতেই মুক্ত করতে পারছে না নিজেকে।

মুলারগান দেখল সিংহটা এবার নিজে থেকে মাটিতে পড়ে টারজনকে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাও পারছে না।

জীবনে বহু লড়াই বহু কুস্তীর প্যাঁচ দেখেছে মুলারগান। কিন্তু সিংহ মানুষে এমন প্রাণপণ লড়াই জীবনে কখনো কোথাও দেখেনি বা তার কথা শোনেওনি।

সিংহদের শক্তির অনুপাতে সহ্যশক্তি নেই। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল সিংহটা। সে এবার চারপায়ের উপর ভর দিয়ে কোনরকমে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল।

টারজন তখন একটা হাত সিংহটার ঘাড় থেকে ছাড়িয়ে খাপ থেকে তার শিকারের ছুরিটাকে বার করল। এই সুযোগে সিংহটা ঘুরে টারজনের হাতটাকে কামড়াতে গেল। কিন্তু টারজন তার ছুরিটা সিংহের ঘাড়ের উপর আমূল বসিয়ে দিল।

সিংহটা বিকট গর্জন করতে করতে যতবার শূন্যে লাফ দিতে লাগল ততবার তার ঘাড়ে ও পাঁজরে ছুরিটা সজোরে আমূল বসিয়ে দিতে লাগল টারজন।

এইভাবে তিনবার ছুরির আঘাত খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে গেল সিংহটা।

সিংহটা পড়ে গেলে তার মৃতদেহের উপর একটা পা রেখে আকাশের পানে মুখ তুলে বিজয়ী বাঁদরগোরিলাদের মত ভয়ঙ্করভাবে চীৎকার করে উঠল। তা শুনে মাটিতে বসে পড়ল মার্কস। মুলারগানের মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল। বাবাঙ্গোরা সিংহগর্জনের থেকে আরো ভয়ঙ্কর সেই অচেনা চীৎকার শুনে ছুটে আরো দূরে পালাতে লাগল।

টারজন বন্দীতুজনকে মুক্ত করে সেই নৈশ অন্ধকার বনের মধ্য দিয়ে সেই প্রান্তরের কাছটায় নিয়ে এল।

পরদিন আপন আপন লোকদের সঙ্গে মিলন হলো সকলের। মুলারগান আর মার্কস মেলটনের সঙ্গে এক শিবিরে রইল। টারজন ওয়াজিরিদের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগল। বাবাঙ্গোদের ঐ অঞ্চল হতে তাড়াবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে লাগল তারা।

যাবার আগে টারজন মুলারগান ও মার্কসকে বলল, আফ্রিকা থেকে সোজা আমেরিকায় চলে যাবে। আর কখনো আসবে না।

মুলারগান বলল, 'কখনো না' একথাটা কতদিন মনে রাখতে পারব তা জানি না।

মার্কস টারজনকে বলল, শোন মিস্টার, তুমি যদি আমার হয়ে একবার কুস্তি লড়ো তাহলে তোমাকে একশো স্বর্ণমুদ্রা দেব।

টারজন মুখ ঘুরিয়ে ওয়াজিরিদের সঙ্গে চলে গেল সেখান থেকে।

মার্কস মুলারগানকে বলল, দেখলে, লোকটা একশো স্বর্ণমুদ্রা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল। তবে তোমার পক্ষে ভালই হয়েছে। কারণ ও একবার লড়াইয়ে নামলে এক রাউণ্ডে তোমার চ্যাম্পিয়নপদ কেড়ে নিত।

টারজন এ্যাণ্ড দি জাঙ্গল মার্ডারস্

টারজন ও জঙ্গলে খুন

ব্রোঞ্জের মত গায়ের রং, নগ্নপ্রায় দৈত্যাকার দেহ। একদিন প্রথম সকালে সূর্য ওঠার আগেই বনপথ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছিল একটি মানুষ। সে মানুষ হলো টারজন। এদিকে বনটা অনেক পাতলা। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল কিছু কিছু গাছ। তাই তার গতিবেগ ছিল অবাধ এবং দ্রুত।

জঙ্গল এখানে ঘন হলে সে গাছের উপর দিয়ে এগিয়ে যেত ডালে ডালে। এইভাবে যাবার সময় সে পায় বাঁদরের মত গতিবেগ আর তার দেহে আসে বাঁদরগোরিলার শক্তি। সভ্য জগতের সঙ্গে অনেক রকমের সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও তার সুদূর শৈশব ও বাল্যকালের বন্য জীবনযাত্রার অনেক কিছুই আজও রয়ে গেছে তার মধ্যে।

আজ তাকে দেখে পরিবেশ সম্বন্ধে উদাসীন ও নির্বিকার মনে হলেও আসলে তার চারপাশের পরিবেশ সম্বন্ধে সব সময়ই সজাগ ও সচকিত থাকে তার প্রতিটি ইন্দ্রিয়।

পথে যেতে যেতে আগেই বুঝতে পেরেছিল টারজন তার বাঁ দিকে প্রায় একশো ফুট দূরে একটা সিংহ আধখাওয়া একটা জেব্রার মৃতদেহের পাশে শুয়ে আছে। চোখে না দেখলেও বাতাসে ভেসে আসা গন্ধ থেকে এসব জানতে পেরেছিল সে।

সিংহটার পেটে যে ক্ষিদে নেই এটাও সে বুঝতে পেরেছিল গন্ধসূত্র ধরে। তাই সে কোন ভয় না করে পথ চলতে লাগল উদাসীনভাবে। চোখ ও কানকে সব সময় বিশ্বাস করে না টারজন। অল্প আলো বা অন্ধকারে চোখে দেখা যায় না। কানে শোনা শব্দ অনেক সময় ধরা যায় না ঠিকমত। কিন্তু নাকের গন্ধ কখনো প্রতারণা করে না টারজনের সঙ্গে। তবে এক্ষেত্রে একমাত্র সমস্যা হলো অনুকূল বাতাস।

পথে একটা নদী পেল টারজন। কিন্তু তখন নদীটা সাঁতার কেটে পার হওয়ার কোন ইচ্ছা ছিল না বলে অন্য পথ ধরল সে।

এই সময় অনুকূল বাতাস না পেয়ে কানটাকে সজাগ করে রাখল টারজন। সহসা দূর থেকে আসা হায়েনার শব্দ শুনতে পেল সে।

সব জীবজন্তুর মধ্যে ভাঙ্গো বা হায়েনাকে মোটেই দেখতে পারে না সে। একমাত্র কুমীর ছাড়া হায়েনাকেই সবচেয়ে ঘৃণা করত। সবচেয়ে বিশ্রী লাগে তার গায়ের গন্ধ। হায়েনার গন্ধ মোটেই সহ্য করতে পারত না টারজন।

তবে শুধু ঘৃণার বশবর্তী হয়ে কোন জন্তুকে বধ করা টারজনের নীতি নয়। বিশেষ কোন ক্ষতি না করলে কোন হায়েনাকে মারত না সে। তাই সে সব সময় হায়েনাকে এড়িয়ে যেত।

ভাঙ্গো বা হায়েনাকে এড়িয়ে যাবার জন্য আবার পথ পরিবর্তন করল টারজন। কিন্তু হঠাৎ হায়েনার চীৎকারের মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত ভাব বুঝতে পারল যার জন্য সে তার মন পরিবর্তন করল। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখতে চাইল।

তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিল টারজন। বনটা ঘন হলে সে গাছের উপর উঠে ডালে ডালে বড় বড় লাফ দিয়ে দারুণ বেগে এগিয়ে চলল। গাছের বাঁদরগুলো তার সঙ্গে কথা বলল। অন্য সময় হলে সে বাঁদরছানার সঙ্গে খেলা করত অথবা বড় বড় পুরুষ বাঁদরগুলোর সঙ্গে নারকেল নিয়ে লোফালুফির খেলা খেলত। কিন্তু তখন তার সময় ছিল না বলে থামল না সে একবারও। ভাঙ্গোর কণ্ঠস্বরের মধ্যে এই অদ্ভুত ভাবের কারণ কি সেটা সে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জানতে চায়।

তবু একটা পুরুষ বাঁদর একটা নারকেল টারজনের দিকে ছুঁড়ে দিলে টারজন সেটা ধরে নিয়ে বাঁদরটাকে ছুঁড়ে দিলে বাঁদরটা পড়ে গেল গাছ থেকে।

অন্য বাঁদরগুলো হাসতে লাগল। টারজন সেই বাঁদরটাকে বলল, তোমার ছোট ছোট ভাইদের সঙ্গে খেলা করো।

এই বলে আবার তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিল টারজন। ক্রমে হায়েনাদের চীৎকারের শব্দটা আরো জোরে শোনাতে লাগল। তীব্র হয়ে উঠতে লাগল তাদের গায়ের গন্ধ। অন্য সময় হলে ঘৃণায় থুতু ফেলত সে। কিন্তু এখন সব ঘৃণার কথা ভুলে এগোতে লাগল শব্দ লক্ষ্য করে।

আরো কিছুটা গিয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এমন একটা দৃশ্য দেখল সে যা সাধারণতঃ আফ্রিকার জঙ্গলে দেখা যায় না।

টারজন দেখল সেই জায়গার উপর আংশিকভাবে ভাঙ্গা একটা বিমান পড়ে আছে। ছ সাতটা হায়েনা সেই বিমানটাকে ঘিরে অশান্তভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চীৎকার করছে। আর মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে বিমানটার গায়ে উঠে ভিতরে কি আছে তা দেখতে চাইছে।

গাছ থেকে নিঃশব্দে মাটিতে নেমে এল টারজন। তারা গর্জন করতে করতে কিছুটা তেড়ে এল। কিন্তু পরক্ষণেই পিছিয়ে গেল। কোন জীবন্ত

প্রাণীর দিকে সাবধানে এগোয় ওরা।

তবে টারজনকে একা দেখে হায়েনাগুলো দাঁত বার করে এগিয়ে আসতে লাগল। বিশেষ করে ওদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী ও দলপতি টারজনকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলো।

টারজন কিন্তু তেমন গ্রাহ্য করল না হায়েনাগুলোকে। সে খাপ থেকে ছুরিটা বার করল না। অথবা তূণ থেকে তীর বার করে ধনুকে জুড়ল না। এমন কি হাতের বর্শাটা নিয়েও তাড়া করল না তাদের।

টারজনের ঔদাসীন্য ও নির্বিকার ভাব দেখে হায়েনাদের দলের নেতা ও সবচেয়ে বড় হায়েনাটা লাফ দিয়ে গায়ে উঠে টারজনের গলাটায় কামড় দিতে গেল।

কিন্তু টারজন তার একটা হাত দিয়ে হায়েনাটার গলা ধরে অন্য হায়েনাগুলোর উপর এমন জোরে আছাড় মেরে ফেলে দিল যে তিনটি হায়েনা চাপা পড়ে গেল তার চাপে।

চাপা পড়া হায়েনা তিনটি আবার উঠে পড়ল বটে কিন্তু তাদের দলনেতা হায়েনাটা আর উঠতে পারল না। সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব হায়েনাগুলো সেই মরা হায়েনাটার মৃতদেহটা ছিঁড়ে খেতে লাগল।

ওদের গন্ধ থেকে টারজন বুঝতে পেরেছিল ওরা এখন ক্ষুধার্ত। ক্ষুধার্ত হলে ওরা দুঃসাহসী হয়ে ওঠে।

হায়েনাগুলো মৃতদেহটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে থাকলে টারজন বিমানটাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেখল বিমানটার একদিকের একটা পাখা ভেঙ্গে গেছে। নামার সিঁড়িটাও ভেঙ্গে গেছে। পাইলট তখনো ককপিটে ছিল। কিন্তু টারজন দেখল তার মাথাটা ঢলে পড়েছে ইনস্ট্রুমেণ্ট বোর্ডের উপর।

নম্বর আর চিহ্ন দেখে টারজন বুঝল ইতালির বিমানবাহিনীর এক সামরিক বিমান। এরপর সে বিমানের পাখাটায় উঠে ককপিট থেকে মৃতদেহটাকে টেনে বার করে এনে দেখল। একদিন বা দুদিন আগে মৃত্যু হয়েছে। গলায় একটা গুলির দাগ। আকাশে বিমানটা ওড়ার সময়েই গুলিটা লাগে। তার আহত হওয়ার পরও সে বিমানটাকে নামায় কোনরকমে। কিন্তু আরো যাত্রী ছিল নিশ্চয়ই। তারা কোথায়?

আশপাশের মাটিতে যাদের পায়ের দাগ রয়েছে তারা ত আদিবাসী নয়। কিছু সিগারেটের টুকরো আর একটু সিলোফেন দেখতে পাওয়া গেল।

টারজন মৃত লোকটির ক্ষত দেখে বুঝল, এই পাইলটের সঙ্গীরা বা বিমানের যাত্রীরা যদি তাকে গুলি করত তাহলে সে গুলি আসত পিছন থেকে অথবা ডান দিক থেকে। কিন্তু ক্ষতটা আছে তার বাঁদিকের গলায়। সুতরাং একই স্তরে উড়ে চলা কোন উড়ন্ত বিমান থেকে কেউ গুলি করেছে তাকে।

কিন্তু সে বিমানটা গেল কোথায় ? দুর্গম আফ্রিকার জঙ্গলের বুকে এ এক নতুন রহস্য।

হায়েনাগুলো মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে দারুণ চীৎকার করছিল। কিন্তু এই রহস্য উদ্‌ঘাটনে টারজনের মনটা তখন এমনই ব্যস্ত ছিল যে বিরক্ত হলেও সে তার বর্শা নিয়ে হায়েনাদের তাড়াতে গেল না।

খুঁজতে খুঁজতে টারজন একটা ভাল হাতের দস্তানা দেখতে পেয়ে কুড়িয়ে নিল সেটা। এই সময় হায়েনাদের চীৎকার আর দুর্গন্ধ অসহ্য ঠেকায় সে তাদের বর্শা উঁচিয়ে তাড়িয়ে দিল। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক সেদিক পালিয়ে গেল।

আশেপাশের মাটিটা পরীক্ষা করে টারজন দেখল দুজন লোকের পায়ের দাগ রয়েছে। তারা এখান থেকে নিচের দিকে কোথাও গেছে।

টারজন তা দেখে আপন মনে বলল, আমি এই পায়ের দাগ অনুসরণ করে দেখা করব তাদের সঙ্গে।

তার কারণটাও সে বুঝল। যে দুজন বিপন্ন মানুষ ভগ্ন বিমান থেকে নেমে এই জঙ্গলে ঘুরছে তারা মানুষ, আবার তারা বিদেশী। তাদের সাহায্যের দরকার হতে পারে। তার এলাকায় কোন বিদেশী এসে কি করছে সেটা দেখা উচিত তার।

এই ভেবে সেখান থেকে এগিয়ে চলল টারজন। এক জায়গায় তার প্রিয় হাতি বন্ধু ট্যাণ্টর তাকে দেখে শুঁড়টা বাড়িয়ে দিল তাকে পিঠে তুলে নেবার জন্য। কিন্তু টারজন তখন খুব ব্যস্ত থাকায় হাতিটাকে একটু আদর করে ছেড়ে দিল।

সকালের বাতাসে টারজন একটা নতুন গন্ধ পেল। সে গন্ধটা হলো তার একটা বিমানের। এদিক সেদিক খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গায় আর একটা বিমান পড়ে আছে দেখতে পেল। সে বিমানটা একেবারে ভাঙা এবং দোমড়ানো। বিমানের পিছন দিকটা দেখে টারজন বুঝল মেশিনগানের গুলিতে সেদিকটা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে।

তার মানে সে বুঝল। আকাশে উড়ে চলার সময়ই যুদ্ধ বাধে দুটো বিমানের মধ্যে। প্রথম বিমানটা এই বিমানটাকে মেশিনগান থেকে গুলি করে ভেঙে নামিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিমান থেকে তখন রিভলবারের গুলি দিয়ে প্রথম বিমানের চালককে হত্যা করা হয়।

ভাঙা বিমানটার কিছু দূরে একটা প্যারাসুট দেখতে পেল টারজন।

অনেক কিছু চিন্তা করার পর সে বুঝল মোট তিনজন দুটো ভাঙা বিমান থেকে বেরিয়ে কোথাও গেছে। কিন্তু কোথায় গেছে এই বিশাল জঙ্গলের মধ্যে ? তারা কি এখনো জীবিত আছে ?

টারজন আরো দেখল প্রথম বিমানটি ইতালীয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিমানটি ইংরেজদের এবং তার চালকও নিশ্চয় ইংরেজ।

টারজনের দেহে ইংরেজ রক্ত প্রবাহিত হওয়ায় ইংরেজ বিমান চালককে উদ্ধার করার আগ্রহ বেশী অনুভব করল সে তার মনের মধ্যে। কারণ সে জানে জঙ্গলের এদিকটায় সিংহ আর বুইরো নামে একজাতের নরখাদক আদিবাসীর উৎপাত খুব বেশী।

টারজন জানত না এই ইংরেজের নাম লেফটন্যাণ্ট সিসিল বার্টন।

লণ্ডনে সামরিক বিভাগের দপ্তর থেকে জুভানভ আর মোশেবা ক্যাম্পবেল নামে দুজন লোক বিমানধ্বংসী এক নতুন ধরনের মেশিনের একটা নক্সা চুরি করে রোমে পালিয়ে যায়। তাদের অনুসরণ করে নক্সাটাকে উদ্ধার করার ভার পড়ে সিসিল বার্টনের উপর।

সিসিল বার্টন রোমে গিয়ে জুভানভরা যে হোটেলে থাকত সেই হোটেলে গিয়ে জুভানভের ব্যাগ থেকে সেই নক্সাটা লুকিয়ে নিয়ে ব্রিটিশ অধিকৃত কেপটাউনে চলে যায়।

জুভানভ ও ক্যাম্পবেল তখন দুজনে মিলে ইতালির একটি সামরিক বিমানে করে কেপটাউনের দিকে রওনা হয়ে পড়ে। কারণ তারা খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে সিসিল বার্টন ইতালি থেকে সোজা কেপটাউনে পালিয়ে গেছে। তাদের এই সামরিক বিমানের চালকের নাম ছিল লেফটন্যাণ্ট এর্লিনি।

২

লেফটন্যাণ্ট সিসিল বার্টন ভূমধ্যসাগরের উপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে আফ্রিকার উপকূলভাগের দিকে উড়ে চলেছিল। সে হঠাৎ পশ্চিমে ফিরে লণ্ডনে চলে যেতে পারত। কিন্তু ইংরেজ সরকার থেকে নির্দেশ এসেছে তাকে আফ্রিকার কেপটাউনে যেতে হবে। যাবার পথে বঙ্গানিতে নেমে তার রাখা সেখানকার রেসিডেণ্ট কমিশনারের হাতে নক্সাটা দিয়ে যেতে হবে।

বঙ্গানিতে একটা বিমানবন্দর ছিল অবশ্য। কিন্তু সেটা জরুরী অবস্থায় কাজ চালানোর জন্য ব্যবহৃত হত। সেখানে বিমানে তেল নেবার ব্যবস্থা আছে কি না তা না জানায় বার্টন ঠিক করল সে তিউনিসে নেমে ট্যাঙ্কে তেল ভরে নেবে।

সে যখন ট্যাঙ্কে তেল ভরছিল আর অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছিল তখন তিউনিসের একজন অধিবাসী তাকে ইংরেজি ভাষায় বলল, ইতালীয়া

তোমাকে মারতে মারতে কেপটাউনে নিয়ে যাবে যদি বেশীক্ষণ এখানে থাক।

বার্টন বুঝল, ইতালীয় সরকার নিশ্চয় তার খোঁজ করছে এবং তাকে ধরার জন্ত তার পিছু নিয়েছে।

তাই তেল ভরেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিমান ছেড়ে দিয়ে আকাশে উঠল বার্টন। বুঝল তিউনিসের স্থানীয় লোক তাকে সতর্ক করে দিয়ে ভালই করেছে। তার উপকার করেছে।

বারবার পিছন ফিরে আকাশপথে দেখতে লাগল বার্টন। দেখতে লাগল কোন অনুসরণকারী বিমান তার পিছু পিছু আসছে কি না। তিউনিসের বিমানবন্দরে তার মোট সময় গেছে আধঘণ্টা। তখন গোধূলিবেলা। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতে তখনো কিছু দেরী আছে। তাই বার্টন ভাবল সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত যদি সে অনুসরণকারীদের দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকতে পারে তাহলে রাত্রির অন্ধকারে তাকে ধরতে পারবে না তারা। সে যাচ্ছিল বঙ্গানি বিমানবন্দরের দিকে। কেপটাউনে যাবার আগে সেখানে থামবে সে।

এই পথটাই পূব দিক দিয়ে কেপটাউন চলে গেছে। আর একটা পথ কায়রো থেকে পশ্চিম দিক দিয়ে গেছে কেপটাউনে। সেই পথটাই বেশী ব্যবহৃত হয়। কারণ সে পথটা নিরাপদ।

সহসা পিছন ফিরতেই অস্তম্লান সূর্যের শেষ রশ্মিতে বার্টন একসময় দেখল তার পিছনে অনেক দূরে একটা উড়ন্ত বিমানের রূপালি পাত চকচক করছে।

তার বিমানের আলো দেখে পিছনের বিমান সারারাত ধরে অনুসরণ করে আসতে লাগল। বিমানটা তার বিমানের থেকেও দ্রুতগামী। তাই তার খুব কাছে কাছে আসছে।

শত্রুদের আসল উদ্দেশ্যের কথাটা বুঝতে পারল বার্টন। শত্রুরা তাকে চায় না, চায় শুধু সেই নক্সাটা আর তার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র। একবার সে কোন রকমে বঙ্গানিতে পৌঁছতে পারলেই আর তার কোন ভয়ই থাকবে না। তার নক্সা ও সরকারী কাগজপত্র সব নিরাপদে রেখে দিতে পারবে। তার যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে.

কিন্তু তা আর হলো না। সকাল হতেই বার্টন দেখল অনুসরণকারী বিমানটা তার একেবারে কাছে বাঁ দিকে এসে পড়েছে। তার একদিকের পাখাটা প্রায় ঠেকছিল তার বিমানের পাখায়।

বার্টন দেখল সেটা ইতালির বিমানবাহিনীর এক অনুসন্ধানকারী বিমান। ইতালীয় সামরিক বিভাগের একজন অফিসার সেটা চালাচ্ছে। এ ছাড়া সে বিমানে যে দুজন যাত্রী ছিল তাদের চিনত না বার্টন। তবে তার মনে হলো তারাই হলো জুবানোভ আর ক্যাম্পবেল। তাদের কখনো চোখে

দেখেনি এবং চিনত না। তবু তার মনে হলো তারা ছাড়া আর কেউ নয় এই দুজন যাত্রী।

উড়ন্ত বিমান দুটোর পিছনে ছিল উন্মুক্ত প্রান্তর। অনুসরণকারী বিমানের চালক তাকে প্রায়ই থামতে বলছিল। কিন্তু বার্টন থামবে না। সে দেখছিল আর মাত্র পঞ্চাশ মাইল পরেই বঙ্গানির বিমানবন্দর। সুতরাং সে ইশারায় জানাল সে থামবে না।

তখন পিছনের বিমান থেকে মেশিনগানের গুলি ছুটে এসে তার বিমানের পিছনে লাগল। বার্টনের হাতে তখন ছিল মাত্র একটা পিস্তল। সেই পিস্তল থেকে সে বিমানের কণ্ট্রোলরুমের দিকে গুলি করল। পাইলট বা কণ্ট্রোলরুমের যাতে ক্ষতি হয় তার জন্য আরো তিন চারবার গুলি করল সে।

পিছনের বিমানটা তখন তার দিক পরিবর্তন করল। মনে হলো সেটা নামতে শুরু করেছে। বার্টন তখনো এগিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু যাবার আগে তার শত্রুরা চরম আঘাত হেনে গেল তাকে। মেসিনগান থেকে আবার গুলি করতে সে গুলির আঘাতে তার বিমানের পিছনের রাডার ও স্টেবিলাইজার ভেঙ্গে গেল। বিমানটা ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে নিচে নামতে লাগল।

বার্টন তখন এঞ্জিন থেকে বেরিয়ে এসে প্যারাসুটে করে মাটিতে নামল। নামার সময় দেখল অনুসরণকারী শত্রুবিমানটা দক্ষিণ দিকে নিচে নামতে নামতে বনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একই বনের মধ্যে দু জায়গায় ভেঙ্গে পড়ে থাকা এই বিমান দুটিকে দেখে টারজন।

প্যারাসুট থেকে বাইরে এসে বার্টন দেখল, চারদিকে শুধু বন আর বন। কোথাও কোন জনবসতি বা জনপ্রাণী নেই। দেখল আফ্রিকার বিশাল গভীর জঙ্গলের মাঝখানে এসে পড়েছে সে। তার মনে হলো এখান থেকে পূর্ব দিকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে পড়বে বাসেলি।

বার্টন দেখল তার বিমানটা একশো ফুট দূরে পড়েছে। এঞ্জিনে আগুন লাগেনি। এঞ্জিনটা কেটে দিয়েছিল সে শুধু। বিমানে গিয়ে কিছু খাবার আর গুলি নিয়ে এসে তার ধারণামত পথ ধরে বঙ্গানির দিকে রওনা হয়ে পড়ল সে।

সে বুঝতে পারল তার অনুসরণকারীদের বিমানটাও এখান থেকে কিছু দূরে পড়েছে এবং তারা তার খোঁজে বেরিয়ে পড়বে নিশ্চয়। সে ভাবল বঙ্গানি যদি এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে হয় তাহলে আজ থেকে তৃতীয় দিনের মধ্যে সে পৌছবে সেখানে। সে প্রার্থনা করল ঈশ্বরের কাছে এই বনে যেন সিংহ না থাকে এবং যদি কোন আদিবাসী থাকে তাহলে তারা যেন বন্ধুভাবাপন্ন হয়।

কিন্তু বার্টন জানত না যে এ অঞ্চলে সিংহ আছে এবং এখানকার আদিবাসীরা মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন নয়। সে আরও জানত না বঙ্গানি এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল নয়, তিনশো মাইল দূরে অবস্থিত।

৩

সিসিল বার্টনের পথে রইজো নামে এক নরখাদক আদিবাসী ছিল। কিন্তু সে তাদের দেখা না পাওয়ায় সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পার হয়ে গেল তাদের অঞ্চলটা। অথচ এই আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে যার জন্ম সেই বাঁদরদলের রাজা টারজন ঘটনাক্রমে বুইরোদের আকস্মিক আক্রমণে আহত ও বন্দী হলো।

টারজন সেদিন প্রতিকূল বাতাসে বনের মধ্য দিয়ে যখন যাচ্ছিল তখন অনুকূল বাতাসের অভাবে কোন গন্ধ-সূত্র না পাওয়ায় সে মোটেই জানতে পারেনি প্রায় বিশজন বুইরো তার পথ ধরেই আসছে। তারা শিকার করতে করতে এসে পড়ে সেইদিকে।

তারা খুবই নিঃশব্দে তার দিকে এগিয়ে আসছিল বলে তাদের পদক্ষেপের কোন শব্দ শুনতে পায়নি টারজন।

এমন সময় তাঁর বাঁ দিকে একটা আহত সিংহকে দেখতে পেল সে। সিংহটার গায়ের একপাশ থেকে রক্ত পড়ছিল। সিংহটা হঠাৎ ঘুরে আক্রমণ করল টারজনকে। টারজন তার ডান কাঁধ থেকে ভারী বর্শাটা নামিয়ে তা দিযে সিংহটাকে মারতে উদ্যত হতেই পিছন থেকে বুইরোরা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপরে।

তাদের সর্দার পিঙ্গুর ছেলে চেমিঙ্গো চিনতে পেরেছিল টারজনকে। এই টারজনই একবার তাদের গাঁ থেকে তাদের এক বন্দীকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে বোকা বানায় তাকে।

চেমিঙ্গো তাই সময় নষ্ট না করে তার বর্শা দিয়ে টারজনের পিঠে আঘাত করল। তবে আঘাতটা তত জোর হয়নি, তেমন আহত হলো না টারজন। টারজনও তার পিঠের তূণ থেকে একটা তীর নামাল।

এদিকে সিংহটা তখন ঢাল হাতে একজন বুইরো যোদ্ধার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ফেলে দিল। তখন অন্য যোদ্ধারা একযোগে আক্রমণ করে ঘায়েল করে ফেলল সিংহটাকে।

চেমিঙ্গো এবার খুশি হয়ে বন্দী টারজন আর সিংহের একটা মৃতদেহ নিয়ে বিজয়গর্বে তাদের গাঁয়ে গিয়ে হাজির হলো।

তাদের গাঁয়ের যাদুকর ডাক্তার বন্দী অবস্থায় না রেখে তখনি মেরে ফেলতে বলল টারজনকে। কিন্তু গাঁয়ের অনেকে টারজনকে ছেড়ে দিতে বলল। কারণ তাকে বধ করলে তার মৃত আত্মা গাঁয়ের অনেক ক্ষতি করবে।

তখন চেমিঙ্গোর বাবা সর্দার পিঙ্গু একটা আপোষ করল।

পিঙ্গু হুকুম দিল, বন্দীকে ভাল করে বেঁধে উপযুক্ত পাহারার মধ্যে রেখে দাও। তার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করো। এর মধ্যে যদি কোন অশুভ ঘটনা না ঘটে তাহলে অন্যান্য বন্দীদের মত তারও অবস্থা হবে। তখন ভোজন উৎসব চলবে।

টারজনের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরা বন্ধ হয়ে গেল। সাধারণ মানুষ হলে সেই ক্ষততেই মৃত্যু হত তার। কিন্তু টারজন সাধারণ মানুষ নয়। এরই মধ্যে সেরে উঠেছে সে! মুক্তির কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে।

বুইরোরা তাকে শক্ত করে বেঁধে রেখেছিল। প্রতিদিন রাতে তারা বাঁধনটা শক্ত করে দিত। আবার টারজন তার পরে একটু একটু করে আলগা করে দিত সে বাঁধন যাতে তার হাতে পায়ের রক্ত চলাচলে কোন অসুবিধা না হয়।

টারজন ভাবত এই বাঁধন অমর্যাদাকর তার পক্ষে। তাছাড়া কোন মানুষ যদি ইচ্ছামত তার হাত পা চালাতে না পারে তাহলে সে মানুষই নয়, আধা মানুষ। বুইরোরা যখন তাকে শিশুর মত খাইয়ে দেয় তখন তার আরও খারাপ লাগে।

রাগের আগুনে টারজনের অন্তরটা জ্বলতে থাকলেও মাথাটা ঠাণ্ডা রাখে সে।

টারজন বুঝতে পারে তারা ওকে খাইয়ে মোটা করতে চাইছে। তার শক্ত পেশীবহুল দেহটার মাংস খেতে ওদের ভাল লাগবে না; তাই তার দেহে চর্বির সঞ্চার করে ওর দেহটাকে নরম করতে চায়।

তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় সাধারণতঃ অন্য সব মানুষদের থেকে সজাগ থাকে সব সময়। কিন্তু সে একটা ঘরের মধ্যে বন্দী থাকায় চোখ কোন কাজ করতে পারে না। তার দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করতে পারে না। হাত-পা বাঁধা থাকায় স্পর্শেন্দ্রিয় কাজ করতে পারে না। কিন্তু তার কান আর নাক সজাগ এবং সক্রিয় আছে আগের মতই।

তার শ্রবণেন্দ্রিয় আর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ছাড়া অন্য ইন্দ্রিয় সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে আছে এখন। শব্দ ও গন্ধের প্রতি খুব বেশী সচেতন হয়ে বস্তীর বাইরে বনের মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে তা জানতে চায় সে।

বন থেকে বাতাসে ভেসে আসা অনেক শব্দই শুনতে পায় সে। শীতা বা চিতা বাঘের ডাক, ডাঙ্গো বা হায়েনার অট্টহাসি, নুমা বা সিংহের গর্জন—

অনেক কিছুই শুনতে পায় সে।

সহসা একটা শব্দ শুনে সজাগ হয়ে ওঠে সে। মাথাটা দোলাতে দোলাতে মন্ত্র উচ্চারণের মত মুখ থেকে একটা শব্দ বার করতে থাকে। প্রহরারত রক্ষী তাকে জিজ্ঞাসা করে, কি করছ ?

টারজন বলে, আমি প্রার্থনা করছি।

রক্ষী পিঙ্গুর কাছে গিয়ে কথাটা জানালে সে বলে, ঠিক আছে। ওকে প্রার্থনা করতে দাও।

রক্ষী এসে দেখে সেইভাবে প্রার্থনা করতে করতে মাঝে মাঝে চীৎকার করে উঠছে টারজন।

টারজন বুঝতে পারে তার চীৎকারে কাজ হচ্ছে। কানে এক বাঞ্ছিত শব্দ আর নাকে এক আকাঙ্খিত গন্ধ পায় সে। বুইরোরা এসব কিছুই বুঝতে পারে না।

টারজন যখন এক একবার গলা ফাটিয়ে চীৎকার করে তখন বুইরোরা ভাবে তার গলায় খুব জোর আর সে তার দেবতাদের শোনাবার জন্য এত জোরে চীৎকার করছে।

এদিকে জঙ্গলের গভীরে তখন টারজনের হাতিবন্ধু ট্যাণ্টর একদল হাতির সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে ছিল দলপতি। সে হঠাৎ টারজনের ডাক শুনতে পায়। সে তখন চীৎকার করে তার দলের অন্য সব হাতিদের জড়ো করে এক জায়গায়। তারপর একযোগে টারজনের গলার শব্দকে লক্ষ্য করে বুইরোদের বস্তীর দিকে আসতে থাকে।

গাছপালা ভেঙ্গে গর্জন করতে করতে গাঁয়ের দিকে আসতে থাকা হাতির দলের শব্দটাকে টারজনই প্রথম শুনতে পায়। হাসি ফুটে ওঠে টারজনের ঠোঁটে। তার প্রার্থনায় তাহলে কাজ হয়েছে।

টারজন এবার স্পষ্ট শুনতে পায় কাঠের গেট ভেঙ্গে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়েছে মত্ত হাতির দল। সে তখন জোরে চীৎকার করে ওঠে, ট্যাণ্টর ট্যাণ্টর, তোমরা আমার কাছে এস। এই যে আমি।

কিন্তু টারজনের ডাক শোনবার কোন প্রয়োজন ছিল না হাতিদের। তার গন্ধ তারা পেয়েছিল।

গোটা গাঁটাকে বিধ্বস্ত করে সব কুঁড়েগুলোকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে টারজনের ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হল হাতিরা। তারপর ঘরের চালটাকে তুলে ফেলে টারজনকে শুঁড় দিয়ে পিঠে উঠিয়ে নিল তার বন্ধু ট্যাণ্টর।

হাতির পিঠে উঠেই টারজন অন্য হাতিদের কি করতে হবে না হবে নির্দেশ দিতে লাগল। গোটা গাঁটা একেবারে বিধ্বস্ত হলে এবং বুইরোরা হাতিদের অত্যাচারে গাঁ ছেড়ে সাময়িকভাবে পালিয়ে গেলে টারজন হাতির

দলকে বনে ফিরে যাবার নির্দেশ দিল। টারজনের হাতদুটো বাঁধা ছিল তখনো। হাতির পিঠে চেপে বনে ফিরে গেলে বাঁদরেরা খুলে দিল তার হাতের বাঁধন।

ট্যাণ্টরকে আদর করে হাতিদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর আবার গাছে উঠে যাত্রা শুরু করল টারজন। কিন্তু এবার আর বিদেশী বিমানযাত্রীদের খোঁজে নয়। সেই ইংরেজ বিমানযাত্রী হয়ত এতদিনে আর বেঁচে নেই। হয় সে বনের মধ্যে না খেয়ে মারা গেছে অথবা কোন হিংস্র জন্তুর পেটে গেছে।

যাই হোক, এখন বঙ্গানি যেতে হবে। সেখানকার রেসিডেন্ট কমিশনার তার বন্ধুবর টারজনকে ঢোল সহরৎ করে খবর পাঠিয়েছেন সে যেন অবিলম্বে দেখা করে তাঁর সঙ্গে। বুইরোদের গাঁয়ে বন্দী অবস্থায় থাকার সময়েই এই ঢোল সহরতের কথা শুনতে পায় সে।

৪

আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিনের পর দিন ধরে পথ চললেও সে কিকরে অক্ষত রইল সেটা সত্যিই আফ্রিকার ইতিহাসে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। যাই হোক যে ভাগ্যের সুতো বার্টনকে টেনে এনেছে এই অবস্থার মধ্যে সে সুতোটাতে আজও রক্তের দাগ কেন লাগেনি তা বলতে পারবে না কেউ।

তবে পথে দু দুবার সিংহের কবলে পড়েছিল বার্টন। কিন্তু দুটোরই কাছাকাছি একটা গাছ পেয়ে যাওয়ায় সেই গাছের উপর উঠে পড়ে প্রাণ বাঁচায় সে। একবার সারাদিন গাছে উঠে বসে থাকতে হয় সিংহের ভয়ে। তৃষ্ণায় একটু জল পর্যন্ত খেতে পায়নি। অবশেষে অধৈর্য হয়ে শিকারের আশা ছেড়ে চলে যায় সিংহটা। আর একদিন আর একটা সিংহের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কিন্তু সিংহটার পেট ভর্তি ছিল বলে সে কোন মনোযোগ দেয়নি বার্টনের দিকে। বার্টন অবশ্য ভাবত সিংহমাত্রই সব সময় নরখাদক। তারা জীবজন্তুকে দেখলেই বা হাতের কাছে পেলেই খেয়ে ফেলে।

কিন্তু খাদ্যের সমস্যাটা দিনে দিনে প্রকট হয়ে উঠল বার্টনের কাছে। খেতে না পেয়ে তার শরীর রোগা হয়ে যেতে লাগল দিনে দিনে। হাতের কাছে ফলমূল যা পেতে লাগল তাই খেতে লাগল।

কিন্তু দেহটা তার শীর্ণ হলেও মনে তখনো জোর ছিল। আশা ছিল বার্টনের।

একদিন সকালের দিকে পাহাড়ের ধারে বসেছিল সামনে উপত্যকাটার দিকে তাকিয়ে। সহসা দেখতে পেল উপত্যকাটার উপর থেকে একদল যাত্রীর একটা সফরী এগিয়ে আসছে তার দিকে।

বহুদিন পর আজ প্রথম মানুষের দেখা পেল আফ্রিকার জঙ্গলের মধ্যে। আনন্দে চীৎকার করে উঠল বার্টন। দেখল সফরীতে রয়েছে একদল শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর দুজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা। কুলিরা মালপত্র বয়ে নিয়ে আসছিল পিছনে। রোদের তাপ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্য শ্বেতাঙ্গদের মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ। সামনেই একজন স্থানীয় পথপ্রদর্শক ছিল।

সফরীর কাছে ছুটে গেল বার্টন। তার চোখে জল এসে গিয়েছিল, আনন্দে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। সে হাত বাড়িয়ে ডাকতে লাগল তাদের।

তার ডাকে থেমে গেল চলমান সফরীটা। কিন্তু বার্টন দেখল তার প্রতি পথিকদের কারো কোন উৎসাহ বা আগ্রহ নেই।

বার্টনের ছেঁড়া ময়লা পোশাক আর শীর্ণ চেহারা দেখে একটি মেয়ে বলে উঠল, কি ভয়ঙ্কর!

মেয়েটির কোন কামনা ছিল না, ছিল শুধু এক অভদ্র অমানবিক বিস্ময়।

বার্টন মেয়েটিকে চিনত। সে বলল, তোমার আচরণে আমি দুঃখিত বারবারা। তুমি শুধু উপরের পোশাকটাকেই দেখলে, কিন্তু সে পোশাক যে মানুষটা পরে আছে তাকে দেখলে না।

মেয়েটি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বলল, তুমি চেন আমাকে?

বার্টন বলল, ভালভাবেই চিনি। তুমি হচ্ছ বারবারা রামসগেট। লর্ড জন রামসগেট নামে ঐ ভদ্রলোক তোমার ভাই। অন্যদের আমি চিনি না।

পথিকদের একজন বলল, লোকটা বোধহয় আমাদের এই সফরীর কথা কারো কাছে শুনেছে। যাই হোক, তোমার কথা বল। তুমি কি তোমাদের সফরীর দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে পথ হারিয়ে ফেলেছ? তুমি কি ক্ষুধার্ত? তুমি কি আমাদের যাত্রীদলে যোগ দিতে চাও?

লর্ড জন বলল, থাম বার্ন্ট। ওকে ওর কথা বলতে দাও।

বার্টন বলল, আজ যদি তোমাদের একজন কুলির সঙ্গে আমার দেখা হত, তাহলে সে আগে আমায় কিছু খাদ্য ও পানীয় দিত।

মেয়েটি লজ্জিত হয়ে বলল, আমি দুঃখিত। নানারকম ঝামেলায় বিব্রত থাকায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি খাবার ও জল আনতে বলছি।

বার্টন বলল, তাড়াতাড়ি করতে হবে না। আমি আগে তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেব। আমি লণ্ডন থেকে একটি বিমানে করে কেপটাউন যাচ্ছিলাম। পথে নামতে বাধ্য হই। তার পর থেকে আমি বঙ্গানির দিকে

এগিয়ে চলেছি। এবার আমি আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমার নাম লেফটন্যাণ্ট সিসিল গাইনস বার্টন। আমি সরকারী বিমানবাহিনীতে কাজ করি।

লেডী বারবারা বলল, অসম্ভব। এ কখনই হতে পারে না।

লর্ড জন বলল, আমরা বার্টনকে চিনি। তোমাকে তার মত দেখতে লাগছে না।

তার জন্য দায়ী আফ্রিকা। তোমরা কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্যই চিনতে পারবে। প্রতি সপ্তার শেষে আমি তোমাদের রামসগেট প্রাসাদে অতিথি হিসাবে যেতাম।

লর্ড জন ভাল করে বার্টনকে দেখে চিনতে পেরে বলল, হা ভগবান! সত্যিই ত। ক্ষমা করো বন্ধু।

এই বলে করমর্দনের জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিল তার।

বার্টন কিন্তু সে হাত গ্রহণ করল না। বলল, এই হাত একজন দুর্দশাগ্রস্ত বিপন্ন পথিকের দিকে আগেই বাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। সুতরাং এখন এ হাত আমি মর্দন করতে পারব না।

লর্ড জন তার বোনকে বলল, ঠিকই বলেছে। ভুলটা আমাদেরই।

বারবারা তার পানে চাইল। সে বলল, আমরা গভীরভাবে দুঃখিত বার্টন। তুমি যদি অন্ততঃ আমার হাতটা গ্রহণ করো তাহলে নিজেকে সম্মানিত মনে করব আমি।

আর আপত্তি করল না বার্টন। তারা পরস্পরের করমর্দন করল। বারবারা তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ডানকান ট্রেণ্ট নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল।

খাওয়ার পর সফরীর অন্য সব সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হলো বার্টন। সেই দলে মিঃ রোমানক নামে এক রুশীয় পথিক ছিল। সে দাড়ি কামাতে কামাতে বার্টনকে জানাল বঙ্গানি সেখান থেকে এখনো দুশো মাইল দূরে।

বার্টন আরো জানতে পারল আসলে দুটো সফরী ছিল। একটা ছিল রোমানকের আর একটা ছিল লর্ড জনদের। পরে যখন ওরা দেখল ওদের গন্তব্যস্থল এক অর্থাৎ ওরা সকলেই বঙ্গানি যাবে তখন এক করে ফেলল দুটো সফরী।

জন বলল, তফাৎ এই যে রোমানকরা বন্দুক নিয়ে শিকার করে আর আমরা ক্যামেরা নিয়ে শিকার করি।

ট্রেণ্ট বলল, সব বাজে। এর থেকে পশুশালায় গিয়ে জীবজন্তুদের ছবি তুলে আনলেই হলো।

বার্টন আরও জানল জিরাও ছিল আগে রোমানকের পথপ্রদর্শক। বার্টন

জানতে পারল একে একে সে ছাড়া আরো দুজন বিপন্ন পথিক এই সফরীতে যোগদান করে। তারা হলো স্মিথ আর পিটারসন। তাদের আদিবাসী সঙ্গীরা নাকি তাদের ত্যাগ করে চলে যায়।

বার্টন বলল, ওদের দেখে কিন্তু ভাল মানুষ মনে হচ্ছে না।

লর্ড জন বলল, ওরা নিজেদের কোন কাজই করতে চায় না। তাছাড়া গন্টের আচরণ বড়ই প্রভুত্বমূলক। সে কথায় কথায় সকলকে বিদ্রূপ করে। সবাই তাকে ঘৃণা করে। রোমানকের ভৃত্য পীয়ের আর আমার ভৃত্য তমলিন দুজনে বারবারার ঝিকে ভালবাসে। গোদেনস্কি আর রোমানকের মধ্যেও কোন ভালবাসা নেই। আমাদের এই সফরীটাকে মোটেই এক সুখী পরিবার বলা যায় না।

ডিনারের পর কফি আর সিগারেট দেওয়া হলো সকলকে।

বার্টন বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বলল, আজ সকালেই আমি না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে মরে যাচ্ছিলাম। কার ভাগ্যে কি আছে তা কেউ জানে না।

বার্টন পেটের উপর হাত বোলাতে লাগল। বারবারা বলল, ভবিষ্যতে আমাদের কি আছে সেটা আগে হতে জানতে না পারাটাই বোধ হয় ভাল।

দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। বার্টনের সঙ্গে জন রামসগেটের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যেতে লাগল। বিশেষ করে সে বারবারাকে ভালবেসে ফেলল। তার লক্ষণ দেখে ডানকান ট্রেন্ট ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বার্টনকে সে তার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবতে লাগল।

একদিন গোলমাল বাধল সফরীর মধ্যে। একদিন গোদেনস্কি বারবারার ঝি ভায়োলেটের দিকে সোজা এগিয়ে এসে প্রস্তাব করল এবং তার প্রেম নিবেদন করল। ভায়োলেট এটা চাইছিল না। সে অস্বস্তিবোধ করছিল। বার্টন হঠাৎ সেখানে এসে পড়ায় সে গোদেনস্কিকে একটা ঘুষি মেরে ফেলে দিল। গোদেনস্কিও তার ছুরি বার করল। তখন বারবারা এসে পড়ায় গোদেনস্কি চলে গেল।

বারবারা বার্টনকে বলল, তোমার একজন শত্রু হলো।

বার্টন বলল, আমার অনেক শত্রু আছে।

এর পর ডানকান ট্রেন্ট এসে বার্টনকে স্পষ্ট বারবারার কাছ থেকে সরে যেতে বলল।

শান্তভাবে বার্টন বলল, আমার মনে হয় এ ব্যাপারটা বারবারার উপরেই ছেড়ে দেওয়া ভাল। কে সরে যাবে না যাবে সেটা সেই ঠিক করবে।

এতে ট্রেন্ট প্রথমে আঘাত করে বার্টনকে। বার্টন তখন জোর একটা ঘুষি মেরে ফেলে দেয় ট্রেন্টকে।

পরদিন সকালে লর্ড জন গোদেনস্কিকে জানিয়ে দেয় বজানিতে পৌছে

গেলেই কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া হবে তাকে। সকলেই এড়িয়ে চলতে লাগল গোদেনস্কিকে। এমন কি স্মিথ ও পিটারসনও তাকে দেখতে পারত না। সারাদিন সে তাই একা একা মুখ ভারী করে পথ চলত ও তার কাজ করে যেত।

আগুনের মত গরম রোদের নিষ্ঠুর তাপে সকলেরই কষ্ট হচ্ছিল। মালবাহী কুলীদের কষ্ট হচ্ছিল সবচেয়ে বেশী। গণ্ট সব সময় ছোটাছুটি করে কুলিদের দেখাশোনা আর বকাবকি করছিল।

এক সময় ধৈর্য হারিয়ে ফেলে গণ্ট একটা কুলিকে মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিল। সে উঠে দাঁড়ালে আবার তাকে ফেলে দিল।

বার্টন তখন নিকটেই ছিল। সে গণ্টের সামনে এসে বলল, খবরদার মারবে না বলে দিচ্ছি।

গণ্ট বার্টনকে বলল, তুমি নিজের চরকায় তেল দাওগে। এ সফরী আমি পরিচালনা করছি।

বার্টন বলল, কার সফরীকে পরিচালনা করছ তা আমি দেখতে চাই না। তুমি কোন লোককে মারবে না বা গালাগালি দেবে না।

গণ্ট সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘুষি চালিয়ে দিল। বার্টন সরে গিয়ে সেটা এড়িয়ে গেল। তারপর এক ঘুষিতে ফেলে দিল গণ্টকে।

সফরীতে আসার পর এই হলো বার্টনের তিন নম্বর লড়াই।

লর্ড জনকে বার্টন বলল, আমি দুঃখিত রামসগেট, সকলের সঙ্গেই আমার ঝগড়া বাধছে।

তাকে সমর্থন করে রামসগেট বলল, তুমি ঠিকই করেছ।

বারবারাও বলল, গণ্টকে উচিত শিক্ষা দিয়ে খুব ভাল করেছ তুমি। লোকটাকে সবাই খারাপ বলে।

বার্টন বলল, আর কারো সঙ্গে শত্রুতা করতে হবে না। আগামী কালই আমরা বন্ধানিতে পৌছব।

এর পর পরস্পরকে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে সকলেই শুতে চলে গেল শিবিরের মধ্যে। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল বার্টন, আজ সে সত্যিই সুখী। আগামী কালই তার বাবার সঙ্গে দেখা হবে। তাছাড়া বারবারাকে সে পেয়েছে প্রেমিকারূপে।

শান্তিপূর্ণ এক স্তব্ধতা বিরাজ করছিল নৈশ শিবিরের মধ্যে। জ্বলন্ত আগুনের পাশে বসে ছিল তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রহরী। দূরে এক সিংহের গর্জন শোনা গেল। জ্বলন্ত আগুনে বেশী করে কাঠ ফেলে দিল আস্কারি।

৫

তখনো কিছুটা রাত ছিল। ভোর হয়নি ভাল করে। আগের প্রহরীর পর নতুন যে প্রহরী এসেছে সে একগাদা কাঠের পাশে পিঠ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ঘুম ভাঙতেই দৈত্যাকার নগ্ন এক শ্বেতাঙ্গকে আগুনের ধারে বসে থাকতে দেখে চমকে ওঠে সে। ভাল করে চোখ মেলে দেখে বুঝল এটা স্বপ্ন নয়, তার দেখার কোন ভুল হয়নি।

প্রহরী দৈত্যাকার লোকটিকে বলল, কে তুমি? কোথা থেকে এসেছ? তুমি যদি কোন দৈত্যদানব হও তাহলে আমি তোমাকে খাবার এনে দেব। কোন ক্ষতি করো না আমার।

আগন্তুক লোকটি বলল, আমার নাম টারজন। এটা কার সফরী?

প্রহরী বলল, এ সফরী দুজনের—বাওয়ানা রোমানক আর বাওয়ানা রামসগেটের।

টারজন বলল, ওরা বঙ্গানি যাচ্ছে ত?

আমরা আগামী কালই বঙ্গানিতে পৌঁছব।

ওরা শিকার করে?

বাওয়ানা রোমানক শিকার করে। কিন্তু বাওয়ানা রামসগেট শুধু ছবি তোলে।

টারজন বলল, তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ কেন? সিংহ এসে ধরবে যে। ঐ দেখ জলজলে দুটো চোখ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে।

প্রহরী থতমত খেয়ে রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়াল। কথাটা সত্যি।

টারজন বলল, গুলি করো না। গুলি লাগলেও ও তোমাকে খেয়ে ফেলবে।

এই বলে সে একটা জলন্ত কাঠ নিয়ে সিংহের জলন্ত চোখদুটো লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিতেই পালিয়ে গেল সিংহটা।

এর পর টারজন বলল, তোমাদের শিবিরের মধ্যে একজন মৃত লোক আছে।

এই বলে শ্বেতাঙ্গদের শিবিরটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল।

শিবিরের ভিতরে গিয়ে প্রহরী ডাকাডাকি করে সকলকে তুলল। বলল, কোথা থেকে দৈত্যের মত একটা নগ্নদেহ শ্বেতাঙ্গ এসে বলছে এই শিবিরের মধ্যে একটা মৃত লোক পড়ে আছে।

সকলেই টারজনের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। ভয় পেয়ে গেল। অবশেষে রামসগেট তার কাছে গিয়ে কথা বলল তার সঙ্গে।

টারজন বলল, আমার নাম টারজন। সত্যিই এই শিবিরের মধ্যে একটা লোক মরে পড়ে আছে।

রামসগেট বলল, কিকরে বুঝলে তুমি?

বাতাসে গন্ধ পেয়ে বুঝলাম। মানুষ মরে গেলেই একটা বিশেষ গন্ধ বার হয় তার দেহ থেকে।

সকলেই হেসে উড়িয়ে দিল তার কথাটা। বলল, লোকটা পাগল।

কিন্তু রামসগেট গণ্টকে ডেকে খোঁজাখুঁজি করতে বলল। বলল, সবাইকে ডেকে তোল। আজ খুব সকালেই যাত্রা শুরু করব।

এমন সময় একজন ভৃত্য ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিল বার্টন তার ঘরে মরে পড়ে আছে।

সকলেই বলতে লাগল, ঐ উলঙ্গ আধ-পাগলা লোকটাই খুন করেছে বার্টনকে। কিন্তু লর্ড জন রামসগেট বা বারবারা একথা মানতে পারল না। ওরা বলল, ওর তাতে স্বার্থ কি? তাছাড়া প্রহরী বলছে, মাত্র কিছুক্ষণ আগে আসে লোকটা। এসে ঠাণ্ডায় আগুন পোয়াতে থাকে।

টারজন শান্তভাবে বলল, আমি আসার আগেই লোকটি নিহত হয়।

বার্টনের মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখা গেল। তার পিঠে ছোরা মারা হয়েছে। ছোরাটা তার হৃৎপিণ্ডটাকে বিদ্ধ করেছে।

রামসগেট বলল, আগন্তুককে সন্দেহ করার কোন অর্থ হয় না। বারবারা বলল, বার্টনের শত্রু ছিল এই শিবিরে। গণ্ট আর ট্রেণ্টের সঙ্গে তার মারামারি হয় এবং ওরা তাকে খুন করবে বলে ভয় দেখায়।

অবশেষে ঠিক হলো বঙ্গানিতে গিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে ব্যাপারটাকে। পুলিশ প্রমাণ করবে কে খুন করেছে।

গণ্ট আর ট্রেণ্ট বলল, লোকটাকেও আমরা বেঁধে সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

কিন্তু গণ্ট টারজনের কাছে যেতেই তাকে সরিয়ে দিল টারজন। ট্রেণ্ট তখন পিস্তল তুলে ধরে টারজনকে বলল, পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি করব।

কিন্তু ভয়ে লক্ষ্য ঠিক করতে পারল না ট্রেণ্ট। গুলিটা অন্য দিকে চলে গেল। টারজন তার পিস্তলধরা হাতটা ধরে ফেলল। তারপর তাকে টানতে টানতে বনের দিকে নিয়ে গেল।

ট্রেণ্ট চেঁচাতে লাগল, তোমরা কিছু করতে পারছ না। ও আমাকে বনে নিয়ে গিয়ে খুন করবে।

রামসগেট বলল, গুলি করলে ট্রেণ্টের গায়ে লাগবে। আমরা কিছুই করতে পারি না।

বনের মধ্যে নিরাপদে ঢুকেই ট্রেণ্টকে ছেড়ে দিল টারজন। ট্রেণ্ট ছুটে এসে শিবিরে বলল, আমার হাতের কব্জি ভেঙ্গে গেছে। সাংঘাতিক জোর লোকটার গায়ে। আমাকে ছেড়ে দিয়েই গাছের উপর উঠে বাঁদরের মত ডাল থেকে ডালে লাফ দিয়ে দিয়ে চলে গেল।

একটা স্ট্রেচারে বার্টনের মৃতদেহটাকে চাপিয়ে বয়ে নিয়ে যেতে লাগল কুলিরা।

আবার যাত্রা শুরু হলো সফরী। আজ দেরী হয়ে গেল শিবির গোটাতে।

সেদিন বঙ্গানি পৌছতে পারল না ওরা। রাতে আবার এক জায়গায় শিবির স্থাপন করল ওরা। কিন্তু সেদিন মাঝরাতে পিটারসন খুন হলো। তারও পিঠে একটা ছোরা বসিয়ে দেওয়া হয়।

স্মিথ বলল, সেই উলঙ্গ লোকটার কাজ। সে এসেছিল। আমি পালিয়ে যাবার সময় গুলি করেছি। অন্ধকারে দেখতে পাইনি গুলিটা লেগেছে কিনা। সে রাতে আর ঘুম হলো না কারো, ভয়ে আর উৎকণ্ঠায় স্তব্ধ হয়ে রইল সবাই।

৬

বঙ্গানিতে মৃত সিসিল গাইনস বার্টনের বাবা কর্ণেল জিরাল্ড গাইনস বার্টনের সরকারী বাংলোতে বসে ছিল টারজন।

বার্টনের মৃত্যুসংবাদটা টারজনই দিল তার বাবাকে।

কর্ণেল বার্টন বলল, কিন্তু কে কোন্ স্বার্থে আমার ছেলেকে খুন করল?

টারজন বলল, স্বার্থ নিশ্চয়ই আছে। তবে ওদের সফরীতে ট্রেণ্ট বলে একটা লোক আছে। সে আর বার্টন একটি মেয়েকে ভালবাসত। সুতরাং অনেকের সন্দেহ ট্রেণ্টও ওকে মারতে পারে।

বার্টন বললেন, সফরী বঙ্গানিতে এলে আমি ওদের সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করব। দোষীকে খুঁজে বার করতেই হবে।

টারজন বলল, খুনী যদি আফ্রিকাতে থাকে তাহলে আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারবে না।

সফরী বঙ্গানিতে পৌছেই শিবির স্থাপন করল। তারপর রোমানক আর রামসগেট কর্ণেল বার্টনের বাংলোতে এসে দেখা করল। তারা বার্টনের মৃত্যুসংবাদ দিলে কর্ণেল বললেন, এখবর আগেই জেনেছেন তিনি।

ওরা আশ্চর্য হয়ে বলল, তা কিকরে সম্ভব?

এমন সময় টারজন এসে তাদের সামনে দাঁড়াল।

রামসগেট বলল, গতরাতে আমাদের শিবিরে পিটারসন নামে আর

একজন লোক খুন হয়।

টারজনকে দেখেই রামসগেট বলল, ওই হচ্ছে খুনী। ওই বার্টনকে এবং আগের রাতে পিটারসনকে খুন করেছে। স্মিথ ওকে গতরাতে দেখেছে শিবিরে।

কর্ণেল বার্টন বলল, এ কখনই হতে পারে না। টারজন কখনই আমার ছেলেকে খুন করতে পারে না। আর গতরাতে ও আমারই কাছে ছিল। সুতরাং পিটারসনকে ও খুন করেনি।

টারজনকে সঙ্গে নিয়ে কর্ণেল বার্টন রামসগেটদের শিবিরে গেলেন জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।

তিনি গিয়ে বললেন, এই শিবিরের কেউ কারো নামে কোন অভিযোগ করতে চায় ?

বারবারা বলল, আমি ট্রেন্টের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনছি।

টারজন কর্ণেলের অনুমতি নিয়ে প্রশ্ন করতে লাগল। সে প্রথমে সকলের ছুরি পরীক্ষা করল। তারপর রামসগেটকে বলল, স্মিথ ও পিটারসনকে কতদিন থেকে চেন তোমরা ?

রামসগেট বলল, মাত্র কয়েকসপ্তা আগে আমাদের সফরীতে যোগদান করে ওরা।

পিটারসন কিছুটা খুঁড়িয়ে চলত ?

রামসগেট বলল, হ্যাঁ।

স্মিথ বলল, এ সব খোঁজে দরকার কি ? লোকটার মাথায় ছিট আছে।

টারজন হঠাৎ স্মিথের পেটের কাছে দেখল তার শার্টটা উঁচু হয়ে আছে। সে হাত দিয়ে দেখল সেখানে বেশ কিছু কাগজপত্র আছে।

টারজন এবার সকলের সামনে জোর গলায় বলল, ট্রেন্ট বার্টনকে খুন। করেনি, স্মিথই হচ্ছে খুনী। সে বার্টনকে খুন করেছে। সে পিটারসনকেও খুন করেছে।

কর্ণেল বার্টন বললেন, কিন্তু কি কারণ থাকতে পারে এই খুনের ?

টারজন স্মিথের জামার তলায় লুকোন কাগজগুলো টেনে বার করে বলল, —এই দরকারী কাগজগুলোই হলো একমাত্র কারণ। আসলে ওদের স্মিথ আর পিটারসন নাম নয়। স্মিথের আসল নাম হলো যোশেফ ক্যাম্পবেল আর পিটারসনের নাম হলো জুবানেভ। বার্টনের কাছ থেকে এই কাগজগুলো ছিনিয়ে নেওয়াই ছিল ওদের একমাত্র লক্ষ্য। বার্টনের জীবিত অবস্থায় ওরা যদি চুরি করত কাগজগুলো তাহলে শিবিরের মধ্যে খোঁজ করলেই ধরা পড়ত ওরা। ক্যাম্পবেল তাই খুন করে ওকে। পরে ক্যাম্পবেল জুবানেভকেও খুন করে কারণ তাহলে এই কাগজগুলো ইতালি সরকারের কাছে বিক্রী

করলে যা টাকা পাবে তাতে ভাগ দিতে হবে না কাউকে।

কর্ণেল বার্টনের সঙ্গে যে পুলিশবাহিনী ছিল তারা ক্যাম্পবেল ওরফে স্মিথকে গ্রেপ্তার করল।

রামসগেট কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল টারজনকে, জুবানেভই যে মৃত পিটারসন এটা কিকরে বুঝলে ?

টারজন বলল, আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়টা বড় প্রবল। কারণ আমি জঙ্গলে ছোট থেকে পশুদের কাছে মানুষ। পশুদের মতই আমার ঘ্রাণশক্তি প্রবল। সভ্য জগতের কেউ বুঝতে পারবে না একথা। ওদের ভাঙ্গা বিমান দুটো আমি দেখেছি। সেখানে একটা দস্তানা কুড়িয়ে পাই। সেই দস্তানাটা শুঁকে যে গন্ধ পাই পিটারসনের মৃতদেহটা শুঁকেও সেই গন্ধ পেয়েছিলাম।

সব কথা শেষ করে সব রহস্যের সমাধান করে টারজন বলল, বিদায় বন্ধুগণ, আমি এবার আমার বাড়ি যাচ্ছি। মাঝে মাঝে আমার নিজের লোকদের দেখতে বাড়ি যাই বটে, কিন্তু জঙ্গলের ডাক না শুনে পারি না, তার টানে ধরা না দিয়ে পারি না।

টারজন দি ম্যাগনিফিসেণ্ট

মহীয়ান টারজন

সত্য অনেক সময় কল্পনাকেও হার মানায়।

এই কাহিনী যদি অবিশ্বাস্য মনে হয় তাহলে উপরোক্ত এই স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি মনে রাখবেন। এ কাহিনীর শুরু হয় আজ হতে প্রায় কুড়ি বছর আগে।

সেদিন আফ্রিকায় বিষুবরেখার পাঁচ ডিগ্রী উত্তরে এক শূন্য বিশাল প্রান্তরে আকাশ থেকে অগ্নিবৃষ্টি করে যাচ্ছিল জ্বলন্ত সূর্য। একটি লোক একটা ছেঁড়া শার্ট আর ছেঁড়া পায়জামা পরে টলতে টলতে অতি কষ্টে পথ হাঁটছিল। তার জামা ও পায়জামার উপর ছিল শুকনো রঙের দাগ। হাঁটতে হাঁটতে একসময় সে মাটিতে পড়ে গিয়ে অনড হয়ে শুয়ে রইল।

ঝোপে ঢাকা একটা ছোট পাহাড়ের মাথা থেকে একটা সিংহ এই দৃশ্যটির উপর স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকিয়ে ছিল।

একটা শকুনি আকাশে ঘুরতে ঘুরতে শায়িত লোকটিকে মৃত ভেবে লক্ষ্য করছিল তীক্ষ্ণ ও লুব্ধ দৃষ্টিতে।

সেই প্রান্তরটার দক্ষিণ প্রান্ত থেকে অন্য একটি লোক এগিয়ে আসছিল উত্তর দিকে। কোন ক্লান্তি বা অবসাদের চিহ্ন ছিল না লোকটির মধ্যে। তার পেশীবহুল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহে বাদামী রঙের চামড়াটা চকচক করছিল। এক অবাধ উচ্ছলতায় ভরা তার প্রতিটি নিঃশব্দ পদক্ষেপ শীতা বা চিতাবাঘের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু তার চেহারায় বা চোখে মুখে কিছুমাত্র সংশয় বা শঙ্কার চিহ্নমাত্র ছিল না। পোশাক বলতে একটা শুধু কৌপীন জড়ানো ছিল তার কোমরে। তার একদিকের কাঁধে ঝোলানো ছিল একটা ঘাসের দড়ি আর একদিকের কাঁধে ছিল তীরভরা একটা তূণ। কোমরে ঝোলানো ছিল খাপে ভরা একটা ছোরা। তার এক হাতে ছিল একটা বর্শা আর একহাতে ছিল একটা ধনুক। তার শান্তধূসর একজোড়া চোখের উপর একঝাঁক কালো লম্বা চুল এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছিল মাথাটার চারপাশে।

সিংহটার বাসা এখান থেকে অনেক দূরে উত্তর দিকে হলেও এ জায়গাটা

অচেনা নয় তার। এদিকটায় অনেকবার এসেছে সে আগে। কোথায় জল আছে এবং কোথায় শিকার করলে পেট ভরে খেতে পাবে সে তা জানত।

দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে এগিয়ে আসা লোকটি হলো টারজন।

সে এখানে এসেছে এক সম্রাটের আদেশে একটি গুজবের বিষয়ে তদন্ত করতে। গুজবটা হলো এই যে ইউরোপীয় শক্তি নাকি ঘুষ নিয়ে স্থানীয় এক উপজাতি দলের সর্দারকে হাত করছে। তখন যুদ্ধ চলছিল সারা দেশ জুড়ে। কিন্তু এ যুদ্ধ আমাদের কাহিনীর বিষয়বস্তু নয়, ঘটনাক্রমে এসে যাওয়া এক ব্যাপারমাত্র।

টারজন যখন লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রান্তরটা পার হয়ে আসছিল তখন তার নাক, কান, চোখ—তিনটে ইন্দ্রিয়ই ছিল সজাগ। কোন শব্দ, গন্ধ বা দৃশ্য এড়িয়ে যেতে পারেনি তাকে। দূরে একটা পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে থাকা সিংহটাকে দেখতে পায় সে। আকাশে চক্রাকারে ঘুরতে থাকা শকুনিটার দৃষ্টি এড়ায়নি তার। শুধু অনড় হয়ে শুয়ে থাকা লোকটাকে তখনো দেখতে পায়নি সে। তার মতে প্রতিটি শব্দ, দৃশ্য বা গন্ধের একটি করে কাহিনী আছে। গোটা অরণ্য অঞ্চলটাই তার কাছে খোলা বইএর মত। তাতে ঘৃণা, ভালবাসা, জীবনমৃত্যুর যত রোমাঞ্চকর কাহিনী আছে।

আমরা যেখানে সেই খোলা বই থেকে একটামাত্র অক্ষর বা শব্দকে তুলে নেই, টারজন গোটা বইটাকে এক মুহূর্তে পড়ে ফেলতে পারে। এমন সব জটিল সমস্যাকে টেনে বার করে তার থেকে যে আমরা তার কিছুই বুঝতে পারি না।

টারজন পথ চলতে চলতে তার সামনে সাদা চকচকে কি একটা বস্তুকে পড়ে থাকতে দেখল। কিছুদূরে এগিয়ে যেতেই সে দেখল শুধু একটা মাথার খুলি নয় একটা গোটা নরকঙ্কাল পড়ে রয়েছে। আরও দেখল কঙ্কালটা অনেক দিন ধরে পড়ে আছে। কিছু কাঁটা গাছ গজিয়ে উঠেছে তার মধ্যে থেকে। দেখল তার পাশে একটা ভাঙ্গা লাঠির ডগায় একটুকরো রেশমী কাপড়ে বাঁধা একটা চিঠি। কাপড়টা শুকিয়ে মড়মড়ে হয়ে গেলেও তার ভিতরে চিঠিটা ঠিক আছে।

টারজন চিঠিটা খুলে দেখল সেটা ইংরিজিতে লেখা এবং হাতের লেখাটা বেশ পরিষ্কার। চিঠিটা কুড়ি বছর আগে লেখা। দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে একটা নরকঙ্কালের পাশে একটা রেশমী কাপড়ে জড়ানো ও বাঁধা অবস্থায় চিঠিটা পড়ে আছে এখানে। চিঠিতে লেখা আছে, জানি না এ চিঠি কার হাতে পৌছবে। আমি এই চিঠি একজনের মাধ্যমে পাঠাচ্ছি, কিন্তু জানি না সে এই অভিশপ্ত দেশ থেকে বার হতে পারবে কি না। সে আশা আমি করি না। তবে যদি কোনদিন এ চিঠি কোন শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির হাতে পড়ে

তাহলে তিনি যেন নিকটবর্তী কোন রেসিডেন্ট কমিশনার বা কোন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেন যাতে তাঁরা তাড়াতাড়ি আমাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করতে পারেন।

আমি আর আমার স্ত্রী লেক রুডলফ উত্তরাঞ্চলে অভিযানে বেরিয়েছিলাম সে আজ বহুদিন আগের কথা। আমরা তখন যে অঞ্চলে ছিলাম সে অঞ্চলে এক ভয়ঙ্কর উপজাতি বাস করত। নানারকম গুজব শুনে আমাদের ভৃত্যেরা আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যায়। তবু আমরা যেন কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির টানে এগিয়ে চলেছিলাম।

মাফা নদী যেখানে নিউবারি নদীতে পড়েছে সেইখানে একটা খাদ পার হয়ে একটা মালভূমিতে গিয়ে পড়তেই কাজী নামে এক ভয়ঙ্কর নারী উপজাতির মেয়েরা ধরে ফেলল আমাদের। এক বছর পর আমার কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যাসন্তান প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার স্ত্রীকে বধ করে কাজীদের নারী শয়তানরা। আমার স্ত্রী পুত্র সন্তান প্রসব করলে মারত না তারা। তারা শ্বেতাঙ্গ লোক চায়। তাই আমাকে আর আরো বারোজন শ্বেতাঙ্গ বন্দীকে হত্যা করেনি তাড়া।

যে জলপ্রপাত থেকে উৎসারিত হয়েছে মাফা নদী সেই জলপ্রপাতের উপরে এক বিস্তৃত মালভূমির উপরে অবস্থিত কাজীদের দেশটা। জায়গাটা কিন্তু খুবই দুর্গম। কেবলমাত্র মাফা নদী আর নউবারি নদীর সঙ্গমস্থলের কাছ দিয়ে যাওয়া যায়।

একমাত্র সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গদের বড় রকমের একটি দল অভিযান চালিয়ে আমাকে ও আমার মেয়েকে উদ্ধার করতে পারে কাজীদের কবল থেকে। আমার মনে হয় কৃষ্ণকায় কোন আদিবাসী এদেশে প্রবেশ করবে না কিছুতেই। কাজী মেয়েরা শয়তানের মত লড়াই করে। তাদের এক অদ্ভুত অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে। আমি নিজের চোখে তাদের সে শক্তির নিদর্শন দেখেছি।

কোন আদিবাসী উপজাতির দল এই রহস্যময় দেশের কাছাকাছি থাকতে চায় না। তাই কাজীদের বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। শুধু তাদের ভয়ঙ্কর প্রথাগত কার্যাবলীর গুজবগুলো এখানকার আশেপাশের অঞ্চলে রূপকথায় পরিণত হয়েছে। কোন সফরী এদিকে এসে পড়লে এই সব গুজবের কথা শুনে ভয় পেয়ে যায় সফরীর লোকেরা।

শ্বেতাঙ্গ বিদেশীরা কাজীদের কাজকর্মের মাথামুণ্ডু কিছু জানতে বা বুঝতে পারে না। কারণ নিগ্রো আদিবাসীরা তাদের কিছুই বলবে না। তারা ভাবে বিদেশীদের এ সব কথা বললে তাতে তাদের ক্ষতি হবে। তাই কাজীদের দেশের কাছাকাছি এসে পড়লে শ্বেতাঙ্গদের সফরী ছেড়ে পালিয়ে যায় তারা।

এমন কি শ্বেতাঙ্গদের এক বড় বাহিনীও কাজীদের কাছে হেরে যেতে পারে। কারণ অতিপ্রাকৃত শক্তিসমূহের সঙ্গে লড়াই করে পেরে ওঠা সম্ভব নয়। তবে তারা একবার যদি জয়ী হতে পারে তাহলে সে জয়ের জন্য এক বিরাট পুরস্কার পাবে। এই পুরস্কারের আশাতেই আনুষঙ্গিক সব বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে তারা।

কাজীদের দখলে আছে প্রচুর পরিমাণে হীরে। এ হীরে কোথা থেকে তারা পেয়েছে, কোথায় এর খনি তা আমি জানতে পারিনি। তবে এটা জানতে পেরেছি যে সে হীরের উৎস আছে এই দেশের মাঝেই। আমি যতদূর জানি কাজীদের হীরের ওজন হলো ছয় হাজার ক্যারেট আর দাম হবে দু লক্ষ পাউণ্ড। কাজেই বিপদের ঝুঁকির তুলনায় পুরস্কারটাও কম নয়।

এ চিঠি কারো মারফৎ বাইরের জগতে পাঠাতে পারব এ আশা আমি কোনদিন করিনি। পরে একদিন এদেরই এক নিগ্রোগুপ্তচরকে ঘুঁষ দিয়ে বশ করে এ চিঠি বয়ে নিয়ে যেতে রাজী করিয়েছি।

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এ চিঠি যেন যথাসময়ে কোন যোগ্য ব্যক্তির হাতে পৌছয়। ইতি মাউণ্টফোর্ড।

চিঠিখানার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত দুবার পড়ল টারজন। মাউণ্টফোর্ড! সে মনে করে দেখল অনেকদিন আগে লর্ড ও লেডী মাউণ্টফোর্ডএর রহস্যময় নিখোঁজের কথা সে শুনেছিল। সেই মাউণ্টফোর্ড এখনো বেঁচে আছে একথা সে ভাবতেই পারেনি।

তবে মাঝে মাঝে সুদান আর রোডেশিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলের কয়েক জায়গায় কোন উপজাতি সর্দার অথবা কোন মুমূর্ষু শ্বেতাঙ্গ বিদেশীর মুখ থেকে মাউণ্টফোর্ডের নামটা শুনেছিল সে। কিন্তু তিনি ঠিক কোথায় কোন অঞ্চলে আছেন তা জানতে পারেনি সে।

এতদিনে আসল খবরটা জানতে পারল, কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে। কুড়ি বছর হয়ে গেছে লেডী মাউণ্টফোর্ড মারা গেছেন। লর্ড মাউণ্টফোর্ড আজ বেঁচে আছেন কি না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। ছোট থেকে এই সব অসভ্য বর্বর নারীদের মাঝখানে তাঁদের কন্যাও কখনো এতদিন বেঁচে থাকতে পারে না।

জঙ্গলে যার জন্ম এবং জঙ্গলে যে শৈশব থেকে লালিত পালিত তার কাছে মৃত্যু একটা অতি স্বাভাবিক ঘটনা। তাই লর্ড মাউণ্টফোর্ড ও তাঁর কন্যার মৃত্যুর সম্ভাবনাটাকে কোন গুরুত্ব দিল না টারজন। তবে সে সুযোগ পেলেই কোন ইংরেজ কর্তৃপক্ষকে মাউণ্টফোর্ডের লেখা এই চিঠিটা দিয়ে দেবে। সে শুধু এইটুকুই করতে পারে।

এবার সে মন থেকে এ সব কথা সরিয়ে দিয়ে বাস্তব পরিবেশের দিকে মন

দিল। সে দেখল মাথার উপর শকুনিরা তখনো ঘুরছে বৃত্তাকারে। বোঝা গেল শকুনিটা মৃতপ্রায় এমন একটা জীবের জন্য ঘুরছে যার এখনো মৃত্যু হয়নি আর সেটা আকারে বড় বলে আক্রমণ করতেও পারছে না।

শকুনির লক্ষ্যবস্তুটার দিকে এগিয়ে গেল টারজন। দেখল একটা সিংহও একটা উঁচু জায়গা থেকে নেমে আসছে একই লক্ষ্যের দিকে। সিংহটা যেমন টারজনের উপস্থিতিটাকে গ্রাহ্য করল না তেমনি টারজনও সিংহটাকে আসতে দেখেও তার গতি পরিবর্তন করল না।

এইভাবে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে একটি শ্বেতাঙ্গ লোকের শায়িত দেহ দেখতে পেল। দেখল, তার ডানদিকে প্রায় একশো গজ দূরে সিংহটা ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটি তখনো মরেনি। সে সিংহটাকে দেখতে পেয়ে উঠে বসল। সে ভয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। শুধু একটা হাঁটুর উপর ভর দিয়ে নতজানু হয়ে বসল।

টারজন তার পিছনেই ছিল। কিন্তু তাকে দেখতে পেল না লোকটি।

লোকটি নতজানু হয়ে বসতেই সিংহটা তার উপর ঝাঁপ দেবার জন্য গর্জন করে সংকেতসূচক ধ্বনি দিতে লাগল। সে এগিয়ে যেতে লাগল লোকটার দিকে।

টারজন দেখল সিংহটা শুধু কৌতূহলের বশেই ঝাঁপ দিয়েছে লোকটার উপর। সে ক্ষুধার্ত নয়। তার পেট ভর্তি।

লোকটি কিন্তু এসব কিছুই বুঝতে পারেনি। সে কিছু বুঝতেও চায়নি। তার ওঠার ক্ষমতা ছিল না এবং হাতে কোন অস্ত্রও ছিল না।

লোকটি দেখল সিংহটা একেবারে তার কাছে এসে পড়তেই একটা নগ্নপ্রায় লোকও সিংহের মত গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল। তাকে দেখে সিংহটা একবার থমকে দাঁড়িয়ে দাঁত মুখ বার করে আর একবার গর্জন করে উঠল।

সেখানে কোন গাছপালা ছিল না। সিংহটা আক্রমণ করলে টারজনকে লড়াই করতে হত। কিন্তু সে জানত সিংহটা তাকে আক্রমণ করবে না। যাই হোক টারজন এবার বীর বাঁদর গোরিলাদের মত ভয়ঙ্করভাবে একবার চীৎকার করে উঠতেই পালাল সিংহটা।

একটা মানুষের মুখ থেকে এমন পশুর গর্জন শুনে লোকটি ভীষণভাবে আশ্চর্য হয়ে গেল।

টারজন এবার লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, আপনি কি আহত না ক্ষুধাতৃষ্ণায় এমন দুর্বল হয়ে পড়েছেন?

যার মুখ থেকে পশুর গর্জন বেরিয়ে এসেছিল তাকে ভদ্রলোকের মত ইংরিজিতে কথা বলতে শুনেও তেমনি আশ্চর্য হয়ে গেল লোকটি। সে দেখল

সিংহটা যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকেই চলে গেল। লোকটি ভাবতে লাগল যে লোক সিংহকে ভয় দেখিয়ে তাড়াতে পারে সত্যিই সে ভয়ের বস্তু।

লোকটাকে নিরুত্তর দেখে টারজন বলল, আপনি ইংরিজি জানেন?

লোকটি বলল, হ্যাঁ। আমি একজন আমেরিকান। আমি আহত নই। কয়েকদিন কিছুই খেতে পাইনি আমি। আজ একেবারেই জল পাইনি।

লোকটিকে তার কাঁধের উপর তুলে নিয়ে টারজন বলল, যেখানে খাদ্য ও জল পাওয়া যাবে সেইখানে যাব আমরা। তারপর আপনার কথা শুনব।

২

লোকটিকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে যেতে যেতে টারজন বুঝতে পারল লোকটি অচৈতন্য হয়ে পড়েছে।

অবশেষে জলের ধারে এসে টারজন লোকটিকে একটা গাছের তলায় নামিয়ে দিল। এরপর জল এনে লোকটির মাথা তুলে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে কয়েক ফোঁটা জল ঢেলে দিল।

এরপর ঠাণ্ডা জল দিয়ে লোকটির চোখ মুখ ধুইয়ে দিল টারজন। লোকটি এবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় অসংলগ্ন কয়েকটি কথা বলল। বলল, হা ভগবান! কত সুন্দরী!

লোকটি এবার চোখ খুলে টারজনের মুখপানে তাকিয়ে বলল, হীরে, অনেক হীরে! তুমি হীরে পেয়েছ? মেয়েটা খুব সুন্দরী, হয়ত শয়তান ভর করে আছে তার উপর। আমি নিজের চোখে দেখেছি। হীরের এক বিরাট তাল। তার দাম প্রায় দশ মিলিয়ন ডলার।

টারজন তাকে বলল, এখন শান্ত হও। চুপ করে থাক। আমি খাবার নিয়ে আসছি।

খাবার নিয়ে এসে টারজন দেখল লোকটি শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। তখন রাত্রির অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে।

টারজন তার তীর ধনুক দিয়ে একটা পাখি আর একটা খরগোস মেরে এনেছিল। মরা পাখিটার উপর একতাল কাদা লেপে দিয়ে আগুন জেলে তাতে পোড়াতে দিল। মরা খরগোসটাকেও একটা কাঠিতে গেঁথে আগুনে ঝলছে নিল। আগুনে কাদাটা শুকিয়ে গেলে শুকনো মাটির সঙ্গে পাখির গায়ের পালকগুলোও উঠে গেল।

এইভাবে মাংস তৈরী করে লোকটিকে খেতে দিলে লোকটি টারজনকে

বলল, কে তুমি? কি ঘটেছিল বলত? আমার ত কিছুই মনে পড়ছে না।

টারজন বলল, আমি তোমাকে প্রান্তরে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম। তুমি খুব ক্লান্ত ছিলে। উঠতে বা চলতে পারছিলে না। তাই খাদ্য ও পানীয়ের সন্ধানে তোমাকে এখানে এনেছি।

লোকটি এবার বলল, ওঃ, তুমিই সেই লোকটি যার ভয়ে সিংহটা পালিয়ে যায়। এবার মনে পড়েছে। তুমি তাহলে আমায় খাদ্য ও পানীয় এনে দিলে।

টারজন বলল, হ্যাঁ, চাও ত আরো খাবার দেব। আমাদের পিছনে একটা ঝর্ণা আছে। পার ত গিয়ে জল খেয়ে এস।

লোকটা বসে বসে কোনরকমে এগিয়ে গেল জলের দিকে। গায়ে কিছুটা শক্তি পেয়েছে সে। টারজন তাকে হেঁকে বলল, বেশী জল এখন খেও না।

পেট ভরে খাবার ও জল খেয়ে লোকটি টারজনকে আবার বলল, বল তুমি কে? কেনই বা আমাকে বাঁচালে?

টারজন বলল, তার আগে বলত তুমি কে? এ অঞ্চলে কি করছিলে তুমি?

টারজনের নগ্নপ্রায় দেহ, তার দেহের অপরিসীম শক্তি, প্রভুত্বসূচক কণ্ঠস্বর —এই সব কিছু দেখে অবাক হয়ে গেল লোকটি। তার মনে হলো এই অসাধারণ লোকটি এ অঞ্চলের অবিসংবাদী অধিপতি এবং তার প্রভুত্ব মেনে চলে এখানকার সকলে।

লোকটি এবার বলল, আমার নাম উড, আমি একজন লেখক। বেশী টাকাকড়ি না নিয়ে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এই জন্যই এক নির্জন বনপথে আমাকে অসহায় ও বিপন্ন অবস্থায় দেখেছিলে তুমি। আমার অবস্থা যত অসহায়ই হোক আমার মাথায় এমন এক অভিজ্ঞতার কথা আছে যা আজ পর্যন্ত কোন ভ্রমণ কাহিনীতে লিখতে পারে'নি। আমি যে সব জিনিস দেখেছি তা সভ্য জগতের কোন লোক স্বপ্নেও দেখেনি কখনো এবং সে সব জিনিস বিশ্বাস করতে পারবে না তারা। আমি নিজের চোখে দেখেছি এবং নিজের হাতে ধরেছি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড় হীরকখণ্ড। আমার মনে হচ্ছে আমি মনে করলে তা সঙ্গে করে আনতেও পারতাম।

আবার পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী এবং নিষ্ঠুরতমা নারীকেও দেখেছি। আমার মনে হয় আমি তাকেও আনতে পারতাম আমার সঙ্গে। আমি তাকে ভালবাসতাম, এখনো বাসি। আবার তাকে ঘৃণাও করি, মাঝে মাঝে অভিশাপ দিই তাকে। ঘৃণা আর ভালবাসা—এই দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ আবেগ একই সঙ্গে অনুভব করি আমি। আমি আমার মন দিয়ে তাকে ঘৃণা করি আবার আমার দেহ আর আত্মার সমস্ত নিবিড়তা দিয়ে

তাকে ভালবাসি।

লোকটি একটু থেমে আবার বলতে লাগল, প্রথম থেকে বলছি, তবে শোন। লর্ড আর লেডী মাউন্টফোর্ডের রহস্যময়ভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কথা নিশ্চয় শুনে থাকবে?

টারজন বলল, কে তা না শুনেছে।

লোকটি বলল, আজ হতে কুড়ি বছর আগে তারা সভ্য জগৎ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আজও কত গুজব রটে চারদিকে। এই রহস্যময় ব্যাপারটা এমনইভাবে মায়ায় জড়িয়ে ফেলে আমার মনটাকে যে এই গুজবের সত্যাসত্য যাচাই করে দেখার জন্য নিজেই এক অভিযানে বার হবার মতলব করি আমি।

লোকটি আরও বলল, আমার এক ধনী বন্ধু আছে নিউ ইয়র্কে। তার নাম হলো রবার্ট ভ্যান আইক। অবশ্য সেকথা শুনে কোন লাভ নেই তোমার।

কোন মন্তব্য করল না টারজন। যে শুধু শুনে যেতে লাগল।

বিন্দুমাত্র কোন আগ্রহ বা আবেগের কোন ছায়া পড়ল না তার মুখে। কিন্তু বহুদিনের পুরনো এক অবরুদ্ধ আবেগ প্রকাশের পথ খুঁজছিল স্ট্যানলি উডের মধ্যে। তখন একটা পাথরের মূর্তি পেলেও তাকে তার কথা শোনাতে চায় সে।

আমি বব ভ্যান আইককে আমার পরিকল্পনার কথা বলতেই সে আমার সঙ্গে এক অভিযানে যেতে চাইল এবং খরচপত্রের দায়িত্বও বহন করতে চাইল। ভাবলাম আমার পরিকল্পনাটা অবশ্যই সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে এবার।

পুরো একটি বছর ধরে ইংলণ্ড ও আফ্রিকায় অনুসন্ধানকার্য চালিয়ে বেশ বুঝতে পারলাম যে নিউবারি নদীর ধারে রুডলফ্ হ্রদের উত্তর-পশ্চিম দিকে কোন একটা জায়গা থেকে নিখোঁজ হন লর্ড ও লেডী মাউন্টফোর্ড।

আফ্রিকার জীবনযাত্রার সঙ্গে অভিজ্ঞতা আছে এমন কিছু শ্বেতাঙ্গ শিকারী নিয়ে এক সফরী গড়ে তুললাম আমরা।

নিউবারি নদীর ধারে পৌছনোর আগে পর্যন্ত ভালই চলল আমাদের অভিযান। ও অঞ্চলে লোকবসতি খুবই কম। যতই এগিয়ে যেতে লাগলাম নদীর ধার দিয়ে ততই কম আদিবাসী দেখতে পেলাম। যে দু একটা আদিবাসীর দেখা পাচ্ছিলাম তারা ছিল বন্য বর্বর আর ভয়ঙ্কর। তারা কোন কথা বলতে চাইত না আমাদের সঙ্গে। কিন্তু তারা আমাদের নিগ্রো ভৃত্যদের সঙ্গে কিছু কিছু কথাবার্তা বলত। সেই অবসরে তারা ঠাকুর দেবতার ভয় ঢুকিয়ে দেয় তাদের মনের মধ্যে।

ক্রমে আমাদের দল ছেড়ে চলে যেতে লাগল আমাদের নিগ্রোভৃত্যেরা। কেউ কোন কারণ বলল না। শুধু একে একে চলে যেতে লাগল। ফলে মহামুস্কিলে পড়লাম আমরা। এ অঞ্চলের পথঘাট আমরা কিছুই চিনি না। সম্পূর্ণ অজানা এক দেশ। তার উপর চারদিকে শত্রু। আমাদের সম্বল বলতে শুধু কিছু অস্ত্রশস্ত্র আর কিছু রসদ। তাও সঙ্গে মালবহনের কোন লোক নেই।

অবশেষে নিগ্রোভৃত্যদের একজন সর্দার আমাদের একদিন বলল, যে সব আদিবাসীদের সঙ্গে এর আগে তাদের কথা হয়েছে তারা তাদের বলেছে নিউবারি নদীর উপর দিকে উত্তরে এক ভয়ঙ্কর উপজাতি আছে। তাদের দেশে কোন পুরুষ নেই, সবাই মেয়ে। কিন্তু তারা বড় নিষ্ঠুর, বড় নির্মম। তাদের দেশে কোন নিগ্রো গিয়ে পড়লে তাকে হয় তারা ক্রীতদাস করে রাখবে চিরদিনের জন্য, না হয় তাকে হত্যা করবে। তারা এক যাদু জানে, তাদের হাতে এমন এক অতিপ্রাকৃত শক্তি আছে যার জন্য যদিও তাদের কোন বন্দী তাদের হাতছাড়া হয়ে কোনরকমে পালিয়ে আসে তাহলেও তার নিষ্কৃতি নেই। সেই পলাতক বন্দী তার নিজের দেশে পৌঁছনোর আগে কোন না কোনভাবে মৃত্যু ঘটে তার। যুদ্ধ করে সেই উপজাতিয় মেয়েদের পরাজিত বা ধ্বংস করা সম্ভব নয়। কারণ ওরা মানুষ নয়, ওরা নারী-রূপিনী রাক্ষসী।

আমাদের অভিযাত্রীদলে স্পাইক ও স্ট্রোন নামে যে দুজন শিকারী ছিল, আমি সর্দারের কথাটা তাদের জানাতেই তারা হেসে উড়িয়ে দিল কথাটা। তারা বলল, নিগ্রোভৃত্যেরা তাদের বাড়ি থেকে অনেক দূরে এসে পড়ায় তারা ফিরে যেতে চায়। তাই তারা এই সব বানানো কথা বলে আমাদের ভয় দেখাতে চায় যাতে আমরা আর না এগিয়ে ফিরে যাই।

তাই তারা অবশিষ্ট নিগ্রোভৃত্যদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে লাগল। পরদিন সকালে দেখা গেল একজন নিগ্রোভৃত্যও আমাদের দলে নেই। আমরা তখন মাত্র চারজন শ্বেতাঙ্গ ছাড়া আর কেউ ছিল না আমাদের দলে। অথচ সঙ্গে যা মালপত্র ছিল তা বহন করার জন্য পঞ্চাশজন লোকের দরকার। বব, ভন আইক, স্পাইক আর স্ট্রোন—আমরা তখন ছিলাম মোট এই চারজন। আশপাশে অনেক খোঁজ করেও নিগ্রোভৃত্যদের কাউকে পাওয়া গেল না।

আমাদের মধ্যে ভন আইকের খুব সাহস। তার মন খুব শক্ত। আমিও এর আগে বহু বিপদের মাঝে পড়েছি। আমার মনেও সাহস কম ছিল না। আমি একবার উকোয়েডারের নিউ গিনী অঞ্চলে নরখাদকদের কবলে পড়ি। মধ্য আমেরিকায় বিপ্লব চলা কালে একবার জলন্ত আগুনের সামনেও পড়ে যাই।

কিন্তু এ রকম পরিস্থিতিতে জীবনে কখনো পড়িনি এর আগে। কোন

প্রত্যক্ষ বিপদ নেই, কোন প্রত্যক্ষ ভয়ের বস্তু নেই। শুধু রোমাঞ্চকর এক ভয়ের শিরশিরে অনুভূতি। গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। আমাদের কেবলি মনে হত অদৃশ্য অবস্থায় কারা যেন লক্ষ্য করছে আমাদের সব সময়। তার উপর মাঝে মাঝে এক অদ্ভুত শব্দ শুনতে পেতাম। সে শব্দ মানুষ বা কোন জন্তুর নয়। অথচ যাদের মুখ থেকে সে শব্দ বার হত তাদের চোখে দেখতে পেতাম না আমরা। তবে সে শব্দ যে-ই করুক তা শুনলে গায়ের লোম খাড়া হয়ে ওঠে ভয়ে।

সেদিন রাত্রিতে চারজনে মিলে এক পরামর্শসভায় বসলাম। স্পাইক ও স্ট্রোন বলল. এখন আমাদের উচিত ঐ শব্দ লক্ষ্য করে এক অভিযান চালানো। আমরা বেশী কিছু সঙ্গে নেব না। শুধু একটা করে রিভলবার, রাইফেল, কিছু অস্ত্রশস্ত্র আর খাবার। বাকি সব রেখে যাব শিবিরে।

পরদিন সকালে নীরবে প্রাতরাশ করার পর সঙ্গে যা নেবার নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

কিন্তু আমরা যেদিকে যেতে চাইলাম শত চেষ্টাতেও যেতে পারলাম না। আমাদের থেকে বৃহত্তর একটা শক্তি যেন আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল অন্য দিকে।

এইভাবে পাঁচ মাইল যাবার পর পথের উপর একজন শ্বেতাঙ্গ লোককে শুয়ে থাকতে দেখলাম। লোকটির বয়স পঞ্চাশের মধ্যে। সে যেমন অতি বৃদ্ধ নয়, তেমনি ক্ষুধাতৃষ্ণাতেও কাতর বলে মনে হলো না। তবু মনে হলো চলার শক্তি নেই তার।

আমরা তার পাশে থামতেই সে চুপি চুপি আমাদের বলল, ফিরে যাও।

তার কথা শুনে বুঝলাম সে এত দুর্বল যে কথা বলতে পারছে না।

আমার কাছে ফ্লাস্কে ভরা কিছু ব্রাণ্ডি ছিল। লোকটিকে তাই কিছুটা খাইয়ে দিতে একটু শক্তি ফিরে পেল সে।

তখন লোকটি বলল, ঈশ্বরের নামে বলছি, তোমরা ফিরে যাও। তোমরা সংখ্যায় বেশী নেই। ওরা তোমাদের ধরে ফেলবে। আমাকে যেমন বিশ বছর ধরে আটকে রেখেছিল তেমনি তোমাদেরও আটকে রাখবে। তোমরা পালাতে পারবে না। কুড়ি বছর ধরে আমি কত বার পালাবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তাদের শক্তির কাছে হার মেনেছি আমি। আমার অবস্থা দেখছ। আমি মুমূর্ষু। তোমরা বরং ফিরে গিয়ে শ্বেতাঙ্গদের এক বিরাট বাহিনী নিয়ে এসে আক্রমণ করবে ওদের। নিগ্রোরা ওদেশে ঢুকবে না। এ হলো কাজীদের দেশ। কিন্তু সমস্ত শক্তি আছে একটি মাত্র লোকের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। সে-ই সব মেয়েদের শেখাচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে সে?

সে বলল, মাফকা।

সে-ই কি সর্দার ?

না, সে সর্দার নয়, তবে সর্বশক্তিমান। সে যাদুকরের থেকেও অনেক বেশী শক্তিমান। সে হচ্ছে আস্ত একটা শয়তান।

আমি লোকটিকে বললাম, তুমি কে ?

সে বলল, আমি মাউন্টফোর্ড।

লর্ড মাউন্টফোর্ড ?

সে বলল, হ্যাঁ।

টারজন উডকে জিজ্ঞাসা করল, লোকটি তোমাকে হীরের কথা কিছু বলেছিল ?

উড তখন টারজনের মুখপানে তাকিয়ে বলল, তুমি কিকরে জানলে একথা ?

টারজন বলল, কিছুক্ষণ আগে তুমি ভুল বকছিলে। তার থেকে জানতে পারি।

উড বলল, কাজীদের হীরে আকারে সত্যিই বিরাট, তার দাম হবে প্রায় দশ মিলিয়ন ডলার। মাউন্টফোর্ডের কাছ থেকে হীরের কথাটা শুনে স্পাইক ও স্ট্রোন হীরের লোভে কাজীদের দেশের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। মাউন্টফোর্ডের কথায় মোটেই ভয় পেল না তারা। তাছাড়া তখন হয়ত ইচ্ছা করলেও ফিরতে পারতাম না আমরা।

টারজন তখন উডকে বলল, তারপর মাউন্টফোর্ডের কি হলো ?

উড বলল, তিনি একটি মেয়ের সম্বন্ধে বিড় বিড় করে কি বলছিলেন। কিন্তু তখন মৃত্যুর আর দেরী ছিল না। বেশী কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর শেষ কথাটা ছিল···মেয়েটাকে বাঁচিও। মাফকাকে হত্যা করো।

এই কথা বলেই মারা গেলেন মাউন্টফোর্ড।

আমরা কিন্তু কাজীদের দেশে যাওয়ার পরেও তিনি যে লোকটার কথা বলেছিলেন সেই মাফকা লোকটাকে দেখতে পাইনি। শুধু তার নাম শুনেছি। আমরা কোন নারী বন্দীকেও দেখতে পাইনি। যদিই বা কোন বন্দিনী থাকে তাকে হয়ত লুকিয়ে রেখেছে তারা। শুনেছি বহু শতাব্দী আগে নির্মিত এক প্রাচীন আমলের প্রাসাদে থাকত সে। সেই প্রাসাদেই হীরে থাকত। কেউ বলত প্রাসাদটা নির্মাণ করে পর্তুগীজরা তাদের আবিসিনিয়া অভিযানের সময়ে। আবার ভন আইক বলত এটা নির্মিত হয় ক্রুসেড ধর্মযুদ্ধের কালে। এ প্রাসাদ যারাই গড়ে তুলুক, মোট কথা কাজীরা করেনি। তবে তারা মেরামত করে সেটাকে যত্নের সঙ্গে বাঁচিয়ে রেখেছে।

কাজীরা মনে করে বড় হীরকখণ্ডটাই ওদের যত কিছু শক্তির উৎস।

তারা তাই প্রাসাদটাকে চারদিক থেকে কড়া পাহারা দিয়ে ঘিরে রেখেছে। মাফকা আর তাদের রাণীও সেই প্রাসাদেই থাকে। হীরেটাকে ওরা বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করে না। সেটা ওরা সবাই ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করে।

আমার মনে হয় তারা মনে করে ওদের রাণী হলো সেই হীরকের মূর্ত ও জীবন্ত প্রতীক যার মধ্যে হীরেটার মত শক্তির উচ্ছলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে রাণীর মধ্যে।

একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে ওদের রাণী হলো সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী নারী। তার মত সুন্দরী মেয়ে জীবনে আমি কোথাও কখনো দেখিনি। তবে ওদের রাণীর মধ্যে এমন একটা বৈপরীত্যের ভাব আছে যা আগে আমি বুঝতে পারিনি। এক এক সময়ে রাণীর মধ্যে নারীসুলভ দয়া মায়া মমতা প্রভৃতি গুণগুলির পূর্ণ পরিচয় পেয়েছি, কিন্তু আবার পরমুহূর্তেই তাকে মনে হয়েছে এক নিষ্ঠুর শয়তান, যেন একটা আস্ত রাক্ষসী। রাণীকে ওরা বলে কনফালা আর হীরকখণ্ডটাকে বলে কনফাল।

এই রাণীই তার নারীসুলভ দয়ামায়ার বশবর্তী হয়ে কোন এক দুর্বল মুহূর্তে আমাকে মুক্ত করে দেয়। পরে সে হয়ত অনুতপ্ত হয়ে মাফকাকে দেয় বলে, মাফকার শক্তিবলেই আমার এই শোচনীয় অবস্থা হয়।

টারজন উডকে বলল, তোমার অন্য তিনজন সঙ্গীর কি অবস্থা হয়?

তারা এখনো সেখানে বন্দী হয়ে আছে।

আমি মুক্তি পেয়ে ভাবি শ্বেতাঙ্গদের একটি বড় দল নিয় এসে তাদের মুক্ত করব।

টারজন বলল, তারা কি এখনো জীবিত আছে?

উড বলল, হ্যাঁ। কাজীরা তাদের বাঁচিয়ে রেখে বিয়ে করবে। কাজীদের দেশে সবাই মেয়ে। তারা একদিন কৃষ্ণকায় ছিল। তাই তারা শ্বেতাঙ্গদের বিয়ে করে ওরাও শ্বেতাঙ্গ হতে চায় এবং কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের তাড়িয়ে দেয়। শ্বেতাঙ্গদের বিয়ে করা তাদের ধর্মের একটা অঙ্গ।

এই বিয়ের ব্যাপারটা তাদের যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কারণ তাদের কারো গায়ের রং আর কালো নেই। তাদের গায়ের রংটা বাদামী থেকে সাদা হয়ে উঠছে। কনফালা বা ওদের রাণীকে সত্যিই সুন্দরী বলা চলে। তার গায়ে নিগ্রোদের রঙের কোন চিহ্নই নেই। যদি কখনো ওদের কোন কৃষ্ণকায় পুত্রসন্তান হয় তাহলে তাকে তারা মেরে ফেলে। কারণ ওদের ধারণা, সন্তানরা পিতার রক্তের রংটাই পায়।

টারজন বলল, যদি ওরা পুত্রসন্তানদের এইভাবে মেরে ফেলে তাহলে যোদ্ধা পায় কোথা থেকে?

উড বলল, এখানে মেয়েরাই যুদ্ধ করে। আমি ওদের যুদ্ধ কখনো দেখিনি।

তবে যা শুনেছি তাতে মনে হয় যোদ্ধা হিসাবে ওরা বড় ভয়ঙ্কর, বড় হিংস্র। তুমি হয়ত বুঝতে পারছ হারানো বন্ধুদের মতই ওদের দেশে গিয়ে উঠেছিলাম আমরা। আমরা যুদ্ধ করতে চাইনি। আমাদের চারজনের মধ্যে দুজন চেয়েছিল হীরে। ডন আইক চেয়েছিল একটা দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চ আর আমি চেয়েছিলাম এক নতুন ভ্রমণকাহিনী লেখার উপাদান। তাই আমরা সকলেই বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম ওদের।

এটা ছমাস আগের ঘটনা। বব পেয়েছে এক দুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চ। আমি পেয়েছি লেখার উপাদান। স্পাইক আর স্ট্রোন হীরে পায়নি, কিন্তু তারা প্রত্যেকে সাতজন করে স্ত্রী পেয়েছে। কনফালা রাণী হিসাবে শ্বেতাঙ্গ বন্দীদের স্ত্রী নির্বাচন করে দেয় ওদের মধ্য থেকে। কিন্তু কনফালা নিজে কাউকে বিয়ে করতে পারে না।

মেয়েরা স্বামী পাবার জন্য কনফালার কাছে অনেক পূজা উপচার দেয়। যার উপচার বেশী মূল্যবান সে-ই স্বামী পায়।

কনফালা বব ও আমাকে বেশী পছন্দ করত। আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আমার কাছে বাইরের জগতের অনেক কথা শুনত। ধীরে ধীরে আমি হয়ে উঠি তার কাছের মানুষ। ফলে তার গুণগুলোই বড় হয়ে ওঠে আমার কাছে, তার নিষ্ঠুরতাকে আমি ক্ষমার চোখে দেখতে শুরু করি।

একদিন তার প্রতি আমার ভালবাসার কথাটা বলে ফেলি সাহস করে।

কথাটা শুনে আমার মুখপানে তাকিয়ে থাকে কনফালা বিস্ময়ের সঙ্গে। প্রথমে বলে, প্রেম ? প্রেম কি জিনিস আমি জানি না।

পরে বলে, একথা আর উচ্চারণ করো না মুখে। মনে রেখো আমি শুধু রাণী নই, আমি দেবী। আমাকে ওরা পূজো করে। তোমার স্পর্ধার জন্য আমি তোমাকে বধ করতে পারতাম। তুমি কি জান না, আমি বিয়ে করতে পারি না, কাউকে ভালবাসতে পারি না। মাফকা একথা জানতে পারলে আমাদের দুজনকেই হত্যা করবে।

আমি দেখলাম ঘৃণার থেকে ভয়ের ভাবই বেশী ফুটে উঠেছে কনফালার মুখে। সে বলল, মাফকা তার যাদুশক্তির বলে একথা একদিন জানতে পারবেই।

অনেক ভেবে সে আমাকে মুক্ত করে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। কারণ এতে দুজনেরই প্রাণ রক্ষা হবে। আমি ভাবলাম আমি মুক্তি পেলে আমার সঙ্গীদের একদিন উদ্ধার করতে পারব। কনফালাকেও বুঝিয়ে নিয়ে যেতে পারব আমাদের সঙ্গে।

তার সাহায্যেই আমি পালিয়ে আসতে পেরেছি।

৩

স্ট্যানলি উডের সব কথা মন দিয়ে শুনল টারজন। লোকটাকে সে চেনে না। সুতরাং তার সব কথা বিশ্বাস করতে পারল বলে মনে হয় না। তাছাড়া তার ধারণা সভ্য জগতের সব মানুষই মিথ্যাবাদী। প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে কথা বিশ্বাস করা চলে না।

তবে লোকটার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হলো সে। তাছাড়া পশুসুলভ এক সহজাত শক্তি বলে লোকটার মূল চরিত্র সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান সে লাভ করল।

অবশেষে সে জিজ্ঞাসা করল, যাই হোক, এখন কি করতে চাও তুমি?

সত্যি কথা বলতে কি, আমি কি করতে চাই তা আমি নিজেই জানি না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হবার সঙ্গে সঙ্গে কত কি শব্দ শুনতে পাওনি? কত সব ছায়া-মূর্তি দেখতে পাওনি? কারা যেন অদৃশ্যভাবে আমাদের দেখছে—একথা মনে হয়নি? এসবই মাফকার অতিপ্রাকৃত শক্তিরও নিদর্শন।

টারজন হাসিমুখে বলল, আমি কোন কোন জিনিসের শব্দ বা গন্ধ পেয়েছি। তাতে ভয়ের কিছু নেই।

উড বলল, তুমি মাফকাকে চেন না।

টারজন বলল, আমি আফ্রিকাকে চিনি। আমি নিজেকে চিনি।

টারজনের কণ্ঠে আশ্বাস পেয়ে খুশি হলো উড। সে বলল, তুমি দেখছি টারজনের মতই সাহসী।

টারজন দেখল লোকটি তার পরিচয় জানে না। সে-ই টারজন একথা জানে না সে। সেইটাই ভাল, কারণ তাহলে যা কিছু জানার তা সহজে জানতে পারবে সে তার কাছ থেকে। এ অঞ্চলে কেউ তাকে চেনে না, সুতরাং তার পরিচয় জানতে পারবে না উড।

এবার উড বলল, তুমি কিন্তু এখনো তোমার নাম বলনি। তোমার পরিচয় দাওনি। আমি এদেশে আসার পর থেকে এত সব অবিশ্বাস্য জিনিস দেখেছি যাতে আমি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারছি না। কোন সভ্য জগতের মানুষ এমন নগ্ন হয়ে একা একা এই বনে ঘুরে বেড়াতে পারে একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না।

কথাটা বলতে গিয়ে সংশয় ও শঙ্কার একটা ছায়া ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। সে বলল, তুমি আবার মাফকার চর নও ত?

টারজন ঘাড় নেড়ে বলল, তুমি খুবই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে পড়েছ। এ অবস্থায় আমি মাফকার চর হই বা না হই তাতে কিছু যায় আসে না।

আমাকে বিশ্বাস করা বা না করাটা তোমার ব্যাপার। তোমার যা খুশি করতে পার।

স্মিত হাসি হেসে উড বলল, আমরা দুজনে একই পথের পথিক। আমরা কেউ কারো সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না। আমি যা যা বলেছি তা এক আজগুবি কাহিনী হতে পারে। তা তুমি বিশ্বাস নাও করতে পার। কিন্তু আমি অন্ততঃ আমার নাম বলেছি। কিন্তু তুমি তাও বলনি।

টারজন বলল, আমার নাম ক্লেটন। তুমি নিশ্চয় এই দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে চাও?

উড বলল, হ্যাঁ চাই, কিন্তু তার কোন সম্ভাবনা নেই।

কেন নেই?

মাফকা আর কনফালা।

টারজন বলল, আমি তোমাকে এখনি অবশ্য এ দেশ থেকে বার করে নিয়ে যেতে পারব না। তবে তুমি আমার সঙ্গে টানা লেক অঞ্চলে যেতে পার। সেখানে অবশ্য লেখার মত এক কাহিনী পাবে তুমি। কিন্তু আমাকে কথা দিতে হবে তা তুমি লিখবে না কখনো। আর যদি তুমি আমার সঙ্গে না যাও তাহলে তোমাকে এইখানে ছেড়ে যেতে হবে আমায়। এবার কি করবে তা ঠিক করো।

উড বলল, আমি যাব তোমার সঙ্গে। কিন্তু ওখানে কখনই পৌঁছতে পারবে না।

এই বলে চারদিকে তাকিয়ে আবার বলল সে, দেখছ না কারা আমাদের দেখছে। কারা যেন দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। কিছু দেখতে বা শুনতে পাচ্ছ না?

টারজন বলল, ওসব কিছু না। আসলে তোমার মাথার স্নায়ুগুলো ঠিক নেই। আমি বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিছু দূরে চিতাবাঘ ডাকছে। তাও শুনতে পাচ্ছি।

হ্যাঁ, আমিও তা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এছাড়া আর একটা জিনিসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু তুমি কালা?

তুমি এখন ঘুমোও। তোমার এখন বিশ্রাম দরকার। কাল আর সে শব্দ শুনতে পাবে না।

কিন্তু দেখ, ঐ গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে একটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে। শুধু ছায়া যার মধ্যে কোন বস্তু নেই।

টারজন বলল, তুমি ঘুমোও। আমি লক্ষ্য রাখছি।

উড চোখ বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়লে একা একা ভাবতে লাগল টারজন। যেভাবে মাউন্টফোর্ডের মৃত্যু হয়েছে এবং উড যেভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে তাতে মাফকার অতিপ্রাকৃত শক্তির কথাটাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না একে-

বারে। যাদু আর রহস্যের দেশ আফ্রিকায় অনেক কিছুই সম্ভব।

কিন্তু সে যাই হোক, মাফকার যত শক্তিই থাক সে শক্তিকে ভয় পেল না টারজান। জঙ্গলের পশুদের মতই কোন অতিপ্রাকৃত বা যাদুকরী শক্তির প্রতি কোন ভয়ই নেই তার।

ভাবতে ভাবতে একসময় শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়ল টারজান।

সূর্যটা তখন আকাশে আধ-হাত মাত্র চওড়া হয়েছে এমন সময় ঘুম ভাঙল উডের। উঠেই দেখল সেই অদ্ভুত শ্বেতাঙ্গ লোকটি নেই।

তা দেখে উড কিন্তু খুব বেশী বিস্মিত হলো না। একটি অচেনা অজানা লোকের বোঝা কেন সে বইবে তার কোন যুক্তি নেই। তবে সে অন্ততঃ উডের ঘুম ভাঙা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত। তাকে কোন সিংহ বা চিতার শিকার হিসাবে ফেলে রেখে চলে যাওয়া উচিত হয় নি তার।

উড ভাবল তবে এটা ঠিক যে লোকটা আর যাই হোক মাফকার চর না। সে নিজেও সেই শয়তানীর যাদুর কবলে পড়েছে।

আবার গাছপালার মধ্যে সেই ভূতুড়ে শব্দটা শুনতে পেল উড। উড নিজে একজন সাহসী লোক হলেও সে আর সহ্য করতে পারছিল না। এক পরিচিত বিপদের সম্মুখীন হওয়া এক কথা আর এক অদৃশ্য অদৃষ্টপূর্ব ভয়াবহ বস্তুর ভয়ে পীড়িত হওয়া অন্য এক জিনিস।

উড এবার মরীয়া হয়ে পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যেদিক থেকে শব্দটা আসছিল সেদিকে তাকিয়ে চীৎকার করে বলল, যে-ই হও, চলে এস, মানুষের মত যুদ্ধ করো।

এমন সময় গাছের উপর থেকে নেমে পড়ল টারজান। একটা ছোট হরিণের মৃতদেহ ছিল তার কাঁধের উপর। টারজান এসেই উডকে বলল, কি, আবার সে শব্দ শুনছিলে নাকি?

উড হাসিমুখে বলল, হ্যাঁ শব্দটা পেয়ে বসেছে আমাকে। যাই হোক, হরিণটা কি করে মারলে? কি করে গাছের উপর দিয়ে ডালে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে ওটাকে কাঁধে করে নিয়ে এলে?

টারজান বলল, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে হরিণটার মাংস আগুনে ঝলসে নিয়ে খেয়ে আবার পথ চলতে থাকা।

খাওয়ার পর টারজান উডকে বলল, কিছুটা মাংস পকেটে ভরে নাও। আবার শিকার পাওয়ার আগে ক্ষিদে লাগলে খাবে।

খাওয়ার পর ওরা আবার পথ চলতে লাগল। নিউবারি নদীর উপত্যকার উপর দিয়ে এগিয়ে চলল টারজান। উড দেখল ওরা কাজীদের দেশের কাছাকাছি এসে পড়েছে। অন্য কোন লোক হলে এখানে এসে মাফকার অশুভ শক্তির খপ্পরে পড়ে গিয়ে মাফা নদী পার হয়ে কাজীদের দেশে চলে

যেত। কিন্তু টারজন সাধারণ মানুষ নয়, সে কারো কোন শক্তির খপ্পরে না পড়ে অবিচলিতভাবে পথ হাঁটতে লাগল।

কিন্তু উডের মনে হলো এক অদৃশ্য শক্তির বশীভূত হয়ে পড়েছে সে। সে তাই ভাবল টারজন অবলীলাক্রমে কাজীদের দেশের সীমানা পার হয়ে এগিয়ে চললেও তার সঙ্গে যেতে পারবে না। সেই অদৃশ্য শক্তি তাকে যেতে দেবে না।

উড তাই একসময় চীৎকার করে টারজনকে বলল, তুমি চলে যাও। আমি মাফকার কবলে পড়ে গেছি। মাফা নদী পার হয়ে কাজীদের দেশে যাচ্ছি আমি।

টারজন পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি আমার সঙ্গে যাবে বলেছিলে ত?

উড বলল, বলেছিলাম, কিন্তু আমার পাগুলো ওইদিকে টানছে। অন্য দিকে যেতে পারছি না আমি।

টারজন উডকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, মাফকা যে ওষুধ তৈরী করে তার থেকে বেশী শক্তিশালী ওষুধ আছে আমার কাছে।

উড আশ্চর্য হয়ে টারজনকে জিজ্ঞাসা করল, মাফা নদী পার হয়ে তোমার সেখানে যেতে ইচ্ছা করছে না?

টারজন বলল, শুধু একটা কৌতূহল হচ্ছে সেখানকার লোকগুলো ও মাফকাকে দেখার জন্য। তাছাড়া অন্য কিছু না।

উড বলল, মাফকার চারদিকে এত পাহারা যে তুমি তাকে দেখতে পাবে না।

কাজীদের দেশটাকে দেখার এক দারুণ কৌতূহল হলেও সে কৌতূহলকে মনের মধ্যে প্রশ্রয় দিল না টারজন। সে সহজভাবে উত্তর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল উডকে কাঁধে নিয়ে।

টারজন হঠাৎ ভাবল, উড কাজী মেয়েদের সম্বন্ধে যা বলেছে তার মধ্যে একটা কথা বুঝতে পারেনি সে। উড বলেছে কাজী মেয়েরা নাকি খুব ভাল যোদ্ধা। কিন্তু তাদের যুদ্ধ ও নিজের চোখে দেখেনি।

টারজন তাই একসময় উডকে প্রশ্ন করল, আচ্ছা কাজী মেয়েরা কাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে? তুমি বলেছ তারা নাকি খুব ভাল যুদ্ধ করতে পারে।

উড বলল, পুব দিকে বেশ কিছু দূরে আর এক উপজাতি আছে। তাদের নাম জুলি। আগে ওরা সবাই একই উপজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু ওদের দুজন যাদুকর ডাক্তার ছিল। তাদের নাম ছিল মাকফা আর উরা। পরে এই দুজন যাদুকরের মধ্যে ঈর্ষার ভাব জাগে। তখন ওরা এক এক জন যাদুকরের অধীনে দুটো উপজাতিতে ভাগ হয়ে যায়। এখন তারা

পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ বিবাদ করে। দুটো পৃথক এলাকায় বাস করে। কাজীদের অধিকারে যেমন ভারী হীরকখণ্ড আছে যার নাম গলফান, তেমনি উল্লাদের আছে সবুজ পান্নার এক ধাতব তাল। যার দাম হবে কুড়ি মিলিয়ন ডলার। কাজীদের রাণী গলনালা আমাকে এসব বলেছে। এখন তারা দুটো ধাতু নিয়ে কাড়াকাড়ি করে।

টারজন বলল, আসলে ওদের কাছে টাকাকড়ি বা অর্থসম্পদ আর বিলাসিতার কোন দাম নেই। এসব চায় না ওরা। ওরা শুধু চায় শক্তি। শক্তিবৃদ্ধির জন্যই এই দুই-উপজাতি পরস্পরের ধাতুটাকে হস্তগত করতে চায়।

ঘণ্টাখানেক পথ চলার পর এক জায়গায় উডকে তার কাঁধ থেকে নামিয়ে দিল। বলল, এবার তুমি বোধ হয় নিজেই হাঁটতে পারবে।

এই বলে টারজন আবার উত্তর দিকে হেঁটে যেতে লাগল।

এদিকে উড মুখে এক আতঙ্কের ছাপ নিয়ে দক্ষিণ দিকে ছুটতে লাগল কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে ধরে ফেলল টারজন।

উড আর্তকণ্ঠে টারজনকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি মনে করো আমি কোনদিন শয়তান মাফকার ভয়ঙ্কর ইচ্ছাশক্তির কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারব?

টারজন বলল, হয়ত পারবে না। কারণ আমি শুনেছি আফ্রিকার অনেক সাধারণ যাদুকর অনেক বন্দী পলাতককে অনেক বছর পরেও শত শত মাইল দূর থেকে ফিরিয়ে আনে তাদের ইচ্ছাশক্তির দ্বারা। মাফকার শক্তি নিশ্চয় সাধারণ যে কোন যাদুকরের শক্তির থেকে বেশী।

সে রাতে নিউবারি নদীর ধারে এক জায়গায় দুজনে শুয়ে পড়ল। পরদিন সকালে উঠে টারজন দেখল উড চলে গেছে।

৪

উড চলে যাওয়ায় মাফকার অলৌকিক যাদুশক্তি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে উঠল টারজন। তাছাড়া তার কাছ থেকে উড কাজীদের দেশে ফিরে গিয়ে এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছে যে তার শক্তির থেকে মাফকার শক্তি বেশী।

এই কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে উডকে সেই দুর্নিবার শক্তির কবল থেকে উদ্ধার করার বাসনা প্রবল হয়ে উঠল টারজনের মনে। সে কাজীদের দেশে গিয়ে উডকে উদ্ধার করবেই। তবে সরাসরি সোজা পথে না গিয়ে দক্ষিণ পূর্বদিকের এক দুর্গম পথ দিয়ে পিছন থেকে কাজীদের দেশে যেতে চাইল সে।

এ পথে অনেক দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় আর খাদের জন্য পদে পদে বাধা পেতে

লাগল টারজন। তবু সে ভাবল এই পথে সে একদিন কাজীদের দেশে গিয়ে উভ আর তার সঙ্গীদের মুক্ত করবে মাফকার কবল থেকে।

উভ চলে যাওয়ার পর তৃতীয় দিন বিকালবেলায় টারজন উঁচু পাহাড়ের ধারে এসে থামল। তার সামনে এক খরস্রোতা পার্বত্য নদী বয়ে যাচ্ছিল। তার মনে হলো, কাজী আর জুলিদের দেশে মধ্যবর্তী এক জায়গায় এসে পড়েছে সে।

তার পিছনে ছিল পূবদিকে উঁচু পাহাড়। তার সামনে পশ্চিম দিক থেকে বইতে থাকা বাতাসে বেবুন, চিতাবাঘ আর বুনো মোষের গন্ধ পাচ্ছিল। কিন্তু টারজন বুঝতে পারেনি তার পিছনে পাহাড়ের মাথা থেকে কয়েক জোড়া চোখ লক্ষ্য করছে তাকে।

পাহাড়টার উপরে তখন ছিল এগারজন যোদ্ধা। তাদের মধ্যে দুজন ছিল দাড়িওয়ালা শ্বেতাঙ্গ আর পাঁচজন ছিল কৃষ্ণকায় আদিবাসী। তাদের হাতে ছিল তীর ধনুক আর বর্শা। পিঠে ঢাল। তাদের গলায় ছিল বিভিন্ন জন্তুর দাঁতের ও হাড়ের মালা।

তারা উপর থেকে লক্ষ্য করল, টারজন সামনের নদী থেকে জল খেয়ে এসে তার পিঠের তূণ থেকে কিছু মাংস বার করে খেয়ে নিল। তারা তা দেখে ফিসফিস করে কি সব কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে।

যোদ্ধাদের মধ্যে বলিষ্ঠ চেহারার একজন শ্বেতাঙ্গ ছিল দলনেতা। তার মাথার ও দাড়ির চুল কিছু কিছু পাকা ছিল। তার চোখে মুখে বুদ্ধির ছাপ ছিল। দলের লোকেরা তাকে লর্ড বলে ডাকছিল।

তিন দিন ধরে অনেক পাহাড় ডিঙিয়ে খাদ পার হয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল টারজন। তার উপর চিতাবাঘদের জ্বালায় গতরাতে মোটেই ঘুম হয়নি তার।

তখনো ঘণ্টাখানেক বেলা ছিল। একটা ঝোপের পাশে নদীর ধারে ঢালু জায়গাটায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল টারজন।

তার যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন সে দেখল তখনো দিনের আলো নিবে যায়নি। দেখল প্রায় ডজনখানেক সাদাকালো চেহারার যোদ্ধা ঘিরে আছে তাকে। তাদের হাতে সে এখন বন্দী। এখন করার কিছু নেই। মুক্তির জন্য চেষ্টা করেও কোন লাভ নেই। তাই চুপচাপ শুয়ে রইল টারজন।

টারজনের কোন ভয় বা উত্তেজনার চিহ্ন দেখতে না পেয়ে আশ্চর্য হলো যোদ্ধারা।

অবশেষে লর্ড বলল, তাহলে কাজী, তুমি এখন আমাদের হাতে বন্দী।

টারজন চুপ করে রইল। সে লক্ষ্য করল তার ভাষাটা আফ্রিকা ও ইউরোপের ভাষার মাঝামাঝি কি এক দুর্বোধ্য ভাষা। তবু মনে হলো তার

কথার মধ্যে ইংরিজির টান ছিল। মনে হলো লোকটা ইংরেজ।

লর্ড আবার তাকে বলল, আচ্ছা কাজী, তোমার কিছু বলার আছে?

টারজন উত্তর করল, কিছু না।

তাহলে উঠে পড়।

টারজন সহজভাবে উঠে দাঁড়ালে লর্ড তার লোকদের বলল, এর সব অস্ত্র কেড়ে নাও।

টারজন যখন দেখল লোকটা ইংরিজি জানে তখন সে ইংরিজিতে বলল, কে তুমি? কি কারণে তুমি ভাবলে যে আমি একজন কাজী?

লর্ড বলল, কারণ আমরা জানি জুলি আর কাজী ছাড়া এই পার্বত্য অঞ্চলে অন্য কেউ আসে না।

এরপর লর্ড তার লোকদের টারজনের হাতদুটো পিছনের দিক করে বেঁধে দিতে বলল।

তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কাজী টারজনকে নিয়ে যোদ্ধারা পার্বত্য পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল তাদের বস্তীতে। টারজন পথটা ঠিক চিনতে পারল না।

অবশেষে এক সমতল উপত্যকায় এসে পড়ল ওরা। টারজন দূরে অনেকগুলো জ্বলন্ত আগুনের আলো দেখে বুঝতে পারল ওটাই ওদের গাঁ।

ওরা গাঁয়ের গেটের সামনে এসে পড়লে লর্ড হাঁক দিয়ে কি বলল। কয়েকজন সশস্ত্র নারী যোদ্ধা পাহারা দিচ্ছিল গেটে। তাদের দেখে টারজনের মনে হল তারা সবাই শ্বেতাঙ্গ।

গাঁয়ের ভিতর ঢুকে জ্বলন্ত আগুনের আভায় টারজন দেখল পথের ধারে ধারে সারবন্দী অনেক পাথরের ঘর রয়েছে। ঘরগুলোর দেওয়াল পাথরের আর ছাউনিগুলো শুকনো ঘাসের। গাঁয়ের মাঝখানে একটা দোতলা পাথরের বাড়ি রয়েছে।

টারজন আরো দেখল কতকগুলোর সামনে জ্বলন্ত আগুনের পাশে কতকগুলো মেয়ে বসেছিল। তাদের পাশে ছিল কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ। টারজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে মেয়েরা কৌতূহলী হয়ে উঠল।

একজন মেয়ে টারজনকে দেখে বলল, লোকটা কাজী না হলে ভাল হত। ও একজন ভাল স্বামী হতে পারত। কিন্তু কাজী বলে ওরা ওকে সিংহকে দিয়ে খাওয়াবে।

অন্য একজন বলল, লোকটার বুদ্ধি আছে বলে মনে হয়। উরা ওকে মারবে না, কারণ উরা চায় বুদ্ধিমান লোক।

সেই দোতলা পাথরের বাড়িটার সামনে বন্দী টারজনকে নিয়ে এসে লর্ড একজন নারী প্রহরীকে বলল, উরাকে খবর দাও, একজন কাজীকে বন্দী করে

এনেছি।

সেই নারী প্রহরী আবার অন্য একজন প্রহরীকে কথাটা বলল।

লর্ড উরার প্রাসাদের সেই প্রথম নারীপ্রহরীকে বলল, লোকটা কিন্তু দেখতে চমৎকার। তোমার স্বামী হলে কিন্তু খুব ভাল মানাত লয়ো।

লয়ো বলল, লোকটা সত্যিই কি শ্বেতাঙ্গ? ওর গাটা তামাটে মনে হচ্ছে। কিন্তু ও যখন কাজী তখন ত কোন কথাই নেই।

টারজন দেখল লয়ো মেয়েটি শ্বেতাঙ্গ এবং তার চেহারার গড়ন ভাল। তার মনে শুধু একটা চিন্তাই ছিল। জুলিরা যখন কাজীদের শত্রু তখন সে হয়ত এদের কাছ থেকে কাজীদের সম্বন্ধে এমন অনেক তথ্য পাবে যাতে কাজীদের দেশে গিয়ে তার উদ্দেশ্য সাধন করা সহজ হবে তার পক্ষে।

টারজন যখন এই সব ভাবছিল তখন একজন নারীপ্রহরী এসে লর্ডকে বলল, লর্ড, তুমি বন্দীকে উরার কাছে নিয়ে যাও।

ছয়জন নারীপ্রহরীসহ লয়ো লর্ড ও টারজনকে উরার ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

একটা বড় ঘরে ঢুকে টারজন দেখল দূরে একধারে একটা উঁচু মঞ্চের উপর মাথায় একরাশ পাকা চুল নিয়ে ভূড়ি মোটা একটা লোক বসে আছে। তার চোখদুটো আগুনের মত জ্বলজ্বল করছিল। প্রায় বিশজন সশস্ত্র নারীযোদ্ধা চারদিক থেকে ঘিরে ছিল মঞ্চটাকে।

টারজনকে মঞ্চের সামনে নিয়ে যাওয়া হলে তার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল উরা। দেখে কেমন যেন বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল সে। তারপর টারজনকে প্রশ্ন করল, আমার ভাই কেমন আছে?

টারজন বলল, আমি তোমার ভাইকে চিনি না।

উরা রাগতভাবে বলল, কি, আমার মিথ্যাবাদী, খুনী, চোর ভাইকে চেন না তুমি?

টারজন ঘাড় নেড়ে বলল, না, আমি তোমার ভাইকে চিনি না। আমি কাজী নই।

উরা তখন লর্ডএর উপর অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল, তুমি যে বলেছিলে তুমি একজন কাজীকে বন্দী করে এনেছ?

লর্ড বলল, আমরা ওকে মাফা নদীর উৎসের কাছে বন্দী করি। ও অঞ্চলে কাজী ছাড়া আর কে আসবে?

উরা গর্জন করে উঠল, তুমি একটা আস্ত বোকা। আমি ওকে প্রথম দেখার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছি ও কাজী নয়। তোমার মত বোকা লোকের কোন দরকার নেই আমাদের। তোমার থেকে শুধু কতকগুলো বোকা সন্তানের জন্ম হবে। তাই তোমাকে মরতে হবে। লয়ো এর অস্ত্র

কেড়ে নাও। একে এখন বন্দী করে রাখ।

এরপর টারজনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে উরা বলল, তুমি জুলিদের দেশে কি করছিলে ?

টারজন বলল, আমার একজন হারানো সঙ্গীর খোঁজ করছিলাম।

তুমি কি ভেবেছিলে আমাদের দেশে সে আছে ?

না, আমি তোমাদের দেশে আসতে চাইনি; আমি কাজীদের দেশে যেতাম।

তুমি মিথ্যা কথা বলছ। কাজীদের দেশ না হয়ে কেউ কখনো মাফা নদীর উৎস মুখে আসতে পারে না।

আমি কাজীদের দেশে না গিয়ে অন্য পথে এখানে এসেছিলাম।

কিন্তু এ পথে অনেক পাহাড় আর খাদ পার হতে হয়।

আমি পাহাড় আর খাদ পার হয়ে এসেছি।

উরা বলল, আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি কাজী নও, তুমি হচ্ছ মাফকার চর। তার দ্বারা নিযুক্ত এক চাকর। সে আমাকে খুন করার জন্য পাঠিয়েছে তোমাকে।

এর পর সে হাসতে হাসতে বলল, দেখা যাবে কে বেশী শক্তিধর ? মাফকা না আমি ? মাফকার চাকরকে কে বাঁচায় দেখ। এই কে আছ, একে বন্দী করে অন্য বন্দীর সঙ্গে রাখগে। এদের দুজনকেই মরতে হবে।

৫

উরার প্রাসাদের দোতলার একটা ঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছিল টারজন আর লর্ডকে। সে ঘরে ছিল একটামাত্র জানালা। জানালাটা কাঠের রড দিয়ে ঘন করে ঘেরা ছিল।

প্রহরী ঘরের দরজা বন্ধ করে চলে গেলে টারজন উঠে জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল। সেদিন ছিল জ্যোৎস্না রাত। আকাশে কোন মেঘ ছিল না। চাঁদের আলোয় টারজন দেখল বাইরে পাঁচিল ঘেরা খানিকটা ফাঁকা জায়গা রয়েছে।

টারজন এবার মুখ ঘুরিয়ে লর্ডকে বলল, আমি তখন তোমাকে বললাম আমি কাজী নই। কিন্তু তুমি তখন শুনলে না আমার কথা। শুনলে তোমাকে এই বিপদে পড়তে হত না।

লর্ড বলল, আমাকে হত্যা করার এটা একটা অজুহাত মাত্র। ওরা আমাকে মারার একটা সুযোগ খুঁজছিল। এই জুলিদের দেশে পুরুষদের

প্রয়োজন আছে। তারা যুদ্ধ করে। উরা শুনেছে একদল লোক এখান থেকে ওদের ধাতুটাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। এর সঙ্গে আবার উরাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রও জড়িয়ে আছে। আমি সেই চক্রান্তকারী দলের একজন। কাজীদেশ ছাড়া এখান থেকে বাইরের জগতে যাবার অন্য কোন পথ নেই। তাই ভেবেছিলাম ঐ পান্না ধাতুটা মাফকাকে ঘুঁষ দিয়ে তাদের দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার অনুমতি পাব। উরার বিশ্বাস আমিই এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। তাই ও আমার জীবন নাশ করতে চায়।

উরা ইচ্ছা করলেই অবশ্য যে কোন সময়ে আমাকে মারতে পারে। কিন্তু ও সুযোগ খুঁজছিল। একটা কারণ দেখিয়ে ও তার আসল উদ্দেশ্য এবং আমার উপর ওর সন্দেহটা ঢেকে রাখতে চাইছিল। ও সে কারণ পেয়ে গেছে। আমাকে মারার পর ও ষড়যন্ত্রকারীদের একে একে বধ করবে।

টারজন বলল, উরার পরিকল্পনার এত কথা তুমি জানলে কি করে?

লর্ড বলল, উরার ঘনিষ্ঠদের একজন আমাকে ভালবাসে। এই বিভীষিকার দেশে কিছুটা ভালবাসা এখনো আছে। যাই হোক, এখন আমাদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন আমাদের মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

টারজন বলল, তুমি ত ইংরেজ তাই না?

লর্ড বলল, হ্যাঁ, আমি ইংরেজ ছিলাম। কিন্তু এখন আমি কি তা জানি না। আমি কুড়ি বছর বন্দীজীবন যাপন করছি। প্রথমে কাজীরা আমাকে ধরে। তারপর জুলিরা একবার কাজীদের আক্রমণকালে আমাকে বন্দী করে এখানে আনে।

টারজন বলল, কিন্তু উরা ত কোন বন্দীকে বাঁচিয়ে রাখে না।

লর্ড বলল, আগে ওদের এখানে শ্বেতাঙ্গ পুরুষের দরকার ছিল। তাই ওরা আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। এখন সে প্রয়োজন ওদের মিটে গেছে। ওদের লোকসংখ্যা এখন অনেক বেড়ে গেছে। মেয়েরাও সব শ্বেতাঙ্গ হয়ে গেছে। এখন কোন সন্তানের মধ্যে নিগ্রোরক্ত দেখাই যায় না।

লর্ড আরো বলল, শোনা যায় উরা আর মাফকা দুই যমজ ভাই। বহুদিন আগে ওরা নাকি কলম্বিয়া থেকে পালিয়ে আসে। সঙ্গে পান্নার ধাতব তালটা। কাজীরা গলফান নামে হীরকখণ্ডটা কিকরে পায় তা আমি জানি না। হয়ত ওরা কোথাও থেকে চুরি করে আনে। ওদের বিশ্বাস কাজীদের গলফান আর জুলিদের পান্নাই সব শক্তির উৎস। কিন্তু উরাকে না মারলে পান্নাটা পাওয়া যাবে না। আমরা তাই উরাকে মারতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের সে স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন আমাকে উরা সিংহের মুখে ফেলে দিয়ে মজা পাবে। আর তোমাকে ওরা টুকরো টুকরো করে কাটবে।

টারজন বলল, কিন্তু দুজনের এই মৃত্যুদণ্ডের মধ্যে তফাৎ কেন ?

কারণ উরার ধারণা তোমার মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে। তোমার মাথাটাকে তাই চায় ওরা।

কিন্তু কিকরে তা সম্ভব ?

ওরা তা খাবে।

বুঝেছি। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে এই ধরনের প্রথা আছে। ওদের ধারণা ওরা কারো মস্তিষ্কটা খেলে তার বুদ্ধিটা পাবে। কোন বীর শত্রুর হৃৎপিণ্ড খেলে তার সাহস পাবে। কোন দ্রুতগামী মানুষের পায়ের পাতা খেলে তার মত ছুটতে পারবে আর কোন তীরন্দাজের হাতের তালু খেলে তার মত তীর ছুঁড়তে পারবে।

যত সব বাজে কুসংস্কার।

টারজন বলল, তবে আমার ধারণা যদি তুমি পালাতে চাও তাহলে ওরা তোমাকে সিংহের মুখে ফেলতে পারবে না আর আমারও মাথা খেতে পারবে না।

পালাব ? পালানোর কোন পথ নেই।

পথ অবশ্য আমি জানি না। তবে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

কি করে পালাব ? দরজা জানালাগুলো দেখ। বাইরে জানালার নিচে তাকিয়ে দেখ।

বাইরে আছে চিতাবাঘ।

লর্ড কৌতূহলী হয়ে বলল, কিকরে জানলে বাইরে চিতা আছে ?

আমি তার গন্ধ পেয়েছি। আমি একটু আগে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে দেখেছি বাইরে পাঁচিলঘেরা সীমানার মধ্যে চিতা আছে একটা।

কথাটা ঠিক।

টারজন আবার জানালার ধারে গিয়ে পরীক্ষা করল। তারপর বলল, জানালাটা অশক্ত।

এই বলে সে জানালাটা ভেঙ্গে দিয়ে দুটো কাঠের রড নিজে নিয়ে একটা রড লর্ডকে দিল। বলল, এইগুলোই হবে এখন আমাদের অস্ত্র।

লর্ড বলল, কিন্তু চিতাটা। আমরা পালাতে গেলেই চিতাটা চীৎকার করবে আর তখন প্রহরীরা ছুটে আসবে।

টারজন দেখল, বাইরে ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে একটা বড় কালো চিতাবাঘ তার পানে তাকিয়ে গর্জন করছে।

টারজন বলল, আমরা গাঁয়ের বাইরে গিয়ে পড়লে তুমি পথ চিনতে পারবে ? নাকি মাফকার মত উরার ইচ্ছাশক্তি আবার তোমায় ফিরিয়ে আনবে ?

এইজন্যই ত উরাকে আমরা খুন করতে চেয়েছিলাম।

জুলিদের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কিরকম ? তারা কি ওর প্রতি অনুরক্ত ?

ওরা তাকে ভয় করে এবং ঘৃণা করে। ওদের উপর উরার প্রতাপের একমাত্র ভিত্তি হলো ভয়।

সব মেয়েরাই ?

হ্যাঁ, প্রত্যেকেই।

উরার মৃত্যু হলে ওরা কি করবে ?

যে সব কৃষ্ণকায় ও শ্বেতাঙ্গ বন্দী হয়ে আছে তারা সবাই একযোগে মেয়েদের সঙ্গে বাইরের জগতে পালিয়ে যাবে। এখানকার মেয়েরা বিদেশীদের মুখ থেকে বাইরের জগতের নানা কথা শুনে সেখানে যেতে চায় তারা। শ্বেতাঙ্গরা জুলিদের বুঝিয়েছে যে পান্নার তালটা উরার কাছে আছে এটা এক মূল্যবান ধাতু। ওটা বিক্রি করলে অনেক টাকা হবে। তারা অনেক সুখে থাকতে পারবে। জুলি মেয়েরা চায় এক একজনের এক একজন করে স্বামী থাকবে। কয়েকজন মেয়ে মিলে একজন করে স্বামী চায় না তারা।

কিন্তু উরাকে ওরা খুন করেনি কেন এতদিন ?

কারণ এক অতিপ্রাকৃত শক্তির ভয়। ওরা নিজের হাতে ত মারতে পারবেই না, আবার কাউকেও মারতে দেবে না। ওরা শেষ পর্যন্ত উরাকে রক্ষা করে যাবে সেই শক্তির ভয়ে। কিন্তু উরা একবার নিহত হলে অবস্থা অন্যরকম দাঁড়াবে।

টারজন এবার জিজ্ঞাসা করল, উরা কোথায় ঘুমোয় ?

ওর সিংহাসনের পিছনে একটা ঘরে। কিন্তু একথা জানতে চাইছ কেন ?

টারজন বলল, আমি তাকে হত্যা করতে যাচ্ছি। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই।

লর্ড ঘাড় নেড়ে বলল, না না, তা করতে যেও না। ও দেবতার থেকেও শক্তিশালী ও সর্বজ্ঞ। কিন্তু কেন তুমি ওকে মারতে যাচ্ছ ?

কারণ আমার একজন দেশবাসী কাজীদের হাতে বন্দী আছে। উরাকে মেরে জুলিদের সাহায্যে আমি তাকে মুক্ত করতে পারব। তার সঙ্গে অন্যান্য বন্দীদেরও মুক্ত করব। আমি একা মনে হয় তা পারব না। মাফকার কাছে যাওয়া সম্ভব। সে আরো বেশী ভীতু এবং উরার থেকে আরো বেশী সতর্ক।

উরার খুব কাছে তুমি এখনো যাওনি।

উরা যে ঘরে বসে সে ঘর ছাড়া অন্য কোন পথ দিয়ে কি তার শোবার ঘরে যাওয়া যায় ?

পথ একটা আছে, কিন্তু সে পথে তুমি যেতে পারবে না। আমাদের নিচের তলায় যে ঘরে শোয় উরা বাইরের ঐ উঠোনটার দিকে একটা জানালা

আছে। সে জানালায় কোন রড নেই। কিন্তু জানালার নিচে কালো চিতাটা পাহারা দেয় সব সময়। একই সঙ্গে উরার রক্ষী হিসাবে কাজ করে এবং বন্দীরা যাতে পালাতে না পারে সেটাও দেখে।

টারজন বলল, তাহলে ত আমি ঐ খোলা জানালা দিয়েই যাব। কিন্তু চিতাটাকে কিভাবে সামলাবো সেইটাই হলো সমস্যা। চিতাটা ত গর্জন করে জানাবে সবাইকে।

চিতার উপর উরার প্রভুত্ব অপরিসীম। ও যেন ওর একটা পোষা বিড়াল। হঠাৎ বিপদে পড়লে চিতাটাকে ডাকার জন্যই গরাদহীন জানালাটা খোলা রাখে উরা।

টারজন বলল, উরার জীবনযাত্রা সম্বন্ধে সব কিছু বলত। কে ওর কাছে থাকে। কখন খায়? কখন শোয় বা ওঠে?

লর্ড বলল, আমরা যতদূর জানি ওর কাছে কেউ শোয় না। রোজ সূর্য ওঠার পরেই ও ওঠে। ওর ঘরের মধ্যে একটা ফুটো দিয়ে ওর প্রাতরাশ দেওয়া হয়। ওর তিনটে ঘর আছে। সে সব ঘরে ও কি করে তা কেউ জানতে পারে না। কেউ সেখানে যেতে পায় না। মাঝে মাঝে এক একজন নারীযোদ্ধাকে ডেকে তাকে দিয়ে কি করে কেউ তা জানে না। ভয়ে কেউ কোন কথা বলে না। প্রাতরাশ খাওয়ার একঘণ্টা পর দরবার ঘরে মঞ্চের সিংহাসনে এসে বসে উরা। সেখানে অনেক অভিযোগ ওকে শুনতে হয়, বিচার করে শাস্তির বিধান করতে হয়। শিকারীদল ও যোদ্ধাদের নির্দেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিতে হয়। কৃষিকার্য সম্বন্ধেও যাবতীয় নির্দেশ দিতে হয়। সব কাজ সেরে তার ভিতরকার ঘরে চলে যায় উরা। তবে রাতের খাওয়াটা সে দরবার ঘরে বসে খায়।

টারজন বলল, ঠিক আছে।

কিন্তু চিতা?

সেটা দেখা যাবে।

ওই জানালার ধারে গিয়ে টারজন দেখল চিতাটা পাঁচিলের ধারে ছায়ায় শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে।

টারজন লর্ডকে বলল, চিতাটা ঘুমিয়ে আছে।

কিন্তু ও বেশীক্ষণ ঘুমিয়ে থাকবে না।

আমি তা চাইও না। আমি শুধু কোনরকমে মাটিতে পা দিতে পারলেই হলো।

টারজনের এক হাতে ছিল ভাঙা জানালা থেকে নেওয়া মোটা একটা বড় রড। তাই নিয়ে জানালার বাইরে গিয়ে জানালার নিচেকার কাঠটা এক হাতে ধরে ঝুলতে লাগল। তারপর লাফ দিয়ে নিচে পড়ল।

লর্ড জানালার ধার থেকে দেখতে লাগল রুদ্ধ নিঃশ্বাসে। নেমেই নিঃশব্দে ঘুমন্ত চিতাটার দিকে এগিয়ে গেল সে। কিন্তু অর্ধেক পথ যেতেই জেগে উঠল চিতাটা।

লর্ড মনে মনে টারজনের সাহসিকতার প্রশংসা না করে তার এই কাজটাকে বোকামি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারল না।

কালো চিতাটা যথাসাধ্য প্রচণ্ডতার সঙ্গে নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে পড়ল টারজনের উপর। কোন গর্জন করল না। শুধু মাটির উপর ধুপধাপ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নিশীথ রাতের নিস্তব্ধতাটাকে ভঙ্গ করল না।

টারজন তখন দুহাতে সেই কাঠের মোটা রডটাকে ধরে এক আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিতাটার মাথায় ক্রমাগত মেরে চলেছিল।

কোনক্রমেই চিতাটা তার চোয়ালবারকরা দাঁতগুলো বসিয়ে দিতে পারছিল না টারজনের গায়ে।

লর্ড যখন রুদ্ধশ্বাসে চিতার সঙ্গে টারজনের এই লড়াই দেখছিল তখন উরার ঘরের জানালা দিয়ে আর একজোড়া চোখ নিঃশব্দে দেখছিল সে লড়াই।

লাঠির ঘায়ে চিতার মাথাটার হাড়গুলো সব ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে গেলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল চিতাটা। তা দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে উরার ঘরের জানালা থেকে সেই চোখজোড়াটা সরে গেল। নিঃশব্দে ভিতরের ঘরের অন্ধকারে চলে গেল।

চিতাটাকে বধ করার পর উরার ঘরের দিকে চলে গেল টারজন। খোলা জানালাটার ভিতর দিয়ে লাফিয়ে পড়ল ঘরের ভিতর। গন্ধ শুঁকে দেখল সে ঘরে কোন লোক নেই। সে শুনেছে ভিতরে উরার তিনখানা ঘর আছে। কিন্তু কোন্ ঘরটাতে উরা আছে কে জানে? তার মনে হলো উরা তার ঘর থেকে চিতাটার সঙ্গে তার লড়াই দেখে ভয়ে ভিতরদিকে একটা ঘরে ঢুকে পড়েছে। সে নিশ্চয় রক্ষীদের ডাকতে যায়নি। তাহলে শব্দ হত হাঁকডাকের।

চাঁদের কিছুটা আলো ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় টারজন দেখল সেই ঘরের দেওয়ালে একটা দরজা রয়েছে। নিঃশব্দে দরজাটা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। গন্ধ শুঁকে বুঝল, কিছুক্ষণ আগে উরা সে ঘরে ছিল, কিন্তু এখন নেই। ঘরটা অন্ধকার।

সেই ঘর থেকে ভিতরে অন্য একটা ঘরে যাবার একটা দরজা ছিল। টারজনের মনে হল ঐ দরজা দিয়ে উরা ভিতরে আর একটা ঘরে চলে গেছে। সেই ঘরে যাবার জন্য সে পা বাড়াতেই পায়ের তলায় জালের দড়ি ঠেকল

তার। তার সন্দেহ হলো এটা একটা ফাঁদ। তাকে ধরার জন্য পাতা আছে।

আর না এগিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে ফিরে যাবার চেষ্টা করল টারজন। কিন্তু কোথা থেকে জালটা টানতেই মোটা দড়ি দিয়ে বোনা জালটায় আটকে পড়ল সে। শত চেষ্টা করেও জাল থেকে মুক্ত করতে পারল না কিছুতেই।

এমন সময় তার সামনের দরজাটা খুলে ভিতরের একটা আলোকিত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল উরা। টারজন দেখল উরার পিছনে আলোকিত ঘরের দেওয়ালে অনেক মাথার খুলি সাজানো রয়েছে। একটা টেবিলের উপর মধ্যযুগীয় যাদুবিদ্যার নানা উপকরণ রয়েছে সাজানো। টেবিলের উপর পান্নার সেই তালটা থেকে একটা সবুজ আলো বিকীর্ণ হচ্ছিল।

উরা জালের মধ্যে আবদ্ধ টারজনকে বলল, আমরা ভেবেছিলাম তোমাকে পরে মারব। কিন্তু এখনই তোমাকে ভয়ঙ্করভাবে মারা হবে।

টারজন কোন কথা না বলে জালটাকে পরীক্ষা করে দেখল। জালের দড়িগুলো চামড়ার দড়ি দিয়ে বোনা।

উরার চোখে মুখে আর কোন ভয়ের চিহ্ন ছিল না। তার পরিকল্পনা সফল হওয়ায় সে খুশি হয়েছিল।

উরা বলল, এখানে তোমাকে কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করব। তারপর আমার প্রিয় পোষা এত ভাল চিতাটাকে মারার জন্য আমি চরম প্রতিশোধ নেব তোমার উপর। তীব্র যন্ত্রণা আর পীড়নের মধ্য দিয়ে তোমার মৃত্যুকে দীর্ঘায়িত ও বিলম্বিত করব। কিন্তু তুমি যাতে সে পীড়নের কিছু দেখতে না পাও তার জন্য তোমার চোখদুটোকে আগে নষ্ট করে দেব। উরার শক্তি এবার দেখ।

এই বলে সে পাশের ঘরে গিয়ে একটা উনোনে জ্বলতে থাকা কয়লার আগুনে একটা সূচলো লোহার রড পোড়াতে দিল। সেই রডটা হাতে করে এনে উরা বলল, এই জালের দড়ি পাগলা হাতিতেও ছিঁড়তে পারে না।

এই বলে সে সেই রডের সূচলো লাল গরম মুখটা টারজনের চোখে ঢুকিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে এল।

কিন্তু টারজন পর পর দুবার সেই রডটা হাত দিয়ে সরিয়ে দিল। রডটাকে উরা টারজনের চোখের কাছে আনতেই পারল না। টারজন কোন ক্ষমা প্রার্থনা না করায় এবং তার রডটা ঠেলে সরিয়ে দেওয়ায় উরা আরও রেগে গেল।

উরা পাশের ঘর থেকে আর একটা রড নিয়ে এসে বলল, এটা আরো গরম। এটা দিয়ে তোমার চোখদুটোকে এবার ঠিক বিদ্ধ করব।

টারজন দেখল সে রডের উপরটা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত লাল হয়ে উঠেছে।

সেই রডটা ধরে উরা টারজনের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, এবার তুমি নিশ্চয় চীৎকার করে ক্ষমা চাইবে।

কিন্তু টারজন দেখল তার পিছনে দরজাটা ঠেলে কে প্রবেশ করল ঘরে। মুখ ঘুরিয়ে সে দেখল কাঠের সেই মোটা রডটা নিয়ে লর্ড এসে ঘরে ঢুকেছে।

ঘরে ঢুকেই লর্ড তার দুহাতে রডটাকে লাঠির মত ধরে সজোরে উরার হাতে মেরে তার হাতের কব্জি ভেঙ্গে দিল। জ্বলন্ত রডটা পড়ে গেল তার হাত থেকে। তারপর সে তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে উরার মাথায় ক্রমাগত ঘা দিয়ে যেতে লাগল। উরার মাথাটা ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে গেল উরা।

টারজন এবার লর্ডকে বলল, ঠিক সময়েই এসে পড়েছ।

লর্ড বলল, কিভাবে চিতাটাকে মেরেছ আমি তা নিজের চোখে দেখেছি। তারপর তুমি উরার ঘরের দিকে এগিয়ে এলে আমিও অনুসরণ করি তোমায়।

এই বলে একটা ছুরি উরার টেবিল থেকে তুলে নিয়ে জালের দড়ি কেটে মুক্ত করল টারজনকে।

লর্ড এরপর টারজনকে বলল, এখন এই পান্নার তালটা আমাদের দুজনের। এখনো রাত শেষ হতে অনেক দেরী। চল আমরা এখান থেকে চলে যাই! এখন উরার ঘরে কেউ আসবে না। ওর মৃতদেহটা আবিষ্কার করতে কয়েকদিন সময় লেগে যেতে পারে।

টারজন লর্ডকে বলল, তুমি তোমার বন্ধুদের কথা ভুলে গেছ।

লর্ড বলল, উরা মরে গেছে। এবার ওরা মুক্তি পাবে। ওদের মুক্তির পথ প্রশস্ত করে দিয়েছি। এই ধাতুটা এখন আমাদের।

টারজন বলল, তুমি কাজীদের কথাও ভুলে গেছ। তাদের দেশের ভিতর দিয়ে কিকরে এটা নিয়ে যাবে? মাফকার শক্তি উরার থেকে আরো বেশী। মাফকার হাত থেকে পালাতে পারবে না।

তাহলে এখন কি করব আমরা?

টারজন বলল, আমি আগে সেখানে গিয়ে মাফকাকে খতম করব।

লর্ড বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানিয়ে টারজন বলল, না, আমি একা যাব। মাফকার অলৌকিক শক্তি দূর থেকেও তার শত্রুদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে। সে শক্তির কবল থেকে তুমি মুক্ত করতে পারবে না নিজেকে। একমাত্র আমার উপর সে শক্তি কাজ করবে না। তুমি গেলে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে।

এই বলে সে একটা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে পান্নার তালটাকে জড়িয়ে রাখল।

ওটা নিয়ে কি করবে তুমি ?

এটা সঙ্গে থাকলে মাফকার দেখা পাওয়া সহজ হবে আমার পক্ষে।

লর্ড হেসে বলল, তুমি কি ভেবেছ আমাকে বোকা বানিয়ে এটা একা নিয়ে যাবে তুমি ? তুমি জান এটার কত দাম। আমরা দুজনে এটা ভাগ করে নেব।

টারজন বলল, তুমি দেখেছ আমি কিভাবে চিতাটাকে মেরেছি। তুমি যদি আমার কাজে হস্তক্ষেপ কর তাহলে—

লর্ড বলল, কিন্তু এর দাম অনেক।

টারজন বলল, দাম যাই হোক, আমার তাতে প্রয়োজন নেই। আমার টাকা বা ধন-সম্পদের অভাব নেই। আমি এটাকে নিয়ে গিয়ে মাফকার কবল থেকে আমার লোকদের উদ্ধার করার কাজে এটাকে ব্যবহার করতে চাই শুধু।

এই বলে দড়ি দিয়ে কাপড়ে জড়ানো পান্নার তালটাকে ভাল করে বেঁধে তার কোমরের সঙ্গে বেঁধে দড়িতে ঝুলিয়ে নিল। তারপর ছুরিটা তুলে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলো।

যাবার জন্য উদ্যত হয়ে সে বলল, একদিন পর তুমি যারা এখান থেকে যেতে চায় তাদের নিয়ে কাজীদের দেশে তাদের সঙ্গে লড়াই করে পথ করে চলে যাবে। তবে আমি মাফকাকে আমাদের পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারলে তোমাদের সুবিধা হবে। কাজ সেরে আমি এই পান্নাটাকে নিউবারি আর মাফা নদীর সঙ্গমের কাছে এক জায়গায় রেখে আমার কাজে চলে যাব। তিন সপ্তা পর আমি আবার ফিরে এসে সেই পান্নার তালটাকে জুলিদের হাতে তুলে দেব।

লর্ড বলল, তাহলে আমার কি হবে ? তুমি জুলিদের দেবে ? এইজন্যই কি আমি উরার হাত থেকে তোমাকে বাঁচালাম ?

টারজন বলল, আমি চাই এটা তোমরা সবাই মিলে ভাগ করে নাও। তুমি ত বলেছিলে এটা কাজীদের ঘুঁষ দিয়ে তাদের দেশের ভিতর দিয়ে পথ করে বাইরের জগতে চলে যাবে। তুমি অন্য সবাইকে ফাঁকি দিয়ে একা এটা নিতে চাও তা ত আমি জানতাম না।

টারজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে লর্ড দরবার ঘরে চলে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে রক্ষীদের ঘরে গেল।

উরার দরবার ঘর থেকে লর্ডকে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে রক্ষীরা অবাক হয়ে গেল। মেয়ে যোদ্ধাদের মধ্যে লরো বলল, কি হলো লর্ড, তুমি কিভাবে তোমার ঘর থেকে বেরিয়ে এলে ?

লর্ড বলল, সেই কাজী বন্দীটা উরাকে খুন করে পান্নার তালটা নিয়ে

পালিয়েছে।

সব মেয়ে যোদ্ধারা তখন একযোগে বলে উঠল, উরাকে খুন করেছে! উরা তাহলে মৃত!

হ্যাঁ হ্যাঁ, উরা খুন হয়েছে। কিন্তু পান্নার তালটা চুরি গেছে।

জুলি মেয়েরা তখন উল্লসিত হয়ে ছুটে বেরিয়ে গাঁয়ের পথে পথে এই সুখের সংবাদটা প্রচার করতে লাগল।

এদিকে টারজন তখন গাঁ থেকে কিছুটা দূরে অন্ধকারে একা একা পথ চলতে চলতে গাঁ থেকে অনেক হৈ হুল্লোড়ের শব্দ শুনতে পেল। সেই সঙ্গে যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে জয়ঢাক বাজানোর শব্দও শুনতে পেল।

টারজন বুঝতে পারল লর্ড সবাইকে তার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তারা এবার একযোগে তাকে ধরতে আসবে।

টারজান তার চলার গতি বাড়িয়ে দিল।

এদিকে লর্ড জুলির সকলকে বোঝাতে লাগল, যদি আমরা পান্নার তালটাই না পাই তাহলে উরার মৃত্যুতে আমাদের কি লাভ হবে। আমরা মুক্ত হয়ে বাইরের জগতে গিয়ে কি করব?

টারজন এবার তার অনুসরণকারীদের পদশব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল। সে বুঝতে পারল তারা এখন বিক্ষুব্ধ। তারা যদি একবার ধরতে পারে তাকে তাহলে তার জয়ের উদ্দেশ্য সাধনের কোন আশাই থাকবে না।

নদীর ধারে ধারে আরো কিছুটা এগিয়ে গেলে টারজনের মনে হল সে যেন একা নেই। ছায়ার মত কে যেন তাকে জড়িয়ে ধরে তার সঙ্গে হাঁটছে। তার নিঃশ্বাস পড়ছে তার গায়ে। অথচ তার তীব্র ঘ্রাণশক্তির মাধ্যমে সে বুঝল কেউ নেই।

কোন যাদুশক্তি বা মায়ায় বিশ্বাস করে না টারজন। অথচ অশরীরী প্রেতের মত কে তাকে অনুসরণ করছে তা বুঝতে পারল না। একবার মনে হলো উরাঃ প্রেতাত্মা। কিন্তু পরে বুঝল এটা হলো পান্নার ধাতব শক্তি।

টারজন বুঝল, যে রহস্যময় গুপ্ত শক্তি উরার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাকে এতখানি ভীতিপ্রদ ও শক্তিশালী করে তুলেছিল, সে শক্তিকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আঁকড়ে ধরে রেখেছিল, সেই শক্তিই এই পান্নার ভিতর এক জীবন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে তার উপর।

তা যদি হয় তাহলে কাজীদের হীরকখণ্ড গলফানের মধ্যেও আছে এই একই শক্তি। সেই গলফানই হলো মাফকার সকল শক্তির উৎস এবং মাফকা এই পান্নার তালটা পেলে দ্বিগুণ শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

কিন্তু টারজন ভেবে পেল না সামান্য একটা পাথর বা ধাতু কি করে শক্তি যোগায় মানুষকে? তবে কি এই পাথর বা ধাতু যার কাছে থাকে তারই

মধ্যে এ শক্তি সঞ্চারিত হয় ?

টারজন এবার পথটা ছেড়ে এক পাশের এক বড় পাথরের আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে রইল। দেখল তার অনুসরণকারী জুলিরা লর্ডএর নেতৃত্বে অনেক কাছে এসে পড়েছে। ওদের দলে আছে পঞ্চাশজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর প্রায় চারশো জুলি মেয়ে যোদ্ধা। ওদের ধারণা পলাতক বেশী দূরে যেতে পারেনি।

টারজন পান্নার তালটার উপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে হাত দিয়ে ছুঁড়ে মেয়ে যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে মনে মনে বলতে লাগল, তোমরা ফিরে যাও। নিজেদের গাঁয়ে ফিরে যাও।

মেয়েরা তবু সেই পথ ধরে এগিয়ে আসছিল অব্যাহত গতিতে। টারজন তবু হতাশ হলো না। পান্নার তালটা থেকে সব আবরণ সরিয়ে সেটা একটু তুলে ধরতেই চাঁদের আলোয় চকচক করতে লাগল সেটা। এক উজ্জ্বল সবুজ আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল টারজনের দেহটা। সে বেশ বুঝতে পারল এক নতন শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে তার দেহে। যতবারই সে ডান হাত দিয়ে পান্নার তালটাকে স্পর্শ করে ততবারই অলৌকিক বৈদ্যুতিক শক্তির তরঙ্গ সঞ্চারিত হয় তার দেহের প্রতিটি শিরায়। মেয়েদের লক্ষ্য করে সে আবার তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করল। মনে মনে বলল, ফিরে যাও।

জুলি মেয়েরা হঠাৎ থেমে গেল চলতে চলতে।

শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের একজন বলে উঠল, কি হলো, থামলে কেন ?

একজন মেয়েযোদ্ধা বলল, আমরা ফিরে যাচ্ছি।

কেন ?

তা জানি না। আমরা বিশ্বাস করি না উরা মরে গেছে। সে আমাদের ডাকছে। ফিরে যেতে বলছে।

লর্ড বলল, বাজে কথা। আমি নিজে দেখেছি সে খুন হয়েছে। তার মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে একতাল মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়েছে।

এই বলে মেয়েরা ফিরে যেতে লাগল।

লর্ড বলল, ওদের যেতে দাও।

লর্ডের নেতৃত্বে পঞ্চাশজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ দাঁড়িয়ে রইল। জুলির মেয়েযোদ্ধারা ক্রমে পথের বাঁকটায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

লর্ড বলল, ভাল হলো। আমরা মোট পঞ্চাশজন আছি। পান্নাটা পেয়ে মেয়েগুলোকে আর ভাগ দিতে হবে না।

একজন বলল, এখনো আমরা পাইনি সেটা।

কাজীটাকে ধরতে পারলেই সেটা আমাদের হবে। সে দিতে না চাইলে আমরা সবাই মিলে খুন করব তাকে।

আড়াল থেকে মুচকি হাসল টারজন।

লর্ড তার দলের লোকদের বলল, এগিয়ে চল। দেরী করছ কেন?

কিন্তু কেউ নড়ল না। কেউ পা তুলতে পারল না। এমন কি লর্ড নিজেও চলতে পারল না।

একজন লর্ডকে বলল, কি হলো, যাচ্ছ না কেন?

লর্ড বলল, তোমরাই বা যেতে পারছ না কেন?

লর্ডের মুখখানা ম্লান হয়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন দারুণ ভয় পেয়ে গেল। সে বলল, আমি বা তোমরা কেউ যেতে পারবে না। মেয়েরা ঠিকই বলেছিল, উরার শক্তি কাজ করছে।

লর্ড বলল, আমি নিজে দেখেছি সে মরে গেছে।

তাহলে তার প্রেতাত্মা। ঐ দেখ।

এই বলে পথের ধারে যে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে ছিল টারজন সেই দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাল।

সবাই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। পাথরের ওধার থেকে একটা সবুজ আলো বেরিয়ে এসে চাঁদের আলোকে ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

শ্বেতাঙ্গরা ভয়ে বুকে ক্রশ আঁকতে লাগল তা দেখে।

এমন সময় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল টারজন।

লর্ড বলল, সেই কাজী।

অন্য একজন বলল, সেই পান্নার তাল।

কিন্তু অস্ত্র তুলল না। কেউ এগিয়ে গেল না টারজনের দিকে।

টারজন এবার তাদের কাছে এসে বলল, তোমরা সংখ্যায় পঞ্চাশজন আছ। আমার সঙ্গে কাজীদের দেশে এস। সেখানে আমার কয়েকজন লোক বন্দী হয়ে আছে। তাদের মুক্ত করে আমরা ওদেশ থেকে বেরিয়ে যাব। তারপর যার যেখানে ইচ্ছা চলে যাবে।

লর্ড বলল, কিন্তু পান্নাটা? তুমি বলেছিলে আমাকে তার ভাগ দেবে।

টারজন বলল, কিছুক্ষণ আগে তুমি আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলে। ফলে সে অধিকার তুমি হারিয়ে ফেলেছ। তাছাড়া আমি এখন এই পান্নার শক্তির স্বরূপটা বুঝতে পেরেছি। এ শক্তি বিপজ্জনক। তোমার মত অযোগ্য লোকের হাতে পড়লে তা দারুণ ক্ষতি করবে। কাজীদের দেশ থেকে আমি বেরিয়ে গেলে নিউবারি নদীর জলে এটা ফেলে দেব যাতে কেউ এটাকে খুঁজে না পায়।

লর্ড বলল, আসলে তুমি এটা নিজের কাছেই রেখে দিতে চাও। কাউকে ভাগ দিতে চাও না।

টারজন বলল, যা খুশি ভাবতে পার। এখন এস আমার সঙ্গে।

টারজনের পিছু পিছু নীরবে এগিয়ে যেতে লাগল ওরা।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে পথের ধারে একটা উঁচু জায়গা থেকে টারজন কাজীদের নগর আর মাফকার দুর্গটা দেখতে পেল। একটা উপত্যকার একপ্রান্তে একটা খাড়া পাহাড়ের কোলে গড়ে উঠেছে নগরটা জুলিদের গ্রামের থেকে এ নগরটা অনেক বড় এবং আরো বিস্তৃত জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে।

দূর থেকে কাজীদের নগরটা দেখার পর টারজন তার দলের লোকদের বলল, আমরা অনেক পথ হেঁটেছি। তার উপর কিছুই খাওয়া হয়নি। তোমরা সবাই ক্লান্ত। রাত্রির অন্ধকার ঘন হয়ে না ওঠা পর্যন্ত ওখানে যাওয়া ঠিক হবে না। সুতরাং তোমরা এখন বিশ্রাম করো।

একজনের কাছ থেকে একটা বর্শা নিয়ে তার মুখ দিয়ে একটা জায়গার চারদিকে একটা গণ্ডী টেনে দিল টারজন। তারপর বর্শাটা যার হাত থেকে নিয়েছিল তাকে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, তোমরা কেউ এই গণ্ডীর বাইরে পা বাড়াবে না।

এই বলে সেই গণ্ডীর রেখার বাইরে কিছুটা দূরে সে নিজে শুয়ে পড়ল। পান্নার তালটা তার পাশে রাখল এবং তার উপর একটা হাত চাপিয়ে রাখল।

সকলেই বিশ্রামের সুযোগ পেয়ে শুয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল সবাই। একমাত্র লর্ড একা জেগে রইল। পান্নাটার দিকে সব সময়ের জন্য নিবদ্ধ করে রাখল তার জাগ্রত দৃষ্টি। ধাতুটা থেকে বিচ্ছুরিত এক সবুজ আভার বৃত্তসীমার মধ্যে অর্থদ্বারা ক্রয়যোগ্য সভ্য জগতের সকল সম্পদ ও সকল ঐশ্বর্যকে আবদ্ধ দেখতে পেল সে।

সন্ধ্যা গিয়ে রাত্রি এল। তবু চাঁদ উঠল না আকাশে। চারদিকে ঘোর অন্ধকার। শুধু পান্নার সবুজ একটুখানি অস্পষ্ট আলো এ জায়গার কিছুটা অন্ধকার দূর করেছিল।

লর্ড লক্ষ্য করল টারজনের একটা হাত পান্নার উপর চাপানো আছে। তার মনে পড়ল উরা যখন কাউকে দিয়ে জোর করে কিছু করাত তখন সে পান্নাটার উপর হাত দিয়ে রাখত। সে তাই বুঝল যতক্ষণ কেউ তার কোন অঙ্গ দিয়ে ছুঁয়ে থাকবে পান্নাটাকে ততক্ষণই সে এক অলৌকিক অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী থাকবে।

দেখতে দেখতে লর্ড একসময় দেখল ঘুমের মধ্যে একবার পাশ ফিরতেই টারজনের হাতটা পান্নার উপর থেকে খসে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের বর্শাটা নিয়ে ঘুমন্ত টারজনের দিকে এগিয়ে গেল। লর্ড গণ্ডীটা পার হবার সময় একটু ইতস্ততঃ করল। তারপরই সে টারজনের কাছে গিয়ে পান্নাটা তুলে নিল। বর্শা দিয়ে টারজনকে হত্যা করার কথাও

একবার ভেবেছিল সে। কিন্তু তা করল না কারণ ভাবল তাকে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করলেও মরার আগে সে চেঁচালে সকলে জেগে উঠবে। তখন পান্নাটা নিয়ে একা পালাতে পারবে না। তাহলে সকলকেই ভাগ দিতে হবে।

পান্নার তালটা নিয়ে লর্ড একা নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

৭

হঠাৎ চমকে ঘুম থেকে জেগে উঠল টারজন। চাঁদের আলো ঝরে পড়ছিল তার মুখের উপর। তার মনে হলো সে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। হাতের কাছে পান্নার তালটা না পেয়ে তার খোঁজ করতে লাগল।

কিন্তু সেটা না পেয়ে লাফ দিয়ে উঠে ঘুমন্ত লোকগুলোর কাছে গেল। দেখল সবাই ঘুমোচ্ছে। শুধু লর্ড নেই। টারজন ভাবল লোকগুলোকে জাগিয়ে তুলে কোন লাভ হবে না। কারণ এখন তার সব শক্তির উৎস পান্নার তালটা নেই এখন সে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না। এখন তারা সবাই শত্রু হয়ে উঠবে।

সারা শিবিরটার চারদিকে ঘুরে গন্ধসূত্র ধরে সে বুঝতে পারল লর্ড মাফা নদীর উপত্যকার উপর দিয়ে পালিয়ে গেছে। সে গেছে নিউবারি নদীর দিকে। লর্ড হয়ত ঘণ্টা দুই আগে চলে গেছে। কিন্তু যত আগেই সে যাক সে তাকে ধরবেই।

রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যতই এগিয়ে যেতে লাগল টারজন ততই লর্ডের গন্ধটা বেশী অনুভূত হতে লাগল তার নাকে। পথটা ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গেছে ধীরে ধীরে। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল পথটা। এই পথই চলে গেছে কাজীদের দেশে।

প্রায় একঘণ্টা ধরে লর্ডকে অনুসরণ করার পর টারজন দূরে অস্পষ্ট একটা সবুজ আলো দেখতে পেল। দেখল আলোটা ডান দিকে ঘুরে একটা পথ ধরল। মনে হলো লর্ড বোধ হয় কাজীদের নগরটাকে পাশ কাটিয়ে অন্য একটা পথ ধরেছে। কিন্তু ও যে পথেই যাক তাকে ধরে ফেলবে সে।

দ্রুতপায়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ টারজনের পায়ের মাটিটা নেমে গেল। সে একটা অন্ধকার গর্তের মধ্যে পড়ে গেল। সে বুঝল গর্তের উপরটা নরম মাটি আর ডালপালা দিয়ে ঢাকা ছিল। আসলে এটা চিতাবাঘ ধরার একটা ফাঁদ। ফাঁদটা কাজীরা পেতেছে।

টারজন দেখল গর্তের মুখটা অনেক উঁচুতে। লাফ দিয়ে সেখানে উঠে বার হওয়া সম্ভব নয় তার পক্ষে। সে বুঝল কাজীরা কাল দিনের বেলায় ফাঁদটা

দেখতে আসবে। ততক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তারা এসে হয় তাকে বধ করবে পশুর মত অথবা বন্দী করে নিয়ে যাবে। তবে ফাঁদের মুখটা আর ঢাকা নেই বলে কোন চিতা অন্ততঃ এ গর্তে আর পড়বে না।

সে একবার লর্ডের কথা ভাবল। ভাবল লর্ড পান্নার তালটা নিয়ে সভ্য জগতে একবার পৌছতে পারলে অনেক ক্ষতি করবে। তার মত একটা অপদার্থ লোক এই মূল্যবান ধাতুর যোগ্য নয়। যাই হোক লর্ডের ব্যাপার নিয়ে সে আর মাথা ঘামাতে চাইল না। সে শুধু নিজের কথা ভাবতে লাগল। কিন্তু নিজের কথা নিয়েও বেশী চিন্তা করল না সে। পরিস্থিতি যত ভয়াবহই হোক না কেন, ভয় পাওয়া বা উদ্বেগে কাতর হওয়া তার স্বভাব নয়। তাই সে তার প্রবল আত্মবিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

রাত্রি গভীর হতেই ঘুমিয়ে পড়ল টারজন সেই অন্ধকার গর্তটার মধ্যে। আসন্ন বন্দীত্ব বা মৃত্যুর সম্ভাবনাপূর্ণ এই শোচনীয় অবস্থাও কিছুমাত্র বিচলিত করতে পারল না তার মাথার স্নায়ুগুলোকে।

টারজনের যখন ঘুম ভাঙল তখন সূর্য মাথার উপরে উঠে গেছে অনেকটা। সে কান পেতে একসঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনতে পেল। তাদের কথাবার্তাও শুনতে পাচ্ছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টারজন মুখ তুলে দেখল কয়েকজন মেয়েযোদ্ধা আর কয়েকজন পুরুষ গর্তের উপর থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখছে তাকে। তাদের একজন বলল, চমৎকার একটা চিতা ধরা পড়েছে।

আর একজন বলল, মাফকা খুশি হবে। কিন্তু আমাদের নগরের কাছে উপত্যকায় যে সব প্রহরী ছিল তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এখানে ও এল কি করে ?

গর্তের মধ্যে একটা মোটা দড়ি ফেলে দিল ওরা। টারজন বলল, ধর দড়িটা, আমি উঠছি।

দুটো কারণে ধরা দিতে চাইল টারজন। প্রথমতঃ এখানে বাধা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করতে যাওয়া মানে অবধারিত মৃত্যু। দ্বিতীয়তঃ তাকে বন্দী মাফকার কাছে নিয়ে গেলে সে অন্ততঃ উড ও তার সঙ্গীদের উদ্ধার করার সুযোগ পাবে একটা।

দড়ি ধরে উঠে গর্তের উপর টারজন পা দিতেই কতকগুলো বর্শা তার চারদিকে উচিয়ে ধরল যোদ্ধারা।

টারজন দেখল আটজন মেয়েযোদ্ধা আর চারজন পুরুষ। সকলেই শ্বেতাঙ্গ এবং সশস্ত্র।

একজন মেয়ে আশ্চর্য হয়ে বলল, কে তুমি ?

টারজন বলল, আমি একজন শিকারী।

এখানে এলে কি করে ?

আমি উপত্যকার উপর দিয়ে নিউবারি নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ এই গর্তের মধ্যে পড়ে যাই।

একজন মেয়েযোদ্ধা বলল, কিন্তু প্রহরীদের এড়িয়ে এলে কি করে এখানে ? কাজীদের দেশে আসার মাত্র ত একটাই পথ এবং সে পথে প্রচুর পাহারার ব্যবস্থা আছে।

টারজন বলল, আমি উত্তর দিক থেকে পার্বত্য অঞ্চলে শিকার করতে করতে আসছি। পরে পার্বত্য এলাকা এড়িয়ে এই উপত্যকার পথে চলে আসি। আমি আবার নিউবারির দিকে চলে যাব।

মেয়েযোদ্ধাটি বলল, না, তুমি এখন আমাদের বন্দী। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

টারজন বলল, ঠিক আছে, তাই নিয়ে চল। তোমরা বারোজন, আমি একা। তোমাদের হাতে অস্ত্র আছে, আর আমি নিরস্ত্র।

টারজনকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল ওরা। কিন্তু হাত দুটো বাঁধল না।

ইচ্ছা করলেই পালাতে পারত টারজন : তার সঙ্গে ছুটে পারত না ওরা। কিন্তু যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও পালালো না সে। কারণ সে কাজীদের দেশেই যেতে চায়। সেখানে তাকে ওরা বন্দী করে রাখলেও যে সে কোনদিন পালাতে পারবে না বা নিজের মুক্তি নিজেই রচনা করে নিতে পারবে না একথা মোটেই ভাবল না সে। কারণ প্রবল আত্মবিশ্বাসের জন্য ব্যর্থতার কথা কখনই চিন্তা করে না সে।

যে চারজন শ্বেতাঙ্গ লোক টারজনের সঙ্গে যাচ্ছিল তাদের কথাবার্তা হতে টারজন জানতে পারল তাদের একজনের নাম স্ট্রোন। স্ট্যানলি উডের মুখ থেকে তার সঙ্গী স্ট্রোন ও ভন আইকের নাম শুনেছিল।

টারজন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি উড আর ভন আইকের সঙ্গে ছিলে ?

স্ট্রোন বিস্মিত হয়ে টারজনের মুখপানে তাকাল। তুমি উডকে চিনতে ?

টারজন বলল, হ্যাঁ, সে কি আবার ধরা পড়েছে ?

স্ট্রোন বলল, হ্যাঁ, যাফকার কবলে একবার পড়লে আর নিষ্কৃতি নেই। সে তোমাকে দূর থেকেও টেনে আনবেই। উড পালিয়ে গিয়েও আবার ফিরে এসেছে। আচ্ছা তোমার নাম কি ক্লেটন ?

টারজন বলল, হ্যাঁ।

তোমার কথা উডের কাছ থেকে অনেক শুনেছি। তোমার চেহারার বর্ণনা তার মুখ থেকে শুনেছিলাম বলেই তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারি।

উড কি এখনো বেঁচে আছে ?

হ্যাঁ, মাফকা এখনো মারেনি তাকে। তবে ওকে মরতেই হবে। মাফকা ওর পালানোর জন্য দারুণ রেগে আছে। লোকটা ভয়ঙ্কর। একমাত্র টমি সেনাদের এক বিরাট দলই তাকে জব্দ করতে পারে।

টারজন বলল, কিন্তু গলফানের শক্তির দ্বারা টমিদের থামাতে পারবে না মাফকা ?

বোধ হয় পারবে না। কারণ কোন বিদেশী পালাতে গেলে ও এত রেগে যায় কেন ? হয়ত আক্রমণের ভয় করে।

টারজন আবার জিজ্ঞাসা করল, মাফকা কি সত্যি সত্যিই মৃত্যুদণ্ড দিতে চায় উডকে।

স্ট্রোন বলল, ও হয়ত উডের শুধু পালানোর জন্য এত রাগত না। উডের সবচেয়ে বড় অপরাধ সে রাণী গলনালাকে ভালবাসে এবং গলনালারও একটা দুর্বলতা আছে তার প্রতি।

সারা পথটা স্ট্রোন টারজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যেতে লাগল। নগরের কাছাকাছি এসে টারজন দেখল নগরপ্রাচীরটা পাথর দিয়ে গাঁথা। নগরের ভিতরের বাড়িগুলো সব পাথরের এবং সেগুলো একতলা অথবা দোতলা। একমাত্র মাফকার প্রাসাদটা চারতলা।

রাজপথের উপর দিয়ে টারজনকে নিয়ে ওরা মাফকার প্রাসাদের দিকে এগিয়ে চলল। পথে অনেক কৃষ্ণকায় নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর মেয়েযোদ্ধা দেখল। পথে যে সব শিশুরা খেলা করছিল তারা সবাই মেয়ে।

টারজনকে দেখে মেয়েযোদ্ধারা তার কথা আলোচনা করতে লাগল উৎসাহের সঙ্গে। একজন বলল, ওরকম স্বামী পেতে হলে অনেক দাম দিতে হবে।

মাফকার প্রাসাদের কাছে এলে চারজন পুরুষ সরে গেল। শুধু আটজন মেয়েযোদ্ধা প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে গেল টারজনকে। টারজন দেখল উরার প্রাসাদের থেকে মাফকার প্রাসাদে ঐশ্বর্যের পরিমাণ অনেক বেশী। মাফকা অনেক লুটের মাল পায়, উরা সেটা পায় না।

দরবার ঘরে ঢুকে টারজন দেখল ঘরের শেষ প্রান্তে একটি মঞ্চের উপর পাতা একটি সিংহাসনে যে মানুষটি বসে আছে তাকে দেখতে অবিকল উরার মত। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। তখন উডের কথাটা মনে পড়ল তার। উড বলেছিল আসলে মাফকা আর উরা দুই যমজ ভাই; দেখতে একই রকমের।

টারজনকে ধরার সময় যে সব মেয়েযোদ্ধারা ছিল তারা বন্দী সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করল মাফকার কাছে। মাফকা সে বিবরণ খুঁটিয়ে দেখার পর

উরার মতই গলফান নামক সেই হীরের তালটার উপর হাত রেখে টারজনকে প্রশ্ন করল, কে তুমি ?

টারজন বলল, আমি একজন ইংরেজ, শিকার করছিলাম।

কি কারণে ?

খাদ্যের জন্য।

মাফকার পাশেই একটি চেয়ারে একটি সুন্দরী মেয়ে বসেছিল। টারজন বুঝতে পারল ঐ মেয়েটিই হলো গলনালা অর্থাৎ কাজীদের রাণী। তার বুকে ও পেটের উপর খাঁটি সোনার বক্ষাবরণী ও উদরবেষ্টনী। পরনে ছিল চিতার নরম চামড়া দিয়ে তৈরী স্কার্ট। তার হাতে, বাহুতে ও পায়ে ছিল অনেক তামা ও সোনার গয়না। তার মাথার উপর ছিল হালকা একটা মুকুট।

উরার মত মাফকার পরনে ছিল মাত্র একটা কৌপীন এবং ভুঁড়িটা মোটা। টারজন বুঝল রাণীর বেশভূষা যতই জাঁকজমকপূর্ণ হোক, তার মুকুট যতই শক্তির প্রতীক হোক, আসল শক্তি আছে কৌপীনপরা ঐ কুৎসিতদেহী লোকটার হাতে।

টারজনকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার পর মাফকা হুকুম দিল, নিয়ে যাও ওকে এখান থেকে।

গলনালা মাফকাকে জিজ্ঞাসা করল, ওর জন্য স্ত্রী নির্বাচন করতে হবে না ?

মাফকা বলল, না। আমি দেখে বুঝলাম, ওকে হত্যা করাই উচিত হবে। নিয়ে যাও ওকে। একটা ঘরে আটক করে রাখগে।

রক্ষীরা টারজনকে উপরতলার একটি বড় ঘরে নিয়ে গিয়ে তাকে একা রেখে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে চলে গেল। দুটো বেঞ্চ ছাড়া আর কোন আসবাবপত্র ছিল না সে ঘরে। ঘরের দেওয়ালে নগরের দিকে কতকগুলো ছোট ছোট জানালা ছিল। তাই দিয়ে বাইরে থেকে কিছু আলো আসছিল। একদিকের দেওয়ালে আগুন জ্বালাবার একটা বড় চুল্লী ছিল। কিন্তু সেখানে কোন আগুন জ্বালানো ছিল না।

ঘরটা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখল টারজন। জানালাগুলো ঘরের অনেক উপরে। সেদিক দিয়ে বাইরে যাবার কোন উপায় নেই।

সে তখন আগুন জ্বালাবার শূন্য চুল্লীটাকে পরীক্ষা করে দেখল। দেখল সেটা আসলে কোন চুল্লী নয়, নিচের তলার যাবার একটা গুপ্ত পথ। সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ দিয়ে নিচের তলায় একটি বড় ঘরে গিয়ে পড়ল টারজন। ঘরটির দরজায় ভিতর থেকে খিল আঁটা ছিল। মৃদু আলোকিত সেই ঘরের একপ্রান্তে একটি চেয়ারের উপর কাজীদের রাণী গলনালা বসে তন্ময় হয়ে কি ভাবছিল।

নিঃশব্দে গলনালার দিকে এগিয়ে গেল টারজন। বুঝতে পেরে মুখ ফিরিয়ে টারজনকে দেখে বিস্মিত হলো গলনালা। কিন্তু চীৎকার করল না।

টারজন বলল, ভয় পেও না। আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে আসিনি।

গলনালা বলল, আমি ভয় পাইনি। আমার হাতের নাগালের মধ্যে অনেক যোদ্ধা আছে এবং ডাকলেই তারা ছুটে আসবে। কিন্তু তুমি কিকরে এলে এখানে ?

টারজন দেখল রাণী গলনালার মধ্যে প্রভুত্বসূচক কোন কঠোর বা উদ্ধত ভাব নেই। সে এখন শান্ত মিষ্টি একটি মেয়ে।

টারজন তার কোন জবাব না দিয়ে বলল, স্ট্যানলি উড এখন কোথায় ? ওরা ওকে নিয়ে কি করবে ?

তুমি স্ট্যানলি উডকে চিনলে কি করে ?

আমি তার বন্ধু। সে এখন কোথায় ?

গলনালা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে টারজনের দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি তার বন্ধু ? তাতে কিছু যায় আসে না। তার যত বন্ধুই থাক, কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না।

তুমি তাকে বাঁচাতে চাও ?

হ্যাঁ।

তাহলে কেন আমাকে সাহায্য করছ না ? তোমার হাতে ক্ষমতা আছে।

না, পারি না। তুমি বুঝতে পারছ না। আমি রাণী। আমাকে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে।

তোমারই সাহায্যে সে কিন্তু একদিন মুক্ত হয়ে পালিয়ে যায়।

চুপ করো। জোরে কথা বলো না। মাফকা এটা আগেই সন্দেহ করেছে। এটা সে যদি নিঃসন্দেহে জানতে পারে তাহলে তার ও আমার ভাগ্যে কি যে ঘটবে তা আমি জানি না। মাফকা আমাকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করে বলেই আমাকে কড়া পাহারায় এ ঘরে নজরবন্দী করে রেখেছে। সে বলে আমারই নিরাপত্তার জন্যই এই পাহারার ব্যবস্থা। কিন্তু আমি জানি এর আসল কারণ কি।

মাফকা কোথায়। আমি তাকে দেখতে চাই।

তুমি তাকে আগেই দেখেছ। তোমাকে বন্দী করে তারই কাছে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি শুনেছিলাম মাফকার সঙ্গে কেউ দেখা করতে পায় না। সে কাউকে দেখা দেয় না।

একথা তোমাকে উড বলেছিল। মাফকা কিছুদিন অসুস্থ ছিল বলে সে দেখা দিত না, দরবার ঘরে বসত না তখন। কিন্তু তুমি একজন বিদেশী হয়ে

তাকে না জানিয়ে তার নগর সীমানার মধ্যে প্রবেশ করেছ শুনে তোমাকে দেখতে চায় সে। কিন্তু তুমি আসলে কে? কেন এদেশে এসেছ? আমার ঘরেই বা কেন এসেছ? মাফকার মত তোমারও কি কোন অলৌকিক শক্তি আছে?

টারজন নিচু গলায় বলল, হয়ত আছে। কিন্তু তুমি স্ট্যানলি উডকে মুক্ত করতে চাও এবং তার সঙ্গে তুমি যেতে চাও। তবে তুমি কেন আমাকে সাহায্য করছ না?

কিন্তু কিকরে তোমায় সাহায্য করতে পারি আমি?

তুমি শুধু আমাকে বলে দাও মাফকাকে একা কোথায় পেতে পারি আমি।

সহসা গলনালার মুখের ভাবটা বদলে গেল একেবারে। এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতার ছাপ ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। তার গোটা দেহটা শক্ত হয়ে উঠল। উডের কথাটা মনে পড়ে গেল টারজনের। মাঝে মাঝে এমনি করে আশ্চর্যভাবে বদলে যায় গলনালা। রহস্যময় এক ভাবান্তর দেখা দেয় তার মধ্যে।

কোন কথা না বলে 'রক্ষী' 'রক্ষী' বলে চীৎকার করে উঠল গলনালা। সে তার কোমরের খাপ থেকে ছুরিটা বার করে টারজনকে মারতে গেল লাফ দিয়ে। টারজন তার হাতের কব্জিটা ধরে ফেলে কেড়ে নিল ছুরিটা। তারপর বলল, বল, কিছু হয়নি। ওদের যেতে বল।

রক্ষীরা গলনালার চীৎকার শুনে রুদ্ধ দরজায় করাঘাত করছিল। গলনালা আরো জোরে চীৎকার করতে লাগল সাহায্যের জন্য।

টারজন তখন তাকে ধরে ঘরের অন্য দিকের একটি দরজা খুলে ভিতর দিকের একটি ঘরে তাকে ভরে দরজাটায় শিকল তুলে দিল। তারপর যে গোপন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে এসেছিল সেই পথে এক মুহূর্তে তার উপরতলার ঘরে চলে গেল।

রক্ষীরা সেই ঘর খুলে গলনালাকে মুক্ত করলে গলনালা বলল, লোকটা কোথায়? তাকে ধরেছ?

রক্ষীবাহিনীর একজন বলল, এ ঘরে ত কেউ নেই।

যে লোকটাকে আজ বন্দী করে আনা হয় সেই লোকটা নেই?

এখানে ত কেউ ছিল না।

মাফকার কাছে গিয়ে এখনি জানাও তাকে বন্দীটা পালিয়েছে। তোমাদের মধ্যে কয়েকজন বন্দীর ঘরে এখনি গিয়ে দেখ সে সেখানে আছে কি না। আমি বলছি লোকটা আমার ঘরে একটু আগে এসেছিল। আমার ছুরিটা সে কেড়ে নিয়ে ঐ ঘরে আমাকে ভরে রাখে। তোমরা কয়েকজন এ ঘরে

থাক। সে আবার আসতে পারে।

রক্ষীরা টারজনের ঘরে গিয়ে যখন দেখল সে বসে আছে সেই ঘরে তখন তারা আশ্চর্য হয়ে গেল সকলে।

একজন রক্ষী জিজ্ঞাসা করল তাকে, কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?

কোথায় আর যাব ?

তুমি রাণী গলনালার ঘরে গিয়েছিলে।

কিন্তু কিকরে সে ঘরে যাব আমি ?

সেটাই ত তোমায় জিজ্ঞাসা করছি।

সেটা আমাকে জিজ্ঞাসা না করে রাণীকে জিজ্ঞাসা করগে। কেউ যদি পাগল হয়, আমি ত আর পাগল নই।

রক্ষীরা তখন ঠিক করল নিজেদের মধ্যে মাফকাকে কথাটা জানাবে। সেই এর সমাধান করবে। লোকটা ত এই ঘরেই রয়েছে।

এই বলে চলে গেল তারা ঘর বন্ধ করে। ঘণ্টাখানেক পর ডজনখানেক মেয়েযোদ্ধা এসে টারজনকে সঙ্গে করে মাফকার কাছে নিয়ে গেল। টারজন দেখল মাফকার শোবার ঘরটা রাণীর ঘরের পাশেই।

একটা টেবিলের ধারে তখন দাঁড়িয়ে ছিল মাফকা। টেবিলের উপর কাপড় জড়ানো কি একটা জিনিস ছিল। তার পাশেই ছিল গলফান নামে সেই হীরকের তাল। মাফকা তার উপর একটা হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল।

নাকে রক্তের গন্ধ পেল টারজন। সে দেখল কাপড় ঢাকা যে বস্তুটা টেবিলের উপর ছিল তার উপর রক্তের দাগ রয়েছে। সে বুঝল বস্তুটা যাই হোক সেটা তাকে দেখাতে চায় মাফকা।

মাফকার সামনে দাঁড়িয়েছিল টারজন। দুজনেই ছিল নীরব নির্বাক, শুধু মনে মনে যুদ্ধ চলছিল। দুজনে দুজনের মনটাকে বোঝার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎ মাফকা প্রশ্ন করল টারজনকে, রাণীর ঘরে কিকরে গিয়েছিলে ?

টারজন কড়া গলায় বলল, আমি যদি রাণীর ঘরে গিয়ে থাকি তাহলে মাফকা ছাড়া কে তা জানতে পারবে ? কিন্তু তুমি কেমন করে জেনেছ যে আমি রাণীর ঘরে গিয়েছিলাম ?

গলনালা তোমাকে দেখেছে।

গলনালা আমাকে সশরীরে দেখেছে না এটা তার মনের অসার কল্পনা। তাছাড়া এমনও হতে পারে যাতুকর মাফকাই হয়ত তার মনে এই চিন্তাটা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

মাফকা গর্জন করে উঠল, না, আমি তা করিনি।

টারজন এবার বুঝল উপরতলার কারাকক্ষ থেকে নিচের তলায় গলনালার ঘরে যাবার যে একটা গোপন সুড়ঙ্গপথ আছে মাফকা তা জানে না।

টারজন আরও লক্ষ্য করল যে ঘরে দাঁড়িয়ে আছে মাফকা সে ঘরের পিছনে আর একটি আলোকিত ঘর রয়েছে। সেইটিই তার শোবার ঘর ও গবেষণাগার। ঠিক উরার যেমন ছিল।

এবার এক নতুন প্রশ্ন করল মাফকা, কেন তুমি আমাকে না জানিয়ে জুলিদের দেশে গিয়েছিল?

টারজন বলল, একথা কে বলেছে আমি ওখানে গিয়েছিলাম?

তুমিই আমার ভাই উরাকে মেরেছ। তুমিই তার পান্নার তালটা চুরি করেছিলে। তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য এদেশে এসেছ। তুমি জানতে চাইছিলে কে বলেছে আমাকে এ সব কথা। বলেছে এই লোকটি।

এই কথা বলেই সেই রক্তমাখা কাপড়টা টেনে সরিয়ে দিল মাফকা। সঙ্গে সঙ্গে লর্ডের কাটা মুণ্ডটা আর তার পাশে পান্নার সবুজ ধাতব তালটা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল সে।

মাফকা টারজনের মুখের উপর এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য তাকাল তার দিকে। কিন্তু টারজনের মুখের ভাবের মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা গেল না। সে মোটেই বিচলিত হলো না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মাফকা বলল, মাফকার শত্রুদের এই অবস্থাই হয়। তোমাকেও এইভাবে মরতে হবে। যারা আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে, আমার লোকদের উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলছে তাদেরকেও মরতে হবে এমনি শোচনীয়ভাবে।

এরপর সে তার রক্ষীদের ডেকে বলল, যাও লোকটাকে সেই ঘরে বন্দী করে রাখগে। অন্য সব ষড়যন্ত্রকারীদেরও ওর সঙ্গে একই ঘরে রাখবে। একই সঙ্গে মারা হবে ওদের।

আগে যে ঘরে টারজন ছিল উপরতলার সেই ঘরে রক্ষীরা নিয়ে গেল তাকে। আর কোন্ কোন্ বন্দীকে তার ঘরে আনা হবে তা বুঝতে পারল না টারজন। সে জানালা দিয়ে নগরটার দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে তা দেখার চেষ্টা করছিল আর ভাবছিল উডের সঙ্গে কিভাবে দেখা হতে পারে তার।

টারজন একটা পরিকল্পনা খাড়া করল বটে, কিন্তু সেটা নির্ভর করছে উডের উপর। প্রথমে উডের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার দরকার। তারপর দেখতে হবে, উড মাফকা বা কাজীদের সম্বন্ধে কতখানি কি জানে।

টারজন যখন আপন মনে এই সব কথা ভাবছিল হঠাৎ তখন ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে খোলা হলো। চারজন বন্দী ঘরে ঢুকল। দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল। মুখ ঘুরিয়ে টারজন দেখল চারজন বন্দীর মধ্যে উড একজন।

টারজনকে দেখেই চীৎকার করে উঠল উড, ক্লেটন না? আরে তুমি

কিকরে এখানে এলে ? এখানে কি করছ তুমি ?

তোমাদের মতই মৃত্যুর জন্য প্রহর গণনা করছি।

তুমি কিকরে ধরা পড়লে ? আমি ভেবেছিলাম তোমাকে ওরা কিছুতেই ধরতে পারবে না।

টারজন তখন তাকে বুঝিয়ে বলল, কিভাবে সে এদিকে আসতে আসতে চিতাবাঘ ধরার ফাঁদে পড়ে যায় এবং কিভাবে তারা ধরে তাকে।

উড তখন তার সঙ্গী তিনজনের সঙ্গে টারজনের পরিচয় করিয়ে দিল। তার সঙ্গে ভন আইক, স্ট্রোন আর স্পাইক। স্ট্রোনের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল টারজনের। এই তিনজন সঙ্গী তাদের সফরীতে ছিল।

স্ট্রোন টারজনকে বলল, উড কখন আবার এখানে আসে তা আমি দেখিনি। আমি জানি ওরা আমাদের নিয়ে কি করবে।

টারজন বলল, আমি জানি ওরা তোমাদের নিয়ে কি করবে। মাফকা আমাকে একটু আগে বলেছে। আমাদের সবাইকে মারবে ওরা। মাফকা বলেছে তোমরা গোলমাল বাধাও।

ভন আইক বলল, কোন গোলমাল বাধাবার আগেই ও সব জানতে পারে। তুমি কিছু ভাববার আগেই ও তা জানতে পারে।

স্পাইক বলল, উড নিগ্রো মেয়েটা অর্থাৎ গলনালার সঙ্গে ভালবাসাবাসির খেলা না খেললে ও বিপদে আমাদের পড়তে হত না।

উড স্পাইককে বলল, তুমি এ সম্বন্ধে আর কোন কথা বলবে না। বললে পর আমি তোমাকে কিকরে চুপ করিয়ে দিতে হয় তা জানি।

এই বলে সে স্পাইককে মারতে গেলে ভন আইক দুজনের মাঝখানে দাঁড়াল। সে বলল, নিজেদের মধ্যে মারামারি না করে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে।

স্ট্রোন বলল, এবার কেউ মারামারি করতে গেলে তার মাথাটা আমরা ভেঙ্গে দেব।

উড বলল, স্পাইককে আগে ক্ষমা চাইতে হবে। তা না হলে আমি সুযোগ পেলেই ওকে খুন করব।

ভন আইক স্পাইককে উডের কাছে ক্ষমা চাইতে বলল।

সে স্পাইকের কানে কানে চুপি চুপি কি বলতে স্পাইক উডকে বলল, ঠিক আছে, আমি আমার কথা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। আমি একথা বলতে চাইনি।

উড বলল, ঠিক আছে। তোমার ক্ষমা প্রার্থনা আমি মেনে নিলাম।

এই বলে সে আবার টারজনের সঙ্গে কথা বলার জন্য তার কাছে চলে গেল। টারজন তখন জানালার ধারে দাঁড়িয়ে নীরবে দর্শক হিসাবে সব কিছু

দেখে ও শুনে যাচ্ছিল।

টারজন বলল, স্পাইক ঠিকই বলেছে, ওর মধ্যে নিগ্রো রক্ত আছে। আমি কিছুক্ষণ আগে ওকে দেখেছি।

উড আশ্চর্য হয়ে বলল, কি বলছ তুমি? তুমি তাকে দেখেছ? সে কেমন আছে? আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা ঘটেছে।

টারজন বলল, মাফকা তাকে সন্দেহ করছে সে তোমাকে পালাতে সাহায্য করেছে। সে তাই তাকে একটা ঘরে কড়া পাহারার মধ্যে আটক করে রেখেছে।

তুমি আমার সম্বন্ধে কিছু বলেছ তাকে?

হঁ্যা বলেছি। সে তোমাকে সাহায্য করতে চায়।

প্রথমে সে এব্যাপারে উৎসাহী ছিল এবং আমাদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। কিন্তু পরে হঠাৎ সে বদলে যায় এবং চীৎকার করে আমাকে ধরাবার জন্য প্রহরীদের ডাকতে থাকে অকারণে।

উড বলল, এক একসময় সে বেশ থাকে, কিন্তু আবার এক একসময় হঠাৎ শয়তানের মত হয়ে ওঠে। তার এই ভাবান্তরের কোন কারণ খুঁজে পাই না। তার মনটা মোটের উপর ঠিক আছে ত? তার মানে সে প্রকৃতিস্থ আছে ত?

টারজন বলল, আমার মনে হয় ও প্রকৃতিস্থ নেই। যাই হোক তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। এখন আমাদের একমাত্র ভাববার বিষয় হলো কিভাবে আমরা মুক্তি পেতে পারি। মাফকা কখন এবং কিভাবে আমাদের মারতে চায় তা জানি না। তবে আমাদের যা কিছু তাড়াতাড়ি করতে হবে। হঠাৎ ওকে ধরতে হবে।

উড বলল, কিন্তু কড়া পাহারার মধ্যে রুদ্ধদ্বার ঘরে বন্দী থাকাকালে কিভাবে ওকে হঠাৎ ধরব?

টারজন বলল, আচ্ছা আমাদের এই পাঁচজনের বাইরে আর কারো কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না? অন্য বন্দীদের খবর কি? তারা কি আমাদের দলে যোগদান করবে?

পারলে ওরা সকলেই যোগদান করত আমাদের দলে। কিন্তু দলে আমাদের যেই থাকুক না কেন, মাফকার কে কি করবে? আমরা কিছু করতে যাবার আগেই আমাদের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। একবার যদি হীরের তালটা হস্তগত করতে পারতাম! ঐ ধাতুটাই ওর সমস্ত শক্তির উৎস।

টারজন বলল. ওটা আমরা হাত করতে পারি।

উড বলল, অসম্ভব।

এই বলে সে ভন আইককে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি মনে করো ভন?

ভন আইক বলল, কোন সম্ভাবনা নেই। রাত্রিবেলায় মাফকা হীরের তালটা তার ঘরে রাখে। হীরেটা সব সময় তার কাছে কাছে থাকে। রাত্রিবেলায় তার ঘরটা তালা দেওয়া থাকে। তার চারদিকে থাকে কড়া পাহারা। কোন উপায় নেই।

টারজন উডকে বলল, তুমি আমায় বলেছিলে, মাফকা হীরেটার প্রতি খুব একটা যত্নবান নয়। যে কেউ তাতে হাত দিতে বা সেটাকে দেখতে পারে। তুমি নাকি সেটা একবার নেড়ে চেড়ে দেখেছ।

উড বলল, মাফকা তার ওষধিবিদ্যা আর যাদু জানে। তার সাহায্যে ও একটা নকল হীরকখণ্ড তৈরী করেছে। সেটা যখন তখন দেখায়। আসল হীরেটা লুকিয়ে রাখে। রাত্রিবেলায় নকল হীরেটা সামনে রেখে আসলটা তার কাছেই কোন ভাবে লুকিয়ে রাখে। রাত্রিবেলায় কেউ হীরে চুরির জন্য তার ঘরে ঢুকলে নকল হীরেটাই দেখতে পাবে সামনে। অবশ্য আসল হীরেটাও কাছেই রাখে।

ভন আইক বলল, হীরেটা নিতে হলে রাত্রিবেলায় ওর নির্জন ঘরে ঢুকতে হবে। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়।

টারজন বলল, মাফকার ঘরটা কি গলনালা বা রাণীর ঘরের পাশেই ?

হ্যাঁ পাশেই, কিন্তু মাফকা দুটো ঘরের মাঝখানের দরজাটা তালাবন্ধ করে রাখে রাত্রিতে।

টারজন বলল, আমার মনে হচ্ছে মাফকার ঘরে আমি যেতে পারব। আমি যাচ্ছি।

কেমন করে যাবে শুনি।

আমার সঙ্গে কেউ আসবে না। আমি এখনি ফিরে আসব।

এরপর সে সেই চুল্লীর ভিতর দিয়ে সুড়ঙ্গপথে চলে গেল।

ভন আইক উডকে জিজ্ঞাসা করল, লোকটা কে ?

ক্লেটন নামে এক ইংরেজ। আমি অন্ততঃ তাই জানি। ও নিজে আমাকে বলেছে।

আমার মনে হয় টারজন নামে যদি কোন লোক থাকে ত ও হচ্ছে সেই।

উড বলল, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। ও গাছের উপর দিয়ে বাঁদরের মর যাওয়া আসা করে। তীর ধনুক দিয়ে জীবজন্তু মেরে কাঁচা মাংস খায়।

যে সুড়ঙ্গপথ দিয়ে গলনালার ঘরে গিয়ে পড়েছিল টারজন সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে সে গলনালার ঘরটা পাশে ফেলে রেখে মাফকার বড় ঘরটায় গিয়ে পৌঁছল। দেখল মাফকা তখন ঘরের দরজা বন্ধ করে নাক ডাকিয়ে গভীর-

ভাবে ঘুমোচ্ছে। তার খাটের পাশে টেবিলে হীরে ও পান্নার দুটো তালই রয়েছে। টেবিলের উপর একটা ধারাল দা আর একটা বড় ছোরা রয়েছে। গলনালার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া ছুরিটা টারজনের হাতে ছিল।

টারজন নিঃশব্দে মাফকার খাটের কাছে গিয়ে টেবিল থেকে অস্ত্রগুলো সরিয়ে রাখল। তারপর মাফকার ঘাড় ধরে তাকে কিছুটা নাড়াল। মাফকা জেগে উঠতেই টারজন বলল, চুপ করে থাক। তাহলে তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না।

মাফকা তার ঘরের চারদিকে তাকাল। দেখল সাহায্যের কোন আশা নেই।

সে কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, বল কি চাও। তুমি আমাকে মেরো না। যা চাও তাই দেব।

টারজন এবার মাফকাকে উপুড় করে শুইয়ে তার হাতদুটো পিছন থেকে বেঁধে ফেলল। তারপর তার মুখটা আর চোখদুটোও বেঁধে দিল। তারপর মাফকাকে তার খাটের উপর সেইভাবে ফেলে রেখে গলনালার ঘরে চলে গেল। গিয়ে দেখল গলনালা তার ঘরের মাঝখানে বিছানার উপর বসে আছে।

টারজনকে দেখে গলনালা আর চেঁচামিচি করল না। সে শুধু বলল, ভাল সময়েই এসেছ আবার।

টারজন বলল, মাফকা ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু কেন তুমি আবার এসেছ আমার কাছে ?

উড আর তিনজন সঙ্গী বন্দী হয়ে আছে একটা ঘরে। তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

আমি জানি। আমিই তাদের সে দণ্ড দান করেছি।

নিজের উপর চরম বিতৃষ্ণাবোধ করছিল গলনালা। সে বিতৃষ্ণা চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল তার।

টারজন বলল, তুমি তাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করতে পার। সাহায্য করবে কি ?

কোন লাভ হবে না। মাফকার শক্তি আবার তাদের টেনে আনবে এখানে। তখন তাদের আরো এমন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে যে তারা তা ভাবতেই পারবে না।

মাফকা যদি কোনরকম হস্তক্ষেপ না করে তাহলে মেয়েযোদ্ধারা তোমার কথা শুনবে ত ?

হ্যাঁ।

কোথায় যাবে তুমি ?

ইংলণ্ডে।

ইংলণ্ডে কেন যাবে ?

কারণ আমাকে স্নেহ ও অনুগ্রহ করতেন এমন একজন আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন মুক্তি পেলে আমি যেন ইংলণ্ডে চলে যাই।

ঠিক আছে, তোমার চিঠি সঙ্গে নিয়ে প্রস্তুত হও। তুমি মুক্তি পাবে আজই। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি উড আর তার তিনজন সঙ্গী তোমার কাছে আসব। তুমি তৈরী হয়ে থাকবে। তবে তোমার মেয়েযোদ্ধারা যাতে আমাদের যেতে বাধা না দেয় তার জন্য তাদের হুকুম দেবে তুমি।

তাতে কোন ফল হবে না। মাফকা আবার আমাদের সকলকে ধরবে।

সেকথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমাকে যা বলছি তা করবে কিনা বল।

আমি কথা দিচ্ছি তা করব। তবে তাতে আমাকে ও তোমাদের সবাইকেই মরতে হবে।

তাহলে প্রস্তুত হয়ে নাও। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা আসছি।

সেখান থেকে বেরিয়ে টারজন সোজা সেই ঘরটায় চলে গেল উড আর তার সঙ্গীরা যেখানে ছিল। টারজন তাদের চুপি চুপি কি বলতে টারজনের পিছু পিছু তারাও বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

টারজন তাদের সোজা মাফকার ঘরে নিয়ে গেল। হীরে আর পান্না দুটোর ধাতুর তাল থেকে আলোর ছটা বেরিয়ে আসছিল ঘর থেকে। স্পাইক আর স্ট্রোন দুজনে ধাতু দুটোর সামনে দাঁড়িয়ে এক মুগ্ধ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারা বুঝল পান্নার তালটা জুলিদের দেশ থেকে আনা হয়েছে।

স্ট্রোন হাত দিয়ে ধাতুদুটোকে স্পর্শ করতে গিয়ে ভয়ে স্পর্শ করতে পারল না। এই দুটো ধাতুর শক্তির কথা সে জানত।

উড আর তার সঙ্গীরা মাফকাকে বিছানায় চোখ মুখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে দারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল।

উড টারজনকে বলল, কিকরে তুমি একাজ করলে ?

টারজন বলল, আমি প্রথমে ধাতুদুটোকে সরিয়ে নিয়েছিলাম ওর কাছ থেকে। আসলে ঐ দুটো ধাতু থেকেই ও সব শক্তি পেত। এবার এখান থেকে চলে যাব আমরা।

ভন আইক বলল, ঠিক বলেছ তুমি। কিন্তু এই বুড়ো শয়তানটাকে নিয়ে এখন কি করব ?

স্ট্রোন টেবিল থেকে দাটা তুলে নিয়ে মাফকার গলা কাটতে যাচ্ছিল।

টারজন তার হাতটা ধরে ফেলে বলল, ওকে নিয়ে কি করব একটু পরেই তা দেখতে পাবে।

তুমি আমাকে হুকুম করছ?

টারজন তার মুখের উপর একটা চড় বসিয়ে দিতে সে ঘুরে পড়ে গেল।

স্ট্রোন উঠে বলল, এই অপমানের শোধ আমি নেব।

টারজন এবার প্রভুত্বসূচক কণ্ঠে বলল, চুপ করো। তোমাকে যা বলছি তাই করো।

এরপর উডের দিকে মুখ ঘুরিয়ে টারজন বলল, তুমি আর ভন আইক ধাতু দুটোকে নাও। স্ট্রোন আর স্পাইক মাফকাকে বয়ে নিয়ে যাবে।

ভন আইক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাব আমরা?

সে জানত মাফকার ঘরের বাইরে বারান্দায় মেয়েযোদ্ধারা পাহারা দিচ্ছে।

টারজন বলল, আমরা প্রথমে যাব গলনালার ঘরে।

স্পাইক বলল, সে চীৎকার করে উঠলেই মেয়েযোদ্ধারা ছুটে এসে সব বানচাল করে দেবে।

গলনালার কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমাকে যা বলছি তাই করো। তবে সঙ্গে এই সব অস্ত্রগুলোও নিতে পার। বলা যায় না, দরকার হতে পারে।

উড আর ভন আইক ধাতুদুটো তুলে নিল। স্ট্রোন আর স্পাইক ভয়ে ভয়ে মাফকাকে তুলে নিল।

তারপর তারা চলে গেল গলনালার ঘরে।

ওরা গিয়ে দেখল গলনালা যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘরের মাঝখানে। মাফকার অবস্থা দেখে ভয়ে চুপসে গেল। তারপর উডকে দেখে ছুটে গেল তার কাছে।

উড একটা হাত দিয়ে গলনালাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ভয় করো না গলনালা। আমরা তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

হ্যাঁ, তুমি যেখানে যাবে তোমার সঙ্গে যাব। কিন্তু মাফকাকে নিয়ে এখন কি করবে? সে আমাদের সবাইকে আবার এখানে ফিরিয়ে এনে খুন করবে।

স্পাইক বলল, ওকে এখন আমাদের খুন করা উচিত।

ভন আইক টারজনের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি স্পাইকের সঙ্গে একমত। ওকে না মারলে যখন আমাদের মরতে হবে তখন আমরা ওকে খুন করব না কেন?

টারজন বলল, এখন মাফকাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। কারণ কাজী মেয়েদের মনোভাব আমরা জানি না। ওকে তারা দেবতার মত মানে। মাফেকাকে মেরে ফেললে ওরা ক্ষেপে যেতে পারে।

উড বলল, ক্লেটন ঠিক বলেছে।

গলনালার ঘরের বাইরে দারুণ গোলমাল ও চেঁচামিচির শব্দ শোনা গেল। অনেকে মাফকার ঘরের দরজায় ঘা দিয়ে মাফকার নাম ধরে ডাকছে।

টারজন তখন গলনালাকে বলল, তুমি মেয়েযোদ্ধাদের মধ্যে প্রধানা একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করো ওরা কি চায়। আমরা পাশের ঘরে যাচ্ছি।

এই বলে অন্যদের ডেকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল টারজন।

গলনালা দরজার কাছে যে নাকাড়া ছিল তাতে তিনবার ঘা দিয়ে দরজা খুলে দিল। একজন মেয়েযোদ্ধা ঘরে প্রবেশ করে নতজানু হলো।

গলনালা বলল, বারান্দায় এত গোলমাল কিসের ? এই সকালে মাফকাকে ডাকছ কেন ?

মেয়েযোদ্ধাটি বলল, জুলিরা আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসছে। তারা একজন দূত পাঠিয়ে তাদের পান্নার তালটাকে ফেরৎ চাইছে। তারা সংখ্যায় অনেক। আমরা তাই মাফকার শক্তির শরণাপন্ন হয়েছি। আমরা চাইছি মাফকার শক্তি দিয়ে তাদের দুর্বল করে দিতে। তখন আমরা তাদের যুদ্ধে পরাজিত করে সহজেই তাড়িয়ে দিতে পারব।

গলনালা বলল, তাদের এখন কোন শক্তি নেই, কারণ উনি এখন মৃত। আমাদের যোদ্ধাদের বল, আমি রাণী গলনালা তাদের হুকুম দিচ্ছি তারা যেন জুলিদের মেরে তাড়িয়ে দেয় আমাদের নগর থেকে।

জুলিরা আমাদের নগরদ্বারে ঢুকে পড়েছে। আমাদের যোদ্ধারা ভয় পেয়ে গেছে। মাফকার শক্তি ছাড়া তারা দুর্বল বোধ করছে। কিন্তু মাফকা কোথায় ? আমাদের ডাকে সে সাড়া দিচ্ছে না কেন ?

গলনালা মেঝের উপর পা ঠুঁকে বলল, আমি যা বলছি তাই করো। আমার সামনে প্রশ্ন করার কোন অধিকার নেই তোমার। যাও, নগর রক্ষা করো। আমি রাণী হিসাবে তোমাদের শক্তি যোগাব। তোমরা জুলিদের পরাজিত করবে।

মেয়েযোদ্ধাটি তখন ক্রুদ্ধভাবে বলল, মাফকাকে একবার দেখতে দাও আমাদের।

গলনালা তখন বুদ্ধি খাটিয়ে একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করল। বলল, ঠিক আছে। আগে আমার হুকুম তামিল করো। তারপর জুলিদের বন্দী করে নিয়ে দরবার ঘরে এস। তখন মাফকাকে দেখতে পাবে।

মেয়েযোদ্ধাটি চলে গেলে যে ঘরে টারজনরা অপেক্ষা করছিল গলনালা সে ঘরের দরজা খুলে দিল। টারজন বেরিয়ে এসে বলল, আমি সব শুনেছি। তোমার এখন পরিকল্পনা কি ?

আমি কিছু সময় চাই।

এরপর তাহলে মাফকাকে দরবার ঘরে হাজির করাতে চাও ?

না, কারণ মাফকাকে বাঁধা অবস্থায় দেখলে ওরা আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। আবার মাফকাকে ছেড়ে দিলেও সে আমাদের হত্যা করবে।

তাহলেও এটা একটা ভাল মতলব। আমরা এটাই করব।

টারজনের মুখে হাসি ফুটে উঠল।

গলনালা বলল, তুমি কি পাগল হয়েছ ?

হয়ত তাই। আমরা যদি এখন এখান থেকে চলে যাই তাহলে আমরা কাজীদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে যেতে পারব না। মেয়েদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই না আমি। আমার মনে হয় উপায় একটা আছে। আচ্ছা তুমি জান আসল গলফানটা কোথায় আছে ?

হ্যাঁ জানি।

তাহলে সেটা এখনি নিয়ে এস এখানে। তার উপর একটা কাপড় জড়িয়ে রাখ যাতে কেউ সেটা দেখতে না পায়। কাউকে বলবে না। শুধু তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানবে না।

কি করতে চাও তুমি ?

অপেক্ষা করো দেখতে পাবে। এখন যা বলছি তাই করো।

গলনালা উদ্ধতভাবে বলল, ভুলে যেও না আমি রাণী।

আমি শুধু জানি তুমি এমনই এক নারী যে তার প্রেমিকের সঙ্গে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে চায়।

গলনালা এবার লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু কোন কথা বলল না। সে মাফকার ঘরে চলে গেল নীরবে।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সে চামড়ায় জড়ানো আসল হীরের তালটা নিয়ে এল।

টারজন সেটা নিয়ে তার দলের লোকদের বলল, এবার আমরা প্রস্তুত।

তারপর গলনালাকে বলল, আচ্ছা, দরবার ঘরে যাবার কি কোন গোপন পথ আছে ?

গলনালা বলল, আছে, আমার সঙ্গে এস।

এই বলে গলনালা মাফকার ঘরে গিয়ে একটি দরজা খুলল। সেই দরজা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আবার একটা ছোট দরজা পেল। সেই দরজা খুলে বেরিয়েই তারা দরবার ঘরে মঞ্চের পিছনে এসে পড়ল।

দরবার ঘর তখন শূন্য। মেয়েযোদ্ধারা তখনো ফিরে আসেনি। টারজনের নির্দেশ অনুসারে উড সিংহাসনের পাশে একটি উঁচু জায়গায় আসল গলফানটা রাখল। স্ট্রোন আর স্পাইক হাতপা ও চোখমুখ বাঁধা অবস্থায় মাফকাকে তার চেয়ারে বসিয়ে দিল। গলনালা পাশের একটি চেয়ারে বসল।

টারজন গলফান বা হীরের তালটায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অন্তরা চেযারের পিছনে দাঁড়িয়ে রইল। ভন আইক পান্নার তালটা চামড়া দিয়ে ঢেকে রাখল।

নীরবে তারা অপেক্ষা করতে লাগল।

একমাত্র টারজন ছাড়া সকলেই ভয় পেয়ে গেল। সকলেই এক স্নায়বিক দৌর্বল্যে পীড়িত হতে লাগল। এমন সময় ঘরের বাইরে বারান্দায় পদশব্দ শোনা গেল। ঘরের দরজা খুলে দেওয়া হলো। কাজী যোদ্ধাদের নেত্রীরা ঘরে ঢুকল। মাফকা আর রাণীর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তারা সবাই মাথা নত করল।

কিন্তু মাফকার অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। একজন ক্রুদ্ধভাবে গলনালাকে প্রশ্ন করল, এসবের অর্থ কি গলনালা!

কয়েকজন অপরিচিত বিদেশীকে মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আরো আশ্চর্য হয়ে গেল তারা।

তাদের প্রশ্নের উত্তর দিল টারজন। বলল, এর অর্থ হচ্ছে এই যে মাফকার আর কোন শক্তি নেই। সে তোমাদের সকলের জীবনকে তার হাতের মুঠোর মধ্যে রেখেছিল। সে তার নিজের স্বার্থের জন্য তোমাদের দিয়ে যুদ্ধ করিযে নিয়ে যুদ্ধের সব ফল সে একা ভোগ করেছে। তোমাদের সে বন্দী করে রেখেছিল। তোমরা তাকে ভয় করতে, ঘৃণা করতে। কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারতে না।

মেয়েযোদ্ধাটি তখন বলল, মাফকা আমাদের শক্তি যোগাত। তার শক্তি চলে গেলে আমরা শক্তিহীন হয়ে পড়ব।

টারজন বলল, সে শক্তি যায়নি। শুধু সে শক্তি এখন মাফকার হাতে নেই।

মেয়েযোদ্ধাদের একজন বলল, ওদের মেরে ফেল। মেরে ফেল।

তখন সবাই এই কথা বলে চীৎকার করতে লাগল। তারা এইভাবে চীৎকার করতে করতে মঞ্চের দিকে এগোতে লাগল।

টারজন তখন গলফানের উপর একটি হাত রেখে বলল, থাম, তোমরা রাণীর সামনে নতজানু হও।

কথাটা শুনতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধারা সবাই নতজানু হলো।

টারজন বলল, এবার উঠে দাঁড়াও। যাও, নগরদ্বারে যাও। বন্দীদের নিয়ে এস। তারা আসবে। যুদ্ধ বন্ধ হবে না।

যোদ্ধারা সকলে দরবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে টারজন তার দলের লোকদের বলল, আমাদের পরিকল্পনা ঠিকমত কাজ করেছে। আমি জানতাম এতে কাজ হবে। মাফকার যা কিছু অলৌকিক শক্তি ছিল তা এই গলফানের

মধ্যেই আছে নিহিত। পান্নার তালটাতেও এই একই শক্তি আছে। তবে বাজে লোকের হাতে পড়লে এর ফল খারাপ হবে। এ শক্তিকে ভাল কাজে নিয়োজিত করতে হবে।

গলনালা সব কিছু মন দিয়ে শুনছিল। এমন সময় বারান্দায় আবার পদশব্দ শোনা গেল। গলনালা বলল, ওরা আসছে।

পঞ্চাশজন মেয়েযোদ্ধা ঘরে ঢুকল। তাদের মধ্যে অর্ধেক ছিল কাজী আর অর্ধেক জুলি। অনেকের গা থেকে তখন রক্ত ঝরছিল। তাদের দেহে অনেক ক্ষত ছিল।

টারজন তাদের বলল, এখন তোমরা মুক্ত। উরা আর মাফকা দুজনেরই শাসন থেকে মুক্ত তোমরা। উরা মৃত। আর মাফকাকে আমি তোমাদের হাতে তুলে দেব। তোমরা যা খুশি করবে। গলফানটা সরিয়ে নেবার সঙ্গে সঙ্গে তার সব শক্তি চলে গেছে। আমরা এদেশ থেকে চলে যাচ্ছি। রাণী গলনালাও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। যে সব বন্দী ও ক্রীতদাসরা আমাদের সঙ্গে যেতে চায় তারা যেতে পারে। আমরা নিরাপদে এ দেশের সীমানা ছেড়ে চলে গেলে গলফানটা আমি তোমাদের হাতে দিয়ে দেব। এখন সকাল হয়ে গেছে। আমরা যাচ্ছি। এই নাও মাফকাকে।

এই বলে টারজন মাফকাকে দুহাত দিয়ে তুলে মেয়েযোদ্ধাদের হাতে তুলে দিল।

মেয়েযোদ্ধারা সব স্তব্ধ হয়ে রইল। টারজন তার দলের লোকদের নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার হাতে ছিল চামড়া ঢাকা গলফান। ভন আইকের হাতে ছিল জুলিদের পান্নার তালটা।

নগরের রাজপথে এসে তারা দেখল একদল নিগ্রো ক্রীতদাস ও শ্বেতাঙ্গ বন্দী দাঁড়িয়ে ছিল পথের ধারে।

টারজন তাদের বলল, আমরা এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তোমরা ইচ্ছা করলে আমাদের সঙ্গে যেতে পার।

বন্দীরা ভয়ে ভয়ে বলল, মাফকা আমাদের খুন করবে।

টারজন বলল, মাফকা আর কাউকে খুন করতে পারবে না।

৮

নিরাপদে তারা কাজীদের দেশের সীমানাটা পার হয়ে গেল। গলফান হাতে টারজন তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। বন্দী ও ক্রীতদাসদের মন থেকে ভয় কাটেনি তখনো। যে মাফকা এতকাল ধরে প্রভুত্ব করে এসেছে

তাদের উপর সেই মাফকার কাছ থেকে তারা তাদের মুক্তিকে ঐন্দ্রজালিকভাবে ছিনিয়ে নিয়েছে এটা বিশ্বাস করতে পারছিল না তারা। তারা ভেবেছিল মাফকার শক্তি আবার তাদের টেনে নিয়ে যাবে মৃত্যু আর পীড়নের অন্তহীন নরকে।

কিন্তু যখন এ ধরনের কিছুই ঘটল না তখন নিশ্চিন্ত হলো তারা।

অবশেষে এসে নিউবারি নদীর উপত্যকায় এসে পড়ল।

টারজন তখন সবাইকে বলল, আমি এবার চলে যাব। তোমরা যাবে দক্ষিণে আর আমি যাব উত্তরে।

এই বলে সে তার হাত থেকে হীরের তালটা ভন আইকের হাতে দিয়ে বলল, এটা আজ রাতের মত রেখে দাও। কাল সকালে আমাদের সঙ্গে যে তিনজন কাজীদের মেয়েযোদ্ধা এসেছে তাদের একজনকে এটা দেবে।

এরপর সে মেয়েযোদ্ধাদের বলল, আমি তোমাদের হাতে এটা তুলে দেব বলেছিলাম। এটা তোমরা নেবে। তোমরা এটা ভাল কাজে ব্যবহার করবে। কোন অন্যায় করবে না।

এবার উডকে বলল, উড, গলনালার পক্ষ থেকে এই পান্নার তালটা নাও। আশা করি এর দ্বারা সুখী হবে সে।

স্পাইক বলল, তাহলে আমরা কি পাব ?

টারজন বলল, শুধু মুক্তি নিয়ে চলে যাবে তোমরা। দিনকতক আগে এই মুক্তির কথাও ভাবতে পারতে না তোমরা।

স্পাইক বলল, এত বড় হীরের তালটা ঐ সব নিগ্রো মেয়েদের দিয়ে দিলে ? আমরা তার একটা অংশও পাব না। এটা কিন্তু ঠিক নয়। এটা তুমি করতে পার না।

টারজন বলল, আমি তা ইতিমধ্যেই করে ফেলেছি।

স্পাইক তখন তার সঙ্গীদের বলল, এর জন্য তোমরা সবাই রুখে দাঁড়াবে না ? ঐ দুটো ধাতু আমরা লণ্ডনে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে সব টাকা সমানভাবে ভাগ করে নেব।

ভন আইক বলল, আমি আমার জীবন নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছি— এতেই আমি খুশি। গলনালার একটা ধাতুতে অধিকার আছে। অন্য ধাতুটা জুলি আর কাজীরা ভাগ করে নেবে। তাই নিয়ে তারা বাইরের জগতে চলে যাবে। তারপর যা হয় হবে।

স্ট্রোন বলল, আমাদেরও একটা করে ভাগ পাওয়া উচিত।

কয়েকজন বন্দী শ্বেতাঙ্গ সমর্থন করল স্ট্রোনকে। অন্য শ্বেতাঙ্গরা বলল, আমরা মুক্তি পেয়েছি এটাই যথেষ্ট। এই অভিশপ্ত ধাতু যত তাড়াতাড়ি আমাদের চোখের সীমা থেকে চলে যায় ততই ভাল।

আর একজন বলল, ওগুলো সত্যিই অভিশপ্ত। এর থেকে কোন মঙ্গল হবে না আমাদের।

স্পাইক বলল, আমি কিন্তু ছাড়ব না।

টারজান তাকে বলল, তুমি পাবে না। আমি যা বলার সব বলে দিয়েছি। আমি এখন উত্তর দিকে যাচ্ছি। কিন্তু তোমরা এ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যাবার আগেই আবার আমি ফিরে আসব দক্ষিণ দিকে। আমি এসে দেখব তোমরা কেউ কোন অন্যায় কাজ করেছ কিনা।

এই বলে চলে গেল টারজান। রাত্রির অন্ধকার তখন ঘন হয়ে উঠেছে। একশোজন পলাতকের সেই দলটি তখন শিবির স্থাপন করে রান্না খাওয়ায় মন দিল। যে সব নিগ্রো ক্রীতদাস হয়ে ছিল কাজীদের দেশে তারা এখন কুলির কাজ করতে লাগল আর শ্বেতাঙ্গদের ভৃত্য হিসাবে ফাই ফরমাশ খাটতে লাগল।

উড আর ভন আইক টারজনের সহকারী ছিল। টারজনের অনুপস্থিতিতে তারা এখন দলের নেতৃত্ব করতে লাগল। টারজন তাদের বলে গেছে দক্ষিণ দিকে মাইল তিনেক গেলেই আদিবাসীদের একটা গাঁ পাবে। তারপর এ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যাওয়া সহজ হবে তাদের পক্ষে।

গলনালা উডকে বলল, তুমি কি মনে করো ও আবার ফিরে আসবে?

উড বলল, ও কাজ সেরে ফিরে আসতে আসতে আমরা হয়ত এ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যাব।

গলনালা বলল, সে যতক্ষণ আমাদের মাঝে ছিল বড় নিরাপদ বোধ করতাম। ও যে আফ্রিকার একটা অংশ। এখানকার সব কিছুই ওর জানা।

উড বলল, ও থাকাকালে কোন দায়িত্ববোধই ছিল না আমার। কারণ আমি জানতাম ও সব কিছুর ব্যবস্থা করবে।

ভন আইক বলল, আমি ভেবে পাই না ও কে, আফ্রিকাতে ও কি করছে। ও আবার টারজন নয় ত?

উড হেসে বলল, আমারও তাই মনে হত।

একজন নিগ্রো ওদের জন্য রান্না করে ওদের খাবার দিল। তাতে মাংস ছিল না। ওরা তাই খাবার সময় ঠিক করল পরদিন স্পাইক আর স্ট্রোন শিকার করতে যাবে।

উড হেসে বলল, কিন্তু কি নিয়ে শিকার করবে? আমাদের সঙ্গে বর্শা বা ছুরি কিছুই নেই।

ভন আইক বলল, কিন্তু আমাদের মাংস পেতে হবে ত? আমাদের সঙ্গে তীর ধনুক আছে।

এরপর সে কামুদি নামে একজন নিগ্রোকে ডেকে বলল, তীর ধনুক নিয়ে

তোমরা পশু শিকার করতে পারবে ?

কামুদি বলল, হ্যাঁ পারব বাওয়ানা। নদীর ধারে অনেক শিকার পাওয়া যাবে।

রাত্রিটা ছিল মখমলের মত নরম। চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল শিবিরের উপর। নিগ্রোরা কিছু তীর ধনুক তৈরী করল।

শ্বেতাঙ্গরা এক একটা ছোট দলে বিভক্ত হয়ে গল্প করতে লাগল। উড, গলনালা আর ভন আইক কাজীদের দেশ থেকে আনা একটা চামড়ার উপর শুয়ে ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করতে লাগল। গলনালা যাবে লণ্ডনে। অন্যান্য শ্বেতাঙ্গরা আমেরিকায় তাদের বাড়ির কথা ভাবতে লাগল। তাদের বাড়ির লোকেরা তাদের মৃত ভেবে তাদের আশা ত্যাগ করেছে।

উড গলনালাকে বলল, ঐ পান্নার তালটা থেকে তুমি ধনী হবে। তার থেকে একটা সুন্দর বাড়ি, সুন্দর সুন্দর আসবাবপত্র, কত ভোগের উপকরণ পাবে তুমি। বন্ধু হিসাবে কত লোক জুটবে তোমার চারপাশে।

গলনালা বলল, আমি আর কোন লোক চাই না।

উড বলল, তোমার টাকা থাকলে অনেকেই তোমাকে চাইবে।

ভন আইক বলল, তোমাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। তোমাকে অনেকেই অনেক প্রলোভন দেখাবে।

গলনালা বলল, স্ট্যানলি আমার সব কিছু ব্যবস্থা করবে। সে দেখাশোনা করবে আমার। তাই না স্ট্যানলি ?

স্ট্যানলি উড বলল, কিন্তু তুমি তখন আমার থেকে ভাল লোক পেতে পার। তোমার বয়স কম, তুমি অনভিজ্ঞ। সভ্য জগতের লোকদের সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই।

সভ্য জগতের লোকরা কি মাফকার থেকেও খারাপ ?

একদিক দিয়ে আরো বেশী খারাপ।

ভন আইক উঠে শুতে চলে গেল। বলল, ঘুমিয়ে পড়।

গলনালা বলল, আমি মোটেই ভয় করি না। তুমি আমার পাশে থাকবে সব সময়। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

গলনালার একটা হাত টেনে নিয়ে উড বলল, এটাই যেন সব সময় তোমার মনে থাকে।

আমাদের মধ্যে কখনো কোন ভুল বোঝাবুঝি হবে না।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর গলনালা তার ছোট আস্তানাটায় শুতে চলে গেল। উডও শুয়ে পড়ল। গলনালার কিন্তু ঘুম এল না চোখে। আনন্দের আবেগে আর উত্তেজনায় ঘুম আসছিল না তার। আনন্দের এই মুহূর্তগুলিকে ঘুমিয়ে নষ্ট করতে চাইল না সে।

কিছুক্ষণের মধ্যে শিবির থেকে নিঃশব্দে বনচ্ছায়ার মধ্যে বেরিয়ে হাঁটতে লাগল। শিবিরের সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শিবিরটা একেবারে স্তব্ধ। চাঁদ তখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে।

গাছের ছায়ার মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছিল গলনালা ধীর পায়ে। একই সঙ্গে দীর্ঘকাল পর মুক্তি আর তার আকাঙ্খিত প্রেমাস্পদকে লাভ করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল সে। মাফকার কথা মনে করে, অতীত বন্দীজীবনের কথা ভেবে শিউরে উঠছিল মাঝে মাঝে। সে তাই অবাঞ্ছিত অতীতের স্মৃতি হতে মনটাকে তার বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করতে চাইছিল।

সহসা এক জায়গায় কাদের কথাবলার চাপা শব্দ শুনতে পেল।

গলনালা স্পষ্ট শুনতে পেল আড়াল থেকে কে একজন বলছে, হীরে আর পান্না দুটোই হাতছাড়া হয়ে গেল আমাদের। তার দাম কত জান স্ট্রোন। আমরা কিছুই পেলাম না।

স্ট্রোন বলল, পান্নার তালটাকে ও নিগ্রো মেয়েটাকে দিয়ে দিল জোর করে। ওটা কিন্তু দেখো, উড নামে ঐ আমেরিকানটা ভালবাসার নাম করে ভুলিয়ে নেবে ওর কাছ থেকে, ও কখনো নিগ্রো মেয়েটাকে বিয়ে করবে না।

কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আর দাঁড়াল না গলনালা। ছায়া-ঘেরা নৈশ বনপথের মধ্যে ছুটতে লাগল সে। কোথায় যাবে সে তা জানে না। তার স্বপ্নের সৌধটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল অকস্মাৎ। তার সব সুখ বাষ্প হয়ে যেন উবে গেল এক মুহূর্তে।

পরদিন সকালে উড ঘুম থেকে উঠেই কামুদিকে ডাকল। বলল, সবাইকে ডাক। আজ আমরা তাড়াতাড়ি রওনা হব।

এরপর সে ভন আইককে ডেকে বিভিন্ন কাজ সেরে প্রস্তুত হতে লাগল যাত্রার জন্য।

ভন আইক চারদিকে তাকিয়ে কিসের খোঁজ করতে লাগল। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠল।

উড বলল, কি হলো ?

ভন আইক বলল, গলফান নেই। গতরাতেও এইখানে ছিল একটা চামড়ায় মোড়া।

উড তার বিছানাটা ভাল করে খুঁজে দেখল, তারপর হতাশ হয়ে বলল, পান্নার তালটাও নেই। কে এ কাজ করল ?

এরপর তারা দুজনে শিবিরের অন্য জায়গায় গিয়ে মেয়েযোদ্ধারা যেখানে

শুয়ে ছিল সেখানে গিয়ে খোঁজ করল।

একজন মেয়েযোদ্ধা বলল, কি খুঁজছ ?

গলফান।

সেটা তোমাদের কাছেই ছিল।

টারজন সেটা রাত্রির মত ভন আইককে রাখতে দেয়।

এরপর দেখা গেল স্পাইক আর স্ট্রোন শিবিরে নেই।

এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারল ওরা।

উড বলল, এরকম কিছু একটা ঘটবে তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। যখন গলফানটাকে কাজীদের আর পান্নার তালটাকে গলনালাকে দিয়ে দেয় ক্রেটন ওরা দুজনে তখন ক্ষেপে উঠেছিল। ওরাই সেটা নিয়ে পালিয়েছে।

ভন আইক বলল, এখন তাহলে কি করব আমরা ?

উড বলল, ওদের অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু সেটা ত বড় কথা নয়। এখন কথা হচ্ছে আমি কথাটা কিকরে গলনালাকে বলব সেটাই হলো সমস্যা। আমার অবশ্য কিছুরই অভাব নেই। যা আছে তাতে আমাদের ভালভাবেই চলে যাবে। কিন্তু পান্নার তালটা নিয়ে ও অনেক কিছু আশা করেছিল। আর্থিক দিক থেকে ও আমার উপর নির্ভর না করে স্বাধীন হতে চেয়েছিল। অনেক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে চেয়েছিল। কথাটা শুনলে ও ভেঙ্গে পড়বে একেবারে।

যাই হোক কথাটা যখন বলতে হবেই তখন বলে ফেল। তারপর ওদের খোঁজে বার হতে হবে তাড়াতাড়ি।

উড তখন গলনালার তাঁবুতে চলে গেল। গলনালার নাম ধরে অনেক ডাকাডাকি করল। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেল না। তারপর ও নিজে ঢুকল তাঁবুতে। কিন্তু হতাশ হয়ে বেরিয়ে এল পরমুহূর্তে। মুখখানা সাদা হয়ে উঠল ওর। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, ওরা ওকেও নিয়ে পালিয়ে গেছে।

ভন আইক বলল, কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? গলনালা ত তাহলে চীৎকার করত। তাহলে শিবিরের সবাই জেগে উঠত। ওকে ত ওরা জোর করে নিয়ে যেতে পারবে না।

উড বলল, তাহলে কি বলতে চাও গলনালা ওদের সঙ্গে স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছে ?

ভন আইক বলল, আমি এমনি যুক্তির খাতিরে বলছিলাম। আমি ঠিক একথা বলতে চাইনি।

উড বলল, গলনালা আমার কাছ থেকে চলে যেতে পারে না। কাল রাতেই আমরা দুজনে একসঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য কত পরিকল্পনা করছিলাম।

ভন আইক বলল, সে যাই হোক, আমি শুধু ভাবছি তুমি সত্যি সত্যিই বিয়ে করে আমেরিকায় নিয়ে গেলে কি হবে। ওখানকার মানুষেরা কারো মধ্যে নিগ্রো রক্ত থাকলে তাকে কিরকম ঘৃণা করে তা জান তুমি। আমি তোমার ও তার মুখ চেয়েই বলছি কথাটা।

শান্ত কণ্ঠে উড বলল, আমি তা জানি বব। তবু আমি তাকে নিয়ে নরকে গিয়েও নরক যন্ত্রণা সহ্য করতে রাজী আছি। তার প্রতি সেটুকু ভালবাসা আমার আছে।

ভন আইক বলল, ঠিক আছে উড। খুব ভাল কথা। আমার সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব সব সময়েই পাবে তুমি। তুমি বিয়ে করলেও তোমাদের দুজনের প্রতি আমার সম্পর্ক চিরদিনই মধুর থাকবে।

ভন আইক বলল, যাই হোক, এখন এবার ওদের খোঁজে রওনা হয়ে পড়া যাক।

উড বলল, আচ্ছা, তোমার কি মনে হয়? ওরা কি সত্যি সত্যি গলনালাকে ধরে নিয়ে গেছে?

ভন আইক বলল, আসল কথা কি জান, ওরা দেখেছে ক্লেটন গলফান আর পান্নার তালটার সাহায্যে কাজী ও জুলিদের স্বমতে এনে কিভাবে প্রভুত্ব করে তার উপর। তাই আমার মনে হয় ঐ ধাতু দুটোর সাহায্যেই ওরা গলনালাকে বাধ্য করেছে ওদের সঙ্গে যেতে। তাই সে কোন চেঁচামিচি করেনি।

উড বলল, তা অবশ্য হতে পারে। কিন্তু গলনালাকে ওরা কেন সঙ্গে নিল?

ভন আইক বলল, ওরাও রক্তমাংসের মানুষ। কিন্তু খুব উঁচু স্তরের নয়।

উড পাগলের মত বলল, তাকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। তাড়াতাড়ি করতে হবে।

ওরা যে পথে পালিয়ে গেছে নিগ্রোভৃত্যরা সেই পথই ধরল। পথটা চলে গেছে দক্ষিণ দিকেই।

৯

এরপর দুসপ্তা কেটে গেল। টারজন তার কাজ সেরে উত্তর দিক থেকে ফিরতে লাগল। মাঝে মাঝে তার গলনালা, উড আর স্পাইকদের কথা মনে হচ্ছিল। ওরা এখন কি করছে, কোথায় আছে এবং কেমন চালাচ্ছে সে বিষয়ে জানতে ইচ্ছা করছিল ওর। ওরা কোন ভাল আদিবাসীদের গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছলেই খাদ্য ও মালবাহী লোকের অভাব হবে না। তখন সভ্য জগতে গিয়ে পৌঁছনো সহজ হবে ওদের পক্ষে।

সেদিন বিকালের দিকে টারজন বনের মধ্যে শিকারীদের পায়ে চলা একটা পথ পেল। হালকা মৃদুমন্দ বাতাসে তার মাথার কালো লম্বা চুলগুলো দুলছিল। সহসা সামনের দিক থেকে একটা সিংহের গন্ধ এসে লাগল তার নাকে। গন্ধ থেকে টারজন বুঝল সিংহটা বুড়ো।

এর পরেই টারজন আর একটা গন্ধ পেল। সে গন্ধ হলো এক শ্বেতাঙ্গ মহিলার।

গাছের উপর দিয়ে সেই দিকে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখল আলুথালু বেশে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়ে বনপথে কোন রকমে পা টেনে টেনে চলেছে। তার পরনের পোশাক ময়লা এবং ছেঁড়া। ক্রমাগত অনাহার, অনিদ্রা আর পথকষ্টে তার ইন্দ্রিয়চেতনাগুলো ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল। কোন কিছু সে যেন শুনতে পাচ্ছিল না।

সহসা পিছন ফিরে একটা সিংহকে দেখে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। মৃত্যু অবধারিত জেনেও সে আর পালাবার চেষ্টা করল না। সে শুধু এই প্রার্থনাই করতে লাগল যে মৃত্যুটা যেন তার তাড়াতাড়ি হয়।

গলনালা থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে সিংহটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর মাটিতে পেটটা ঠেকিয়ে শুয়ে ঝাঁপ দেবার জন্য গর্জন করে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। এমন সময় গলনালা তার বিস্ফারিত চোখ দিয়ে দেখল একটা গাছের ডাল থেকে একজন নগ্নপ্রায় লোক সিংহটার পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সিংহটার মত এক ভয়ঙ্কর গর্জন করে উঠল। সে দেখল একটা ধারাল চকচকে ছুরি বারবার ওঠানামা করতে লাগল। তারপর শেষবারের মত একবার গর্জন করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সিংহটা।

লোকটি এবার খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়াতে গলনালা চিনতে পারল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। টারজন এবার সিংহের মৃতদেহটার উপর একটা পা তুলে আকাশের দিকে মুখ তুলে বিকটভাবে চীৎকার করে উঠল।

তারপর মুখ নামিয়ে গলনালাকে দেখেই আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, গলনালা তুমি? তুমি এখানে একা কি করছিলে?

গলনালা তখন যা যা হয়েছিল সব বলল। বলল, এই সব শুনে আমি বুঝলাম আমি থাকলে বিপদ নেমে আসবে উডের জীবনে। তাই আমি শিবির ছেড়ে একা পালিয়ে এসেছি। ওরা দক্ষিণ দিকে যাবে বলেই আমি এসেছি উত্তর দিকে।

গলনালা সব শেষে বলল, সে এখন কাজীদের দেশেই ফিরে যেতে চায়। কারণ সে তাদেরই শুধু চেনে।

টারজন বলল, সেখানে যাবে না তুমি। এখন মাফকা নেই। ওরা

তোমাকে মেরে ফেলবে।

আমিও তাই মনে করি. কিন্তু আর কোথায় যাব আমি?

টারজন বলল, এখন তুমি আমার সঙ্গে এস। পরে যা হোক একটা ব্যবস্থা হবে। উডের সঙ্গে অবশ্যই দেখা হবে।

কয়েক সপ্তা ধরে পথ চলার পর টারজন তার আফ্রিকার বাংলোতে তার স্ত্রীর কাছে নিয়ে গেল গলনালাকে। তার স্ত্রী গলনালাকে যথেষ্ট আদর যত্নের সঙ্গে রেখে দিল বাড়িতে।

এদিকে উড ও ভন আইকের অনেক খোঁজ করল। কিন্তু তাদের বা তাদের দলের কোন সন্ধান পেল না। এরই মধ্যে কোথায় কতদূরে গেল তারা তা বুঝতে পারল না টারজন।

দুজন শ্বেতাঙ্গ অন্ধকার বনপথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের কেবলি মনে হচ্ছিল এ পথের যেন শেষ নেই। আসলে তারা পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

উড একবার থেমে মাথার ঘাম মুছল। তারপর ভন আইককে বলল, আমরা যদি পূবদিকে আরও এগিয়ে যাই তাহলে কোন গাঁ পাব। তাহলে আমরা কাউকে পথপ্রদশক হিসাবে নিতে পারব।

ভন আইক বলল, তাই চল।

আধ মাইল যাওয়ার পর ওরা বনের শেষে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর এসে পড়ল।

ভন আইক বলল, যাক, কিছুটা স্বস্তি পাওয়া গেল। বনটা অন্ততঃ শেষ হয়েছে।

সহসা উড তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, ঐ দেখ, মনে হচ্ছে একজন আদিবাসী যোদ্ধা এইদিকেই আসছে। তবে মনে হচ্ছে ওরা ভাল।

দুজনে তখন অপেক্ষা করতে লাগল দাঁড়িয়ে।

নিগ্রো যোদ্ধাদলের একজন নেতা এগিয়ে এসে উডদের ইংরিজি ভাষায় বলল, এখানে তোমরা কি করছ? শিকার করছ কি?

উড বলল, আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমরা গাইড চাই।

নিগ্রোদলের নেতা বলল, আমাদের সঙ্গে এস। আমাদের বড় বাওয়ানার কাছে নিয়ে যাব তোমাদের।

ভন আইক বলল, তোমাদের বড় বাওয়ানার নাম কি? আমরা হয়ত তাকে চিনতে পারি।

টারজন।

উড ও আইক দুজনেই আশ্চর্য হয়ে গেল! উড বলল, টারজন নামে সত্যি সত্যিই কোন লোক আছে? কি বলছ তুমি?

কে বললে নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই দেখতে পাবে তাঁকে।

তোমার নাম কি ?

মুভিরো।

এক ঘণ্টার মধ্যেই তারা একটা বড় বাংলোবাড়ির সামনে গিয়ে পৌছল। ভিতরে মুভিরো খবর পাঠাতেই টারজন বেরিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে।

টারজনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে গেল উড আর আইক। দুজনেই একবাক্যে বলে উঠল, ক্লেটন !

টারজন বলল, তোমাদের অনেক খোঁজ করেও কোন খবর পাইনি। ওখানে কি করছিলে ? যাই হোক, তোমাদের দেখে খুব আনন্দ পেলাম। কোথায় ছিলে এতদিন ?

উড বলল, যে রাতে তুমি চলে আস সেই রাতেই স্পাইক আর স্ট্রোন গলফান আর পান্না দুটো ধাতুই চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যায়। গলনালাকেও ধরে নিয়ে যায়। আমরা তাদের খোঁজ করে বেড়াচ্ছি। আমাদের নিগ্রো ভৃত্যরা বলল, ওরা দক্ষিণ পশ্চিম দিকে পালিয়েছে। আমরা সেই দিকে খোঁজ করতে গিয়ে নিজেরাই পথ হারিয়ে ফেলি !

টারজন বলল, হীরে আর পান্না দুটোই চুরি গেছে ? একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। ওগুলো সুখের থেকে দুঃখই নিয়ে আসত তোমাদের জীবনে।

উড বলল, ওসব পাথর চুলোয় যাক। আমি শুধু গলনালাকে চাই।

টারজন বলল, আমার মনে হয় খুব শীঘ্রই তাকে পাওয়া যাবে। এখন চল তোমাদের থাকার ঘর দেখিয়ে দিই। তোমরা স্নান করে নতুন পোশাক পাবে। তারপর বাগানে চলে যাবে। সেখানে আমরা থাকবো।

ভন আইকই প্রথমে বাগানে গেল। চমৎকার অসংখ্য ফোটা ফুলে ভরা সাজানো বাগান। তার মাঝখানে এক জায়গায় লণ্ডনের একটা সংবাদপত্র হাতে বসে ছিল গলনালা।

ভনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে লাফিয়ে উঠল গলনালা। বব তুমি ! সে কোথায় ?

গলনালা তুমি ! উড এখানে আছে। তুমি স্পাইক আর স্ট্রোনের হাত থেকে মুক্তি পেলে কি করে ?

স্পাইক আর স্ট্রোনের সঙ্গে আমি কখনো ছিলাম না। আমি ত একাই চলে আসি।

এরপর সে রাতের ঘটনাটা সব বলল গলনালা। সে বলল, সে রাতে ঘুম আসছিল না বলে বনের মধ্যে আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে কিছুটা এগিয়ে যায়। সহসা সে আড়াল থেকে স্ট্রোন ও স্পাইকের চাপা গলায় বলা

ষড়যন্ত্রের কিছু কথাবার্তা শুনতে পায়। ওৎ পেতে শোনা কথাগুলো সব বলল সে ভনকে।

গলনালা বলল, আমি তখন দেখলাম আমার জন্য স্ট্যানলির জীবন বিপন্ন হতে পারে। আমি তাকে সত্যি সত্যিই ভালবাসতাম। সে শুধু পান্না ধাতুটার জন্য আমাকে চায় এটা আমি ভাবতেই পারিনি।

ভন আইক বলল, একথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি এ বিষয়ে কথা বলেছিলাম তার সঙ্গে। সে আমাকে বলেছে দরকার হলে তোমাকে নিয়ে নরকে যাবে, সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করবে কিন্তু তোমাকে ছাড়তে পারবে না। তোমার তুলনায় পান্না তুচ্ছ তার কাছে।

গলনালার চোখে জল এল। বলল, তার সঙ্গে এখন দেখা হবে?

এমন সময় উড বাগানে এসেই গলনালাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। সে ভাবতেই পারেনি যে গলনালাকে কত কষ্ট করে খুঁজে আসছে এতদিন সেই গলনালাকে এখানে দেখতে পেয়ে যাবে।

প্রথমে দুজনেই আনন্দে এত অভিভূত হয়ে পড়ল যে কেউ কোন কথা বলতে পারল না। পরে দুজনেই নিজের নিজের দুঃখের কাহিনী বলল।

সন্ধ্যাবেলায় তারা সকলে মিলে ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করতে লাগল।

উড বলল, আমরা এখন আমেরিকায় চলে যেতে চাই। সেখানেই আমাদের বিয়ে হবে।

কিন্তু গলনালা বলল, আমাকে তার আগে একবার লণ্ডনে যেতে হবে। ঔপনিবেশিক দপ্তর থেকে আমি একখানি চিঠি পেয়েছি। চিঠিটার কথা আগেই বলেছি তোমায়, চিঠিটা আমি এখনি নিয়ে আসছি। আমি তা পড়তে পারব না।

গলনালা উঠে গিয়ে তার ঘর থেকে একখানা চিঠি বার করে এনে টারজনকে পড়তে দিল। বলল, এটা পড়ে দিন।

টারজন পড়তে লাগল।

"এই চিঠিখানি আমি লিখছি আমার মেয়ের উদ্দেশ্যে। সে যদি ভাগ্যক্রমে কাজীদের দেশ থেকে কখনো মুক্তি পায় তাহলে সে যেন লণ্ডনে গিয়ে পরিচয় দান করে। কাজীদের দেশেই তার জন্ম হয় এবং তার জন্মের পরেই কাজীরা তার মাকে হত্যা করে। পরে তাকে তারা তাদের রাণী করে এবং তাকে গলনালা নামে অভিহিত করে। মাফকা নিষেধ করায় আমি তাকে বলতে পারিনি সে আমার মেয়ে। কারণ মাফকা তাকে তার মেয়ে বলেই প্রচার করত। মাউণ্টফোর্ড।

আফ্রিকার ভয়াল আরণ্যক রাত্রি এগিয়ে আসছিল তখন ধীরে ধীরে। দূরে শোনা যাচ্ছিল পশুরাজ সিংহের গর্জন। এমন সময় একটি বনের মধ্যে আটজনের একটি সফরী শিবির স্থাপনের চেষ্টা করছিল রাত্রির মত। তাদের দলের মধ্যে ছিল দুজন শ্বেতাঙ্গ আর দুজন নিগ্রো আদিবাসী।

শিকার করে তারা যে মাংস পেয়েছিল তা রান্না করছিল নিগ্রোভৃত্যেরা। শ্বেতাঙ্গ দুজন হলো স্ট্রোন আর স্পাইক।

স্পাইক প্রথমে বলল, সামনেই নরখাদকদের দেশ।

এরপর চামড়ায় মোড়া দুটো ধাতুর দিকে তাকিয়ে সে বলল, এই ধাতু দুটোই আমাদের কাছে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্ট্রোন বলল, কয়েক লক্ষ ডলারের জন্ত আমি আরো অনেক অভিশাপের বোঝা বহন করতে রাজী আছি।

তবে যদি জীবিত বেরিয়ে যেতে পার।

স্ট্রোন বলল, আমি ভাবছি শুধু সেই ক্লেটনটার কথা। সে এলে দুটো ধাতুই কেড়ে নিত আমাদের কাছ থেকে।

সে ত উত্তর দিকে গেছে।

কিন্তু বলে গেছে আবার এদিকে আসবে সে। আমরা কিছু অন্যায় করলে সে জানতে পারবে!

আবার সিংহের গর্জন শোনা গেল। সূর্য অনেক আগেই অস্ত গিয়েছিল। ঘন হয়ে উঠছিল সন্ধ্যার ছায়া। এমন সময় দশ বারোজন আদিবাসী যোদ্ধা এসে ঘিরে ফেলল তাদের।

স্ট্রোন শুধু হাতে তাদের সামনে সাহস করে দাঁড়াল। নিগ্রোভৃত্যরাও উঠে দাঁড়াল। স্ট্রোন আদিবাসী যোদ্ধাদের সর্দারকে বলল, আমরা পথপ্রদর্শক খুঁজছি। আমাদের পিছনে একটা বড় সফরী আসছে। তাতে অনেক বন্দুক আছে।

সর্দার বলল, মিথ্যা কথা। আমাদের লোক তোমাদের দুদিন ধরে অনুসরণ করে খোঁজখবর নিয়ে আমাকে জানায়। তোমাদের আমাদের গাঁয়ে যেতে হবে।

স্ট্রোন আর স্পাইক তখন যুক্তি করে একে একে হীরের ও পান্নার তাল দুটো হাতে নিয়ে আক্রমণকারীদের উদ্দেশ্যে বলল, চলে যাও তোমরা, অস্ত্র ফেলে দাও।

কিন্তু আদিবাসী যোদ্ধাদের সর্দার মোটেই অস্ত্র ফেলে দিল না বা চলে গেল না। সে স্পাইককে একটা লাথি মারল। তার দলের যোদ্ধারা যুদ্ধের

ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে আসতে লাগল অস্ত্র হাতে। এমন সময় একটা বিরাট সিংহ দাঁত বার করে গর্জন করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল সর্দার আর তার যোদ্ধাদের উপর।

সিংহটা আদিবাসী যোদ্ধাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে সেই সুযোগে ছুটে পালিয়ে গেল স্ট্রোন। যাবার সময় হেঁকে স্পাইক আর নিগ্রোভৃত্যদের বলে গেল, আমি হীরকখণ্ডটা নিয়ে যাচ্ছি। তোমরা পান্নাটা আনতে যেন ভুলো না।

নরখাদক আদিবাসী যোদ্ধার দল আর সিংহের আক্রমণ থেকে কোন রকমে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রাণভয়ে সারারাত ধরে ছুটতে থাকে ওরা। স্ট্রোনের পিছু পিছু স্পাইক ও নিগ্রোভৃত্যরাও ছুটতে থাকে।

পরদিন সকালে একটা নদীর ধারে এসে থামে ওরা। তখন ওরা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছে একেবারে। দীর্ঘক্ষণ পর ওরা আবার সকলে সমবেত হয়ে কথা বলতে লাগল। প্রথমে ওদের সঙ্গে যা কিছু বাসি মাংস ছিল তা আর জল খেয়ে ক্ষিদেটা মেটাল ওরা।

তারপর স্পাইক বলল, আমি হীরের তালটার উপর হাত রেখেছিলাম বলেই হঠাৎ সিংহটা এসে পড়ে বাঁচিয়ে দেয় আমাদের।

স্ট্রোন বলল, তুমি হীরেটা ছোঁবার আগেই সিংহটা এগিয়ে আসতে থাকে।

স্পাইক বলল, ঠিক আছে। তাহলে পরীক্ষা করে দেখা যাক।

এই বলে সে হীরেটায় হাত দিয়ে স্ট্রোনকে বলল, বসে পড়।

স্ট্রোন বসল না। শুধু বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগল।

এরপর স্পাইক একটা গণ্ডী টেনে দিয়ে স্ট্রোনকে বলল, এর বাইরে যেও না।

স্ট্রোন তার বাইরে চলে গেল।

স্পাইক বলল, ক্লেটনের হাতে তখন কিন্তু এটা কাজ করেছিল সে যাকে যা বলত তাই সে করত।

স্ট্রোন বলল, তখন গলনালা উপস্থিত ছিল।

স্পাইক বলল, কিন্তু পান্নাটা কি করে কাজ করত? তার ত কোন রাণী নেই।

ঠিক আছে, পান্নাটা নিয়ে একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক।

স্পাইক বলল, কই দাও দেখি।

স্ট্রোন বলল, নিগ্রোভৃত্যরা এনেছে বোধ হয়। হয়ত তাদের কাছেই আছে।

কিন্তু দেখা গেল, প্রাণভয়ে পালিয়ে আসার সময় নিগ্রোভৃত্যরা কেউ

সেটা আনেনি।

স্ট্রোন তখন স্পাইককে বলল, এত দামী ধাতুটা নরখাদকদের দেশে ফেলে এলে ?

১১

বনের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে উড একসময় গলনালাকে বলল, খুব ক্লান্তিবোধ হচ্ছে ?

গলনালা বলল, মোটেই না।

ভন আইক বলল, কষ্ট হবে বৈকি ! তুমি ত শুধু ওখানে সারাদিন সিংহাসনে বসে থাকতে।

গলনালা বলল, কিন্তু মাঝে মাঝে কাজীদের সঙ্গে শিকার করতাম আমি, তাই আমার সঙ্গে ছুটে পারবে না তোমরা।

গলনালা, উড আর ভন আইক পথ চলছিল বনের ভিতর দিয়ে। ওরা টারজনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলেছে সভ্য জগতের দিকে। টারজন ওদের জন্য এক ভাল ও নির্ভরযোগ্য সফরী আনিয়ে দিয়েছে।

সারাদিন পথ চলার পর ওরা এক জায়গায় শিবির গড়ে তুলল। রাত্রিতে শিবিরের ধারে আগুন জ্বালিয়ে পাহারার ব্যবস্থা হলো।

এদিকে এই শিবিরের উত্তর দিকে এক মাইল দূরে স্পাইক আর স্ট্রোন আগুন দেখতে পেল।

ওটা কাদের শিবির, কারা ও আগুন জ্বেলেছে তা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল দুজনে। ও আগুন আদিবাসীরা জ্বালাতে পারে আবার শ্বেতাঙ্গ শিকারীদলও হতে পারে। আবার ক্লেটনও হতে পারে।

রাত্রিকালে এই বনাঞ্চলে সিংহের দারুণ ভয়। তবু ওরা আগুনটাকে লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে লাগল। তারা তখন সংখ্যায় মাত্র চারজন।

আগুনের কাছে গিয়ে শিবিরটাকে ভাল করে দেখল। তারপর সেখানে না গিয়ে কাছাকাছি একটা ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল যাতে ওরা শিবিরের সব কিছু দেখতে পায় অথচ শিবিরের কেউ দেখতে পাবে না ওদের।

হঠাৎ গলনালাকে দেখতে পেয়ে স্পাইক চুপি চুপি স্ট্রোনকে শিবিরের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, ঐ দেখ কে।

স্ট্রোনও দেখতে পেয়ে বলল, গলনালা।

তার সঙ্গে আছে উড আর ভন আইক।

স্ট্রোন বলল, আমরা শুধু গলনালাকে চাই। ওরা চুলোয় যাক।

কিন্তু গলনালাকে নিয়ে কি করব আমরা ? কি কাজ হবে আমাদের ?

তুমি একটা আস্ত বোকা। গলনালা কাছে থাকলে আমাদের হীরেটা কাজ করবে। যেমন করত মাফকার হাতে।

চুপ, ওরা কি বলছে এখন শোন চুপ করে।

শিবিরের মধ্যে তখন উড, ভন আইক আর গলনালা কথা বলছিল। তাদের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা স্ট্রোন আর স্পাইক।

পরদিন ওরা কি করবে তার একটা কর্মসূচী তৈরী করছিল ভন আইক।

ভন বলল, আগামী কাল আমরা যখন শিকারে যাব তখন গলনালা শিবিরে বিশ্রাম গ্রহণ করবে। তবে সে যদি যাবার জন্য জেদ ধরে তাহলে তাকেও সঙ্গে নিতে হবে। তবে তিনজন পুরুষ হলে শিকারের কাজে সুবিধা হত।

গলনালা বলল, আমাকে তোমরা তোমাদের সভ্য জগতের মেয়েদের মত ভেবো না। আমি শিকারে গেলে একজন পুরুষের মতই কাজ করব। শিকারের কাজে আমি শুধু অভ্যস্ত নই, পারদর্শিনীও। যাই হোক, এখন আমি শুতে যাচ্ছি। কাল তাহলে শিকারে যাওয়া যাবে।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পরই শিকারে বেরিয়ে পড়ল ওরা তিনজন। ভন আইক গেল পূবদিকে, উড গেল দক্ষিণে আর গলনালা গেল উত্তর দিকে। প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল বন্দুকহাতে একজন করে সহকারী।

উডদের শিবিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি ছোট পাহাড়ের উপর থেকে স্ট্রোন আর স্পাইক উডদের এই শিকার-অভিযান লক্ষ্য করতে লাগল। গলনালা তার বন্দুকধারী সহকারীকে নিয়ে কোন্ দিকে গেল তা বিশেষ করে নজর রাখতে লাগল তারা।

গলনালাকে একা ভিন্ন এক দিকে শিকারে যেতে দিতে কিছুতেই মন চাইছিল না উডের। কিন্তু গলনালা না ছাড়ায় বাধ্য হয়েছে তাকে যেতে দিতে। তার সব আপত্তি খণ্ডন করে চলে গেছে গলনালা।

উড তখন বাধ্য হয়ে তার সঙ্গে একজন বন্দুকধারীর হাতে তুটো রাইফেল দিয়ে পাঠিয়েছে তাকে। তাছাড়া গলনালার মনটা আর মাথার স্নায়ুগুলোও বেশ শক্ত হওয়ায় ভয়ের তেমন কিছু নেই।

কিন্তু গলনালা তখন ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি একটা পাহাড়ের উপর থেকে স্ট্রোন আর স্পাইক তাকে লক্ষ্য করছে।

যে পাহাড়টার উপর থেকে স্ট্রোন আর স্পাইক লক্ষ্য করছিল তাকে সেই পাহাড়টার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে একটা প্রান্তরে পড়ল গলনালা। কিন্তু সে যেখানে গেল সেখানে ভন আইক ও উডকে দেখা যাচ্ছিল না। কারণ তাদের

মাঝখানে অনেক গাছ আর বড় বড় পাথর ছিল। তাই স্পাইক আর স্ট্রোন গাছ আর পাথরের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে অনুসরণ করে চলেছিল গলনালাকে।

স্ট্রোন আর স্পাইকের আটজনের একটা দল গোপনে তার পিছু নিয়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ না করেই পশ্চিম দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল গলনালা সিংহের সন্ধানে। তার ডান দিকে একটা ছোট পাহাড় ছিল।

এমন সময় দুটো রাইফেলের গুলির আওয়াজ শুনে গলনালা তার বন্দুকবাহককে বলল, ওরা কেউ শিকার পেয়েছে। আমরা হয়ত ভুলপথে এসেছি।

বন্দুকবহনকারী বলল, না মেমসাহেব, ঐ দেখুন।

এই বলে একদিকে হাত বাড়িয়ে গলনালাকে দেখাল। গলনালা সেদিকে তাকিয়ে একটা গাছের তলায় বড় খাদের মাঝে একটা সিংহকে দেখতে পেল।

গলনালা বলল, এখন কোন মনোযোগ দিও না ওর দিকে। আমরা ওর আরো কাছে গিয়ে গুলি করব পাশ থেকে।

গলনালা প্রথমে সিংহটার ডান দিকে, তারপর তার সামনে কিছুটা এগোতেই দাঁত বার করে গর্জন করে উঠল সিংহটা।

গলনালা বলল, ও উঠে দাঁড়ালে ভাল হত।

তার বন্দুকধারী সঙ্গী তখন একটা পাথরের টুকরো সিংহটার গায়ে ছুঁড়ে দিল।

সিংহটা সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে আক্রমণ করল ওদের।

এদিকে স্পাইক স্ট্রোনকে তার পাশে ইশারায় ডাকল। দৃশ্যটার দিকে কড়া নজর রাখল সে।

গলনালা হাঁটু গেড়ে বসে তার বন্দুক থেকে গুলি করল। গুলিটা সিংহটার গায়ে লাগল, কিন্তু সে থামল না। সিংহটা মাটিতে পড়ে গিয়ে একবার গড়াগড়ি দিয়ে আবার উঠে ভয়ঙ্করভাবে এগিয়ে আসতে লাগল তাদের দিকে। গলনালা আবার গুলি করল। কিন্তু গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। তখন তার বন্দুকবাহক একটা গুলি করল। কিন্তু সে গুলিটাও লাগল না। সে তখন ছুটে পালাতে লাগল।

সিংহটা তখন গলনালাকে ছেড়ে পলাতক বন্দুকবাহকের দিকে ছুটতে লাগল। গলনালা আবার গুলি করল। গুলিটা এবার সিংহের গায়ে লাগল। কিন্তু সিংহটা পলাতক বন্দুকবাহককে ধরে ফেলল। তাকে ধরেই তার মাথায় একটা কামড় বসিয়ে দিল।

গলনালা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে দেখল লোকটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে মেরে ফেলল সিংহটা।

গলনালার বন্দুকবাহক লোকটা মারা যেতেই স্ট্রোন স্পাইককে বলল,

ভালই হলো, আমরা মেয়েটা আর সেই সঙ্গে দুটো বন্দুক পেয়ে যাব।

স্পাইক বলল, যখন অন্য লোক নেই তখন এস।

স্ট্রোন আর স্পাইক এবার গলনালার দিকে এগিয়ে গেল।

গলনালা তাদের দেখেও কোন ভয় পেল না। সে যদিও জানত লোক দুটো খারাপ এবং তারা হীরে আর পান্নার তালদুটো চুরি করেছে তথাপি তাদের দেখে তার কোন বিপদ ঘটতে পারে একথা তার একবারও মনে হলো না।

তারা গলনালার কাছে এসে অন্তরঙ্গতার হাসি হেসে বলল, তুমি অল্পের জন্য বেঁচে গেছ। আমরা পাহাড়ের উপর থেকে সব দেখেছি। আমাদের হাতে বন্দুক থাকলেও কোন সাহায্য করতে পারিনি। কারণ আমরা অনেকটা দূরে ছিলাম।

গলনালা তাদের জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি করছিলে তোমরা ?

স্পাইক বলল, আমরা কোন একটা রেলস্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম। তারপর পথ হারিয়ে ফেলি।

স্ট্রোন এবার মৃত বন্দুকবাহকের রাইফেল আর গুলিগুলো নিয়ে নিল। স্পাইক তখন গলনালার ভাল বন্দুকটাকে লক্ষ্য করতে লাগল।

গলনালা বলল, তোমরা আমাদের শিবিরে চলে আসতে পার। আমরাও রেলস্টেশনের দিকেই যাব।

সেকথার উত্তর না দিয়ে স্পাইক তাকে বলল, তোমার বন্দুকটা ত চমৎকার। একবার দেখি।

গলনালা কোন সন্দেহ না করেই বন্দুকটা তুলে দিল তার হাতে।

গলনালা বলল, তোমাদের লোকরা আমার মৃত লোকটাকে আমাদের শিবিরে বয়ে নিয়ে যাক।

স্পাইক বলল, আমরা তোমাদের শিবিরে যাব না।

গলনালা বলল, আমি তাহলে কি করব ? আমি ত একা ওকে বয়ে নিয়ে যেতে পারব না।

তুমি আর তোমাদের শিবিরে ফিরে যাবে না।

কি বলতে চাও তোমরা ?

তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে।

না, আমি যাব না।

স্পাইক বলল, দেখ গলনালা, আমরা তোমার সঙ্গে কোন ঝামেলা করতে চাই না। তোমাকে কোনরকম আঘাত করতেও চাই না। সুতরাং আশা করি তুমি শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের সঙ্গে আসবে। তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে।

কিন্তু কেন? কি প্রয়োজন?

তুমি ছাড়া হীরেটা কোন কাজ করছে না।

কাজ করছে না মানে?

আমরাও মাফকার মত এখানে একটা রাজ্য গড়ে তুলতে চাই এই ধাতুটার সাহায্যে। মাফকার মত এটাকে আমরা কাজে লাগাব। এর একটা অলৌকিক শক্তি আছে। আমরা সেই শক্তির সাহায্যে সে রাজ্যের রাজা হব আর তুমি হবে তার রাণী। আমি তোমাকে বিয়েও করতে পারি।

স্ট্রোন তাকে থামিয়ে বলল, না তুমি তা পার না। ওর উপর আমারও অধিকার আছে। ও আমার।

গলনালা বলল, না, আমি তোমাদের কারোরই হব না। তোমরা বোকা। তোমরা আমাকে জোর করে নিয়ে গেলে তোমাদের খুঁজে বার করে হত্যা করা হবে। তোমাদের কাছ থেকে গলফানটাও কেড়ে নেওয়া হবে। যদি তোমাদের মাথায় সুবুদ্ধি থাকে ত আমাকে ছেড়ে দেবে। তোমরা বরং গলফানটা ইউরোপে নিয়ে যেতে পার। ওটাকে বিক্রি করলে জীবনে অনেক কিছু পাবে।

স্পাইক বলল, না, তোমাকে যেতেই হবে আমার সঙ্গে।

১২

ভন আইক পর পর দুটো গুলি করে একটা সিংহকে মেরে ফেলে। উডের ভাগ্যে কোন শিকার জোটেনি। সে তখন গলনালার নিরাপত্তার কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল।

সে তাই ভন আইকের কাছে গিয়ে বলল, মরা সিংহটাকে লোক মারফৎ শিবিরে পাঠিয়ে দিয়ে চল আমরা গলনালার খোঁজে যাই।

ভন আইক তাতে রাজী হলে যেদিক থেকে কয়েকটা গুলির শব্দ এসেছিল সেই দিকে এগিয়ে গেল তারা।

দুঘণ্টা ধরে তারা গলনালার খোঁজ করে বেড়াল। তার নাম ধরে ডাকল। কিন্তু তাকে দেখতে পেল না বা তার কোন সাড়া পেল না। তারপর খুঁজতে খুঁজতে গলনালার সঙ্গে সিংহটার যেখানে লড়াই হয় সেখানে এসে পড়ল তারা। দেখল বন্দুকবাহকটার মৃতদেহের উপর একটা সিংহ মরে পড়ে আছে। কিন্তু গলনালা সেখানে নেই। মৃত লোকটার বন্দুকও নেই।

উডরা ভাবল, সিংহ ও তার মৃত বন্দুকবাহককে শিবিরে বয়ে নিয়ে যাওয়া

তার পক্ষে সম্ভব নয় বলে গলনালা হয়ত অন্য পথ দিয়ে শিবিরে গেছে লোক ডেকে আনতে। তাই তারা শিবিরে গেল।

কিন্তু শিবিরে গিয়ে দেখল গলনালা সেখানেও নেই।

তখন বিকাল হয়ে গেছে। তবু উড বলল, এখনি তার খোঁজে বার হতে হবে। সে তখন শিবিরের সব লোককে তিন দলে ভাগ করে দুটি দল সে নিজে ও ভন আইককে নিয়ে বেরিয়ে গেল। একটি দলকে শিবির রক্ষার কাজে রেখে গেল। বলল, তারা যেন সারারাত একটি বড় অগ্নিকুণ্ড জেলে রাখে এবং মাঝে মাঝে বন্দুকের আওয়াজ করে। গলনালা যাতে পথ হারিয়ে ফেললে ফিরে আসতে পারে শিবিরে।

কিন্তু উড বা ভন আইক কোন খোঁজ পেল না গলনালার। অবশেষে পরদিন দুপুরবেলায় ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে ফিরে এল শিবিরে।

ভন আইক বলল, গলনালা বেঁচে থাকলে আমাদের বন্দুকের আওয়াজ শুনে ঠিক ফিরে আসত সে।

উড বলল, সে মারা গেছে এটা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তার দুটো বন্দুক ছিল। মৃত বন্দুকবাহকের বন্দুক আর সব গুলি সে নিয়েছে। সেটা তুমি দেখেছ। তার নিজের বন্দুকও ছিল। কোন সিংহের দ্বারা আক্রান্ত হলে সে অন্ততঃ গুলি করত এবং আমরা তার আওয়াজ শুনতে পেতাম।

ভন বলল, আমার মনে হয় গুলি করার সুযোগ পায়নি। সে বুঝতে পারার আগেই সিংহটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর।

উড বলল, তা অবশ্য হতে পারে।

ভন বলল, কোন আশা থাকলে আমিও থেকে যেতাম। কিন্তু যেহেতু কোন আশা দেখছি না চল আমরা বাড়ির পথে রওনা হই। দেশে ফিরে গেলে তুমি সব ভুলে যাবে।

উড বলল, তুমি যাও। আমি যাব না।

কিন্তু একা কি করবে এখানে?

আমি আবার টারজনের কাছে ফিরে যাব। সে আমাকে সাহায্য করতে পারবে এ ব্যাপারে। যদি কেউ তাকে খুঁজে বার করতে পারে ত একমাত্র টারজনই পারবে। যদি গলনালা মারা যায় তাহলেও কোথায় কিভাবে মৃত্যু হয় তার তাও সে আবিষ্কার করতে পারবে।

দশদিন ধরে সেই শিবিরে রয়ে গেল উড। সে টারজনের বাড়িতে না গিয়ে একজন লোককে একটা চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিল। এই দশদিনের মধ্যে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে অনেক খোঁজ করল গলনালার। কিন্তু তাকে বা তার কোন চিহ্নই খুঁজে পেল না।

একদিন উড যখন তার শিবিরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে গলনালার কথা ভাবছিল তখন হঠাৎ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল টারজন। টারজনকে দেখেই লাফিয়ে উঠে পড়ল উড। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, টারজন! তুমি মানুষ নও, দেবতা, আমি জানতাম তুমি আসবে।

টারজন বলল, তোমার চিঠি পেয়েই আমি চলে এসেছি।

উড তার ব্যর্থতার কথা সব বলল।

টারজন বলল, আজ আর হবে না। কাল খোঁজ করব।

পরদিন সকালেই উড আর টারজন সেই শিবিরটাতে গেল প্রথমে যেখানে একদিন স্পাইক আর স্ট্রোন ছিল একদিন এবং যেখান থেকে তারা গলনালার গতিবিধি লক্ষ্য করে।

আগে উড এ শিবিরটাকে দেখে ভেবেছিল এখানে হয়ত একজন নিগ্রো আদিবাসী থাকত সাময়িকভাবে। কোন শ্বেতাঙ্গ ছিল না।

কিন্তু টারজন শিবিরের উঠোনের ঘাসগুলো পরীক্ষা করে দেখে বলল, এখানে একদল লোক ছিল। তাদের মধ্যে শ্বেতাঙ্গও ছিল।

তাদের গন্ধসূত্র ধরে উত্তর দিকে উডকে নিয়ে এগিয়ে চলল টারজন। ক্রমে তারা সেই জায়গাটায় গিয়ে পড়ল যেখানে সেই সিংহটা আর গলনালার বন্দুকবাহকটা মরে পড়েছিল।

টারজন বলল, এখান থেকেই একদল লোক ধরে নিয়ে যায় গলনালাকে।

উড বলল, সে আজ প্রায় এগার দিনের কথা। তাহলে আর ত দেরী করা চলবে না। এখনি খোঁজ করতে হবে তাদের।

টারজন বলল, আমি একা যাব। তুমি তোমার শিবিরে ফিরে যাও আজকের মত। কাল সকালে আমার বাড়িতে গিয়ে থাকবে। আমি গিয়ে খোঁজ করতে করতে যদি কোন সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করি তাহলে একজন লোক দিয়ে খবর পাঠাব! তুমি তাহলে আমার ওয়াজিরিদের সঙ্গে নিয়ে আমার সাহায্যে যাবে। এখন আমার সঙ্গে এত তাড়াতাড়ি যেতে পারবে না।

এই বলে সেখান থেকে চলে গেল টারজন সঙ্গে সঙ্গে।

বিষণ্ণ মনে একা একা তার শিবিরে ফিরে গেল উড।

দুদিন ধরে গন্ধসূত্র ধরে উত্তরদিকে এগিয়ে চলল টারজন। তারপর বাতাঙ্গো নামক এক উপজাতিদের এলাকায় এসে পড়ল। এই বাতাঙ্গোরা বড় যুদ্ধবাজ আর নরখাদক। তারা ওয়াজিরিদের চিরশত্রু।

টারজন ভাবল যারা গলনালাকে ধরে নিয়ে গেছে তারা এদিকে এসে পড়লে বন্দী হতে পারে বাতাঙ্গোদের হাতে। তারা ধরা পড়েছে কিনা সে বিষয়ে বাতাঙ্গোদের সর্দারের গাঁয়ে গিয়ে খোঁজ করতে হবে।

টারজন দেখল তার পূব দিকে কতকগুলো ছোট ছোট পাহাড় উত্তরদিকে বিস্তৃত হয়ে আছে। সে সব পাহাড়গুলোর কাছে গিয়ে সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার উপর উঠে সে দূরে কতকগুলো গাঁ দেখতে পেল। গাঁ মানে চারদিকে বাঁশ বা কাঠের খুঁটির বেড়া দিয়ে বানানো কতকগুলো ছোট ছোট কুঁড়েঘর।

যে সমতল উপত্যকার উপর গাঁগুলো অবস্থিত তার পশ্চিম দিকে অনেক গাছপালার জঙ্গল। জায়গাটার প্রাকৃতিক দৃশ্যটা বড় মনোরম। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল টারজন। এতদিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যপ্রীতি যায়নি টারজনের। এই সৌন্দর্যপ্রীতিই তার আরণ্যক জীবনের প্রতি আসক্তির অন্যতম একটি প্রধান কারণ।

টারজন দেখল সব গাঁগুলোর মধ্যে কোন্ গাঁটা সবচেয়ে বড়। সে বুঝল ঐ গাঁটাই তাহলে বাতাঙ্গোদের সর্দারের গাঁ।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। আকাশে চাঁদ ছিল না। পাহাড়ে ও উপত্যকার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠতেই সামনের গাঁগুলোর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। দূর থেকে জ্বলন্ত উঠোনের আগুনের আলো দেখতে পাচ্ছিল।

পাহাড় থেকে একটা সিংহও নেমে এগিয়ে যাচ্ছিল সেই সব গাঁগুলোর দিকে।

গাঁগুলোর কাছাকাছি গিয়ে গ্রামবাসীদের ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আকাশের দিকে মুখ করে বুকের ভিতর থেকে পশুসুলভ এক ভীষণ চীৎকার করল টারজন।

সে চীৎকার শুনে ভয় পেয়ে গেল বাতাঙ্গোরা। পুরুষরা অস্ত্র তুলে নিল হাতে। মেয়েরা তাদের শিশুগুলোকে কোলে তুলে নিল।

একজন বাতাঙ্গো বলল, একটা দানব।

বাতাঙ্গোদের সর্দার বলল, এ চীৎকার আমি এর আগে একবার শুনেছিলাম। ওটা হলো ওয়াজিরিদের শয়তান উপদেবতার চীৎকার। বহুকাল আগে আমরা একবার ওয়াজিরিদের দেশ আক্রমণ করেছিলাম।

একজন বুড়ো লোক বলল, আমি যখন বয়সে বালক ছিলাম তখন বনে শিকার করতে গিয়ে একবার লোমওয়ালা একজন বৃক্ষমানবের মুখ থেকে এই ধরনের চীৎকার শুনেছিলাম।

তার কথায় কান না দিয়ে সকলে আবার এই ধরনের কোন চীৎকার হয় কিনা তা শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইল।

টারজন গাঁয়ে গেটের কাছে এসে দেখল তার পাশে একটা বড় গাছ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। দেখল গাঁয়ের চারদিকে একটা অনুচ্চ পাঁচিল ঘিরে আছে গাঁটাকে।

টারজন ঠিক করল, এখন সে গাঁয়ের ভিতর যাবে না। এখন ওদের রাতের খাওয়ার সময়। খাওয়ার পর ওরা শুয়ে পড়লে তবে সে গিয়ে দেখে আসবে গাঁয়ের ভিতরে কোন ঘরে শ্বেতাঙ্গ বন্দী আছে কিনা।

খাওয়ার পর বাতাজোদের অনেকেই তাদের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। একদল নাচগান করতে লাগল বাজনা বাজিয়ে। গাঁয়ের কাছে এসে একটা সিংহ গর্জন করছিল মাঝে মাঝে।

টারজন এবার সর্দারের কুঁড়েটাকে দেখতে গেল। দাওয়ায় যে মশালের আলো জলছিল তাতে সে দেখতে পেল একটা টুলের উপর পা ঝুলিয়ে বসে আছে সর্দার। তার পায়ের কাছে রয়েছে সেই পান্নার তালটা যা স্ট্রোন আর স্পাইক নিয়ে পালিয়ে আসে।

তা দেখে টারজনের সন্দেহ হলো গলনালা, স্ট্রোন আর স্পাইক এই গাঁয়েই বন্দী হয়ে আছে।

অবশেষে রাত গভীর হতে নাচগান বন্ধ হয়ে গেল। সকলেই শুতে চলে গেল। সর্দারও সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে শুয়ে পড়ল। সেই ঘরে কয়েকজন নারী ও শিশু ছিল। গাঁয়ের পথঘাট একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়লে গাছ হতে নিঃশব্দে নেমে পড়ল টারজন। ছায়ার মত গাঁয়ের পথ ধরে প্রতিটি কুঁড়ের সামনে থেকে বাতাসে গন্ধ শুঁকে শুঁকে পরীক্ষা করল ঘরগুলো। কিন্তু কোথাও কোন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ বা মহিলার সন্ধান পেল না।

অবশেষে সর্দারের ঘরের দরজার সামনে এসে টারজন দেখল ঘরের দরজার কাছে মেঝের উপর পান্নার তালটা পড়ে আছে। সর্দার তার স্ত্রীদের নিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

টারজন এবার ঘরে ঢুকে সর্দারের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার গলাটাকে আলতোভাবে দুহাত দিয়ে ধরল।

সর্দার চমকে জেগে উঠতেই টারজন চুপি চুপি বলল, যদি বাঁচতে চাও ত চেঁচাবে না।

সর্দার নিচু গলায় বলল, কে তুমি? কি চাও?

আমি শয়তান—দেবতা। দুজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আর একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা কোথায়?

আমি কোন শ্বেতাঙ্গ নারী দেখিনি। বেশ কিছুদিন আগে বনে শিকার করতে গিয়ে বনের দুজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষকে দেখি। কিন্তু তাদের সঙ্গে কোন নারী ছিল না। একটা সিংহ আমাদের সকলকেই আক্রমণ করতেই তারা ছুটে পালিয়ে যায়।

ঘরের মধ্যে একজন নারী জেগে উঠে বলল, কে কথা বলছে?

টারজন সর্দারকে বলল, ওকে চুপ করতে বল।

সর্দার বলল, শয়তানদের দেবতা। যদি বাঁচতে চাও ত চুপ করো।

মেয়েটি চুপ করে শুয়ে পড়ল।

টারজন আবার সর্দারকে বলল, তারা কোন্ দিকে পালিয়েছে? সঙ্গে লোক ছিল?

জঙ্গলের পশ্চিম দিকে। তারা ছিল মোট দুজন। দুজন শ্বেতাঙ্গ আর সব আদিবাসী। বন্দুক বা খাবার ছিল না তাদের সঙ্গে।

টারজন বলল, এই পান্নাটা তোমরা চুরি করে এনেছ?

সর্দার বলল, না, তারা ভয়ে পালিয়ে যাবার সময় এটা ফেলে যায়। তারা সাদা পাথরটা সঙ্গে করে নিয়ে যায়।

টারজন বলল, আচ্ছা, পরে কি কোন শ্বেতাঙ্গ মহিলা তোমাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে যায়?

কোন শ্বেতাঙ্গ মহিলা আমাদের গাঁয়ের পাশ দিয়ে যায়নি। গেলে অবশ্যই আমি জানতে পারতাম।

আর কিছু না বলে নিঃশব্দে পান্নার তালটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল টারজন। গেটের কাছে এসে দেখল সিংহটা তখনো ওৎ পেতে বসে আছে। টারজন আর সে রাতে সিংহটাকে না ঘাঁটিয়ে সেই গাছটার উপর শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দিল।

১৩

এদিকে স্ট্রোন আর স্পাইকের সঙ্গে সমানে উত্তর দিকে হেঁটে চলল গলনালা। বাতাঙ্গোদের গাঁটাকে এড়িয়ে যাবার জন্য অনেকটা ঘুরতে হয় তাদের।

গলনালার জন্য স্ট্রোন আর স্পাইক দুজনেই দারুণ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল পরস্পরের প্রতি। সব সময় গলনালার কাছে কাছে থাকত তারা দুজনেই। গলনালার সঙ্গে একজনকে ছেড়ে রেখে অন্য জন কোথাও যেত না।

তাদের পরস্পরের প্রতি এই ঈর্ষার জন্য গলনালার সুবিধাই হত। কেউ তাকে বিরক্ত করতে সাহস পেত না। কেউ বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া কথাই বলত না তার সঙ্গে। গলনালা দেখল তার নিরাপত্তা এই দুজনের উপস্থিতির উপর নির্ভর করছে। দুজনেরই জীবনের দাম আছে তার কাছে। সেই তাই দুজনকেই সমানভাবে ভালবাসার ভান করত। কারো প্রতি বিন্দুমাত্র বেশী আগ্রহ বা আসক্তি প্রকাশ করত না।

একজন নিগ্রোভৃত্য হীরের তালটাকে বয়ে নিয়ে যেত। স্ট্রোন বা

স্পাইক কেউ একজন সেটা স্পর্শ করলেই অন্যজন এক ভয়ঙ্কর বর্বর প্রতিবাদে ফেটে পড়ত। ভাবত তাদের একজন গলফান আর গলনালাকে পেয়ে গেলে তাদের মিলিত অলৌকিক শক্তির সহায়তায় অন্যজনকে ধ্বংস করে ফেলবে।

কিছুক্ষণ একটা সফরীর সঙ্গে যাবার সময় স্পাইক পাহাড়ঘেরা একটা উপত্যকা দেখে। ও এখন সেই জায়গাটায় যেতে চাইছিল।

সে একদিন গলনালাকে বলে, জায়গাটা যেন স্বর্গোদ্যান মিস। আমরা সেখানে রাজার হালে থাকব। সেখানকার আদিবাসীরা শান্তিপ্রিয়। গলফান আর তুমি আমাদের কাছে থাকলে তাদের উপর আমরা সহজেই প্রভুত্ব করতে পারব।

গলনালা বলল, গলফান থাকলেও তোমাদের সেটা কাজে লাগবে না।

কেন ?

তোমরা ওটা ব্যবহার করতে জান না। তোমাদের সে মানসিক শক্তি নেই।

তোমার সে শক্তি আছে ?

মাফকার মৃত্যুর পর আমি ওটার শক্তি কোন কাজে প্রয়োগ করে দেখিনি।

ওর শক্তি প্রয়োগ করতে পার ? তুমি কি মনে করো সে ক্ষমতা তোমার আছে ?

হ্যাঁ আছে, কিন্তু আমি সে শক্তি প্রয়োগ করে তোমাদের কাউকে কোন সাহায্য করব না। তার আগে তোমরা যে আমার কোন ক্ষতি করবে না কখনো সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে আমাকে।

স্পাইক তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না কখনো।

স্ট্রোন বলল, ওর কথা বিশ্বাস করো না।

স্পাইক স্ট্রোনের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘুষি পাকিয়ে বলল, আমি তোমার নাক ভেঙ্গে দেব।

স্ট্রোন সরে গিয়ে তার রাইফেলটা তুলে নিয়ে তার বাঁটটা স্পাইকের পেটে ঠেকিয়ে বলল, আমার নাকটা ভেঙ্গে দাও দেখি।

স্পাইক বলল, মাত্র দুটো নিগ্রো নিয়ে তুমি একা একা ঐসব গাঁগুলো পার হতে পারবে না, একজন শ্বেতাঙ্গ সঙ্গীর অবশ্যই দরকার হবে তোমার।

স্ট্রোন বলল, ঠিক আছে, তাহলে ঝগড়া বন্ধ করো।

গলনালা তাদের দুজনকেই বলল, তোমরা আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে এসে কেউ কোনদিন সুখে থাকতে পারবে না। স্ট্যানলি উড আর টারজন দুজনেই তোমাদের খুঁজে বার করে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বে না।

স্পাইক বলল, টারজন! এর মধ্যে আবার টারজন এল কোথা থেকে?

গলনালা বলল, ক্লেটনকে জান না?

হ্যাঁ, জানি।

আরে, সে-ই ত টারজন।

প্রথম কথা সে টারজন হলেও আমাদের খুঁজে পাবে না। আমরা কোথায় সে জানতেই পারবে না। আর জানতে পারলেও গলফান আমাদের হাতে আছে। গলফান কাছে থাকলে সে আমাদের কিছুই করতে পারবে না। উল্টে আমরা তাকে আমাদের ইচ্ছামত তাকে চলতে বাধ্য করব।

গলনালা বলল, আমার সাহায্য না পেলে তা তোমরা পারবে না। আর স্ট্যানলি ও টারজন এসে পড়লে আমি বরং তোমাদেরই তাড়িয়ে দেব। আমি তাদের বিরুদ্ধে যাব না।

গলনালার কথা শুনে ভয় পেয়ে গেল স্পাইক। সে এবার স্ট্রোনকে ডেকে বলল, একবার যদি গলনালা হীরের তালটার উপর তার থাবা বসাতে পারে তাহলে আর রক্ষা নেই আমাদের। সে আমাদের হত্যা পর্যন্ত করতে পারবে। গলফানটা আমাদের কোন কাজে লাগবে না।

স্ট্রোন বলল, গলনালা ছাড়া ওটাকে কাজে লাগাতে পারব না আমরা। তাহলে এখন আমরা কি করব?

স্পাইক বলল, এখন দেখতে হবে গলনালা যেন ওটাতে হাত দিতে না পারে। নিগ্রোভৃত্যদের কাছে ওটা থাকলেও ও তাদের বশ করে হাত দিতে পারে। সুতরাং এখন থেকে ওটাকে আমাদের দুজনের একজনকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে।

এই কথাই আমি বহুদিন ধরে বলে আসছি।

এখন এ ব্যাপারে আমরা দুজনেই একমত। গলনালা ছাড়া ওটাকে আমরা কেউ কাজে লাগাতে পারব না। ওকে ওটার উপর হাত দিতে দেব না।

তাহলে ধাতুটাকে রেখেই বা লাভ কি আমাদের?

দাঁড়াও, যে দেশে আমরা যাচ্ছি সেখানে একবার যেতে পারলে ওকে আমরা বাধ্য করব আমাদের মতে চলতে। যেখানে ওকে নিয়ে গিয়ে ফেলব সেখানে ও আমাদের হত্যা করলেও পালাবার পথ খুঁজে পাবে না।

আমাদের হাত থেকে পালাবার জন্য ও আমাদের যেমন করে হোক খুন করবেই।

স্পাইক বলল, তবু এখন এছাড়া আমাদের করার কিছু নেই।

এরপর ওরা শিবির উঠিয়ে আবার যাত্রা শুরু করল। ওরা উত্তর দিকে যেতে লাগল।

এদিকে বাতাজোদের গাঁটাকে ফেলে পশ্চিম দিকে গিয়ে বনের প্রান্তে এসে দাঁড়াল। সেইখানে সে কয়েকটা গাছেঘেরা ত্রিভুজাকৃতি একটা জায়গায় মাটি খুঁড়ে পান্নার তালটা পুঁতে রেখে মাটি চাপা দিয়ে তার উপর কিছু ঘাস আর গাছের পাতা দিয়ে সেখানকার মাটিটা ঢেকে দিল।

ঝড়েতে গন্ধসূত্রটা হারিয়ে যাওয়ায় পলাতকদের অনুসরণের পথে বাধা পড়ল। তাই সে নিজের যুক্তিবোধের সাহায্যে ভেবে দেখতে লাগল কোন্‌দিকে যেতে পারে তারা।

সে ভাবল, ওরা যখন গলনালাকে পেয়েছে তখন তাকে দিয়ে হীরের তালটাকে কাজে লাগাবে। তার অলৌকিক শক্তির দ্বারা অনেক কিছু চাইবে তারা এবং তার জন্য নিশ্চয় ওরা অন্য কোথাও না গিয়ে কাজীদের দেশেই ফিরে যাবে। সেখানে গিয়ে গলনালাকে রাণী করে রাজ্যসুখ ভোগ করতে চাইবে ওরা। কারণ কাজীরা গলফান আর গলনালার মর্ম বোঝে। সেখানে অনেক মেয়েও ভোগ করতে পাবে ওরা।

এই ভেবে টারজনও উত্তর দিক বরাবর স্পাইকদের পথের সমান্তরাল একটা পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগল।

দুদিন যাওয়ার পর পথে এক জায়গায় হায়েনার অট্টহাসি শুনে সেখানে গিয়ে দেখল একটা বড় গর্তের মধ্যে এক বড় হাতি পড়ে আর্তনাদ করছে।

এই হাতিটি টারজনের সেই হাতিবন্ধু প্রিয় ট্যাণ্টর না হলেও তারই সমজাতীয়। টারজন তাই গর্তের একপাশে মাটি খুঁড়ে মুক্ত করল হাতিটাকে। গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে তার শুঁড় দিয়ে টারজনের দেহটাকে সোহাগভরে স্পর্শ করল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর আবার উত্তর দিকে রওনা হয়ে পড়ল টারজন।

এদিকে টারজনের বাড়িতে টারজন ফিরে না আসায় অধৈর্য হয়ে পড়ল ষ্ট্যানলি উড। টারজনের কোন খবর পেল না সে। তাই একদিন ওয়াজিরিদের সর্দার মুভিরোকে উড বলল, আমাকে কিছু লোক দাও, আমি নিজেই গলনালার খোঁজে বার হব।

অবশেষে মুভিরো তাকে দুজন ওয়াজিরি যোদ্ধা দিল। তাই নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ল উড।

বাতাজোদের দেশে তারা এসে পড়লে ওয়াজিরিরা সেদিকে না গিয়ে ট্রোন ও স্পাইকদের মত অন্য পথে যেতে লাগল।

কয়েকসপ্তা যাবার পর আদিবাসীদের একটা গাঁয়ে এসে তারা বুঝল, ঠিক পথেই এসেছে তারা। আদিবাসীদের সর্দার বলল, নজন লোকের এক সফরী এসেছিল তাদের গাঁয়ে। তাতে ছিল দুজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ, একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা আর ছজন নিগ্রোভৃত্য। সর্দার তাদের সঙ্গে পথপ্রদর্শক

দিয়ে উত্তরের দিকে আর এক গাঁয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে।

তা শুনে আশান্বিত হলো উড। বুঝল গলনালা তাহলে বেঁচে আছে এখনো এবং তার উপর পীড়ন করা হয়নি।

১৪

সেদিন উত্তরাঞ্চলের এক গাঁয়ে এক আদিবাসী সর্দারের সঙ্গে কথা বলছিল স্ট্রোন আর স্পাইক।

স্পাইক একসময় জিজ্ঞাসা করল সর্দারকে, উত্তর দিকে কি আছে?

সর্দার বলল, শুধু পাহাড় আর পাহাড়।

আমি যে উপত্যকার কথা বলছি সে উপত্যকাটা ঐ পাহাড়গুলো দিয়েই ঘেরা।

সর্দার বলল, আমি আগামী কাল তোমাদের সঙ্গে কিছু পথপ্রদর্শক দেব।

স্পাইক তখন নিশ্চিন্ত হয়ে স্ট্রোন আর গলনালার পাশে বসে কথা বলতে লাগল। সে তার পরিকল্পনাটার কথাটা তুলে বলল, আর দেরী নেই। সেই উপত্যকাটায় একবার গিয়ে পৌছলেই আমরা নিরাপদ হয়ে উঠব।

গলনালা বলল, মোটেই না। স্ট্যানলি আর টারজন তোমাদের খুঁজে বার করবেই।

স্পাইক বলল, আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে ওরা যেতেই পারবে না। সে জায়গা কখনো খুঁজে পাবে না।

সর্দার ওদের পথপ্রদর্শক দেবে যেমন আমাদের দিচ্ছে।

স্পাইক বলল, কিন্তু পথপ্রদর্শকরাও সে জায়গা খুঁজে পাবে না। কারণ আমরা প্রথমে উপত্যকাটায় গিয়েই থেমে থাকব না। আমাদের গন্তব্যস্থানটা আরো ছমাইল পুবদিকে। প্রথম উপত্যকাটায় যাবার পরই পথপ্রদর্শকদের বিদায় দিয়ে এগিয়ে যাব আমরা। আমরা ওদের বলব, আমরা উপকূলের দিকে যাচ্ছি। তারপর ওরা চলে গেলেই আমরা পুবদিক ছেড়ে উত্তর দিক ধরব। তারপর আবার পশ্চিম দিক, তবে আমার গন্তব্যস্থল সেই উপত্যকাটা পাব। তখন আর কেউ খুঁজে পাবে না আমাদের।

গলনালা বলল, তবু স্ট্যানলি আর টারজন তোমাদের খুঁজে বার করবেই।

স্পাইক রেগে গিয়ে বলল, আর ওদের নাম আমার কাছে করো না। ওদের নাম শুনলেই বিরক্তি লাগছে আমার।

স্ট্রোন কিন্তু আজ একবারও গলনালার সঙ্গে কোন কথা বলেনি। সে শুধু বারবার তির্যকদৃষ্টিতে গলনালার দিকে তাকিয়েছে আর গলনালা তার

পানে তাকাতেই সে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছে।

সে রাতে ভাল করে খাওয়ার পর তারা শুতে চলে গেল তাড়াতাড়ি। কিন্তু স্ট্রোন ঘুমোল না। ইচ্ছা করে জেগে কান পেতে রইল। ক্রমে সারা গাঁটা নিশুতি ও নিস্তব্ধ হয়ে উঠল।

স্ট্রোন শুধু ভাবতে লাগল স্পাইক কখন ঘুমিয়ে পড়বে গভীরভাবে। এই স্পাইকই তার সেই মধুর স্বপ্নপূরণের পথে একমাত্র বাধা। তবু সে স্পাইককে ভয় করে। এমন কি সে ঘুমিয়ে থাকলেই তার ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে সে। তাই সে খুন করতে পারে না ঘুমন্ত স্পাইককে।

স্ট্রোন বিছানা থেকে উঠে ঘরের দরজার কাছে এসে দেখল গাঁয়ের সব লোক ঘুমিয়ে পড়েছে। গাঁয়ের ওপারে শূন্য প্রান্তরটা নিবিড় অন্ধকারে ঢাকা।

ঘর থেকে নিঃশব্দে বার হতে গিয়ে একটা রান্নার পাত্রে তার পা লেগে গিয়ে জোর শব্দ হলো। স্পাইকের ঘুমটা সে শব্দে কিছুটা ব্যাহত হলো, কিন্তু ভাঙ্গল না একেবারে। তবে ঘুমটা পাতলা হয়ে গেল তার।

এদিকে গলনালার ঘরের দিকে চুপিসারে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল স্ট্রোন।

গলনালা তখনো ঘুমোয়নি। সে দরজার ওপারে অন্ধকারে তাকিয়ে ছিল শূন্য দৃষ্টিতে। সহসা দরজার কাছে কার চাপা পদশব্দ শুনে চমকে উঠল সে। বুঝতে পারল কে একজন হাতে পায়ে হেঁটে গুঁড়িমেরে তার ঘরে ঢুকছে।

গলনালা ভয়ে ভয়ে বলল, কে তুমি ? কি চাও ?

স্ট্রোন চাপা গলায় বলল, চুপ করো। কোন গোলমাল করো না। কথা আছে।

কণ্ঠস্বরটা চিনতে পেরে গলনালা বলল, এখন চলে যাও। কাল কথা হবে।

স্ট্রোন তেমনি চাপা গলায় বলল, আমার কথা শোন। ওই উপত্যকায় যাবে না তুমি। তুমি নিশ্চয় স্পাইকের সঙ্গে সারা জীবনটা কাটাতে চাও না সেখানে। সেখানে গেলেই সে আমাকে খুন করে একা আধিপত্য করবে তোমার উপর। আমি ওকে জানি। তার থেকে আমার সঙ্গে হীরেটা নিয়ে ইউরোপে চল। আমরা প্যারিসে গিয়ে উঠব।

আমি তোমার সঙ্গে কোথাও যেতে চাই না। চলে যাও এখান থেকে। তা না হলে আমি স্পাইককে ডাকব।

স্ট্রোন তার হাতদুটো বাড়িয়ে গলনালার গলাটা খুঁজতে খুঁজতে বলল, তা যদি করো আমি তাহলে তোমার ঘাড়টা মটকে ভেঙ্গে দেব।

গলনালার গলাটা টিপে ধরল স্ট্রোন। গলনালা স্পাইকের নাম ধরে চীৎকার করে উঠল। সে স্ট্রোনের হাতদুটো তার গলা থেকে সরিয়ে দেবার

চেষ্টা করতে লাগল। সে ছটফট করতে লাগল।

চীৎকার শুনে জেগে উঠল স্পাইক। সে স্ট্রোনের নাম ধরে ডাকতে লাগল। কিন্তু দেখল স্ট্রোন ঘরের মধ্যে তার বিছানায় নেই।

স্পাইক তখন গলনালার ঘরের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু দরজার কাছেই বাধা দিল স্ট্রোন। সে ঘুষি পাকিয়ে গর্জন করতে লাগল। গলনালা ঘরের এককোণে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ওরা দুজনে জড়াজড়ি করে খালিহাতে মারামারি করতে লাগল। গলনালার কেবলি ভয় হতে লাগল, দুজনের একজন মারা গেলে তার নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়ে উঠবে।

ওরা গড়াগড়ি দিতে দিতে ঘরের দরজা থেকে সরে আসতেই গলনালা ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সে গাঁয়ের সর্দারকে জানিয়ে ওদের মারামারি থামাতে বলল।

কিন্তু সর্দার তার যোদ্ধাদের পাঠাবার আগেই ওরা নিজেরাই থেমে গেল।

স্পাইক গুঁড়ি মেরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গলনালা তা দেখে ভাবল স্পাইক নিশ্চয় স্ট্রোনকে খুন করে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। সে তাই ছুটে গিয়ে গাঁয়ের একটা কুঁড়ের মধ্যে আশ্রয় নিল।

দুজনের মধ্যে স্পাইককেই সব সময় বেশী ভয় করত গলনালা। সে-ই বেশী বিপজ্জনক দুজনের মধ্যে। কারণ সে বেশী শক্তিমান এবং দুঃসাহসী। স্ট্রোনের অতটা সাহস বা শক্তি ছিল না তার মত।

কিন্তু আসলে স্ট্রোন মরেনি। পরদিন সকালে গাঁয়ে একটা রাস্তার উপর আহত অবস্থায় পড়ে ছিল স্ট্রোন। তা দেখতে পেয়ে স্পাইক তার কাছে গেল।

স্ট্রোন বলল, কি হয়েছিল, আমার এই অবস্থা হলো কেন?

স্পাইক বলল, তুমি লরীচাপা পড়েছিলে।

কই, আমি ত কোন লরী দেখিনি।

গলনালা যে ঘরে লুকিয়ে ছিল সে ঘর থেকে ওদের দুজনকে দেখতে পেয়ে বেরিয়ে তাদের দুজনের সামনে এসে হাজির হলো।

তাকে দেখে স্ট্রোন বলল, মেয়েটিকে দেখতে আমার বোনের মত মনে হচ্ছে।

স্পাইক দেখল, স্ট্রোন বেশী আহতও হয়নি। তবে তার মাথাটায় হয়ত কোন গোলমাল হয়েছে।

যাই হোক, সেদিন সকালেই কিছু খাওয়ার পর দুজন পথপ্রদর্শককে সঙ্গে নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। স্পাইক চলল আগে আগে। স্ট্রোন গলনালার পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। এক বিহ্বলতার ভাব ছিল তার চোখে।

একসময় স্ট্রোন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাম কি ?

গলনালা বুদ্ধি করে বলল, তোমার বোনের নাম জান না তুমি ?

তোমার নামটা কি বলত। আমার মাথায় সব জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

গলনালা বলল, তোমার বোনের নাম মনে পড়ছে না ?

স্ট্রোন বলল, তুমি আমার বোন। এখানে থাকায় ভালই হবে। কেউ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

স্পাইক যেতে যেতে পথপ্রদর্শকদের সঙ্গে কথা বলতে লাগল।

স্পাইক তার পর গলনালাকে বলল, ওরা আমাদের সঙ্গে যাবে না ? এখনো আমাদের পাঁচ মাইল পথ যেতে হবে আর ওরা আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ওরা বলছে সামনে এক শ্বেতাঙ্গদের দেশ আছে। তারা ওদের ধরতে পারলে ওদের ক্রীতদাস করে রাখবে এবং সিংহের মুখে ফেলে দেবে। তারা আমাদের নিগ্রোভৃত্যদের মনেও ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছে।

গলনালা বলল, চল আমরা ফিরে যাই। কি হবে আর এগিয়ে গিয়ে ? তার থেকে আমায় আমার বন্ধুদের কাছে নিয়ে চল। অজানা দেশে গিয়ে তুমি নিজেই যদি নিহত হও তাহলে গলফান নিয়ে কি হবে ? কিন্তু আমাকে আমার বন্ধুদের কাছে নিয়ে গেলে আমি তাদের বলে গলফানটা তোমায় দিয়ে দেব এবং তোমাকেও ছেড়ে দেওয়া হবে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, তোমার কোন ক্ষতি হবে না। আমি উডকে যা বলব সে তাই করবে।

স্পাইক মাথা নেড়ে বলল, না, তোমাকে আমি ছাড়ব না। আমি যেখানে যাবার ঠিক যাব তোমাকে নিয়ে। তাতে যদি গলফানটা আমায় হারাতে হয় ত হবে।

গলনালা বলল, আমি তোমাকে একটা সুযোগ দিলাম। তুমি বোকা বলে তা গ্রহণ করতে পারলে না।

পথপ্রদর্শকরা চলে গেলে ওরা অজানা পার্বত্য পথে দিনের পর দিন ধরে এগিয়ে চলল। প্রতিদিনই সকাল হলেই স্পাইক ভাবে আজ সে ঠিক তার স্বপ্নের সেই মায়াময় দেশে পৌছে যাবে। প্রতি রাত্রেই সে বলে পরের দিন সে তার গন্তব্যস্থলে পৌছে যাবে।

স্ট্রোনের মানসিক অবস্থা সেই একই রকমের রয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল গলনালা তার বোন। এই ভেবে গলনালার নিরাপত্তা সম্বন্ধে বেশী তৎপর হয়ে উঠল সে।

স্ট্রোন জানে না সে কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। দিনের পর দিন সে শুধু মূক পশুর মত নীরবে পথ হেঁটে যায়। কাউকে কোন প্রশ্ন করে না, কোন কথা বলে না। তবে তার একমাত্র আগ্রহ শুধু গলনালার উপর। তার ধারণা গলনালা তার বোন এবং সে বিপদে পড়েছে। তাই সে একটা

রাইফেল সব সময় তার হাতে রাখে। তাকে রক্ষা করার জন্ত সব সময় বদ্ধপরিকর হয়ে আছে।

এইভাবে বহুদিন ধরে সেই পার্বত্য অঞ্চলে সেই মায়াময় উপত্যকার সন্ধানে এগিয়ে যেতে লাগল স্পাইকরা। অবশেষে একদিন একটা পাহাড়ের উপর একটা ঝর্ণার ধারে বিকালের দিকে শিবির স্থাপন করল ওরা।

তখন বিকাল বেলা। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল পশ্চিম আকাশে। স্পাইক বসেছিল গলনালার পাশে।

স্পাইক বলল, ওটা সূর্য নয়, আগুন। হয়ত ওখানে একটা আগ্নেয়গিরি আছে। আমার মনে হয় আমরা আমাদের সেই আকাঙ্খিত উপত্যকায় এসে গেছি। আমি একবার রাত্রিকালে দক্ষিণ দিক থেকে ঐ আগুনটা দেখেছিলাম। ওখানে আমরা একবার পৌছলেই ওখানে তুমি সংসার পাতবে।

গলনালা কোন উত্তর দিল না। এখন আর সে ভয় করল না স্পাইককে। কারণ সে জানে স্পাইক তার কোন ক্ষতি করতে এলে বা পীড়ন করলে স্ট্রোন খুন করবে স্পাইককে।

সেদিন রাতে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল স্পাইককে। কিন্তু পরদিন যখন সে শুনল তাদের দুজন নিগ্রোভৃত্য তাদের সফরী ছেড়ে চলে গেছে তখন তার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। তবে দেখল গলফানটা নিয়ে যায়নি তারা।

এরপর থেকে স্পাইক গলফানটা কাছে নিয়ে শুত।

সেদিন দুপুরের দিকে একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকা পেল তাদের সামনে। স্পাইক যেদিকে যেতে চাইছিল উপত্যকাটা সেইদিকেই বিস্তৃত। উপত্যকার একদিকে একটা নদী বয়ে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে কিছু কিছু বনঝোপও ছিল। তবে পূব দিকে ছিল একটা বড় আর ঘন বাঁশবন।

একজন নিগ্রোভৃত্য হঠাৎ থেমে কানখাড়া করে কি শুনে বলল, একদল মানুষ আসছে বাওয়ানা।

স্পাইক গলনালার দিকে তাকিয়ে বলল, আমি ত কিছু শুনতে পাচ্ছি না, তুমি পাচ্ছ?

গলনালা বলল, হ্যাঁ, আমি মানুষের গলার শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

স্পাইক বলল, তাহলে পথ থেকে সরে গিয়ে আমরা এক জায়গায় লুকিয়ে থাকতে পারি।

এই বলে সে তাদের সব লোকদের একশো গজ দূরে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেল। তারপর সেখানে থেমে কান পেতে কি শুনতে লাগল। তারা বুঝল আগন্তুকরা সেইদিকেই আসছে।

স্পাইক কোন লুকোবার জায়গা পেল না। তাদের পিছনে যে একটা ঝোপ ছিল তাতে প্রবেশ করা যাবে না, বড় দুর্গম। সামনে উপত্যকাটা

পশ্চিম দিকে একটা পাহাড়ের দিকে চলে গেছে। অবশেষে শেষ উপায় হিসাবে উত্তর দিকে বনটার প্রান্তে সকলকে যেতে বলল স্পাইক। সকলে ছুটতে লাগল সেইদিকে।

পিছন ফিরে তাকিয়ে গলনালা দেখল, আগন্তুকদের যে দলটা উপত্যকার উপর দিয়ে এগিয়ে আসছিল তাদের সামনে ছিল প্রায় বারোজন কৌপীনপরা নিগ্রো। তাদের পিছনে ছিল দুজন অদ্ভুত পোশাকপরা শ্বেতাঙ্গ। তাদের সেই পোশাকের মধ্যে জাঁকজমক ছিল। তাদের পিছনে কিছুদূরে ছিল আরো বিশজন সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গ। তবে তাদের পোশাকে কোন জাঁকজমক ছিল না। তাদের হাতে ছিল বর্শা আর তরবারি। একজন যোদ্ধার হাতে একটা মানুষের রক্তাক্ত কাটা মুণ্ডু ঝোলানো ছিল।

গলনালা বলল, ওরা শ্বেতাঙ্গ। ওরা আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে পারে।

স্পাইক বলল, আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। গলফান আর তোমার নিরাপত্তার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি আমি।

এই বলে গলনালা দলের অন্যদের মত পালাবার চেষ্টা না করে থমকে দাঁড়িয়ে রইল। বলল, তোমার থেকে যে কোন লোকই ভাল আমার কাছে।

স্পাইক চীৎকার করে বলল, বোকামি করো না, চলে এস।

এই বলে সে গলনালার একটা হাত ধরে তাকে টানতে লাগল।

গলনালা স্ট্রোনকে বলল, স্ট্রোন, তুমি আমাকে বাঁচাও।

স্ট্রোন তাদের কিছুটা আগে ছিল। গলনালার ডাকে সে পিছন ফিরে দেখল স্পাইক আর গলনালা ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। স্পাইকের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে গলনালা।

স্ট্রোন তা দেখে রেগে গিয়ে চীৎকার করে স্পাইককে বলল, ছেড়ে দাও ওকে, আমার বোনকে ছেড়ে দাও।

বলতে বলতে স্পাইকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল স্ট্রোন। দুজনে পরস্পরকে কিল, চড়, ঘুষি মারতে লাগল।

প্রথমে কি করবে তা ভেবে পেল না গলনালা। তারপর সে অগ্রসরমান যোদ্ধাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এগিয়ে গেল কিছুটা। আসলে সে স্পাইকের কাছ থেকে মুক্তি পেতে চাইছিল। সে দেখল যোদ্ধারা তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। দেখল সামনের সারির নিগ্রোদের দুজন একটা সিংহকে ধরে আছে।

গলনালা দেখল সহসা আগন্তুক দলের একজন যোদ্ধা থমকে দাঁড়িয়ে উপত্যকার একদিকে হাত বাড়িয়ে কি দেখাল। তখন তাদের সকলেই তাদের পথ থেকে অন্য দিকে ছুটতে লাগল। চামড়ার দড়িবাঁধা সিংহটাকে

টানতে টানতে নিয়ে যেতে লাগল তারা।

গলনালা ওদের পালাবার কারণ খুঁজতে গিয়ে যোদ্ধাটা যে দিকে হাত বাড়িয়ে দেখিয়েছিল সেদিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় একশোটা হাতি পিঠে কয়েকজন করে যোদ্ধাকে নিয়ে এই দিকেই এগিয়ে আসছে। এদিকে তার পায়ের কাছে তখন স্ট্রোন আর স্পাইক মারামারি ও ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল ভয়ঙ্করভাবে।

১৫

স্পাইকরা যেখানে তাদের পথপ্রদর্শকদের ছেড়ে দিয়ে একটি পথ ধরে এগিয়ে চলতে থাকে স্ট্যানলি উড ছজন ওয়াজিরি যোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে সেই পথই ধরে।

সেই পথ ধরেই স্পাইকদের মত তারাও সেই উপত্যকাটায় গিয়ে পড়ে। উডরা উপত্যকায় কিছুটা যাবার পর দেখল পথের রেখাটা মিলিয়ে গেছে। শুধু ঘাসের উপর অসংখ্য হাতির পায়ের এলোমেলো দাগ দেখতে পেল।

উড হতবুদ্ধি হয়ে গেল। ভাবল আজ টারজন থাকলে অনায়াসে পথ খুঁজে পেত।

এমন সময় হঠাৎ একজন ওয়াজিরি উডকে একদিকে দেখাল, একটা নগর দেখা যাচ্ছে বাওয়ানা।

সেদিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল উড। দেখল, খড়ের চালওয়ালা কতকগুলো কুঁড়েঘরের সমন্বয়ে গড়া কোন গাঁ নয়। সাদা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সোনার গম্বুজ ও চূড়াওয়ালা অসংখ্য প্রাসাদ আর অট্টালিকায় ভরা এক মনোরম নগর।

উড সেই ওয়াজিরিদের জিজ্ঞাসা করল, এ কোন্ নগর?

আমি ওদিকে কোনদিন যাইনি বাওয়ানা তাই ঠিক জানি না।

অন্য একজন ওয়াজিরি যোদ্ধা বলল, মেমসাহেব বোধ হয় ঐ নগরেই আছে বাওয়ানা।

উড বলল, হয়ত আছে। কিন্তু ওখানকার লোকগুলো কেমন হবে তা জানি না। যদি শত্রুভাবাপন্ন হয় তাহলে সেখানে গেলেই তারা আমাদের সবাইকে বন্দী করবে।

ওয়াজিরি যোদ্ধারা বলল, আমরা ওয়াজিরি, আমাদের সবাইকে বন্দী করতে পারবে না। আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমরা ভয় পাইনি।

উড একজন যোদ্ধার ঘাড়ে হাত রেখে বলল, আমি জানি, তোমরা সাহসী

বীর যোদ্ধা। তোমাদের বড় বাওয়ানার বন্ধুর জন্য তোমরা সব কিছু করতে পার। নরকে পর্যন্ত যেতে পার। কিন্তু আমি তোমাদের এইভাবে বলি দিতে পারব না। তোমরা বরং ফিরে গিয়ে টারজনকে খবর দাও। সে যা হয় ব্যবস্থা করবে। টারজন না থাকলে মুজিরোকে বলবে।

ওয়াজিরিরা বলল, আপনি বরং আমাদের মধ্য থেকে একজনকে খবর দিতে পাঠিয়ে দিন।

কিন্তু উড তা শুনল না। বলল, না, আমি যা বলছি শোন; এটা আমার আদেশ। তোমাদের তা মানতে হবে।

ওয়াজিরি যোদ্ধারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলে গেল। উড তখন একা পা চালিয়ে দিল সেই স্বর্ণনগরীর পথে।

এদিকে টারজন তখন সেই ওন্থার উপত্যকার একধারে একটি উঁচু মালভূমির একটি প্রান্ত থেকে সেই স্বর্ণনগরী ক্যাথনির দিকে তাকিয়ে ছিল। নগরদ্বারের কাছে যে একটা নদী ছিল তার উপর একটা সোনার সেতু চকচক করছিল সূর্যের আলোয়।

কিন্তু ওই স্বর্ণনগরী অজানা নয় টারজনের। ও নগরে একদিন বন্দী ছিল সে। তারপর সেখানকার রাজনৈতিক উত্থানপতনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে। স্বর্ণনগরী ক্যাথনি থেকে কিছু দূরে এ্যাথনি নামে আর একটা নগর আছে। সেখানকার সব কিছু হাতির দাঁত দিয়ে বাঁধানো অথবা নির্মিত। তাই বলা হয় ক্যাথনি যেমন স্বর্ণনগরী তেমনি এ্যাথনি হচ্ছে হাতির দাঁতের নগরী।

এই দুই নগরীর অধিবাসীদের মধ্যে এক তীব্র বিরোধ ও শত্রুতা চলে আসছে। সুযোগ পেয়ে এক নগরের লোকেরা আক্রমণ করে অন্য নগরের লোকদের। ক্যাথনির যোদ্ধারা পোষমানা সিংহদের গলায় দড়ি ধরে ঘুরে বেড়ায় আর এ্যাথনির যোদ্ধারা হাতির পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়।

টারজন ভাবল একদিন সে নগরে বন্দী থাকলেও আজ সে নগরীতে আর শত্রু নেই তার। কারণ তার প্রধান শত্রু রাণী নেমোনি আজ আর নেই। আলেক্সটার নামে তার নিজের যে ভাইকে কারাগারে বন্দী করে রাখে রাণী নেমোনি সেই ভাইই আজ রাজা হয়েছে এবং কোর্সো, যুডো, জেমনন নামে টারজনের অন্তরঙ্গ বন্ধুরাই তাকে রাজা করে। তার সেই সব বন্ধুরা আজও আছে সে নগরীতে। রাণীর প্রধান পরামর্শদাতা কুখ্যাত তোমো হয়ত এতদিনে নিহত হয়েছে। তাকে আর ভয় করার কিছু নেই।

এই ভেবে সাহসের সঙ্গে উপত্যকাটা পার হয়ে নগরদ্বারে উপস্থিত হলো টারজন। নগরদ্বারের দুধারে দুটো সোনার সিংহের মূর্তি দাঁত বার করে দাঁড়িয়েছিল। প্রহরীরা টারজনকে এগিয়ে আসতে দেখে আগেই চিনতে

পেরেছিল।

নগরদ্বারের কাছে এসে টারজন থামতেই অভ্যর্থনা জানাল তাকে।

প্রহরীদের ক্যাপ্টেন টারজনকে সঙ্গে করে রাজপ্রাসাদের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। সে পথে টারজনকে বলল, রাজা আলেক্সটার আপনি ফিরে এসেছেন দেখে খুশি হবেন। কারণ আপনার চেষ্টাতেই তিনি রাজা হতে পেরেছেন এবং আজও জীবিত আছেন। আপনি এইখানে অপেক্ষা করুন। আমি আলেক্সটারকে খবর দিচ্ছি।

সোনা ও হাতির দাঁতের কারুকার্যখচিত একটা ঘরে অপেক্ষা করতে লাগল টারজন। অনেকক্ষণ পর ক্যাপ্টেন ফিরে এল সেই ঘরে। তার মুখটা ছিল বিষণ্ণ এবং তার সঙ্গে ছিল কুড়িজন যোদ্ধা। তাদের সকলের হাতেই বর্শা ছিল।

ক্যাপ্টেন বিষাদগম্ভীর মুখে বলল, আমি দুঃখিত টারজন, আলেক্সটার আমাকে আপনাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম দিয়েছেন।

টারজন দেখল কুড়িটা বর্শা তাকে ঘিরে আছে। আলেক্সটারের অকৃতজ্ঞতায় সে বিস্মিত ও মর্মাহত হলেও বাইরে সে বিস্ময়ের বা বিহ্বলতার ভাবটা প্রকাশ করল না।

যোদ্ধারা টারজনের সব অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাকে রাজপ্রাসাদের দোতলার একটা ঘরে নিয়ে গেল। টারজন দেখল এই ঘরটা বড় এবং তাতে আলো বাতাস আছে। আগের বারে সে যখন বন্দী ছিল এখানে তখন তাকে একটা অন্ধকার ঘরে রাখা হয়েছিল। সে ঘরে কোন আলো বাতাস ছিল না। তখন সে ক্ষোবেগ নামে আর একজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর সঙ্গে বন্দী ছিল সেই ঘরে।

যোদ্ধারা ঘরের দরজাটা বন্ধ করে চলে গেলে টারজন একটা খোলা জানালার ধারে গিয়ে বাইরে উঠোনের দিকে তাকিয়ে কি দেখতে লাগল। তারপর একটা বেঞ্চের উপর শুয়ে পড়ে কোন বিপদের কথা চিন্তা না করেই ঘুমিয়ে পড়ল।

রাত্রির অন্ধকার বাইরে ঘন হয়ে উঠলে টারজনের ঘরের দরজা খুলে একজন ঘরে ঢুকল। তার হাতে ছিল একটা জলন্ত মশাল। সে ঘরে ঢুকে তার পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর সে টারজনের কাছে এসে তার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে টারজনের প্রতি তার বন্ধুত্ব ও আনুগত্যের কথা জানাল।

টারজন তাকে চিনতে পেরে বলল, তোমাকে দেখে খুশি হলাম জেমনন। ডোরিয়া আর তার বাবা মা ভাল আছে ত? তোমার বাবা ফোর্ডোই বা কেমন আছেন?

জেমনন বলল, তারা সবাই ভাল আছে, কিন্তু কেউ সুখে নেই। তোমার প্রতি যে আচরণ করা হয়েছে তার থেকে তুমি অনুমান করতে পেরেছ রাজ্যের অবস্থা কি চলছে।

টারজন বলল, বুঝতে পারছি কিছু একটা ঘটেছে। কিন্তু কি তা জানি না।

শীঘ্রই সব বুঝতে পারবে। দেশের অবস্থা সত্যিই দুঃখজনক।

মানুষই হচ্ছে সব পশুদের মধ্যে জঘন্য এবং নিকৃষ্ট। যেখানেই মানুষ আছে সেখানেই যত দুঃখ। কিন্তু এখানে কি ঘটেছে? আমি ত ভেবেছিলাম নেমোনির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব অশান্তির অবসান ঘটেছে।

আমরাও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু আমাদের সে ধারণা ভুল। আলেক্সটার অকৃতজ্ঞ, কাপুরুষ এবং দুর্বলমনা। রাজা হওয়ার পরই সে তোমোর প্রভাবের অধীন হয়ে পড়ে। এর ফল কি হতে পারে তা জান তুমি। আমরা সকলেই তার কুনজরে পড়ে আছি। আসলে তোমোই হচ্ছে এ রাজ্যের প্রকৃত শাসক। তবু জনগণ আমাদের ভালবাসে বলে গণ-বিক্ষোভের ভয়ে আমাদের মেরে ফেলতে সাহস পায় না ওরা।

এরপর জেমনন বলল, কিন্তু তোমার খবর কি? তুমি আবার ক্যাথনিতে ফিরে এলে কি করে?

টারজন বলল, সে এক দীর্ঘ কাহিনী। একটি কুমারী মেয়ে আর তার প্রেমিক আমার হেফাজতে ছিল। তারা বাড়ির পথে রওনা হলে মেয়েটিকে দুজন শ্বেতাঙ্গ চুরি করে নিয়ে যায়। আমি একথা জানতে পারার পর মেয়েটির খোঁজে বেরিয়েছিলাম। যারা মেয়েটিকে নিয়ে পালিয়ে যায় তাদের সফরী থেকে চলে যাওয়া দুজন নিগ্রোর সঙ্গে অনেকদিন আগে আমার দেখা হয়। তারাই আমাকে এদিকে আসতে বলে।

জেমনন বলল, আর তোমাকে বেশী খুঁজতে হবে না। আমি জানি মেয়েটি কোথায় আছে। তবে এখন তুমি তোমোর বন্দী। সুতরাং তা জেনেও কোন লাভ হবে না তোমাদের কারো।

টারজন বলল, কি করে জানলে মেয়েটি কোথায় আছে?

জেমনন বলল, আলেক্সটার আমাকে প্রায়ই থেনার উপত্যকায় এ্যাথনির লোকদের আক্রমণ করার জন্য পাঠায়। সে চায় এইভাবে আমার মৃত্যু ঘটুক। যে সব সামন্তকে সে ভয় করে তাদেরও পাঠায় সে। সম্প্রতি আমি এই ধরনের এক অভিযানে গিয়েছিলাম। আমরা সংখ্যায় বেশী ছিলাম না বলে আমাদের অভিযান সফল হয়নি তেমন। শুধু শত্রুদের একটা মাথা নিতে পেরেছিলাম। আসার সময় পথে আমরা এ্যাথনির একদল লোককে হাতির পিঠে চড়ে আসতে দেখি। সেই সময় উপত্যকায় একদল লোককে দেখি। সে

দলে তুজন শ্বেতাঙ্গ, একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলা আর চার পাঁচজন নিগ্রোভৃত্য ছিল। আমরা দেখলাম শ্বেতাঙ্গ তুজন মারামারি করছে আর মেয়েটি পালাতে চাইছে। আমাদের দেখতে পেযে মেয়েটি ছুটে আসতে থাকে সাহায্যের জন্ম। আমরা তাদের সকলকে হয়ত বন্দী করে আনতাম। কিন্তু তখন আমরা এ্যাথনির যোদ্ধাদের ভয়ে পালিয়ে আসতে ব্যস্ত থাকায় নজর দিতে পারিনি তাদের দিকে। আমার মনে হয় এ্যাথনির যোদ্ধারা তাদের বন্দী করে নিযে গেছে। কিন্তু তুমি তা জেনে এখন কি করবে? তুমি এখন তোমোর কবলে পড়েছ।

টারজন বলল, এখন তোমো আমাকে নিযে কি করবে? আবার কোন ফোবেগকে সে বন্দী করেছে নাকি?

জেমনন হো হো শব্দে হেসে উঠল। সে বলল, তুমি যেভাবে সেই কুস্তি প্রতিযোগিতায় ক্যাথনির সবচেয়ে বলবান লোকটাকে ছুঁড়ে দর্শকদের কোলের কাছে ফেলে দাও তা কখনো ভুলব না আমি। সে পরাজয় ছিল তোমোর পরাজয় কারণ সে বাজীতে হেরে যায়। তার উপর তার রাগের এও একটা কারণ। এবার হয়ত কোন মানুষ নয়, একটা সিংহের মুখে ফেলে দেবে তোমায়। আবার হয়ত বা বিষ খাইয়ে বা ছুরিকাঘাতেও তোমাকে হত্যা করা হতে পারে। কারণ তাহলে তোমার মৃত্যুর ব্যাপারটা আরও নিশ্চিত হয়ে উঠবে। যাই হোক, আজ রাত্রিতে আমি তোমার কাছে এসেছি তোমাকে বাঁচাবার জন্ম। রাতের প্রহরীদের ক্যাপ্টেন আমার বন্ধু বলে আমি আসতে পেরেছি তোমার কাছে। কিন্তু আমার কোন পরিকল্পনা নেই। তুমি যদি এই ঘরের দরজা খুলে রেখে পালিয়ে যাও তাহলে তার জীবন বিপন্ন হবে। তুমি অবশ্য একটা পরিকল্পনা খাড়া করতে পার।

টারজন বলল, আগে আমাকে তোমোর পরিকল্পনার কথা জানতে হবে। এখন আমার কথা হলো তুমি আমার ঘর থেকে চলে যাও এই মুহূর্তে। কেউ দেখে ফেলতে পারে।

জেমনন বলল, আমি কি তোমার জন্ম কিছুই করতে পারি না? তুমি আমার জন্ম কত করেছিলে।

টারজন বলল, তুমি শুধু তোমার ছোরাটা আমাকে দিয়ে যাও। আমি আমার কৌপীনের নীচে সেটা লুকিয়ে রাখব।

জেমনন ঘর থেকে চলে গেলে আবার ঘুমিয়ে পড়ল টারজন। বন্য পশুর মতই সকল অবস্থাতেই নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বিগ্ন সে।

১৬

টারজনকে মৃত্যুদণ্ড দান করেছে আলেক্সটার। তোমোর পরামর্শেই এই দণ্ডের বিধান করেছে সে।

তখন বেলা এগারটা বাজে। সূর্য উজ্জ্বলভাবে কিরণ দিচ্ছিল আকাশে। প্রহরীরা রাজার আদেশে ঘর থেকে বার করে আনল টারজনকে। সকাল থেকে খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হয়নি তাকে। তার দারুণ পিপাসা পেয়েছিল। কিন্তু প্রহরীদের কাছে জল চাইলে তারা দেবে না। সে কিছুই চাইল না।

টারজনকে শৃংখলিত অবস্থায় প্রহরীরা প্রাসাদপ্রাঙ্গণ পার হয়ে রাজপথে নিয়ে গিয়ে থামল। রাস্তার দুধারে জনতা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। সেখান থেকে এক মিছিল বার হয়ে নগরের বাইরের এক প্রান্তরে যাবে। মিছিলের সামনে ছিল রাজ্যের সামন্ত ও যোদ্ধারা, তারপর ছিল সিংহটানা রাজার রথ আর তারপরে কয়েকজন নিগ্রো একটা সিংহকে গলবদ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছিল।

এ মিছিল আগেও একবার দেখেছিল টারজন। তখন রাণী নেমোনির শাসনকাল ছিল এবং রাণীর কোপদৃষ্টিতে পড়েছিল সে। মিছিলটা যখন নগরদ্বার অতিক্রম করে সিংহপ্রান্তরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ধীর গতিতে তখন আগের বারের মত এবারেও সেই একইভাবে মিছিলের পিছু পিছু এগিয়ে যেতে লাগল সমবেত জনতা। টারজনকে রাজার রথের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল শিকল দিয়ে।

সিংহপ্রান্তরে মিছিলটা পৌঁছলে টারজনের শিকল খুলে দেওয়া হলো। শিকল বাঁধা শিকারী সিংহটাকে কখন খুলে দেওয়া হবে, কখন সে সিংহ বন্দীর দেহটাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে সে দৃশ্য দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠল জনতা। রাজা আলেক্সটারের চোখে মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। তার বয়স তিরিশের কাছাকাছি। টারজন দেখল মুখখানা নিষ্ঠুরতায় ভরা।

আলেক্সটার একসময় বলল, তাড়াতাড়ি করো, আমার ভাল লাগছে না।

রাজার আদেশে আসল অনুষ্ঠানের জন্য সবাই তাড়াহুড়ো করতে লাগল। তাড়াতাড়ি এক ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে গেল। শিকারী সিংহটাকে যে নিগ্রোটা ধরে ছিল হঠাৎ তার হাত থেকে শিকলটা পড়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে সিংহটা গর্জন করতে করতে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বর্শাধারী যোদ্ধাদের আক্রমণ করল। নিরস্ত্র জনতা প্রাণভয়ে পালাতে লাগল।

চারদিকে বিরাট গোলমাল ও হৈ চৈ শুরু হয়ে গেল। সামন্তরা বিব্রত হয়ে পড়ল। তখন রথের উপর দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছিল আলেক্সটার। সে চীৎকার

করে বার বার বলতে লাগল, যে এই সিংহটাকে মারতে পারবে তাকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে। সে যা চায় তাই দেওয়া হবে।

কিন্তু সবাই তখন নিজের জীবন নিয়ে ব্যস্ত। কেউ তার কথায় কান দিল না।

তার প্রধান পরামর্শদাতা তোমোও তখন পালিয়ে গেছে সেখান থেকে। আলেক্সটার পালাতে পারল না, কারণ সিংহটা তখন যোদ্ধাদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল। বর্শার ঘা খেয়ে আরও উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল সে।

আলেক্সটার কিন্তু পালাতে পারল না।

সহসা মুখ ঘুরিয়ে রথের উপর দাঁড়িয়ে থাকা আলেক্সটারকে লক্ষ্য করে ছুটে আসতে লাগল সিংহটা। এবার সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গেল আলেক্সটার। অথচ পালাবার কোন উপায় নেই, কোন পথ নেই। ভয়ে হিম হয়ে গেল তার পায়ের রক্ত।

আলেক্সটারের কয়েকজন দেহরক্ষী শুধু সিংহটাকে বর্শা দিয়ে আক্রমণ করল। আর সবাই পালিয়ে গেছে। আর আছে শুধু বন্দী টারজন।

এমন সময় বন্দী তার পরনের কৌপীনের ভিতর থেকে একটা ছোরা বার করে রথের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া সিংহটাকে আক্রমণ করল। সিংহটা তাকে লক্ষ্য করে একটা জোর লাফ দিতেই টারজন বসে পড়ে পিছন থেকে সিংহটার পিঠে চেপে পড়ে তার কেশর ধরে ফেলল। সিংহটার মত টারজন অদ্ভুতভাবে একধরনের গর্জন করতে লাগল। সে তার ছুরিটা সিংহটার বুকে পাঁজরে পিঠে বারবার বসিয়ে দিতে লাগল।

আলেক্সটার আশ্চর্য হয়ে দেখতে লাগল একবার টারজন সিংহটার পিঠে আর একবার সিংহটা টারজনের পিঠে চেপে দুজনেই গড়াগড়ি দিতে লাগল। তবে টারজন বারবার ছুরিটা বসাতে লাগল সিংহটার ঘাড়ে।

এদিকে রাজার দেহরক্ষীরা লড়াইরত টারজন ও সিংহটাকে চারদিকে ঘিরে বর্শাহাতে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু টারজনকে বাদ দিয়ে সিংহটার গায়ে বর্শা দিয়ে আঘাত করার কোন সুযোগই পাচ্ছিল না তারা।

অবশেষে আপনা থেকে অবশ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সিংহটা। টারজন তার মৃতদেহের উপর একটা পা রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে বাঁদর-গোরিলাদের মত এমন অদ্ভুতভাবে চীৎকার করল যা শুনে ভয় পেয়ে গেল আলেক্সটার। আগে সে সিংহটাকে ভয় করছিল এখন তার ভয় এই লোকটাকে। তার মনে হলো এ লোক সিংহের থেকেও ভয়ঙ্কর। এ নিশ্চয় তাকে একদিন খুন করবে।

একজন সামন্ত আলেক্সটারকে জিজ্ঞাসা করল, এখন কি করব একে নিয়ে ?

আলেক্সটার বলল, ওকে নিয়ে যাও। ওকে মেরে ফেল ।

সামন্ত বলল, কিন্তু ও আপনার জীবন রক্ষা করেছে।

আলেক্সটার বলল, এখন নিয়ে যাও। ঘরে আটক করে রাখ। পরে যা হয় করা যাবে। এখন দেখছ না, আমি কত ক্লান্ত। এখন আমাকে বিরক্ত করো না।

সামন্ত রক্ষীদের টারজনকে আবার সেই কারাকক্ষে নিয়ে যেতে বলল। আলেক্সটারের কথায় সে নিজেই লজ্জিত হলো। সেও বন্দী টারজনের সঙ্গে প্রাসাদের দিকে যেতে লাগল। পথে সে টারজনকে বলল, তুমি যা করেছ তার জন্য এর থেকে অনেক বড় পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল।

টারজন বলল, আমি নিজে শুনেছি রাজা বলেছিল সিংহটাকে কেউ মারতে পারলে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে তাকে। সে যা চাইবে তাই দেওয়া হবে।

হ্যাঁ আমিও শুনেছি।

আমার মনে হয় উনি তা ভুলে গেছেন।

কিন্তু তুমি কি চাইতে?

কিছুই না।

সামন্ত বিস্মিত হয়ে বলল, সেকি! কিছুই না?

শত্রুর কাছ থেকে আমি কিছুই চাই না।

সামন্ত বলল, আমার কাছে বলতে পার, আমি ত তোমার শত্রু নই।

আমি সকাল থেকে কোন খাদ্য বা পানীয় পাইনি।

তুমি দুটোই পাবে।

টারজনকে এবার রাজপ্রাসাদের অন্য একদিকের দোতলায় রাস্তার দিকের একটি ঘরে রাখা হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে একজন যোদ্ধা দরজা খুলে ঘরে ঢুকে টারজনকে খাবার দিয়ে গেল।

যোদ্ধাটি বলল, সিংহের সঙ্গে তোমার লড়াই আমি নিজের চোখে দেখেছি। আমি রাণী নেমোনির সামনে ফোবেগের সঙ্গে তোমার লড়াইও দেখেছিলাম। ফোবেগকে তুমি হারিয়ে দিয়েছিলে। তাকে তুমি তখন মেরে ফেলতে পারতে। জনতা তাকে মারবার জন্য বারবার উত্তেজিত করছিল তোমায়। তবু তাকে তুমি মারনি।

টারজন বলল, ফোবেগ এখনো বেঁচে আছে?

হ্যাঁ, সে এখন মন্দিরে রক্ষীর কাজ করছে।

তাকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।

যোদ্ধাটি এবার টারজনের কাছে এসে তার কানে কানে বলল, কোন মদপান করবে না এখানে। আর কোন ঘরে ঢুকলে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়াবে।

টারজন ভেবে দেখল যোদ্ধাটি তাকে ঠিক পরামর্শ দিয়েছে। মদের সঙ্গে ওরা বিষ মিশিয়ে দিতে পারে আর তাকে পিছন থেকে মারার জন্ত কোন আততায়ীকে পাঠাতে পারে। সে বুঝল ক্যাথনির যোদ্ধাদের মধ্যে তার অনেক বন্ধু আছে।

টারজন এবার রাস্তার দিকের জানালার ধারে এসে দেখল রাজপথের মাঝখান দিয়ে একটা সিংহ হেঁটে চলেছে। সে পথচারীদের কাউকে আক্রমণ করছে না বা কারো দিকে তাকাচ্ছে না। এ সিংহটা ক্যাথনির পোষা সিংহগুলোর মধ্যে অন্ততম। মাঝে মাঝে এদের জীবজন্তুর মাংসের সঙ্গে মরা মানুষ খেতে দেওয়া হয়। কিন্তু এরা জীবন্ত মানুষ খায় না।

টারজন দেখল, রাজপথের ওধারে একদল লোক জড়ো হয়ে কি বলাবলি করছে। তারা মাঝে মাঝে রাজপ্রাসাদের দিকে তাকাচ্ছে। অনেক পথচারী পথ দিয়ে যেতে যেতে সেই ভিড়ের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে সমবেত জনতার সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। যে যোদ্ধা তাকে খাবার দিয়ে যায় একটু আগে সে জনতার কাছে গিয়ে তাদের কি বলতে জনতা যে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল টারজন সেদিকে তাকিয়ে অভিনন্দন জানাল তাদের।

টারজন দেখল জনতার ভিড ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। চারদিক থেকে বহু লোক এসে যোগ দিচ্ছে সেই জনতার সঙ্গে। তাদের মধ্যে অনেক যোদ্ধাও ছিল। অন্ধকার হয়ে উঠলে অনেকে মশাল হাতে ছোটাছুটি করতে লাগল। তারা প্রাসাদের সামনে এসে জড়ো হতে লাগল।

প্রাসাদ থেকে একজন সামন্তর অধীনে একদল যোদ্ধা এসে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করল। কিন্তু জনতা চীৎকার করে বলে উঠল, টারজনকে ছেড়ে দাও। তাকে মুক্ত করে দাও।

বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক হাতের জলন্ত মশালটা নাড়িয়ে চীৎকার করে উঠল, ধিক আলেক্সটারকে। তার লজ্জা হওয়া উচিত।

টারজন চিনতে পারল লোকটি হলো ফোবেগ।

এরপর রাজার যোদ্ধাদের সঙ্গে বিক্ষুব্ধ জনতার মারামারি শুরু হয়ে গেল। অনেকের মাথা ভাঙল। অনেকে আহত হলো। রাজার যোদ্ধারা হেরে গিয়ে প্রাণ নিয়ে কোনরকমে পালিয়ে গেল প্রাসাদের মধ্যে।

গোটা রাজপথ তখন উত্তাল হয়ে উঠেছে বিক্ষুব্ধ জনতার ভিড়ে। প্রাসাদের সামনে গেটের উপর করাঘাত করতে জনতা ধ্বনি দিতে লাগল, তোমো নিপাত যাক। তোমোর মৃত্যু চাই।

এমন সময় জনতার মধ্য থেকে একজন লোক বলল, আলেক্সটার শিকারী সিংহদের ছেড়ে দিয়েছে আমাদের মারার জন্ত। আলেক্সটার নিপাত যাক।

টারজন দেখল প্রাসাদের আস্তাবল থেকে পঞ্চাশটা শিকারী সিংহকে

দড়ি ধরে তাদের রক্ষীরা এগিয়ে আসছে জনতার দিকে। এদিকে জনতার ক্ষোভ তখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। তারা তবু ছুটে পালাল না সিংহদের ভয়ে। তারা সমানে ধ্বনি দিতে লাগল টারজনের মুক্তির জন্য।

টারজন তখন আর চুপ করে থাকতে পারল না। তারই জন্য এতগুলি লোক জীবন বিপন্ন করে লড়াই করছে অথচ তাদের জন্য কিছুই করতে পারবে না সে। না, সে আর কিছুতেই দাঁড়িয়ে থাকবে না চুপ করে।

তাই সে গর্জন করে জানালার গরাদগুলো ভেঙ্গে দেখল, জানালার নিচে উঠোনটা একেবারে খালি। উঠোনের বাইরেই রাজপথ। রাজপথে সমবেত জনতার দিকে সিংহগুলোকে নিয়ে তাদের রক্ষীরা এগিয়ে আসছে।

টারজন জানালা থেকে উঠোনটায় নেমে পিছনের দরজা দিয়ে সোজা জনতার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। জনতার মধ্য থেকে কয়েকজন তাকে চিনতে পেরে ধ্বনি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানাল।

টারজন বলল, যাদের হাতে মশাল আর বর্শা আছে তারা সামনে এগিয়ে এস।

এই বলে সে নিজে একটা মশাল ধরে কয়েকজনকে মশাল নিয়ে তার সঙ্গে সিংহগুলোর মুখের কাছে যেতে বলল। অন্যান্য জন্তুদের মত সিংহরাও আগুনকে ভয় করে। মুখের কাছে জ্বলন্ত মশালের আঁচ পেয়ে সিংহগুলো পিছিয়ে যেতে লাগল। তাদের রক্ষীরাও পিছু হটতে লাগল।

জনতা এবার অধৈর্য হয়ে প্রাসাদের মধ্যে ঢুকতে চাইল। টারজন তাদের বলল, থাম, সিংহগুলোকে আগে চলে যেতে দাও। তারপর আমি আলেক্সটার আর তোমোর কাছে যাব।

ফোবোগ এগিয়ে এসে বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

টারজন জনতাকে বলল, আমরা সামনের গেট দিয়ে নয়, পিছনের দরজা দিয়ে যাব। তোমরাও আমাদের সঙ্গে চল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাসাদের মধ্যে ঢুকে টারজন দেখল একটি ঘরের মধ্যে রাজা আলেক্সটার কয়েকজন সামন্তের সঙ্গে নৈশভোজন করছিল। বিক্ষুব্ধ জনতার ধ্বনি ক্রমাগত শুনতে শুনতে ভয় পেয়ে গিয়েছিল সে। তার উপর শিকারী সিংহরা জ্বলন্ত মশালের তাড়া খেয়ে পালিয়ে এসেছে শুনে আরো ভয় পেয়ে গেছে সে। তোমো তাকে বোঝাচ্ছিল সিংহরা পালালেও প্রাসাদের যোদ্ধারা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেবে। জনতা কিছুতেই পেরে উঠবে না আমাদের যোদ্ধাদের সঙ্গে।

আলেক্সটার বলল, তোমার জন্যই এমন হলো তোমো। সব তোমারই দোষ। তুমি ঐ বুনো লোকটাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখতে বলেছিলে। তার ফলে কি হলো দেখ। জনগণ আমাকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করতে

চাইছে। এখন কি করব ?

আলেক্সটারের মত তোমোও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। জনতাও তার মৃত্যু চায়—এই ধ্বনি সে নিজের কানে শুনেছে।

তোমো তাই একটা পরিকল্পনা খাড়া করে বলল, ঠিক আছে, বুনো লোকটাকে এখানে আনাও। তাকে মুক্তি দিয়ে কিছু টাকা দিয়ে দাও। তারপর জনতাকে একথাটা জানিয়ে দাও লোক মারফৎ।

আলেক্সটার সেইমত আদেশ দিল তার লোকদের।

তোমো বলল, তারপর অবশ্য আমরা এককাপ মদপান করতে দিতে পারি লোকটাকে।

সঙ্গে সঙ্গে টারজনকে উপরতলা থেকে আনার জন্য একজন সামন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু ঘরের দরজা খুলে বারান্দায় বেরোতেই সে দেখল টারজন দাঁড়িয়ে আছে। সে তাদের কথা শুনছিল।

সামন্ত ফিরে এসে ঘরে ঢুকে আলেক্সটারকে জানাল, টারজন এসে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে টারজন ঘরে ঢুকে পড়ল। তার পিছু পিছু ফোবেগ ও জনতার একটি অংশ ঘরে ঢুকে পড়ল।

তাদের দেখে আলেক্সটার, তোমো ও সামন্তরা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আলেক্সটার ও তোমো দুজনে পালাবার চেষ্টা করছিল ভিতরের দরজা দিয়ে। কিন্তু টারজন এগিয়ে গিয়ে ধরে ফেলল তাদের।

কোন সামন্তই তরবারি কোষমুক্ত করে এগিয়ে এল না আলেক্সটারের সাহায্যে। তারা সকলেই তাকে ছেড়ে চলে গেল।

আলেক্সটার টারজনের সামনে নতজানু হয়ে তার জীবন ভিক্ষা করতে লাগল। সে বলল, তুমি বিশ্বাস করো, কিছুক্ষণ আগেই আমি আদেশ দিয়েছি তোমাকে মুক্ত করে দেবার জন্য। তোমাকে এখানে এনে অনেক ধনরত্ন দিতাম। তোমার জন্য একটি প্রাসাদ, দাসদাসী এবং অনেক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিতাম।

টারজন বলল, একথা সেই সিংহপ্রান্তরে তোমার ভাবা উচিত ছিল। তোমার দান আমি গ্রহণ করি বা না করি, জনগণ অন্ততঃ এভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত না।

আলেক্সটার বলল, তাহলে এখন আমাকে নিয়ে কি করতে চাও তোমরা ?

টারজন বলল, তোমার প্রজারা কি করবে তা জানি না, তবে যুডোকে যদি তারা রাজা না করে তাহলে ভুল করবে।

টারজন জানত সামন্তদের মধ্যে যুডোই রাজা হবার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। সে অভিজাতবংশীয়। ভদ্র, উদার এবং মার্জিত স্বভাব। জনগণ তাকে ভালবাসে।

টারজনের মুখ থেকে যুডোর নাম শুনে তার নামে সমর্থনের ধ্বনি দিতে লাগল জনগণ।

তা শুনে আলেক্সটারের মুখখানা ভয়ে সাদা হয়ে গেল। সে তখন ধীর পায়ে তোমোর কাছে গিয়ে বলল, তুমিই আমার এই সর্বনাশ করলে। আমার বোনের আমলে তুমি আমাকে চক্রান্ত করে বছরের পর বছর ধরে কারাগারে বন্দী করে রাখ। তুমিই আমার বোনের জীবন মাটি করে দাও। আমার জীবনকেও কুপরামর্শ দিয়ে মাটি করে দিয়েছ। তোমার জন্যই আমি সিংহাসন হারালাম। কিন্তু আর তুমি কারো সর্বনাশ করতে পারবে না।

এই বলে সে মুহূর্তের মধ্যে খাপ থেকে তরবারি খুলে এত তাড়াতাড়ি এবং এত জোরে তোমোর মাথায় মারল যে তার মাথাটা দু ফাঁক হয়ে গেল চোখের নিমেষে।

তার বোন নেমোনি যেমন একদিন পাগল হয়ে গিয়েছিল তেমনি আলেক্সটারও পাগল হয়ে গেল। তোমোকে হত্যা করার পর সে এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সেই তরবারিটা নিজের বুকে ঢুকিয়ে দিল। তারপর পড়ে গেল।

এইভাবে ক্যাথনির রাজবংশের শেষ রাজা আলেক্সটারের জীবনের অবসান ঘটল।

১৭

ক্যাথনি থেকে যে পথটা এ্যাথনি নগরের দিকে চলে গেছে সেই পথ দিয়ে যেতেই এ্যাথনির দক্ষিণ দিকের নগরদ্বার পাওয়া যায়। নগরদ্বারের সামনে আছে এক বিস্তীর্ণ সমতল প্রান্তর। সেখানে যোদ্ধারা হাতিদের প্রশিক্ষণ দেয়। নগরের উত্তর দিকে আছে প্রচুর চাষের জমি। সেখানে ক্রীতদাসরা চাষের কাজ করে।

তখন বিকাল বেলা। নগরদ্বারের উপরে যে পর্যবেক্ষণের ঘর ছিল সেখানে প্রহরীরা দিনরাত পাহারা দেয়। তখন প্রহরীদের অনেকে ক্লান্ত হয়ে পাশা খেলছিল। কয়েকজন প্রহরী সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর দৃষ্টি ছড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল।

সহসা একজন প্রহরী বলে উঠল, দাক্ষণ দিক থেকে একটা লোক আসছে।

পাশা খেলতে খেলতে অন্যান্য প্রহরীরা বলল, কত জন ?

বললাম ত একজন।

তাহলে বিপদসূচক ঘণ্টা বাজাবার দরকার নেই। কিন্তু একা এ্যাথনিতে কে আসবে ? ও কি ক্যাথনির লোক ?

প্রথম প্রহরী বলল, লোকটা অবশ্য এখনো অনেক দূরে আছে। তবে তার পোশাক দেখে ত ক্যাথনির লোক বলে মনে হচ্ছে না। ওর পোশাকটা অদ্ভুত ধরনের মনে হচ্ছে।

প্রহরীদের অফিসার আরো উপরে উঠে গিয়ে ভাল করে দেখল। পরে বলল, লোকটা ক্যাথনির নয়। লোকটা হয় খুব বোকা না হয় খুব সাহসী। তা না হলে একা ও এ্যাথনিতে আসত না।

স্ট্যানলি উড একা হাঁটতে হাঁটতে নগরদ্বারের কাছে এসে পড়লে প্রহরীরা যে ভাষায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল সে ভাষা বুঝল না সে।

উড ইশারা করে বলল, সে বন্ধু।

গেট খুলে বেরিয়ে এল প্রহরীরা। তারা উডের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু উড তাদের কোন কথা বুঝতে না পারায় তারা নগরের ভিতরে নিয়ে গেল।

উড দেখল রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট পাকা দোকান ঘর রয়েছে। সে দেখল যে সব প্রহরীরা তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে ও রাস্তায় যে সব লোক চলাচল করছে তারা সবাই শ্বেতাঙ্গ। তবে তাদের পোশাক আশাকগুলো অন্য ধরনের। এখানে সেখানে কিছু নিগ্রোও দেখতে পেল।

উডকে দেখার জন্য রাস্তার ধারে ধারে কিছু ভিড় জমে উঠল। তাদের ভাষা বুঝতে না পারার জন্য খুবই অস্বস্তিবোধ করতে লাগল উড। গলনালা সম্বন্ধে সে কার কাছে কিভাবে খোঁজখবর নেবে তা বুঝতে পারল না। তাছাড়া ওরা বন্দী করবে না অতিথি হিসাবে রেখে দেবে তাও বুঝতে পারল না।

উড ঠিক করল যেমন করে হোক ওদের ভাষাটা আগে শিখে নিতে হবে।

উড দেখল এখানকার অফিসার ও যোদ্ধারা মাথায় হাতে ও পায়ে হাতির দাঁতের তৈরী এক ধরনের গয়না পরে।

উডকে প্রথমে নগরের মাঝখানে এক বিরাট প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটা বড় বাড়ির উঠোনে নিয়ে যাওয়া হলো। বাড়ির গায়ে ছিল পার্কের মত এক বড় বাগান। সেখানে একজন অফিসারের কাছে প্রহরীরা উডের বিবরণ দান করলে অফিসার উডকে অন্য এক জায়গায় নিয়ে যাবার নির্দেশ দিল।

উডকে সেখান থেকে বার করে তার দিয়ে ঘেরা একটা চারকোণা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় মিলে প্রায় পঞ্চাশজন

বন্দী ছিল। উড বুঝল তাকে ওরা বন্দী করেছে।

হঠাৎ বন্দীদের মধ্যে কে একজন উড়ের নাম ধরে ডাকতেই চমকে উঠল উড। দেখল, শ্বেতাঙ্গ বন্দীদের মধ্যে স্পাইক আর স্ট্রোন রয়েছে।

স্পাইককে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রাগে জ্বলে উঠল উড়ের সর্বাঙ্গ। সে ঘুষি পাকিয়ে তাকে মারতে গেল। স্পাইক আর স্ট্রোনই বিশ্বাসঘাতকতা করে গলফান ও গলনালাকে চুরি করে নিয়ে পালায়।

কিন্তু স্পাইক রাগল না। সে উডকে বলল, কি করে তুমি এলে এখানে? এখন ওসব করে বা ঝগড়াঝাঁটি করে কোন লাভ হবে না। এখন একযোগে কাজ করতে হবে। উদ্ধারের কথা ভাবতে হবে।

উড বলল, গলনালা কোথায়? তাকে নিয়ে কি করেছ তোমরা?

স্ট্রোন বলল, ওরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে। তার পর থেকে তার আর দেখা পাইনি আমরা। যেদিন আমাদের বন্দী করে ওরা সেদিন থেকেই ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

স্পাইক বলল, আমার মনে হয় গলনালাকে রাজপ্রাসাদে রাখা হয়েছে। ওরা বলছে ওদের রাজার নজর পড়েছে গলনালার উপর। সেই নোংরা লোকটা গলফান আর গলনালা দুটোকেই নেবে।

উড বলল, তোমরা কিজন্য তাকে চুরি করেছিলে? যদি তোমাদের কেউ তার কোন ক্ষতি করে থাক তাহলে—

স্ট্রোন বলল, আমার বোনের ক্ষতি কেউ করতে পারবে না।

স্পাইক বলল, এখান থেকে তাকে নিয়ে যাবার আগে পর্যন্ত কেউ তার কোন ক্ষতি করেনি। তবে এখান থেকে তাকে নিয়ে যাবার পর কি হয়েছে জানি না। গলফানটা যাতে তার সাহায্যে কাজে লাগাতে পারি সেইজন্যই গলনালাকে নিয়ে আসি আমরা।

উড বলল, অভিশপ্ত পাথরটা।

স্পাইক বলল, সত্যিই পাথরটা সব সময় অভিশাপ হয়ে উঠেছে আমাদের কাছে। ওটা শুধু দুর্ভাগ্যই এনেছে। আমার ও স্ট্রোনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। আমাদের অবস্থা কি হয়েছে দেখ। আমরা পান্নাটা হারিয়েছি. হীরেটাও হারালাম। এখন আমাদের হাতির খাদ্য একরকমের ভূষি খাওয়ানো হয়।

উড দেখল স্পাইক ইতিমধ্যেই ঐ অঞ্চলের কিছু ভাষা শিখেছে। তার কিছু কিছু কথা অন্যান্য বন্দীরা বুঝতে পারছে।

উড এবার নিজেকে বুঝিয়ে ঠিক করল, স্পাইক আর স্ট্রোনের প্রতি তার মনোভাবের পরিবর্তন করা উচিত। তারা যত শত্রুতাই করে থাক, এখন তাদের উপর কোন প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা না করে একসঙ্গে মুক্তির কোন

উপায়ের জন্য বরং চেষ্টা করা উচিত। তাতে গলনালার অন্ততঃ কিছুটা উপকার হতে পারে।

স্পাইক একজন মোটা লোকের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, ঐ যে দেখছ একটা লোক বসে রয়েছে ও-ই আমাকে ওদের ভাষা শিখিয়েছে।

উড বলল, আমিও ওর কাছে ভাষা শিখব। ওর সঙ্গে দেখা করব আমি।

স্পাইক বলল, লোকটা খারাপ নয়। মনে হয় উঁচু বংশের। ওর নাম ভালথর। ওকে এখানকার সবাই বলে, হস্তীমানব। ওকে সবাই ভালবাসে। কিছুদিন আগে এখানে এক বিপ্লব ঘটে যায়। তাতে অনেক লোক মারা যায়। আগেকার রাজাকে মেরে ফোরোস নামে একটা রাজ্যশাসন করছে এখন।

এর পর উডকে ভালথরের কাছে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের ভাষায়। বলল, আমার বন্ধু তোমার কাছে তোমাদের ভাষা শিখতে চায়।

ভালথর উডের বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা মর্দন করে হাসিমুখে বলল, ঠিক আছে, ও আমাকে ইংরিজি ভাষা শিখিয়ে দেবে, আমি ওকে আমাদের ভাষা শিখিয়ে দেব।

সেদিন থেকে স্বৈরাচারী শাসক ফোরোসের প্রাসাদের আস্তাবলে হাতিদের দেখাশোনার কাজ করতে লাগল উড অন্যান্য ক্রীতদাসদের মত। সে কাজে পরিশ্রম বেশী, অথচ খাদ্য কম এবং বাজে। তার উপর তদারককারীদের আচরণ খারাপ।

আসার পর থেকে একদিনও গলনালার কোন খবর পায়নি উড তার সম্বন্ধে কোন কথাই শুনতে পায়নি। আস্তাবলের ক্রীতদাসরা রাজপ্রাসাদের কোন খবরই পায় না। সে বেঁচে আছে কিনা তাও জানে না। গলনালা সম্বন্ধে এই অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগ তার শারীরিক শ্রম আর কষ্টের বোঝার থেকে দুর্বিসহ হয়ে উঠল আরও।

ভালথর অবশ্য একদিন তাকে বলেছিল, সে যদি সুন্দরী হয় তবে তার জীবনের কোন ভয় নেই। সুন্দরী মেয়েদের জীবন নাশ করি না আমরা। এমন কি এরিথরাও তা করে না।

উড জিজ্ঞাসা করেছিল, এরিথরা কে ?

যারা বিপ্লবের মাধ্যমে এ্যাথনির রাজা জাইগোর জায়গায় ফোরোসকে সিংহাসনে বসায়।

উড বলেছিল, সে খুবই সুন্দরী। তবে সে এত সুন্দরী না হলেই ভাল হত। তবে তার কোন ক্ষতি হবে না। মেনোফ্রা সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি তা যদি সত্য হয় তাহলে মেনোফ্রাই তাকে ফোরোসের কুনজর হতে রক্ষা করবে। আবার ফোরোস সম্বন্ধে আমার ধারণা যদি সত্যি হয় তাহলে তোমার সুন্দরী বান্ধবীকে আর কাউকে করায়ত্ত করতে দেবে না। সে

অপেক্ষা করে যাবে। ও কখনো আশা ত্যাগ করবে না।

মেনোফ্রা আবার কে ?

কে আবার। ঈর্ষার দিক থেকে সে এক আস্ত শয়তানী, আর একদিক দিয়ে সে ফোরোসের স্ত্রী।

এই সব কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলো উড। কিছুটা সান্ত্বনা পেল। তবে তাকে বুকে আশা নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে যেতে হবে। কারণ এবিষয়ে কোন পরিকল্পনা খাড়া করে কাজ করা সম্ভব নয়। ভালথর বলেছিল, ফোরোসকে সরিয়ে জাইলোকে আবার সিংহাসনে বসাবার জন্য এক প্রতি-বিপ্লব ঘটতে পারে। কিন্তু তা ঘটতে পারে এবং রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থাই বা কি সে সম্বন্ধে কোন খবরই আসে না ক্রীতদাসদের কাছে। তাছাড়া জাইগোর যে সব সমর্থক বন্দী হয়ে আছে কারাগারে তাদের সঙ্গে নগরবাসীদের কোন যোগাযোগ নেই। জাইগোপন্থী সামন্ত ও নেতারা বিপ্লবের সময় নগর ছেড়ে পাহাড়ে পর্বতে গিয়ে আত্মগোপন করে থাকে।

আস্তাবলের কাজ ছাড়াও আর একটা কাজ করতে হত উডকে। ভালথর, স্পাইক আর স্ট্রোনের সঙ্গে তাকে নগরের দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত প্রান্তরে হাতির পিঠে চড়ে গিয়ে হাতিদের বশ করতে হত। সাধারণ ক্রীতদাসদের থেকে তার বুদ্ধি বেশী ছিল বলে এ কাজের ভার দেওয়া হয় তাকে।

রোজ সকালের দিকেই হাতির পিঠে চড়ে ফাঁকা মাঠে যেতে হত তাদের। একদিন সকালবেলায় মাঠ থেকে ফিরে আসার পর তারা যখন হাতিদের গা ধুয়ে দিচ্ছিল তখন হঠাৎ হুকুম আসে তাদের আবার হাতি নিয়ে মাঠে যেতে হবে।

হাতির পিঠে চড়ে মাঠের দিকে তারা এগোতেই যোদ্ধারা তাদের বলল, একটা বুনো হাতিকে বশ করে আস্তাবলে নিয়ে আসার জন্যই তাদের পাঠানো হচ্ছে। বুনো হাতিটা মাঠের ফসলের ক্ষতি করছে এবং কিছুতেই পোষ মানতে চাইছে না।

একজন যোদ্ধা আবার বলল, হাতিটা একেবারে বুনো এবং পাগলা। তা যদি হয় তাহলে আমরা কেউ জীবন নিয়ে আর ফিরতে পারব না।

ভালথর বলল, জাইগোর শাসনকালে সামন্তরা বুনো হাতি বশ করে আনতে যেত, ক্রীতদাসদের পাঠানো হত না।

ভালথর একজন সামন্ত। তাই ভালথরের দুপাশে যোদ্ধা ও ক্রীতদাসরা হাতি চালিয়ে যেতে লাগল। উড ছিল ভালথরের একেবারে পাশে।

একজন যোদ্ধা চীৎকার করে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। দেখা গেল দূরে একটা বাঁশবন থেকে সেই বুনো হাতিটা বেরিয়ে আসছে।

ভালথর উডকে সাবধান করে দিল, হাতিটা আকারে বিরাট এবং একে-

বারে বুনো। ও এই দিকেই আসছে। একটুও ভয় নেই। তুমি সাবধানে এগোবে, রক্ষীরা যাই বলুক বেশী এগোবে না ওর কাছে, তাহলে সংযত করতে পারবে না তোমার হাতিকে।

উড বলল, এত বড় হাতি আমি কখনো দেখিনি।

ভালথর বলল, আমিও না। ওর দাঁতটা আবার কালো।

উড বলল, এখন আমাদের কি করতে হবে? কিভাবে ওকে বশ করা হবে আমি ত তার কিছু খুঁজে পাচ্ছি না।

ভালথর বলল, কয়েকটা মেয়ে হাতিকে ওর আশে পাশে পাঠিয়ে ওকে ভুলিয়ে নগরদ্বারের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে।

এমন সময় বুনো হাতিটা ওদের দেখে তার শুঁড়টা তুলে ক্রুদ্ধভাবে গর্জন করতে লাগল। যে অফিসার ওদের নেতৃত্ব দান করছিল সে কয়েকজন ক্রীতদাসকে তাদের মেয়ে হাতি নিয়ে বুনো হাতিটার কাছে যেতে বলছিল।

কিন্তু বুনো হাতিটা মেয়ে হাতিদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে অফিসার যে পুরুষ হাতিটার পিঠে চেপে ছিল সেই পুরুষ হাতিটাকে আক্রমণ করল। হাতিটা পড়ে যেতে তার পিঠ থেকে অফিসারও পড়ে গেল। অফিসারের আর্ত চীৎকারের সঙ্গে বুনো হাতিটার গর্জন মিশে গেল। অফিসার ছুটে পালাতে লাগল।

ভালথর উডকে নিয়ে তাদের মেয়ে হাতিদুটোকে চালিয়ে বুনো হাতিটার দিকে যেতে লাগল। কিন্তু তারা তার কাছে যাবার আগেই বুনো হাতিটা ছুটতে থাকা অফিসারকে শুঁড় দিয়ে ধরে পা দিয়ে পিষে ফেলল।

তার ক্রোধের বস্তুটাকে ইচ্ছামত মেরে পিষে ফেলার পর শান্ত হয়ে লেজ নাড়ছিল বুনো হাতিটা। ঠিক তখনি ভালথর আর উড তাদের দুটো মেয়ে হাতি নিয়ে গিয়ে বুনো হাতিটার দুপাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন আর পাগলামির চিহ্নমাত্র নেই তার মধ্যে।

এ্যাথনির লোকেরা হাতি ধরার সময় অনুচ্চ স্বরে এক ধরনের সুরেলা গান গাইত। সে গানের কোন বাণী ছিল না। শুধু একটা মিষ্টি সুরের অনুরণণ। ভালথর সেই গানটা গাইতে লাগল।

দুটো মেয়ে হাতির মাঝখানে বুনো হাতিটা ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগল নগরের দিকে। আর কোন দৌরাত্ম্য দেখাল না। অন্যান্যরা তাদের পিছু পিছু আসতে লাগল।

সকলেই ভালথরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে লাগল। উড তাকে বুনো হাতি ধরতে সাহায্য করায় তার কথা রাজপ্রাসাদে চলে গেল।

পরদিন একজন অফিসার এসে উডকে জানাল ফোবোগ তাকে দেখতে চেয়েছে।

১৮

সূর্য কিছুক্ষণ আগে পশ্চিম আকাশটাকে রাঙিয়ে দিয়ে গেছে। সন্ধ্যার অন্ধকার নিঃশব্দে গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছিল থেনারের উপত্যকার উপরে। টারজন তখন একা ক্যাথনি থেকে এ্যাথনি নগরীর দিকে এগিয়ে আসছিল গলনালার খোঁজে।

টারজনের সহায়তায় যুডো ক্যাথনির সিংহাসনে বসার পর সে টারজনকে একা এ্যাথনিতে যেতে নিষেধ করে। জেমননও তাকে একাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু কারও কথা শোনেনি টারজন। সঙ্গে কোন সেনাদল না নিয়েই একা যাবে এ্যাথনিতে।

যুডো তখন তাকে বলে, ঠিক আছে, তুমি যাও। কিছুদিনের মধ্যে ফিরে না এলে তোমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য আমি এক সেনাদল পাঠাব।

টারজন বলল, আমি ফিরে না এলে বুঝবে আমি মরে গেছি।

যুডো বলল, ওরা তোমাকে মারবে না। ওদের নগরে এখন কাজের লোকের দরকার। তোমার মত চেহারার লোককে ওরা কিছুতেই মারবে না।

জেমনন বলল, হাতির পরিচর্যা না করিয়ে তোমাকে ওরা যুদ্ধের কাজে লাগাবে।

টারজন বলল, আমি যুদ্ধ করতে বা লোক খুন করতে চাই না।

থেনারের উপত্যকায় অনেক সিংহ আছে বলে দিনের বেলায় সেদিকে পথ চলত না টারজন। থেনারের উপত্যকার সিংহগুলো সাধারণ সিংহ নয়। তাদের বেশীর ভাগই ক্যাথনি থেকে পালিয়ে মানুষ শিকারের জন্য প্রশিক্ষণ পাওয়া সিংহ। তাদের মানুষের মাংস খেতে দেওয়া হত।

রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে উঠলে থেনারের উপত্যকার উপর দিকে বেশ কিছু পথ এগিয়ে গেল টারজন। তারপর পিছনে কয়েকটা সিংহের ডাক শুনতে পেল। সেখানে কোন গাছপালা বা বন জঙ্গল নেই। বনটা অনেক দূরে। তাই জোরে পা চালিয়ে চলতে লাগল টারজন। কারণ সে জানে এই সব ভয়ঙ্কর শিকারী সিংহদের কবলে পড়লে কোন মানুষ রক্ষা পাবে না।

টারজন দেখল তার সামনে কিছুদূরে একটা পাহাড়ের উপর চাঁদ উঠেছে। তার আলো ছড়িয়ে পড়েছে উন্মুক্ত উপত্যকার উপর। সিংহদের ডাক শুনে মনে হলো তারা বাতাসে শিকারের গন্ধ পেয়েছে। তবে কি তারই দিকে আসছে তারা?

টারজন তার চলার গতি বাড়িয়ে দিল। সে ডাক শুনে বুঝল মোট

পাঁচটা সিংহ একসঙ্গে আসছে। সে আরও বুঝল সিংহগুলো তার পিছনে এক মাইল দূরে আছে আর তার সামনে যে বন আছে তার দূরত্ব সেখান থেকে তিন মাইল।

এবার ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল টারজন। কিন্তু বনের কাছে যেতেই দেখল সামনে একটা সিংহ তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে তার পিছনে সেই পাঁচটা সিংহ এগিয়ে আসছে দ্রুত গতিতে। টারজন তখন তার বুকের ভিতর থেকে বাঁদর গোরিলাদের মত এক ভয়ঙ্কর শব্দ বার করে চীৎকার করে উঠতেই তার পথ থেকে সরে গেল সিংহটা। টারজন এক লাফে একটা গাছের ডালে উঠে পড়ল। এদিকে সেই পাঁচটা সিংহ তাকে ধরার জন্য লাফ দিল একসঙ্গে।

টারজন গাছের অনেক উপরে তাদের নাগালের বাইরে উঠে গিয়ে গাছ থেকে পাতা আর শুকনো ডাল ফেলে সিংহগুলোর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তাদের রাগিয়ে দিল আরও। তারপর সেখানে আর সময় নষ্ট না করে গাছের ডালে ডালে এ্যাথনির দিকে চলে গেল।

সে জেমননের কাছে শুনেছিল এ্যাথনি নগরের উত্তর দিকের গেটে পাহারা কম থাকে। দক্ষিণ নগরদ্বারেই পাহারার কড়াকড়ি বেশী। সে তাই উত্তর দিকের গেটের কাছে গিয়ে সরাসরি সেখান দিয়ে ঢোকার চেষ্টা না করে সে নগর-প্রাচীরের উপর উঠে সেখান থেকে লাফ দিয়ে গেট থেকে দূরে একটা বাগানের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

বাগানটার একদিকে একটা টিনের চালা ছিল। তার মাথায় উঠে দেখল সেদিকে প্রাচীরের ওপারেই একটা রাস্তা নগরের মধ্যে চলে গেছে। টিনের চাল থেকে লাফ দিয়ে রাস্তায় পড়ল টারজন।

চাঁদের আলোয় পথঘাট সব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। পথে কোন লোক ছিল না। পথের দুধারের বাড়িগুলোর সব দরজা বন্ধ। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। সহসা টারজন দেখল একটা বাড়িতে জানালা খুলে একটা লোক তাকে প্রশ্ন করল, কে তুমি? এত রাতে এখানে কি করছ?

টারজন অনুচ্চ গলায় উত্তর করল, আমি ডাইমন।

এটা জেমননের কাছ থেকে শিখেছিল সে। জেমনন তাকে বলেছিল এ্যাথনির লোকেরা বিশ্বাস করে ডাইমন নামে এক প্রেতাত্মা রাত্রিতে ঘুরে বেড়ায় এবং ইচ্ছামত যে কোন মানুষের জীবন নাশ করতে পারে। তাই হঠাৎ কারো মৃত্যু ঘটলে বা রাত্রিতে কেউ মারা গেলে তারা বলে ডাইমন তাকে নিয়েছে।

টারজনের মুখ থেকে 'ডাইমন' নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে জানালা বন্ধ করে ঘরের ভিতরে ঢুকে গেল সেই লোকটা।

ছায়াচ্ছন্ন সেই রাস্তাটা দিয়ে এগিয়ে নগরের মাঝখানে রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি এসে পড়ল টারজন। সে শুনেছিল এ্যাথনির রাজপ্রাসাদের উত্তর ও দক্ষিণদিকের দরজাতেই দিনরাত পাহারা থাকে। অন্যান্য দরজাগুলো বন্ধ করে রাখা হয় এবং সেগুলো ব্যবহার করা হয় না।

প্রাসাদের চারদিকে যে প্রাচীর ছিল, পশ্চিম দিকে গিয়ে সেই প্রাচীরের উপর উঠে পড়ল টারজন। উঠে দেখল তার গায়ে একটা সুন্দর সাজানো বাগান রয়েছে। সেই বাগানে নেমে সে একটা বড় বাড়ির কাছে চলে গেল। সে বুঝল এটাই রাজপ্রাসাদ। দেখল বাড়িটার মধ্যে অনেকগুলো ঘরে তখনো আলো জ্বলছে।

সেই সব ঘরগুলোর মধ্যে একটা ঘরে দেখল ভোজসভার অনুষ্ঠান চলছে। প্রশস্ত ঘরখানার মাঝখানে একটা বিরাট লম্বা টেবিলের চারদিকে প্রায় একশোজন লোক খাওয়ার পর ঝিমোচ্ছে। বেশীর ভাগ লোকই অতিরিক্ত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে উঠেছে। অনেকে কথা বলছে, হাসছে, আবার মারামারি করছে।

লোকগুলোকে দেখে ক্যাথনির সামন্তদের মত ভদ্র বলে মনে হলো না টারজনের। এই ভোজসভার যে প্রধান সে টেবিলের সামনে বসে ছিল। লোকটাকে একটা পশু বলে মনে হচ্ছিল। সে কেবল ভৃত্য ও ক্রীতদাসদের হুকুম করছিল। এই লোকটিই হলো রাজা ফোরোস।

এক সময় সেই গৃহস্বামী লোকটা টেবিল চাপড়ে একজন ক্রীতদাসকে বলল, আমি তাকে নিয়ে আসার জন্য বলিনি তোকে ?

ক্রীতদাসটি বলল, কাকে হুজুর ?

কেন, সেই মেয়েটিকে।

কোন্ মেয়েটিকে ?

ক্রীতদাসটি ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, আমি আনতে পারব না। মেনোক্রা তাহলে আমার পিঠের চামড়া তুলে নেবে।

ফোরোস বলল, মেনোক্রা জানতে পারবে না। সে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ফোরোসের পাশে যে একটা লোক বসেছিল সে কিন্তু অন্যান্যদের মত মাতাল হয়নি। সে ফোরোসকে পরামর্শ দিল, কাউকে পাঠিও না মেয়েটাকে আনার জন্য। ওকে আনতে হবে না। মেনোক্রা তাহলে যে আনতে যাবে তার ও তোমার হৃৎপিণ্ড উপড়ে নেবে।

ফোরোস তখন চীৎকার করে বলে উঠল, তাহলে রাজা কে ?

অন্য লোকটি বলল, মেনোক্রাকে জিজ্ঞাসা করো একথা।

ফোরোস জোর গলায় বলল, আমি রাজা।

এই বলে সে একজন ক্রীতদাসকে ডাকল। কিন্তু ক্রীতদাসটা অন্য দিকে

তাকিয়ে থেকে না শোনার ভান করল। ফোরোস তখন একটা মদের পেয়ালা ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে। একটুর জন্য বেঁচে গেল তার মাথাটা।

ফোরোস গর্জন করে বলল, যাও, মেয়েটাকে নিয়ে এস।

ক্রীতদাসটি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, কোন্ মেয়েটি হুজুর ?

ফোরোস বলল, এ্যাথনিতে ত একটা মেয়েই আছে।

ক্রীতদাসটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে ফোরোস বলল মেনোফ্রা যদি তার কাজে নাক গলাতে আসে তাহলে সে তাকে ছেড়ে দেবে না।

এই বলে জোরে হাসতে গিয়ে ফোরোস পড়ে গেল মাটিতে। এমন সময় সকলেই ভয়ে ভয়ে দরজার দিকে মুখ তুলে তাকাল।

ঘরখানার বাইরে পিছন দিক থেকে সব দেখছিল ও শুনছিল টারজন। সারাক্ষণ নীরবে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে। তবে ফোরোসের কথা শুনে বুঝতে পারল না যে মেয়েটিকে সে আনতে বলল সে মেয়েটি কে।

ঘরের সকলে দরজার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই টারজনও সেদিকে তাকাল। সে দেখল, উঁচু পুরুষালি চেহারার একটি মেয়ে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে। টারজন দেখল মেয়েটার গালপাট্টা আর নাকের নিচে স্পষ্ট মোচের রেখা রয়েছে।

টারজন বুঝল এই মেয়েটাই ফোরোসের স্ত্রী মেনোফ্রা।

মেনোফ্রা সোজাসুজি ফোরোসকে জিজ্ঞাসা করল, এই অসময়ে তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ কেন ?

ফোরোস অবাক হয়ে গেল। সে ভয় পেয়ে গেল। সে দেখল তার আশেপাশে যারা ছিল, যারা মাতলামি করছিল, মেনোফ্রার ভয়ে সবাই ভদ্র হয়ে উঠেছে তারা।

ফোরোস বলল, শোন প্রিয়তমা, আমরা এই উৎসবে যোগদান করার জন্য তোমাকে ডাকছিলাম।

মেনোফ্রা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, কিসের উৎসব ?

ফোরোস তার পাশের লোককে বলল, কিসের উৎসব ক্যাণ্ডো ?

ক্যাণ্ডো কি উত্তর দেবে খুঁজে না পেয়ে জিব দিয়ে ঠোঁটদুটো ভিজিয়ে নিতে লাগল।

মেনোফ্রা তীক্ষ্ণগলায় বলল, আমার কাছে মিথ্যা কথা বলো না। আসলে তুমি আমাকে নয়, অন্য কোন মেয়েকে ডেকে পাঠিয়েছিলে।

এর পর যে ক্রীতদাস তাকে ডাকতে গিয়েছিল তার দিকে ঘুরে মেনোফ্রা বলল, বল আমাকে আনতে কি ও পাঠিয়েছিল তোমায় ?

ক্রীতদাসটি নতজানু হয়ে বলল, হে মহীয়সী রাণীমা, আমি ভেবেছিলাম উনি আপনাকেই আনতে বলছেন।

ও কি বলেছিল তোমায় ?

উনি বলেছিলেন, 'মেয়েটিকে নিয়ে এস।' আমি যখন ওঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ মেয়েটি তখন উনি বললেন এ্যাথনিতে ত একটিই মেয়ে আছে।

মেনোফ্রা এবার ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল, এবার বুঝেছি কোন্ মেয়ে। সেই বিদেশী মেয়েটা যাকে দুটো লোকের সঙ্গে ধরা হয়েছিল। অনেকদিন থেকেই তুমি এটা চাইছিলে। কিন্তু সাহস পাওনি। আজ মদ বেশী খেয়ে সাহস পেয়েছ। ঠিক আছে, আমি সেই মেয়েটাকে পাঠাব তোমার কাছে, কিন্তু কেটে টুকরো টুকরো করে। জ্যান্ত বা গোটা অবস্থায় পাঠাব না।

এর পর মেনোফ্রা উপস্থিত সবাইকে বেরিয়ে যেতে বলল ঘর থেকে। বলল, যত সব শুয়োরের দল। বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।

এই বলে সে সোজা ফোরোসের কাছে গিয়ে তার একটা কান ধরে বলল, এই রাজামশাই, তুমি এবার আমার সঙ্গে এস ত।

১৯

টারজন এবার সেই ঘরের বাইরে জানালা থেকে সরে গিয়ে দোতলার দিকে তাকাল। তার মনে হলো দোতলায় কোন একটা ঘরেই শুয়ে আছে গলনালা। চুপ করে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে তার তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির দ্বারা উপরতলার ঘর থেকে আসা গন্ধের শ্রেণীবিশ্লেষণ করে দেখতে লাগল সে। নাকডাকার শব্দে সে বুঝতে পারল সে ঘরে কেউ একজন ঘুমোচ্ছে। সে ঘরটা ছিল একেবারে অন্ধকার।

টারজন সেই জানালা দিয়ে উপরতলায় উঠে গরাদহীন জানালার ভিতর দিয়ে দোতলার অন্ধকার ঘরটায় পড়ল। তারপর দরজার কাছে গিয়ে খিল খুলে বারান্দায় চলে গেল। দেখল বারান্দাটা লম্বা এবং তার ধারে কতকগুলো ঘর আছে।

একটা ঘর থেকে জোর বাগ-বিতণ্ডার শব্দ আসছিল। টারজন বুঝল ফোরোস আর মেনোফ্রার মধ্যে জোর ঝগড়া হচ্ছে। হঠাৎ সেই ঘরের মেঝের উপর একজনের পড়ে যাওয়ার শব্দ হলো। তারপরই সব চুপ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফোরোস দরজা খুলে একটা রক্তমাখা তরোয়াল নিয়ে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে আসতে লাগল।

টারজন তখন সেই অন্ধকার ঘরখানার মধ্যে দরজাটা অর্ধেক খুলে তার পাশে লুকিয়ে রইল। সে দেখল ফোরোস সেই বারান্দাটার শেষ প্রান্তে গিয়ে আর একটা বারান্দায় গিয়ে পড়ল। টারজন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগল।

তারপর দেখল ফোরোস চাবি বার করে একটা ঘরের তালা খুলে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। কিন্তু দরজাটা বন্ধ করল না। টারজনও দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে নিঃশব্দে এমনভাবে ঢুকে পড়ল যে ফোরোস তা টের পেল না। চর্বি দিয়ে জ্বালানো একটা প্রদীপের আলোয় স্বল্প আলোকিত ছিল ঘরখানা।

সেই ঘরের এককোণে হাত পা বাঁধা অবস্থায় গলনালা শুয়ে ছিল। আর এক কোণে সেইভাবে শুয়েছিল স্ট্যানলি উড। ফোরোস নেশার ঘোরে টলতে টলতে তাদের দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, প্রেমিক-প্রেমিকা দেখছি বেশ রয়েছে। কিন্তু তোমরা ছাড়াছাড়ি কেন? আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব কেমন করে প্রেম করতে হয়। এখন এই মেয়েটি আমার। মেনোফ্রা এখন মৃত। এই তরবারিটা দেখ। এটা মেনোফ্রার রক্তে রঞ্জিত। প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের আচরণ কি হওয়া উচিত তা দেখিয়ে দেব তোমাদের। আমি তোমাকে খুন করব।

এই বলে সে তরোয়ালটা নিয়ে গলনালার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু সে তরোয়ালটা ধরে গলনালাকে হত্যা করার জন্য তুলতেই টারজন সেটা পিছন থেকে কেড়ে নিয়ে ফোরোসকে ফেলে দিল মেঝের উপর।

টারজন চাপা গলায় বলল, চুপ করে থাকবে তা না হলে তোমার খুন করব।

ফোরোস দেখল নগ্নপ্রায় এক দৈত্যাকার মূর্তি তারই তরোয়ালটা তার বুকের উপর ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

ফোরোস বলল, কে তুমি? বল কি চাও। তুমি যা চাও তাই দেব, শুধু আমাকে প্রাণে মেরো না।

টারজন বলল, আমি যা চাই তা আমি ঠিক নেব, তুমি নড়বে না।

এই বলে সে প্রথমে উডের ও তারপর গলনালার বাঁধন কেটে দিল। এর পর উডকে বলল, ফোরোসকে বেঁধে ফেল। তার মুখটাও বেঁধে দাও যাতে চেঁচাতে না পারে।

উড তাই করলে টারজন তাকে বলল, এখানে কি করে এলে?

উড বলল, আমি গলনালার খোঁজ করতে করতে এই নগরে এসে পড়ি। তার পর ওরা বন্দী করে আমায়। স্পাইক ও স্ট্রোনকেও ওরা বন্দী করে রেখেছে। তাদের কাছ থেকে গলফানটাও নিয়ে নিয়েছে।

এর পর তিনজনেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। সহসা বারান্দায় কার পায়ের শব্দ শুনতে পেল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে দরজা ঠেলে দরজার সামনে একবার দাঁড়িয়ে তাদের দেখে নিল মেনোফ্রা। তার মাথা ও কাঁধ থেকে রক্ত ঝরছিল তখনো। তার পোশাকটা রক্তে ভিজে গেছে।

মেনোফ্রা কিছু না বলে দরজাটায় তালা দিয়ে রক্ষীদের ডাকতে গেল।

উড বলল, আমরা বেশ ফাঁদে পড়লাম ।

গলনালা বলল, কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য !

উড বলল, গলনালাকে নিয়ে ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ। সেই বিরোধেরই পরিণতি এটা ।

উড বলল, রক্ষীরা ছুটে আসছে ।

বারান্দায় মেনোফ্রার সঙ্গে রক্ষীদের কথাবার্তা হচ্ছিল ।

মেনোফ্রা দরজা খুলে রক্ষীদের বলল, একটা বুনো লোক ঢুকে বন্দীদের মুক্ত করে দিয়েছে আর রাজাকে বেঁধে রেখেছে। ওরা রাজাকে মেরে ফেলতে পারে। আমি সেটা চাই না। আমি নিজের হাতে রাজাকে মারতে চাই। তোমরা বিদেশীদের বন্দী করে রাজাকে আমার কাছে নিয়ে এস।

টারজন দরজার কাছে গিয়ে রক্ষীদের বলল, যদি তোমরা আমার বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢোক তাহলে রাজাকে আমি হত্যা করব ।

রক্ষীরা মুস্কিলে পড়ল। কি করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল মেনোফ্রার সঙ্গে ।

উড ফোরোসকে বলল, রাণী তোমাকে পেলে মেরে ফেলবে ।

কিন্তু মুখ বন্ধ থাকায় ফোরোস কোন কথা বলতে পারল না ।

দুপক্ষই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। কি করবে কিছু খুঁজে পেল না।

টারজন বলল, ক্যাথনির সামন্তরা অনেক ভাল। অনেক ভদ্র।

উড বলল, বর্তমানে এদেশের শাসকরা সমাজের নিচেরতলার মানুষ। এর বৈধ রাজা ও সামন্তদের সরিয়ে নিজেরা শাসনভার নিয়ে দেশকে রসাতলে নিয়ে যাচ্ছে ।

টারজন বলল, ভালথর আমাদের কোনভাবে সাহায্য করতে পারে না ?

উড বলল, তাকে ওরা ক্রীতদাস করে রেখেছে ।

টারজন বলল, আমি ক্যাথনিতেই এসব শুনেছিলাম। তাই এখানে এসে ভালথরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলাম ।

এমন সময় দরজায় কারা ঘা দিল ।

টারজন বলল, কি চাও তোমরা ?

রক্ষীরা দরজা খুলে বলল, রাজাকে রাণীর হাতে তুলে দাও। তাহলে তোমাদের মুক্তি দেওয়া হবে। কোন ক্ষতি করা হবে না।

টারজন তখন উডকে রাজার মুখের বাঁধন খুলে দিতে বলল।

ফোরোস কাতর মিনতির স্বরে বলল, আমাকে তোমরা রাণীর হাতে তুলে দিও না। ও আমাকে খুন করবে।

টারজন বলল, আমরা তাহলে একটা চুক্তি করতে পারি।

ফোরোস বলল, যে কোন শর্ত আমি মেনে নেব।

টারজন বলল, আমাদের মুক্তি দিয়ে প্রহরীসহ থ্যানার উপত্যকা পার করে দিতে হবে।

ফোরোস বলল, কথা দিচ্ছি তাই হবে।

উড বলল, হীরের তালটাও দিতে হবে।

হ্যাঁ, তাই দেওয়া হবে।

টারজন বলল, কি করে জানব তুমি তোমার কাজ করবে? আমরা তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তারপর ছেড়ে দেব।

ফোরোস বলল, আমি তোমাদের সব দাবি মেনে নেব। শুধু রাণীর হাতে আমাকে তুলে দিও না।

টারজন বলল, আর একটা কথা। ভালথরকে মুক্তি দিতে হবে।

সে দাবিও মঞ্জুর করলাম।

উড টারজনকে বলল, ফোরোসকে তুমি নগরের বাইরে নিয়ে গেলেই ওরা অন্য কাউকে রাজা করবে।

টারজন বলল, ওর কথামত কাজ করবে এবিষয়ে আমি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত ওকে আমি বাইরে নিয়ে যাব না।

এর পর সে ফোরোসকে বলল, রক্ষীরা তোমার কথা শুনবে ত?

ফোরোস বলল, তা ত জানি না। ওরা সবাই রাণীকে ভয় করে।

উড বলল, আমরা যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।

টারজন এবার ফোরোসের বাঁধন খুলে বলল, আমার সঙ্গে দরজার সামনে চল। রাণীকে আমাদের প্রস্তাব বা চুক্তির শর্তের কথা বল।

ফোরোস মেনোফ্রাকে বলল, শোন প্রিয়তমা। আমার কথা শোন।

মেনোফ্রা বলল, কোন কথা শুনব না, খুনী কোথাকার। আমি শুধু তোমাকে একবার আমার হাতে পেতে চাই।

ফোরোস বলল, আমার কথা শোন। ক্যাণ্ডোকে ডেকে পাঠাও। তাকে সব কথা বল।

মেনোফ্রা রক্ষীদের বলল, কাপুরুষের দল, দেখছ কি? তাদের টেনে বার করে আন ঘর থেকে।

ফোরোস বলল, থাম তোমরা, এগোবে না। আমি রাজা। রাজার আদেশ।

মেনোফ্রা বলল, আমি রাণী। আমি বলছি যাও, রাজাকে মুক্ত করে আন।

ফোরোস বলল, আমি ঠিক আছি। আমাকে মুক্ত করার প্রয়োজন নেই।

তখন একজন অফিসার গিয়ে ক্যাণ্ডোকে ডেকে আনল।

ক্যাণ্ডো এসে রাণীর সব কথা শুনে রাণীকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কি

আলোচনা করল। তারপর সে টারজনের সামনে এসে বলল, সব ঠিক হয়ে গেছে। রাণী অনুমতি দিয়েছেন। তোমরা কাল সকালেই প্রাতরাশ খাওয়ার পর মুক্তি পেয়ে চলে যাবে। তোমাদের সঙ্গে প্রহরী দেওয়া হবে। এখন রাত্রিকাল। তাই বেরোন ঠিক হবে না। শুধু তোমরা কথা দেবে তোমরা রাজার কোন ক্ষতি করবে না।

টারজন বলল, কথা দিলাম।

২০

পরদিন সকাল হতেই উডের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে ভাবল সব বিপদ কেটে গেছে একেবারে। সে বলল, এখন আমার ক্ষিদে পেয়েছে। এখন খাবার চাই।

এমন সময় কে একজন দরজার তালা খুলে দুটো খাবারের থালা ঘরের মধ্যে রেখেই দরজা বন্ধ করে চলে গেল।

খাবার মানে শক্ত জিনিস কিছু নেই। শুধু দু থালা ঝোল। তরল ঝোলের সঙ্গে কুচি কুচি মাংস মেশানো ছিল। ওরা তিনজনে ভাগ করে তাই খেল।

ফোরোস বলল, এটা খুবই সুস্বাদু খাবার। মেনোফ্রা ভাল খাবারই পাঠিয়েছে। আমি ত ভেবেছিলাম ও আমাদের জন্য হাতির শুকনো চামড়া পাঠাবে।

কিন্তু সে খাবার খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম নেমে এল গলনালার চোখে। সে বলল, আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। চোখ দুটোকে খুলে রাখতে পারছি না।

উডেরও তাই হলো। উডও তাই বলল।

দেখতে দেখতে সকলেরই চোখ জড়িয়ে এল। গভীর ঘুমে অচৈতন্য হয়ে উঠল সবাই।

একটি ঘরের মধ্যে খাটের উপর পাতা বিছানায় কনুইএর উপর ভর দিয়ে হাতের তালুতে মাথা রেখে শুয়ে ছিল মেনোফ্রা। দরজার কাছে চারজন যোদ্ধা পাহারায় নিযুক্ত। মেনোফ্রার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ক্যাণ্ডো। তার পায়ের দিকে খাটের নিচে উড আর গলনালা অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিল। ফোরোসও অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিল। তবে তার হাত পা বেঁধে রাখা হয়েছিল।

মেনোফ্রা ক্যাণ্ডোকে জিজ্ঞাসা করল, আমার কথামত বুনো লোকটাকে ক্রীতদাসদের ঘরে বেঁধে রেখেছ ?

ক্যাণ্ডো বলল, হ্যাঁ রাণীমা। সে খুব বলবান বলে শিকল দিয়ে বেঁধে রেখেছি।

ঠিক আছে। বোকারাও অনেক সময় ঠিক কাজ করে।

ধন্যবাদ রাণীমা।

আর ধন্যবাদ দিতে হবে না। তোমাদের ধন্যবাদ শুনলে গা জ্বালা করে আমার। যত সব মিথ্যাবাদী, প্রতারক আর বিশ্বাসঘাতকের দল। তোমাকে ফোরোস বন্ধুর মত দেখত। তবু তুমি তার বিরুদ্ধাচরণ করছ। আমার সঙ্গে তোমার কোন বন্ধুত্ব নেই। আমাকে তুমি ঘৃণা করো। তবু তুমি কাপুরুষ বলে আমার বিরুদ্ধে যেতে পার না। যদি কোনদিন যাও ত তোমার মাথা আমি ভেঙ্গে ফেলব।

উডই প্রথমে চোখ খুলল। তার জ্ঞান ফিরলে সে দেখল তার পাশে শুয়ে আছে গলনালা। তার তখনো জ্ঞান ফেরেনি। তবে শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটা ওঠানামা করছিল বলে বুঝল সে এখনো বেঁচে আছে।

উড এবার রাণী ও ক্যাণ্ডোর পানে তাকিয়ে অভিযোগের সুরে বলল, এইভাবে তোমরা তোমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পালন করেছ। আমাদের আর একজন কোথায় ?

ক্যাণ্ডো বলল, সে নিরাপদেই আছে। রাণীমা দয়া করে তোমাদের কাউকেই মারেননি।

উড আবার জিজ্ঞাসা করল, আমাদের নিয়ে কি করতে চাও তোমরা ?

মেনোফ্রা বলল, বুনো লোকটাকে সিংহের মুখে ফেলে দেওয়া হবে। আর আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদের হত্যা করা হবে না।

কি তোমার উদ্দেশ্য ?

কিছুক্ষণের মধ্যেই জানতে পারবে।

এই বলে সে ক্যাণ্ডোকে আদেশ করল, একজন পুরোহিতকে ডেকে আন। ফোরোস এখনি জেগে উঠবে।

গলনালা এবার জেগে উঠে বসে বলল, আমরা এখন কোথায় ? কি হয়েছে ?

উড বলল, আমরা এখন বন্দী। ওরা আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

গলনালার চোখে জল এসেছিল। উড তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, সাহস অবলম্বন করো প্রিয়তমা। ধৈর্য ধরো।

অনেক ধৈর্য ধারণ করেছি অনেক দিন ধরে। আর পারছি না। চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছে আমার।

এমন সময় ফোরোস জেগে উঠল। মেনোফ্রা বলল, ইঁদুরটা জেগে উঠেছে।

ফোরোস বলল, তুমি তাহলে আমাকে উদ্ধার করেছ প্রিয়তমা।

এখন তা বলতে পার। পরে বুঝতে পারবে।

ফোরোস বলল, ক্যাণ্ডো, আমার বাঁধন খুলে দাও। রাজাকে এভাবে বেঁধে রাখাটা ভাল দেখায় না।

আমার কিন্তু ভালই লাগছে দেখতে। তপ্ত লোহার শিকল দিয়ে তোমাকে বেঁধে রাখা উচিত ছিল। কিন্তু আমি তা করিনি। তুমি আমাকে তরবারি দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করবে। এই মেয়েটাকে তোমার স্ত্রী করবে। তাই না? প্রথমে আমি লোভের বস্তুটাকে তোমার কাছে রেখে তোমার মন থেকে সব লোভ দূর করে ফেলব।

এমন সময় একজন যোদ্ধা এসে খবর দিল, পুরোহিত এসে গেছে।

মেনোফ্রা বলল, তাকে নিয়ে এস।

মেনোফ্রার আদেশে উড আর গলনালা একটা বেঞ্চের উপর বসল।

পুরোহিত ঘরে ঢুকলে মেনোফ্রা তাকে বলল, এদের বিয়ে দিয়ে দাও।

বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল উড আর গলনালা। গলনালা বলল, এটা কখনই স্বাভাবিক বিয়ে নয়। এর মধ্যে কোন কুমতলব আছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই বিয়েটা হয়ে গেল। বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল মেনোফ্রার মুখে। রাগে লাল হয়ে উঠল ফোরোসের মুখখানা।

বিয়েটা হয়ে গেলে মেনোফ্রা ফোরোসকে বলল, আমাদের দেশের আইন তুমি জান। রাজা বা প্রজা যেই হোক, এদের মাঝখানে এলেই তার মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। এবার ফোরোস চিরদিনের মত মেয়েটাকে হারালে। আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব। একই ঘরে তুমি মেয়েটার সঙ্গে বাস করবে। কিন্তু খুব সাবধান। আমি তোমার উপর লক্ষ্য রাখব।

এর পর সে রক্ষীদের বলল, এই লোকটাকে ক্রীতদাসদের ঘরে নিয়ে যাও। তবে দেখবে এর যেন কিছু না হয়। আর ফোরোস ও মেয়েটাকে আমার ঘরের পাশের ঘরটায় তালাবদ্ধ করে রাখবে।

এদিকে টারজন জ্ঞান ফিরলে দেখল তার হাত পা শিকল দিয়ে বাঁধা। তার গলায় লোহার বেড়ী। সে যে ঘরে বন্দী হয়ে আছে সে ঘরে আর কেউ নেই।

সূর্যের অবস্থান দেখে সে বুঝল খাবারের সঙ্গে ঘুমের ওষুধ মেশানো ছিল এবং সেই খাবার খেয়ে এমন ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল সে। ওষুধের ক্রিয়া এখন শেষ হয়ে গেছে। তবে মাথাটা ধরে আছে আর শরীরটা খুব দুর্বল লাগছে তার। জ্ঞান ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই উড আর গলনালার জন্য ভাবনা হতে লাগল তার।

সহসা টারজন দেখতে পেল রক্ষীরা উডকে তার ঘরের দিকে নিয়ে আসছে।

উড এসে তাকে বলল, আমি ত ভাবছিলাম তোমাকে ওরা মেরে ফেলেছে।

এর পর যা যা ঘটেছিল তাদের ভাগ্যে সব টারজনকে বলল সে। শেষে বলল, মেনোফ্রা একটা মেয়ে নয়, রাক্ষসী, একটা পশু। কিন্তু ওরা আমাদের না বেঁধে শুধু তোমাকে বাঁধল কেন তার কিছু জান ?

টারজন বলল, ওরা হয়ত আমাকে নিয়ে কোন বিশেষ মজা পেতে চায়।

বিকালের দিকে ভালথর এসে দেখা করল টারজনের সঙ্গে। ভালথর বলল, টারজন তুমি ?

টারজন বলল, হ্যাঁ ভালথর, আমি।

এর পর ভালথর উডকে বলল, তুমি তাহলে আবার ফিরে এসেছ ? আমি ত ভেবেছিলাম তোমাকে আর দেখতেই পাব না। কি হয়েছিল ?

উড তাকে যা যা হয়েছিল সব বলল।

ভালথর বলল, মেনোফ্রা যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন গলনালা নিরাপদ। কিন্তু ক্যাণ্ডো মেনোফ্রাকে বেশীদিন বাঁচতে দেবে না। তখন ফোরোস আবার রাজা হবে। সে রাজা হলে সে তোমাকে ধ্বংস করবে। তখন গলনালার আর কোন আশা থাকবে না। ভূতপূর্ব রাজা জাইগো আবার শাসনক্ষমতায় ফিরে না এলে অবস্থার কোন উন্নতি হবে না। একটু চেষ্টা করলেই এটা সম্ভব হতে পারে কারণ নগরের জনগণ আর বেশীর ভাগ যোদ্ধা ফোরোসের প্রতি বিরক্ত।

একজন লম্বা নিগ্রো টারজনের কাছে এসে বলল, আমাকে চিনতে পারছ না মালিক ?

টারজন বলল, হ্যাঁ পারছি। তুমি হচ্ছ জেম্বা। তুমি ক্যাথনিতে যুডোর বাড়িতে কাজ করতে। কিকরে এলে এখানে ?

জেম্বা বলল, একবার অভিযানের সময় এরা আমাকে বন্দী করে আনে। সেই থেকে বন্দী হয়ে আছি। এরা বড় নিষ্ঠুর। এখানে খাটুনিও বেশী। আমি এখন ক্যাথনিতে ফিরে যেতে চাই।

টারজন বলল, সেখানে গেলে তুমি স্বাধীনতা পাবে। তোমার পুরনো মালিক এখন ক্যাথনির রাজা হয়েছে।

সে যদি জানতে পারে আমি এখানে বন্দী হয়ে আছি তাহলে সে এ্যাথনির উপর যুদ্ধ ঘোষণা করে আমাকে মুক্ত করবে।

ভালথর বলল, তাহলে ক্যাথনির সেনাদলকে আমরা বরণ করে নেব। কিন্তু তার সম্ভাবনা নেই। কারণ তাকে তোমার সম্বন্ধে কিছু জানাবার কোন উপায় নেই।

টারজন বলল, আমার এই গলার বেড়ীটা একবার খুলতে পারলে আমি

নিজে ক্যাথনিতে গিয়ে যুডোর সেনাবাহিনীকে নিয়ে আসতাম। যুডো নিজে এসে আমার বন্ধুদের মুক্ত করত।

দিনকতক এইভাবে কেটে গেল। প্রাসাদের কোন খবর ক্রীতদাসদের বাসায় আসে না। সকাল হলেই ক্রীতদাসরা কাজ করতে চলে যায়। টারজন একা পড়ে থাকে শৃংখলিত অবস্থায়। তবু মনের জোর কমে না টারজনের। তার আপাতশান্ত চেহারাটার অন্তরালে এক প্রচণ্ড ক্রোধ উত্তাল হয়ে উঠতে থাকে দিনে দিনে।

একদিন বিকালবেলায় ক্রীতদাসরা কাজ থেকে ফিরলে কয়েকজন অফিসার এসে প্রতিটি ক্রীতদাসকে গুণে হিসাব নিতে লাগল। সব ক্রীতদাসদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগল। টারজন জানতে পারল কয়েকজন ক্রীতদাসের একটি দল পালাবার চেষ্টা করে এবং তাদের হাতে একজন অফিসার নিহত হয়। হিসাব নিয়ে দেখা গেল তিনজন ক্রীতদাস পালিয়ে গেছে। তাদের মধ্যে জেম্বাও আছে।

অফিসারেরা চলে গেলে টারজন দেখল ক্রীতদাসরা সব বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে। একটু উস্কানি পেলেই তাদের চাপা ক্ষোভ ফেটে পড়ে আগুনের মত জ্বলে উঠবে। ভালথর তাদের বুঝিয়ে ধৈর্য ধরে শান্ত হয়ে থাকতে বলল।

ভালথর বলল, এখন আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। সুশিক্ষিত সশস্ত্র যোদ্ধাদের সঙ্গে পেরে উঠব না। নগরবাসীদের মধ্যেও দারুণ অসন্তোষ। জাইগো একদিন ফিরে এসে আবার রাজা হবে। ততদিন অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

একজন ক্রীতদাস বলল, রাজা যেই হোক, আমাদের ত ক্রীতদাসই থাকতে হবে।

ভালথর বলল, না, জাইগো রাজা হলে তোমরা মুক্তি পাবে। আমি কথা দিচ্ছি।

ক্রীতদাসরা বলল, আমরা একমাত্র তোমার কথায় বিশ্বাস করি।

রাত্রিতে ক্রীতদাসরা তাদের খাবার রান্না করে নিত। হাতির মাংস আর মাঠ থেকে চুরি করে আনা কিছু শাকসব্জী দিয়ে একটা ঝোল রান্না করত ওরা।

টারজন আসার পর থেকে স্পাইক খুব ভয় পেয়ে যায়। সে বুঝতে পারে তারা এখান থেকে মুক্তি পেলেও হীরেটা টারজন নিয়ে নেবে। স্ট্রোনের অবশ্য কোন ভয় নেই। তার শুধু একমাত্র চিন্তা তার বোন গলনালার কেউ যেন কোন ক্ষতি না করে। এখনো তার ধারণা গলনালা তার বোন। হীরেটা সম্বন্ধে তার কোন চিন্তা নেই।

একদিন সন্ধ্যার পর একজন অফিসার এসে ভালথরের গলায় একটা লোহার বেড়ী পরিয়ে দিয়ে গেল।

ভালথর অফিসারকে বলল, জানতে পারি কি কোরোস আমাকে এভাবে কেন সম্মানিত করেছে?

অফিসার বলল, কোরোস নয়, মেনোফ্রার আদেশ। তিনিই এখন দেশ শাসন করছেন।

ভালথর বলল, তোমাদের রাণী নিচের তলার মানুষ বলে সামন্তদের উপর ওর এত রাগ। কোরোস তাকে বিয়ে করার আগে মেনোফ্রা ছিল একটা রাস্তার মেয়ে।

২১

ভালথরের গলায় লোহার বেড়ী পরিয়ে দিলে ক্রীতদাসরা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। রাণীর ধারণা ভালথরই ক্রীতদাসদের ক্ষেপিয়ে তুলছে। তাই তার এই শাস্তি। কিন্তু সে জানত না ক্রীতদাসদের ক্ষেপানো দূরের কথা তাদের শান্ত করারই চেষ্টা করে ভালথর। তার একমাত্র দোষ ক্রীতদাসরা তাকে ভালবাসে।

উড একদিন জানতে পারল দু একদিনের মধ্যেই টারজন আর ভালথরকে নগরের বাইরে ক্রীড়াঙ্গনে নিয়ে গিয়ে সিংহকে দিয়ে খাওয়ানো হবে। সিংহের সঙ্গে সকলের সামনে লড়তে হবে তাদের। অথবা হাতি দিয়ে পিষিয়ে মারা হবে।

ভালথর বলল, আমরা মরতে ভয় পাই না। সাহসের সঙ্গে কিভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হয় তা জানি।

টারজনকে এভাবে মরতে হবে শুনে মর্মাহত হল উড। টারজন তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

নির্দিষ্ট দিনে বিকালবেলায় প্রায় পঞ্চাশজন যোদ্ধা এসে টারজন আর ভালথরকে বন্দীশালা থেকে বার করে নিয়ে গেল। প্রাসাদ থেকে এক বিরাট মিছিল বেরিয়ে তা নগরের বাইরে ক্রীড়াঙ্গনে যাবে। তার সঙ্গে নগরের বহু লোক যাবে দর্শক হিসাবে।

প্রাসাদের সামনেই মিছিলটাকে গড়ে তোলা হচ্ছিল। মিছিলে অনেক সুসজ্জিত হাতি ছিল। সেই সব হাতির পিঠে একজন করে গণ্যমান্য লোকদের বসার জন্য একটা হাওদা সাজানো হয়েছিল। সব হাওদাগুলোই খোলা ছিল এবং তাতে কয়েকজন করে বসবে। একটা হাওদা রাণী মেনোফ্রার জন্য বিশেষভাবে সাজানো হয়েছিল। তাতে শুধু রাণী একা বসবে।

রাণী মেনোক্রা হাওদার উপর বসলে ভালথর এক অট্টহাসি হেসে চীৎকার করে বলতে লাগল, দেখ দেখ, রাস্তার একটা বাজে মেয়ে রাণী হয়েছে। রাণীর মত ভাব দেখাচ্ছে। অথচ মুকুটটা কিভাবে মাথায় পরতে হয় তাই জানে না। মুকুটের পিছন দিকে সামনে করে পরেছে।

কথাটা মেনোক্রার কানে যেতে রাগে লাল হয়ে উঠল সে। মুকুটটা মাথা হতে খুলে পাশে নামিয়ে রাখল।

একশোটা সুসজ্জিত হাতি সারবন্দীভাবে এগিয়ে চলতে লাগল ধীর গতিতে। সশস্ত্র যোদ্ধারা পায়ে হেঁটে যেতে লাগল। দুপাশে দর্শকরা যেতে লাগল নীরবে।

টারজন দেখল মিছিলটা যতই জাঁকজমকপূর্ণ হোক, তার মধ্যে প্রাণ নেই। জনতার মধ্যে নেই কোন উল্লাস বা হর্ষধ্বনি।

টারজন আর ভালথরকে শৃংখলিত অবস্থায় পায়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বধ্যভূমির দিকে। তাদের দেখে জনতার ক্ষোভ বেড়ে যাচ্ছিল। ক্রীড়াঙ্গন নয়, যেন এক বধ্যভূমির দিকে নীরব নিষ্প্রাণ একটা মিছিল এগিয়ে চলেছিল ধীর গতিতে।

রাজপথের উপর দিয়ে গিয়ে দক্ষিণ দিকের নগরদ্বারে গিয়ে পৌছল শোভাযাত্রাটা। অবশেষে নগরদ্বার পার হয়ে পূব দিকে ঘুরে ক্রীড়াঙ্গনে মিছিলটা যেতেই টারজন আর ভালথরকে শোভাযাত্রা থেকে বার করে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো। ঢোকার মুখে অনেক সশস্ত্র প্রহরীর ব্যবস্থা ছিল।

আরো অনেক বন্দীকে টারজনদের কাছে আনা হলো। ভালথর টারজনকে বলল, এরা হচ্ছে সেই সব সামন্ত যারা এরিথরাদের দলে যোগদান করেনি। কোয়োস আর মেনোক্রা মনে করে সব সামন্ত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের হত্যা করে তারা নিষ্কণ্টক হয়ে উঠবে। তাদের বিরোধিতা করার আর কেউ থাকবে না। কিন্তু এভাবে শত্রুর শেষ করা যায় না। শত্রুর শেষ করতে গিয়ে আরো শত্রু বাড়াচ্ছে।

কুস্তিখেলা অর্থাৎ নিধনযজ্ঞ শুরু হলো। হাতির পিঠ থেকে নেমে মেনোক্রা রাজার জন্য নির্মিত মঞ্চে গিয়ে বসল।

প্রথম লড়াই হবে দুজন লোকের মধ্যে। দুজন প্রতিযোগীর মধ্যে একজন হলো বিশালবপু একজন সামন্ত যোদ্ধা; তার হাতে ছিল বর্শা আর তরবারি। আর একজন হলো একজন ভূতপুর্ব সামন্ত যার হাতে ছিল একমাত্র একটা ছোরা। এটা কোন খেলা বা প্রতিযোগিতা নয়, সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। সশস্ত্র যোদ্ধাটার নাম হায়ার্ক।

টারজন ভালথরকে বলল, মোটা লোকটাকে সহজেই মারতে পারত ও।

টারজনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একজন রক্ষী তাকে বলল, তুমি হায়ার্ক মারতে পারতে ?

টারজন বলল, কেন পারব না। ও ত একটা জড়সড় কাপুরুষ।

রক্ষী বলল, কি বলছ হায়ার্ক কাপুরুষ ? ওর মত সাহসী এরিথরাদের মধ্যে আর একজনও নেই।

হায়ার্কের অসম প্রতিযোগীর বিকৃত মৃতদেহটাকে ক্রীতদাসরা সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, হায়ার্ক তখন বীর বিক্রমে পায়চারি করছিল। রাণী মেনোফ্রা হাত নেড়ে তাকে অভিনন্দন জানাল।

একজন অফিসার পরের প্রতিযোগীদের ডাকতে লাগল। টারজনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা সেই রক্ষী তখন অফিসারকে টারজনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, এই লোকটা বলছে হায়ার্ককে বধ করতে পারবে। লড়াইটা দেখে খুশি হবে এবং মজা পাবে মেনোফ্রা।

অফিসার বলল, আগে এই লড়াই হয়ে যাক। তারপর মেনোফ্রার মত নেব।

পরের প্রতিযোগী ছিল একজন বৃদ্ধ লোক আর একটা সিংহ। বৃদ্ধের হাতে ছিল শুধু একটা ছোরা।

টারজন বলল, সিংহটাও বুড়ো। তার অনেকগুলো দাঁত নেই।

ভালথর বলল, তবু লোকটাকে মেরে ফেলার মত শক্তি ওর আছে।

সেই রক্ষীটি তখন টারজনের পাশ থেকে বিদ্রূপের সুরে বলল, তুমি কি সিংহটাকেও মেরে ফেলতে পারবে নাকি ?

টারজন বলল, সম্ভবতঃ পারব।

একথা শুনে হো হো শব্দে হেসে উঠল রক্ষীটি।

সিংহটার হাতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মৃত্যু ঘটল বৃদ্ধটির। এর পরই হায়ার্কের সঙ্গে টারজনের লড়াইএর অনুমতি দিল মেনোফ্রা। অফিসার অনুমতি পেয়ে ঘোষণা করল, একদিনের মধ্যে দুটো লোককে মারতে পারলে হায়ার্ককে ক্যাপ্টেন করবে রাণী মেনোফ্রা।

সেই রক্ষী তখন অফিসারকে বলল, এই বুনো লোকটা বলছে সিংহটাকেও মারতে পারবে ও।

অফিসার বলল, তার আগে হায়ার্কই ত ওকে মেরে ফেলবে। তাহলে কিকরে বুঝব ও সিংহ মারতে পারবে।

টারজন চীৎকার করে বলল, একই সঙ্গে হায়ার্ক আর সিংহটার সঙ্গে লড়াই করব অবশ্য হায়ার্ক যদি সিংহ দেখে ভয় না পায়।

অফিসার উৎসাহিত হয়ে বলল, তাহলে ত খুব ভাল কথা। এখনই অনুমতি নিয়ে আসছি।

কিছুক্ষণের মধ্যে মেনোক্রার অনুমতি নিয়ে এল অফিসার।

হায়ার্কের কিন্তু এ প্রতিযোগিতায় মন ছিল না। সে মেনোক্রাকে জানাল তার স্ত্রী অসুস্থ। তাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে তখনি। কিন্তু মেনোক্রা বলল, সে যদি বুনো লোকটার সঙ্গে লড়াই না করে তাহলে তাকে সে খুন করবে।

টারজনকে একটা ছোরা দেওয়া হলো। লড়াই শুরু হয়ে গেল। একটা সিংহকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য লোক চলে গেল। হায়ার্ক ভাবল সিংহটা আসার আগেই টারজনকে মেরে ফেলতে পারলে তার আর কোন ভয় থাকবে না। তাই সিংহটা আসার আগেই সে তার বর্শাটা সজোরে ছুঁড়ে দিল টারজনের খোলা বুকটা লক্ষ্য করে।

কিন্তু টারজন এক আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বর্শার বাঁটটা ধরে ফেলল। তারপর বর্শাটাকে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। হায়ার্ক তখন তার তরবারিটা বার করতে গেল। কিন্তু তার আগেই টারজন লোহার মত শক্ত হাত দিয়ে তাকে ধরে ঘোরাতে লাগল। দর্শকরা হর্ষধ্বনি করে অভিনন্দন জানাল টারজনকে।

এমন সময় সিংহটা টারজনের দিকে আসতে লাগল। টারজন তার ছোরাটা আগেই ঢুকিয়ে রেখেছিল তার কৌপীনের মধ্যে। তাতে দর্শকরা আরো আশ্চর্য হয়ে যায়।

টারজন তার পরিকল্পনামত হায়ার্ককে ধরে সিংহের দিকে ছুঁড়ে দিল। হায়ার্ক উঠেই প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল। টারজন জানত ছুটন্ত লোককে আগে ধরে সিংহরা। হলোও ঠিক তাই। হায়ার্ক যদি একপাশে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে সিংহটা টারজনকেই ধরতে যেত। হায়ার্ক সিংহটার সঙ্গে ছুটে পেরে উঠল না। এক লাফে তাকে ধরে তার মাথাটা চিবোতে লাগল সিংহটা। মেনোক্রার মঞ্চের কাছেই হায়ার্ক ধরা পড়ে সিংহের হাতে।

টারজন এবার ফেলে দেওয়া বর্শাটা কুড়িয়ে নিয়ে সিংহটার কাছে নির্ভয়ে চলে গেল। সিংহটা তখন হায়ার্কের মৃতদেহটাকে খাচ্ছিল। তার কাছে গিয়ে টারজন হাত থেকে বর্শাটা ফেলে দিয়ে সিংহটার কেশর আর তার পিঠের আলগা চামড়া ধরে তাকে মৃতদেহটা সমেত উপর থেকে শূন্যে তুলে ফেলল। তারপর তার অতি-মানবিক শক্তির সাহায্যে সিংহটাকে ঘোরাতে ঘোরাতে মেনোক্রার মঞ্চের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। চেয়ারসমেত উল্টে পড়ে গেল মেনোক্রা। কিন্তু তার কোন ক্ষতি হলো না। কারণ সিংহটা ভয়ে আর্তনাদ করছিল। সে উঠেই মুক্তির জন্য পালাতে লাগল।

চারদিকের তুমুল চীৎকার ও হৈচৈ স্তব্ধ হয়ে গেলে ভারপ্রাপ্ত অফিসার টারজনের কাছে এসে জানাল, তুমি সিংহটাকে মেনোক্রার চেয়ারের উপর

ফেলে না দিলে মেনোক্রা তোমাকে মুক্তি দিত। এখন ও তোমাকে অবিলম্বে মারার জন্য আদেশ দিয়েছে। তোমাকে হাতির পায়ের তলায় পিষে মারা হবে।

ভালথর টারজনকে বলল, এবার কি করবে? কিছু ভেবেছ?

টারজন বলল, কি আর করব? আমি ত একটা হাতিকে মেনোক্রার উপর ফেলে দিতে পারি না। বিশেষ করে যে হাতিটা আসছে আমাদের মারার জন্য সেটাকে ত নয়ই। আমি ওকে একবার ধরার চেষ্টা করি। আকারে যেমন বিরাট, স্বভাবের দিক থেকে তেমনি বুনো। ও ভীষণ বিপজ্জনক।

রঙ্গভূমির কেন্দ্রে টারজন আর ভালথরকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। হাতিটা প্রথমে ওদের দেখতে পায়নি। সে পালাবার পথ খুঁজছিল।

হাতিটা হঠাৎ টারজনদের দেখতে পেয়ে শুঁড় দুলিয়ে সেইদিকে আসতে লাগল।

টারজন দেখল হাতিটার একটা দাঁত কালো। তা দেখে ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, একদিন ও এই হাতিটাকেই গর্ত থেকে উদ্ধার করেছিল। গর্তের উপর দাঁড়িয়ে কয়েকটা হায়েনা অট্টহাসি হেসেছিল। মাথার উপর শকুনি উড়ে বেড়াচ্ছিল।

হাতিটা গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছিল। টারজন তখন কিছুটা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা হাত তুলে তাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, ডাণ্ডো ট্যাণ্টর! টারজন হো!

সে ডাক শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল সেই বিরাট হাতিটা। ভালথরকে তার পিছু পিছু আসতে বলে টারজন হাতিটার কাছে গিয়ে তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে তাকে বলল, টারজন! টারমাঙ্গানি!

হাতিটা তখন একে একে টারজন আর ভালথরকে শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে পিঠের উপর তুলে নিল। টারজন তখন পশুদের ভাষায় পালিয়ে যেতে আদেশ করল এবং হাতিটা তা বুঝল।

কাঠের বেড়া ভেঙ্গে গেট ভেঙ্গে হাতিটা বেগে চলে গেল ক্রীড়াঙ্গনের সীমানার বাইরে। এ্যাথনির যোদ্ধারাও মিছিলের হাতিগুলোর পিঠে চেপে তাদের ধরতে বেরিয়ে গেল।

টারজনরা আধ মাইল যাবার পর দেখল একদল হাতির পিঠে চেপে এ্যাথনির যোদ্ধারা তাদের ধরতে আসছে। টারজন বলল, পিঠে পাঁচ ছজন করে লোক আছে। ওদের আসতে দেরী হবে।

ভালথর বলল, আর আধ ঘণ্টা যেতে পারলে আমাদের আর ধরতে পারবে না।

একসময় হঠাৎ সামনের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল। টারজনকে বলল, ঐ দেখ, একদিকে হাতির দল আর একদিকে ক্ষুধিত সিংহের মাঝখানে পড়ে গেছি।

মুখ ঘুরিয়ে দেখল টারজন, ভয়ঙ্কর একদল সিংহ নিয়ে ক্যাথনি থেকে এক সেনাবাহিনী আসছে এ্যাথনির দিকে।

ভালথর বলল, একটা উপায় আছে। পুবদিকের পাহাড়গুলোর দিকে হাতিটাকে চালিয়ে নিয়ে যাও। সেখানে গিয়ে জাইগো আর তার অনুচরদের সঙ্গে কথা বলব।

টারজন বলল, ক্যাথনি থেকে যারা আসছে তারা আমাদের বন্ধু। ওদের কাছ থেকে পালাব কেন?

ভালথর বলল, তবে তোমাকে চিনতে পারার আগে যেন শিকারী সিংহগুলোকে ছেড়ে না দেয়। কারণ ওরা শিকারী সিংহ। হাতির পিঠে লাফ দিয়ে মানুষ ধরে ওরা।

টারজন বলল, তাহলে এইখানে নেমে সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে আমাদের পরিচয় দিই।

ভালথর বলল, তাহলে ওরা আমাদের ধরে ফেলবে।

দেখা যাক না চেষ্টা করে।

এই বলে টারজন হাতিটাকে কি বলতে সে তাদের নামিয়ে দিল। তারপর টারজন হাতিটার কানে কানে কি বলতে সে মুখ ঘুরিয়ে এ্যাথনির হস্তীবাহিনীকে আক্রমণ করার জন্য ছুটে গেল।

টারজন বলল, আমরা অন্ততঃ কিছুক্ষণ সময় পাব।

ক্যাথনির যোদ্ধাদের মধ্য থেকে একজন অফিসার টারজনকে তাদের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে ছুটে এল টারজনের কাছে। টারজন দেখল সে হলো জেমনন। সে বলল, আমরা ত তোমাকেই উদ্ধার করতে যাচ্ছি। আমি দূর থেকেই তোমাকে দেখতে পাই।

টারজন বলল, কি করে জানলে আমি বন্দী হয়ে আছি?

জেধা পালিয়ে যায় এখান থেকে। সে-ই খবর দেয় আমাদের। জেধা ঘুডোকে খবর দেয় তোমাকে ওরা হত্যা করবে।

টারজন বলল, আমার দুতিনজন বন্ধু এখনো বন্দী হয়ে আছে এ্যাথনিতে। তবে কোয়োসের একদল সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ অবস্থায় এখানেই পাবে।

ঘুডোও এগিয়ে এসে ওদের অভ্যর্থনা জানাল। ঘুডো ও জেমনন ভালথরকে চিনত। তারা দুজনেই ভালথরকে অভ্যর্থনা ও শুভেচ্ছা জানাল।

ঘুডো বলল, এ্যাথনির আগেকার সামন্তদের প্রতি আমার সমর্থন আছে।

ভালথর বলল, ঘুডো আমাদের সহায় আছে। আমরা জাইগোকে আবার সিংহাসনে বসাব। তোমাদের সিংহবাহিনীকে ছেড়ে দাও।

এদিকে কালো দাঁতওয়ালা বুনো হাতিটা এ্যাথনির হস্তীবাহিনীকে আগেই ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। অনেক যোদ্ধা হাওদা থেকে পড়ে গেছে। আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে অনেক হাতি মরে গেছে।

এমন সময় ক্যাথনির শিকারী সিংহরা হাতিগুলোর পিঠে লাফ দিয়ে উঠে যোদ্ধাদের ছিঁড়ে খুঁড়ে খেতে লাগল। তারা হাতিগুলোর কোন ক্ষতি করল না। হাতির পিঠ থেকে নেমে এ্যাথনির যোদ্ধারা বর্শা নিয়ে আক্রমণ করার আগেই ক্যাথনির পদাতিক সৈন্যরা আক্রমণ করল। এ্যাথনির সৈন্যরা নগরে না গিয়ে বিভিন্ন দিকে পালাতে লাগল।

যুডো তার বিজয়ী বাহিনীকে নিয়ে এ্যাথনিতে প্রবেশ করল। টারজন আর ভালথর তার সঙ্গেই ছিল। কেউ তাদের বাধা দিল না।

তারা গিয়েই প্রথমে উড, স্পাইক আর স্ট্রোনকে মুক্ত করল। তারপর উডকে নিয়ে তারা প্রাসাদের মধ্যে গলনালার খোঁজে চলে গেল। প্রাসাদের রক্ষীরা ভয়ে পালাতে লাগল।

গলনালা যে ঘরে বন্দী ছিল সে ঘরের তালা ভেঙ্গে ঢুকে ওরা দেখল ছুরি হাতে ফোরোসের মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে আছে গলনালা। উডকে দেখতে পেয়েই গলনালা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরল।

গলনালা বলল, মেনোফ্রা মরে যাওয়ায় ফোরোস আমায় জ্বালাতন করতে থাকে। তাই তাকে আমি হত্যা করেছি।

জাইগোকে ডাকিয়ে আনিয়ে তাকেই এ্যাথনির সিংহাসনে বসানো হলো।

টারজনরা এক সপ্তাকাল এ্যাথনিতে থেকে গেল। তারপর তার বাড়ির দিকে রওনা হলো টারজন। নগরের বাইরে গিয়ে দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগল তারা। কিছুদূর যাবার পর মুভিরোর সঙ্গে দেখা হলো তাদের। একশোজন যোদ্ধার এক দল নিয়ে টারজনের খোঁজে আসছিল মুভিরো।

স্পাইক আর স্ট্রোনকে এই শর্তে মুক্তি দিল যে তারা সোজা কোন উপকূলে চলে যাবে এবং তারা আর কখনো আফ্রিকায় আসবে না। উড আর গলনালা টারজনের সঙ্গে তাদের বাড়িতে যাবে।

স্পাইকের কাতর অনুনয় বিনয়ে হীরের তালটা তাকে দিয়ে দিল টারজন। ওরা চলে গেলে উড আর গলনালা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে টারজন হেসে বলল, ওটা আসল গলফান নয়। আসলটা আমার বাড়িতে আছে। ওটা নকল গলফান মাফকার কাছে থাকত। পান্নার তালটাও আমি উদ্ধার করে পথে এক জায়গায় পুঁতে রেখেছি।

টারজন এ্যাণ্ড দি লায়ন ম্যান

টারজন ও সিংহমানব

স্টুডিওর অফিস ঘরে বসে প্রযোজনা সমিতির সহ-সভাপতি মিল্টন স্মিথ তার সহকারীদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। তার ছয়জন সহকারীদের কাছে তার নতুন ছবির পরিকল্পনা সম্বন্ধে তার বক্তব্য বোঝাচ্ছিল হাত নেড়ে।

সে বলল, জোড়া লাগানো কোন নকল জঙ্গল নয়, নকল শব্দ নয়, দন্তহীন নির্জীব যেসব সিংহ সাধারণত ছবিতে দেখানো হয় সেসব কিছুই নয়। এ ছবিতে সবকিছুই জীবন্ত দেখানো হবে।

একজন সেক্রেটারি এসে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকে খবর দিল, ওরমান এসে গেছেন।

মিল্টন স্মিথ তার হাত দুটো ঘষে বলল, নিয়ে এস তাকে এখানে। ওরমানের কথা ভাবলেও প্রেরণা পাওয়া যায়। এ ছবি তৈরীর কাজে সেই হলো আসল লোক।

ঘরের মধ্যে থেকে একজন বলল, হ্যাঁ, আপনি একদিন ওরমানের কথা বলেছিলেন।

এরপর ঘরের দরজা ঠেলে সেক্রেটারি ওরমানকে নিয়ে এলে স্মিথ উঠে গিয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করল। ঘরের সকলেই তাকে অভ্যর্থনা জানাল।

স্মিথ করমর্দন করে বলল, তোমাকে দেখে খুশি হলাম ওরমান। তুমি বোর্নিও থেকে আসার পর আর তোমার দেখা পাইনি। সেখানে তুমি একটা বড় কাজ করেছ। কিন্তু তার থেকে আরো বড় একটা কাজ তোমার জন্য রেখেছি। তুমি জঙ্গলের উপর তোলা কিছু ভাল ছবি দেখেছ আশা করি।

ওরমান বলল, হ্যাঁ, দেখেছি। এখন অনেকেই জঙ্গলের উপর ছবি তৈরী করছে।

স্মিথ বলল, এই সব জঙ্গলের উপর তোলা ছবি হলিউডের পঁচিশ মাইলের মধ্যেই কোন না কোন জায়গা থেকে তোলা হয়। তার মধ্যে শুধু আফ্রিকার ছবি আর গলার স্বর জুড়ে দেওয়া হয়।

ওরমান বলল, কোথায় ছবি তোলা হবে ? হলিউডের আশেপাশে ?

স্মিথ বলল, না স্যার। আমরা একটা দলকে আফ্রিকার জঙ্গলের গভীরে পাঠাচ্ছি। সে জঙ্গলটার নাম কি জো ?

ইতুরি জঙ্গল।

একবার ভেবে দেখ টম, ঐ ইতুরি জঙ্গলে সব শব্দ-যন্ত্র নিয়ে যাওয়া হবে। ছবি তোলার সব সরঞ্জাম পাঠানো হবে। সেখানে সব বাস্তব ও জীবন্ত জিনিস পাবে। সেখানকার জঙ্গল, জীবজন্তু, আদিবাসী, তাদের গলার শব্দ, সব তোলা হবে। মনে কর একটা জিরাফের ছবি তুললে, তার সঙ্গে সঙ্গে তার গলার স্বরটাও তুলে নেবে।

ওরমান বলল, তার দরকার হবে না স্মিথ। কারণ জিরাফের গলায় শব্দ নেই।

স্মিথ বলল, তাতে কি হয়েছে ? অন্যান্য জীবজন্তুর গলার স্বর রেকর্ড করবে। যেমন ধর সিংহ, হাতি, বাঘ, জো তার গল্পে একটা বাঘের ঘটনা জুড়ে দিয়েছে। তা দেখে দর্শকরা তাদের আসন থেকে লাফিয়ে উঠবে।

ওরমান বলল, কিন্তু আফ্রিকার জঙ্গলে ত বাঘ পাওয়া যায় না। আমি বলছি।

স্মিথ চিত্রনাট্যরচয়িতা জোএর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, কি জো ?

জো বলল, তুমি একটা বাঘের দৃশ্য চেয়েছিলে। তাই আমি সেটা জুড়ে দিয়েছি।

স্মিথ বলল, তাতে কি হয়েছে। বাঘের পরিবর্তে আমরা একটা কুমীরের ঘটনা জুড়ে দেব।

ওরমান বলল, আপনি আমাকে ছবিটি পরিচালনা করতে বলছেন ?

স্মিথ বলল, হ্যাঁ, এবং এ ছবি করে তুমি বিখ্যাত হয়ে যাবে।

ওরমান বলল, বিখ্যাত হব কিনা জানি না তবে আমি আফ্রিকায় কখনো যাইনি। তাই সেখানে যেতে আমার ভাল লাগবে। মধ্য আফ্রিকায় শব্দযন্ত্রসহ ট্রাক নিয়ে যাওয়া চলবে ত ?

স্মিথ বলল, আমরা সব ব্যাপারটা আলোচনা করে দেখছি। আমরা তাই মেজর হোয়াইটকে বসিয়ে রেখেছি। মেজর হোয়াইট, ইনিই হলেন পরিচালক ওরমান। মেজর একজন নামকরা শিকারী এবং আফ্রিকার জঙ্গলের সবকিছু পড়া বইএর পাতার মত জানা আছে ওর। ও আমাদের দলের সঙ্গে টেকনিক্যাল এ্যাডভাইজার হিসাবে যাচ্ছে। আচ্ছা, ট্রাকগুলো নিয়ে যাওয়া চলবে ত ?

ওরমান বলল, আপনি খরচ করলে ঠিক নিয়ে যাওয়া চলবে।

স্মিথ বলল, ঠিক আছে। এখন চিত্রকাহিনীটা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু

বলছি। আমাদের যে কাহিনীটা জো লিখেছে তার নেতা হলো এমনই একজন মানুষ যার আফ্রিকার জঙ্গলে জন্ম হয় এবং সে সেখানেই লালিত পালিত হয়। সে একটা সিংহের দুধ খেয়ে মানুষ হয়। সে সিংহদের মাঝেই থাকত। বড় হয়ে সে সিংহদের রাজা হয়। তারপর একটি মেয়ের সংস্পর্শে আসে সে। সে জীবনে মেয়ে কখনো দেখেনি। মেয়েটি একদিন একটা পুকুরে স্নান করছিল। এমন সময় সেই সিংহমানুষ তার কাছে এল। কেমন লাগছে? ভাল ত?

ওরমান বলল, ভালই ত মনে হচ্ছে। এখন কথা হচ্ছে সেই সিংহমানুষের ভূমিকায় কে অভিনয় করবে?

স্মিথ বলল, তার চেহারাটা চমৎকার। যেকোন মেয়ে তাকে দেখলেই ঘাবড়ে যাবে।

ওরমান বলল, কে সে? তার নাম কি?

তার নাম স্ট্যানলি ওবরস্কি।

তার নাম ত কখনো শুনিনি।

না শুনলেও সে কিন্তু বিখ্যাত লোক।

সে অভিনয় করতে পারে ত?

অভিনয় করতে পারে মানে? তাকে দেখলেই অভিনেতা বলে মনে হয়। তাকে চেষ্টা করে অভিনয় করতে হয় না।

ওরমান বলল, আর কে কে অভিনয় করছে? কোন্ ভূমিকায় কে অভিনয় করছে?

স্মিথ বলল, ওবরস্কির নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছে নাওমি ম্যাডিসন। কিন্তু বিষুবরেখার কাছে আফ্রিকায় বড় গরম। ও হয়ত গলে যাবে দারুণ গরমে। তারপর গর্ডন মার্কাস ম্যাডিসনের বাবার ভূমিকায় অভিনয় করছে। ভূমিকাটা হলো এক শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীর। মেজর হোয়াইট যিনি এখানে এখন বসে রয়েছেন তিনি অভিনয় করছেন এক শ্বেতাঙ্গ শিকারীর ভূমিকায়।

মেজর হোয়াইট বলল, খুব একজন সুদক্ষ শিকারীর ভূমিকায় আমি অভিনয় করতে পারব বলে মনে হয় না।

ওরমান বলল, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না মেজর, আপনি শুধু সাধারণ এক শিকারীর মত নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করে যাবেন।

চিত্রনাট্যকার জো বলল, আপনাদের কাউকে কিছু ভাবতে হবে না, সব ভাবনা পরিচালকের।

ওরমান বলল, এখন নাওমির কথায় আসা যাক স্মিথ। সাধারণতঃ সে ক্যাবারে নাচের দৃশ্যে আর যুবক যুবতীদের নিয়ে তোলা ছবিতে ভাল অভিনয় করে। কিন্তু সিংহ আর হাতিদের মত সব জীবজন্তুদের নিয়ে তোলা ছবিতে

সে কেমন অভিনয় করবে কে জানে ?

স্মিথ বলল, তার হয়ে অনেক সময় তার ড্যামিরূপে অভিনয় করার জন্য আমরা রোগা টেরীকেও পাঠাচ্ছি।

ওরমান বলল, আর সব কে কে আমার দলে থাকবে ? আমার ক্যামেরাম্যান কে হবে ?

বিল ওয়েস্ট।

চমৎকার।

এছাড়া পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশজন ড্রাইভার থাকবে। জেনারেটার ট্রাক আর শব্দযন্ত্রের ট্রাক ছাড়া থাকবে কুড়িটা ট্রাক। পাঁচটা প্রাইভেট কার যাবে যাত্রীদের নিয়ে। তবে আমরা দলের সংখ্যা কমাবার জন্য যারা গাড়ি চালাতে পারে এমন লোকদের থেকে যন্ত্রচালকদের বাছাই করেছি। দুঃখের বিষয় তুমি তখন শহরে ছিলে না। থাকলে তুমি তোমার পছন্দমত লোকদের নিতে পারতে। অথচ আমাদের খুব তাড়াতাড়ি এই কাজটা সারতে হয়েছে। একমাত্র সহকারী পরিচালক ছাড়া অন্য সবাই চুক্তিপত্রে সই করেছে। সহকারী পরিচালক হিসাবে যাকে খুশি তুমি নিতে পার।

স্মিথের কথা শেষ হতে ওরমান বলল, কিন্তু কবে আমরা আফ্রিকা রওনা হচ্ছি ?

আজ হতে দশ দিনের মধ্যে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওরমান বলল, কী আশ্চর্য জীবন আমাদের! ছয় মাস বোর্নিওতে থাকার পর হলিউডে এসে মাত্র দশ দিন থাকার পর আবার আফ্রিকা রওনা হতে হবে এবং ছয় মাস কাটাতে হবে সেখানে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শেখ আবেল বেনেম আর তার আরব অনুচরেরা দলের পিছন থেকে সব দেখছিল। তারা দেখছিল দু'শো জন নিগ্রোভৃত্য কিভাবে ন'টন মালবোঝাই একটা ভারী ট্রাককে একটা ছোট্ট স্রোতের কাদা জলে ভর্তি নদীর বুক থেকে টেনে তুলছিল। ওরমান সবকিছুর তদারক করছিল। তার মাথা আর গা থেকে ঘাম ঝরছিল আর সে রাগে ও বিরক্তিতে গালাগালি করছিল।

তার কিছুটা দূরে একটা যাত্রীগাড়ির ভিতরে দুটি মেয়ে বসেছিল আর সেই গাড়ির দরজা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে জেরল্ড বেন একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন আছ নাওমি ?

খুব খারাপ।

আবার জ্বর হয়েছে ?

জিঙ্গা ছেড়ে আসার পর থেকে আর জ্বর হয়নি। তবে আমার মনে হচ্ছে আমি এখনি হলিউডে চলে যাই। কিন্তু মনে হচ্ছে আর সেখানে কোনদিন যেতে পারব না। এখানেই আমায় মরতে হবে।

না, না, ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

অন্ত মেয়েটি তখন বলল, গতরাতে ও একটা স্বপ্ন দেখেছিল।

বেন বলল, রোণ্ডা, তুমি ত বেশ আছ ?

রোণ্ডা বলল, হ্যাঁ, আমার ত মনে হচ্ছে আমি ভাগ্যবতী।

ম্যাডিসন বলল, রোণ্ডা বড় দেহসর্বস্ব। ওর মন বলে কোন জিনিস নেই। আমাদের মত শিল্পীদের স্নায়ুতন্ত্র কত জটিল, কত সূক্ষ্ম তা ও জানে না।

রোণ্ডা হেসে বলল, একজন বিষণ্ণ শিল্পীর থেকে একটা সুখী গরু হয়ে ঘুরে বেড়ানো ভাল।

ম্যাডিসন বলল, গতকাল প্রথম দৃশ্যের ছবি তোলা হয়। সেখানে আমার কাজ ছিল। কিন্তু আমি জ্বরে পড়েছিলাম। আমার হয়ে রোণ্ডাই কাজ করেছে।

বেন বলল, রোণ্ডাকে দেখতে তোমারই মত।

নাওমি ম্যাডিসন বলল, সেটাই ত হলো সমস্যা। লোকে তার অভিনয় ভাববে।

রোণ্ডা বলল, তাহলে তুমিই প্রশংসা পাবে।

ম্যাডিসন বলল, প্রশংসা! আমার নাম যশ সব মাটি হয়ে যাবে। মনে রেখো রোণ্ডা, তুমি সুন্দরী মেয়ে হতে পার, কিন্তু অভিনয়ের কিছুই বোঝ না। লোকে আমার কাছ থেকে ভাল অভিনয় আশা করে। তোমার মধ্যে তা না পেয়ে তারা হতাশ হবে এবং তার জন্য আমাকেই দোষ দেবে।

রোণ্ডা হেসে বলল, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব এবং কথা দিচ্ছি যাতে তোমার নামযশ নষ্ট না হয় তার জন্য ভাল অভিনয় করব।

নাওমি বলল, একজন আরবের পক্ষে শ্বেতাঙ্গ না হয়ে জন্মানোটা যেমন দোষের নয়, তেমনি তোমার পক্ষে ভাল অভিনয় করতে না পারাটাও দোষের নয়। সবাই অভিনয়প্রতিভা নিয়ে জন্মায় না। কিন্তু কতক্ষণ আমাদের এভাবে বসে থাকতে হবে এখানে ?

বেন বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত না ট্রাকগুলোকে কাদা থেকে টেনে তোলা হয়। এটা খুব খারাপ জায়গা। এদিকে আসতে ওরমানকে নিষেধ করা হয়েছিল আগে থেকে। আদিবাসীরা এখনো বিক্ষুব্ধ হয়ে আছে। তারা শান্ত হয়নি।

কিছুক্ষণ তারা নীরবে বসে মাছি তাড়াতে লাগল। আরবরা তাদের টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চেপে সবকিছু দেখতে লাগল।

শেখ আবেল বেন তার পাশের একজন আরবকে বলল, দুটো মেয়ের মধ্যে

কোন্ মেয়েটা হীরকদেশের রহস্য জানে তা জান ?

আরবটা বলল, মেয়েদুটো দেখতে এক।

শেখ বলল, ওদের একজনের কাছে কাগজটা আছে এবিষয়ে তুমি নিশ্চিত ?

আরব বলল, হ্যাঁ কাগজটা ছিল একজন বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গের কাছে। সেই বৃদ্ধই হলো মেয়েটার বাবা। যে শ্বেতাঙ্গ যুবকটা মুখ বাড়িয়ে কথা বলছে মেয়েদুটোর সঙ্গে সে প্রথমে বৃদ্ধকে হত্যা করে কাগজটা হাত করার এক ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু পরে মেয়েটা সে ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে কাগজটা তার বাবার কাছ থেকে নিয়ে নেয়। বৃদ্ধ আর ঐ যুবকটা মনে ভাবছে কাগজটা হারিয়ে গেছে।

শেখ বলল, যে যুবকটা মেয়েটার বাবাকে খুন করার চক্রান্ত করে মেয়েটা তারই সঙ্গে বন্ধুভাবে কথা বলছে। ঐ সব খৃস্টান কুকুরদের লীলাখেলা কিছু বুঝতে পারি না।

আতুই নামে আরবটা বলল, আমিও বুঝতে পারি না। ওরা সত্যিই পাগল। এই ঝগড়া মারামারি করছে নিজেদের মধ্যে, আবার কিছুক্ষণ পরে একসঙ্গে বসে হাসাহাসি করছে আর কথা বলছে। তারা সব কাজ এমন গোপনে করে যে কেউ দেখেও তা বুঝতে পারে না। যুবকটার সামনেই মেয়েটা সেই কাগজটা খুলল, অথচ যুবকটা তা বুঝতে পারল না। পরে সে মেয়েটার বাবার কাছে গিয়ে কাগজটা দেখতে চাইল। মেয়েটার বাবা খুঁজে কাগজটা পেল না। তখন দুজনেই ভাবল কাগজটা হারিয়ে গেছে।

শেখ বলল, সত্যিই ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত। আচ্ছা, তুমি কি ওদের ভাষা বুঝতে পার ?

আতুই বলল, হ্যাঁ, আমি একবার এক বৃদ্ধ শ্বেতাঙ্গের কাছে খাইবার গিরিবর্ত্মে কাজ করেছিলাম।

শেখ দেখতে লাগল ট্রাকগুলোকে নদীর বুক থেকে একে একে তুলে ওপারে নিয়ে গিয়ে সারবন্দীভাবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো। আতুই কিছুক্ষণ ভেবে বলল, যে মেয়েটার কাছে কাগজটা আছে তাকে কখন আমি হাত করতে পারব সেই কথাই ভাবছি।

শেখ বলল, এখন তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। বোকা, ওরা ভাবে আমরা আরব বেদুইনরা কিছু বুঝি না ! ওরা ছবি তৈরীর ভান করে ওদের আসল উদ্দেশ্যকে গোপন করে রাখতে চায়।

দুশোজন নিগ্রোভৃত্য যখন ট্রাকগুলোর সঙ্গে বাঁধা মোটা মোটা দড়ি ধরে টানাটানি করছিল, টমাস ওরমান তখন একটা লম্বা চাবুক হাতে দাঁড়িয়েছিল

তাদের কাছে। তার পোশাকগুলোয় কাদা লেগে ছিল। তার সারা দেহে ঘাম ঝরছিল। তার কোমরে রাইফেলের পরিবর্তে একটা স্কচের বোতল ঝোলানো ছিল। হাতে চাবুক থাকলেও নিগ্রোভৃত্যদের মুখে ক্রুদ্ধ বিক্ষুব্ধ এক নীরবতা বিরাজ করতে দেখে সে চাবুকটা ব্যবহার করছিল না।

ওরমান তার দলবল নিয়ে হলিউড থেকে তিনমাস হলো এখানে এসেছে। কিন্তু যেখান থেকে ছবি তোলার কাজ শুরু হবে, সেই নির্দিষ্ট জায়গাটায় এখনো পৌছতে পারেনি। তার উপর ছবির নায়িকা এমন দূষিত জ্বরে ভুগছে যে সে হয়ত ছবিতে অভিনয় করতেই পারবে না, সমস্ত সময়টা হয়ত তাকে বিছানায় শুয়ে কাটাতে হবে। তার নিজেরও দু-দুবার জ্বর হয় এবং তার পর থেকে তার মনমেজাজ খুব খারাপ হয়ে যায়। সবচেয়ে ভাবনার বিষয় হলো এই যে, এখানকার আদিবাসীরা তাদের পিছু নিয়েছে। তারা এখন প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠেছে তাদের পথে।

হঠাৎ গর্জন করে উঠল ওরমান, কি কুঁড়েমি হচ্ছে ?

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওরমানের চাবুকটা একজন আদিবাসীর কোমরে পড়ল।

ওয়েস্ট বেনের কাছে গিয়ে বলল, ওরমান পাগল হয়ে গেছে। ও যদি চাবুকটা ফেলে না দেয় এবং ওদের শান্তিতে কাজ করতে না দেয় তাহলে আমাদের পরে দুঃখ পেতে হবে।

রোণ্ডা বলল, নিগ্রোরা খুব রেগে আছে সব সময়। তারা একবারও হাসে না বা গান করে না।

ওয়েস্ট বলল, আমি কিছুক্ষণ আগে লক্ষ্য করেছি সর্দার কামুড়ি একবার ওরমানের দিকে তাকিয়েছিল। তার চোখে মুখে ঘৃণার ভাব ফুটে উঠেছিল।

বেন বলল, এখন নিগ্রোদের উপর অত্যাচারের দিন চলে গেছে। কামুড়ি হলো ওদের সর্দার। ঐ সব নিগ্রোভৃত্যদের গাঁয়ের প্রধান। ও যদি রেগে গিয়ে ওদের যেতে বলে তাহলে সবাই আমাদের ছেড়ে চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। তাহলে আমাদের দারুণ কষ্টে পড়তে হবে।

ওয়েস্ট বলল, তাহলে এখন কি করব আমরা ? ওরমান ত আমাদের পরামর্শ চায়নি ? তবে নাওমি, তুমি একটা কিছু করতে পার। তোমাকে ওরমান ভালবাসে। তোমার কথা শুনতে পারে।

নাওমি বলল, আমি নিজের জ্বালায় মরছি। ও যদি নিজের কবর নিজের হাতেই খোঁড়ে তাহলে আমি কি করতে পারি ?

কিন্তু ওর কবর হলে আমাদেরও ত কবরে যেতে হবে।

নাওমি বলল, এখন আমি এখান থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। এই ভয়ঙ্কর জায়গাটা থেকে দূরে চলে যেতে চাই। এখানে বসে বসে আর কতক্ষণ মাছি

তাড়াব? আচ্ছা, স্ট্যানলি ওবরস্কি কোথায় গেল? আজ সারাদিন তাকে দেখতে পাইনি।

বেন বলল, সিংহপুরুষটি হয়ত গাড়ির পিছন দিকে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে।

নাওমি বলল, তোমরা কেউ তাকে দেখতে পার না। তোমরা সারা জীবন কাজ করেও কিছু করতে পারনি। কিন্তু এই বয়সেই সে একজন ভাল অভিনেতা হয়ে উঠেছে। সে একজন সত্যিকারের শিল্পী।

রোগুা বলল, সংকেত পাওয়া গেছে। এবার আমরা আবার যাত্রা শুরু করব।

আবার মোটরবাহিনী এগিয়ে চলল। সামনের দিকে ছিল সশস্ত্র প্রহরী আর মালবাহকরা। সহকারী পরিচালক প্যাট ওগ্রেডির উপর ভার ছিল ট্রাকগুলোর। তার হাতে কোন চাবুক ছিল না। প্যাটের পাশে ছিল মেজর হোয়াইট। হোয়াইট একসময় প্যাট ওগ্রেডিকে বলল, সবকিছুর ভার যদি তোমার উপর থাকত তাহলে খুব ভাল হত। মন মেজাজের দিক থেকে ওরমান মোটেই একাজের উপযুক্ত নয়।

ওগ্রেডি বলল, কি করব, আর কোন উপায় নেই।

মেজর হোয়াইট বলল, টমের কি হলো তা বুঝতে পারছি না।

ওগ্রেডি বলল, ওরমান কিন্তু আগে খুব ভাল ছিল। তার এই ধরনের মনোভাব আগে কখনো দেখিনি।

হোয়াইট বলল, এখন সে খুব বেশীমাত্রায় স্কচ খেতে ধরেছে। মনে হচ্ছে এই জন্যই তার এই অবস্থা।

ওগ্রেডি বলল, জ্বর আর অত্যধিক দুশ্চিন্তাই এর কারণ বলে মনে হচ্ছে।

হোয়াইট বলল, কারণ যাই হোক, আমাদের অবস্থা খারাপের দিকে যাচ্ছে।

ওগ্রেডি কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় সামনের দিকে কতকগুলো রাইফেল গর্জে উঠল একসঙ্গে।

ওগ্রেডি সামনের দিকে চলে গেল।

মেজর হোয়াইট সফরিটার প্ল্যাঙ্কের দিকে গিয়ে পৌঁছবার আগেই গুলির শব্দ থেমে যায়। সে গিয়ে দেখল তার দলের শ্বেতাঙ্গরা রাইফেল হাতে গাছগুলোর চারধারে ঘুরে ঘুরে শত্রুদের খুঁজছে আর জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছে। তাদের দুজন নিগ্রো যোদ্ধা তীরবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। তাদের দেহগুলো থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল। হোয়াইট বুঝল তীরগুলো বিষাক্ত। তা না হলে এত তাড়াতাড়ি তাদের মৃত্যু ঘটত না।

ওরমান রাইফেল হাতে শত্রুদের খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

হোয়াইট তাকে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার ওরমান?

ওরমান বলল, জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে আদিবাসীরা আমাদের অতর্কিতে আক্রমণ করেছে।

হোয়াইট বলল, ওরা হলো বানস্থটো জাতীয় আদিবাসী। ওদের দেশে আমাদের ঢুকতে দিতে চায় না ওরা।

ওরমান বলল, নোংরা ইঁদুরগুলো কি চায় তা আমি গ্রাহ্য করি না। ভেবেছে কয়েকটা তীর মেরে ভয় দেখাবে। আমি ওদের মজা দেখিয়ে দেব। আমি ভিতরে যাবই।

হোয়াইট বলল, ভুলে যেওনা ওরমান, অনেকগুলি জীবনের দায়িত্ব তোমার উপর। তার উপর দুজন শ্বেতাঙ্গ নারীর ভারও তোমার উপর। তোমাকে সতর্ক করে দেওয়া সত্বেও তুমি এপথে যাচ্ছ।

ওরমান রেগে গিয়ে বলল, দায়িত্বটা আমার, তোমার নয়।

তাকে দেখে বেশ বোঝা গেল, সে তার ভুল বুঝতে পারছে অথচ তা স্বীকার না করে গোঁড়ামির সঙ্গে সেই ভুলটাকে আঁকড়ে ধরে আছে।

ওরমান বলল, ওরা তীর ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন আমরা গুলি ছুঁড়ে তাদের প্রত্যুত্তর দিয়েছি, ওরা আর আমাদের বিরক্ত করবে না।

হোয়াইট বলল, আমি তা মনে করি না। ওরা দলবেঁধে সামনে এসে লড়াই করে না। ওরা এইভাবে মাঝে মাঝে দু-তিনজন লোককে মারবে। অথচ ওদের কখনো দেখতে পাবে না।

ওরমান বলল, ঠিক আছে, তুমি যদি ভয় পেয়ে যাও তাহলে ফিরে যেতে পার। আমি তোমার সঙ্গে একজন প্রহরী আর কুলি দেব।

হোয়াইট মৃদু হেসে বলল, আমি অবশ্যই তোমার সঙ্গেই থাকব।

এই বলে সে মেয়েদের গাড়ির দিকে চলে গেল। গিয়ে দেখল রোণ্ডা গাড়ির পা-দানিতে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির ভিতরে নাওমি ম্যাডিসন শুয়ে আছে সীটের উপর।

হোয়াইট বলল, তুমি এভাবে বাইরে বেরোবে না। ভিতরে যাও। আমরা তোমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব।

রোণ্ডা বলল, ওরা কি এইভাবে আমাদের জীবন নাশ করে যাবে?

হোয়াইট বলল, আমারও তাই মনে হয়। আমি তোমাকে ভয় দেখাতে চাই না। তবে সাবধানে থাকবে। মিস ম্যাডিসন কি মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

রোণ্ডা বলল, হ্যাঁ।

ওরা দুজনে ম্যাডিসনকে তুলে বসিয়ে দিয়ে সুস্থ করল। ওরমান তখন সবাইকে নির্দেশ দিচ্ছিল। সে বলছিল, তোমরা সব সময় তোমাদের রাইফেল প্রস্তুত করে রাখবে। প্রত্যেক ট্রাকে একজন করে বাড়তি প্রহরীর ব্যবস্থা করব। বিল আর বেন মেয়েদের কাছে থাক। ক্ল্যারেম, তুমি প্যাটের কাছে

চলে যাও। সামনের দিকে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে বল। মেজর হোয়াইট, শেখকে গিয়ে বল, সে যেন তার অর্ধেক লোক সামনের দিকে পাঠিয়ে দেয় আর অর্ধেক লোক আমাদের কাছে রাখ। মার্কাস আর ওবরস্কি মাঝখানে থাকবে।

ওবরস্কি একটু দূরে ছিল। তার নাম ধরে ওরমান ডাকতেই সে ছুটে এল। তার চেহারাটা লম্বা এবং বেশ সুদর্শন। তার মাথায় কালো লম্বা চুলগুলো ছড়িয়েছিল। তার হাতে একটা রাইফেল ছিল।

সফরিটা আবার ধীর গতিতে এগিয়ে চলতে লাগল। ওরমান হোয়াইটকে পাশে নিয়ে সামনের দিকে রইল। নিগ্রোভৃত্যরা কুড়ুল আর ছুরি দিয়ে পথ পরিষ্কার করতে করতে যাচ্ছিল। কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা একটা নদী পেল। ওরমান বলল, আজ এখানেই শিবির স্থাপন করব।

গাড়িগুলো সব দাঁড়িয়ে রইল। একটা গাড়ির নিচে বসে ওরমান এক বোতল স্কচ খাচ্ছিল। ম্যাডিসন তার একটা সিগারেট ধরাল। সে বনের চারদিকে তাকাচ্ছিল। দেখল নদীর ওপারেও ঘন বন। ম্যাডিসন একসময় বলল, ফিরে চল টম। তা না হলে আমরা সবাই মারা পড়ব।

ওরমান বলল, আমাকে আমার ছবি করবার জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটুক না কেন, আমাকে আমার কাজ করতেই হবে। যাও, তোমার সিংহ-মানুষকে তোমার মনের কথা জানাওগে।

ম্যাডিসন বলল, তুমি জান আমি তাকে গ্রাহ্য করি না। তুমি ছাড়া আর কাউকে জানি না আমি।

ওরমান আর একবার মদ পান করে বলল, আমার চোখের আড়ালে তুমি কি কর না কর আমি সব জানি। আমাকে অন্ধ ভেবো না।

সামনের দিক থেকে আবার গুলির আওয়াজ এল। ওরমান বলল, আবার হয়ত আক্রমণ করেছে ওরা। ম্যাডিসন, তুমি এখানেই থাক।

এই বলে সে সামনে চলে গেল। যাবার পথে দেখল নয়েস একজন আরবের সঙ্গে খবর নিয়ে আসছে। নয়েস এসে খবর দিল, আবার একঝাঁক তীর আসে কোথা থেকে। দুজন লোক মারা যায় তাতে। আমরা তখন গুলি করি। কাউকে দেখা যায়নি। তীরবিদ্ধ হয়ে দুজন মালবাহক মারা গেছে।

ওরমান বলল, সবাইকে শিবিরে ঢুকে পড়তে বল।

ম্যাডিসন আবার চীৎকার করে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। ওয়েস্ট রোণ্ডাকে বলল, তুমি কিন্তু কোন কিছুতেই ভয় পাও না।

রোণ্ডা বলল, কারণ আমি জানি ভয় পেলে কোন ফল হবে না তাতে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিবির স্থাপনের কাজ সেরে ফেলল ওরা। সামনের ফাঁকা জায়গাটায় সকলে এসে জড়ো হলো।

রোণ্ডা ওয়েস্টকে বলল, তুমি কি আমার সঙ্গে প্রেম করতে এসেছ? এটা প্রেম করার সময় নয়। তুমি একজন ক্যামেরাম্যান। তুমি তোমার কাজ করগে।

ওয়েস্ট বলল, আমি একটা প্রেমের দৃশ্যের ছবি তুলছি।

রোণ্ডা হেসে বলল, ছবির শটটা কেটে দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

একসময় সর্দার কামুড়ি ওরমানের সামনে এসে বলল, আমার লোকরা আর তোমাদের সফরির সঙ্গে যাবে না।

ওরমান বলল, কিন্তু তোমরা সই করেছ চুক্তিপত্রে।

কামুড়ি বলল, কিন্তু আমরা বানস্থটোদের অঞ্চলে আসার জন্য সই করিনি। তোমরা যদি এখান থেকে ফিরে যাও তাহলে আমরা তোমাদের সঙ্গে থাকব।

ওরমান তার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে চাবুক বার করল। বলল, আমি তোমাদের উচিত শিক্ষা দেব।

মেজর হোয়াইট ওরমানের কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলল, থাম। এতদিন আমি তোমার কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিনি। কিন্তু এখন আমাদের সকলের জীবন বিপন্ন।

ওরমান বলল, এটা আমার ব্যাপার। আমি আমার নিজের মতে চলব।

ওগ্রেডি বলল, তুমি নির্বোধের মত কাজ করছ টম। মেজর ঠিকই বলছে। কিছু মনে করো না মেজর। তুমিই এখন সবকিছুর ব্যবস্থা করো। কিভাবে আমরা এই ভয়ঙ্কর জায়গাটা থেকে বেরিয়ে যেতে পারি তার জন্য চেষ্টা করো। টম এখন মাতাল হয়ে আছে। আগামীকাল ও ওর ভুল বুঝতে পারবে। আমরা সবাই তোমার পিছনে আছি।

তার সহকারী ওগ্রেডি এখন তাকে আর সমর্থন করছে না দেখে চুপ করে গেল ওরমান। ওগ্রেডি মেজরকে জিজ্ঞাসা করল, এই বানস্থটো অঞ্চল থেকে আমাদের বার হতে আর ক'দিন লাগবে?

হোয়াইট বলল, ট্রাকগুলোর জন্য পথ করে এগোতে আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে। তা না হলে দুদিনের মধ্যেই এ অঞ্চলের বাইরে গিয়ে পড়তাম। তবে

এখনও আমাদের দুসপ্তা লাগবে, তাও, যদি ভাগ্য ভাল হয়।

ওগ্রেভি বলল, ইতিমধ্যেই স্টুডিও অনেক খরচ করেছে ছবিটার জন্য। অথচ কাজের কাজ এখনো কিছুই হয়নি আমাদের। কামুড়িকে বলে দাও নিগ্রোভৃত্যদের আরো বেশী করে টাকা দেওয়া হবে। ও তাদের রাজী করাবে।

হোয়াইট কামুড়ির কাছে চলে গেল। ওরমান তার তাঁবুর ঘরে চলে গেল। হোয়াইট নিগ্রোদের তাঁবুতে গিয়ে দেখল তারা কি ভাবছে। একটা থমথমে অস্বস্তিকর ভাব বিরাজ করছে তাদের মধ্যে। সে দেখল আরবরা শেখের ঘরে বসে আছে। নিগ্রোরা বা আরবরা আজ কেউ হাসাহাসি বা গান করছে না। আরবদের ভাবের মধ্যেও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল।

কামুড়ির সঙ্গে কথা বলে ফিরে এসে হোয়াইট ওগ্রেভিকে বলল, ওরা বেশী টাকা পেলে আমাদের সঙ্গে যাবে। তবে ওদের আর চাবুক মারা চলবে না।

ওগ্রেভি বলল, কিকরে চাবুক মারা বন্ধ করবে ?

হোয়াইট বলল, আমি চাবুকটা ফেলে দেব। আমি ওরমানকে বলব সে চাবুক মারা বন্ধ না করলে আমরা সবাই তার দল থেকে চলে যাব। তার হাবভাব আমি বুঝতে পারছি না। সে কিন্তু আগে এমন ছিল না।

ওগ্রেভি বলল, এটা হচ্ছে খুব বেশী মদ্যপানের ফল।

হোয়াইট বলল, একবার ছবি তোলার জায়গাটায় পৌছতে পারলে সে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। সে খুব চিন্তা করছে এবিষয়ে। বিশেষ করে এই বানসুটোদের অঞ্চলটা পার হয়ে যেতে পারলেও সমস্যার সমাধান হয়।

ওগ্রেভি বলল, অন্য পথে ঘুরে আমাদের ছবি তোলার জায়গায় গেলে দুসপ্তা সময় লাগবে। কিন্তু সেই পথেই যাওয়া উচিত আমাদের। এভাবে সব কিছু হারানোর থেকে কিছুদিন নষ্ট হওয়া ভাল। এখনো দুটো দিন এইভাবে চলবে। আরো কত জীবন যাবে কেউ জানে না। নিগ্রোরাও ক্ষেপে যাবে। যাই হোক, আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। কোন উপায় নেই। আমি যাচ্ছি। বিদায়।

ক্রমে গোধূলি গিয়ে সন্ধ্যা এল। কিন্তু চাঁদ উঠল না আকাশে। শুধু কিছু তারা দেখা গেল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে উঠল সমস্ত বনভূমি।

ওবরস্কি ম্যাডিসনের ঘরে চলে গেল। তাকে দেখে ম্যাডিসন বলল, আমি বেঁচে আছি কি মরেছি কেউ আমার একবার খবরও নেয় না।

ওবরস্কি বলল, আমি আগেই আসতাম। কিন্তু ওরমান আছে ভেবে আসতে পারিনি।

ম্যাডিসন বলল, ওরমান আছে তার ঘরে। আমি জানি তুমি তাকে ভয় পাও না। কোন কিছুতে ভয় করো না তুমি।

ওবরস্কির সুন্দর চেহারাটার পানে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকাল ম্যাডিসন।

ওবরস্কি বলল, ভয় আমি কাউকে করি না। কিন্তু তুমি বলেছিলে তোমার আমার সম্পর্কের কথাটা ওরমান যেন জানতে না পারে।

ম্যাডিসন বলল, হ্যাঁ, সেটাই ভাল। এখন ওর মেজাজটা ঠিক নেই। একজন পরিচালক কোন অভিনেতার উপর রেগে গেলে অনেক কিছু করতে পারে।

ওবরস্কি বলল, রোণ্ডা কোথায় ?

সে হয়ত বিল ওয়েস্ট, বেন আর মার্কাসকে নিয়ে ব্যস্ত আছে। সারাদিন আমাকে এখানে ফেলে রেখে গেছে।

ওবরস্কি বলল, সে আমাদের কথাটা ওরমানকে বলবে না ত ?

না, সেধরনের মেয়ে ও নয়। তবে ওর একমাত্র দোষ ও বলছে ও নাকি আমার মতই অভিনয় করতে পারবে। সেকথা ও আমাকে বলেছে।

ওবরস্কি বলল, ও কখনই তা পারবে না নাওমি। আমি ছবিতে নামার আগে তোমার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হই। আজ আমরা একই ছবিতে অভিনয় করছি এটা ভাবতেই পারা যায় না। তুমি আমায় ভালবাস ত ?

ম্যাডিসন বলল, অবশ্যই তোমায় আমি ভালবাসি।

তবে কেন তুমি ওরমানের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করো ?

এটা আমার একটা কূটনৈতিক চাল। সে একজন বড় পরিচালক এবং আমি অভিনেত্রী হিসাব আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবেই ওকে ভালবাসার ভাব দেখাই।

অন্ধকার বনে সিংহ ডাকছিল। হায়েনার অট্টহাসি শোনা যাচ্ছিল।

ম্যাডিসন ভয়ে কেঁপে উঠল। বলল, কেউ আমায় হলিউডে পৌছে দিতে পারলে তাকে আমি এক মিলিয়ন ডলার দেব।

এমন সময় রোণ্ডা হঠাৎ ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠল ওবরস্কি।

রোণ্ডা ওবরস্কিকে বলল, যাও সিংহমানুষ, এখন শোবার সময় হয়েছে। আমি দেখলাম ওরমান টলতে টলতে এদিকেই আসছে।

ওবরস্কির মুখখানা মলিন হয়ে গেল। সে একরকম ছুটে চলে গেল ঘর থেকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরমান এসে পড়ল। ম্যাডিসনের ঘর থেকে ওবরস্কিকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেয়ে তাকে আটকাল ওরমান। বলল, তুমি মেয়েদের ঘরে কি করছিলে ?

ওবরস্কি বলল, আমি রোণ্ডার খোঁজ করতে করতে এখানে এসে পড়ি।

সে এলে বেরিয়ে আসি।

ওরমান বলল, মিথ্যা কথা। রোগুা আসার আগেই তুমি এ ঘরে এসেছ এবং অনেকক্ষণ ছিলে। ফের যদি তোমাকে ওর ঘরে ঢুকে আমাকে বোকা বানানোর চেষ্টা করতে দেখি তাহলে তোমাকে খুন করব। বুঝলে ?

এরপর ওরমান ম্যাডিসনের ঘরের মধ্যে ঢুকলে রোগুা বলল, আমাদের ঘরে এসেছ কেন ? বেরিয়ে যাও।

ওরমান বলল, আমি নাওমির সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

রোগুা বলল, কথা বলার থাকলে কাল সকালে বলবে।

ওরমান নাওমির দিকে এগিয়ে এসে বলল, শোন নাওমি, ফের যদি আমার অসাক্ষাতে ওকে নিয়ে খেলা করো আর আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করো তাহলে তোমাকে মারতে মারতে একতাল মাংসপিণ্ডে পরিণত করে ফেলব।

রোগুা বলল, ওবরস্কি আমার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল।

ওরমান বলল, তাহলে তুমি আসার পর ও চলে গেল কেন ?

তুমি আসছ দেখে আমিই তাকে চলে যেতে বললাম।

ওরমান বলল, ঠিক আছে। এবার থেকে মেয়েদের ঘরে কোন পুরুষ আসবে না।

ওরমান চলে গেলে রোগুা ম্যাডিসনকে বলল, আমি তোমার অভিনয়ে সাহায্য করতে এসেছি। কিন্তু তোমার প্রেমের ব্যাপারে কোন কিছু করতে পারব না। এবার থেকে বুঝে চলবে। সাবধানে পা বাড়াবে।

সকাল হবার অনেক আগেই শিবিরের সবাই জেগে উঠল। সকালে উঠেই হোয়াইট জানতে পারল কামুড়ির অধীনস্থ পঁচিশজন নিগ্রোভৃত্য রাত্রিবেলায় শিবির ছেড়ে পালিয়ে গেছে। প্রহরীদের জিজ্ঞাসা করে জানল তারা কাল শিবির ছেড়ে কখন গেছে তা ওরা দেখতেই পায়নি।

ওরমান বলল, যাক, এখনো যা আছে তাতেই আমাদের চলে যাবে।

হোয়াইট বলল, বানসুটোরা আবার কিছু করলে আরো নিগ্রো চলে যাবে। কামুড়ির কথা তারা শুনবে না। কুলি বা মাল বহনের লোক ছাড়া এদেশে আমরা চলতেই পারব না। এখনো সময় আছে ওরমান। ফিরে চল। আমাদের অবস্থা খুবই খারাপ।

ওরমান বলল, যেতে ইচ্ছা হয় তুমি যাও। নিগ্রো লোকগুলোকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি এই ট্রাকগুলো আর যারা থাকবে তাদের নিয়ে এগিয়ে যাব।

খাবার টেবিলে গরম কফি খেয়ে কিছুটা শান্ত হলো তারা।

প্রাতরাশের পর আবার রওনা হয়ে পড়ল ওদের সফরি। নদীটা পার হয়ে ওপারের বনভূমিতে গিয়ে পড়ল ওরা। নদীতে জল খুব কম ছিল আর জলায়

পাথর থাকায় ট্রাকগুলো সহজেই পার হয়ে গেল। বানম্বুটোদের কোথাও চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর কোন অশুভ ঘটনাও ঘটল না। ওদের চারপাশের বনভূমিতে কোথাও কোন জনপ্রাণী আছে বলে মনে হল না। ক্রমে দুপুর হয়ে গেল। দলের সবার মনে সাহস ফিরে এল। অনেকে সহজ হয়ে কাজের সঙ্গে সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে লাগল। ওদের দুপুরের খাওয়ার সময় পার হয়ে গেলেও ওরা থামল না।

সহসা অতর্কিতে একঝাঁক তীর ছুটে এল। আবার দুজন নিগ্রোভৃত্য মারা গেল সঙ্গে সঙ্গে। মেজর হোয়াইট ওরমানের পাশে একসঙ্গে পথ হাঁটছিল। তার বুকেও একটা তীর এসে লাগলে সে তীরটা বুক থেকে জোর করে তুলে ওরমানের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। শ্বেতাঙ্গ যাত্রীরা রাইফেল হাতে ছোটাছুটি করে বনটা তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। সকলেই ট্রাক থেকে নেমে পড়ল। শুধু ওবরস্কি থেমে যাওয়া একটা ট্রাকের তলায় শুয়ে লুকিয়ে রইল। তাকে ডাকাডাকি করার সময় সে বেরিয়ে এল।

মেজর হোয়াইট আর দুজন নিগ্রোভৃত্য মৃত্যু নিয়ে কথাবার্তা বলতে লাগল। কামুড়ি খুবই ঘাবড়ে গেল। সে ওগ্রেডির সামনে এসে বলল, আমার লোকরা আর যেতে চাইছে না।

ওগ্রেডি বলল, এখন ওরা দল ছেড়ে পালাতে গেলেও ত পথে মরবে। এখানে তবুও আমাদের কাছে রাইফেল আছে। আর একটা দিন ওদের বুঝিয়ে রাখ। আগামীকালই আমরা এই বানম্বুটো অঞ্চলের সীমানা পার হয়ে যাব।

আবার যাত্রা শুরু করল ওরা। কামুড়ির লোকরাও রয়ে গেল। একটা ট্রাকের উপর মৃতদেহ তিনটেকে চাপানো হলো। এরপর যেখানে শিবির স্থাপন করা হবে সেখানে সেগুলোকে কবর দেওয়া হবে। বিক্ষুব্ধ নিগ্রোভৃত্যরা রাগের সঙ্গে রাস্তা পরিষ্কার করে যেতে লাগল। আরবরা যথারীতি দলের পিছনে রইল। আজ সকাল থেকেই ওরমানের হাতে চাবুক ছিল না। আজ সে ভালভাবে কথা বলছিল নিগ্রোভৃত্যদের সঙ্গে। তাদের মনে সাহস সঞ্চার করার চেষ্টা করছিল। সে বলল, আগামীকালই আমরা এ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যাব।

তবে কোন নিগ্রো কাজ করতে না চাইলে সেখানে বলপ্রয়োগ করছিল ওরমান বাধ্য হয়ে। কুড়ুল হাতে একটা লোক কাজ করতে না চাইলে ওরমান তাকে একটা ঘুষি আর একটা লাথি মারল। এতে কেউ কিছু বলল না। কারণ সবাই বুঝল, সকলের ঠিকমত আপন আপন কাজ করার উপর নির্ভর করছে দুশো লোকের জীবন।

সারাদিন আর কোন ঘটনা ঘটল না। কিন্তু বিকালের দিকে আবার এক জায়গায় শিবির স্থাপন করার আগে কিন্তু আবার কয়েকটা তীর এসে বিদ্ধ

করল তিনজনকে। তিনজন নিগ্রো মারা গেল। আর একটা তীর ওরমানের মাথার উপর দিয়ে যাবার সময় তার শিরস্ত্রাণটা ফেলে দিল। অল্পের জন্য বেঁচে গেল সে।

চতুর্থ অধ্যায়

তখনো সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসেনি ওদের শিবিরে। সামান্য যে একটু আলো ছিল তাতে রোণ্ডা তার ঘরে টেবিলে বসে কি লিখছিল একা একা। একটু দূর থেকে আতুই নামে আরবটা লক্ষ্য করছিল তাকে। হঠাৎ মার্কাস এসে রোণ্ডার সামনে বসে তাকে বলল, কবিতা লিখছ নাকি?

রোণ্ডা বলল, দৈনন্দিন ডায়েরী লেখার কাজটা সেরে রাখছি।

মার্কাস বলল, এ ডায়েরীর মধ্যে থাকবে বহু দুঃখজনক ঘটনার সকরুণ কাহিনী।

রোণ্ডা বলল, ঘটনাক্রমে এই ম্যাপটা সেদিন আমার ব্যাগের মধ্যে পেয়ে যাই। সেদিন একটা দৃশ্যে আমার ছবি তোলার সময় এইটা পাই।

ম্যাপটা খুলে রোণ্ডা যখন মার্কাসকে দেখাচ্ছিল তখন আতুই আরো কাছে এসে কুটিল চোখে তা দেখল।

মার্কাস বলল, ওটা তোমার কাছেই রেখে দাও। ওরা চাইলে তবে দেবে। ওরা কি এই ম্যাপটা স্টুডিওতে তৈরী করে?

রোণ্ডা বলল, না। জো একটা দোকান থেকে একটা পুরনো বই কিনে তার মধ্যে এটা পায়। এই মানচিত্রটাকে কেন্দ্র করেই ও কাহিনীর পটভূমি রচনা করেছে। ব্যাপারটা বেশ মজার নয়? লোকের মনে হবে এই ম্যাপটা দেখে হীরক দেশের উপত্যকায় যাওয়া সহজ হবে।

রোণ্ডা ম্যাপটা এবার গুটিয়ে ভাঁজ করে তার ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখল। আতুই সেটা লক্ষ্য করল।

মার্কাস বলল, অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলেই কবর দেওয়া হবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলেই কবর দেওয়ার কাজটা সারা হয়ে গেল। ম্যাডিসন বসে ভাবতে লাগল।

সে রাতে ওরমান একেবারেই ঘুমোতে পারল না। লণ্ঠনের আলোটা মিটমিট করে জ্বলছিল তার ঘরে। শেষ রাতের দিকে পাশের ঘর থেকে ওগ্রেডি তাকে লক্ষ্য করে বলল, ঘুমিয়ে পড় টম। তা না হলে তোমার মাথা গরম হয়ে যাবে।

ওরমান বলল, আমি ঘুমোতে পারছি না। আমি সারাক্ষণ হোয়াইটকে দেখতে পাচ্ছি। আমিই তাকে হত্যা করেছি। আমিই নিগ্রোদের হত্যা করেছি।

ওগ্রেডি বলল, এটা তোমার দোষ নয়। স্টুডিও কর্তৃপক্ষ তোমাকে যে কাজের ভার দিয়ে পাঠিয়েছে তুমি শুধু সেই কাজ জোরের সঙ্গে করে যাচ্ছ।

ওরমান তবু বলল, না, সব দোষ আমার। হোয়াইট বারবার আমায় নিষেধ করেছিল।

ওগ্রেডি বলল, একটু মদ খেয়ে নাও।

ওরমান মশারি থেকে বেরিয়ে এসে একটা মদের বোতল বার করে পর পর দু-তিন গ্লাস মদ খেয়ে বসল। ওগ্রেডি ওধার থেকে এসে তার বন্ধুর পাশে বসে তার কাঁধের উপর একটা হাত রাখল। সহসা জঙ্গলের গভীর থেকে একটা সিংহের গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত চীৎকার শুনতে পেল তারা। সে চীৎকার কোন মানুষ বা পশুর হতে পারে না।

ওরমান বলল, তুমি ভূত বিশ্বাস করো প্যাট?

ওগ্রেডি বলল, ঠিক বিশ্বাস করি না। তবে কখনো কখনো কিছু কিছু অদ্ভুত ছায়ামূর্তি দেখেছি।

আমিও দেখেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহটা জেগেছিল প্রথমে বিল ওয়েস্টের মনে। সে ছুটে নিগ্রোভৃত্যদের শিবিরে চলে গেল। কামুড়ীর খোঁজ করল। বিল দেখল শিবিরে একটা নিগ্রোভৃত্যও নেই।

বিল ওয়েস্টের ডাকাডাকিতে ওরমান আর ওগ্রেডি ছুটে এল। ওরমান বিলকে বলল, প্রাতরাশের কি হলো?

বিল বলল, প্রাতরাশ এবার থেকে নিজের হাতে তোমায় তৈরী করে নিতে হবে। শিবির ছেড়ে নিগ্রোভৃত্যরা সব পালিয়েছে। আগুনটা পর্যন্ত নিবিয়ে দিয়ে গেছে। শিবিরে কোন পাহারা নেই। মনে হয় আমাদের কিছু খাদ্য-দ্রব্যও নিয়ে গেছে।

ওরমান বলল, কিন্তু কখন কোন দিকে পালাল? কোথায় যাবে তারা?

সবাই ওরমানের মুখপানে তাকাতে লাগল। তারা দেখল ওরমান প্রথমে কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও কিছুক্ষণের মধ্যে সামলে নিল নিজেকে। সকলে তখন

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

ওরমান নির্দেশ দিল ট্রাকগুলো সব দেখ। ড্রাইভারদের সব বলল, মালপত্র সব ঠিক আছে কিনা তারা দেখুক। বিন, তুমি এ কাজগুলো করো। প্যাট একজন প্রহরী বসিয়ে দাও শিবিরের সামনে। আরবরা এখনো আছে শিবিরে। প্যাট, তুমি বরং তাদের প্রহরীর কাজে লাগিয়ে দাও। তারপর সকলকে খাবার টেবিলে ডাক।

নির্দেশ দেওয়ার পর ওরমান নিজে সব কিছু তদারক করে দেখতে গেল। তার মন মাথা এখন সব পরিষ্কার। কোন ভয়ের চিহ্ন নেই তার চোখে মুখে। গতরাতে তার ঘুম না হলেও আজকের এই দুর্ঘটনা তাকে সজাগ করে দিয়েছে। নিদ্রাহীন রাত্রির সব ক্লান্তি আর অস্বাস্তি ঝেড়ে ফেলে ঠাণ্ডা মাথায় এই চরম বিপদের সম্মুখীন হলো সে।

ওরমান শিবিরে একবার ঘুরে এসে খাবার টেবিলে এসে দেখল সবাই সেখানে বসে নিগ্রোদের শিবিরত্যাগের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছে নিজেদের মধ্যে। একজনের একটা কথা ওরমানের কানে এল। কে বলল, এক বোতল স্কচ আমাদের এই বিপজ্জনক পথে এনেছে, কিন্তু এখন আর এক বোতল স্কচ আমাদের এ পথের বিপদ থেকে মুক্ত করতে পারবে না।

ওরমান শান্তভাবে বলল, কি হয়েছে তোমরা সকলেই জান। এর জন্য কাউকে দোষারোপ করে লাভ নেই। আমাদের অবস্থা এখনো একেবারে হতাশাব্যঞ্জক হয়নি। আমরা কোনরকমে বানসুটোদের এই এলাকা পার হতে পারলে আর কোন ভয় নেই। তখন আমরা কোন আদিবাসীদের গাঁয়ে কিছু মালবাহক যোগাড় করব। এর মধ্যে তোমাদের সকলকেই আপন আপন কাজ করে যেতে হবে। এবার হতে তোমাদের শিবির স্থাপন করতে হবে, শিবির গোটাতে হবে, মাল বোঝাই, মাল নামানো, রান্না, পথ পরিষ্কার, পাহারার কাজ সবই করতে হবে। এখন আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হবে। কে রান্না করতে পারবে?

রোণ্ডা বলল, সে রান্না করবে।

ওরমান বলল, মোট তিনজন রাঁধুনির দরকার। আর কে কে রান্না করবে?

ওবরস্কি বলল, আমি সাহায্য করব রোণ্ডাকে।

সবাই হেসে উড়িয়ে দিল কথাটাকে। অবশেষে ঠিক হলো রোণ্ডা রান্নার কাজ করবে আর জিমি ও শর্টি তাকে সাহায্য করবে।

ওরমান বলল, এখন রাঁধুনিরা যখন প্রাতরাশের জন্য খাবার তৈরী করবে বাকি সবাই লরীতে মাল তোল এবং তাঁবুগুলো গুটিয়ে নাও।

নাওমি ম্যাডিসন একসময় ওরমানের কাছে এসে বলল, আমার কাছে

যে নিগ্রোভৃত্যটা কাজ করত সে চলে গেছে। এখন আমার কাজ করার কেউ নেই।

ওরমান বলল, ঠিক আছে, তুমি আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছ ভাল হয়েছে। তুমি ত রান্না করতে পারবে না। তুমি খাবার টেবিলে পরিবেশন করবে আর ডিসগুলো ধুতে সাহায্য করবে।

নাওমি বলল, তুমি কি ঠাট্টা করছ? আমাকে এই সব কাজ করতে বলছ কি করে? আমি তা পারব না।

ওরমান বলল, স্মিথ তোমায় আবিষ্কার করার আগে তুমি কি করতে তা আমি জানি। তুমি যদি একাজ করতে না পার তাহলে খাবে না।

খাবার সময় নাওমি তার গাড়ির সীটে বসে রইল। খেতে গেল না। তাঁবু গুটিয়ে মাল বোঝাই করে সফরি রওনা হবার সময় রোণ্ডা সব কাজ সেরে তার গাড়িতে গেল। সে কাগজে মোড়া গোটাকতক স্যাণ্ডউইচ নাওমিকে দিয়ে বলল, এগুলো তোমার জন্য এনেছি, তুমি খেয়ে নাও।

নাওমি ম্যাডিসন নীরবে তা খেয়ে নিল।

সফরির গতিটা খুব ধীর ছিল। শ্বেতাঙ্গরা পথ পরিষ্কারের কাজ ঠিকমত করতে পারছিল না। তারা একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল গরমে। কুড়ুল দিয়ে গাছ-কাটার কাজে অভ্যস্ত ছিল না তারা। পথের সামনে এখানে অনেক গাছ ছিল।

বিল ওয়েস্ট তার কপাল থেকে ঘাম ঝেড়ে বলল, পথপ্রদর্শক না থাকায় আমরা বুঝতে পারছি না কোন্ পথে কোথায় যাচ্ছি।

যেতে যেতে ওরা বন পার হয়ে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। জায়গাটা মানুষসমান লম্বা ঘাসে ভর্তি, একটাও গাছ নেই।

ওরমান বলল, এখানে কোন গাছ না থাকায় শত্রুরা আমাদের বিরক্ত করবে না। জোরে গাড়ি চালাও। যাত্রীরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

কিন্তু ঘাসের উপর গাড়িগুলো কিছুটা এগিয়ে যেতেই ঘাসগুলোর ভিতর থেকে আবার একঝাঁক তীর উড়ে এল। এবার আর লুকিয়ে রইল না শত্রুরা। বানসুটো আদিবাসীরা যুদ্ধের ধ্বনি দিতে দিতে বর্শা হাতে সামনে ছুটে এল। রাইফেলগুলো গর্জে উঠল। শ্বেতাঙ্গ যাত্রীরা সকলেই গুলি চালাতে লাগল। রোণ্ডাও রিভলবার হাতে বেরিয়ে পড়ল তার গাড়ি থেকে। আদিবাসীদের অনেকেই মারা গেল। তারা দু মিনিটের মধ্যেই আবার ঘাসগুলোর মধ্যে পালিয়ে গেল। শ্বেতাঙ্গদের দশ-বারোজন মারা গেল।

নয়েস, বেন ও সাতজন আমেরিকান আর তিনজন আরব মারা গেল। তাদের মৃতদেহগুলো একটা ট্রাকের উপর চাপানো হলো।

ওগ্রেডি ওরমানকে বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে বেরিয়ে যেতে

হবে টম। শয়তানরা ঘাসগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে।

ওরমান আবার যাত্রা শুরু করার হুকুম দিল। ওগ্রেডি বলল, কিন্তু ওবরস্কি কোথায়? তাকে ত দেখছি না।

মার্কাস বলল, আমি দেখেছি আক্রমণের সময় ও গাড়ি থেকে নেমে ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। আক্রমণটা আমাদের বাঁদিকে শুরু হওয়ায় ও ডানদিকে চলে যায়।

ওরমান নিজে ঘাসের মধ্যে ওবরস্কির খোঁজ করতে গেল। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন খুঁজতে লাগল। কিন্তু অনেক খুঁজেও ওবরস্কিকে পাওয়া গেল না কোথাও। তার মৃতদেহও কেউ দেখতে পেল না।

যাই হোক, সফরি আবার এগিয়ে চলল। বিকালের দিকে এক জায়গায় শিবির স্থাপন করা হলো। রান্নার কাজ শেষ হলে সবাই বিষণ্ণ মুখে খাবার টেবিলে বসল। সবাই আশ্চর্য হয়ে দেখল নাওমি ম্যাডিসন নিজে থেকে রাতের খাবার পরিবেশন করছে।

স্ট্যানলি ওবরস্কির চেহারাটা অসাধারণভাবে বলিষ্ঠ হলেও মনে একটুও সাহস বা পৌরুষবোধ ছিল না। অথচ তাকে দেখে তা মনে হত না। তার দলের সবাই ভাবত গায়ে যার এত শক্তি, চেহারাটা এমন বলিষ্ঠ এবং সুগঠিত মনটা তার অবশ্যই তেমনি শক্তিশালী এবং সাহসী। কিন্তু আসলে তার মনটা ছিল দারুণ ভীরু প্রকৃতির। কিন্তু লজ্জায় সে তার ভীরুতা প্রকাশ করত না কখনো। ভীরুতার সঙ্গে কোন বিপদের সম্মুখীন হলে লোকে তাকে উপহাস করবে এই ভয়ে যথাসম্ভব বিপদ আপদকে এড়িয়ে চলত সে। আজও তাই বানসুটো আদিবাসীরা তাদের অকস্মাৎ আক্রমণ করলে সাহসের সঙ্গে দলের আর পাঁচজনের মত সম্মুখীন না হয়ে কোন লড়াই না করে ঘাসের ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

একজন আদিবাসী তাকে দেখে প্রথমে ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু পরে সে তাদের দলের লোকদের ডাকে। সে একটা ছুরি বার করে। ওবরস্কির হাতে কোন অস্ত্র ছিল না। সে তার দলের লোকদের কাছে ছুটে পালাতেও পারল না। এর আগে কাল্পনিক অনেক বিপদের কথা শুনেছে ও ভেবেছে। কিন্তু জীবনে আজ প্রথম এক প্রত্যক্ষ ও জলজ্যান্ত বিপদের সম্মুখীন হলো। সঙ্গে সঙ্গে এক অমিত সাহসে শক্ত হয়ে উঠল তার দেহের স্নায়ুগুলো। গরম হয়ে উঠল তার প্রতিটি শিরা ও ধমনীর রক্তস্রোত। সে তখন তার সামনের নিগ্রো আদিবাসীটাকে দুহাত দিয়ে মাথার উপর তুলে মাটিতে আছাড় মেরে ফেলে দিল। জীবনে আজ সে প্রথম লড়াই করল নিজের হাতে। তার দেহে এতখানি শক্তি ছিল, মনে এত সাহস ছিল তা নিজেই জানত না সে। আজ প্রথম সে পরিচিত হলো তার নিজের শক্তি আর সাহসের সঙ্গে।

কয়েকজন বানসুটো আদিবাসী এসে ওবরস্কির হাতদুটো পিঠের দিকে ঘুরিয়ে বেঁধে দিল। তারপর লড়াই শেষে পালিয়ে যাবার সময় ওবরস্কিকেও হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। ক্রমাগত অনেকক্ষণ ধরে পথ চলে আদিবাসীরা বিকালের দিকে একটা গাঁয়ে গিয়ে পৌছল।

ওবরস্কিকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের সব লোক, নারী, শিশু সবাই ছুটে এল। তার গায়ে থুথু দিতে লাগল আর ময়লা ফেলতে লাগল। গাঁয়ের সর্দার এসে দর্শকদের তাড়িয়ে দিল। অবশেষে এক অন্ধকার কুঁড়ে ঘরের সামনে তার মধ্যে ঢুকে পড়তে বলল। কিন্তু দরজাটা খুব ছোট বলে ঢুকতে পারছিল না ওবরস্কি।

আদিবাসী যোদ্ধারা তাকে কোনরকমে টেনে ঢোকাল। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হলেও ওবরস্কি দেখতে পেল কামুড়ি আর দুজন নিগ্রো হাত পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে মেঝের উপর।

ওবরস্কি সিংহমানুষের অভিনয় করার জন্য এসেছিল বলে নিগ্রোভৃত্যরা তাকে সিম্বা বলত। ওবরস্কিকে দেখেই আশ্চর্য হয়ে কামুড়ি বলল, তোমাকে কি করে ধরল বাওয়ানা সিম্বা?

ওবরস্কি বলল, তুমি তাহলে পালিয়ে এসে ভাল কাজ করনি কামুড়ি।

কামুড়ি বলল, আমাদের দলের অনেকে পথে ওদের হাতে মারা যায়। কিছু লোককে বন্দী করে এনেছে। কিছু লোক পালিয়ে যায়।

ওবরস্কি বলল, ওরা আমাদের খুন করছে না কেন?

কামুড়ি বলল, কারণ ওরা আমাদের খাবে।

ওবরস্কি বলল, তুমি কি বলতে চাও ওরা মানুষখেকো?

কামুড়ি বলল, হ্যাঁ। তবে অন্য সব নরখাদক আদিবাসীদের মত নয়। ওরা সব সময় মানুষ খায় না বা মানুষের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খায় না। ওরা কেবল যারা কোন না কোন দলের প্রধান বা সর্দার, যারা বীর সাহসী এবং বলবান ওরা শুধু তাদেরই হত্যা করে তাদের মাংস খায়। কারণ ওদের ধারণা তাহলে ওরাও বীর, বলবান এবং প্রধান হবে। আবার মৃতদেহের বাছাই-করা শুধু কয়েকটা অঙ্গ খায় তারা। তারা আমাদের হৃৎপিণ্ড, হাতের তালু, পায়ের তলা, আর হাতপায়ের পেশীগুলো খাবে।

ওবরস্কি বলল, আমি ত কোন দলপ্রধান নই, বীর বা সাহসী নই, আমি এক কাপুরুষ। তবে কেন আমাকে খাবে ওরা?

কামুড়ি একথার মানে বুঝতে পারল না।

ওবরস্কি বলল, তাহলে কখন আমাদের খাবে?

কামুড়ি বলল, তা ঠিক বলা যায় না। এখনও খেতে পারে, আবার কিছুদিন পরেও খেতে পারে। ওদের গাঁয়ে যাদুকর ডাক্তার আছে, তার কথামতই

এসব কাজ করে ওরা।

ওবরস্কি বলল, ওদের সর্দারকে একটা কথা বলে দেখতে পার। তুমি ত ওদের ভাষা বোঝ। বল আমাদের হাত পায়ের বাঁধনটা আপাততঃ খুলে দিক। তারপর যখন খায় খাবে। তাছাড়া আমাদের খেতে দিচ্ছে না কেন? আমরা ত রোগা হয়ে যাব তাহলে। আমাদের খাবার আগে কিছুদিন ভাল করে খাইয়ে রেখে দিয়ে বলবান করে তোলা উচিত ওদের।

কামুড়ি বলল, একথা বলে কোন ফল হবে না। ওরা ত আমাদের গোটা দেহটা খাবে না। তাই চর্বি বা মাংসের কোন দরকার নেই ওদের।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সেদিন রাতের খাওয়া হয়ে গেলে ওরমান আর বিল ওয়েস্ট গিয়ে রোণ্ডাকে বলল, তোমরা যাও, আমরা ডিশগুলো ধুয়ে নেব। জিমি আর শর্টি আমাদের সাহায্য করবে।

কিন্তু রোণ্ডা আর নাওমি ম্যাডিসন দুজনেই আপত্তি করল। বলল, আমরা মেয়েমানুষ, এগুলো ভাল পারব। তোমরা বরং বসে গল্প করো। আমাদের সাহস দাও।

নাওমি বলল, সিনেমায় নামার আগে হলিউডের মেন স্ট্রীটের একটা হোটেলে একাজ করেছি আমি। সুতরাং এখন ভালই পারব আমি একাজ।

ওরমান তাকে বাহবা দিল। বলল, সত্যিই তুমি খুব ভাল মেয়ে।

রোণ্ডা বলল, আহা বেচারী স্ট্যানলি, কোথায় কিভাবে মারা গেল তা কেউ জানে না। বেচারাকে কেউ কবরও দেবে না ঠিকভাবে।

জিম বলল ঠিকই হয়েছে। উপযুক্ত শাস্তি ও পেয়েছে। বিপদের সময় আমাদের কাছে থেকে ও লড়াই না করে পালিয়েছে কাপুরুষের মত।

রোণ্ডা বলল, হ্যাঁ, ওর দোষ ত্রুটি অনেক আছে ঠিক, কিন্তু ও কখনো কারো সম্বন্ধে কোন নিন্দা করত না বা অশোভন কথা বলত না।

ওরমান বলল, আমাদের মধ্যে ওর অভিনয় করে কাজ চালাবার মত আর কেউ নেই। সেটাই হলো মুস্কিলের কথা।

নাওমি বলল, আর কি করে ছবি করবে? নায়ক চলে গেল। আরো কত লোক মারা গেল। এখন পথপ্রদর্শক নেই, মালবাহক নেই।

এমন সময় ওগ্রোড এসে ওরমানকে বলল, আরবদলের আতুই বলছে, তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে মধ্যরাত্রির পর থেকে সকাল ছটা পর্যন্ত ওরা পাহারায় থাকবে। আমরা রাত্রি পর্যন্ত পাহারা দিয়ে ওদের ডেকে দিয়ে

শুতে যাব।

ওরমান বলল, সে ত ভাল কথা। আমাদের লোকরা তাহলে একটু নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করতে পারবে।

রাত্রি দুপুর হলে শ্বেতাঙ্গরা আরবদের ডেকে পাহারায় বসিয়ে দিয়ে শুতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ল তারা।

পরদিন সকালে রোদ ওঠার পর গর্ডন মার্কাস প্রথমে উঠল। উঠেই শিবিরটার চারদিকে তাকিয়ে তার কেমন মনে হতে লাগল। শিবিরটাকে ফাঁকা ফাঁকা মনে হলো তার। আগুনের কাঠ সব নিভে গেছে। ধোঁয়া হচ্ছে না তাতে। তার উপর কেউ পাহারায় নেই। এরপর সে দেখল আরবরা শিবির ছেড়ে পালিয়ে গেছে। মার্কাস তখন ছুটে গিয়ে ওরমান আর ওগ্রেডির তাঁবুতে গিয়ে তাদের জাগাল। ব্যস্তভাবে বলল, আরবরা পালিয়ে গেছে। তাদের ঘোড়া, মালপত্র কিছুই নেই।

ওরমান আর ওগ্রেডি মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। সব শুনে ওরমান বলল, মনে হচ্ছে কয়েক ঘণ্টা আগেই ওরা পালিয়েছে। যাই হোক, ওদের ছাড়াই আমাদের চলতে হবে। এখন প্রাতরাশের জন্য খাবার তৈরীর জন্য মেয়েদের ডাক। জিমি আর শর্টিকেও ডেকে তোল।

মার্কাস মেয়েদের ঘরে চলে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, মেয়েদের পাওয়া যাচ্ছে না। রোণ্ডা, নাওমি কেউ নেই। তাদের ঘরটার সবকিছু তছনছ হয়ে আছে।

ওরমান ছুটে রান্নাঘরে গেল। বলল, তারা হয়ত প্রাতরাশের জন্য খাবার তৈরী করছে।

কিন্তু দেখল তারা রান্নাঘরেও নেই। শিবিরের সর্বত্র ও আশেপাশে কোথাও তাদের পাওয়া গেল না।

মার্কাস বলল, আরবরা ওদের ধরে নিয়ে গেছে। ওদের চেঁচাবার সুযোগ দেয়নি কিন্তু কেন তারা ওদের নিয়ে গেল।

ওগ্রেডি বলল, হয়ত মুক্তিপণ চায় মোটা রকমের অথবা ওদের বিক্রি করে দিতে চায় মোটা দামে।

ওরমান বলল, এশিয়া ও আফ্রিকাব অনেক জায়গায় মেয়ে বিক্রির বাজার আছে।

এরপর ওরমান কোথায় যাবার জন্য তার জামা কাপড়, খাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে তৈরী হতে লাগল। তা দেখে বিল ওয়েস্টও সেইভাবে যাবার জন্য তার জিনিসপত্র গোছাতে লাগল।

ওরমান তাকে বলল, কোথায় যাবে তুমি?

ওয়েস্ট বলল, আমি যাব তোমার সঙ্গে।

ওরমান বলল, আমি যাচ্ছি আমার কবরখানায়।

ওগ্রেডি বলল, তোমরা যদি মেয়েদের খোঁজ করতে যাও তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব।

অনেকেই যেতে চাইল। কিন্তু ওরমান বলল, না, আমি একা যাব। দলবলের থেকে একজন লোক অনেক দ্রুত যেতে পারে। ওরা ঘোড়ায় গেলেও অনেক জায়গায় নামতে হবে ওদের। তার থেকে আমি হেঁটে তাড়াতাড়ি যাব। আমার অনুপস্থিতিতে সফরির ভার থাকবে ওগ্রেডির উপর।

ওগ্রেডি বলল, কিন্তু তুমি একা, ওদের ধরতে পারলেই বা কি করবে? কি করে একা লড়াই করবে?

ওরমান বলল, আমি ত লড়াই করব না। আরবরা ওদের বিক্রি করে যত টাকা পাবে আমি তাদের আরো বেশী টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে আনব।

ওগ্রেডি বলল, প্রাতরাশ করে যাও।

ওরমান প্রাতরাশ খেতে খেতে বলল, ওয়াম্বি জলপ্রপাতের কাছে তোমরা অপেক্ষা করবে আমার জন্য। সেখানে গেলে কিছু আদিবাসী ভৃত্য পাবে। দক্ষিণ দিকের পথ দিয়ে একজন লোককে জিঞ্জায় পাঠিয়ে আমাদের আমেরিকার স্টুডিওতে খবর পাঠিয়ে দেবে। যা যা ঘটেছে তা জানিয়ে দেবে এবং এখন কি করা হবে তার নির্দেশ চাইবে।

ওরমান যাবার জন্য উদ্যত হতেই বিল ওয়েস্ট তার পিছু নিল। বলল, আমাকে যেতেই হবে। রোণ্ডা কোথায় কেমন আছে তার কিছুই জানি না।

ওরমান বলল, বুঝেছি। আমি একথাটা ভাবিনি। তুমি আমার সঙ্গে যেতে পার।

ওরমান আর ওয়েস্ট শিবির থেকে বেরিয়ে যেপথে আরবরা ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে গেছে সেই পথ ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে।

রাত্রিশেষে নতুন দিনের আলোকে স্বাগত জানাল ওবরস্কি। কারণ এদিন মৃত্যু এসে তার বন্দীত্বের সব দুঃখকষ্টভোগের অবসান ঘটাতে পারে। দড়ির শক্ত বাঁধনগুলোর জন্য তার হাতে পায়ে ব্যথা লাগছিল। তার উপর ক্ষুধা তৃষ্ণার জ্বালা। ক্ষুধার থেকে তৃষ্ণায় বেশী কষ্ট পাচ্ছিল সে। ঘরের ছোট ছোট ইঁদুরগুলো গায়ে উঠে কামড়াচ্ছিল। সারা রাত ধরে গ্রামবাসীরা নাচগান করতে থাকায় তাদের সেই ভয়ঙ্কর নাচগানের শব্দে রাতে একটুও ঘুম হয়নি ওবরস্কির। কিন্তু ওবরস্কি দেখল কামুড়ি ও তার দুজন লোক বেশ ঘুমোচ্ছে।

ওবরস্কির ডাকাডাকিতে কামুড়ি আর দুজন বন্দী নিগ্রো উঠে পড়ল। সে তাদের বলল, খাবার আর জলের জন্য তোমরা চীৎকার করো।

কামুড়ি আর দুজন বন্দী একযোগে চেঁচাতে থাকলে দরজার বাইরে শুয়ে-

থাকা একজন প্রহরী উঠে পড়ল। সে ঘরে ঢুকে বলল, তোমরা যদি এভাবে চীৎকার করো তাহলে তোমাদের জিব কেটে দেব।

সারারাত নাচগান করে কাটিয়ে ক্লান্ত হয়ে গ্রামবাসীরা প্রায় দুপুর পর্যন্ত ঘুমোল। তারপর মেয়েরা উঠে রান্নার কাজ করতে লাগল। কয়েকজন প্রহরী এসে বন্দীদের পায়ের বাঁধনগুলো খুলে দিয়ে তাদের সকলকে বানস্তুটো আদিবাসীদের সর্দার রঙ্গুলার ঘরের সামনে নিয়ে গেল। রঙ্গুলা কামুড়িকে তাদের ভাষায় কি বললে কামুড়ি ওবরস্কিকে বলল, সর্দার জিজ্ঞাসা করছে তোমরা ওদের দেশে কি করছিলে?

ওবরস্কি বলল, আমরা একটা কাজে চলে যাচ্ছিলাম। ওদের কোন ক্ষতি করিনি। আমরা বন্ধু। আমাকে ছেড়ে দিতে বল।

কামুড়ির মাধ্যমে সেকথা শুনে রঙ্গুলা বলল, সব শ্বেতাঙ্গদের মারা হবে। গতকাল তাকেও মারা হত, শুধু তার চেহারাটা খুব বলিষ্ঠ বলে সঙ্গে সঙ্গে মারা হয়নি।

কামুড়ি রঙ্গুলাকে বলল, কিন্তু আমাদের কোন খাদ্য বা পানীয় না দিয়ে এভাবে শুকিয়ে রাখলে তাতে কি লাভ হবে তাদের?

রঙ্গুলা তার লোকদের সঙ্গে কি আলোচনা করল। তারপর ওবরস্কির কাছে এসে তার পোশাকগুলো হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। পরে কামুড়ির মাধ্যমে সেগুলো সব খুলে দিতে বলল। ওবরস্কি বলল, আমি কি পরব? কিছু একটা পরতে হবে ত?

ওবরস্কি তার পরনের সব পোশাক একে একে খুলে দিলে রঙ্গুলা একটা ময়লা কৌপীন দিল পরতে। সে যখন তার প্যাণ্ট খুলছিল তখন রঙ্গুলার বাড়ির মেয়েরা দরজা থেকে হাসাহাসি করছিল।

এরপর রঙ্গুলা তাদের যোদ্ধাদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা একটা লোককে ডেকে ওবরস্কির পাশে দাঁড়াতে বলল। দেখল ওবরস্কি তার থেকেও লম্বা এবং তার পেশীগুলো সত্যিই বেশ বলিষ্ঠ আর সুগঠিত।

কামুড়ি আর ওবরস্কিকে আবার সেই ঘরটার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। এবার আর তাদের পাগুলো বাঁধা হলো না। রঙ্গুলার নির্দেশে একটা আদিবাসী মেয়ে তাদের জল আর খাবার দিয়ে গেল।

এইভাবে এক সপ্তাহ কেটে গেল। তারপর একদিন রাত্রিবেলায় কামুড়ির একজন বন্দী লোককে তিন-চারজন যোদ্ধা এসে তাকে সর্দারের ঘরের সামনে নিয়ে গেল। গ্রামবাসীরা ঢোলের তালে তালে উল্লাস করতে লাগল। সেই উল্লাসের মাঝে একসময় একটা তীক্ষ্ণ কণ্ঠের আর্ত চীৎকার শুনতে পেল ওবরস্কি।

কামুড়ি বলল, সব শেষ।

পরদিন রাতে আবার একজন বন্দীকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করল ওরা।

তৃতীয় দিন কামুড়ি বলল, আজ আমার পালা। আজ রাতে তোমাকে একা থাকতে হবে মালিক।

কিন্তু রাত্রি হতেই কামুড়ি আর ওবরস্কি দুজনকেই নিয়ে যাওয়া হলো সর্দারের বাড়ির সামনে সেই বধ্যভূমিতে। ওবরস্কির সামনে কামুড়িকে নির্মম পীড়নের মাধ্যমে ধীরে ধীরে হত্যা করা হলো। কিন্তু সেদিন ওবরস্কিকে হত্যা করা হলো না। কামুড়িকে হত্যা করার পর ওবরস্কিকে আবার সেই ঘরে এনে রাখা হলো।

পরদিন ওবরস্কি ভাবল, আজ তার পালা। সে বুঝল মৃত্যু তার অনিবার্য। কিন্তু পীড়নটাকে যাতে সে এড়াতে পারে এবং মৃত্যুটা যাতে দ্রুত সংঘটিত হয় তার জন্য সে একটা পরিকল্পনা খাড়া করল। সে ঠিক করল বধ্যভূমিতে গিয়ে সে তার দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে যোদ্ধাদের মারতে শুরু করে দেবে। তাহলে তাকে খুব তাড়াতাড়ি মেরে ফেলবে তারা।

এদিকে টারজন দূর থেকে রঙ্গুলাদের গাঁ থেকে পর পর তিন রাত ঢাক-ঢোলের আওয়াজ, নাচগানের শব্দ শুনতে পেয়েছে। সে জানে এ অঞ্চলে কোন আদিবাসীরা থাকে এবং কি পদ্ধতিতে তারা শ্বেতাঙ্গদের দিনের পর দিন হত্যা করে চলেছে। নিগ্রো আদিবাসী বা শ্বেতাঙ্গদল কোন পক্ষের প্রতিই তার কোন সহানুভূতি নেই। তাছাড়া সে দেখেছে শ্বেতাঙ্গদলের নেতা ওরমান নিগ্রোভৃত্যদের কিভাবে চাবুক মেরেছে। কয়েকদিন আগে ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে বানসুটোরা যখন শ্বেতাঙ্গদের আক্রমণ করে এবং একসঙ্গে অনেকগুলো রাইফেল গর্জন করে ওঠে টারজন তখন কাছাকাছি ছিল না। তবে সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল।

আজ রাতে আবার বানসুটোদের গাঁ থেকে দমদম নাচের বাজনার শব্দ শুনতে পেল। কি মনে হতে সেই গাঁয়ের দিকে গাছের ডালে ডালে এগোতে লাগল টারজন। জাদ-বাল-জা তখন তার সঙ্গে ছিল না। সে আজকাল একটা মোটাসোটা সিংহীকে তার সাথী হিসাবে পেয়ে বেশীর ভাগ সময় তার কাছে কাছেই থাকে।

গাঁয়ের কাছে গিয়ে টারজন দেখল গাঁয়ের সর্দারের ঘরের সামনে নাচের আসর বসেছে। জলন্ত আগুনের আলোয় দেখতে পেল তারই মত অনেকটা দেখতে বলিষ্ঠদেহী এক শ্বেতাঙ্গ যুবককে একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। একটু পরেই অর্থাৎ নাচ হয়ে গেলেই তার উপর অকথ্য পীড়ন চালিয়ে হত্যা করা হবে তাকে।

টারজন দেখল সর্দারের ঘরের আশেপাশে ও পিছনে অনেকগুলো গাছ

রয়েছে। গাঁয়ের পিছন দিক দিয়ে সে সর্দারের কুঁড়ের কাছে একটা গাছের উপর উঠে গেল। সেখান থেকে ওদের নাচটা ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছিল টারজন। মুখে রংমাখা যোদ্ধারা বাজনার তালে তালে নাচছিল আর মাঝে মাঝে লাফাচ্ছিল। সর্দার রঙ্গুলা একপাশে দাঁড়িয়েছিল। বন্দী শ্বেতাঙ্গ যুবকটিকে দেখে কৌতূহল জাগল তার মনে। তার মত অনেকটা দেখতে। সে কে এবং কোথা থেকে এসেছে তা বুঝতে পারল না। দেখল যুবকটি একেবারে নগ্ন এবং এ অঞ্চলে আসা শ্বেতাঙ্গদলের সঙ্গে তাকে দেখতে পায়নি এর আগে।

সর্দার রঙ্গুলা একটা টুলের উপর বসেছিল। সে হঠাৎ হুকুম দিল, বন্দীকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেল এবার।

কিন্তু ওববস্কিকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য যোদ্ধারা তার কাছে এলেই সে একজনকে তুলে এনে অন্য যোদ্ধাদের উপর সজোরে ফেলে দিল। তাতে অনেকে পড়ে গেল। রঙ্গুলা চীৎকার করে বলতে লাগল, ওকে ধরে ফেল। বেঁধে ফেল।

কিন্তু সমানে একা অনেক লোকের সঙ্গে লড়াই করে যেতে লাগল ওবরস্কি। নিগ্রোযোদ্ধারা সংখ্যায় বেশী থাকায় ক্রমে তারা ওবরস্কিকে ধরে ফেলল। কিন্তু তার হাত পা বাঁধতে গেলে সে আবার ঘুষিতে বেশ কয়েকজনকে ঘায়েল করল। তবু তারা ওববস্কিকে মাটিতে ফেলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাছের উপর থেকে অতর্কিতে একটা দড়ির ফাঁস এসে সর্দার রঙ্গুলার গলায় আটকে গেল। তার হাতদুটোও বাঁধা পড়ে গেল ফাঁসে। রঙ্গুলা ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে চীৎকার করে উঠল। তার পাশের লোকরা কিছু বোঝার আগেই তার দেহটা আশ্চর্যজনকভাবে গাছের উপর উঠে গেল। অথচ গাছের উপর কোন লোক দেখতে পেল না তারা।

ওবরস্কি নিজেও কম আশ্চর্য হলো না।

হঠাৎ গাছের উপর থেকে এক অদৃশ্য লোকের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। রঙ্গুলাকে সে কণ্ঠস্বর বলল, আমাকে দেখতে পাচ্ছ? দেখ আমি কে।

রঙ্গুলা ভয়ে ও যন্ত্রণায় হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হ্যাঁ পাচ্ছি, ওয়ালাম্বে।

টারজন বলল, না আমি ওয়ালাম্বে বা মৃত্যুর দেবতা নই। আমি তার থেকেও বড়। আমি হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন। আমি যেকোন সময়ে মৃত্যু এনে দিতে পারি। যেকোন লোকের মৃত্যু ঘটাতে পারি।

রঙ্গুলা তেমনি হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কি চাও তুমি? কি করবে আমাকে নিয়ে?

টারজন বলল, আমি নিজেকে দু ভাগে ভাগ করে আর একটি মানুষকে আমার মত করে তাকে পাঠিয়েছিলাম তোমাদের কাছে। তোমরা তার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করো তা দেখতে চেয়েছিলাম। আমি দেখলাম তারা তোমার কোন ক্ষতি না করলেও তোমরা তাদের বিনা কারণে হত্যা করো, তাদের সঙ্গে

নিষ্ঠুর ব্যবহার করো। এরজন্য তোমাকে মরতে হবে।

রঙ্গুলা বলল, তুমি গাছের এইখানে রয়েছ, আবাব গাছের তলাতেও রয়েছ। তুমি তাহলে দানব। তোমাকে খাদ্য, পানীয়, অস্ত্রশস্ত্র এবং মেয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট করব। তুমি আমাকে মেরো না।

টারজন বলল, তোমার জীবনের একটা মূল্য ছাড়া আর আমি কিছুই চাই না।

রঙ্গুলা ভয়ে ভয়ে বলল, সেটা কি মালিক?

টারজন বলল, তোমাকে কথা দিতে হবে তুমি কোন শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে লড়াই করবে না। তোমাদের দেশে কোন শ্বেতাঙ্গ এলে বরং তাকে সাধ্যমত সাহায্য করবে।

রঙ্গুলা বলল, কথা দিচ্ছি মালিক। আমি তাই করব।

টারজন বলল, তাহলে তোমাদের লোকদের বল ঐ বন্দীর বাঁধন খুলে তাকে যেন ছেড়ে দেয় তারা। তারপর গাঁয়ের গেট খুলে দেয় যেন। আমরা চলে যাব।

রঙ্গুলা চীৎকার করে তার লোকদের সেইমত হুকুম দিল। টারজনও তখন তার গলা থেকে ফাঁসটা খুলে দিল।

ওবরস্কি এই সব ব্যাপার দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল একেবারে। গাছের উপর থেকে টারজন এবার ইংরিজিতে তাকে বলল, তুমি গাঁয়ের বাইরে বনের ধারে চলে যাও। ওরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। আমি যাচ্ছি এখনি।

ওবরস্কি টারজনের কথামত গাঁয়ের বাইরে বনের মধ্যে ঢুকতেই তার পিছনে গিয়ে হাজির হলো টারজন। ওবরস্কি মুখ ঘুরিয়ে বলল, কে তুমি?

টারজন বলল, আমি বাঁদরদলের রাজা টারজন।

ওবরস্কি আগেই টারজনের নাম শুনেছিল। সে ভেবেছিল টারজন কোন রক্ত মাংসের মানুষ নয়। সে শুধু আফ্রিকার রূপকথার এক কাল্পনিক চরিত্র।

বনের মধ্যে যেতে যেতে টারজন বলল, আমার পিছু পিছু এস।

ওবরস্কি বলল, তোমাকে আমার ধন্যবাদ জানানো হয়নি। তুমি এসে আমাকে উদ্ধার না করলে আজ আমার জীবন চলে যেত।

টারজন কিন্তু সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে নীরবে পথ চলতে লাগল। মাঝে মাঝে তাদের পথের সামনে একটা করে সিংহের গর্জন শোনা যাচ্ছিল। নিশীথ গভীর রাতে অন্ধকার বনভূমির মধ্য দিয়ে জীবনে প্রথম পথ হাঁটছে ওবরস্কি। অথচ কোনদিকে না তাকিয়ে কোনরকম বিচলিত না হয়ে অবলীলাক্রমে পথ হেঁটে চলেছিল টারজন।

অবশেষে তারা একটা ফাঁকা জায়গায় একটা নদীর ধারে এসে থামল।

চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল ফাঁকা জায়গাটায়। চারদিকে অন্ধকার কালো বনভূমির মাঝখানে চাঁদের আলোভরা এই ফাঁকা জায়গাটাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল।

কিন্তু সে সৌন্দর্য ভাল করে উপভোগ করতে না করতেই দুটো সিংহ দেখে ভয় পেয়ে গেল ওবরস্কি। তাদের মধ্যে একটা সিংহ আর একটা সিংহী ছিল। সিংহীটা ওদের দেখে গর্জন করতে লাগল।

টারজন ওবরস্কিকে বলল, কোন ভয় নেই, তুমি দাঁড়াও। সিংহীটাকে আমি চিনি না, দেখি কি ব্যাপার।

ওবরস্কি সেইখানে ভয়ে ভয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল। সে দেখল টারজন সিংহটার দিকে এগিয়ে গেল। সে ভাবল টারজন পাগল। পাগল না হলে কেউ কখনো একটা জীবন্ত সিংহের কাছে নিজে থেকে গিয়ে ধরা দেয় না। তার হাতে এই সময় একটা রাইফেল থাকলে সে বাঁচাতে পারত এই লোকটাকে।

কিন্তু ওবরস্কি আশ্চর্য হয়ে দেখল টারজন এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে সিংহটার সঙ্গে। সে বলল, টার্মাঙ্গানী ও জাদ-বাল-জা ট্যাণ্ড বাণ্ডোলো। স্থাবর ট্যাণ্ড বাণ্ডোলো। অর্থাৎ টার্মাঙ্গানী এসেছে, জাদ-বাল-জা তুমি তোমার সিংহীকে সাবধান করে দাও।

জাদ-বাল-জা নামে সিংহটা কাছে গিয়ে কি বলতেই সিংহীটা চলে গেল। জাদ-বাল-জাও তার সঙ্গে চলে গেল।

টারজন এবার ওবরস্কির ঘাড়ে একটা হাত রেখে বলল, জাদ-বাল-জা আর তোমার কোন ক্ষতি করবে না কখনো। সে এবার থেকে তোমার গন্ধ শুঁকে তোমাকে চিনতে পারবে।

ওবরস্কি ভেবেছিল একটা গাছের উপর উঠে পড়বে। কিন্তু টারজনের কথায় আশ্বস্ত হলো সে। টারজন আবার ওবরস্কিকে বলল, জাদ-বাল-জা আসছে। তুমি ওর গায়ে মাথায় হাত বোলাও। ভয় পেলেও সে ভয়টা বাইরে প্রকাশ করবে না।

টারজন এবার ঘাসের উপর সটান শুয়ে পড়ে বলল, এখানেই শুয়ে পড়। জাদ-বাল-জা পাহারা দেবে যাতে আমাদের ক্ষতি না হয়। আচ্ছা তুমি এ অঞ্চলে কিভাবে এলে?

ওবরস্কি তখন আমেরিকা থেকে কখন কিভাবে কি কারণে আফ্রিকার জঙ্গলে এল তা সব বলল।

টারজন তা শুনে বলল, আমি যদি জানতাম তুমি ঐ সফরির লোক তাহলে আমি তোমাকে উদ্ধার করতাম না।

ওবরস্কি বলল, কেন?

টারজন বলল, তোমাদের দলনেতা লোকটা বড় খারাপ। সে নিগ্রোভৃত্যদের প্রায়ই চাবুক মারত।

ওবরস্কি বলল, লোকটাকে আমিও দেখতে পারতাম না। শুধু টাকার জন্য এ ছবিতে অভিনয় করতে আসি আমি। লোকটা পরিচালক হিসাবে খুব নামকরা। তবে বড় মদ খায় আর মদ খেয়েই চাবুক মারত লোকগুলোকে।

কথা বলতে বলতে ক্রমে ঘুমিয়ে পড়ল ওবরস্কি। টারজনের চোখেও আগেই ঘুম এসে গিয়েছিল।

সপ্তম অধ্যায়

ইয়াদ নামে এক আরব যুবক আতুইকে বলল, এই মেয়েটাকে ধরে এনে আমার মনে হয় ভুল করেছে শেখ। শ্বেতাঙ্গরা রাইফেল নিয়ে আমাদের ধরতে আসবে। আমি ওদের চিনি। আমাদের সবাইকে মেরে ফেলবে। তোমরা ম্যাপটা পেয়ে গেছ। কিন্তু ম্যাপের জন্য ওরা কিছু বলবে না। ও ম্যাপের পরোয়া করে না ওরা। কিন্তু মেয়ে চুরির অপরাধ ওরা কখনো ক্ষমা করে না।

আতুই বলল. হীরের দেশে আমরা কোনদিন উপত্যকা খুঁজে না পেলেও আমরা শুধু হাতে দেশে ফিরে যাব না। মেয়েদুটো বিক্রি করে দিলে মোটা দাম পাওয়া যাবে। এমন কি ওদের দলের শ্বেতাঙ্গরাও মুক্তিপণ হিসাবে অনেক টাকা দিয়ে ফিরিয়ে নিতে পারে ওদের। তাছাড়া ম্যাপটাতে ইংরিজি ভাষায় যেসব কথা লেখা আছে তা পড়ার জন্য মেয়েদুটোর দরকার। আমি ইংরিজি বলতে পারি। কিন্তু পড়তে বা লিখতে পারি না।

সকাল থেকে সারাটা দিন ধরে অশ্বারোহী আরবরা ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছিল মেয়েদুটোকে নিয়ে। নাওমি একসময় রোণ্ডাকে বলল, আর আমি হাঁটতে পারছি না। আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ব।

রোণ্ডা বলল, আমাকে ধরে ধরে হাঁট।

সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়লে শেখ শিবির স্থাপন করল পথের ধারে এক জায়গায়।

সন্ধ্যের পর শেখ আতুইকে ম্যাপটা আনতে বলল। বলল, আমাকে বুঝিয়ে দাও কোথায় হীরকদেশের উপত্যকাটা আছে আর সেখানে যাবার পথটাই বা কোনদিকে।

আতুই আবার রোণ্ডাকে ডাকল। বলল, হীরকদেশের উপত্যকাটা

কোথায় আছে এই ম্যাপটাতে তা দেখিয়ে দাও।

রোণ্ডা ম্যাপটা দেখে হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, কোথায় হীরকদেশ? ও ত কল্পনা। আমাদের যে ছবি হবে তাতে ঐ ধরনের জায়গার একটা কল্পনা করা হয়েছে।

আতুই বলল, দেখ, বেদুইনদের তুমি ঠকাতে পারবে না। তুমি যদি আমাদের এটা দেখিয়ে না দাও তাহলে তোমার গলা কেটে ফেলব।

নাওমি ভয়ে শিউরে উঠে রোণ্ডাকে বলল, তুমি ওদের বুঝিয়ে দাও। কেন এমন করছ?

রোণ্ডা তখন ম্যাপটার উপর ঝুঁকে পড়ে শেখকে বোঝাতে লাগল। এক জায়গায় হাত দিয়ে বলল, এটা হলো উত্তর দিক। এটা হলো হীরকদেশের উপত্যকা। এইখানে কতকগুলো তীর রয়েছে। এইগুলো হচ্ছে পথনির্দেশ। উপত্যকায় যাবার পথ। উপত্যকার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে একটা নদী রয়েছে। সেই নদীটা আবার আর একটা বড় নদীতে পড়েছে। এখানে এক নরখাদক উপজাতিদের বস্তী আছে।

শেখ একটা আঙ্গুল দিয়ে বলল, এটা বোধ হয় ওম্বাম্বি জলপ্রপাত আর এটা হলো বানসুটোদের গাঁ। আগামীকাল আমরা এই নদীটা পেরিয়ে ফাঁকা প্রান্তরটায় গিয়ে পড়ব। তারপর একটা রুক্ষ পাহাড় পাব।

আতুই বলল, কাল যদি ওখানে যেতে পারি তাহলে খুব তাড়াতাড়ি আমরা হীরকদেশের উপত্যকায় গিয়ে পড়ব।

শেখ আতুইকে কি বলতে রোণ্ডা তাকে জিজ্ঞাসা করল শেখ কি বলল।

আতুই বলল, শেখ বলছে হীরকদেশে গিয়ে অনেক হীরে পেলে সে ধনী হবে। তখন সে তোমাদের দুজনকেই রেখে দিতে পারবে। সে তখন আর বিক্রি করবে না তোমাদের।

আরবরা মেয়েদের শোবার জন্য একটা তাঁবুর ঘরে কম্বল বিছিয়ে দিল। রোণ্ডার চোখে কিন্তু ঘুম এল না। সে একসময় নাওমিকে বলল, ওরা যখন সত্যি সত্যিই হীরের দেখা বা খোঁজ পাবে না, তখন আমাদের উপর ক্ষেপে যাবে। আমাদের তখন যেখানে হোক বিক্রি করে দেবে। সুতরাং এখনি আমাদের পালিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।

নাওমি বলল, সে কি, এই রাত্রিতে বনের ভিতর দিয়ে কি করে পালাবে? যাই হোক, তোমার মতলবটা কি?

রোণ্ডা বলল, তুমি শুধু আমাকে অনুসরণ করে যাবে। কোন কথা বলবে না।

এই বলে সে উঠে দেখল আরবরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। একজন পাহারাদার শুধু আগুনের ধারে জেগে আছে। সেও তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে

ঝিমোচ্ছে।

রোগা চুপি চুপি উঠে গিয়ে একটা জলন্ত কাঠ এমনভাবে সজোরে প্রহরীটার মুখের উপর গুঁজে ধরল যে সে সঙ্গে সঙ্গে অচেতন হয়ে পড়ে গেল।

বনের মধ্যে অশ্বারোহীদের যাবার মত যে একটা পথ ছিল সেই পথ ধরে ওরমান আর বিল ওয়েস্ট ক্রমাগত এগিয়ে চলেছিল। পরের দিন এইভাবে যেতে যেতে দেখল পথটা একটা নদীর মধ্যে নেমে গেছে। ওপার থেকে আবার শুরু হয়েছে পথটা। ওপারে বনটাও আবার শুরু হয়েছে নদীর ধার থেকে। কিন্তু নদীটা পার হয়ে ওরা বুঝতে পারল না আরবরা এপথে এসেছে বা গেছে কি না। ওরা শিবিরে যা কিছু অল্প খাবার এনেছিল তা ফুরিয়ে গেছে। পথে কোন শিকারও পায়নি। শিবির থেকে বার হবার পর এগার দিন কেটে গেছে। তবুও কোন সন্ধান পায়নি আরবদের।

ওরমান একসময় বলল, আমি ভেবেছিলাম একদিনের মধ্যেই আরবদের দেখা পেয়ে যাব এবং দেখা করেই শিবিরে ফিরে আসব। কিন্তু এগার দিন কেটে গেল। আর কোন আশাই নেই। এখন আমাকে ফিরে গিয়ে আমার দলের লোকদের বাড়ি পাঠাবার কথা ভাবতে হবে।

ওরা বুঝতে পারল বনে পথ হারিয়ে ফেলেছে। হঠাৎ ওয়েস্ট বলল, কিসের একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে কে যেন আসছে।

ওরমান বলল, ওটা একটা সিংহ হলে মুস্কিল হবে। কারণ এখানে পথটা সরু এবং দুধারে ঘন ঝোপ।

ওয়েস্ট বলল, এখনো কাছে এসে পড়েনি সিংহটা। এখন এগিয়ে চল।

ওরা রাইফেল প্রস্তুত করে হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল। এগিয়ে যেতে যেতে ওরা একটা ওরই মধ্যে ফাঁকা জায়গায় এসে পড়ল। গাছগুলো সেখানে একটু দূরে দূরে। সিংহটাও সেই ফাঁকা জায়গাটার মুখে এসে দাঁড়াল। ওরমান বলল, গুলি করো বিল। ও আমাদের আক্রমণ করার উদ্যোগ করছে।

ওরমান আগে গুলি করল। গুলিটা সিংহটার মাথার খুলিতে লাগল। বিলের গুলিটা লাগল না। সিংহটা ক্ষেপে গিয়ে ওরমানকে আক্রমণ করল। ওয়েস্ট হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু ওরমানকে কোনভাবে আহত করার আগেই একটা গাছ থেকে টারজন সিংহটার উপর অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ে তার কেশর ধরে বারবার ছুরি বসাতে লাগল তার গায়ে। সিংহটা মারা গেলে তার মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে বিজয়সূচক এক চীৎকার করল। ওরমান আর ওয়েস্ট অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তারা কোন ধন্যবাদ দেবার আগেই টারজন অদৃশ্য হয়ে গেল বনের মধ্যে।

ওরমান বলল, তুমি ভূত বিশ্বাস করো বিল?

বিল বলল, কিন্তু এটা ত মৃত নয়।

ওরমান বলল, আমার মনে হয় ওবরস্কির প্রেতাত্মা এসে আমাদের সিংহের কবল থেকে বাঁচাল।

অষ্টম অধ্যায়

প্রহরীটাকে মেরে রোণ্ডা শিবিরের সব ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিল। তাদের জন্য দুটো ঘোড়াকে বেছে নিয়ে নিজে একটাতে চেপে অন্যটাতে নাওমিকে চাপাল। অন্য ঘোড়াগুলোকে বনের মধ্যে তাড়িয়ে দিল। ঘোড়াগুলো ছাড়া পেয়ে এদিক সেদিক ছুটে পালাতে লাগল।

ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে বনপথ ধরল ওরা। বনপথে কিছুটা যাবার পর পিছনে হৈচৈ আর চীকার শুনতে পেল। রোণ্ডা বুঝল আরবরা জেগে উঠেছে। সে নাওমিকে বলল, ঘোড়াটাকে জোরে চালাও।

ওদের ঘোড়া-দুটো এবার খুব জোরে ছুটতে লাগল।

রোণ্ডা বলল, ওরা আর আমাদের ধরতে পারবে না। অনেক দূরে চলে এসেছি। আমরা এবার আমাদের সফরিতে ফিরে যাব। অথচ কয়েক ঘণ্টা আগেও ভাবতে পারিনি আমরা।

নাওমি বলল, আমার ত মনে হচ্ছে আর কখনো আমাদের লোকদের সঙ্গে দেখা হবে না আমাদের। এই ভয়ঙ্কর জঙ্গলটা থেকে আর কখনো বার হতে পারব না আমরা।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর নাওমি বলল, আমি তোমার সঙ্গে কত খারাপ ব্যবহার করেছি রোণ্ডা। কিন্তু কয়েকদিন হলো তুমি আমার চোখ খুলে দিয়েছ।

কিছুদূর যাবার পর তারা একটা নদীর সামনে এসে পড়ল। নদীটা কিভাবে পার হতে হবে তা বুঝতে পারল না তারা।

রোণ্ডা বলল, নদীটা পার হতে হবে। এখন ফিরে গেলে আরবদের কবলে পড়ব আমরা। আমার সঙ্গে সঙ্গে এস। নদীটা তেমন চওড়া বা গভীর নয়। ঘোড়াগুলোকে নামিয়ে দিলে ঠিক পার হয়ে যাব।

নদী পার হতেই সকাল হয়ে গেল। দূরে সামনে পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। নদীটার এপারে ফাঁকা মাঠ। মাঝে মাঝে কিছু গাছপালা ছড়িয়েছিল।

নদী পার হয়ে ওরা আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিল। সহসা সামনে কতকগুলো গাছের ওধার থেকে একটা সিংহের গর্জন শোনা গেল। ঘোড়া-

গুলো থেমে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে সিংহটা ওদের সামনে এসে রোগুার ঘোড়াটাকে আক্রমণ করল আগে। রোগুা ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মরার মত শুয়ে রইল স্থির হয়ে। সিংহটা ঘোড়াটাকে মেরে তার উপর থাবা গেড়ে বসে রইল। এদিকে সিংহটা রোগুার ঘোড়াটাকে মারতে গিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লে নাওমির ঘোড়াটা তীরবেগে পিছন দিকে ঘুরে পালিয়ে গেল। নদী পার হয়ে যে পথে এসেছিল ওরা, সেই পথেই পালাতে লাগল ঘোড়াটা। নাওমি তার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারল না কোনভাবে। নাওমি একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল সিংহটা সেইভাবে বসে আছে ঘোড়ার মৃতদেহটার উপর আর তার অদূরে রোগুা তেমনি শুয়ে আছে নিস্পন্দ হয়ে।

এদিকে ওরমান আর বিল ওয়েস্ট পথ হারিয়ে গভীর জঙ্গলের মধ্যে অনেক ঘুরে বেড়াল। কিন্তু কোন পথ খুঁজে পেল না। ওরা হারানো মেয়েদুটোর খোঁজে বেরিয়েছে দু সপ্তাহ হয়ে গেল। তার কয়দিন কিছুই খাওয়া হয়নি। আজ আবার পথে সিংহ ওদের আক্রমণ করায় ভয় পেয়ে গেছে দুজনেই।

ওরমান বলল, আমি ভূত বিশ্বাস করি না। ওবরস্কি ভূত নয়, ওবরস্কি নিজেই আমাদের উদ্ধার করে চলে গেছে। তবে তার মাথার ঠিক নেই। সে পাগল হয়ে গেছে বলে গায়ে তার জোর অনেক বেড়ে গেছে এবং সে আমাদের চিনতে পারেনি।

ওয়েস্ট বলল, ওবরস্কি যাই করুক সে শুধু আমাদের বাঁচায়নি, সে আমাদের আর একটা উপকার করে গেছে সিংহটাকে মেরে।

ওরমান বুঝল সিংহটার মাংস খাবার কথা বলছে ওয়েস্ট।

ওরা দুজনে বসে ছুরি দিয়ে সিংহটার মৃতদেহ কেটে পেট ভরে মাংস খেল এবং অনেকটা মাংস কেটে সঙ্গে নিয়ে নিল। মাংস খেয়ে কিছুটা গায়ে বল পেল ওরা।

সন্ধ্যার দিকে ওয়েস্ট হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে ওরমানকে কি দেখাল। ওরমান তা দেখে বলল, ও হচ্ছে ঈয়াদ নামে সেই আরবটা। কিন্তু ওর সঙ্গে ও দলের অন্য কেউ নেই। ও এক জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে একা বসে আছে তার পাশে।

ওরমান আর ওয়েস্ট রাইফেল হাতে এগিয়ে গেল। ওদের দেখে ঈয়াদও রাইফেল তুলে গুলি করতে গেল। কিন্তু তার আগেই ওরমান ওকে লক্ষ্য করে রাইফেল তুলে ধরেছে। সে ধমক দিয়ে বলল, বন্দুক নামাও।

ঈয়াদ বাধ্য হয়ে এবার বন্দুক নামাল।

ওরমান ওকে জিজ্ঞাসা করল, শেখ আবেল বেনেম কোথায়? আমাদের দল থেকে যে মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়েছিলে তারাই বা কোথায়?

ঈয়াদ শুধু নামগুলো ছাড়া ওদের কোন কথা বুঝতে পারল না। সে

ইংরিজিতে কথা বলতে জানে না, আতুই জানত। সে হাবভাবে ও ইশারা করে বুঝিয়ে দিল, একটা মেয়েকে সিংহতে খেয়েছে। সে ছাড়া বাকি আরবদলের সবারই অবস্থা খুব খারাপ। তারা সবাই বিপদাপন্ন।

ওরা বুঝল ঈয়াদ নিশ্চয়ই কোন বিপদ থেকে বাঁচার জন্য দল ছেড়ে একাই পালিয়ে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছে। না খেতে পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে।

একটা নদীর ধারে সন্ধ্যার সময় শিবির স্থাপন করল ওরা। ওদের সঙ্গে যে মাংস ছিল তা রান্না করল ওরমান। ঈয়াদ ওদের সঙ্গেই রয়ে গেল। ওরমান বলল, আগামীকাল সকালে আমরা আমাদের সফরির খোঁজে বার হব। ঈয়াদ আমাদের কাছে থাকবে পথ দেখাবার জন্য।

এদিকে ওদের শিবিরের কাছ থেকে ওদের অলক্ষে অগোচরে টারজন কখন ওদের দেখে গেছে তা বুঝতে পারেনি ওরা। টারজন সেই রাতেই ওবরস্কির কাছে গিয়ে বলল, আমি তোমাদের দুজন সঙ্গীকে দেখে এসেছি, তাদের নাম ওরমান আর ওয়েস্ট। তাদের সঙ্গে একজন আরবও ছিল। আমাদের এখান থেকে উত্তর দিকে কয়েক মাইল দূরে।

ওবরস্কি বলল, মেয়েদের দেখনি ?

টারজন বলল, না, কালই তোমায় ওরমানের কাছে নিয়ে যাব। সেখানে গেলেই জানতে পারবে সবকিছু।

নবম অধ্যায়

সেদিন সিংহটার আক্রমণের পর চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল রোণ্ডা ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে। চেতনা ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকাতেই সে দেখল একটা সিংহ তার মরা ঘোড়াটার উপর একটা পায়ের থাবা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে তখন ভয়ে আবার চোখ বন্ধ করল।

সিংহটা এবার তার কাছে এসে তার দেহটাকে শুঁকতে লাগল। রোণ্ডা যতদূর পারল শ্বাসরুদ্ধভাবে মরার ভান করে রইল। সে জানত সাধারণতঃ মরা মানুষকে কোনরকম পীড়ন করে না সিংহরা। দেখল কিছুক্ষণ পর ঘোড়ার মৃতদেহটা টানতে টানতে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে গেল সিংহটা।

রোণ্ডা শুয়ে শুয়ে লক্ষ্য করতে লাগল সিংহটাকে। সে দেখল কাছে একটা গাছ রয়েছে। গাছটায় কোনরকমে একবার উঠতে পারলেই আপাততঃ মুক্তি পাবে সিংহটার কবল থেকে। সিংহটা মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকে দেখছিল।

সিংহটা যখন অন্যদিকে তাকিয়ে বসেছিল তখন রোণ্ডা ছুটে গিয়ে গাছটার

একটা ডাল ধরে ফেলল। ক্রমে সে গাছের উপরে উঠে গেল। সিংহটাও ততক্ষণে একটা লাফ দিয়ে তাকে ধরতে গিয়ে তার নাগাল পেল না। গাছের উপর চারদিকে তাকাতে লাগল রোণ্ডা। দেখল তার উত্তরপূর্ব দিকে এক বিশাল প্রান্তর বিস্তৃত হয়ে আছে। প্রান্তরটার মাঝে মাঝে আছে কিছু কিছু গাছের জটলা। প্রান্তরটা ক্রমশঃ উঁচু হয়ে একটা পাহাড়ে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। সহসা তার আতুই-এর একটা কথা মনে পড়ে গেল। ঐ পাহাড়ের নিচে উপত্যকাটার শেষ প্রান্তে একটা জলপ্রপাত আছে। তার নাম ওম্বাম্বি জলপ্রপাত। তার মনে হলো ঐ জলপ্রপাতের কাছে কোনরকমে গিয়ে পড়তে পারলেই সে তার সঙ্গীদের দেখা পাবে। ওরমান ওখানেই যেতে বলেছিল। এক নতুন আশার আলো দেখতে পেল রোণ্ডা। তাতে তার আগের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সব কালিমা মিলিয়ে গেল মুহূর্তে।

প্রায় একটা ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর রোণ্ডা দেখল সিংহটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে যে নদীটা তারা পার হয়ে এসেছে সেই নদীর ধারে গিয়ে একটা ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। রোণ্ডা দেখল এই হচ্ছে সুযোগ। সে তাই গাছ থেকে নেমে উপত্যকার উপর দিয়ে হাঁটতে লাগল সামনের পাহাড়টাকে লক্ষ্য করে। একবার পিছন ফিরে দেখল সিংহটা আর আসছে না তার পিছনে। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছিল সে।

পথে যেতে যেতে একটা শকুনিকে উড়ে বেড়াতে দেখল মাথার উপর। রোণ্ডা সেটাকে কুলক্ষণ হিসাবে ভাবল। তারপর একটা গণ্ডার দেখতে পেয়ে গাছে উঠে পড়ল। গণ্ডারটা চলে গেলে সে গাছ থেকে নেমে আবার পথ চলতে লাগল। তখন দিনের আলো শেষ হয়ে আসছিল। পথটা এবার ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে।

এবার সে বাঁদিকে একটা নদী আর ডানদিকে কতকগুলো পাহাড় দেখতে পেল। নদীতে অনেক জলহস্তী ছিল। তবু রোণ্ডা নদীর কূলে গিয়ে জল খেল। পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছিল সে। পাহাড়ের নিচে অনেক গাছ ছিল। একটা গাছের উপর উঠে রাতটা কাটাল সে। সারারাত সিংহের গর্জন শুনতে পাচ্ছিল। একটুও ঘুম হলো না।

সকালে উঠে রোণ্ডা দেখল অনিদ্রা আর অনাহারে আরো অনেকখানি দুর্বল হয়ে পড়েছে সে। কিন্তু এখানে কোন খাবার পাবার আশা নেই। সে তাই নদীর ধারে একটা সরু পথ ধরে এগিয়ে চলতে লাগল। যেতে যেতে জলপ্রপাতের শব্দ শুনতে পেল। সে বুঝল ঐ জলপ্রপাত থেকেই এই নদীটা বেরিয়েছে।

ক্লান্তি ও দুর্বলতায় আর পথ চলতে পারছিল না রোণ্ডা। একসময় একটা পাথরের উপর বসে পড়ল। এমন সময় তার পিছনে কে ইংরিজিতে বলল,

ও একা আছে। ওকে আমরা আমাদের দেবতার কাছে নিয়ে যাব।

রোণ্ডা মুখ ঘুরিয়ে দেখল দুটো গোরিলা মানুষের মত কথা বলছে।

একটা লোমশ হাত রোণ্ডাকে ধরে ফেলল। একটা গোরিলা তাকে বলল, এস আমাদের সঙ্গে। আমরা তোমাকে আমাদের দেবতার কাছে নিয়ে যাব।

রোণ্ডা গোরিলাদুটোর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য ধবস্তাধবস্তি করতে লাগল। কিন্তু পারল না। একজন গোরিলা তাকে শক্ত করে ধরে পথ চলতে লাগল।

পথের মধ্যে দুজন গোরিলা ঝগড়া শুরু করে দিল নিজেদের মধ্যে। যে গোরিলাটা রোণ্ডাকে ধরেছিল সে বলল, সে তাকে তাদের দেবতার কাছে নিয়ে যাবে।

অন্য গোরিলাটা বলল, দেবতা তো খুবই বৃদ্ধ। সে তার খাবার চিবোতেই পারে না। তার বয়স কত হলো তা কেউ বলতে পারে না। মেয়েটাকে আমি আমার কাছে রেখে দেব। দেবতা মেয়েটাকে রাজা অষ্টম হেনরিকে দিয়ে দিতে পারে। রাজার ত সাতটা স্ত্রী আছে। আবার কেন?

অন্য গোরিলাটা বলল, না, একে আমি তোমাকে দেব না। আমি দেবতার কাছে নিয়ে যাব।

এইভাবে দুজনে ঝগড়া লেগে গেল। যে গোরিলাটা রোণ্ডাকে ধরেছিল সে রোণ্ডাকে নামিয়ে দিয়ে মারামারি করতে লাগল অন্য গোরিলাটার সঙ্গে।

সেই ফাঁকে রোণ্ডা সরে পড়ল সেখান থেকে। কিন্তু তাকে পালিয়ে যেতে দেখে গোরিলাদুটো মারামারি বন্ধ করে ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল রোণ্ডাকে।

বাঁদরের মত সহজভাবে গোরিলাদুটো কখনো গাছে চড়ে কখনো পাহাড়ে উঠে এগিয়ে যেতে লাগল। রোণ্ডা ভেবে পেল না কোথায় তারা নিয়ে যাবে তাকে। কে তাদের দেবতা, কে রাজা অষ্টম হেনরি, তার কিছুই বুঝতে পারল না। রোণ্ডা একসময় ইংরিজি ভাষায় গোরিলাদের প্রশ্ন করল, তোমাদের দেবতা কে? একটা গোরিলা বলল, আমাদের দেবতা পশু নয়, সে একজন মানুষ, খুব বুড়ো হয়ে পড়েছে। সে তোমার মত একজন মেয়ের কথা বলেছিল। তাই তোমাকে তার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

অবশেষে ওরা রোণ্ডাকে একটা নগরসীমানায় নিয়ে গেল। যে নগরের কিছুটা একটা বড় পাহাড় কেটে তার গায়ে নির্মাণ করা হয়েছে আর কিছুটা নির্মিত হয়েছে পাহাড়টার পাদদেশের সমতলভূমিতে। নগরটায় ঢোকার মুখে অনেক বাঁশবন আর জামবন দেখতে পেল রোণ্ডা। নগরসীমানার মধ্যে মাঠে অনেক গোরিলা মেয়ে-পুরুষ কাজ করছিল।

রোণ্ডা একটা গোরিলাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের রাজার নাম অষ্টম হেনরি। হেনরি ত অনেককাল আগে ইংলণ্ডের রাজা ছিল।

গোরিলাটা বলল, আমাদের এ রাজ্যের রাজা, রাণী, মন্ত্রীর সব নাম ইংলণ্ডের হেনরির যুগের মত দেওয়া হয়েছে।

নগর মধ্যে ছুটো বড় পাকা বাড়ি দেখতে পেল। তার মধ্যে একটা হলো রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের প্রহরী বন্দীসহ গোরিলাদুজনকে দেখে বন্দিনীকে প্রথমে রাজার কাছে নিয়ে যেতে বলল।

প্রাসাদের মধ্যে একটা বড় ঘরে রোণ্ডাকে নিয়ে যাওয়া হলো। রোণ্ডা দেখল ঘরটার মধ্যে কোন চেয়ার টেবিল নেই। ঘরখানার মেঝেতে শুকনো ঘাস পাতা রয়েছে। ঘরের পিছন দিকে একটা উঁচু মঞ্চ রয়েছে। মঞ্চের গায়ে ডালপালা ও পাতাহীন একটা মোটা গাছের গুঁড়ি রয়েছে। মঞ্চের উপর একজন গোরিলা পায়চারি করছিল। ছয়-সাতজন গোরিলা মঞ্চের নিচে সামনের দিকে বসেছিল। পায়চারি করতে থাকা গোরিলাটাই হলো রাজা অষ্টম হেনরি।

যে গোরিলাটা রোণ্ডাকে ধরে এনেছিল রাজা তাকে বলল, বন্দিনীকে কোথায় ধরেছ বাকিংহাম ?

গোরিলাটা বলল, জলপ্রপাতের কাছে।

রাজা বলল, ও কি করছিল ?

গোরিলাটা বলল, ও বলছিল ও ওর সঙ্গীদের খোঁজ করছিল।

রাজা বলল, তার মানে বন্দিনী ইংরিজী জানে ?

রোণ্ডা বলল, হ্যাঁ, আমি ইংরিজিতে কথা বলতে পারি। তুমি যদি রাজা হও তাহলে তোমার কাছে আমার আবেদন, তুমি আমাকে সেইখানে পাঠিয়ে দাও।

রাজা বলল, না, আমি তোমাকে আমার কাছে রেখে দেব।

যে দুজন গোরিলা রোণ্ডাকে ধরে এনেছিল তাদের একজন বলল, কিন্তু ওকে আমি আমাদের দেবতার কাছে নিয়ে যাব। প্রথমে আপনাকে দেখাবার জন্যে বন্দিনীকে আপনার কাছে এনেছি। এরপর ওকে দেবতার কাছে নিয়ে যাব।

রাজা বলল, সে কি ক্র্যানমার, তুমিও আমার বিরোধিতা করছ ?

একজন গোরিলা বলল, ক্র্যানমার ঠিকই বলেছে। ওকে দেবতার কাছেই নিয়ে যাওয়া উচিত। আপনি ভুলে যাবেন না, আপনার সাতজন স্ত্রী আছে।

রাজা বলল, তুমি উলসির মতই কথা বলেছ। তুমি সব সময় দেবতার পক্ষ হয়ে কথা বল।

উলসি বলল, ভুলে যাবেন না দেবতাই আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দয়াতেই আমরা সবকিছু পেয়েছি। তিনি ইচ্ছা করলেই আমাদের ধ্বংস করতে পারেন।

রাজা পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থেমে গিয়ে গাছের গুঁড়িটাকে ধরে নাড়া দিল। তারপর গুঁড়িটার উপর উঠে গিয়ে নিচের গোরিলাদের পানে তাকিয়ে গর্জন করতে লাগল। কিছুক্ষণ পর লাফ দিয়ে সেখান থেকে মঞ্চের উপর নেমে তার লোমশ হাতটা দিয়ে বুক চাপড়াতে লাগল। তারপর বলল, আমি হচ্ছি রাজা। আমার কথাই আইন। মেয়েটাকে অন্তঃপুরে মেয়েদের কাছে নিয়ে যাও।

উলসিও বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, দেবতাকে যে অমান্য করবে তাকে মরতে হবে। বন্দিনীকে দেবতার কাছে নিয়ে যাও।

রাজা পাগলের মত হয়ে গিয়ে বলল, না, এ বন্দিনী আমার। সাফোক, প্রহরীদের ডাক। উলসিকে টাওয়ারে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখ। বাকিংহাম, বন্দিনীকে মেয়েদের কাছে অন্তঃপুরে নিয়ে যাও।

রাজা আর উলসি তখনো বুক চাপড়ে ঝগড়া করছিল। বাকিংহাম নামে গোরিলাটা রোণ্ডাকে তখন টানতে টানতে অন্তঃপুরে নিয়ে গেল।

রাজ-অন্তঃপুরে গিয়ে রোণ্ডা দেখল রাজার যে সাতজন রাণী ছিল তাদের সকলের নাম অষ্টম হেনরির রাণীদের নাম অনুসারে ক্যাথারিণ, এ্যানি বোলিন প্রভৃতি এই সব নাম রাখা হয়েছে। রোণ্ডাকে রাণীদের কাছে নিয়ে গেলে বড় রাণী ক্যাথারিণ বলল, রাজা কি আবার একটা বিয়ে করবে? নিশ্চয়ই এইজন্যই মেয়েটাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

এ্যানি বোলিন বলল, কিন্তু রাজার অনেক রাণী আছে।

বাকিংহাম রোণ্ডাকে রেখে চলে যাবার সময় বলে গেল, সেটা রাজা ঠিক করবেন।

বাকিংহাম চলে গেলে রাণীরা রোণ্ডাকে ঘিরে ফেলে তার পোশাক ধরে টানাটানি করতে লাগল।

রোণ্ডার মনে হলো সে পাগল হয়ে যাবে।

একজন রাণী রোণ্ডাকে জোরে ঠেলে দিল। সে দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল রোণ্ডা।

দশম অধ্যায়

নাওমির ঘোড়াটা ঊর্ধ্বশ্বাসে আরবদের শিবিরের দিকে ছুটতে লাগল। নাওমি ঘোড়াটার লাগাম টেনে তার গতিটা অন্য দিকে ঘোরাবার অনেক চেষ্টা করল। কিন্তু ঘোড়াটা তাকে সোজা আরবদের শিবিরে নিয়ে গেল। আতুই তাকে দেখতে পেয়ে আবার বন্দী করে ফেলল।

নাওমিকে দেখে খুশি হলো শেখ। সে বলল, অন্য মেয়েটি কোথায় ?

নাওমি বলল, সিংহ তাকে খেয়ে ফেলেছে।

শেখ বলল, ঠিক আছে। তুমি হলেই চলবে। আমাদের কাছে ম্যাপটা আছে। তুমিই আমাদের হীরকদেশের উপত্যকায় নিয়ে যাবে।

নাওমি বলল, আমি যদি তোমাদের সেখানে নিয়ে যাই তাহলে বল আমাকে মুক্তি দেবে ? আমার সঙ্গীদের কাছে পাঠিয়ে দেবে ?

শেখ আতুইএর মাধ্যমে কথাটা শুনে বলল, ওকে বল তাই করব। কিন্তু আমরা হীরে পেয়ে গেলেও ওকে ছাড়ব না। একথাটা ওকে কিন্তু বলো না।

তখন বিকাল হয়ে গিয়েছিল। আরবরা নদীটার ধারে গিয়ে সে রাতটার মত ওখানেই শিবির স্থাপন করল। পরদিন সকালেই ওরা আবার যাত্রা শুরু করল। নাওমি ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। নদীটার ধারে ধারে সরু পথটা ধরে ওরা এগোতে লাগল।. কিন্তু জলপ্রপাতটার কাছে গিয়ে নাওমি দেখল, এবার নদীটার ওপারে যেতে হবে। কারণ ওধার থেকেই হীরকদেশের উপত্যকায় যাবার রাস্তা।

কিন্তু নদীটা বড় খরস্রোতা এখানে। তার উপর জলে অনেক কুমীর আছে। কোনখান থেকে নদীটা পার হওয়া সহজ হবে তা দেখতে গিয়ে দুটো দিন কেটে গেল ওদের। তারপর একটা জায়গা ওরা নির্বাচন করল। কিন্তু সেখান থেকেও নদী পার হতে গিয়ে সকাল থেকে প্রায় সারাদিন কেটে গেল। কিন্তু ওরা যখন নাওমিকে নিয়ে নদীর ওপারে গিয়ে পৌছল তখন দেখা গেল ওদের দুজন লোক মারা গেছে এবং তাদের ঘোড়াদুটোকে কুমীরে ধরে নিয়ে গেছে।

নদীর ওপারে গিয়ে ওরা একটা চওড়া রাস্তা দেখতে পেল। সেই পথ ধরে ওরা যেতে লাগল। আতুই নাওমির পাশে পাশে ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছিল। একসময় আতুইকে দেখাল নাওমি, ঐ দেখ, লাল গ্র্যানাইট পাথরের একটা স্তম্ভ। ম্যাপে ওটা দেখানো আছে। ওর পুব দিকেই আছে হীরকদেশের উপত্যকায় যাবার প্রবেশ পথ।

শেখের মুখে হাসি ফুটে উঠল কথাটা শুনে। নাওমি বলল, আমি আমার কথামত কাজ করেছি। তোমরা তোমাদের কথামত কাজ করো। আমাকে আমার সঙ্গীদের কাছে পাঠিয়ে দাও।

আতুই বলল, থাম, এখন নয়। এখনো আমরা উপত্যকায় পৌছুইনি। তোমাকে আমাদের সঙ্গে আরো যেতে হবে। ঐটাই যে হীরকদেশের উপত্যকা সেবিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে আমাদের।

কিন্তু নাওমি সেকথা না শুনে তার ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। 'সে জানে তার সঙ্গীরা কোথায় আছে। তবে সে শুনেছে

আরবদের কাছে যে জলপ্রপাতটা ফেলে এসেছে তারা সেটাই হলো ওম্বাম্বি জলপ্রপাত। নাওমি ভাবল সেখানে গেলেই দেখা পাবে তার সঙ্গীদের।

কিন্তু আতুই ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল নাওমিকে। সে নাওমির ঘোড়াটার লাগাম ধরে বলল, আর যদি কখনো এইভাবে পালাবার চেষ্টা করো তাহলে তার ফল কিন্তু খুব খারাপ হবে।

সে রাতে সেই লাল গ্র্যানাইট পাথরের স্তম্ভটার কাছেই শিবির স্থাপন করল আরবরা। পরদিন সকালে পুব দিকের একটা পথ ধরল ওরা। ওদের বিশ্বাস এই পথই ওদের নিয়ে যাবে সেই হীরকদেশের উপত্যকায় যেখানে গেলে ওরা হবে প্রভূত ধনরত্নের অধিকারী।

পরদিন সকালেই টারজন তার কথামত ওরমান আর ওয়েস্টের সন্ধানে বার হতে চাইল। কিন্তু ওবরস্কি হঠাৎ জ্বরে পড়ে গেল। সে শুয়ে শুয়ে জ্বরের ঘোরে ভুল বকতে লাগল। টারজন দেখল এখন পথ হাঁটা সম্ভব নয় তার পক্ষে। আবার তাকে এই জঙ্গলের মধ্যে অচেতন অবস্থায় ছেড়ে যাওয়াও ঠিক হবে না। অথচ মানবতার খাতিরে ওরমানদের খোঁজ করাটাও উচিত বলে মনে করল সে।

অবশেষে সে ওবরস্কিকে কাঁধে তুলে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল। সারাদিন ধরে ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে এগোতে লাগল; পথে শুধু জল খাবার জন্য একবার থেমেছিল। কোন কিছু খাবার কথা ভাবেনি। পথে মাঝে মাঝে একবার করে জ্ঞান ফিরে পেয়ে ওবরস্কি টারজনকে অনুরোধ করছিল, আমাকে নামিয়ে দাও, একটু বিশ্রাম নিই।

কিন্তু জ্ঞান ফিরে পেয়ে পরক্ষণেই আবার জ্ঞান হারিয়ে ফেলছিল ওবরস্কি।

দিনের শেষে একটা গাঁয়ে গিয়ে পৌছল টারজন। ওবরস্কির তখনো জ্ঞান ফিরে আসেনি। টারজনের থাকার জন্য একটা কুঁড়েঘর দিয়েছিল গাঁয়ের সর্দার পুঙ্গু। সেই ঘরে ওবরস্কিকে শুইয়ে দিয়ে নিজে পেটভরে খেয়ে নিল টারজন। তারপর একাই উত্তর দিকের একটা বনপথ ধরে হাঁটতে লাগল। তখন গোধূলি হয়ে গেছে।

এদিকে সেই গোরিলাদের পার্বত্য নগরীর প্রাসাদ অন্তঃপুরে বন্দী অবস্থায় সাতদিন কাটাল রোণ্ডা। রাণীরা তাকে ভাল চোখে কেউ না দেখলেও কনিষ্ঠা রাণী ক্যাথারিন পার তাকে ঘৃণা করত সবচেয়ে বেশী। কারণ রাজা রোণ্ডাকে আবার বিয়ে করলে তার আদর একেবারেই কমে যাবে রাজার কাছে। তবে তাকে সেদিন থেকে আর কেউ মারধোর করেনি।

রোণ্ডা রাণীদের কাছ থেকে প্রশ্ন করে কিছু কিছু জানতে পারল। ক্যাথারিন পারই রোণ্ডার সব প্রশ্নের উত্তর দিল। সে বলল, আমরা সব

মিলিয়ে ছজন রাণী। তাদের নাম হল ক্যাথারিন অফ আরাগন, এ্যানি বোলিন, জেম সেমুর, এ্যানি অফ ক্লীভস্, ক্যাথারিন হাওয়ার্ড ও ক্যাথারিন পার।

রোগুা বলল, আজ হতে চারশ বছর আগে ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরির রাণীদের এই সব নাম ছিল।

ক্যাথারিন পার বলল, এটা হলো ইংলণ্ড এবং আমাদের বিয়ের পর এই সব নাম দেওয়া হয়েছে।

রোগুা বলল, তোমাদের দেবতা কোথায় থাকে ?

ক্যাথারিন পার বলল, ঐ প্রাসাদটায়। ওর ভিতরটায় কোনদিন ঢুকিনি। তাঁকে দেখিওনি কখনো। তবে শুনেছি তিনি নাকি খুবই বৃদ্ধ। দেবতার কাছে কেবলমাত্র রাজা আর তাঁর সামন্তরা ছাড়া কেউ যেতে পারে না। দেবতা বলেছে রাজা যদি আবার বিয়ে করে তাহলে তাকে মরতে হবে। কারণ অষ্টম হেনরি আর বিয়ে করেনি এবং তার স্ত্রীদেরও আর কোন নাম নেই।

এমন সময় বাইরে তুমুল গোলমালের শব্দ শোনা গেল। জানালা দিয়ে ক্যাথারিন পার আর রোগুা উঁকি মেরে দেখল প্রাসাদের উঠোনে দুদল গোরিলা লড়াই করছে ভয়ঙ্করভাবে। রোগুা ক্যাথারিনকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে ক্যাথারিন বলল, উলসির দলের গোরিলারা উলসিকে টাওয়ার থেকে মুক্ত করে এনেছে। রাজার দলের গোরিলাদের সঙ্গে উলসির দল তাই লড়াই করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লড়াইটা অন্তঃপুরের বারান্দায় চলে এল। অন্তঃপুরের মধ্যে এদিকে রাণীরা সেদিকে কোন চোখ কান না দিয়ে উদাসীনভাবে কলা ছাড়িয়ে খেতে লাগল। হঠাৎ ঘরের দরজা ঠেলে একদল পুরুষগোরিলা ঘরে ঢুকল। তাদের নেতা ঘরে ঢুকেই বলল, সেই লোমহীন মেয়েটা কোথায় ?

এই বলে সে রোগুার কাছে এসে তার হাতের কব্জিটা ধরে টানতে টানতে তাকে নিয়ে গেল। বলল, এস, দেবতা তোমায় ডেকে পাঠিয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

আরবরা সরু পথটা ধরে এগিয়ে যেতে থাকল। আতুই নাওমির পাশে পাশে তার ঘোড়াটাকে চালাতে লাগল। সে যে হীরকদেশে যাবে এবং সেখানে গিয়ে অনেক হীরে ও ধনরত্ন পাবে এবিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না তার। যতই সে এগিয়ে যেতে লাগল সামনের পাহাড়টার দিকে ততই খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল তার মুখখানা।

ক্রমে পথটা উঁচু হতে হতে একটা খাড়াই পাহাড়ের সামনে এসে পড়ল ওরা। আর ঘোড়া চালানো সম্ভব নয়। এবার পায়ে হেঁটে সাবধানে পাহাড়টা পার হয়ে ওধারের উপত্যকাটায় পৌঁছতে হবে।

শেখ ঈয়াদকে বলল, তুমি ঘোড়াগুলোকে এইখানে দাঁড়িয়ে দেখবে যেন পালিয়ে না যায়। আমরা এগিয়ে গিয়ে দেখব। মেয়েটা আমাদের সঙ্গেই যাবে।

ঈয়াদ সেইখানে ঘোড়ায় চেপে প্রতীক্ষায় রইল। শেখরা পা টিপে টিপে পাহাড়ে উঠতে লাগল। সহসা ঈয়াদ নিচে থেকে দেখতে পেল পাহাড়ের গা দিয়ে যে পথে শেখরা যাচ্ছিল সেই পথের ধারে ও উপরে ঘন বাঁশবন ছিল। সেই বাঁশবন থেকে মানুষের মত অনেকটা দেখতে কালো লোমওয়ালা একটা গোরিলা মুখ বাড়িয়ে উঁকি মেরে শেখদের দেখতে লাগল। এমনি করে পর পর কয়েকটা গোরিলা বাঁশবন থেকে বেরিয়ে এসে গর্জন করতে করতে আরবদের সামনে এসে দাঁড়াল। ঈয়াদ নিচে থেকে চীৎকার করে শেখকে সাবধান করার চেষ্টা করলেও তখন আর কোন উপায় ছিল না।

আরবরা পর পর গুলি করতে লাগল। তাতে দু-চারটে গোরিলা মারা গেল। জনকতক আহত হলো। কিন্তু বাকি সব গোরিলাগুলো আরবদের হাত থেকে সব বন্দুক কেড়ে নিয়ে সেগুলো ভেঙ্গে ফেলে দিল। তারপর তারা আরবদের ধরে তাদের ঘাড়ে কামড়ে দিতে লাগল আর তাদের হাতের কুড়ুল আর লাঠি দিয়ে আঘাত করতে লাগল। বাকিংহাম নামে যে গোরিলাটা আগে রোণ্ডাকে ধরেছিল সেই গোরিলাটা নাওমিকে তুলে নিয়ে পালাতে লাগল।

ঈয়াদ দেখল দুজন গোরিলা তাকে ধরার জন্য পাহাড়ের উপর থেকে নেমে আসছে। সে তখন সেখানে আর না দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে ছুটিয়ে দিল পিছন দিক দিয়ে।

গোরিলাদের হাতে ধরা পড়ে ভয়ে নাওমির রক্ত হিম হয়ে জমে যেতে লাগল। আরবদের থেকে এরা আরো ভয়ঙ্কর। নাওমির মনে হলো সে যেন যুক্তিবোধ হারিয়ে ফেলেছে।

গোরিলাটা তাদের নগরে ঢোকার মুখে থমকে দাঁড়াল। সে ঠিক করল নাওমিকে সে নিজের কাছে রেখে দেবে। সে তাকে নিয়ে নগরে যাবে না। সেখানে তাকে নিয়ে গেলে রাজা অথবা দেবতার হাতে তুলে দিতে হবে তাকে। কিন্তু সে নাওমিকে রোণ্ডা বলে ভুল বুঝল। সে ভাবল কিছুদিন আগে সে যে শ্বেতাঙ্গ মেয়েটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে দেবতার হাতে তুলে দেয় এ হচ্ছে সেই মেয়েটা। কিন্তু কেমন করে পালিয়ে এল তা বুঝতে পারল না সে।

বাকিংহাম নামে সেই গোরিলাটা নাওমিকে প্রশ্ন করল, দেবতার কাছ থেকে কেমন করে তুমি পালিয়ে এলে ?

নাওমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে বলল, তার মানে ? আরবরা ত আমাকে ধরেছিল। তাদের কাছ থেকে আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আবার আমি ধরা পড়ি তাদের হাতে।

কিন্তু দিনকতক আগে আমি তোমাকে ধরিনি ?

আমি আগে তোমাকে কখনো দেখিনি।

তাহলে দিনকতক আগে তোমার মত একটা মেয়েকে ধরি।

সে কি মাথায় একটা লাল রুমাল পরেছিল ?

হ্যাঁ।

কোথায় সে ?

বাকিংহামের অদূরে নগরের মধ্যে পাথরের একটা প্রাসাদের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, সে এখন আছে ঐ প্রাসাদের দেবতার কাছে। আমি তাহলে তোমাকে আমার বাড়িতে রেখে দেব।

নাওমি বলল, না, না, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

বাকিংহাম বলল, না, আমি তোমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে রেখে দেব যাতে রাজা বা দেবতা জানতে না পারে। সেখানে খাদ্য বা পানীয়ের কিছুরই অভাব হবে না।

এদিকে পুন্সুর গাঁয়ে ওবরস্কিকে রেখে দিয়ে ওরমানদের খোঁজে জঙ্গলে ক্রমাগত গাছের ডালে ডালে এগিয়ে যেতে থাকল টারজন। রাতটা সে একটা গাছে কাটিয়ে সকালে জেগে উঠল। আবার রওনা হলো। কিছুদূর যাওয়ার পর বাতাসে শ্বেতাঙ্গদের গন্ধ পেল।

পথে একটা হরিণ দেখতে পেয়ে সেটাকে শিকার করল টারজন। তার অল্প কিছু দূরেই ওরমান আর ওয়েস্ট সেই পথে আসছিল।

হঠাৎ ওরমান ওয়েস্টকে বলল, কিসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

ওয়েস্ট বলল, নিশ্চয় কোন জন্তু।

ওরমান বলল, ওবরস্কি আসছে।

ওয়েস্ট দেখল ওবরস্কির মত অবিকল দেখতে একটা লোক কাঁধের উপর একটা মরা হরিণ নিয়ে তাদের দিকে আসছে।

টারজন দেখল, ওরা দুজনেই তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে।

টারজন বলল, তোমরা নিশ্চয় খুবই ক্ষুধার্ত।

ওরমান বলল, ওবরস্কি তুমি ?

টারজন বলল, তুমি কি ভেবেছিলে আমি ভূত ?

ওরমান হেসে বলল, আমি তোমাকে সত্যিই মৃত ভেবেছিলাম। সেদিন তুমি আমাদের সামনে একটা সিংহ মেরেছিলে। তুমি এ কাজ করতে পার এটা ত আমরা ভাবতেই পারিনি।

টারজন তার নিজের পরিচয় না দিয়ে বলল, অনেক জিনিসই তোমরা জান না। আমি তোমাদের দলের মেয়েদের খোঁজ করছি। তোমাদের দলের বাকি সবার খবর কি ?

ওরমান বলল, তারা এখন কোথায় আছে কিছুই জানি না। আমরাও মেয়ে ছুটির খোঁজ করছি। আমরা এই আরবটিকে ধরেছি। এর কাছে জানতে পারি একটি মেয়ে সিংহের কবলে পড়ে মারা যায়। অন্যটির ও আরবদের কি অবস্থা হয়েছে তা ও জানে না।

টারজন তখন আরবী ভাষায় ঈয়াদকে প্রশ্ন করতে সে বলল, একটা মেয়ে সিংহের হাতে ধরা পড়ে। অন্যটিকে গোরিলাদের হাতে ধরা পড়তে দেখেছি আমি। গোরিলারা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে তার পূর্ণ বিবরণ জেনে নিল টারজন ঈয়াদের কাছ থেকে। তারপর সে ওরমানকে বলল, মনে হয় ও সত্য বলছে। যাই হোক, আমি এখনি সেই উপত্যকায় গিয়ে দেখব।

এই বলে আবার গাছের উপর লাফ দিয়ে উঠে কোথায় চলে গেল টারজন।

ওরমান আর ওয়েস্ট সেইদিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

এদিকে বাকিংহাম নামে সেই গোরিলাটা নাওমিকে নিয়ে দক্ষিণ দিকের পাহাড়টা পার হয়ে উপত্যকাটার দক্ষিণ প্রান্তে গিয়ে পড়ল। শহরটাকে বাঁদিকে ফেলে গেল সে। পথে একটা গাছে অনেক ফল ঝুলে থাকতে দেখে নাওমি বলল, এ ফল খাওয়া চলবে ?

বাকিংহাম বলল, হ্যাঁ।

নাওমি কিছু ফল পেড়ে খেল। ওরা আবার এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ওরা দেখল আর একটা গোরিলা ওদের তাড়া করে আসছে। বাকিংহাম নাওমিকে কাঁধে তুলে নিয়ে একটা বনে ঢুকে পড়ল। ও বলল, সাফোক আসছে তোমাকে ছিনিয়ে নেবার জন্য।

বন থেকে ছুটে গিয়ে একটা পাহাড়ের গুহার সামনে এসে বাকিংহাম বলল, তুমি এখানে থাক। আমি সাফোককে মেরে তাড়িয়ে দিয়ে আসছি।

নাওমি সেই গুহাটায় একা রয়ে গেল। গুহার কাছে একটা ছোট ঝর্ণা ছিল। তার জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাল সে। এইভাবে দুটো দিন দুটো রাত

কাটানোর পর তৃতীয় দিন বাকিংহাম গুহাটায় ফিরে এসে বলল, সাক্ষোক আমাকে তোমার কথা শুধোচ্ছিলো। আমি বললাম তুমি পালিয়ে গেছ। সে তখন আমার সঙ্গে তোমার অনেক খোঁজ করল। এখনো সে বিশ্বাস করে না তুমি পালিয়ে গেছ। যাই হোক, তাড়াতাড়ি করে তুমি আমার পিঠে চাপ।

নাওমিকে পিঠে চাপিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল বাকিংহাম। অনেকক্ষণ ধরে এইভাবে যাবার পর পিছনে কার গর্জন শুনে থমকে দাঁড়াল। দেখল নগ্নদেহ এক শ্বেতাঙ্গ তার কাছে এসে পড়েছে।

নাওমি টারজনকে দেখে ওবরস্কি ভাবল। বলল, স্ট্যানলি, তুমি আমাকে বাঁচাও।

টারজন বাকিংহামকে বলল, তুমি চলে যাও বোলগানি। এ মেয়ে আমার। তোমাকে খুন করে ফেলব।

বাকিংহাম ইংরিজিতে কথা বলায় আশ্চর্য হয়ে গেল টারজন। সে তাকে আক্রমণ করতে তার পিঠের উপর চড়ে তার ঘাড়টা ধরল। দুজনেই পড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। টারজনের সঙ্গে লড়াই করার জন্য নাওমিকে এক জায়গায় নামিয়ে দিয়েছিল বাকিংহাম। সেখান থেকে ওদের লড়াই দেখতে লাগল।

হঠাৎ টারজন তার ছুরিটা বার করে বারবার বসিয়ে দিতে লাগল বাকিংহামের বুকে। অবশেষে বাকিংহাম নিষ্প্রাণ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে টারজন নাওমিকে নিয়ে চলে গেল সেখান থেকে।

ওরা সবাই তাকে ওবরস্কি ভাবায় মজা পাচ্ছিল টারজন। তাই সে নিজের পরিচয় দিল না। নাওমি ক্ষুধায় ও দুর্বলতায় কথা বলতে পারছিল না। তাকে কাঁধের উপর তুলে পথ হাঁটছিল টারজন। নাওমি বলল, কোথায় যাবে এখন স্ট্যানলি ?

টারজন বলল, জলপ্রপাতের কাছে ওরমান আর ওয়েস্ট অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

নাওমি বলল, তারা তাহলে এখনো বেঁচে আছে ?

টারজন বলল, তারা তোমায় খোঁজ করছিল। রোণ্ডাকে বোধ হয় সিংহতে খেয়েছে।

নাওমি হাত বাড়িয়ে গোরিলাদের নগরটাকে দেখিয়ে বলল, না, রোণ্ডাকে গোরিলারা ধরে নিয়ে গিয়ে ঐ নগরের মধ্যে একটা পাথরের প্রাসাদে বন্দী করে রেখেছে। গোরিলাটা আমায় বলেছিল, সে ওদের দেবতার কাছে আছে।

পথে এক জায়গায় নাওমিকে নামিয়ে রেখে কিছু ফল এনে তাকে খেতে দিল টারজন। বলল, এখন এই খাও, শিবিরে হরিণের মাংস আছে; তা খেলে গায়ে বল পাবে।

পথে এবার সেই নদীটা পেল ওরা। নদীটা পার হয়ে ওপারে জলপ্রপাতের কাছে যেতে হবে ওদের। টারজন এক জায়গায় নাওমিকে ধরে সাঁতার কেটে সহজেই নদী পার হলো। নাওমি আশ্চর্য হয়ে গেল।

জলপ্রপাতটার কাছে গিয়ে টারজন নাওমিকে দেখাল পাহাড়ের তলায় তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। টারজন বলল, ওরা হলো ওরমান, ওয়েস্ট আর ঈয়াদ নামে একটা আরব।

ওরমান ওদের দেখতে পেয়ে ছুটে এল। নাওমিকে জড়িয়ে ধরলে তার চোখে জল এল। বলল, আহা বেচারী রোণ্ডা মারা গেছে।

দুঃখে মুখটা নামিয়ে নিল ওয়েস্ট। ওরমান বলল, না, রোণ্ডা মারা যায়নি। গোরিলাদের নগরে সে বন্দী হয়ে আছে।

ওয়েস্ট বলল, আমি তার খোঁজ করতে যাব সেই নগরে। এটা আমার কর্তব্য।

টারজন বলল, তুমি এখানে থাক। তুমি পারবে না। আমি যাব এখনি। আমাকে ওদের নগরটাকে দেখতে হবে। অনেক কিছু জানতে হবে।

তখন অন্ধকার হয়ে আসছিল। সন্ধ্যার সেই ঘনায়মান অন্ধকারে ওদের বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়ল টারজন। সে খাড়াই পাহাড়টার গা বেয়ে অবলীলাক্রমে উঠে যেতে লাগল।

ওয়েস্ট সেইদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল, আমিও যাব।

ওরমান বলল, তুমি দিনের বেলায় ও পাহাড়ে উঠতে পারবে না বিল। রাত্রিবেলায় ত দূরের কথা।

ওয়েস্ট বলল, তবু আমি যাব।

দ্বাদশ অধ্যায়

সেই পাহাড় আর উপত্যকা পার হয়ে প্রাচীরঘেরা একটা নগর দেখতে পেল টারজন। সিংহদের ভয়ে এইরকম উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে নগরটাকে। টারজন প্রাচীরটা পার হয়ে নগরমধ্যে পড়ল। ভিতরটা অন্ধকার। কোন গোরিলাকে কোথাও দেখতে পেল না। একটা বড় বাড়িতে আলো দেখতে পেল টারজন। সে অনুমান করল ঐটাই বোধ হয় দেবতার প্রাসাদ, যার কথা নাওমি তাকে বলেছিল। প্রাসাদটা পাহাড় কেটে নির্মাণ করা হয়েছে।

টারজন অন্ধকারে নগরটার একধার দিয়ে চলে যাওয়া পথটা ধরে প্রাসাদটার দিকে এগিয়ে চলল। প্রাসাদের একটা ঘরে মাত্র আলো জ্বলছিল।

রোগুা বলল, কি করে সে বাকিংহামের হাত থেকে মুক্তি পেল ?

টারজন বলল, আমি বাকিংহামকে বধ করে তাকে মুক্ত করেছি।

রোগুা অবিশ্বাসের সুরে বলল, তুমি বধ করেছ! তুমি লোক হিসাবে খারাপ নও স্ট্যানলি, আগের থেকে তোমার সাহস বেড়েছে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু ওসব বাজে গল্প আমার কাছে করো না। তুমি আবার কৌপীন পরতে শিখলে কবে থেকে ?

টারজন বলল, বানস্যুটো সর্দার রঙ্গুলা আমার আগের পোশাক কেড়ে নেওয়ায় এটাই আমাকে পরতে হয়েছে।

রোগুা বলল, তুমি যদি বানস্যুটোদের হাতে বন্দী হয়েছিলে তাহলে মুক্তি পেলে কি করে ? তারা ত মানুষ খায়।

টারজন উত্তর করল, তুমি ত আমার কথা বিশ্বাস করবে না, যেমন বাকিংহামকে মারার কথা বিশ্বাস করলে না।

এককোণে দূরে জ্বলতে থাকা স্বল্প আলোয় ঘরখানাকে যতদূর সম্ভব ভাল করে খুঁটিয়ে দেখল টারজন। দেখল কোনদিকে বার হবার কোন পথ নেই। শুধু ছাদের কাছে একটা ফাঁদ আছে বলে মনে হলো।

টারজন রোগুাকে বলল, কি খেতে দেয় ওরা এবং কার মাধ্যমে কেমনভাবে দেয় ?

রোগুা বলল, খাবারের মধ্যে দেয় কিছু ফল, বাদাম আর কচি বাঁশের কোঁড়া। একটা গোরিলা এসে ওই ঘরের জানালা দিয়ে এখানে ছুঁড়ে দেয়। ঘরের মধ্যে কেউ ঢোকে না।

হঠাৎ গোরিলাদেবতা আবার পাশের ঘরের জানালার সামনে এসে পড়ায় ওরা চুপ করে গেল। সে একটা চেয়ার এনে জানালার কাছে বসে বলল, হেনরি একটা আস্ত বোকা। সে এমনভাবে তার অনুগত গোরিলাদের উত্তেজিত করছে যাতে সে আমাকে মেরে নিজেই রাজা হতে পারে। আজ অবশ্য তারা আর আমায় বিরক্ত করবে না। কারণ আজ তারা অতিরিক্ত মদ খেয়ে ঘুমে অচেতন হয়ে আছে সবাই। তাই তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলতে এলাম। তোমাদের দিয়ে আমার উদ্দেশ্য পূরণের আগে তোমাদের আমি সব কথা জানাতে চাই।

রোগুা বলল, কিন্তু তোমার উদ্দেশ্যটা কি। কি উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাও তুমি আমাদের দিয়ে ?

গোরিলাদেবতা বলল, সে অনেক কথা। ১৮৩৩ সালে আমার জন্ম হয় ইংলণ্ডে। আমার বয়স যখন বাইশ তখন আমি অক্সফোর্ড থেকে বি. এ. পাশ করি। আমি লামার্ক আর ডারউইনের বই পড়ে মানুষের জন্মগত ও দেহগত উত্তরাধিকার নিয়ে গবেষণার কাজে মনোনিবেশ করি। কিন্তু ইংলণ্ডে

আমার মনোমত সুযোগ না পেয়ে আমি আফ্রিকাতে গোরিলাদের রাজ্যে এসে পড়ি। আমি গোরিলাদের নিয়ে গবেষণা করতে থাকি। তাদের ইংরিজি ভাষা এবং মানুষের আদব-কায়দা শেখাই। আমি তাদের উপর ওষুধ প্রয়োগ করি। তারা মানুষের অনেক গুণ লাভ করে। তারা মানুষ আর গোরিলার সংমিশ্রণে অদ্ভুত এক জীবে পরিণত হয়। আমি কৌশলে গোরিলাদের দেহের জীবকোষ আত্মসাৎ করায় আমার দেহে পরিবর্তন দেখা দেয়। আমার দেহের রং কালো হয়ে যায়। সারা গায়ে বড় বড় লোম গজায়। হাত পায়ের নখ বড় হয়ে ওঠে। এখন আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমি তোমাদের খাব। আগে খাব এই যুবকটিকে, পরে মেয়েটিকে। এর ফলে প্রথমতঃ আমি এর যৌবনশক্তি লাভ করব এবং দ্বিতীয়তঃ আমার দেহটা আবার মানুষের মত হয়ে উঠবে। এ সুযোগ আমি আগে কখনো পাইনি।

এই বলে গোরিলাদেবতা যে পথে এসেছিল সেই পথে চলে গেল। টারজন আর রোণ্ডা পাশাপাশি বসে রইল দুজনে।

রোণ্ডা বলল, ও যা বলল তাতে তোমার ভয় করছে না?

টারজন বলল, যা হবার তা ত হবেই। শুধু শুধু ভয় করে কোন লাভ হবে না।

রোণ্ডা বলল, এখন এখান থেকে কি করে বার হব সেটাই হলো সমস্যা।

টারজন বলল, পারি না পারি চেষ্টা করে একবার দেখতে হবে। একদিক থেকে হাওয়া আসছে। নিশ্চয় কোথাও ফাঁক আছে।

টারজন ঘরখানার একদিকের দেওয়ালের কাছে চলে গেল। রোণ্ডাকে বলল, তুমি আমার কাঁধের উপর উঠে হাত দিয়ে দেওয়ালের উপর দিকে কোন ফাঁক আছে কিনা দেখ।

রোণ্ডা সেইভাবে উঠে বলল, আর একটু উপরে একটা কড়িকাঠ পাওয়া যাবে। ঐ কড়িকাঠ দিয়ে উঠে আমরা ঐ গম্বুজটার মধ্যে যে একটা ফাঁক আছে সেই ফাঁক দিয়ে ছাদে গিয়ে নামতে পারব। ফাঁকটা তিন ফুট চওড়া আর চার ফুট লম্বা। তার মানে একটা লোক ঢুকতে ও বেরোতে পারবে।

টারজন এবার রোণ্ডাকে তার দুটো হাতের তালুর উপর দুটো পা রেখে উঠতে বলল। টারজন তাকে সেইভাবে তুলে ধরলে রোণ্ডা আরো ভাল করে দেখতে পেল। রোণ্ডা কড়িকাঠের উপরে প্রথমে উঠে টারজনের দেওয়া দড়িটা কড়িকাঠের সঙ্গে বেঁধে দিল। সেই দড়ি ধরে টারজন উপরে উঠে গেল। ওরা গম্বুজটার উপরে উঠে যেতেই গোরিলাদেবতার গলা শুনতে পেল নিচের ঘরে।

গোরিলাদেবতা ক্র্যানমার নামে একটা গোরিলার সঙ্গে কথা বলছিল। সে কথা শোনার চেষ্টা করল টারজন।

গোরিলাদেবতা ক্র্যানমারকে বলল, রাজা হেনরি প্রাসাদের ছাদে উঠলেই প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেব, ওকে পুড়িয়ে মারব আমি।

ক্র্যানমার বলল, কিন্তু রাজা মরে গেলে রাজা হবে কে? যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস ত খুব ছোট।

গোরিলাদেবতা বলল, ওর ছেলেকে আমি রাজা করব না। এর পরে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসবে রাণী এলিজাবেথ।

ক্র্যানমার বলল, হেনরির অনেক মেয়ে আছে। তাদের একজনকে ত বেছে নিতে পারেন।

গোরিলাদেবতা বলল, না, যে ইংরেজ মেয়েটাকে বন্দী করে রেখেছি ও-ই হবে ইংলণ্ডের রাণী। ও হবে রাণী এলিজাবেথ। ওকে আমি খাব না।

এমন সময় একজন পুরোহিত এসে ব্যস্ত হয়ে খবর দিল ওদের, বন্দিনীকে পাওয়া যাচ্ছে না। যে শ্বেতাঙ্গ যুবকটি ওর কাছে ছিল সেও নেই।

গোরিলাদেবতা আশ্চর্য হয়ে বলল, পাওয়া যাচ্ছে না। পালিয়ে গেছে? ঘরের দরজা সব বন্ধ আছে?

পুরোহিত বলল, দরজা সব তালাবন্ধ আছে। কিন্তু ওরা পালিয়ে গেছে।

এবার গোরিলাদেবতা ক্র্যানমার এবং আরো কয়েকজন গোরিলা ঘরখানায় ঢুকে তাদের খোঁজ করতে লাগল। টারজন আর রোণ্ডা গোম্বুজের একপাশে লুকিয়ে রইল। অন্ধকারের জন্য ঘরের মেঝে থেকে ওদের দেখতে পাচ্ছিল না।

হঠাৎ টারজন দেখল ঘরের মেঝের উপর আগুন জ্বলছে। ধোঁয়া উঠে এসে মুখে চোখে লাগছে। ততক্ষণে গোরিলাগুলো ছাদের উপরে গম্বুজের কাছে উঠে এসেছে। টারজন দেখল এভাবে আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সে তাই গম্বুজের সেই ফাঁকটা দিয়ে লাফ দিয়ে ছাদের উপর নেমে পড়ল। দেখল গোরিলাদেবতা কয়েকজন গোরিলা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারা টারজনকে ধরতে এলে টারজন তাদের মধ্যে তিনজনকে ছুরি দিয়ে মেরে ফেলল। রোণ্ডাও তখন নেমে এসে ছাদের উপর একপাশে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তখন সকলের দৃষ্টি টারজনের উপর নিবদ্ধ থাকায় রোণ্ডাকে কেউ দেখেনি।

এমন সময় পিছন থেকে একটা গোরিলা কুড়ুলের বাঁট দিয়ে টারজনের মাথায় মারতেই সে পড়ে গেল। গোরিলাদের দেবতা বলল, ওকে হত্যা করো না। বন্দী করে রেখে দাও।

হঠাৎ একজন গোরিলা এসে তাদের দেবতাকে বলল, গোটা প্রাসাদটায় আগুন লেগে গেছে। বন্দীদের ধরার জন্য যে আগুন জ্বালানো হয় তা শুকনো ঘাসগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে পালিয়ে যাও এখান থেকে। তা

না হলে আর পালাতে পারবে না।

গোরিলারা তখন টারজনকে সেখানে ফেলে রেখে যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল। রোণ্ডা একসময় ছাদ থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোন পার হয়ে নগরের বাইরে যাবার জন্য ছুটতে লাগল। কিন্তু তাকে দুটো গোরিলা দেখতে পেয়ে ধরে হেনরির প্রাসাদ অন্তঃপুরে তার রাণীদের কাছে নিয়ে গেল। একমাত্র ছোট রাণী ক্যাথারিন পার ছাড়া আর সব রাণীরা রোণ্ডাকে মারবার জন্য ছুটে এল।

কিন্তু ক্যাথারিন পার তাদের বাধা দিয়ে বলল, ওকে মেরো না। রাজা তাহলে আমাদের সবাইকে মারবে।

তখন সবাই ছেড়ে দিল রোণ্ডাকে।

এদিকে টারজন একটু সুস্থ হয়ে উঠে দেখল, গোরিলাদেবতা পালাবার পথ খুঁজছে, গোটা প্রাসাদটায় আগুন ধরে গেছে। নিচেরতলার জানালা দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে আসছে। টারজন দেখল প্রাসাদটার একটা দিকে তখনো আগুন ধরেনি। সেইদিকটা একটা পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে যুক্ত। টারজন সেইদিকে ছাদের কার্নিশের কাছে গিযে দেখল কুড়ি ফুট নিচে ছাদ থেকে লাফ দিতে পারলে দোতলার আর একটা ছাদ পাওয়া যাবে। ওখানে গিয়ে পড়তে পারলে সেখান থেকে নিচে নামা সহজ হবে। ওখান থেকে একতলা মাত্র দশ ফুট।

টারজন ছাদ থেকে যখন লাফ দেবার উদ্যোগ করছিল তখন গোরিলাদেবতা তার পিছনে এসে বলল, আমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি তোমাকে অনেক হীরে দেব। এত হীরে দেব যে জীবনে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

টারজন বলল, আমি হীরে চাই না। তবে একটা শর্তে তোমাকে উদ্ধার করতে পারি।

গোরিলাদেবতা বলল, বল তোমার শর্তের কথা। আমি রাজি আছি। তবে তাড়াতাড়ি করো।

টারজন বলল, আমাকে আর আমার সঙ্গের মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে হবে।

গোরিলাদেবতা বলল, হ্যাঁ তোমাদের মুক্তি দেব।

টারজন তার হাতের দড়িটা ছাদের কার্নিসের একটা রেলিং-এর সঙ্গে বেঁধে দিল। তারপর গোরিলাদেবতাকে বলল, আমার পিঠে চড়।

গোরিলাদেবতাকে পিঠে নিয়ে নিচে নেমে গেল টারজন। গোরিলাদেবতা আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি কখনই এটা পারতাম না।

নিচে নেমে গিয়ে টারজন তার দড়ির ফাঁসটা গোরিলাদেবতার গলায় আলগা করে লাগিয়ে দিয়ে তাকে বলল, তুমি পালাবে না। এবার মেয়েটাকে

উদ্ধার করতে হবে। সে এখন কোথায় আছে তা দেখতে হবে খুঁজে।

গোরিলাদেবতা বলল, এখন রাজপ্রাসাদের দিকে গেলে তোমার আমার দুজনেরই জীবন বিপন্ন হবে। কারণ রাজার দলের গোরিলারা আমাদের দুজনকেই ধরে ফেলে বন্দী করবে। তার থেকে আমি এক গুপ্ত সুড়ঙ্গপথ দিয়ে একটা গুহায় নিয়ে যাব। সেখানে আমার বিশ্বস্ত কিছু অনুচর আছে। আমি তাদের দিয়ে মেয়েটি কোথায় আছে তার খোঁজ করব।

টারজন বলল, ঠিক আছে, তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পার। তবে আমার সঙ্গে কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতা বা শঠতা করলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য। এই ফাঁসের দড়ি আর আমার কোমরের ছোরাটার কথা সব সময় মনে রাখবে।

গোরিলাদেবতা বলল, ঠিক আছে। তুমি আমার পিছু পিছু এস।

সুড়ঙ্গপথ পার হয়ে গোরিলাদেবতা বেশকিছুটা পথ গিয়ে একটা পাহাড়ের গায়ে একটা গুহায় নিয়ে গেল টারজনকে।

দরজায় চাবি ছিল না। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ঘরখানার ভিতরেও কেউ ছিল না। গোরিলাদেবতা কিছু খেয়ে নিল। তারপর বলতে লাগল, আমার হাতে এখন অনেক হীরে আছে। আমি একটি মেয়েকে তা দিতে চাই। কিন্তু তাকে এখন পাবার আর কোন আশা নেই। আমি যৌবনে একটি মেয়েকে ভালবাসতাম ইংলণ্ডে থাকাকালে। কিন্তু তখন সে একজন গরীব বিজ্ঞানীকে বিয়ে করতে চাইল না। সে চেয়েছিল ধনী স্বামী। তাকে আর আমি ভালবাসি না এখন। কিন্তু তাকে শুধু দেখিয়ে দিতে চাই একবার ধন ঐশ্বর্য কাকে বলে। কিছুদিন আগে আমি একটি চিঠি লিখে একজনকে উপকূলে পাঠাই যাতে চিঠিটা ডাকযোগে ঠিকমত ইংলণ্ডে মেয়েটির হাতে পৌছয়। কিন্তু জানি না সে চিঠি তার হাতে পৌছেছে কি না। তবে তার উত্তর আজও আমি পাইনি।

এমন সময় এক বৃদ্ধ গোরিলা এসে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল। টারজন লাফিয়ে উঠে পড়ল। কিন্তু গোরিলাটা টারজনকে কিছু বলল না। গোরিলাদেবতার সামনে নতজানু হয়ে ভক্তিভরে বসল। গোরিলাদেবতা তাকে বলল, ফাদার টোবিন, কি খবর প্রাসাদের?

টোবিন বলল, আপনার প্রাসাদটা একেবারে ভস্মীভূত হয়েছে।

কিন্তু রাজার খবর কি? সে কি আমাকে এখন মৃত ভাবছে?

হ্যাঁ, সবাই তাই ভাবছে। রাজা খুব খুশি। সে বলছে সে-ই এখন থেকে দেবতা হবে।

উলসি একদিন যে শ্বেতাঙ্গ মেয়েটিকে ধরে এনেছিল সে এখন কোথায় জান?

সে পালাচ্ছিল। কিন্তু রাজার গোরিলারা তাকে ধরে হেনরির অন্তঃপুরে আবার নিয়ে গেছে। হেনরি যদি তাকে বিয়ে করতে চায় তাহলে ক্যাথারিন অফ এ্যারাগণ তাকে ছিঁড়ে খাবে।

টারজন উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, এখনি তাকে উদ্ধার করার জন্য কিছু করতে হবে। এখন তুমি তোমার বিশ্বস্ত গোরিলাদের ডেকে বল, এখনি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হেনরির প্রাসাদ আক্রমণ করতে হবে। তাকে হারিয়ে দিয়ে তার অন্তঃপুর থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে আনতে হবে। বুঝেছ ? তোমার ফাঁসের দড়িটা আর আমার ছুরিটার কথা মনে আছে ত ?

গোরিলাদেবতা সেই পুরোহিতকে বলল, ফাদার টোবিন, তুমি আমার বিশ্বস্ত গোরিলাদের সমাবেশ করো এখানে। আমরা আছি। এখনি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে দেবদ্রোহী রাজাকে শাস্তি দিতে হবে এবং মেয়েটাকে উদ্ধার করতে হবে।

পুরোহিত বলল, আমি এই বিদেশীর কাছে আপনাকে ছেড়ে গেলে কোন ক্ষতি হবে না ত ?

টারজন বলল, তুমি যদি তোমার নিজের কাজ ঠিকমত করো ত এর কোন ক্ষতি আমার দ্বারা হবে না।

এরপর টারজন গোরিলাদেবতাকে বলল, এরা ত তোমার কথা সব ভালই বোঝে এবং এদের মধ্যে যুক্তিবোধ আছে বলেও মনে হচ্ছে।

গোরিলাদেবতা বলল, এদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গেছে কিছু গোরিলা অবিকল মানুষের মত আকার ধারণ করেছে, কিন্তু মন মেজাজের দিক থেকে একেবারে পশু রয়ে গেছে তারা। এদের নগর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা নগরের বাইরে পাহাড়ের গুহায় থাকে। তাদের মধ্যে একজন যুবক আর একটি যুবতী নারী আছে যার মেজাজটা হিংস্র সিংহীর মত।

গোরিলাদেবতা বলল, এখন ওরা গেলে কি করতে হবে আমায় ?

টারজন বলল, প্রাসাদ আক্রমণ করে উদ্ধার করতে হবে মেয়েটিকে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

হঠাৎ জোর গোলমালের শব্দে ঘুম থেকে জেগে উঠল রোণ্ডা টেরী। জানালা দিয়ে দেখল, প্রাসাদের উঠোনে রাজা হেনরির গোরিলাদের সঙ্গে দেবতার গোরিলাদের জোর লড়াই হচ্ছে। রাজার দল ক্রমশই হেরে যাচ্ছিল।

রাণীরা জানালা দিয়ে তা দেখছিল। ক্যাথারিন অফ আরাগন বলল, এই বিদেশী মেয়েটার জন্যই এতকিছু ঝামেলা। ওকে মেরে ফেল। মার সবাই।

তখন এ্যানি বলিন ও অন্যান্য রাণীরা রোণ্ডাকে মারতে এল।

এমন সময় দরজা খুলে স্বয়ং রাজা হেনরি রোণ্ডাকে ধরে নিয়ে যাবার জন্য ঘরে ঢুকল। রাণীরা তখন ভয়ে রোণ্ডার কাছ থেকে সরে গেল। হেনরি সোজা রোণ্ডার কাছে এসে বলল, দেবতা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছে। কিন্তু সে তোমাকে পাবে না। তুমি আমার।

এই বলে হেনরি রোণ্ডাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে প্রাসাদের সুড়ঙ্গপথ দিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে একটা ঘর ছিল। সেখানে গিয়ে হেনরি বলল, এদিকে কেউ আসতে পারে না।

ঘরটা থেকে বেরিয়েই উপত্যকায় গিয়ে পড়ল হেনরি। একটা নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়িয়ে রোণ্ডাকে নামিয়ে দিল। রোণ্ডা দেখল তার মাথার উপর নক্ষত্রখচিত রাত্রির আকাশ। শান্ত শীতল বাতাস গায়ে এসে লাগছিল ওর।

নদীর ধার দিয়ে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে নদীটা পার হলো হেনরি। সে রোণ্ডার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে। মাঝে মাঝে ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে তাকাচ্ছিল সে। দেখছিল কেউ তাদের ধরতে আসছে কি না।

হঠাৎ একটা সিংহের গর্জন শুনতে পেল গোরিলারাজ হেনরি। সে তার চলার গতি বাড়িয়ে দিল। সিংহের গর্জন আরো কাছে শোনা গেল। ঘন কুয়াশায় ছেয়ে ছিল সমস্ত উপত্যকাটা। কিছু দেখা যাচ্ছিল না।

এবার সিংহটা খুব কাছে এসে পড়তে রোণ্ডা ভালভাবে দেখতে পেল। তার মনে হলো সিংহটা খুব ক্ষুধার্ত। হঠাৎ হেনরি রোণ্ডাকে তুলে নিয়ে সিংহটার মুখের সামনে ছুড়ে ফেলে দিল। কিন্তু রোণ্ডা মরার মত শক্ত হয়ে পড়ে রইল। সে জানত মরামানুষকে সিংহ মারে না।

হেনরি একা ছুটে পালাচ্ছিল। কিন্তু তার জীবন্ত শিকার পালাচ্ছে দেখে সিংহটা লাফ দিয়ে তাকে ধরে ফেলল। দুজনেই গর্জন করতে লাগল। রোণ্ডা একবার চোখ মেলে দেখল কিছুদূরে কতকগুলো গাছ রয়েছে। সে আরো দেখল সিংহ গোরিলারাজ হেনরিকে মেরে তার মুখটা চিবিয়ে খাচ্ছে। সে এখন তার শিকারের মাংস নিয়ে ব্যস্ত থাকবে ভেবে রোণ্ডা উঠে ছুটে গিয়ে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

বনের মধ্যে ঢুকে একটা নদী পেল রোণ্ডা। নদীর পাড় দিয়ে বরাবর যে পথটা চলে গেছে সেই পথ ধরে এগোতে লাগল। ক্লান্তিতে হাঁটতে পারছিল না। তবু তাকে নিরাপদ কোন জায়গায় চলে যেতেই হবে। সে ভাবল

নদীটার পাড় দিয়ে ওম্বাম্বি জলপ্রপাতের কাছে যেতে পারলেই ওর সঙ্গীদের দেখা পাবে।

নিবিড় ক্লান্তিতে পা টেনে টেনে চলছিল রোণ্ডা। হঠাৎ তার সামনে একটা গাছ থেকে আধা-মানুষ আধা-গোরিলার মত একটা ভয়ঙ্কর জন্তুকে নেমে পড়তে দেখে চমকে উঠল সে। সে জন্তুর মুখটা মানুষের মত। কিন্তু দেহ আর কানটা বাঁদরের মত।

রোণ্ডা ভাবল সে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতার কেটে ওপারে পালিয়ে যাবে। কিন্তু ঝাঁপ দেবার আগেই গোরিলা মানুষটা ধরে ফেলল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ঐ ধরনের গোরিলামানুষ গাছ থেকে নেমে রোণ্ডার অন্য হাতটা ধরে ফেলল। দুজনে দুদিকে তার দুটো হাত ধরে টানতে লাগল। রোণ্ডার মনে হতে লাগল তার হাত দুটো ছিঁড়ে যাবে।

এমন সময় এক নগ্ন শ্বেতাঙ্গ মানুষ কোথা থেকে এসে তার হাতের মোটা লাঠি দিয়ে গোরিলা দুটোকে মেরে তাড়িয়ে দিল। তারপর সে তার কাঁধের উপর রোণ্ডাকে তুলে নিতেই প্রায় বিশটা গোরিলা এসে ঘিরে ফেলল তাদের। রোণ্ডা দেখল যে মানুষটা তাকে ধরেছিল তার দেহ ও মুখচোখ সত্যিই সুন্দর ও সুগঠিত। তার মাথায় ছিল লম্বা লম্বা চুল। সিংহের কেশরের মত ঘাড়ের উপর ছড়িয়ে পড়েছিল চুলগুলো। কিন্তু গোরিলাগুলো সব যেন মানুষ আর জন্তুর অদ্ভুত এক সংমিশ্রণ। গোরিলাগুলো শ্বেতাঙ্গ মানুষটার ভয়ে কেউ রোণ্ডার কাছে আসতে পারছিল না।

ঠিক এই সময় কাছের একটা গাছ থেকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক শ্বেতাঙ্গ যুবতী নেমেই ছুটে এল তাদের দিকে। তার মাথার সোনালী চুলগুলো ছড়িয়েছিল তার মুখের চারদিকে। তার যৌবনবতী দেহটা নিখুঁত সৌন্দর্যে গড়া, কিন্তু মুখ দিয়ে হিংস্র জন্তুর মত গর্জন করছিল সে।

মেয়েটি আসতেই সকলেই সম্ভ্রমের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু সেই শ্বেতাঙ্গ লোকটা রোণ্ডাকে কাঁধের উপর চাপিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাতে লাগল। সেই শ্বেতাঙ্গ মেয়েটিও ছুটতে লাগল লোকটার পিছু পিছু।

চতুর্দশ অধ্যায়

টারজন যখন দেখল রাজার গোরিলাদল একেবারে হেরে গেল এবং দেবতার গোরিলাদলের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছে তখন সে গোরিলাদেবতার কাছে গিয়ে তার প্রতিশ্রুতির কথাটাকে স্মরণ করিয়ে দিল। দেবতা গোরিলা তখন পলাতক রাজা হেনরির খোঁজ করছিল। টারজন বলল, আগে সেই বন্দিনীকে খুঁজে বার করতে হবে।

গোরিলাদেবতা একবার ভাবল সে তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবে। কিন্তু পরে কি ভাবল, সে রাজী হয়ে গেল টারজনের কথায়। ঠিক করল সে তাদের দুজনকেই মুক্তি দেবে। তাই গোরিলাদেবতা টারজনকে সঙ্গে করে জনকতক গোরিলাযোদ্ধা নিয়ে প্রাসাদের অন্তঃপুরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল।

অন্তঃপুরে ঢোকার মুখে সিঁড়ির কাছে সাফোক আর হাওয়ার্ড পাহারা দিচ্ছিল। তারা দুজনেই রাজার দলের গোরিলা হলেও তারা যখন দেখল রাজার দল হেরে গেছে এবং রাজা পালিয়ে গেছে তখন তারা গোরিলা-দেবতার বশ্যতা স্বীকার করল। গোরিলাদেবতাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে বলল, তারা দেবতারই সেবক এবং রাজাকে তারা তাড়িয়ে দিয়েছে প্রাসাদ থেকে।

গোরিলাদেবতা বলল, সেই বন্দিনী মেয়েটি কোথায় ?

সাফোক বলল, অন্তঃপুরে ছিল। হেনরি তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।

কোন্ পথে পালিয়েছে ?

আসুন, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।

এই বলে সে গোরিলাদেবতা আর টারজনকে নিয়ে সেই গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথটার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গেল। তারপর বলল, এইদিকে হেনরি নগরের বাইরে কোথায় চলে গেছে।

টারজন আর না দাঁড়িয়ে তখনি নগরের বাইরে বেরিয়ে পড়ল রোণ্ডার খোঁজে। সে দেখল বাতাসে একটা পুরুষ গোরিলা আর এক শ্বেতাঙ্গ নারীর গন্ধসূত্র সজীব রয়েছে তখনো। সেই সূত্র ধরে এগোতে লাগল। তার ঘাড়ের উপর সেই ফাঁসের দড়ি আর তার কোমরে খাপে ভরা ছুরিটা ঝোলানো ছিল।

উপত্যকার উপর দিয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা নদী পার হলো। নদীর ওপারে ফাঁকা প্রান্তরটায় যেতেই একটা সিংহের গর্জন শুনতে পেল। কিন্তু ভয় না করে আরো এগিয়ে গিয়ে দেখল একটা সিংহ একটা মরা গোরিলাকে খাচ্ছে এবং সেই নিয়ে ব্যস্ত আছে।

আরো এগিয়ে বনের মাঝে গিয়ে টারজন দেখল মাথায় ঝাঁকরা চুলওয়ালা একজন নগ্ন শ্বেতাঙ্গ এক শ্বেতাঙ্গ নারীকে কাঁধের উপর নিয়ে ছুটছে আর এক শ্বেতাঙ্গ নারী সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় তাকে তাড়া করে ছুটছে তার পিছনে।

বনটা পার হয়ে লোকটা একটা পাহাড়ে উঠতে লাগল। সে পিছন ফিরে টারজনকে দেখে বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় বলল, ফিরে যাও। তা নাহলে তোমাকে মেরে ফেলব।

এবার রোণ্ডাকে চিনতে পেরে বলল, রোণ্ডা !

লোকটা তখন টারজনকে মারার জন্য রোণ্ডাকে পাহাড়ের গায়ে এক-জায়গায় নামিয়ে রাখল। টারজন বলল, রোণ্ডা, তুমি পাহাড়ের মাথায় উঠে যাও। আমি ওর সঙ্গে লড়াই করে ওকে আটকে রাখব।

সেই উলঙ্গ শ্বেতাঙ্গ যুবতী তখন শ্বেতাঙ্গ লোকটাকে বলল, মেয়েটা পালাচ্ছে, ওকে ধর।

লোকটা তখন টারজনকে ছেড়ে রোণ্ডাকে ধরতে যেতেই টারজন তাকে গিয়ে ধরে ফেলল। লোকটার গায়ে প্রচুর শক্তি থাকলেও টারজন তার মুখে জোরে ঘুষি মেরে তাকে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর বসে আবার তার মাথায় আঘাত করল। কিন্তু তাকে হত্যা করল না। টারজন এবার উঠে দেখল সেই উলঙ্গ মেয়েটা রোণ্ডাকে ধরতে যাচ্ছে। সে তখন মেয়েটাকে ধরে পাহাড়ের মাথায় রোণ্ডার কাছে উঠে গিয়ে তার দড়িটা দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল তাকে। মেয়েটা অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তি করেও পেরে উঠল না টারজনের সঙ্গে।

টারজন দেখল সেই গোরিলাগুলো এবার পাহাড়ের নিচে থেকে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু ওরা যেখানে আছে সেখান থেকে পালাবার কোন পথ নেই। সে তখন চীৎকার করে গোরিলাদের বলল, তোমরা ফিরে যাও। তা না হলে তোমাদের দলের এই মেয়েটিকে হত্যা করব।

মেয়েটি তখন টারজনের মুখপানে তাকিয়ে হেসে বলল ওরা থামবে না। তুমি আমাকে হত্যা করলেও ওরা তোমাকে ছাড়বে না। ধরতে পারলে ওরা আমাদের সকলকে খাবে। তুমি বরং পাথর ছুঁড়ে ওদের মার। তাহলে ওরা আর আসতে পারবে না।

টারজন দেখল মেয়েটি এখন শান্ত এবং কোনরকম বিরোধিতা করছে না তার। মেয়েটি টারজনকে বলল, এখন আমি তোমার। ওদের কাছে আর যাব না।

টারজন পাথর কুড়িয়ে গোরিলাদের মাথায় মারতে লাগল। তখন সেই মেয়েটির বাঁধন খুলে দিতে সেও পাথর ছুঁড়তে লাগল। রোণ্ডাও তাই করতে লাগল। মাথায় পাথর লাগায় গোরিলাদের কয়েকজন ঘায়েল হলো। তারা একটা গুহায় গিয়ে আশ্রয় নিল।

মেয়েটি বলল, আমরা এখানে দিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকব। অন্ধকার হয়ে গেলে ওরা আর বেরোবে না বা আমাদের তাড়া করবে না।

টারজন একসময় মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি মানুষের মাংস খাও?

মেয়েটি ইংরিজিতে বলল, আমি বা মালবিয়াত কেউই খায় না।

টারজন বলল, মালবিয়াত কে?

মেয়েটি বলল, আমার লোক। আগে আমি ওর কাছে ছিলাম। এখন

তুমি তার সঙ্গে লড়াই করে আমাকে জয় করে নিয়ে নিয়েছ। এখন আমি তোমার। তবে ও মেয়েটা কে ?

এই বলে রোণ্ডাকে দাঁত বার করে আক্রমণ করতে গেল। টারজন তাকে ধরে ফেলল।

মেয়েটি বলল, যতদিন তোমার কাছে আমি থাকব ততদিন তুমি অন্য কোন মেয়েকে কাছে রাখতে পারবে না।

টারজন বলল, ও আমার নয়।

মেয়েটি বলল, ওর নাম কি ? তোমারই বা নাম কি ? আমার নাম বালজা।

টারজন বলল, ওর নাম রোণ্ডা আর আমার নাম স্ট্যানলি বলতে পার। তুমি ইংরিজি শিখলে কোথা থেকে ?

বালজা বলল, যখন আমি লণ্ডনে ছিলাম। পরে লণ্ডন থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেয় ওরা।

টারজন বলল, কেন তাড়িয়ে দিয়েছে তোমায় ?

বালজা বলল, কারণ আমি ওদের মত নই। ওরা আমায় অনেক আগেই তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমার মা আমায় লুকিয়ে রেখেছিল। পরে আমার সন্ধান পায় ওরা। তখন আমি পালিয়ে আসি।

টারজন বলল, মালবিয়াতও তোমার মত ?

বালজা বলল, ও ইংরিজি শিখতে পারেনি। তুমি ওর থেকে ভাল। তোমাকে আমার ভাল লাগে। তোমাকে আমার ভাল লাগছে। তুমি কি মালবিয়াতকে মেরে ফেলেছ ?

টারজন বলল, না, মরেনি বোধ হয়। আহত হয়ে পড়ে আছে।

বালজা একটা পাথর কুড়িয়ে শায়িত মালবিয়াতের গায়ের উপর ছুঁড়ে দিল। মালবিয়াত কোনরকমে হাতেপায়ে গুড়ি মেরে ওদের চোখের আড়ালে চলে গেল।

বালজা বলল, আমি ওর কাছে ফিরে গেলে ও আমাকে মারবে। তবে আমি সুন্দরী বলে আমাকে বেশী কিছু বলবে না। কিন্তু আমি ওর কাছে আর যাব না। আমি তোমার সঙ্গেই যাব।

ক্রমে পাহাড়গুলোর উপর সন্ধ্যার ছায়া নেমে আসতে ওরা পাহাড়টা থেকে নেমে একটা গুহার দিকে গেল। গুহাটায় গিয়ে টারজন দেখল সরু হলেও গুহার দুটো দিক খাড়াই হয়ে উপরে উঠে গেছে এবং উপরটা ফাঁকা। ভাবল এখানে থাকার থেকে উপরে উঠে যাওয়া ভাল।

টারজন ওদের বলল, আমি আগে উপরে উঠে যাই। পরে দড়িটা নামিয়ে দিলে একে একে উঠে যাবে তোমরা।

উপরে উঠে গেল ওরা। এখন রাত্রি হয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে একটা জলনিকাশের নালা দেখতে পেল। হঠাৎ রোণ্ডা দেখল সেই নালাটায় কতকগুলো পাথর অন্ধকারে জ্বলছে। সে বেশ বুঝতে পারল ওগুলো হচ্ছে হীরে। হীরে ছাড়া অন্ধকারে কোন পাথর এমন করে আলো দিতে পারে না।

রোণ্ডা বলল, পাথরগুলো কুড়িয়ে নিতে পারি?

বালজা বলল, তুমি যতটা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে নিতে পার।

রোণ্ডা বলল, এগুলো হীরে আর এইজন্যই এটাকে বলে হীরকদেশের উপত্যকা। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। বলত ওদের গিয়ে ট্রাকে করে অনেক হীরে বোঝাই করে নিয়ে যেতে পারি।

টারজন বলল, না, জীবনে আর কখনো এই অভিশপ্ত হীরকদেশের নাম করবে না। এটাকে চিরকালের মত বিদায় জানাবে।

এরপর ওরা রাতের মধ্যে দক্ষিণ দিকে একটা পথ ধরল। গোরিলা-নগরী থেকে পালিয়ে আসা গোরিলাগুলো যে গুহায় থাকে সেগুলোকে দূর থেকে ওদের দেখিয়ে দিল বালজা। ওরা এখান থেকে দক্ষিণ দিকে গিয়ে সেই পাহাড়টায় গিয়ে পৌছবে, তার পাদদেশে আছে ওম্বাম্বি জলপ্রপাত যেখানে ওরমানদের অপেক্ষা করতে বলে এসেছে টারজন।

সারারাত ধরে পথ চলল ওরা। রোণ্ডা অত্যধিক ক্লান্ত হয়ে পড়ায় টারজন তাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। বালজা সমানে অক্লান্তভাবে পথ হাঁটতে লাগল। এইভাবে উচুনিচু অনেক পাহাড়ী পথ পার হয়ে ওরা ভোরবেলায় সেই পাহাড়টায় গিয়ে পৌছল। কিন্তু চারদিক কুয়াশায় ঢেকে থাকায় ঠিকমত চিনতে পারছিল না জায়গাটা।

কিছু পরে রোদ উঠতেই কুয়াশা কেটে গেল। ওরা সেই পাহাড়ের পাদদেশে এসে উপস্থিত হলো। টারজন বলল, এখান থেকে আমাদের শিবির আর বেশী দূরে নয়।

রোণ্ডা বলল, এবার আমাকে নামিয়ে দাও স্ট্যানলি, এবার আমি হাঁটতে পারব। কিন্তু শিবিরে যাবার আগে বালজার জন্য একটা স্কার্ট যোগাড় করতে হবে। ওর দেহটা একেবারে নগ্ন।

টারজন বলল, নগ্ন হলেও একেবারে স্বভাবসুন্দর। প্রকৃতির হাতে গড়া মেয়ে। ও সভ্য জগতে গিয়ে বদলে যাবে একেবারে। তখন দেখবে সিগারেট খাচ্ছে দামী জমকালো পোশাক পরে।

এবার নদীর ধার দিয়ে সেই পথটা ধরে এগিয়ে চলল। মাইলখানেক যাবার পর কতকগুলো তাঁবু দেখতে পেল ওরা। রোণ্ডা চীৎকার করে উঠল, সফরি, আমাদের প্যাটকে দেখতে পাচ্ছি।

ওরা শিবিরের কাছে এগিয়ে যেতেই শিবিরের একজন ওদের দেখতে পেয়ে চীৎকার করতে লাগল। তখন সবাই ছোটাছুটি শুরু করে দিল। সবাই রোণ্ডাকে চুম্বন করল তাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে। নাওমি ম্যাডিসন টারজনকে চুম্বন করতেই বালজা তাকে মারতে গেল।

টারজন তার কোমর ধরে তাকে শান্ত করে বলল, ওরা সবাই তোমার বন্ধু। কাউকে মারতে নেই। ওদের সঙ্গে হলিউডে যাবে। সভ্য হবে।

বালজাকে দেখে সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। তার দেহসৌন্দর্য সত্যিই আশ্চর্যজনক। ওরমান ও ওগ্রেডি তার জন্য একটা নতুন ভূমিকা সৃষ্টি করল ছবিতে। ওরমান বলল, সে ছবির কাজ শুরু করবে। সে বলল, সে নিজেও কোন একটা ভূমিকায় অভিনয় করবে। ওগ্রেডি অভিনয় করবে মেজর হোয়াইটের শিকারীর ভূমিকায়।

শেষে ওরমান বলল, বালজার জন্য এমন একটা ভূমিকা তৈরী করেছি যে ভূমিকায় ও অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দেবে সবাইকে।

এরপর দুসপ্তাহ ধরে ওরমান পরপর কয়েকটা দৃশ্যের ছবি তুলে ফেলল। টারজন একসময় একটা দূর আদিবাসী গাঁ থেকে একদল নিগ্রোভৃত্য নিয়ে এল শিবিরের কাজ ও মালপত্র বহন করার জন্য।

হঠাৎ একদিন একটা পিওন এসে একটা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল ওরমানের হাতে। ওদের স্টুডিওর প্রযোজক খবর পাঠিয়েছে ওকে, দলের সকলকে ও ছবির যাবতীয় সাজসরঞ্জাম ও মালপত্র নিয়ে হলিউডে ফিরে যেতে হবে।

আর ছবি তোলা হবে না ভেবে মনটা খারাপ হয়ে গেল ওরমানের। কিন্তু বাকি সবাই খুশিতে লাফাতে লাগল। দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবল থেকে আবার ফিরে যাবে ওরা হলিউডে।

টারজন ওরমানকে বলল, ও ওদের সঙ্গে বানস্যুটোদের গাঁ পর্যন্ত যাবে। সে ওদের বলল, বানস্যুটোদের গাঁয়ের সর্দারের সঙ্গে তার কথা হয়েছে সে আর ওদের কোন ক্ষতি করবে না।

বানস্যুটোদের গাঁয়ের সীমানাটা ওদের পার করিয়ে দিয়ে টারজন ওদের বলল, আমি এক জায়গায় যাচ্ছি। জিঞ্জায় গিয়ে তোমাদের সঙ্গ নেব।

সেখান থেকে পুজুদের গাঁয়ে ওবরস্কির খোঁজে চলে গেল টারজন। সে তখনো পর্যন্ত দলের কাউকে তার আসল পরিচয় দেয়নি। সবাই তাকে স্ট্যানলি ওবরস্কি বলেই জানে।

কিন্তু পুজুর সঙ্গে দেখা হতেই সে বলল, দুঃখের কথা বাওয়ানা, তোমার সেই লোকটি এক সপ্তাহ আগে জ্বরে মারা গেছে। আমরা তার মৃতদেহটা জিঞ্জায় শ্বেতাঙ্গদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি যাতে আমরা মেরেছি বলে কারো কোন সন্দেহ না হয়।

টারজনের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ও ভেবেছিল ওবরস্কিকে ওদের সামনে নিয়ে গিয়ে হাজির করিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার পর নিজের আসল পরিচয়টা দেবে। কিন্তু তা আর হলো না। আর ও ওদের কাছে ফিরে যাবে না কখনো।

সে জাদ-বাল-জাকে সঙ্গে করে জিঙ্গায় চলে গেল। ওরমানদের ট্রাকগুলো যেদিকে যাচ্ছিল তার থেকে অল্প কিছু দূরে একটা জায়গায় জাদ-বাল-জাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ওদের চলার পথে তাকিয়ে রইল। দেখল টম ওরমানের পাশে বসে আছে নাওমি ম্যাডিসন, বিল ওয়েস্টের পাশে আছে রোণ্ডা আর প্যাট ওগ্রেডির পাশে আছে বালজা। সকলেই সকলের হাত ধরে আছে। বালজা সিগারেট খাচ্ছে।

টারজন এ্যাণ্ড দি ম্যাডম্যান

টারজন ও জনৈক উন্মাদ

সেদিন টারজন বনের মাঝে একা পথ চলতে চলতে হঠাৎ বুঝতে পারল দূরে কারা যেন আসছে। সে কাউকে দেখতে না পেলেও তার পঞ্চ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল। সে তার প্রখর কর্ণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঠুং ঠাং শব্দ শুনতে পেল। বুঝল এ শব্দ কোন পশুর নয়, নিশ্চয় কোন মানুষের।

সেই শব্দ লক্ষ্য করে সে গাছের উপর উঠে ডালে ডালে এগিয়ে যেতে লাগল। এইভাবে গিয়ে সে বাতাসে কিছু নিগ্রো আর অল্প দু-একজন শ্বেতাঙ্গের গন্ধ পেল। টারজন যখন আরো অনেকটা এগিয়ে গেল তখন সে দেখতে পেল অদূরে একজন নিগ্রো আর দুজন শ্বেতাঙ্গ একটা ফাঁকা জায়গায় একটা নদীর ধারে শিবির স্থাপন করেছে। নিগ্রোদের সংখ্যা জনকুড়ি হবে। তাদের দেখে এক নির্দোষ শিকারীর দল মনে হলেও টারজন গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রইল। ঠিক করল অন্ধকার হলে সে তাদের কাছে থেকে তাদের কথাবার্তা শুনবে।

হঠাৎ নদীর উপর থেকে আর একটা শব্দ এল। টারজন গাছের উপর থেকে দেখল নদীর উপর দিয়ে কয়েকটা ডিঙ্গি নৌকো দাঁড় বেয়ে ঘাটের কাছে সেই শিবিরটার দিকে আসছে। চারটে নৌকো ঘাটের কাছে এসে ভিড়তেই সামনের নৌকো থেকে দুজন শ্বেতাঙ্গ মাঠে এসে নামল। নৌকোগুলোতেও অনেকগুলো নিগ্রো ছিল।

শিবিরের শ্বেতাঙ্গ দুজন এগিয়ে গিয়ে আগন্তুকদের অভ্যর্থনা জানাল। পরে নৌকারোহীরা কূলে নেমে আগের শিবিরটার পাশে একটা শিবির স্থাপন করল। প্রথমে যারা নদীর ধারে শিবির স্থাপন করেছিল তাদের নেতা পেলহ্যাম ডাটন আগন্তুকদের চিনতনা এবং তাদের দেখে খুব একটা ভাল মনে হলো না। কিন্তু তার শিকারী এবং পথপ্রদর্শক বিল গাণ্ট্র এগিয়ে গিয়ে আগন্তুক শ্বেতাঙ্গ দুজনের একজনকে দেখিয়ে ডাটনকে বলল, ইনি হচ্ছেন টম ক্রাম্প। অনেকদিন আফ্রিকার জঙ্গলে আছেন।

ক্রাম্প তার সঙ্গীকে দেখিয়ে ডাটনকে বলল, ইনি হচ্ছেন মিনস্কি।

ফাঁকা জায়গাটার ধারে যে একটা গাছ ছিল তার উপর থেকে টারজন ক্রাম্পকে চিনতে পারল। সে জানত ক্রাম্প একজন কুখ্যাত হাতির দাঁতের

কারবারী এবং বছর কতক আগে সে ক্রাম্পকে তার দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সে একজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং দুটো দেশের কর্তৃপক্ষ তার নানা কুকীর্তির জন্য তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। বাকি তিনজন শ্বেতাঙ্গকে সে চিনত না। তবে ডাটনকে তার ভাল লোক বলেই মনে হলো। তার সঙ্গী শিকারী গাণ্ট্রকে একজন সাধারণ সরল প্রকৃতির মানুষ বলে মনে হলেও সে তার মনে কোন দাগ কাটতে পারল না। ক্রাম্পের সঙ্গী ইভান মিনস্কিকে সে না চিনলেও তাকে ক্রাম্পের সমগোত্রীয় বলে মনে হলো।

ক্রাম্প তার শিবিরে এসে গাণ্ট্রকে বলল, তুমি এখানে কি করছ বিল? তোমার সঙ্গের লোকটি কে? ও কি শিকার করে বেড়াচ্ছে?

গাণ্ট্র বলল, উনি একজন আমেরিকান। উনি এডিনবরা থেকে আগত টিমথি শিকারেল নামে এক ধনী বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে শিকারে বেরিয়েছিলেন। আমি ওদের শিকারে সাহায্য করছিলাম। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সান্দ্রা নামে একটি যুবতী মেয়ে ছিল সঙ্গে। একদিন টারজন অফ দি এপস্ নামে এক নগ্নপ্রায় দৈত্যাকার লোক আসে আমাদের শিবিরে। তুমি লোকটাকে চেন?

ক্রাম্প তার মুখটা গম্ভীর এবং বিকৃত করে বলল, চিনি না মানে? বছর দুই আগে ও আমাকে এমন একটা অঞ্চল থেকে তাড়িয়ে দেয় যেখানে অনেক ভাল ভাল হাতি ছিল।

গাণ্ট্র আবার বলতে লাগল, শিবিরে এলে টারজনকে পিকারেল এমনভাবে খাতির করতে লাগল যেন মনে হবে টারজন ওর নিজের ভাই। একদিন পিকারেল যখন ডাটন আর আমাকে নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিল তখন তার মেয়ে সান্দ্রা টারজনের সঙ্গে বেড়াতে চলে যায়। তারপর থেকে আর ফিরে আসেনি সান্দ্রা। আমরা ভাবছিলাম তাদের মৃত্যু ঘটেছে। এক সপ্তাহ হলো আমরা তাদের নানা জায়গায় খোঁজাখুঁজি করছি। খুঁজতে গিয়ে আমরা একজন আদিবাসীর দেখা পাই। সে আমাদের বলল, সে দেখেছে টারজন মেয়েটাকে বেঁধে তার গলায় দড়ি দিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। এই কথা শুনে বুড়ো শিকারেল হৃৎপিণ্ডের রোগে আক্রান্ত হয় এবং মৃতপ্রায় অবস্থায় আগের শিবিরেই রয়ে গেছে। সে তার মেয়ের জন্য এক হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করে। কেউ তার মেয়েকে এনে দিতে পারলে সে এই টাকাটা আর টারজনকে কেউ জীবিত বা মৃত এনে দিতে পারলে তাকে পাঁচশো পাউণ্ড দেবে। আমরা তাই ওদের খোঁজে এখানে এসে পড়েছি। সুতরাং তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই।

ক্রাম্প বলল, তাহলে তুমি আশা করছ টারজনকে এখানে খুঁজে পাবেই।

গাণ্ট্র বলল, নিশ্চয়।

ক্রাম্প বলল, হ্যাঁ, আমিও তাই আশা করি। তার সঙ্গে আমাকে একটা

বোঝাপড়া করতেই হবে। তার মাথার দাম পাঁচশো পাউণ্ড এবং একমাত্র আমিই তাকে খুঁজে বার করতে পারব।

গাণ্ট্র বলল, কিন্তু কি করে পাবে?

ক্রাম্প বলতে লাগল, আমি ব্যবসার জন্য ঘুরতে ঘুরতে সম্প্রতি একদিন ওয়াক্রুতুরিদের আদিবাসী গাঁয়ে এসে পড়ি। গাঁয়ের সর্দার মুতিম্বোয়ার সঙ্গে আমার কথা হয়। আমি মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করে তাকে কিছুকরে উপহার দিই। আমি সেদিন তাদের গাঁয়ে গেলে তারা বলল, একটা নগ্ন শ্বেতাঙ্গ লোক তাদের গাঁ থেকে কয়েকজন নারী ও শিশুকে ধরে নিয়ে গেছে। তারা বলল, ক্রুতুরি পাহাড়ের পাদদেশে যে কাঁটাগাছের বন আছে লোকটা থাকে সেখানে। সেখানে কোন শ্বেতাঙ্গ থাকতে পারে আমার ত তা ধারণাই ছিল না। জায়গাটা বড়ই খারাপ। আদিবাসীরা একবার লোকটার খোঁজে ক্রুতুরি পাহাড়ের কাছে গিয়েছিল। কিন্তু জায়গাটা নাকি অভিশপ্ত বলে ওরা ফিরে আসে।

এরপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ক্রাম্প আবার বলল, আমি তোমাদের দলে যোগদান করে ওদের খোঁজ করতে সাহায্য করব।

গাণ্ট্র বলল, তোমার পুরনো বন্ধু টারজনকে তুমি নিজের হাতে গুলি করতে চাও। এই ত?

ক্রাম্প বলল, তার সঙ্গে দেড় হাজার পাউণ্ডও চাই।

গাণ্ট্র বলল, ওতে কিন্তু ভাগ বসাতে এসো না। ও টাকা আমার।

ক্রাম্প বলল, আমি একাই যেতে পারি। কারণ তোমরা গেলে নরখাদক আদিবাসীরা তোমাদের খেয়ে ফেলবে। বিষাক্ত তীর অথবা বর্শা দিয়ে তোমাদের মারতে আসবে। তবু তোমাদের আমি সঙ্গে নেব, কারণ আমাদের সঙ্গে যত বন্দুক থাকে ততই ভাল।

গাণ্ট্র বলল, ঠিক আছে, তোমার কথাই রইল।

ক্রাম্প বলল, ডাটন আমাদের সঙ্গে যাবে না?

গাণ্ট্র বলল, না, মেয়েটার প্রতি ওর একটা দুর্বলতা আছে, তাই ও বড় দুঃখ পেয়েছে। যাই হোক, ওর অনেক টাকা আছে।

ক্রাম্প বলল, মিনস্কিকে কিন্তু সঙ্গে নিতে হবে। আমি যা কিছু পাই তার অর্ধেক ভাগ দিই। বন্ধু হিসাবে ও মোটেই খারাপ না।

গোধূলি চলে যেতে সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল শিবিরে। ক্রমে রাতের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। নিগ্রোভৃত্যরা শিবিরের সামনে আগুন জ্বেলে তার চারপাশে বসল। হিংস্র জন্তুদের তাড়াবার জন্য একটা বড় রকমের অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হলো।

ক্রমে রাত বাড়তে লাগল। অজস্র ব্যাঙের ডাক, সাথীহারা লেমুরের সকরুণ

ডাক, সিংহের গর্জন, নৈশ অরণ্যের আরো সব কত পোকামাকড়ের চীৎকার ডাটনের মনে এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে লাগল। সে ভাবল তার একান্ত ভালবাসার জন সেই মেয়েটি এই ভয়ঙ্কর নৈশ অরণ্যের মাঝে কোথায় আছে এখন তা কেউ জানে না। তবে সে ক্রাম্পের কথা থেকে জেনেছে যে লোকটা তাকে ধরে নিয়ে গিযেছিল সে এখনো পর্যন্ত ফিরিয়ে দিয়ে যায়নি। এখন একমাত্র ভরসা ক্রাম্পের আশ্বাস। সে বলেছে সে টারজনকে খুঁজে বার করবেই।

জলন্ত আগুনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছিল শিবিরের সামনেটা। হঠাৎ আগুনের ধারে বসে থাকতে থাকতে একজন নিগ্রোভৃত্য চীৎকার করে উঠল ভয়ে। তার চীৎকার শুনে শ্বেতাঙ্গরা মুখ তুলে দেখল দৈত্যাকার এক নগ্নপ্রায় শ্বেতাঙ্গ তাদের শিবিরের দিকে আসছে।

ক্রাম্প লাফ দিয়ে উঠে পড়ল। সে টারজনকে চিনতে পারল। চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে সে তার পিস্তল বার করে টারজনকে লক্ষ্য করে গুলি করল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্রাম্পের গুলিটা লাগল না টারজনের গায়ে। কিন্তু মুহূর্তমধ্যে টারজনের একটা তীর ক্রাম্পের ডানদিকের কাঁধটাকে বিদ্ধ করল। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে শিবিরের সবাই হতবুদ্ধি হয়ে গেল এবং কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই টারজন বেরিয়ে গেল শিবির থেকে।

ডাটন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ক্রাম্পকে বলল, তুমি একটা বোকা। ও শিবিরে আসছিল, তুমি গুলি করতে গেলে কেন?

ডাটন জোর গলায় টারজনকে ডাকতে লাগল। বলল, ফিরে এসো টারজন, তোমার কোন ক্ষতি করা হবে না। আমি কথা দিচ্ছি। মিস পিকারেল কোথায়? ফিরে এসে সব কথা বল আমাদের।

কথাগুলো কানে শুনতে পেলেও সে আর ফিরে এল না। সে বুঝল ক্রাম্প তার উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তাকে গুলি করেছে।

সেদিন রাতে একটা গাছের উপর রাত কাটাল টারজন। কিন্তু সে বারবার ভেবেও একটা কথা বুঝতে পারল না মিস পিকারেল নামে মেয়েটি কে এবং কেনই বা তারা তাকে তার অপহরণকারী বলে ভাবছে।

পরদিন সে একটা হরিণ মেরে পেট ভরে তার মাংস খেল। একটা হায়েনা

আর একটা শেয়াল তার ভুক্তাবশিষ্ট মাংসগুলো খাবার জন্ত তার কাছেই ওৎ পেতে বসে রইল। পরে অনেকটা বেলা হলে সে বুঝল তার সামনে একজন আদিবাসী শিকার করছে। সে জানত এ অঞ্চলের আদিবাসীরা তার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন নয় এবং তাকে চেনে এবং বন্ধুভাবে দেখে। সে তাই কোনরকম সতর্কতা অবলম্বন করল না।

হঠাৎ একটা বর্শা একটা ঝোপের ভিতর থেকে ছুটে এসে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। সে বুঝল এটা তার প্রতি আক্রমণ। বর্শাটা তার গায়ে লাগল কি না আক্রমণকারী তা বোঝার আগেই একটা গাছের উপর উঠে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল টারজন।

তার আক্রমণকারী কে এবং কোথায় তারা আছে তা জানার জন্য গাছের উপর থেকে অদৃশ্য অবস্থায় লক্ষ্য করতে লাগল টারজন। সে দেখল কুড়িজন আদিবাসী একজায়গায় জটলা পাকিয়ে বসে আছে। তাদের চোখে মুখে স্পষ্ট ভয়ের চিহ্ন ফুটে রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন বলছিল, বর্শাটা তার গায়ে লাগেনি এবং সে ঠিক এর প্রতিশোধ নেবার জন্ত আসবে।

অন্য একজন বলল, সে আমাদের গাঁয়ে এলে প্রথমে তার সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করব। পরে অসতর্ক মুহূর্তে তাকে ধরে তার হাত পা বেঁধে ফেলব।

আর একজন বলল, আমার কিন্তু ভয় করছে। টারজনকে আমি সত্যিই ভয় করি।

অন্য একজন বলল, কিন্তু ওরা বলেছে তার জন্ত মোটা পুরস্কার দেবে। পুরস্কারটা এত বেশী যে তাতে আমরা প্রত্যেকে একশোজন করে মেয়ে কিনতে পারব এবং তার সঙ্গে অনেক গরু, ছাগল, মুরগীও কিনতে পারব।

কথাগুলো শুনে হতবুদ্ধি হয়ে গেল টারজন। সে ভাবল এই সমস্যার সমাধান তাকে করতেই হবে অন্য কোথাও যাবার আগে।

এইসব আদিবাসীদের গাঁটা কোথায় তা সে জানত। তাই সন্ধ্যার পর সে তাদের গাঁয়ের পাশে একটা গাছের উপর উঠে অপেক্ষা করতে লাগল। সে জানত সে রাতে নাচগানের কোন উৎসব না থাকায় গ্রামবাসীরা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে আর মাত্র একজন প্রহরী গাঁয়ের সর্দারের ঘরের সামনে পাহারা দিতে থাকবে। সে তাই ধৈর্য ধরে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

ক্রমে গাঁয়ের সবাই আপন আপন ঘরে শুয়ে পড়লে এবং গাঁটা একেবারে নীরব হয়ে গেলে গাঁয়ের গেট পার হয়ে গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল টারজন। সে দেখল গেটের কাছে একটা গাছ রয়েছে যার ডালগুলো ঝুঁকে আছে গাঁয়ের ভিতর দিকে। সেইদিক দিয়ে সে সহজে পালাতে পারবে।

টারজন দেখল সে রাতে খুব ঠাণ্ডা থাকার জন্ত প্রহরী তার সামনে আগুন জেলে তার পাশে বসে ঝিমোচ্ছে। তার ঘুম ধরেছে। আশপাশের কুঁড়ে-

গুলোতে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার একমাত্র ভয় কুকুরগুলোকে। তারা তাকে দেখতে পেলেই ঘেউ ঘেউ করে জাগিয়ে দেবে সবাইকে।

টারজন নিঃশব্দে সর্দারের কুঁড়ের কাছে গিয়ে তন্দ্রাহত প্রহরীটার পিছন দিক থেকে তার গলাটা টিপে ধরল। তারপর চাপা গলায় তাকে বলল, চুপ করে থাক, আমি তোমায় মারব না।

কিন্তু তার গলার উপর হাতটা একটু আলগা করে দিতেই প্রহরীটা ভয়ে চীৎকার করে উঠল। টারজন তখন তাকে কাঁধের উপর তুলে নিয়ে গেটের দিকে ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু তার চীৎকারে গাঁয়ের অনেকেই তখন জেগে উঠেছে। একজন যোদ্ধা গেটের কাছে তার সামনে পথরোধ করে দাঁড়াতে টারজন তাকে ঘুষি মেরে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর পা দিয়ে সেই গাছটায় উঠে পডল। অন্য সব যোদ্ধারা তাকে আক্রমণ করার আগেই সে গাছের ডালে ডালে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেশকিছুটা দূরে গিয়ে লোকটার গলাটাকে ছেড়ে দিল টারজন। সে উঠে দাঁড়ালে টারজন তাকে বলল, তুমি আমার সঙ্গে চুপ করে এস। আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।

লোকটা অন্ধকারে টারজনকে চিনতে না পেরে বলল, কে তুমি?

টারজন বলল, আমি টারজন।

লোকটা তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, আমাকে মেরো না বাওয়ানা, তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

কোন কথা না বলে তাকে বনের আরো গভীরে নিয়ে গেল টারজন। একটা ফাঁকা জায়গার ধারে গিয়ে একবার পিছন ফিরে দেখল তাকে কেউ অনুসরণ করছে কি না। একটা গাছের উপর উঠে লোকটাকে তার সামনে বসিয়ে বলল, যদি বাঁচতে চাও ত আমার কথার ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। সত্যি কথা বলবে।

লোকটা বলল, হ্যাঁ বাওয়ানা। আমি সত্যি কথা বলব।

টারজন বলল, আজ তোমার গাঁয়ের লোকেরা কেন আমাকে আক্রমণ করেছিল?

কারণ ঢেঁড়া পিটিয়ে আমাদের গাঁয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় টারজন আমাদের গাঁয়ের মেয়ে ও ছেলেদের ধরতে আসছে।

কিন্তু তোমাদের গাঁয়ের লোকেরা জানে ত আমাকে। তারা জানে টারজন তাদের নারী ও শিশুদের চুরি করে নিয়ে যায় না।

কাঁটাবনের ধারে রুতুরি পাহাড়ের তলায় যে গাঁ আছে তার সর্দার ওয়ারুতুরি আমাদের বলল, টারজন এখন খারাপ হয়ে গেছে। সে তাদের গাঁ থেকে মেয়ে চুরি করে নিয়ে গেছে।

টারজন বলল, তোমরা ওয়ারুতুরির কথা বিশ্বাস কর? তারা নরখাদক এবং মিথ্যাবাদী।

হ্যাঁ বাওয়ানা, আমরা তা জানি। কিন্তু আমাদের গাঁয়ের তিনটে লোক দেখেছে তুমি নাকি একটা শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে গলায় দড়ি দিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে।

টারজন বলল, একথা সত্যি নয়। আমি অনেকদিন তোমাদের গাঁয়ে যাইনি।

আমি তোমাকে দেখিনি বাওয়ানা। ওরা যা বলেছে আমি শুধু তাই বলছি।

টারজন বলল, আমি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি, তুমি তোমায় গাঁয়ে চলে যাও। গাঁয়ের লোকদের বলগে, যে লোকটাকে তারা শ্বেতাঙ্গ মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যেতে দেখেছে সে টারজন নয়। বলবে, টারজন তাদের কোনদিন কোন ক্ষতি করবে না। যে লোকটা টারজনের নাম করে মেয়ে চুরি করে বেড়াচ্ছে টারজন তাকে খুঁজে বার করে খুন করবে। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই।

পরদিন সকালে রুতুরি পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল টারজন। এ রহস্যের সন্ধান তাকে করতেই হবে। দোষী লোককে যেমন করে হোক খুঁজে বার করে তাকে শাস্তি দেবার এক দৃঢ় সংকল্প করল মনে মনে।

দুপুরের পর সে তার পথের সামনের দিক থেকে একটা আদিবাসীকে আসতে দেখল। তাকে দেখে টারজন লুকোবার কোন চেষ্টা করল না। কিন্তু আদিবাসী নিগ্রোটা টারজনকে দেখে চিনতে পেরেই ভয় পেয়ে তার দিকে তার হাতের বর্শাটা ছুঁড়ে দিল। ব্যাপারটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল টারজন। কারণ সে দেখল লোকটা এমন এক গ্রাম্য সর্দারের ছেলে যে তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। এর থেকে সে বুঝল কোন কারণে এ অঞ্চলের সব গাঁয়ের আদিবাসীরাই শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে তার প্রতি। সে আরো বুঝতে পারল কোন একটা লোক নিজেকে টারজন বলে চালাবার চেষ্টা করছে এবং লোকে তাকে টারজন ভাবছে। তাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

আরো কিছু জানার জন্য পলাতক নিগ্রোটাকে ধরে ফেলল টারজন। গাছে গাছে সে এগিয়ে গিয়ে তার পথের সামনে হঠাৎ নেমে পড়ে তাকে ধরে ফেলল। লোকটা নিজেকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করতে টারজন তাকে শক্ত করে ধরে রেখে বলল, কেন তুমি আমাকে মারতে গিয়েছিলে? তোমরা ত জান আমি তোমাদের বন্ধু।

আদিবাসী যোদ্ধাটা বলল, ঢেঁড়া পিটিয়ে আমাদের বলে দেওয়া হয়েছে।

এরপর সে সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করল গতকাল সেই প্রহরীটা যে কথা বলেছিল টারজনকে। লোকটা বলল, ঢেঁড়া পিটিয়ে আমাদের বলে দেওয়া

হয়েছে চারজন শ্বেতাঙ্গের এক সফরি টারজন আর হারিয়ে যাওয়া একটি শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে খুঁজছে।

টারজন এবার বুঝতে পারল ঐ হারিয়ে যাওয়া মেয়েটিই মিস পিকারেল এবং এইজন্যই ক্রাম্প তাকে গুলি করেছিল।

টারজন নিগ্রো লোকটাকে বলল, তোমাদের গাঁয়ে গিয়ে বলগে টারজন কখনো কোন গাঁয়ে গিয়ে কোন মেয়ে চুরি করেনি অথবা সেই শ্বেতাঙ্গ মেয়েটিকেও চুরি করেনি। কোন এক দুষ্ট প্রকৃতির লোকই এ কাজ করে তার নামে চালাবার চেষ্টা করছে।

নিগ্রো যোদ্ধাটি বলল, লোকটা একটা শয়তান।

টারজন বলল, শয়তান হোক বা দানব হোক টারজন তাকে খুঁজে বার করবেই। তোমার যাওয়ার পথে যদি শ্বেতাঙ্গরা আসে তাহলে তাদেরও এই কথা বলবে।

তৃতীয় অধ্যায়

যেতে যেতে ওরা পথের উপর বসে পড়তেই বনভূমির অন্ধকার অস্বস্তিকরভাবে ঘন হয়ে উঠল সান্দ্রার সামনে। আশপাশের গাছগুলোতে অনেক ফুল ফুটে থাকা সত্ত্বেও সে সব ফুলের সৌন্দর্য বা সৌরভ কিছুমাত্র উপভোগ করতে পারল না একটিবারের জন্যও।

যে লোকটা তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল সে তাকে নিয়ে বিশ্রামের জন্য বসল। সে কে এবং কোথায় কি জন্য নিয়ে যাচ্ছে তাকে তা সে বলেনি এখনো পর্যন্ত। এর আগে জিজ্ঞাসা করেও কোন উত্তর পায়নি। তবু আজ আবার সেই একই প্রশ্ন করল সান্দ্রা পিকারেল।

লোকটা বলল, আমি হচ্ছি টারজন। আমি নিজেকে টারজন বলেই জানি। কিন্তু ওরা আমায় দেবতা বলে। কিন্তু আমি দেবতা নই। তবে তুমি যেন একথা বলো না তাদের।

সান্দ্রা বলল, ওরা কারা?

লোকটা বলল, আলেমতেজোরা। ওদের রাজা দা গামা আমাকে দেবতা বলে। কিন্তু ওদের প্রধান পুরোহিত বলে আমি দেবতা নই, একজন শয়তান এবং আলেমতেজোদের ধ্বংসের জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে ওদের দেশে। কাছে দেবতা থাকলে প্রধান পুরোহিতের অসুবিধা হবে, তার ক্ষমতা খর্ব হবে এজন্য সে আমাকে তাড়াতে চায়। এই নিয়ে রাজার সঙ্গে প্রধান পুরোহিত রুইজের ঝগড়া হয়। অবশেষে রুইজ আমার সম্বন্ধে রাজাকে বলে,

ও যদি দেবতা হবে তাহলে ওর দেবী কোথায়? সব দেবতারই দেবী থাকে। আমি তাই তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছি। তুমিই হবে আমার দেবী। তা না হলে তারা আমায় খুন করবে। কিন্তু তোমাকে নিয়ে গেলে তারা আর খুন করবে না আমাকে।

সান্ড্রা বলল, ওখানে যেও না। আমাকে নিয়ে গেলেও কোন না কোন অজুহাতে রুইজ তোমাকে খুন করবে। তার থেকে যেখান থেকে তুমি এসেছ সেখানেই ফিরে যাও।

লোকটা বলল, আলেমতেজো ছাড়া আর কোথায় যাব আমি? যাবার মত আর কোন জায়গা নেই আমার। দা গামা বলে আমি স্বর্গ থেকে ভেসে এসেছি। তারা সবাই একথা বলে। কিন্তু আমি জানি না কেমন করে আবার স্বর্গে ভেসে যাব আমি। আমি অবশ্য নিজেকে দেবতা মনে করি না। আমি শুধু জানি আমি টারজন।

সান্ড্রা বলল, আমার কথা শোন। তুমি আমার সঙ্গে আমাব সঙ্গীদের কাছে চল। তুমি আমাকে তাদের হাতে ফিরিয়ে দিলে তারা তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, না। আমি না গেলে দা গামা খুব রাগ করবে।

সান্ড্রা অনেক করে বুঝিয়েও তাকে রাজী করাতে পারল না। তবে সে একটা জিনিস বুঝতে পারল। বেশ বুঝল লোকটা শিক্ষিত এবং তার প্রতি কখনো অভদ্র বা অশালীন আচরণ করেনি। তবে এটাও ঠিক যে সে টারজন নয়। সে টারজনকে চোখে না দেখলেও তার সম্বন্ধে যেসব কথা ও কাহিনী শুনছে তাতে সে বুঝেছে টারজন কখনো এইভাবে দা গামার কাছে বিলিয়ে দিত না নিজেকে।

আবার পথ চলা শুরু করল লোকটা। এবার সে নিজেই কথা বলে যেতে লাগল। সে বলল, তুমি খুব সুন্দর, তোমাকে দেবী হিসেবে ঠিক মানাবে। এর আগে আমি অনেক নিগ্রো মেয়ে ধরে নিয়ে গেছি। কিন্তু দেবী হিসেবে তাদের পছন্দ হয়নি তাদের। তাদের তারা খেয়ে ফেলেছে। তাদের খাবার জন্য অনেক নারী ও শিশু ধরে দিয়েছি। কারণ তারা পুরুষের মাংস খায় না।

সহসা কোথা থেকে একদল মুখে রংমাখা নিগ্রো যোদ্ধা এসে পড়ায় ওদের কথাবার্তা থেমে গেল। লোকটা সান্ড্রাকে বলল, ওরা ওয়ারুতুরি।

নিগ্রোদলের সর্দার মুতিম্বোয়া বলল, এই হলো টারজন।

কথাটা বলতেই দুজন যোদ্ধা লাফ দিয়ে ধরে ফেলল টারজন নামধারী শ্বেতাঙ্গ লোকটাকে। মুতিম্বোয়া বলল, ওকে এখন মেরো না। আমরা ওদের গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে উৎসবে সবাইকে ডাকব।

একজন যোদ্ধা বলল, ও আমাদের গাঁয়ের অনেক নারী ও শিশুদের চুরি করে নিয়ে গেছে।

মুতিম্বোয়া বলল, সেইজন্যই ওকে তিলে তিলে পীড়ন করে মারা হবে।

সান্দ্রা শ্বেতাঙ্গটাকে বলল, ওরা কি বলছে বুঝতে পারছ ?

লোকটা বলল, হ্যাঁ পারছি। তুমি বুঝতে পারছ ?

সান্দ্রা বলল, হ্যাঁ, বেশ পারছি।

লোকটা বলল, আমি ঠিক পালিয়ে যাব। পরে এসে তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে যাব। তুমি কিছু ভেবো না।

সান্দ্রা আশ্চর্য হয়ে বলল, কিন্তু কি করে ?

লোকটা কোন কথা বলল না। কিছুক্ষণ পরে জোর গলায় সে চীৎকার করে উঠলে দূর থেকে অদ্ভুত গলায় কে যেন তার উত্তর দিল সেই রকম শব্দ করে। কিন্তু সে গলার স্বর কোন মানুষের নয়।

ওয়ারুতুরিরা ভয় পেয়ে গেল। তাদের চলার গতি মন্থর হয়ে উঠল। এইভাবে কিছুটা যেতেই গাঁয়ে বড় বড় লোমওয়ালা একদল বাঁদর-গোরিলা কোথা থেকে ছুটে এসে আক্রমণ করল নিগ্রোদের। নিগ্রো যোদ্ধারা তখন সান্দ্রাকে তুলে নিয়ে ওদের গাঁয়ের দিকে ছুটে পালাতে লাগল। বাঁদর-গোরিলারা ওদের তাড়া করে কিছুটা ছুটে এসে পরে ফিরে চলে গেল।

সান্দ্রাকে গাঁয়ের মধ্যে ওয়ারুতুরিরা নিয়ে গেলে সান্দ্রা মুতিম্বোয়াকে বলল, তুমি সর্দার, তুমি আমাকে আমার সঙ্গীদের কাছে পাঠিয়ে দাও। মুক্তিপণ হিসাবে যা চাইবে আমার বাবা তোমাকে তাই দেবে।

মুতিম্বোয়া হেসে বলল, শ্বেতাঙ্গদের কাছে আমার কাম্য কোন বস্তু থাকলে তা আমি গিয়ে জোর করে কেড়ে আনতে পারি।

গাঁয়ের মেয়েরা সান্দ্রাকে মারতে এবং তার গায়ে থুথু দিতে থাকলে মুতিম্বোয়া বলল, কাল রাতে ওকে মেরে ভোজ করব আমরা। আজ ওকে ছেড়ে দাও।

সান্দ্রা মুতিম্বোয়াকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি তাহলে আমাকে নিয়ে কি করবে ?

মুতিম্বোয়া কোন কথা না বলে রান্নার একটা বড় পাত্রের দিকে আঙুল বাড়িয়ে তার পেটটা ঘষতে লাগল।

•

রুতুরি পাহাড়ের এদিকটায় এর আগে কখনো আসেনি টারজন। সে শুধু এখানকার নাম শুনেছে। সে জানে এখানকার ওয়ারুতুরি নামে উপজাতিরা মানুষ খায়। সে তাই সাবধানে পথ চলতে লাগল। এখানে আসার তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো সেই ভণ্ড প্রতারক লোকটাকে শাস্তি

দেওয়া। আর যদি পারে ত পিকারেল নামে সেই মেয়েটাকে উদ্ধার করে তার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দেবে।

এ অঞ্চলে আসার আগে পর্যন্ত সে কারো দেখা পায়নি। এবার সে পাহাড়টা খুঁজে দেখবে। তবে সে জানত যে লোকটা মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাকে ওয়ারুতুরি গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যেতে হবেই।

রাত্রি হতেই একটা গাছের উপর উঠে শুয়ে পড়ল টারজন। রাত্রির বিচিত্র শব্দ শুনতে শুনতে ঘুম আসছিল না তার। এমন সময় ঢাকের বাজনা শুনে চমকে উঠল সে। সে বুঝল আগামীকাল রাতে ওয়ারুতুরি গাঁয়ে কোন বন্দীহত্যাকে কেন্দ্র করে নরমাংসভোজীদের এক উৎসব হবে। তার জন্য আশপাশের গাঁয়ের লোকদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে সেই ঢাকের শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল গাঁটার দিকে। তারপর একটা গাছের উপর উঠে শুয়ে পড়ল। আগামীকাল সে গাঁটায় যাবে।

পরদিন সকালে আশপাশ গাঁ থেকে বহু নারী ও পুরুষ ওয়ারুতুরি গাঁয়ে এসে ভিড় করতে লাগল। উৎসব হবে সন্ধ্যার সময়। সান্দ্রা বুঝল সে-ই হচ্ছে এই উৎসবের কেন্দ্র। সন্ধ্যে হতেই গাঁয়ের মাঝখানে এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। জায়গাটা ছিল সর্দারের কুঁড়ের সামনে। সেখানে একটা গাছ ছিল। সেই গাছের তলায় পাঁচটা ছাগল এনে রাখা হলো। গাঁয়ের যাদুকর পুরোহিত এসে মন্ত্র পড়তে পড়তে হঠাৎ জোর চীৎকার করে একটা ছাগলের গলা কেটে করুণ স্বরে গানের মত কি একটা মন্ত্র পড়তে লাগল এবং গাঁয়ের লোকরাও তাতে যোগদান করল। তারপর মরা ছাগলটার গা থেকে এক এক খণ্ড মাংস কেটে এক একজন মেয়ের হাতে দিতে লাগল। সেই মেয়েরা আবার মাংসখণ্ডগুলো একটা রান্নার পাত্রে রাখছিল।

এইভাবে পাঁচটা ছাগল কাটা হবার পর যাদুকর পুরোহিত যেমনি একটা লাফ দিয়ে ছুরি হাতে সান্দ্রার গলা কাটতে গেল মুখ দিয়ে মন্ত্র বলতে বলতে অমনি একটা বিষাক্ত তীর এসে তার বুকটা বিদ্ধ করতেই সে মাটিতে পড়ে গেল।

এমন সময় ঘরের পাশের সেই গাছ থেকে দৈত্যের মত এক শ্বেতাঙ্গ মানুষ লাফিয়ে পড়ল। কিন্তু গাঁয়ের সবাই তখন যাদুকর পুরোহিতের মৃত্যু নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সেদিকে খেয়াল করেনি। টারজন একমুহূর্তে সান্দ্রাকে তুলে নিয়ে আবার লাফ দিয়ে গাছে উঠে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। তীরবেগে রুতুরি পাহাড়ের দিকে ছুটে যেতে লাগল সে। অবশেষে পাহাড়ের ধারে একটা বনের মধ্যে নির্জন জায়গায় এসে একটা গাছের উপর উঠে বসল। সান্দ্রা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে? দা গামা ঠিকই বলেছিল, তুমি দেবতা। দেবতা না হলে কোন মানুষ নরখাদকদের হাত থেকে উদ্ধার করতে

পারত না আমাকে। তুমি গতকাল যা বলেছিলে তাই ঠিক।

টারজন গম্ভীর গলায় বলল, তুমি কি বলছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি হচ্ছি বাঁদরদলের রাজা টারজন।

সান্দ্রা ভাবল গলার স্বরটা আলাদা হলেও এ সেই টারজন যে একদিন তাকে তাদের শিবির থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল এবং যাকে আলেমতেজোদের রাজা দা গামা দেবতা বলত।

টারজন বলল, আমি হচ্ছি অন্য মানুষ, টারজন অফ দি এপস্। আমি গতকাল কেন জীবনে কখনো তোমাকে দেখিনি।

সান্দ্রা আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি তাহলে আমাকে শিবির থেকে চুরি করনি?

টারজন বলল, আমার নামে একটা ভণ্ড প্রতারক এই কাজ করেছে। আমি তাকেই খুঁজছি। সে কোথায় তা জান?

সান্দ্রা বলল, ওয়ারুতুরিরা তাকেও ধরেছিল। কিন্তু সে পালিয়ে যায়।

টারজন বলল, তার সম্বন্ধে যা জান বল।

সান্দ্রা বলল, লোকটাকে ত ভদ্র বলেই মনে হচ্ছিল। সে আমার কোন ক্ষতি করেনি।

টারজন বলল, সে তবে কেন তোমাকে চুরি করেছিল?

সে বলছিল, আলেমতেজোদের রাজা দা গামা তাকে বলেছিল একজন দেবী চাই। একজন শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে দেবী হিসাবে দেখাতে হবে। আমার মনে হয় তার মাথাটার ঠিক নেই। তবে সে বলছিল সে-ই টারজন। কিন্তু তুমিই টারজন এটা ঠিক ত?

আমিই হচ্ছি টারজন।

তুমি আমাকে উদ্ধার করলে কেন? কি করে তুমি জানলে যে আমি ওয়ারুতুরি গাঁয়ে আছি?

আমি জানতাম না। ঢাকের শব্দ শুনে বুঝতে পারি ওয়ারুতুরিদের গাঁয়ে আজ উৎসব আছে। আমি জানতাম ওরা নরখাদক আর তুমি এই অঞ্চলেই আছ। তাই আমি ঐ গাঁয়ে গিয়ে পড়ি ব্যাপারটা কি দেখার জন্য।

এখন তুমি আমাকে আমার বাবার কাছে নিয়ে যাবে ত?

হ্যাঁ নিয়ে যাব।

তুমি জান আমার বাবার সফরি কোথায় আছে?

টারজন হেসে বলল, চারজন শ্বেতাঙ্গের একটা সফরি আমাকে হত্যা করার জন্য খুঁজছে। সেটাই যে তোমার বাবার সফরি সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমার বাবার দলে শুধু মোট তিনজন লোক ছিল—আমার বাবা,

পেলহ্যাম ডাটন, আর শিকারী গাণ্ট্।

ক্রাম্প নামে একটা লোক ঐ দলে ছিল। সে আমাকে দেখেই গুলি করে। কিন্তু গুলিটা আমার গায়ে লাগেনি।

ক্রাম্প বোধহয় পরে যোগদান করেছে।

সে রাতে সান্দ্রার শোবার জন্য একটা গাছের ডালের উপর জায়গা করে দিয়েছিল। সেইখানে শুয়ে ঘুমোল সে। সকালে উঠে দেখল টারজন নেই। তবে কি টারজন তাকে ছেড়ে চলে গেছে? তার খুব খিদে পেয়েছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই টারজন কিছু ফল নিয়ে এসে তাকে খেতে দিল। বলল, তোমার খাওয়া হয়ে গেলে আমি তোমাকে তোমার দলের লোকদের কাছে নিয়ে যাব।

সেদিন সকালে ডাটনদের শিবিরে খাবার না থাকায় ক্রাম্প একা শিবির থেকে মাইলখানেক দূরে শিকার করতে গিয়েছিল। জলের ধারে একটা ঝোপের আড়ালে পশু শিকারের জন্য লুকিয়ে ছিল ক্রাম্প। হঠাৎ সে টারজন আর সান্দ্রাকে সেই পথে আসতে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। ক্রাম্প নীরবে টারজনকে লক্ষ্য করে গুলি করল। গুলিটা টারজনের মাথায় লাগতে সে পড়ে গেল। তার মাথা থেকে রক্ত ঝরছিল।

সান্দ্রা ক্রাম্পের কাছে এসে বলল, তুমি কে?

ক্রাম্প বলল, আমার নাম টম ক্রাম্প। আমি তোমাকেই খুঁজছি।

সান্দ্রা বলল, কেন তুমি ওকে গুলি করলে? ওকে তুমি হত্যা করেছ।

সে তোমাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।

সে আমাকে চুরি করেনি। সে আমাকে নরখাদকদের হাত থেকে উদ্ধার করে ডাটনের শিবিরে নিয়ে আসছিল।

যাই হোক, চলে এস। আমি তোমাকে ডাটনের শিবিরে নিয়ে যাব। এখান থেকে মাইলখানেক দূরে শিবিরটা।

সান্দ্রা বলল, ওর জন্য কিছু করবে না? দেখ একবার লোকটাকে।

ক্রাম্প হেসে বলল, যা হবার হয়ে গেছে। তুমি এখন এস আমার সঙ্গে।

সান্দ্রা আর ক্রাম্প যখন শিবিরে গিয়ে পৌঁছল তখন বিকেল হয়ে গেছে। ডাটন তখন ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে একটা হরিণ শিকার করে নিয়ে এল। সান্দ্রাকে দেখতে পেয়েই সে ছুটে এসে তার হাত ধরল।

আবেগের চাপে কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, আমি ত তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।

তার চোখে জল এসেছিল। সে বলল, কে তোমায় খুঁজে পায়?

ক্রাম্প বলল, আমি। আমি টারজনকেও দেখতে পাই। সে আর চুরি

করতে আসবে না কখনো।

সান্দ্রা বলল, সে আমাকে চুরি করেনি। আমি কতবার এই লোকটাকে তা বলেছি। সে-ই বরং আমাকে ওয়ারুতুরিদের গাঁ থেকে উদ্ধার করে গতরাতে। সে আমাকে এখানে নিয়ে আসছিল। অথচ এই লোকটা ঠাণ্ডা মাথায় শুধু শুধু গুলি করে তাকে। ডাটন, তুমি কিছু লোক নিয়ে একবার দেখবে চল। যদি মরে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে কবর দেবার অন্ততঃ একটা ব্যবস্থা করবে। জায়গাটা বেশী দূরে নয়।

ডাটন বলল, আমি এখনি যাচ্ছি।

ক্রাম্প বলল, তার আর দরকার হবে না। হায়েনা বা শকুনিরাই এতক্ষণে তাকে শেষ করে ফেলেছে।

সান্দ্রা বলল, আশ্চর্য! চল পেলহ্যাম, আমরা যাই।

ডাটন ছয়জন নিগ্রোভৃত্য সঙ্গে নিল। শিবিরের সব শ্বেতাঙ্গরাই সঙ্গে গেল। ক্রাম্প আর সান্দ্রা দুজনে জায়গাটা দেখিয়ে দিল। কিন্তু টারজনের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। জীবিত বা মৃত কোনভাবেই তাকে দেখতে পেল না ওরা। ভাবল কোন জন্তুতে হয়ত টেনে নিয়ে গেছে ওকে। কিন্তু আশপাশের ঝোপে-ঝাড়েও মৃতদেহটার খোঁজ পাওয়া গেল না।

ডাটন সান্দ্রাকে বলল, ব্যাপারটা সত্যিই রহস্যময়। একজন টারজন তোমায় চুরি করে নিয়ে গেল আর একজন টারজন তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে এল।

ক্রাম্প কণ্ঠে শ্লেষ মিশিয়ে বলল, লোকটার প্রতি তোমার দুর্বলতা আছে, আগে জানলে গুলি করতাম না। ডাটন সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ করো, তোমার অনেক বেয়াদবি আমি সহ্য করেছি।

সান্দ্রা বলল, আর ঝগড়া করে লাভ নেই। চল, শিবিরে ফিরে চল। আগামীকালই আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবে পেলহ্যাম। আমাদের সফরি গুটিয়ে বাবার কাছে চল।

ক্রাম্প বলল, আমি আর মিনস্কিও যাব তোমাদের সঙ্গে।

ডাটন বলল, তার আর দরকার হবে না।

ক্রাম্প বলল, তোমাদের দরকার না থাকলেও আমার দরকার আছে। আমার পুরস্কারের টাকাটা ত নিতে হবে।

সান্দ্রা বলল, পুরস্কার মানে?

ডাটন বলল. তোমার বাবা তোমার ও টারজনের খোঁজ পাওয়ার জন্য দেড় হাজার পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন।

সান্দ্রা ক্রাম্পকে বলল, তাহলে সে পুরস্কার এখন কেউ পাবে না। যে লোকটি পুরস্কার পাবার যোগ্য তাকে তুমি গুলি করে মেরেছ আর যে

আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল সে এখনো নিরুদ্দেশ।

ক্রাম্প বলল, ঠিক আছে, দেখা যাবে।

যাই হোক, ওরা সবাই শিবিরে ফিরে গেল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এদিকে টারজন নামধারী সেই লোকটা আর তার অনুচর একদল বাঁদর-গোরিলা শিবিরের বাইরে বনের আড়াল থেকে তাদের অলক্ষ্যে অগোচরে লক্ষ্য করতে লাগল তাদের।

টারজন নামধারী লোকটা ভেবেছিল সান্দ্রাকে নরখাদক ওয়ারুতুরিরা খেয়ে ফেলেছে। সে তাই তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। তার মনে আশা জাগে সে তাকে আবার দা গামার কাছে ধরে নিয়ে যেতে পারবে। সান্দ্রাকে হারিয়ে হতাশ হয়ে সে একজন আদিবাসী মেয়েকে ধরে নিয়ে এসেছে দা গামা যাতে তাকে ভক্ষণ করতে পেরে কিছুটা প্রীত হয়।

শিবিরে ফেরার পর শিবিরের সামনে বসে ডাটন আর সান্দ্রা তাদের অতীত অভিজ্ঞতার কথা বলাবলি করছিল। আর অন্য এক জায়গায় ক্রাম্প মিনস্কি আর গাণ্ট্র চাপা গলায় বলল কি আলোচনা করছিল নিজেদের মধ্যে।

ক্রাম্প বলল, আমি কিছুতেই পুরস্কারের টাকাটা ছাড়ব না। এটা পাওয়ার জন্য আমি এক পরিকল্পনা খাড়া করেছি।

গাণ্ট্র বলল, কি সে পরিকল্পনা?

ক্রাম্প গাণ্ট্রকে বলল, ডাটনকে কোনরকমে মেরে ফেলতে পারলেই আমি আর মিনস্কি মেয়েটাকে নিয়ে পালাতে পারব। এমনভাবে তাকে মারতে হবে যাতে মনে হবে সে দুর্ঘটনায় মারা গেছে। কেউ তাকে মারেনি। তখন তুমি ওর বাবার কাছে গিয়ে খবর দেবে তিন হাজার পাউণ্ড মুক্তিপণ দিলে আমরা তার মেয়েকে ফিরিয়ে দেব।

গাণ্ট্র বলল, এই হত্যার ব্যাপারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া ডাটন ভাল লোক। আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে।

ক্রাম্প বলল, ঠিক আছে। হত্যা করতে হবে না। ডাটন যখন ঘুমোবে তখন আমরা মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে যাব। পরদিন সকালে তুমি ডাটনকে বলবে তিন হাজার পাউণ্ড দিলেই আমরা তাকে ছেড়ে দেব। বলবে একথা আমরা শিবির থেকে যাবার আগে তোমায় বলে গিয়েছি।

গাণ্ট্র বলল, তোমরা কোথায় যাবে?

ক্রাম্প বলল, উপিণ্ডি নদীর ধারে পুঙ্গা সর্দারের গাঁয়ে। আমরা সেখানে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে দু মাস অপেক্ষা করব। তার মধ্যে তুমি টাকা নিয়ে না গেলে অন্য ব্যবস্থা করব আমরা।

গাণ্ট্র বলল, বুঝলাম।

গাণ্ট্র পুনরায় বলল, তোমরা কোথায় আছ তা আমি জানি ওরা তা

জানলে আমাকে তোমাদের দলে আছি বলে সন্দেহ করতে পারে।

ক্রাম্প বলল, আমি তোমায় খুন করতে গিয়েছিলাম।

মিনস্কি বলল, আমাকে আবার টাকা পেলে ঠকাবে না ত ?

ক্রাম্প বলল, না বিল, তোমার মত বন্ধুকে ঠকাব না।

কিন্তু ক্রাম্প তখন অন্য কথা ভাবছিল। সে যে তিন হাজার পাউণ্ড পাবার আশা করছিল তার থেকে গাণ্ট্‌ বা মিনস্কিকে কোন ভাগ দেবার ইচ্ছা ছিল না। সে মনে মনে ঠিক করেছিল টাকাটা পেলেই সে মিনস্কিকে খুন করবে। অন্যদিকে গাণ্ট্‌ ভাবছিল অন্য কথা। সে ঠিক করেছিল ডাটন বা সান্দ্রার বাবা টাকাটা যদি সান্দ্রার মুক্তিপণ হিসাবে দেয় তাহলে সে টাকা আর পুজোয় কোনদিন নিয়ে যাবে না সে। সে টাকাটা হাত করে হলিউডে চলে যাবে সোজা। মিনস্কি ভাবছিল টাকাটা ক্রাম্প পেলেই তার অর্ধেক ভাগ আদায় করে নেবে।

এরা তিনজন যখন এই সব চিন্তা করছিল তখন ডাটন আর সান্দ্রা তাদের আপন আপন ঘরে শুতে চলে গেল।

এদিকে টারজন নামধারী লোকটা সান্দ্রার উপর নজর রেখে নীরবে অপেক্ষা করে যাচ্ছিল শিবিরের বাইরে থেকে। সে দেখল গাণ্ট্‌ও শুতে চলে গেলে ক্রাম্প আর মিনস্কি নিগ্রোভৃত্যদের তাঁবুতে চলে গিয়ে তাদের কি সব বোঝাল আর সঙ্গে সঙ্গে তারা মালপত্র গুছিয়ে পশ্চিম দিকে রওনা হয়ে পড়ল তৎক্ষণাৎ।

টারজন নামধারী লোকটা ভেবেছিল মালবাহক নিগ্রোদের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গরাও শিবির ছেড়ে চলে যাবে তার সেই অবকাশে সে মেয়েটাকে নিয়ে পালাবে। কিন্তু সে যখন দেখল শ্বেতাঙ্গরা গেল না তখন সে অধৈর্য হয়ে পড়ল কিছুটা।

সান্দ্রার কিন্তু ঘুম এল না চোখে। সে শুধু টারজনের মৃত্যুর কথাটা ভাবতে লাগল বারবার। সে ভাবছিল যে লোকটি কত বীরত্ব আর সাহসের পরিচয় দিয়ে নরখাদক আদিবাসীদের হাত থেকে উদ্ধার করল তাকে, তার সঙ্গে কত ভদ্র ও মধুর ব্যবহার করে শিবিরের কাছ পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছে দিয়ে গেল সে নিজেই অকস্মাৎ পড়ে গেল মৃত্যুর কবলে।

সহসা তার ঘরের তাঁবুর পিছনের দিকটা কে তুলল। চমকে উঠে বসল সান্দ্রা। দেখল ক্রাম্প আর মিনস্কি চোরের মত চুপিসারে ঘরে ঢুকল দুজনে।

সান্দ্রা বলে উঠল, কে তুমি ? কি চাও ?

ক্রাম্প চাপা গলায় গর্জন করে উঠল, তুমি যদি চীৎকার না করো তাহলে তোমাকে আঘাত করব না। আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি এবং তুমিও আমাদের সঙ্গে যাবে।

সান্দ্রা বলল, ডাটন কোথায় ?

ক্রাম্প বলল, তার ভাগ্য যদি ভাল হয় ত সে ঘুমোবে। যদি তুমি তাকে চেঁচামিচি করে ডাক তাহলে তাকে খুন করা হবে।

সান্দ্রা বলল, তোমরা কি চাও আমার কাছে ? কোথায় নিয়ে যাবে আমায় ?

মিনস্কি বলল, শোন মেয়ে, তোমাকে আমরা এমন এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি যেখানে তোমার বাবা তিন হাজার পাউণ্ড নিয়ে না গেলে কেউ খুঁজে পাবে না তোমাকে।

সান্দ্রা ব্যাপারটা বুঝতে পারল এবার। সে ভাবল সে যদি এখন ডাটনকে ডাকাডাকি করে তাহলে তার ক্ষতি হবে। এরা বড় ভয়ঙ্কর আর দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে তাই তাদের কথায় রাজী হয়ে বলল, ঠিক আছে, আমায় পোশাকটা পরে নিতে দাও। আমি শান্তভাবেই যাব।

ক্রাম্প বলল, ঠিক আছে, আমরা অপেক্ষা করছি।

এদিকে সেই নকল টারজন শিবিরের বাইরে বাঁদর-গোরিলাদের নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ক্রাম্প, মিনস্কি আর সান্দ্রা শিবির হতে বার হবার সঙ্গে সঙ্গে নকল টারজন তার বাঁদর-গোরিলাদের নিয়ে শিবির আক্রমণ করল। গোরিলাগুলো যখন ক্রাম্প আর মিনস্কিকে ধরে কামড় দিচ্ছিল টারজন নামধারী লোকটা তখন সান্দ্রাকে ধরে তুলে নিয়ে গেল। ক্রাম্প বা মিনস্কি গুলি করার কোন অবকাশই পেল না।

গোলমাল শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল ডাটনের। সে রাইফেল হাতে নিয়ে ছুটে এসে দেখল ক্রাম্প আর মিনস্কি রক্তাক্তদেহে শুয়ে আছে। তাদের দেহের কয়েক জায়গায় ক্ষত ছিল। ডাটনকে দেখে তারা উঠল।

ডাটন তাদের জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার ?

মিনস্কি বলল, মিস পিকারেলের ঘরে একজনকে ঢুকতে দেখে আমি ক্রাম্পকে ডাকি। এমন সময় দশ-বারোটা বাঁদর-গোরিলা ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের উপর আর সেই অবসরে সেই টারজন সান্দ্রাকে তুলে নিয়ে যায়।

ক্রাম্প যখন ডাটনের সঙ্গে কথা বলছিল মিনস্কি তখন গাণ্টুর ঘরে গিয়ে তার বাঁধন খুলে দিয়ে সব কথা বলল। ওরা চলে যাবার সময় গাণ্টুকে বেঁধে রেখে যাবে এই কথাই হয়েছিল। ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে ওঠায় তার বাঁধনটা খুলে দিল। বলল, তুমি ডাটনের সঙ্গে মেয়েটার খোঁজে যাও।

ডাটন ক্রাম্পকে বলল, আমি সান্দ্রার খোঁজে যাব। তোমরা কেউ যাবে আমার সঙ্গে ?

ক্রাম্প বলল, আমি যাব না, কারণ এতে কোন ফল হবে না। একডজন বাঁদর-গোরিলার সঙ্গে পেরে উঠব না আমরা।

গাণ্ট্র বলল, আমি যাব।

গাণ্ট্রকে নিয়ে ডাটন সান্ড্রার খোঁজে বনের মধ্যে অনেকটা এগিয়ে গেল। কিন্তু ওদের কোন সন্ধান পেল না। তখন গাণ্ট্র বলল, অন্ধকারে বনের মধ্যে ওদের খোঁজ করা সম্ভব হবে না। তার চেয়ে বরং আগামীকাল সকাল পর্যন্ত শিবিরে গিয়ে অপেক্ষা করা ভাল। সকাল হলে লোকজন নিয়ে এসে খোঁজ করব।

কথাটা মেনে নিল ডাটন। তারা আবার শিবিরে ফিরে এল।

এদিকে সকাল হতেই টারজন নামধারী লোকটা তুটো মেয়েকে গলায় দড়ি দিয়ে নিয়ে যেতে লাগল আবার। তাদের মধ্যে একজন সেই আদিবাসী মেয়ে আর একজন সান্ড্রা। ওরা তুজনেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। পথ চলতে পারছিল না। তবু ওদের টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। টারজন নামধারী লোকটা ভাবছিল এখন বিশ্রামের জন্য থামা ঠিক হবে না। ওদের যেমন করে হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রুতুরি পাহাড়ের পাদদেশে সেই কাঁটাবনের কাছে গিয়ে পৌছতে হবে। তাহলে একদিকে ওয়ারুতুরি আদিবাসী আর অন্য দিকে শ্বেতাঙ্গদের তাড়া—তুদিক থেকেই নিরাপদ হবে।

সকালে রওনা হয়ে তুপুরবেলায় রুতুরি পাহাড়ের তলায় সেই কাঁটাবনের ধারে গিয়ে পৌছল। কাঁটাগাছগুলোকে এড়াবার জন্য ওরা হাতে পায়ে হেঁটে পাহাড়ের একটা চড়াই পার হয়ে একটা পথ পেল।

পথটা পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল টারজন। সান্ড্রাকে বলল, এতক্ষণে আমরা নিরাপদ। এবার আমি রাজা দা গামার কাছে নিয়ে গিয়ে তোমাকে দেবী বানাতে পারব।

সে দ্বিতীয়বার সান্ড্রাকে ধরার পর থেকে কোন কথা বলেনি। সান্ড্রার সঙ্গে এই প্রথম কথা বলল সে। সান্ড্রা বলল, কেন তুমি আমাকে নিয়ে এমন করছ? আমি ত তোমার কোন ক্ষতি করিনি।

নকল টারজন বলল, আমি ও ত তোমার কোন ক্ষতি করিনি। আমি তোমাকে দেবী করব। আলেমতেজোরা তোমাকে পূজো করবে। যা কিছু ভাল জিনিস তোমাকে পূজোর উপচার হিসাবে দেবে।

সান্ড্রা বলল, আমি একজন ইংরেজ মেয়ে, আমি দেবী হতে চাই না।

লোকটা বলল, আমি তোমার এত উপকার করছি অথচ তোমার মধ্যে কোন কৃতজ্ঞতাবোধ নেই।

আবার ওরা এগিয়ে চলতে লাগল। পথের সামনে সান্ড্রা একটা খাড়াই পাহাড় দেখতে পেল। ওটা রুতুরি পাহাড়েরই একটা অংশ। পাহাড়ের পাশে একটা খাদ ছিল। খাদটার ওপারেই একটা গেট ছিল। সান্ড্রা ভাবল ওর ওপারেই হয়ত আছে আলেমতেজোদের গাঁ।

কিন্তু টারজন নামধারী লোকটা বলল, ওটা আলেমতেজো না, ওখানে আলেমতেজোদের অভিভাবক বা গ্রামরক্ষীরা থাকে।

খাড়াই পাহাড়টার কিছু উপরে উঠে সাবধানে পা টিপে টিপে ওরা সেই ফটকটার কাছে গিয়ে পৌঁছতেই একসঙ্গে অনেকগুলো সিংহের গর্জন শুনতে পেল সান্দ্রা। সে লোকটাকে বলল, সিংহ।

লোকটা বলল, সিংহগুলো খাদের মধ্যে আছে। ওরা আমাদের ধরতে পারবে না।

খাদটার পাশ দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ওরা এগোতে লাগল। একদল বাঁদর-গোরিলা একটা নিগ্রো মেয়ের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। সহসা ওরা নিগ্রো মেয়েটাকে খাদের মধ্যে জোর করে ফেলে দিতে একটা আর্ত চীৎকার শুনতে পেল সান্দ্রা। ক্ষুধিত সিংহগুলো মেয়েটাকে টেনে ছিঁড়ে খেতে লাগল। সেদিকে ভয়ে তাকাতে পারল না সান্দ্রা।

সে টারজন নামধারী লোকটাকে বলল, তোমরা পশু। এ কাজ কেন করলে ?

লোকটা বলল, আমি পশু নই। কোন অন্যায় করিনি। আলেমতেজোদের অভিভাবকদের খাবার দিতে হবে ত।

সান্দ্রা বলল, এরপর ত আমার পালা। আমাকেও ত ফেলে দেবে ঐভাবে।

লোকটা বলল, না। তোমার কথা স্বতন্ত্র, কারণ তুমি দেবী।

সান্দ্রা দেখল আর পথ নেই। ওরা আবার একটা খাড়াই পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পড়েছে। ডান দিকে দুরতিক্রম্য খাড়াই পাহাড়, বাঁদিকে গভীর খাদ। তাতে সিংহগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাহাড়টার এক জায়গায় একটু চওড়া ছিল। বাঁদর-গোরিলাগুলো কোনরকমে ওদের উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। সান্দ্রা ভাবছিল যে পাহাড়ের গায়ে কোন কিছু ধরার বা পা রাখার মত জায়গা নেই সেই পাহাড়ের মাথায় কি করে ওরা উঠবে ? একমাত্র গিরগিটি, টিকটিকি অথবা মাছি ছাড়া কোন জীব সে পাহাড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু বাঁদর-গোরিলাগুলো আর সেই টারজন নামধারী লোকটা বেশ উঠে যাচ্ছিল। তারা আগে কিছুটা উঠে সান্দ্রাকে টেনে তুলছিল।

কিন্তু সে পাহাড়ের ভয়াবহ উচ্চতার কথা ভেবে আর উঠতে মন চাইছিল না সান্দ্রার। সে ভাবছিল যে সে পড়ে যাবে ইচ্ছে করে। সে উপর থেকে লাফিয়ে পড়বে।

কিন্তু তার আর দরকার হলো না। একসময় একটা বাঁদর-গোরিলা সান্দ্রাকে হাত ধরে টেনে তুলতে গিয়ে তার ভার সামলাতে না পেরে পড়ে গেল। সান্দ্রাও পড়ে গেল তার সঙ্গে।

চতুর্থ অধ্যায়

বনের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। তার উপর টারজনের অচেতন দেহটা পড়ে ছিল। তাকে ঘিরে দশ-বারোটা বাঁদর-গোরিলা বসে কথা বলছিল।

গয়ান বলল, মারা গেছে।

উঙ্গো বলল, না, মরেনি।

জুখো টারজনের দেহটা ধরে নাড়া দিল। একটা মেয়ে বাঁদর-গোরিলা মুখে করে কিছুটা জল নিয়ে এসে টারজনের কপালে ও চোখে মুখে দিয়ে দিল। টারজন ধীরে ধীরে চোখের পাতা খুলল। সে কোথায় আছে তা একবার দেখে নিয়ে বলল, উঙ্গো, কি ঘটেছিল?

উঙ্গো বলল, একটা টার্মাঙ্গানী অর্থাৎ একটা শ্বেতাঙ্গ তোমাকে বন্দুক থেকে গুলি করেছিল। টারজন পড়ে গেল আর উঙ্গো তাকে তুলে নিয়ে এল।

টারজন এবার ভাবতে লাগল কে তাকে গুলি করেছিল। তার এবার মনে পড়ল ক্রাম্পকে সে দেখতে পেয়েছিল। এবার তার আর বুঝতে বাকি রইল না যে ক্রাম্পই তাকে আবার গুলি করেছে। সে বলল, সেই মেয়েটি কোথায়?

উঙ্গো বলল, সে টার্মাঙ্গানীর সঙ্গে চলে গেছে।

টারজন আশ্বস্ত হলো। মেয়েটি তাহলে তার দলের লোকদের কাছে তাদের শিবিরেই ফিরে গেছে। তবে সে একবার সেই ভণ্ড প্রতারক লোকটাকে ধরার সংকল্প করল মনে মনে যে লোকটা এই সবকিছুর জন্য দায়ী।

টারজনের মাথায় গুলির আঘাতে একটা ক্ষত হয়েছিল। কিন্তু মাথার হাড় বা খুলিটা ভাঙেনি। দিনকতকের মধ্যেই সেরে উঠল সে। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠায় টারজন একদিন উঙ্গোকে বলল, আচ্ছা টারজনের মত নগ্ন হয়ে টারজনের নাম ধারণ করে একটা শ্বেতাঙ্গ ঘুরে বেড়ায়। তুমি তাকে দেখেছ?

উঙ্গো বলল, দুবার দেখেছি লোকটাকে। সে একদল বাঁদর-গোরিলার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়।

টারজন বলল, সে কোন্‌দিকে গেছে?

উঙ্গো দূরে রুতুরি পাহাড়ের ধারে কাঁটাবনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখাল।

টারজন বলল, সেখানে আমাকে নিয়ে যাবে?

উঙ্গো তার দলের বাঁদর-গোরিলাদের সঙ্গে আলোচনা করল। তারা যেতে চাইছিল না, তারা অনেকদিন আগে শিকারে বেরিয়েছে, ডেরায় ফিরে যাবার

অন্তঃ শান্ত হয়ে উঠেছিল। তবু উজোর কথায় তারা রাজী হলো অবশেষে। সুতরাং পরদিনই টারজন বাঁদর-গোরিলাদের সঙ্গে নিয়ে কুতুরি পাহাড়ের দিকে রওনা হয়ে পড়ল।

সান্দ্রা দেখল তাকে টেনে তুলতে গিয়ে যে বাঁদর-গোরিলাটা পড়ে যায় সে খাদের মধ্যে সিংহগুলোর মাঝে পড়ে গেছে। কিন্তু সান্দ্রা পড়তে পড়তে পাহাড়ের গায়েই এক জায়গায় আটকে যায়। সেখান থেকে খাদের নিচের দিকে তাকিয়ে সান্দ্রা দেখতে পেল সিংহগুলো সেই নিগ্রো আদিবাসী মেয়েটার দেহটাকে ছিঁড়ে খাচ্ছে।

সান্দ্রা দেখল পাহাড়ের গায়ে একটা জায়গায় টারজন নামধারী লোকটা একটা বাঁদর-গোরিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাকে দেখছে। লোকটা তার দড়িটা সান্দ্রার উপর ফেলে দিয়ে বলল, এই দড়িটা তোমার কোমরে বেঁধে নাও। আমি আর সাঁচো নামে এই গোরিলাটা দুজনে মিলে তোমায় টেনে তুলব।

সান্দ্রা সঙ্গে সঙ্গে কোমরে দড়িটা বেঁধে নিল। ওরা দুজনে দড়িটা ধরে সান্দ্রাকে টেনে তাদের কাছে তুলে নিল। সান্দ্রা লোকটার পাশে এসে দাঁড়াল। পাহাড়ের সেইখানটায় দাঁড়াবার মত একটুখানি জায়গা ছিল। সেখানে থেকে পাহাড়ের মাথায় ওঠা খুব একটা শক্ত হবে না। সবচেয়ে কঠিন আর কষ্টকর পথটা পার হয়ে এসেছে।

লোকটা সান্দ্রাকে বলল, তুমি খুব সাহসের পরিচয় দিয়েছ।

সান্দ্রা বলল, কিন্তু বাঁদর-গোরিলাটা খাদে পড়ে মারা গেল।

লোকটা বলল, হ্যাঁ ফার্নান্দো খুব ভাল ছিল। ওরা হলো দেবতার সেবক। কিন্তু ওর জীবন বৃথা যাবে না। আলেমতেজোর অভিভাবকদের খাবার চাই ত। ওরা সবসময়ই ক্ষুধার্ত থাকে। ঠিকমত খাবার পায় না। এক একসময় ওরা নিজেদের মধ্যে একজনকে মেরে খেয়ে ফেলে।

আরো কিছুটা উপরে উঠে ওরা একটা ঘাসে ঢাকা জায়গা পেল। টারজন নামধারী লোকটা সান্দ্রাকে বলল, এইখানে শুয়ে কিছুটা বিশ্রাম করে নাও। এখন তুমি নিরাপদ। আমি এখন নিশ্চিন্ত। তুমি যখন আমার কাছে থাক তখন আমার খুব ভাল লাগে। কেন তা জানি না।

একটু চুপ করে থেকে লোকটা আবার বলতে লাগল, আমি যখন তোমাকে প্রথম দেখি তখন আমি তোমাকে দেবী করতে চাইনি। আমি তোমাকে এখানে আনতে চাইনি। আমি জানি তুমি আমাকে ঘৃণা করো। তবু আমি তোমাকে পেয়ে খুবই খুশি। তোমাকে পাওয়ার আগে আমি কখনো এ সুখ অনুভব করিনি।

সান্দ্রা বলল, কিন্তু তুমি আমাকে এখানে না এনে আমার বাবার শিবিরে

থেকে যেতে পারতে ।

লোকটা বলল, আমি না গেলে দা গামা খুব রেগে যেত।

সান্দ্রা বলল, তুমি সেখানকার লোক নও। সেখানে যাবার কোন যুক্তি নেই তোমার। তোমার কথা মোটেই বুঝতে পারছি না আমি। সত্যিই তুমি বড় অদ্ভুত লোক।

লোকটা বলল, হ্যাঁ, আমি নিজেকে নিজেই বুঝতে পারি না। সত্যিই আমি একটা অদ্ভুত লোক। তুমি আমাকে পাগল মনে করো। তাই না?

সান্দ্রা বলল, তুমি এমন কতকগুলো কাজ করেছ যার মধ্যে কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। তুমি আমাকে দুবার আমার বাবা ও সঙ্গীদের কাছ থেকে ধরে এনেছ। অথচ আমার সঙ্গে সদয় ব্যবহার করছ। আবার নিগ্রো মেয়েটিকে সিংহদের মুখে ফেলে দিলে।

লোকটা বলল, মেয়েটা নরখাদক ছিল। তোমরা সভ্য মানুষ হয়েও হরিণ মেরে খাও, সুতরাং সিংহরা মানুষ খাবে সেটা আর বেশী কথা কি?

সান্দ্রা বলল, যাই হোক, আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না।

লোকটা বলল, আমি তোমাকে পছন্দ করি, ভালবাসি। আমি চাই তুমিও আমাকে ভালবাসবে।

সান্দ্রা বলল, তুমি কিকরে আশা কর যে যে লোক আমাকে চুরি করে এনেছে এবং এই ভয়ঙ্কর জায়গায় এনে বন্দী করে রাখতে চাইছে তাকে আমি ভালবাসব?

লোকটা বলল, আলেমতেজো জায়গা হিসাবে খারাপ নয়। সেখানে আমার কোন বন্ধু নেই। আমি দেবতা, আমার সঙ্গে কেউ মেশে না। সেখানে তুমি হবে আমার একমাত্র বন্ধু।

এরপর কথা বন্ধ করে ওরা পাহাড় পার হয়ে ওদিকে একটা নদীর ধার দিয়ে সামনের একটা বনকে লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল। ক্রমে বনের মধ্যে ঢুকে মাইলখানেক এগিয়ে যাবার পর ফাঁকা জায়গার উপর এক বিরাট প্রাসাদ দেখতে পেল সান্দ্রা। তার মনে পড়ে গেল এর আগে একবার তার বাবার সঙ্গে এক শিকার অভিযানে আবিসিনিয়ায় গিয়ে জেনেছিল পর্তুগীজ যাজক ফাদার পেদ্রো দিয়াজের দ্বারা সপ্তম শতকের প্রথম দিকে নির্মিত হয় এই প্রাসাদ।

সান্দ্রা আরো বলল, এ প্রাসাদও হয়ত পর্তুগীজদের দ্বারাই নির্মিত। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল রাজা দা গামার নামটাও পর্তুগীজ মন্দিরের প্রধান পুরোহিত রুইজ আর দেবতার অন্যতম সেবক মৃত ফার্নান্দো নামটাও পর্তুগীজ। একটা রহস্য দানা বেঁধে উঠল তার মনে।

পঞ্চম অধ্যায়

সকালে উঠে ডাটন সান্দ্রার খোঁজে যাবার জন্য প্রথমে নিগ্রোভৃত্যদের সর্দারকে ডাকল। বলল, তোমাদের সকলকে যাবার জন্য তৈরী হতে বল। প্রাতরাশ খাওয়ার পরই রওনা হতে হবে।

এরপর সে দুজন শ্বেতাঙ্গকে ডাকল। ক্রাম্প আগেই উঠেছিল।

কিন্তু সর্দার নিগ্রোভৃত্যদের পেল না। সে এসে ডাটনকে বলল, ওরা ভয় পেয়ে গত রাতে শিবির ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

ডাটন আশ্চর্য হয়ে বলল, ভয়। কিসের ভয়?

সর্দার বলল, ওরা টারজন আর বাঁদর-গোরিলাদের ভয় করছে। টারজনকে চটাতে চায় না ওরা। তার উপর ওয়ারুতুরিদের ওরা ভয় করে। কারণ তারা মানুষ খায়। ওরা বাড়ি থেকে অনেকদিন এসেছে। ফিরে না গেলে ওদের শাস্তি পেতে হবে। আমার মনে হয় খোঁজ করতে না যাওয়াই ভাল।

ডাটন বলল, ওরা আমাদের অনেক খাবার ও জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। এদের দেখা পেলে শাস্তি দেওয়া হবে।

ক্রাম্প বলল, ভয়ের কিছু নেই। টারজনকে আমি মেরে ফেলেছি। আর ওয়ারুতুরিদের গাঁ দিয়ে আমরা যাব না।

সর্দার বলল, আমি ওদের বুঝিয়ে বলব। তবে আমার মতে না যাওয়াই ভাল।

গাণ্ট্র বলল, আমার মনে হয় ওর মনের মধ্যে কুমতলব আছে। ওর চোখের দৃষ্টিটা ভাল লাগছে না।

ক্রাম্প বলল, তুমি চাইলে ফিরে যেতে পার। কিন্তু আমি পুরস্কারটা ছাড়তে পারব না।

মিনস্কি বলল, আমিও ছাড়ব না।

ডাটন বলল, আমিও সান্দ্রাকে খুঁজে বার না করে ছাড়ব না।

অবশেষে টারজন শ্বেতাঙ্গ আর কিছু বিক্ষুব্ধ নিগ্রোভৃত্য মিলে সান্দ্রার খোঁজে বার হলো। সর্দার নিগ্রোভৃত্যদের কোনরকমে রাজী করালেও তারা বিক্ষুব্ধ ছিল মনে মনে। সর্দার নিজেও ক্ষুব্ধ ছিল। সে নীরবে পথ চলছিল। নিগ্রোরাও কোন হাসাহাসি বা গান না করে নীরব গাম্ভীর্যে পথ হাঁটছিল। ডাটন সবার সামনে ছিল। ক্রাম্প আর মিনস্কি নিগ্রোভৃত্যদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তারা।

তারা দুপুরবেলায় এক জায়গায় একটু বিশ্রাম করে নিয়ে আবার যাত্রা

শুরু করল। বিকালের দিকে একজন নিগ্রোযোদ্ধাকে দেখতে পেয়ে ক্রাম্প গুলি করল তার রাইফেল থেকে।

ক্রাম্প আর গাণ্ট্র মৃতদেহটা পরীক্ষা করে বলল, ওর দাঁতগুলো দেখ, ওরা নরখাদক। ওর গায়ে কত সোনার গয়না।

সর্দারও বলল, হ্যাঁ, ওয়ারুতুরিরা নরখাদক।

সর্দার ও তার নিগ্রোভৃত্যরা ভয় পেয়ে গেল।

রাতের মত ওরা একজায়গায় শিবির স্থাপন করল। কিন্তু পরদিন সকালে শিবিরে একটা নিগ্রোভৃত্যকেও পাওয়া গেল না। সর্দারও নেই। ক্রাম্প পাগলের মত গালাগালি করতে লাগল। বলল, ওরা আমাদের সব খাবার আর বেশীর ভাগ গুলি নিয়ে পালিয়েছে রাত্রিবেলায়।

গাণ্ট্র বলল, তুমি নরখাদক ওয়ারুতুরিকে মারার পরই তারা ভয় পেয়ে যায়। ওদের ভয় পাওয়া স্বাভাবিক।

ক্রাম্প বলল, তুমি তাতে রাগ করেছ ?

গাণ্ট্র বলল, রাগ করিনি। কিন্তু আমি আফ্রিকার জঙ্গলে অনেকদিন আছি। আমি জানি নরখাদকরা কত ভয়ঙ্কর। আমি ওদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি। একবার ওরা বসন্ত রোগে মরা মানুষদের কবর থেকে তুলে তাদের মাংস খেয়েছিল। আমার মনে হয় আমাদের ফিরে যাওয়াই ভাল।

ক্রাম্প বলল, তার মানে পুরস্কারটা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে ?

ডাটন বলল, তার মানে মিস পিকারেলের খোঁজ না করেই ফিরে যাব ?

গাণ্ট্র বলল, আমরা চারজনে এই দেশ থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারব না। আর মিস পিকারেলকে খুঁজে পাবার কোন সম্ভাবনাও নেই। টারজন আর তার বাঁদর-গোরিলাদের দেখা পেলেও তাদের কবল থেকে তাকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

ডাটন বলল, তুমি ফিরে যাও। আমি একা যাব।

ক্রাম্প বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

গাণ্ট্র বলল, কতকগুলো পাউণ্ডের জন্য তোমরা সবকিছু করতে পার।

ক্রাম্প বলল, শুধু কতকগুলো পাউণ্ডের কথা নয়। ওয়ারুতুরিটার গায়ে কত সোনার গয়না দেখেছ ? আমার মনে হয় রুতুরি পাহাড়ের কোন এক জায়গায় ভাল ভাল সোনা আছে। ওরা যদি সে সোনা পায় আমরাই বা পাব না কেন ?

গাণ্ট্রকে মিনস্কি বলল, তুমি একা কিছুতেই ফিরে যেতে পারবে না।

গাণ্ট্র বলল, আমি একা ফিরে যাব না। আমি তোমাদের সঙ্গেই যাব। তবে আমাকে পুরস্কার ও সোনা পাওয়া গেলে তার ভাগ দিতে হবে।

ক্রাম্প বলল, এই সোনা সম্বন্ধে অনেক গল্প শোনা যায়। শোনা যায়

হাজার খানেক সিংহ সোনার জায়গাটা পাহারা দিয়ে রেখেছে। আর আছে ছুটো উপজাতি।

মিনস্কি বলল, তাহলে ওয়ারুতুরিরা কিকরে সে সোনা পায় ?

ক্রাম্প বলল, সেই উপজাতিদের দেশে লবণ আর লোহার বড় অভাব। ওরা তাই ওয়ারুতুরিদের কাছ থেকে সোনার বিনিময়ে লবণ আর লোহা নেয় আর ওয়ারুতুরিরা আবার হাতির দাঁতের বিনিময়ে লবণ আর লোহা যোগাড় করে।

গাণ্ট্র বলল, কিন্তু কিকরে সোনা পাবে তুমি ?

ক্রাম্প বলল, আমার মনে হয় রুতুরি পাহাড়ের উপর কোন এক জায়গায় সোনা আছে।

গাণ্ট্র এবার ডাটনকে বলল, তোমার মতলব কি ? তুমি কি করবে ?

ডাটন বলল, আমি মিস পিকারেলের খোঁজে যাব ওখানে। আমার মতে ওখানেই ওকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওরা যাবে সোনার খোঁজে। সুতরাং আমাদের পথ একই, লক্ষ্য যাই হোক। তোমরা যদি আমাকে অনুসন্ধানকার্যে সাহায্য করো তাহলে আমিও তোমাদের সাহায্য করব। আমাদের মোট চারটে রাইফেল থাকবে। একটার থেকে চারটে বন্দুকের দাম আছে আর তার জোরও বেশী।

মিনস্কি বলল, হ্যাঁ, সেই কথাই ভাল।

গাণ্ট্র বলল, তবে একটা কথা। আমাদের খাবার নেই। খাবার জন্য শিকার করতে হবে।

পরদিন সকালে শিকারের খোঁজে শিবির থেকে চারজন চারদিকে বেরিয়ে গেল। ডাটন গেল পশ্চিম দিকে। কিন্তু খালি পেটে পথ চলা যায় না। তাই বাধ্য হয়ে শিকারে যেতে হলো তাকে।

বনের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় এসে চারদিকে শিকারের আশায় তাকাচ্ছিল ডাটন। কিন্তু কোথাও কোন শিকারের সন্ধান পেল না। সে ভাল শিকারী নয়। তার কান আর নাক তত সজাগ ছিল না। সে বুঝতে পারেনি তার পিছন দিকে একটা ঝোপের আড়ালে একটা ক্ষুধার্ত সিংহ ওৎ পেতে বসে আছে।

এবার সিংহটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে ডাটনের পিছনে চুপ করে বসে রইল।

পিছন ফিরে সিংহটাকে দেখতে পেয়েই একটা গাছের কাছে ছুটে চলে গেল ডাটন। কিন্তু সে দেখল গাছের সবচেয়ে নিচু ডালটা দশ ফুট উপরে। সে তাই উঠতে পারল না। সে তার রাইফেল থেকে গুলি করল। গুলিটা সিংহের গায়ে লেগে সে উল্টে পড়ে গেলেও ডাটনকে ধরার জন্য লাফ দিল।

ডাটন আবার গুলি করল কিন্তু গুলিটা এবার লাগল না। সিংহটা এবার ডাটনের উপর ঝাঁপ দেবার জন্য উদ্যোগ করতেই ডাটন দেখল নগ্নপ্রায় এক শ্বেতাঙ্গ সেই গাছটা থেকে লাফিয়ে পড়ল সিংহটার ঘাড়ের উপর। তার পিঠের উপর উঠে তার পাদুটো সিংহটার পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তার ছুরিটা বারবার বসিয়ে দিতে লাগল তার গায়ে।

ডাটনের রাইফেলের গুলিতে আগেই জখম হয়েছিল সিংহটা। এবার টারজনের ছুরির আঘাতে সে লুটিয়ে পড়ল। এবার তার মৃতদেহটার উপর একটা পা রেখে আকাশের দিকে মুখ তুলে বাঁদর-গোরিলাদের মত বিজয়-সূচক চীৎকার করল। ডাটন তা দেখে ভয় পেয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে টারজনের মুখ থেকে সেই ভয়ঙ্কর পাশবিক ভাবটা চলে গেল। সে মৃদু হেসে ডাটনকে বলল, তোমার নাম পেলহ্যাম ডাটন?

ডাটন বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি আমার নাম জানলে কিকরে? তুমি কে?

টারজন বলল, আমিই বাঁদরদলের টারজন। তোমার কথা মেয়েটি আমাকে বলেছিল।

ডাটন বলল, কোন্ টারজন?

টারজন বলল, টারজন একটাই আছে। অন্য একটা লোক আমার নাম নিয়ে কুকর্ম করে বেড়াচ্ছে। আমি তাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ডাটন বলল, তুমিই তাহলে মিস পিকারেলকে উদ্ধার করেছিলে এবং তোমাকেই ক্রাম্প গুলি করেছিল?

টারজন বলল, হ্যাঁ, ক্রাম্প আমায় গুলি করেছিল। সে অত্যন্ত দুষ্ট প্রকৃতির লোক। সে শুধু পুরস্কার আর প্রতিশোধের কথা ভাবছে। আমি তাকে একদিন হাতে পাবই। কিন্তু তুমি একা বনের মধ্যে কি করছিলে?

ডাটন বলল, নিগ্রোভৃত্যরা আমাদের সব খাবার নিয়ে পালিয়েছে শিবির ছেড়ে। তাই শিকার করতে বেরিয়েছিলাম।

টারজন বলল, শিবিরে আর কে কে আছে? ক্রাম্প, মিনস্কি আর গাণ্ট্?

ডাটন বলল, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি কিকরে ওদের নাম জানলে?

টারজন বলল, মেয়েটি আমাকে সব বলেছিল। বলেছিল একমাত্র তোমাকেই সে বিশ্বাস করে।

ডাটন বলল, আমিও ক্রাম্প আর মিনস্কিকে বিশ্বাস করি না। সম্প্রতি গাণ্ট্কেও ভাল মনে হচ্ছে না, কারণ ও প্রায়ই ওদের সঙ্গে চুপি চুপি সলা-পরামর্শ করে। ওদের সবার লোভ পুরস্কারটার উপর। এখন আবার ক্রাম্প বলছে রুতুরি পাহাড়ে ভাল ভাল সোনা আছে।

টারজন বলল, কিন্তু সে সোনা ওরা কোনদিনও পাবে না। মেয়েটি এখন শিবিরে আছে ত?

ডাটন বলল, টারজন নামধারী একজন শ্বেতাঙ্গ কয়েকটা বাঁদর-গোরিলা নিয়ে এসে তাকে আবার চুরি করে নিয়ে গেছে শিবির থেকে।

টারজন বলল, তোমরা তার খোঁজে বেরিয়েছ?

ডাটন বলল, হ্যাঁ।

টারজন বলল, তাহলে আমরা একই পথের পথিক। আমি আমার নামধারী সেই লোকটাকে খুঁজে বার করবই। আমি তাকে শেষ করব।

ডাটন বলল, তাহলে আমাদের সঙ্গে যাবে?

টারজন বলল, না, আমি একা যাব। তোমার সঙ্গীদের আমার ভাল লাগে না। ওরা আমায় হত্যা করার চেষ্টা করবে পুরস্কারের লোভে।

ডাটন বলল, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে যাব। তুমি লোকটাকে খুঁজে বার করবে আর তাহলেই আমি মিস পিকারেলকে খুঁজে পাব। আমার সঙ্গীরা শুধু সোনার খোঁজ করবে। তারা আমাকে সাহায্য করবে না।

টারজন বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। তাহলে তুমি আমার সঙ্গে আসতে পার। কিন্তু তুমি শিবিরে যাবে না একবার?

ডাটন বলল, না, আমার যা কিছু জিনিসপত্র আমার কাছেই আছে। ওদের সঙ্গে আমি আর দেখাও করতে চাই না। ওরা আমার কথা মোটেই ভাববে না।

ডাটন টারজনের সঙ্গে যোগ দিল। তখনি যাত্রা শুরু করল ওরা। সেই ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে বনের মাঝে ঢুকে একটা পথ পেল। কিছুদূর গিয়েই একদল বাঁদর-গোরিলা দেখে গুলি করতে যাচ্ছিল ডাটন। কিন্তু টারজন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ওরা তোমার কোন ক্ষতি করবে না। ওরা আমার বন্ধু। ওদের আমি বুঝিয়ে বলব।

টারজন বাঁদর-গোরিলাদের ভাষায় তাদের সঙ্গে কথা বলে সব বুঝিয়ে দিল। তখন সব বাঁদর-গোরিলাগুলো ডাটনের কাছে এসে তার গা'টা শুঁকে এবং তার গায়ে হাত দিয়ে চলে গেল।

ডাটন বলল, ক'দিন ধরে আমরা মাংস পাইনি। শুধু কিছু ফল খেয়ে আছি।

টারজন তখনি চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সে একটা হরিণ মেরে নিয়ে এসে ডাটনকে বলল, আগুন জ্বালাও।

ডাটন আগুন জ্বালিয়ে তার খাবার মাংসটা আগুনে ঝলসিয়ে সিদ্ধ করে নিল। টারজন বাঁদর-গোরিলাদের সঙ্গে কাঁচা মাংস ছুরি দিয়ে কেটে খেয়ে নিল। তা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে।

খাওয়ার পর রাত্রি হলে টারজন ডাটনকে বলল, তুমি থাক, এইখানেই শুয়ে পড়। বাঁদর-গোরিলাগুলো পাহারা দেবে। কোন বিপদ দেখলে তোমাকে

জাগিয়ে দেবে। আমি এক জায়গায় যাচ্ছি। এখনি ফিরে আসব।

এদিকে ক্রাম্প, মিনস্কি আর গাণ্ট্ শিবিরে ফিরে এসে দেখল ডাটন ফেরেনি। তারা কেউ কোন শিকার পায়নি। সবাই শুধু কিছু করে ফল এনেছিল যোগাড় করে। তাই খেয়ে আগুন জালল শিবির পাহারার জন্য।

ক্রাম্প বলল, ডাটন না আসুক। বাঁচা গেছে।

গাণ্ট্ বলল, লোকটা কিন্তু ভালই ছিল।

মিনস্কি বলল, আমি কোন ধনী লোককেই দেখতে পারি না। ওরা পুঁজিপতি, গরীবদের রক্ত চোষাই ওদের কাজ।

ক্রাম্প গাণ্ট্কে বলল, তোমরা শুয়ে পড়। আমি চার ঘণ্টা আগুনের পাশে বসে পাহারা দেব। তারপর গাণ্ট্কে জাগাব। তারপর সে আবার মিনস্কিকে জাগিয়ে দেবে।

কিন্তু ওরা শুয়ে পড়তেই বনের ভিতর থেকে অদৃশ্য অবস্থায় কে ওদের উদ্দেশ্যে বারবার বলতে লাগল, তোমরা ফিরে যাও। বাঁচতে চাও ত ফিরে যাও। তা না হলে মৃত্যু তোমাদের অনিবার্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সান্দ্রা যা ভেবেছিল তা নয়। আলেমতেজো জায়গাটা তেমন খারাপ নয়। সে ভেবেছিল লোকটার মাথার ঠিক নেই অথবা সে মিথ্যা কথা বলছে। হয়ত সে তাকে কৃষ্ণকায় সুলতানের হাতে তুলে দেবে।

প্রাসাদটার কাছে গিয়ে সান্দ্রা বলল, এইটাই কি রাজপ্রাসাদ এ দেশের ?

লোকটা বলল, হ্যাঁ, আলেমতেজোর রাজা ক্রীস্টোফোরো দা গামার প্রাসাদ।

প্রাসাদটার চারদিকে কোন বাড়ি নেই। টারজন নামধারী লোকটা গেটের কাছে গিয়ে প্রহরীকে বলল, গেট খুলে দাও। রাজাকে গিয়ে খবর দাও আমি ফিরে এসেছি এবং সঙ্গে একজন দেবীকে এনেছি।

প্রহরী তাকে দেখে বলল, ও দেবতা ? এস এস।

তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে গেট খুলে দিল প্রহরী। ভিতরে ঢুকে সান্দ্রা দেখল চকোলেট রঙের অনেক সৈনিক সোনার শিরস্ত্রাণ মাথায়, সোনার বর্ম পরে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদের উঠোনে। তাদের লালচে রঙের পাগুলো হাঁটু পর্যন্ত অনাবৃত। শুধু পায়ে একজোড়া করে স্যাণ্ডেল-ছিল। তাদের হাতে ছিল তরবারি আর যুদ্ধে ব্যবহারযোগ্য একধরনের কুড়ুল। কয়েকজন

সৈনিকের হাতে একটা পুরনো আমলের বন্দুক ছিল। কিন্তু বন্দুকে কোন গুলি ছিল না। কারণ চারশো বছর ধরে আলেমতেজোতে বন্দুকে গুলি বলতে কোন জিনিস ছিল না।

রাজার দরবারঘরে যাবার জন্য উঠোনের ভিতর দিয়ে যাবার সময় সান্দ্রা দেখল একটা বড় বাগানে অনেক নারী পুরুষ কাজ করছে। ওদের গাগুলো সব চকোলেট রঙের। পুরুষদের মাথায় টুপী রয়েছে। মেয়েদের কোমর থেকে উপরের গা-টা অনাবৃত।

টারজন নামধারী লোকটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সব নারী ও পুরুষ নতজানু হয়ে বুকের উপর হাতদুটো ক্রসের মত করল। সান্দ্রা বুঝল, ওরা সত্যি সত্যিই লোকটাকে দেবতা ভাবে। এটা ওদের বিশ্বাস। কিন্তু তার মনে হলো, লোকটার মত এরা সবাই পাগল, অপ্রকৃতিস্থ।

দরবার হলের সামনে গিয়ে ওরা একজন সাদা গাউনপরা মালা হাতে যাজককে দেখতে পেল। ওরা ওদের দরবারঘরের দিকে নিয়ে গেল।

টারজন নামধারী লোকটা ও সান্দ্রাকে ঘরের ভিতর একটি মঞ্চের দিকে যখন যাজকরা সম্ভ্রমের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল তখন ঘরের উপস্থিত সকলে তাদের পথের দুধারে নতজানু হয়ে সম্মান দেখাল।

মঞ্চের উপর তিনটে চেয়ারের সিংহাসন ছিল। যাজকরা সেই লোকটা আর সান্দ্রাকে দুদিকের দুটো চেয়ারে বসিয়ে দিল। মাঝখানের চেয়ারটা শূন্য রইল।

হঠাৎ বাজনা বাজাতে বাজাতে সারবন্দীভাবে একদল যাজক ঘরে ঢুকল। তাদের পিছনে মাথায় সোনার মুকুটপরা একটি স্থূলকায় লোক জমকালো পোশাকে সজ্জিত হয়ে আসছিল। তার পিছনে ছিল অনেক সৈনিক। তাদের মাথায় ছিল শিরস্ত্রাণ আর গায়ে বর্ম। তাদের হাতে ছিল দুদিকে ধারওয়ালা তরবারি। মিছিলটা মঞ্চের কাছে গিয়ে থেমে গেল। মুকুটপরা মোটা লোকটা মঞ্চের উপর উঠে সান্দ্রার সামনে কিছুটা নত হয়ে বুকের উপর হাতদুটো ক্রসের মত করল। তারপর তথাকথিত দেবতার সামনে গিয়েও এইভাবে সম্মান দেখিয়ে মাঝের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

এরপর কালো পোশাকপরা প্রধান পুরোহিত রুইজের নেতৃত্বে আর একটি মিছিল এল। এটি হলো পুরোহিত ও যাজকদের মিছিল। এরপর রাজার সাত রাণী জমকালো পোশাক পরে ঘরে ঢুকে মোষ আর সিংহের চামড়া পাতা ঘরের মেঝের উপর বসে পড়ল।

মঞ্চের সামনে যে একটা বেদী ছিল তার সামনে এসে রুইজ মন্ত্র পড়তে পড়তে জলন্ত আগুনে পোড়া চুল দিয়ে তৈরী একধরনের পাউডার ফেলে দিচ্ছিল। রুইজ যেসব মন্ত্র পড়ছিল দুর্বোধ্য ভাষায় তার মধ্যে কিবুকা

অর্থাৎ যুদ্ধের দেবতা ওয়ালাম্বো অর্থাৎ মৃত্যুর দেবতা এবং মিজিমো অর্থাৎ মৃত আত্মা—এই কথাগুলো বারবার বলছিল। ঘরের মধ্যে যে সব লোক আসা যাওয়া করছিল বা দর্শক হিসাবে দাঁড়িয়ে বা বসে ছিল তাদের দেখে সান্দ্রার মনে হলো পর্তুগীজ আর কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের সংমিশ্রণে এই উপজাতির সৃষ্টি হয়েছে।

সান্দ্রা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ক্ষিদের জ্বালায় তার পেট জ্বলছিল। তার কিছুই ভাল লাগছিল না। তখনো বাজনা বেজে চলেছিল। হঠাৎ সান্দ্রা দেখল একদল নাচিয়ে এসে বেদীর কাছে নাচতে লাগল। ওদিকে কয়েকজন সৈনিক বারো বছরের একটি নিগ্রো মেয়েকে ধরে নিয়ে আসছিল বেদীর দিকে। মেয়েটি চীৎকার করছিল গলা ফাটিয়ে। কাঁদছিল আকুলভাবে। মেয়েটিকে এনে বেদীর উপর তুলে রাখা হলো। রুইজ কি সব মন্ত্র পড়তে লাগল আর নাচিয়েরা বেদীর পাশে নেচে যেতে লাগল। হঠাৎ রুইজ তার পোশাকের ভিতর থেকে একটা ছুরি বার করে বসিয়ে দিল মেয়েটির বুকে। রক্তে ভেসে গেল বেদীটা।

এই ভয়ঙ্কর ও মর্মবিদারক দৃশ্যটা দেখতে দেখতে মূর্ছিত হয়ে পড়ল সান্দ্রা।

সান্দ্রার জ্ঞান ফিরলে সে দেখল একটি ঘরের মধ্যে মোষের চামড়া পাতা একটা বিছানায় শুয়ে আছে সে। প্রধান পুরোহিত রুইজ তার উপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে আর চারজন আদিবাসী নিগ্রো তার সেবা করার জন্য তৎপর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সান্দ্রা চোখ মেলতেই রুইজ বলল, আমি দেবীকে স্বর্গ থেকে ফিরিয়ে আনলাম। ওঁর সেবা করো তোমরা সবাই। এটা হলো আলেমতেজোর রাজা আর প্রধান পুরোহিতের আদেশ।

রুইজ চলে যেতেই সান্দ্রার সামনে নিগ্রো মেয়েগুলি নতজানু হয়ে তার হুকুমের অপেক্ষা করতে লাগল। তাদের সঙ্গে আঠারো উনিশ বছরের একটি ছেলেও ছিল। সান্দ্রা ছেলেটিকে বলল, তুমি কে ? তোমার নাম কি ?

ছেলেটি বলল, আপনার ক্রীতদাস। আমার নাম কিওমিয়া।

সান্দ্রা তাদের চোখেমুখে ভয়ের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করল, এত ভয় পাচ্ছ কেন ?

ছেলেটি বলল, আমরা দেবীর কাছে থাকতে ভয় পাচ্ছি। আমাদের মেরো না। আমরা যথাসাধ্য তোমার সেবা করে যাব।

সান্দ্রা আবার বলল, আমি তোমাদের মারব না। কিন্তু একথা তোমরা ভাবছ কেন ?

ছেলেটি বলল, প্রধান পুরোহিত অনেক ক্রীতদাস ক্রীতদাসীকে বধ করে এবং আলেমতেজোর অভিভাবকদের মাঝখানে ফেলে দেয়।

সান্দ্রা বিছানা পাতা খাটের উপর উঠে বসল। সে ঘরটার চারদিকে তাকিয়ে দেখল। ঘরখানা বড়। আসবাবপত্র বেশী নেই। একটা টেবিল আর কতকগুলো বেঞ্চ রয়েছে। মেঝেটায় মোষ আর সিংহের চামড়া পাতা আছে। জানালাগুলো ছোট ছোট। ঘরের একধারে আগুন জ্বালার জায়গা রয়েছে।

সান্দ্রা বলল, কিওমিয়া, আমি স্নান করব। আমার জন্য কিছু ভাল পরিষ্কার পোশাক আর খাবার দরকার।

এ কথায় ওরা আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ ওরা ভাবত দেবী কখনো খায় না মানুষের মত।

কিওমিয়া ক্রীতদাসীদের বলল, তোমরা স্নানের ব্যবস্থা করে ভাল খাবার নিয়ে এস। আমি পোশাক আনছি।

তিনজন ক্রীতদাসী সান্দ্রাকে পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে স্নানের জন্য গরম জল হচ্ছিল। দুজন তার পোশাক খুলে স্নান করিয়ে দিল। একজন তার চুল বেঁধে দিল। ভাল করে স্নান করে আরামবোধ করল সান্দ্রা।

স্নান করে সান্দ্রা তার শোবার ঘরে আসতেই কিওমিয়া পোশাক নিয়ে এসে দেখল সান্দ্রার দেহটা তখন একেবারে নগ্ন। সে তাই পোশাকগুলো একটা বেঞ্চের উপর রেখে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পোশাকের মধ্যে তখন হরিণের মোটা চামড়ার তৈরী একটা অন্তর্বাস, সোনার জরির কাজ করা একটা স্কার্ট, বুকে বাঁধার জন্য সোনার কাঁচুল আর সোনার ফিতেওয়ালা একজোড়া সুন্দর চটি। এছাড়া ছিল চুল বাঁধার জন্য সোনার কাঁটা। হাতে সোনার তাগা, সোনার আংটি আর পায়ে হাঁটুর কাছে পরার জন্য সোনার গয়না। সান্দ্রা দেখল আলেমতেজোর মেয়েরা কোমরের উপর কোন পোশাক না পারলেও সে দেবী হিসাবে এসব পরতে পারে।

স্নান করে পোশাক ও গয়না পরে নিজেকে দেবীর মত মনে হচ্ছিল সান্দ্রার। পাশের ঘরে ভাল খাবার দেওয়া হয়েছিল। সান্দ্রা যখন খাচ্ছিল তখন পাঁচজন দাসী তার ফরমাস খাটার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। খাবারের মধ্যে ছিল কিছু টাটকা ফল আর শাকসব্জি, ভাল করে রান্না করা মোষের মাংস, ভাল দামী মদ আর কালো কফি।

সান্দ্রার খাওয়া শেষ হয়ে যেতেই বাইরে বাজনার শব্দ শুনতে পেল আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের দরজা ঠেলে রাজা দা গামা প্রবেশ করল।

সান্দ্রার যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি ছিল। সে তাই রাজাকে দেখে উঠে দাঁড়াল না বা নত হয়ে কোন সম্মান দেখাল না। কারণ সে দেবী এবং দেবী রাজার উপরে সম্মানের দিক থেকে এটা সে জানত। সে তাই গম্ভীরভাবে রাজাকে বসতে বলল। রাজা একটা বেঞ্চের উপর বসল।

রাজা ঘরে ঢুকেই সান্দ্রার সামনে কিছুটা নত হয়ে সম্মান জানাল সান্দ্রাকে। বেঞ্চের উপর বসে রাজা ক্রীতদাসীদের চলে যেতে বলল ঘর থেকে। কিন্তু সান্দ্রা বলল, কিওমিয়া থাকবে।

কিওমিয়া ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু দেবীর হুকুম সে অমান্য করতে পারল না। রাজা না চাইলেও সে ঘরে রয়ে গেল।

রাজা সান্দ্রার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, আপনার কোন অসুবিধা হয়নি ত? আপনার সেবার কোন ত্রুটি হয়নি ত?

সান্দ্রা বলল, না, আমার স্নান, পোশাকপরা এবং খাওয়া ঠিকমতই হয়েছে। এখন আমার বিশ্রাম দরকার।

রাজা বলল, দেবতা কোথায় পেয়েছে আপনাকে?

সান্দ্রা বলল, দেবীকে কোথায় পাওয়া যায়?

দেবতা বলেছে সে স্বর্গ থেকে এনেছে।

দেবতা ঠিকই জানে দেবীকে কোথায় পাওয়া যায়।

আপনাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। আপনার নাম কি?

আমার নাম সান্দ্রা। কিন্তু তুমি আমাকে দেবী বলে ডাকবে।

এসব নিয়মকানুনের কথা রাখুন। আমরা বন্ধু পরস্পরের। আপনি দেবী আর আমি রাজা। আলেমতেজোর রাজা ক্রীস্টোফোরো দা গামা, ভাস্কো দা গামার ভাই।

একথা মনে করো না কেন তুমি?

একথা আলেমতেজোর ইতিহাসে লেখা আছে। বংশ পরম্পরায় একথা মুখে মুখে চলে আসছে।

ইতিহাসে বলে ভাস্কো দা গামার ভাই ক্রীস্টোফোরো দা গামা তার সাড়ে চারশো বন্দুকধারী সৈন্যের সঙ্গে মুসলমানদের হাতে পরাজিত ও নিহত হয়।

ইতিহাস মিথ্যা কথা বলে। ক্রীস্টোফোরো মারা যায়নি। সে তার দলবল নিয়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের তাড়া করে। অবশেষে ক্রীস্টোফোরো এইখানে এসে আশ্রয় নেয় এবং এখানে এক রাজ্য গড়ে তোলে ক্রীতদাসদের সাহায্যে। কালক্রমে তারা এই প্রাসাদ গড়ে তোলে। মুসলমানরাও দক্ষিণদিকের উপত্যকায় রয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে।

সান্দ্রা বলল, তুমি মুসলমানদের জয় করে তাদের একেবারে উৎখাত করনি কেন?

রাজা দা গামা বলল, তাহলে যুদ্ধ করার জন্য কোন শত্রু থাকবে না আমাদের। তাহলে জীবনটা আমাদের বিস্বাদ ও বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়বে।

সান্দ্রা বলল, এখন তুমি যেতে পার। আমি বিশ্রাম করব।

দা গামা বলল, যাই হোক, আমরা পরস্পরের বন্ধু। তুমি দেবী হলেও একজন নারী।

সান্দ্রার ঘর থেকে বেরিয়েই প্রধান পুরোহিত রুইজের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাজার। রুইজ বলল, তুমি দেবীর কাছ থেকে দূরে থাকবে ক্রিস। আজ তুমি দেবীর দিকে কিভাবে তাকাচ্ছিলে তা আমি লক্ষ্য করেছি।

দা গামা বলল, আমি রাজা। আমিও দেবদেবীদের স্তরের মানুষ। দেবীর সঙ্গে মেলামেশা করব সে আর বেশী কথা কি ?

রুইজ বলল, তুমি রাজা হলেও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করতে এস না। তুমি যদি দেবীর শালীনতা নষ্ট কর তাহলে এ দেশের জনগণ তোমাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তোমাকে তারা চেনে।

দা গামা বলল, আস্তে কথা বল। লোকে শুনতে পাবে। মনে রেখো, ওসোরিও দা সেরা এখানকার রাজা হলে তোমাকে রহস্যময়ভাবে হত্যা করা হবে এবং পুরোহিত কেদাজাকে প্রধান পুরোহিত করবে। মনে রেখো, আমি রাজা থাকাকালেও দোজা প্রধান পুরোহিত হতে পারে।

রুইজ নরম হলো এ কথায়। সে সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলল, আমাদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ কি ক্রিস। আমি শুধু তোমার মঙ্গলের কথা চিন্তা করেই একথা বলেছি। যাই হোক, তুমি রাজা, রাজা কখনো কোন অন্যায় করতে পারে না।

সপ্তম অধ্যায়

সে রাতে গাণ্ট্ একটুও ঘুমোতে পারেনি। বনের ভিতর থেকে আসা সেই রহস্যময় কণ্ঠের কথাগুলো শুনে ভয় পেয়ে যায় তারা সবাই।

সকালে উঠে গাণ্ট্ দেখল ক্রাম্প আর মিনস্কি আগেই উঠে পড়েছে। গাণ্ট্ বলল, কাল রাতে শুনেছ ? লোকটা কে কিছু বুঝতে পারছ ? আমার ত মনে হয় কোন মানুষ নয়। তবে আমাদের চলে যেতে বলেছে এখান থেকে। না গেলে আমাদের মরতে হবে।

মিনস্কি বলল, শুধু কণ্ঠস্বর কখনো কাউকে মারতে পারে না।

ক্রাম্প বলল, ওসব কথা বাদ দাও। এখন আমাদের খাবার নেই '

এখনি বার হতে হবে।

গাণ্ট্র বলল, কোনদিকে যাবে ?

ক্রাম্প বলল, আমরা যাব রুতুরি পাহাড়ের দিকে।

গাণ্ট্র বলল, তাহলে আমি যাব না।

ক্রাম্প বলল, না যাও, ভালই হবে। একটা লোকের ভাগ বেঁচে যাবে।

গাণ্ট্র বলল, মরা লোকে কখনো কোন পুরস্কার দিতে বা নিতে পারে না।

ক্রাম্প বলল, এখনি চলে যাও।

গাণ্ট্র তার রাইফেলটা নিয়ে শিবির ছেড়ে দক্ষিণ দিকে রওনা হয়ে পড়ল। শিবিরটা চোখের আড়াল হবার আগে গাণ্ট্র একবার শেষবারের মত তার সঙ্গীদের পানে তাকাল।

টারজন বাঁদর-গোরিলাদের কাছে ডাটনকে রেখে সে রাতে চলে গেলে ঘুম এল না ডাটনের। বাঁদর-গোরিলাগুলোকে টারজনের দলে দেখার পর থেকেই সন্দেহ জাগে ডাটনের। তার কেবলি মনে হতে থাকে তাদের শিবির থেকে দ্বিতীয়বার টারজন নামে যে শ্বেতাঙ্গ সান্দ্রাকে ধরে নিয়ে যায় তার সঙ্গেও একদল বাঁদর-গোরিলা ছিল এবং তারা ক্রাম্প আর মিনস্কিকে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। তার মনে হতে লাগল এই টারজনই সেই টারজন এবং এই লোকটাই সান্দ্রাকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে ঠিক। নিশ্চয় টারজন নামধারী দুটো লোক একই বনে দু দল বাঁদর-গোরিলা নিয়ে থাকতে পারে না। তার ভয় হতে লাগল লোকটা নিশ্চয় কোন কুমতলবের বশবর্তী হয়েই তাকে দলে রেখেছে। সে এসে পড়লে আর সে কোনদিন বেরোতে পারবে না তার দল থেকে। সুতরাং এই মুহূর্তেই চলে যাওয়া ভাল।

এই কথা ভেবে তখনি উঠে পড়ল ডাটন। যে বাঁদর-গোরিলাগুলোর উপর ডাটনের নিরাপত্তার ভার দিয়ে গিয়েছিল টারজন তাদের অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আর যারা জেগে ছিল তারা তত গ্রাহ্য করল না। ডাটন তাদের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে চলে গেল। তারা শুধু উদাসীনভাবে তা দেখতে লাগল।

টারজন ফিরে এসে ডাটনকে দেখতে না পেয়ে বাঁদর-গোরিলাদের কাছ থেকে সবকিছু জানল। সে তাদের কথা বিশ্বাস করল। কারণ সে জানত পশুরা কখনো মিথ্যা কথা বলে না মানুষদের মত। সে ডাটনের নাম ধরে বারকতক ডাকল। কিন্তু সাড়া পেল না। সে এগিয়ে বনটার আশেপাশে একবার দেখল। কিন্তু কোথাও কোন সন্ধান পেল না। টারজন আর ডাটনের কথা ভাবল না। তার মনে তখন একটা চিন্তাই ছিল, সে যেমন করে হোক যে

কোনদিন সেই টারজন নামধারী ভণ্ড প্রতারকটাকে ধরে শাস্তি দেবে।

ডাটন তখন একাই অন্ধকার বনপথে রুতুরি পর্বতের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। আফ্রিকার জঙ্গলে একা পথ চলার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না তার। হঠাৎ একসময় তার সামনে একদল নিগ্রো যোদ্ধা পথরোধ করে দাঁড়াল। সে তার রাইফেল তুলে গুলি করার আগেই তাদের একজন রাইফেলটা কেড়ে নিল তার হাত থেকে। ডাটন অসহায় হয়ে পড়ল একেবারে। তার মনে দুশ্চিন্তা থাকায় আগে থেকে তাদের পায়ের শব্দ শুনতে পায়নি। তাকে বেঁধে ফেলল তারা।

নিগ্রো যোদ্ধাগুলোর গায়ে গয়না ছিল। তাদের বড় বড় দাঁতগুলো দেখে সে বুঝল তারা নরখাদক। তাদের ভাষা সে জানত না বলে কোন কথাই বলতে পারল না। তারা তাকে তাদের দিকে ধরে নিয়ে যেতে লাগল। পথে তার রাইফেলটা নিয়ে একটা যোদ্ধা নাড়াচাড়া করায় তার থেকে গুলি বেরিয়ে সামনের একটা লোকের বুকে লাগতেই সে মারা গেল। তখন একটা লোক ডাটনকে মারতে লাগল রেগে গিয়ে। মৃত লোকটা তার আত্মীয় ছিল।

কিন্তু তাদের সর্দার তাকে বাধা দিল। তাদের বোঝাল বন্দীকে গাঁয়ে নিয়ে গেলে তারা তার মাংস খেতে পারবে।

রাজা সান্দ্রার ঘর থেকে চলে যাবার পর তার দাসীরা তার বিছানা পেতে দিল। ঘরের বাইরেই টানা বারান্দা। ঘরের দরজার কাছে একটা কাঠের তক্তার উপর কিওমিয়া শুয়ে রইল।

পরদিন সকাল থেকে নির্বিঘ্নে কাটাল সান্দ্রা। রাজা বা প্রধান পুরোহিত কাউকে দেখতে পেল না। বিকালে সে বেড়াতে বার হলো। প্রাসাদের যে-দিক দিয়ে সে প্রথমে প্রবেশ করেছিল গতকাল তার উল্টো দিক দিয়ে সে বার হলো। তার সঙ্গে ছিল কিওমিয়া আর দুজন যোদ্ধা।

প্রাসাদের বাইরে অনেক খড়ের চালওয়ালা কুঁড়েঘরে ভর্তি একটা গাঁ দেখতে পেল। এই গাঁয়ে থাকে আলেমতেজোর সাধারণ মানুষ—চাষী, শিল্পী, সৈনিক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা। সান্দ্রাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তারা নতজানু হয়ে প্রণাম করল ও বুকে ক্রশ আঁকল। গাঁয়ের বাইরে অনেক মোষ চড়ে বেড়াতে দেখল। সান্দ্রা কিওমিয়াকে জিজ্ঞাসা করে জানল, আলেমতেজোর যোদ্ধারা মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় এই মোষগুলো ব্যবহার করে।

সান্দ্রা জানত আফ্রিকার মোষগুলো বুনো, পোষ মানে না এবং তারা ভয়ঙ্কর। কিন্তু এরা মোষগুলোকে পোষ মানিয়ে তাদের ব্যবহার করছে।

কিওমিয়া বলল, মোষগুলো অনেক উপকার করে এদের। শুধু যুদ্ধের সময় এদের ব্যবহার করে না, এদের মাংস খায়, দুধ খায়, চামড়াগুলো ব্যবহার

করে।

সান্দ্রা বলল, মুসলমান কারা?

কিওমিয়া বলল, আমরা ঐ জাতের। মুসলমানরা এই উপত্যকার ওধারে যে পাহাড় আছে সেই পাহাড়ের ওধারে বাস করে। আমিও একদিন সেখানে বাস করতাম। আমরা মোষ পুষি। আমার বাবার অনেক মোষ আছে। বছর তিনেক আগে আমি আমাদের দেশের লোকদের সঙ্গে এখানে যুদ্ধ করতে আসি। যুদ্ধে আমি এদের হাতে ধরা পড়ায় এরা আমাকে সেই থেকে ক্রীতদাস বানিয়ে রেখে দিয়েছে। কিওমিয়া বলল, রুতুরি পাহাড়ে অনেক সোনা পাওয়া যায় ঠিক। আলেমতেজোরা সে সোনা সহজে আনতে পারে না। সোনা তুলতে গেলেই মুসলমানরা তাদের তাড়া করে। দু'দলে যুদ্ধ হয়।

সন্ধ্যার সময় প্রাসাদে ফিরে এল সান্দ্রা। তার ঘরে ঢোকার কিছুক্ষণ পরে তার ঘরের দরজায় কে কড়া নাড়ল। সান্দ্রা তাকে আসতে বললে দরজা ঠেলে টারজন নামধারী সেই লোকটা ঘরে ঢুকল যাকে এখানকার সকলে দেবতা হিসাবে জানে।

ঘরখানার চারদিকে তাকিয়ে দেখে বলল, ওরা দেখছি তোমাকে বেশ সুখেই রেখেছে।

সান্দ্রা বলল, হ্যাঁ, সুখেই রেখেছে বটে, তবে যদি ওরা স্বস্তিতে আমাকে থাকতে দেয়।

তার মানে?

সান্দ্রা তখন গতরাতের রাজার ব্যাপারটা বলল।

তা শুনে লোকটা সান্দ্রার কাঁধের উপর একটা হাত রেখে বলল, একটা পশু। আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, এখানে তোমাকে আনার জন্য আমাকে ক্ষমা করবে। আমি কি যে সব কাজ করে বসি তার কিছুই আমি বুঝতে পারি না। যাই হোক, যে ভুল আমি করেছি তার প্রতিকার কি করে করব তাই ভাবছি।

সান্দ্রা বলল, কিন্তু কেমন করে এ ভুলের প্রতিকার করবে?

এখানে আমি তোমাকে এনেছি, আবার আমিই তোমাকে নিয়ে যাব এখান থেকে।

পারবে একাজ করতে?

তোমার জন্য যে কোন শক্ত কাজ আমি করতে পারব।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর লোকটা চলে গেল সান্দ্রার ঘর থেকে। আজ লোকটার কথাবার্তা শুনে এবং তার মধ্যে অনুশোচনার ভাব দেখে তার প্রতি সব ঘৃণা ও রাগ দূর হয়ে গেল সান্দ্রার মন থেকে। তবে কি লোকটা সত্যিই ভালবাসে তাকে?

শোবার আগে সান্দ্রা যখন তার দাসীদের সাহায্যে পোশাক খুলছিল তখন দরজা ঠেলে প্রধান পুরোহিত রুইজ ঘরে ঢুকল।

সান্দ্রা রেগে গিয়ে বলল, বিনা অনুমতিতে ঘরে ঢুকলে কেন?

রুইজও রেগে গিয়ে বলল, আমাকে লাল চোখ দেখিও না। দেবতাকে যদি ঘরে ঢুকিয়ে তাকে নিয়ে ফূর্তি করতে পার তাহলে প্রধান পুরোহিতকে কেন ঢুকতে দেবে না? আমার চর আছে সর্বত্র। আমি সব খবর রাখি। দেবতা কখন তোমার ঘরে এসেছিল কখন গেছে তা সব জানি আমি।

সান্দ্রা বলল, বেরিয়ে যাও ঘর থেকে।

রুইজ গলার স্বরটা নরম করে বলল, ঝগড়া করে লাভ কি? তুমি যদি আমার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো তাহলে তুমি যা চাইবে তাই পাবে এ-দেশে। তাহলে তোমায় আমায় মিলে এদেশ শাসন করতে পারব।

রুইজ তার গায়ে হাত দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলে সান্দ্রা বলল, খবরদার, বেরিয়ে যাও বলছি। তুমি আমাকে ছুঁয়ো না। কিওমিয়া, আমাকে রক্ষা করো।

কিওমিয়া বিছানার দিকে এগিয়ে এসে রুইজকে ধরতে গেলে তাকে একটা চড় মারল সে। তারপর আবার সে বিছানার উপর সান্দ্রাকে ফেলে দিয়ে তাকে চেপে ধরল। কিওমিয়া উঠে রুইজের হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল। তখন সান্দ্রাকে ছেড়ে দিয়ে কিওমিয়াকে নিয়ে পড়ল রুইজ। সে তার ছুরিটা বার করে কিওমিয়ার বুকে আমূল বসিয়ে দিল। ক্রীতদাসীরা ভয়ে শিউরে উঠে ঘরের এককোণে চলে গেল।

রুইজ আবার বিছানায় সান্দ্রার কাছে চলে এল।

এমন সময় ঘরের দরজা খুলে গেল। সান্দ্রা দেখল যাকে এখানে সবাই দেবতা বলে জানে সেই টারজন নামধারী লোকটা ঘরে ঢুকে নীরবে রুইজের কাঁধের উপর একটা হাত দিয়ে তাকে টেনে সরিয়ে দিল। রুইজ উঠে তার ছুরি বার করতেই লোকটা ছুরিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তার ঘাড় ধরে ঘর থেকে বার করে দিল। তারপর রুইজের পাছায় একটা জোর লাথি মেরে তাকে বারান্দায় ফেলে দিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

সান্দ্রা এবার লোকটাকে বলল, তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছিলে। কিন্তু এখন ওরা কি করবে তা জান?

লোকটা বলল, আমি আমার ঘরে চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু যাবার সময় রুইজকে তোমার ঘরে ঢুকতে দেখে সন্দেহ হয়। রাজার কথাটা মনে পড়ল আমার তাই ফিরে এলাম।

সান্দ্রা বলল, ওরা তোমাকে দেবতা বলে মানে না। কিওমিয়া এদের কথা সব শুনেছে। শুধু দেশের লোকের কাছে আমাদের দেখিয়ে রাজনৈতিক

উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়। কিছু না বুঝে আমাকে এনে ভুল করেছ তুমি।

আমি দেবতা নই ত কে? আমি কি টারজন?

না, তুমি টারজন নও। তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তার সঙ্গে তোমার একমাত্র পোশাক আর দেহের উচ্চতা ছাড়া কোন মিল নেই। তার মত শক্তি, সাহস, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব কিছুই নেই তোমার। তোমার জন্মপরিচয়, দেশ, অতীতের কথা কিছুই মনে নেই তোমার? যাই হোক, তুমি আমার বাবার যে শিবির থেকে ধরে এনেছিলে আমায় সেই শিবিরটা কোথায় জান ত? আমাকে সেইখানে নিয়ে চল।

লোকটা বলল, হ্যাঁ, যেভাবে আমি গিয়েছিলাম, সেইভাবেই তোমাকে নিয়ে যাব।

সান্দ্রা বলল, ঐ ভয়ঙ্কর পথ দিয়ে আর আমি যেতে পারব না।

লোকটা বলল, তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না। আমার সেবক বাঁদর-গোরিলাগুলো প্রাসাদের বাইরে বনের মধ্যে আছে। যাবার সময় তাদের ডেকে নেব। তোমাকে ধরে আমরা পাহাড় থেকে নামিয়ে দেব।

সেই রাতে লোকটা সান্দ্রার ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে তার সামনে শুয়ে রইল। বলল, তোমাকে আর একা রাখব না।

সেই রাতেই একদল কৃষ্ণকায় মুসলমান যোদ্ধা প্রাসাদের বাইরে বনের মধ্যে লুকিয়ে থেকে পরদিন সকাল হতেই প্রাসাদ আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল।

পরদিন সকালে রাজা আর প্রধান পুরোহিত দুজনেই যুদ্ধের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকায় টারজন নামধারী লোকটা ও সান্দ্রা প্রাতরাশ খেয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রাসাদ থেকে। বলল, আর দেরী করে কাজ নেই। তারা প্রাসাদের সামনের ফটক দিয়ে বেরিয়ে গেল। বলল, গাঁয়ে ঘুরতে যাচ্ছি। প্রহরীরা নতজানু হয়ে পথ করে দিল। কেউ কোন সন্দেহ করল না।

কিন্তু প্রাসাদের সীমানা পার হয়ে বনে ঢুকতেই একদল কৃষ্ণকায় মুসলমান যোদ্ধা ওদের সামনে এসে পথ আটকে দাঁড়াল।

টারজন নামধারী লোকটা বুদ্ধি করে বলল, আমি দেবতা এবং এ আমার দেবী। আমাকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু যোদ্ধাদের দলনেতা এগিয়ে এসে বলল, আমাদের সুলতানের কাছে যেতে হবে তোমাদের।

এই কথা বলে সে দশজন যোদ্ধাকে বাছাই করে বলল, তোমরা এদের সুলতানের কাছে নিয়ে যাও।

এমন সময় আলেমতেজোর যোদ্ধারা, যুদ্ধের ধ্বনি দিতে দিতে এগিয়ে এসে মুসলমান দলকে আক্রমণ করল।

অষ্টম অধ্যায়

টারজন যখন তার বাঁদর-গোরিলাদল নিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ রাইফেলের একটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেল। তারা যে পথে যাবে সেই পথ থেকেই শব্দটা এল। সে ভাবল এটা ঠিক ডাটনের বন্দুকের গুলির শব্দ। তবে কি সে কোন বিপদে পড়ল ?

ব্যাপারটা কি তা দেখার জন্য কাছের একটা উঁচু গাছের উপর উঠে পড়ল টারজন। সবচেয়ে উঁচু ডালের উপর থেকে দেখল একদল ওয়ারুতুরি যোদ্ধা একজন শ্বেতাঙ্গকে বর্শা দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে নিয়ে যাচ্ছে। একটা ডুলিতে করে একটা মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা। টারজন এবার বুঝতে পারল ঐ শ্বেতাঙ্গই হলো ডাটন।

ডাটন যে তার প্রতি সন্দেহবশতঃ ইচ্ছে করে তার দল ছেড়ে পালিয়ে যায় এটা জানত না টারজন। সে ভাবল ডাটনের কোন দোষ নেই এবং সে বনে ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে পথ হারিয়ে ফেলে এবং পরে ধরা পড়ে ওয়ারুতুরিদের হাতে।

সহসা ওয়ারুতুরিদের দলেরই একটা লোকের কাঁধে একটা তীর এসে লাগায় সে চীৎকার করে পড়ে গেল। দলের সবাই তখন থেমে গেল। চারদিকে কাউকে দেখতে পেল না। তখন যে লোকটার আত্মীয় মারা যায় সে ডাটনকে দেখিয়ে বলল, এই শ্বেতাঙ্গটার কারসাজি এটা।

এই বলে সে তার বর্শাটা ডাটনের বুকে বসিয়ে দিতে যেতেই আবার একটা তীর এসে তার বুকে লাগল। সেও পড়ে গেল।

তখন এক অদৃশ্য কণ্ঠস্বর শুনতে পেল তারা, শ্বেতাঙ্গকে ছেড়ে দাও তোমরা তা না হলে মরবে। নিগ্রো'রা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলোচনা করার পর মৃতদেহ ফেলে রেখে বন্দীকে নিয়ে তাড়াতাড়ি পথ চলতে লাগল। আবার সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল, শ্বেতাঙ্গ বন্দীকে ছেড়ে দাও।

কিন্তু নিগ্রোরা এবার ছুটতে লাগল। তখন আবার একটা তীর এসে বিদ্ধ করল একজনকে। এবার বন্দীকে ছেড়ে দিয়ে ছুটে পালাল নিগ্রোরা।

এতক্ষণে ডাটনের পথের সামনে নেমে পড়ল টারজন। ডাটন বলল, তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছ, কি দিয়ে তোমার ঋণ পরিশোধ করব তা জানি না।

টারজন বলল, শিবির ছেড়ে আসা উচিত হয়নি তোমার। বাঁদর-গোরিলারা তোমায় রক্ষা করত যেকোন বিপদ থেকে।

ডাটন বুঝল এই টারজনের কাছে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ তার পক্ষে।

পরদিন সকালেই টারজন কতুরি পাহাড়ের কোণে সেই কাঁটাবনটায় গিয়ে পৌঁছল। একটা সোজা পথ ধরে সেই খাদের পাশে খাড়াই পাহাড়ের পাদদেশে চলে গেল।

এই পাহাড়টা পার হতে হবে ওদের। বাঁদিকের খাদটায় বহু ক্ষুধার্ত সিংহ ঘোরাফেরা করছিল।

ডাটন বলল, আমি কানাডা ও সুইজারল্যাণ্ডে অনেক পাহাড়ে উঠেছি। কিন্তু এ পাহাড়টায় ওঠা সত্যিই কঠিন।

টারজন বলল, টারজন নামধারী লোকটা কিন্তু এই পাহাড় পার হয়েই গেছে।

ডাটন বলল, মিস পিকারেলও এই পাহাড় পার হয়েছে বলতে চাও?

টারজন বলল, খাদে সিংহের মুখে না পড়লে নিশ্চয় পাহাড়ে উঠতে হয়েছে তাকে। আমি বাতাসে ওদের গন্ধসূত্র পেয়ে বুঝেছি এই পথেই ওরা গেছে।

ডাটন বলল, ওদের সঙ্গের বাঁদর-গোরিলাগুলো তাহলে কি এখান থেকে ফিরে গেছে? কারণ ওরা অত বড় আর ভারী দেহ নিয়ে উঠতে পারবে না এই খাড়াই পাহাড়ে।

টারজন তখন এ কথার উত্তর না দিয়ে উঙ্গোকে ডাকল। উঙ্গোকে কি বলতে সে আবার তার দলের বাঁদর-গোরিলাদের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। তখন বাঁদর-গোরিলাগুলো অনায়াসে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেল। টারজনও অবলীলাক্রমে ওদের মতই উঠে গেল পাহাড়ের চূড়ায়। ডাটনের সেখানে উঠে যেতে ওদের থেকে আটঘণ্টা সময় বেশী লাগল।

পাহাড়টার মাথায় উঠে ডাটন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করল। টারজন উপর থেকে দেখল, পাহাড়ের ওপারে একটা উপত্যকা। উপত্যকার ওধারে একটা বন। পাহাড় থেকে নেমে উপত্যকার উপর দিয়ে যেতে যেতে টারজন বলল, ঐ সামনের বনটায় দুদলে যুদ্ধ হচ্ছে।

ডাটন বলল, কিন্তু গুলির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না।

টারজন বলল, কিন্তু ধনুকের টঙ্কার শুনতে পাচ্ছি আমি।

ডাটন বলল, এখন তুমি কি করবে?

টারজন বলল, আমি এগিয়ে গিয়ে দেখব কারা যুদ্ধ করছে। আমার মনে হয় সেই লোকটা মেয়েটিকে নিয়ে ওর মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

ডাটন বলল, তুমি কি লোকটাকে পেলে হত্যা করবে?

টারজন বলল, নিশ্চয়, লোকটা দারুণ দুষ্ট প্রকৃতির, ওকে শেষ করে দেওয়াই ভাল।

ডাটন বলল, আইনের হাতে তুলে দিতে পার।

টারজন বলল, এখানে আমিই আইন।

উপত্যকাটা পার হয়ে বনের কাছে যেতেই ওরা দেখল দুই দলে যুদ্ধ হচ্ছে। দেখল বনটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে একটা ফাঁকা জায়গায় এক বিরাট প্রাসাদ দাঁড়িয়ে আছে। তার উপর থেকে বাদামী রঙের সৈনিকরা মাথায় শিরস্ত্রাণ আর গায়ে বর্ম পরে তীর আর বর্শা ছুড়ছে আর প্রাসাদের নিচে কুড়িটা মোষে-টানা একটা উঁচু রথে করে অনেক কৃষ্ণকায় সৈনিক ঘুরে ঘুরে যুদ্ধ করছে। তাদের হাতে ছিল তীর ধনুক আর বর্শা।

ডাটন বলল, আক্রমণকারী কৃষ্ণকায় সৈন্যদল কিন্তু প্রাসাদ দখল করতে পারবে না।

ওরা দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে যুদ্ধ দেখছিল বলে কোন কিছু খেয়াল করেনি। কখন একদল কৃষ্ণকায় সৈনিক এসে ওদের ঘিরে ফেলেছে তা জানতে পারেনি। টারজন তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পালিয়ে গেল। কিন্তু ডাটন ধরা পড়ে গেল আর দুজন বাঁদর-গোরিলা মারা গেল।

এদিকে ক্রাম্প আর মিনস্কি রুতুরি পাহাড়ের কাছে এসে ওয়ারুতুরি গাঁয়ের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছিল তখন একটা হরিণ দেখতে পেয়ে মিনস্কি গুলি করতে গেলে ক্রাম্প তাকে নিষেধ করল। বলল, গুলি করে কি মানুষখেকো ওয়ারুতুরিদের হাতে ধরা দিতে চাও?

মিনস্কি বলল, আমি ভেবেছিলাম ওদের সর্দার মুভিম্বোয়ার সঙ্গে তোমার ভাব আছে। তুমি ওদের গাঁয়ে কতবার গিয়ে কত উপহার দিয়েছ। তাই ওরা তোমাকে কিছু বলবে না।

ক্রাম্প বলল, তখন আমার দলে কুড়িজন শ্বেতাঙ্গ আর কুড়িটা রাইফেল ছিল। তাই ভয়ে কিছু বলত না। কিন্তু এখন মাত্র দুজন লোক আর দুটো মাত্র রাইফেল দেখে ভয় পাবে না। এখন কি করবে কে জানে?

ওয়ারুতুরি গাঁটা ফেলে রেখে ঠিক পথেই যাচ্ছিল ওরা। কিন্তু ওদের ডান দিকের উপত্যকায় একদল যোদ্ধার একটা সফরি দেখতে পেয়ে মিনস্কি ক্রাম্পকে তা দেখাল।

ওরা বনের মধ্যে লুকিয়ে দেখল সেই সফরিতে মোট পনেরজন লোক ছিল। তাদের চেহারাগুলো লালচে ধরনের বলে তাদের শ্বেতাঙ্গ ভাবল। তাদের সঙ্গে যে মালপত্র ছিল তা পাঁচজন বাহক বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

ক্রাম্প বলল, ওরা ওয়ারুতুরি নয়। ওরা শ্বেতাঙ্গ; ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। ওরা নিশ্চয় রুতুরি পাহাড়ের কোথায় সোনা পাওয়া যায় তা জানে। আমরা ওদের সঙ্গে যাব।

মিনস্কি বলল, কিন্তু ওরা ঠিক শ্বেতাঙ্গ না। গায়ের চামড়াগুলো

বাদামী।

ক্রাম্প বলল, ওরা ত কৃষ্ণকায় নিগ্রোও নয়। চল, আমরা ওদের কাছে যাই।

মিনস্কির ইচ্ছা ছিল না। তবু ক্রাম্পের সঙ্গে যেতে হলো। ওরা তাদের কাছে যাবার আগেই তাদের সফরির একজন শ্বেতাঙ্গ মালবাহককে ইংরিজিতে বলল, তোমরা ইংরিজি ভাষা জান?

ক্রাম্প বলল, জানি।

সেই মালবাহককে শ্বেতাঙ্গ বলল, এদের কাছে এস না। ভাল চাও ত পালিয়ে যাও এখান থেকে! নিকটবর্তী কোন বন্দরে কোন ইংরেজ অফিসারকে জানিয়ে দেবে ফ্রান্সিস বোল্টন শিল্টন রুতুরি পাহাড়ে বন্দী হয়ে আছে।

ক্রাম্প বলল, ধরতে পারলে ওরা আমাদের কি খুন করবে?

বোল্টন বলল, না, তোমাদের ক্রীতদাস করে রাখবে।

মিনস্কি বলল, ওদের হাতে বন্দুক নেই। আমরা গুলি করে ওদের সবাইকে খতম করে শ্বেতাঙ্গ বন্দীটাকে মুক্ত করতে পারি।

মিনস্কি রাইফেল তুলতেই ক্রাম্প বলল, থাম থাম। আমরা সোনার খনিটা খুঁজছি। আমাদের খনিটা পাওয়া নিয়ে দরকার। ওরা আমার ক্রীতদাস বানায় ত বানাবে। কিন্তু একবার সোনার খনিটার সন্ধান পেলেই আমরা পালিয়ে যেতে পারব।

ক্রাম্প আবার এগোতে বোল্টন তাকে সাবধান করে দিল। কিন্তু ক্রাম্প তাকে থামিয়ে দিল। ধমক দিয়ে বলল, তুমি থাম, বাজে বকো না। আমরা জেনেশুনেই যাচ্ছি।

ক্রাম্প আর মিনস্কি দলটার কাছে যেতেই তারা ওদের ঘিরে ফেলল। তারা যে কথা বলল সে ভাষা ক্রাম্পরা বুঝতে পারল। ওরা কি বলছে ক্রাম্প বোল্টনকে জিজ্ঞাসা করতে বোল্টন বলল, ওরা বলছে তোমরা ওদের বন্দী। বন্দুকগুলো দিয়ে দাও।

ক্রাম্প বন্দুক দিল না। সে বোল্টনকে বলল, ওদের বলে দাও আমরা ওদের বন্ধু। আমরা ওদের গাঁয়ে গিয়ে ওদের সর্দারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

কিন্তু সেকথা শুনল না ওরা। ওদের রাইফেলদুটো ছিনিয়ে নিয়ে ওদের মাল বইতে বলল। ক্রাম্প আর মিনস্কি বাধ্য হয়ে ওদের মাল মাথায় তুলে নিল। বুঝল ওদের গাঁয়ে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসের মত এইভাবে খাটাবে।

ক্রাম্প বলল, ওরা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?

বোল্টন বলল, আলেমতেজোতে নিয়ে যাবে।

ক্রাম্প বলল, কোথায় সে জায়গাটা ?

বোণ্টন বলল, আমি সেখানে দু বছর ধরে আছি। দু বছর আগে আমাকে নিগ্রো মুসলমানরা ধরে। আমি তাদের গাঁয়েই থাকতাম। সে গাঁ থেকে আলেমতেজোর উঁচু প্রাসাদটা দেখতে পেলাম। নিগ্রো মুসলমানরা আলেমতেজোদের চিরশত্রু। কয়েক সপ্তা আগে আমি খনি থেকে কাজ করে কয়েকজন ক্রীতদাস আর একদল যোদ্ধার সঙ্গে যখন ফিরছিলাম তখন আলেমতেজোর সীমানায় ভুল করে গিয়ে পড়তেই ধরা পড়ে যাই। তখন থেকে আমি আলেমতেজোতেই বন্দী আছি। নিগ্রো মুসলমানদের থেকে আলেমতেজোর শাসকরা আরও খারাপ। ওরা মানুষ বলি দেয় আর মাঝে মাঝে ক্রীতদাসরা বুড়ো হয়ে গেলে সিংহের মুখে ফেলে দেয়। নিগ্রো মুসলমানরা ক্রীতদাসরা বুড়ো হয়ে গেলে অর্থাৎ কাজ করতে না পারলে আর খেতে দেয় না। বুড়ো ক্রীতদাসরা সেখানে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যায়। কিন্তু তাদের সিংহকে দিয়ে খাওয়ায় না।

ক্রাম্প বলল, দু বছরের মধ্যে পালাবার চেষ্টা করনি ?

বোণ্টন বলল, পালাবার কথা ভেবেছি অনেক। কিন্তু পালাতে সাহস পাইনি।

ক্রাম্প বলল, তাহলে আমাদের সারাজীবন ওখানে বন্দী হয়ে থাকতে হবে ?

বোণ্টন বলল, সেইজন্যই ত তোমাদের ধরা দিতে নিষেধ করছিলাম অত করে।

ক্রাম্প বলল, তোমাদের সঙ্গে কি মাল আছে ?

বোণ্টন বলল, লবন আর লোহা। ওয়ারুতুরিদের গাঁয়ে গিয়ে সোনার বিনিময়ে এই সব মাল নিয়ে আসছি। মাঝে মাঝে ও গাঁয়ে গিয়ে সোনার জন্য যেতে হয় আমাদের।

মিনস্কি বোণ্টনকে বলল, আমি পালিয়ে যেতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার এই সঙ্গী রুতুরি পাহাড়ে সোনার খনি আবিষ্কার করতে চায়। ও সোনার-লোভেই ধরা দিল ওদের হাতে।

বোণ্টন বলল, হ্যাঁ, সেই সোনার খনিতেই ওকে ক্রীতদাসের মত রোদে পুড়ে কাজ করতে হবে। রোদে পুড়ে কাজ করতে করতে শেষে সোনা দেখে ঘৃণা জাগবে ওর মনে।

ক্রমে ওরা প্রাসাদে যাবার পথ ধরল বাঁদিকে কিছুটা গিয়ে।

বোণ্টন বলল, আলেমতেজো যাবার দুটো পথ আছে। মালভূমির দিকে যে সোজা পথটা আছে নিগ্রো মুসলমানরা তা জানে বলেই সেইদিকে আক্রমণ করে তারা। পাহাড়ের উপর দিয়ে খাদের ধার ঘেঁষে যে পথটা

গেছে সে পথে আসা যাওয়া খুবই কঠিন কাজ।

ক্রাম্প বলল, তবে কি আমাদের আশা নেই একেবারে?

বোণ্টন বলল, আশা সব সময়ই আছে।

নবম অধ্যায়

আলেমতেজোদের সঙ্গে নিগ্রো মুসলমানদের যুদ্ধটা অল্প সময়ের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। নিগ্রো মুসলমানরা হেরে গিয়ে পালাতে থাকে। তখন আলেমতেজোর প্রধান সেনাপতি অসোরিও দা সেরা মোষে টানা কুড়িটা রথে করে অনেক সৈন্য নিয়ে তাদের তাড়া করে নিয়ে যায়। যাবার সময় আলেমতেজোদের গাঁয়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে যায় নিগ্রো মুসলমানরা।

গাঁয়ের সীমানার বাইরে কিন্তু আর পলাতক শত্রুদের তাড়া করতে গেল না দা সেরা। কারণ সেটা তাদের দেশের বিধি নয়। এটা যেন একটা খেলা। শত্রুকে নির্মূল করতে চায় না তারা।

বনের মধ্যে গাছের আড়াল থেকে যুদ্ধ দেখল টারজন। অল্প সময়ের মধ্যে ঘটে যাওয়া এই যুদ্ধের অসারতার কথা ভাবছিল সে। হঠাৎ অদূরে বনের মধ্যে দুদল বাঁদর-গোরিলার লড়াইয়ের শব্দ শুনতে পেয়ে সেদিকে এগিয়ে গেল সে। গিয়ে দেখল দুদল বাঁদর-গোরিলা সামনাসামনি দাঁড়িয়ে লড়াইএর জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। একদলের সামনে আছে তাদের রাজা উঙ্গো আর একদলের সামনে আছে মালগাশ নামে তাদের রাজা। দুজনেই নিজেদের বাঁদরদলের অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাজা বলে বুক চাপড়াচ্ছে।

দুদলের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে টারজন বলল, আমি হচ্ছি টারজন, সব বাঁদরদলের রাজা।

টারজনকে দেখে উঙ্গো সরে গেল। মালগাশ হচ্ছে আলেমতেজোর দেবতার সেবক বাঁদর-গোরিলাদের নেতা। সে প্রথমে টারজনকে তাদের দেবতা ভেবেছিল। কিন্তু পরে বুঝল তাদের দেবতা পালিয়ে গেছে। প্রথমে তার দলের সবার সঙ্গে কি আলোচনা করল। তারপর ফিরে এসে টারজনকে বলল, না, তুমি টারজন নও। মালগাশ তোমাকে মারবে।

এই বলে সে টারজনের গলাটা ধরার জন্য হাতদুটো বাড়িয়ে দিল। কিন্তু টারজন তার তলা দিয়ে গলে গিয়ে তার মাথায় এমন একটা জোর ঘুষি মারল যার আঘাতে সে ঘুরে পড়ে গেল। সে উঠে আবার ধরতে গেল টারজনকে। কিন্তু এবারেও সে ধরতে পারল না। উল্টে টারজন তার পিঠের উপর লাফিয়ে

উঠে তার ঘাড়টা ধরে সামনের দিকে চাপ দিতে লাগল। মালগাশ পড়ে গেল। টারজন তার হাতদুটো ধরে তাকে তুলে আছাড় মেরে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর তার বুকের উপর বসে বলল, 'কাগোদা ?' অর্থাৎ হার মেনেছ ?

মালগাশ বলল, 'কাগোদা' অর্থাৎ হার মেনেছি।

মালগাশের দলের সবাই এতক্ষণ লড়াই দেখছিল। তাদের রাজা যখন কারো সঙ্গে লড়াই করে তখন এমনি করে দাঁড়িয়ে দেখে তারা।

টারজন এবার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি হচ্ছি সমস্ত বাঁদরদলের রাজা, আমি যা বলব তাই তোমাদের করতে হবে।

মালগাশ তার দলের সবাইয়ের সঙ্গে মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছিল। টারজন তাদের ডাকল। বলল, মালগাশ তার দলের রাজা থাকবে আর উঙ্গোও তার দলের রাজা থাকবে। তবে যতদিন উঙ্গো তাদের দেশে থাকবে ততদিন তার ও দলের সঙ্গে শান্তিতে মিলেমিশে বাস করতে হবে। আমি যখন ডাকব তখন তোমরা সবাই আসবে। দুজনে মিলে তোমাদের সাধারণ শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করবে।

বাকি দিনটা বাঁদর-গোরিলাদের সঙ্গে কাটিয়ে রাত্রি হতেই তাদের কাছ থেকে চলে গেল টারজন। আলেমতেজোর রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি একটা গাছের উপর উঠে লক্ষ্য করতে লাগল প্রাসাদটাকে।

সকাল হতেই সে প্রাসাদের পাশ দিয়ে যে একটা নদী বয়ে যাচ্ছিল তার জলে গিয়ে স্নান করে এল। তারপর প্রাসাদের সামনের দিকের গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। প্রহরী তাকে তাদের দেবতা ভেবে সম্ভ্রমের সঙ্গে পথ ছেড়ে দিল। ভিতরের সৈনিকরাও তাকে কিছু বলল না বা তার পথ আটকাল না। এমন সময় একটা জোর গোলমালের শব্দে সকলেই ছোটাছুটি করতে লাগল।

টারজনও তাদের সঙ্গে গিয়ে দেখল প্রাসাদের পিছন দিকে যে একটা ফাঁকা জায়গা ছিল তার উপরে অনেকে জড়ো হয়েছে। গাঁয়ের দিক থেকে একটা পাগলা মোষ ছুটে আসছিল। সবাই বলছিল বুনো মোষটা পাগলা হয়ে গেছে, পোষ মানছে না। সামনে যাকে পাবে মেরে ফেলবে। আলেমতেজোর সামন্ত এবং প্রধান সেনাপতি অসোরিও দা সেরার বীর এবং সাহসী হিসাবে খ্যাতি ছিল। সে তাই তার তরবারি হাতে মোষটার পথের সামনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু যখন দেখল ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করতে থাকা মোষটাকে সে আটকাতে বা মারতে পারবে না তখন পিছন ফিরে ছুটে পালাতে লাগল। মোষটা এবার তাকে তাড়া করল।

পাশ থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে দেখতে টারজন বুঝল মোষটা অল্প সময়ের মধ্যেই ধরে ফেলবে লোকটাকে। তার হাত থেকে তার কোন পরিত্রাণ নেই।

তখন সে পাশ থেকে একটা লাফ দিয়ে মোষটার পিঠের উপর উঠে পড়ে তার একটা শিং ধরে মাথাটা ঘুরিয়ে দিল। ঘাড়টা এমনভাবে বাঁকিয়ে দিল যে মোষটা উল্টে পড়ে গেল। টারজন তখন মাটিতে নেমে পড়ল। মোষটা এবার ছাড়া পেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ছুটতে গেলে টারজন এবার সামনে এসে দুটো শিং ধরে আবার ঘাড়টা ঘুরিয়ে দিল। ফলে মোষটা এগোতে বা ছুটতে পারল না। মোষটাকে আবার ঘাড় ধরে উল্টে ফেলে দিল টারজন। তখন কুড়িজন যোদ্ধা মোটা দড়ি নিয়ে এসে তাকে বেঁধে ফেলল।

দা সেরা টারজনের সাহস আর অতিমানবিক শক্তি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কোন মানুষের এত শক্তি ও সাহস থাকতে পারে সে কল্পনাও করতে পারেনি কোনদিন। টারজন যখন লড়াই করছিল মোষটার সঙ্গে তখন সে তার সৈনিকদের ডাকাডাকি করে। কিন্তু কেউ মোষটার কাছে যেতে পারেনি।

এবার টারজনের কাছে গিয়ে দা সেরা বলল, তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। কে তুমি এবং কিভাবে তোমার এ ঋণ পরিশোধ করব?

টারজন বলল, আমি হচ্ছি বাঁদরদলের টারজন।

দা সেরা বলল, সে ত দুবছর আলেমতেজোর দেবতা হিসাবে ছিল। এখন চলে গেছে। তার নামই ত টারজন।

টারজন বলল, না, আমিই টারজন। সে হচ্ছে ভণ্ড প্রতারক, আমার নাম নিয়ে কুকর্ম করে বেড়ায়। তুমি কে?

দা সেরা বলল, আমি আলেমতেজোর সৈন্যদলের প্রধান সেনাপতি অসোরিও দা সেরা। তুমি আমার অতিথি হয়ে এখানে থাকবে।

এবার সে তার সৈনিকদের বলল, এই দেখ, এই বিদেশীই হচ্ছে আসল দেবতা। আগের সেই দেবতা ভণ্ড প্রতারক।

এ কথায় সবাই নতজানু হয়ে সম্মান দেখাল টারজনকে।

দা সেরা বলল, তুমি আমার ঘরে চল।

এই বলে সে তাকে প্রাসাদের দিকে নিয়ে যেতে লাগল। তার পথের দুধারের সব লোক নতজানু হয়ে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে লাগল। টারজন তখন ভাবল সে দেবতা হতে চায় না। সে শুধু এখানে অপেক্ষা করে দেখতে চায় কি হয়।

এদিকে রাজা দা গামা তার ঘরে বসে একজন ক্রীতদাসকে ডেকে বলল, শুনছি নাকি দেবতা ফিরে এসেছে?

প্রধান পুরোহিত রুইজ বলল, সে নাকি একটা পাগলা মোষকে ঘায়েল করেছে। দা সেরা তার ঘরে দেবতার সঙ্গে কথা বলছে।

দা গামা বলল, ওদের দুজনকেই ডাক।

এদিকে দা সেরা টারজনকে বলছিল, তুমি এখানে থেকে যাও। আমি তোমাকে মৃত্যু ও দাসত্ব দুটোর হাত থেকেই রক্ষা করব।

টারজন বলল, তার মানে?

দা সেরা বলল, এখানে বন্দীদের হয় বলি দেওয়া হয় অথবা ক্রীতদাস করে রাখা হয়।

টারজন বলল, আমি ওসব কিছুরই ভয় করি না।

দা সেরা বলল, তুমি কিজন্য এখানে এসেছ?

টারজন বলল, আমি এখানে তোমাদের সেই দেবতা ভণ্ড লোকটাকে মারতে এসেছি।

দা সেরা বলল, তুমি আমাদের দেবতাকে মারতে এসেছ? সত্যিই তুমি বীর। কিন্তু মনে কর আমরা যদি সত্যি সত্যিই তাকে দেবতা বলে বিশ্বাস করে থাকি?

টারজন বলল, আমি জানি তুমি, তোমাদের রাজা দা গামা বা প্রধান পুরোহিত রুইজ কেউ তাকে দেবতা বলে বিশ্বাস করে না। তারা শুধু সাধারণ কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের দেবতার নাম করে বশীভূত করে রাখতে চায় রাজনৈতিক কারণে। আমি কিন্তু এসব পছন্দ করি না। আমি কখনো বলব না যে আমি দেবতা। আমি আবার চলে যাব। লোকটা এখন কোথায়? যে মেয়েটি এসেছিল সে-ই বা কোথায়?

দা সেরা বলল, ওরা এখান থেকে পালিয়ে যাবার সময় নিগ্রো মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে। উপত্যকার শেষ প্রান্তে পাহাড়ের তলায় ওদের গাঁ।

টারজন বলল, আমি সেখানে যাব।

দা সেরা বলল, ওরা বড় ভয়ঙ্কর, তোমাকে মেরে ফেলবে।

তবু আমি যাব।

এত তাড়াতাড়ি করার কিছু নেই। তাকে যদি তারা হত্যা না করে থাকে তাহলে তাকে ক্রীতদাস করে রেখেছে। সে ক্রীতদাস হয়েই থাকবে সেখানে। তুমি কিছুদিন আলেমতেজোতে থাকার পর সেখানে যাবে। এখানে থেকে তুমি আমাকে সাহায্য করতে পার।

টারজন বলল, কিভাবে আমি সাহায্য করব তোমায়?

দা সেরা বলল, দা গামা আর রুইজ দুজনেই খুব খারাপ লোক। আমরা তাদের জায়গায় এক নতুন রাজা ও প্রধান পুরোহিতকে বসাতে চাই। রাজ্যের লোকেরা তোমাকে তাদের দেবতা বলে বিশ্বাস করলে রাজা দা গামার বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহী করে তোলাটা কঠিন হবে না।

টারজন বলল, তাহলে তুমি রাজা হবে?

দা সেরা বলল, রাজ্যের সামন্ত আর যোদ্ধারা যাকে রাজা করবে সেই

রাজা হবে।

দা সেরার কথা শেষ হতেই একজন দূত এসে বলল, দেবতা আর আপনাকে দরবারঘরে রাজা ডাকছেন।

দূত টারজনকে দেখেই তাকে দেবতা ভেবে নতজানু হলো।

দা সেরা বলল, রাজাকে বলগে, তিনি যেন দরবারঘরে রাজ্যের সব সামন্ত আর যোদ্ধাদের ডাকেন যাতে তারা আমাদের আসল দেবতাকে বরণ করে নিতে পারে।

দা সেরা আর একজন দূতকে প্রাসাদের সবাইকে ও গাঁয়ের সব লোককে আসল দেবতার আবির্ভাবের কথাটা জানাবার জন্য পাঠিয়ে দিল।

এদিকে নতুন দেবতার কথাটা শোনার পর থেকে ক্ষেপে গিয়েছিল দা গামা। সে বলছিল, এটা দা সেরার চালাকি। আসলে সে নতুন দেবতাকে হাতের মুঠোয় রেখে কার্যসিদ্ধি করতে চায়। আর আমার রাজ্যের লোকগুলোও কি বোকা! তারা দেবতাকে চোখে না দেখেই তাকে বিশ্বাস করছে।

প্রধান পুরোহিত রুইজ তখন বলল, তাহলে কেন তাদের বলছ না যে লোকটা দেবতা নয়, একটা ভণ্ড প্রতারক?

রাজা বলল, সেটা বলবে তুমি। তুমি প্রধান পুরোহিত। তুমি দেখলেই বুঝতে পারবে কে দেবতা বা দেবতা নয়।

দরবারঘরে গিয়ে দা গামা সিংহাসনে বসল। রুইজ বেদীর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, তোমরা সবাই জান, আমাদের আসল দেবতাকে মুসলমানরা ধরে নিয়ে গেছে। সেই আসল দেবতা যদি ফিরে আসে তাহলে কৃতজ্ঞচিত্তে তাকে বরণ করে নেব আমরা। আর যদি সে ভণ্ড হয় তাহলে তাকে দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করা হবে চিরদিনের জন্য অথবা আলেমতেজোর অভিভাবকদের মুখে ফেলে দেওয়া হবে।

দরবারঘরে সমবেত জনতার মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল।

এমন সময় ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে দা সেরা বলল, আসল দেবতা এসে গেছেন।

উপস্থিত সকলেই দা সেরা ও টারজনের দিকে তাকাতে লাগল।

টারজনকে দেখে অনেকেই নতজানু হয়ে বলল, আসল দেবতা। কেউ কেউ আবার নতজানু হলো না, বলল, ভণ্ড।

দা সেরা আবার বলতে লাগল, তোমরা সবাই দেখেছ এই দেবতা কিভাবে একটা পাগলা মোষকে থামিয়ে দেয় এবং তার সঙ্গে লড়াই করে তাকে ফেলে দিয়ে বশীভূত করে। কোন মানুষ কখনো এ কাজ করতে পারে না। আর আমরা যাকে আসল দেবতা ভাবতাম সেই ভণ্ড লোকটা নিগ্রো মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে। কিন্তু সে সত্যিই আসল দেবতা হলে কেউ তাকে ধরতে

পারত না।

একথা সামন্ত আর যোদ্ধারা মেনে নিল। তাদের প্রায় সবাই নতজানু হয়ে টারজনকে আসল দেবতা হিসাবে বরণ করে নিল। সামান্য দু-চারজন দা গামা আর রুইজের প্রতি আনুগত্য দেখাতে লাগল।

রুইজ বলল, ও দেবতা নয়, ভণ্ড।

দা গামা বলল, ওদের দুজনকেই ধরে সিংহের মুখে ফেলে দাও। ওদের মধ্যে একজন বিশ্বাসঘাতক।

একথা শুনে রাজার অনুগত একজন যোদ্ধা টারজনকে তার মুক্ত তরবারি দিয়ে আঘাত করতে গেল। কিন্তু টারজন তাকে তুলে মেঝের উপর আছড়ে ফেলে দিল।

এরপর দরবারঘরটা স্তব্ধ হয়ে গেল। সবাই ভয় পেয়ে গেল। মোষের সঙ্গে টারজনের লড়াই তারা দেখেছিল, তার উপর আবার তারা তার শক্তির পরিচয় পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। এবার দুই-একজন বাদে সবাই একবাক্যে বলে উঠল, দা গামা নিপাত যাক, দা সেরা দীর্ঘজীবী হোক।

তারা সবাই ধ্বনি দিতে দিতে টারজন আর দা সেরাকে ঘিরে দাঁড়াল। দা গামার অনুগত দু-চারজন অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। রুইজ যোদ্ধাদের কাছে রাজা দা গামা আর আসল দেবতার প্রতি অনুগত থাকার জন্য আহ্বান জানাল। কিন্তু রুইজকে সবাই ভয় আর ঘৃণা করত। এইজন্য অনেকে রুইজকে মারার জন্য তাকে ধরতে গেল। রুইজ পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গেল। তার পিছু পিছু দা গামাও পালাল।

এইভাবে আসারিও দা সেরা আলেমতেজোর রাজসিংহাসনে আরোহণ করল। দা সেরা সিংহাসনের পাশে বসে তার পাশে টারজনকে আসল দেবতা হিসাবে বসাল। এবার তাদের সামনে কেসাদা নামে একজন পুরোহিত এসে টারজনের সামনে নতজানু হয়ে বসল। দা সেরা টারজনকে বলল, এই হচ্ছে তোমার প্রধান পুরোহিত। জনতার সামনে ঘোষণা করে দাও।

টারজন তা না করায় দা সেরা নিজেই তা ঘোষণা করল।

সেই রাতেই প্রাসাদের মধ্যে এক ভোজসভার আয়োজন করল দা সেরা।

এমন সময় একদল দূত এসে নতুন রাজা দা সেরাকে খবর দিল একদল যোদ্ধা লবণ আর লোহা বোঝাই পাঁচটা পুঁটলি আনার সময় পথে তিনজন শ্বেতাঙ্গকে বন্দী করে এনেছে।

দা সেরা বলল, এটা শুভ সংবাদ। আমার রাজত্বের প্রথমেই এটা শুভ লক্ষণ। এর আগে কখনো আমরা শ্বেতাঙ্গ ক্রীতদাস পাইনি। আজ ওয়ারুতুরিদের গাঁ থেকে সোনার বিনিময়ে লোহা আর লবণ আনার সময় আমাদের যোদ্ধারা তিনজন শ্বেতাঙ্গকে বন্দী করে এনেছে।

টারজনের এসব ভাল লাগছিল না। তবু ব্যাপারটা দেখার জন্য বসল। সামন্ত ও যোদ্ধারা উঠে দাঁড়াল। দা সেরা বন্দী তিনজনকে সেখানে আনার জন্য হুকুম দিলে তাদের আনা হলো। বন্দী তিনজন হলো ক্রাম্প, মিনস্কি আর বোণ্টন। ক্রাম্প টারজনকে দেখেই আশ্চর্য হয়ে মিনস্কিকে বলল, ঐ দেখ, সেই বাঁদরলোকটা।

মিনস্কি বলল, লোকটা আবার সিংহাসনে বসে আছে। সোনার খনিটা আর খুঁজে পাব না।

টারজন ক্রাম্প ও মিনস্কিকে কিছু না বলে বোণ্টনকে বলল, তুমি একজন ইংরেজ, তুমি এদের সঙ্গে কিকরে এলে ?

বোণ্টন বলল, যারা আমাকে বন্দী করেছিল তারাই ওদের ধরে। আমি এদের কখনো দেখিনি। দু বছর আগে নিগ্রো মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ি আমি। ওদের সুলতান আমাকে সেখানে ক্রীতদাস করে রেখেছিল।

টারজন বলল, তুমি তাহলে ওদের দেশে দু বছর ছিলে।

বোণ্টন বলল, তুমিই কি এ রাজ্যের প্রধান ?

টারজন দা সেরাকে দেখিয়ে বলল, এ হচ্ছে এই রাজ্যের রাজা আর আমি দেবতা। এখানকার লোকেরা আমাকে দেবতা বলে মনে করে।

দা সেরা টারজনকে বলল, ঠিক আছে, তুমি এই লোকটাকে তোমার ক্রীতদাস হিসাবে রাখতে পার। বাকি দুজন বন্দী হয়ে থাকবে।

দা সেরার হুকুমে ক্রাম্প আর মিনস্কিকে কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো।

ভোজসভা শেষ হয়ে গেলে টারজন বোণ্টনকে তার ঘরে নিয়ে গেল। টারজন জানালার কাছে বোণ্টনকে নিয়ে গিয়ে বলল, নিগ্রো মুসলমানদের দেশটা কোথায় জান ? ওরা কিভাবে কি রীতিতে যুদ্ধ করে তা দেখেছ ?

বোণ্টন বলল, হ্যাঁ জানি।

টারজন বলল, আমি তোমাকে নিয়ে ওখানে যাব। ওখানে একটা লোক একটা মেয়েকে নিয়ে পালিয়েছে। আমি লোকটাকে খুন করে মেয়েটাকে উদ্ধার করতে চাই।

টারজন এবার দা সেরাকে বলল, নিগ্রো মুসলমানদের গাঁয়ে যাচ্ছি। সেই ভণ্ড লোকটাকে খুন করে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে চাই। ইংরেজ মেয়েটিকে সে জোর করে ধরে এনে এখানে দেবী বানিয়েছে।

দা সেরা বলল, আজ সকালে ওখানকার সুলতান একজন দূত পাঠিয়েছিল। ও বলেছে এখানকার রাজা যদি দুশো মোষ দেয় তাহলে ওরা ওদের দুজনকে ছেড়ে দেবে।

টারজন বলল, তোমার সব সৈন্য দিয়ে ওদের গাঁ আক্রমণ করো।

দা সেরা বলল, কেন আমি ওদের আক্রমণ করব ? এটা ত তোমাদের

নীতি নয়।

টারজন বলল, তুমি এখন সম্প্রতি রাজা হয়েছ। এখন যদি তোমাদের শত্রুদেশকে জয় করতে পার এই সুযোগে তাহলে এ দেশের জনগণ ও যোদ্ধারা সব তোমাকে দারুণ খাতির করবে। যুদ্ধ ও দেশ জয়ই রাজার মানসম্মান বাড়িয়ে দেয়।

দা সেরা কথাটা মেনে নিল।

নিগ্রো মুসলমানদের গাঁয়ে একটা কুঁড়ে ঘরে বন্দী ছিল সান্দ্রা পিকারেল। টারজন নামধারী লোকটা ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করতে গিয়েছিল খনিতে। সান্দ্রাকে একটা মেয়ে রোজ খাবার দিতে আসত। তাকে সে জিজ্ঞাসা করে জানল, সুলতান আলেমতেজোতে দূত পাঠিয়েছিল। দুশো মোষ তারা মুক্তিপণ হিসাবে দিলে ওদের দুজনকে ছেড়ে দেবে সুলতান। কিন্তু আমেলতেজো দিতে রাজী হয়নি। দূত ফিরে এসেছে।

সান্দ্রা মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল, আমার তাহলে কি হবে?

এমন সময় সুলতানের এক বুড়ী স্ত্রী এসে বলল, সুলতান এই শ্বেতাঙ্গ বন্দিনীকে আজই বিয়ে করবে। বিয়ের উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে গাঁয়ের মধ্যে।

আত্মহত্যার জন্য বুড়ীটাকে একটা ছুরি এনে দিতে বলল। বুড়ীটা সান্দ্রার প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। সান্দ্রাকে সুলতান বিয়ে করলে তার প্রতি তার আদর কমে যাবে।

ক্রীতদাসরা দিনের শেষে পাহাড় থেকে কাজ করে ফিরলে টারজন নামধারী লোকটা আর ডাটন কথাটা শুনল। শুনল, আজই সুলতান বিয়ে করবে সান্দ্রাকে। তাকে স্ত্রী করে রেখে দেবে তার কাছে।

লোকটা ডাটনকে বলল, আজই পালিয়ে যেতে হবে আমাদের।

ডাটন বলল, সুযোগ কোথায়? পলাতক ক্রীতদাসরা ধরা পড়লে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় তাদের।

লোকটা বলল, সুযোগ বার করতে হবে।

সেদিন দুপুরবেলায় একজন যোদ্ধা এসে সুলতানকে খবর দিল, সে নিজে দেখেছে, আলেমতেজোর এক বিরাট সৈন্যদল উপত্যকার ওধারে পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে। ওরা ঠিক আমাদের গাঁ আক্রমণ করবে। সুলতান সব ক্রীতদাসদের কাজ বন্ধ করে তাদের যুদ্ধের সাজে সজ্জিত করতে বলল।

অন্য সময় আলেমতেজোর যোদ্ধারা যুদ্ধের সময় সোজা উপত্যকা পার হয়ে মোষে টানা যুদ্ধের রথ নিয়ে যুদ্ধের ধ্বনি দিতে দিতে এ গাঁয়ের দিকে এগিয়ে এসে আক্রমণ করত। তা দেখে গাঁয়ের নিগ্রো মুসলমানরাও ছুটে গিয়ে তাদের সম্মুখীন হত। কিন্তু এবার টারজনের পরামর্শে আলেমতেজোর

যোদ্ধারা লুকিয়ে ছিল পাহাড়ের পাশে এক হাজার যোষ নিয়ে। রথগুলো এবার আনেনি। ওরা ঠিক করেছিল সন্ধ্যা হলে আক্রমণ করবে।

এদিকে সন্ধ্যা হতেই দা সেরা আক্রমণ করল। সুলতান সান্দ্রার হাতটা ছেড়ে দিয়ে যুদ্ধের জন্য সবাইকে প্রস্তুত হবার জন্য হুকুম দিতে লাগল। সব ক্রীতদাসদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হলো। মুসলমান যোদ্ধারা বর্শা আর তীর ধনুক নিয়ে রুখে দাঁড়াল। টারজনের বাঁদর-গোরিলারাও নিগ্রোদের ধরে ধরে কামড়াতে লাগল। বহু নিগ্রো মারা গেল। অনেকে যুদ্ধ ছেড়ে পরিবার নিয়ে পালাতে লাগল গাঁ ছেড়ে।

সান্দ্রা দেখল সুলতানের যোদ্ধারা হেরে যাচ্ছে! আলেমতেজোর যোদ্ধারা জয়ের ধ্বনি দিচ্ছে। তারা তাকে আবার বন্দী করে নিয়ে যাবে। সে তাই যুদ্ধের গোলমালের মধ্যে একসময় পালাল একদিকে। তাকে দেখতে পেয়ে টারজন নামধারী লোকটা তাকে গিয়ে ধরে ফেলল। ডাটনও তাদের কাছে চলে এল। সন্ধ্যার অন্ধকারে গাঁ পার হয়ে তারা বনের ভিতরে গিয়ে ঢুকে পড়ল।

সান্দ্রাকে পেয়ে ডাটন তাকে জড়িয়ে ধরল আবেগের সঙ্গে। বলল, সান্দ্রা তুমি! তোমাকে ফিরে পাব ভাবতেই পারিনি।

কথাগুলো ভারী সীসের মত টারজন নামধারী লোকটার অন্তরের উপর চেপে বসল। সে বুঝল ডাটন সান্দ্রাকে সত্যিই ভালবাসত। এ ভালবাসার প্রতিদান দিতে সান্দ্রা বাধ্য।

যুদ্ধে সুলতানের বাহিনীকে একেবারে হারিয়ে দিয়ে আলেমতেজো জয়লাভ করল। সুলতান লুকিয়ে পড়েছিল। দা সেরা তাকে খুঁজে বার করে রাখল আলেমতেজোতে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। টারজন সেই ভণ্ড লোকটা বা সান্দ্রাকে অনেক খুঁজেও কোথাও পেল না। তখন সে বলল, এখন রাত্রিকাল। কাল সকালে আবার খোঁজ করব।

টারজন এবার তার বাঁদর-গোরিলাদের ডেকে বলল, তোমরা এখন যেতে পার। আর এখন কোন কাজ নেই।

উঙ্গো তার দলের সবাইকে নিয়ে তখনি চলে গেল। টারজন তখন বোল্টনকে ডেকে বলল, আমরাও এই অবসরে সরে পড়ি। দা সেরাকে বলার কিছু নেই।

টারজন সঙ্গে সঙ্গে বোল্টনকে নিয়ে যাওয়ার পরই বেরিয়ে পড়ল গাঁ থেকে। সুলতান তার বিয়ের ভোজের জন্য যে সব খাবার প্রস্তুত করেছিল সেই সব খাবার দা সেরা আর তার যোদ্ধারা খেয়ে শেষ করল।

পথে বেরিয়ে বোল্টন টারজনকে বলল, তোমার পরিকল্পনা কি? এখন কি করবে ঠিক করেছ?

টারজন বলল, আপাতত: লোকটাকে খুঁজে বার করে খুন করব। তারপর তোমাকে কঙ্গোর বৃটিশদের কাছে পৌছে দেব। সেখান থেকে তুমি দেশে ফিরে যাবার জাহাজ পেয়ে যাবে।

বোল্টন বলল, এখান থেকে বেরিয়ে যাবার দুটো পথ আছে। একটা খাদের পাশ দিয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে আর একটা উপত্যকা আর বনের ভিতর দিয়ে। এই পথটাই সোজা। আমরা এই সোজা পথটা দিয়ে যাব।

এদিকে আলেমতেজোর রাজপ্রাসাদে দা সেরা যখন যুদ্ধের প্রস্তুতির ব্যাপারে ব্যস্ত ছিল তখন এক ফাঁকে ক্রাম্প আর মিনস্কি প্রাসাদের বাইরে বনে পালিয়ে যায়।

বনে গিয়ে ক্রাম্প বলল, সকাল হলে সোনার খনির খোঁজ করব।

মিনস্কি বলল, সকাল হলে আমি এই অভিশপ্ত দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজব।

ক্রাম্প বলল, আমি যদি জানতাম তুমি একটা ভীরু কাপুরুষ তাহলে তোমাকে আমি সঙ্গে আনতাম না।

মিনস্কি বলল, আমিও যদি জানতাম তোমার বুদ্ধিটা গাধার মত তাহলে তোমার সঙ্গে আসতাম না। আজ শিকার করার মত হাতে একটা অস্ত্রও নেই। এখন সোনার খনি না খুঁজে কোথায় খাবারের মত কিছু পাওয়া যায় তার চেষ্টা করো।

ক্রাম্প সোনার লোভে মিনস্কিকে এড়িয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু একেবারে একা থাকা ঠিক হবে না এই বিপজ্জনক জায়গায় এজন্য মুখে গালাগালি করলেও তার সঙ্গ ছাড়ছিল না।

ওরা আলেমতেজোর যোদ্ধাদের সঙ্গে যাতে দেখা না হয় তার জন্য ঘুরপথে এগিয়ে যাচ্ছিল। এজন্য সারারাত ধরে পথ চলার পর সকালে ওরা রুতুরি পাহাড়ের পাদদেশে গিয়ে পৌছল। সেই পাহাড়ের মধ্যেই এক জায়গায় টারজন নামধারী লোকটা, ডাটন আর সান্দ্রা লুকিয়েছিল। পাহাড়ে ওঠার আগেই ক্লান্ত হয়ে একজায়গায় শুয়ে পড়ে বিশ্রাম করতে লাগল ক্রাম্প আর মিনস্কি। ক্ষুধা আর তৃষ্ণা দুটোতেই কাতর হয়ে পড়েছিল ওরা।

এদিকে সান্দ্রা সেই পাহাড়ের কোলে একজায়গায় সকাল হতেই জেগে উঠল ঘুম থেকে। সে দেখল তার সঙ্গী দুজন তখনো ঘুমোচ্ছে। সে দুজনের মুখপানে তাকাল। ডাটনকে সে আগে ভালবাসত। কিন্তু তাকে আজ কাছে পেলেও যে তাকে একদিন ধরে নিয়ে এসে এত সব বিপদের মধ্যে ফেলে দেয় টারজন নামধারী সেই লোকটার প্রতি তার হৃদয়ের দুর্বলতাটাকে মুছে ফেলতে পারছিল না তার মন থেকে। সে দেখল ডাটনের থেকে লোকটা বলিষ্ঠ চেহারার এবং তার মুখখানাও বেশ মিষ্টি। মাথার লম্বা চুলগুলো

ছড়িয়ে পড়েছিল মুখের চারদিকে। লোকটা মাথামোটা, কোন কারণে অতীতের সব স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। সে পরের কথায় তাকে চুরি করে আনলেও পরে সে নিজের ভুল বুঝতে পারে। এতদিন তাকে এত কাছে পেয়েও তার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি বা কোন জারজ লালসার পরিচয় দেয়নি। ফলে লোকটার অসহায় অবস্থা দেখে ধীরে ধীরে মমতামেশানো এক ভালবাসা জাগে তার অন্তরে।

লোকটা জেগে উঠে সান্দ্রার দিকে চোখ মেলে তাকাল। সান্দ্রা লজ্জা পেল। এমন সময় ডাটনও জেগে উঠল। ডাটন বলল, আজ কোন্‌দিকে এগোব আমাদের তা ঠিক করতে হবে। গতকাল রাতে অন্ধকারে কিছু ঠিক করতে পারিনি।

সান্দ্রা বলল, ঐ পাহাড় থেকে আমি নামতে পারব না। আমার অভিজ্ঞতা আছে।

টারজন নামধারী লোকটা বলল, আর একটা পথ আছে এদেশ থেকে বেরিয়ে যাবার। পথটা খুঁজতে হবে আমায়।

ডাটন বলল, এখন আমাদের খাবার চাই। তাহলে একই সঙ্গে পথ আর আহার খুঁজতে হবে।

ওরা তিনজনই আর দেরী না করে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে লাগল।

দশম অধ্যায়

টারজনের কাছ থেকে ছাড়া পেয়েই উঙ্গো আর মালগাশের দুটো দল আবার ঝগড়া করে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। দুটো দল দুদিকে আহারের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। গতরাতে যুদ্ধের পর থেকে তাদের মনমেজাজ গরম হয়ে ছিল। তার উপর গতকাল থেকে কিছু খেতে না পেয়ে আরো রেগে গিয়েছিল।

সান্দ্রা ক্লান্তি আর ক্ষুধাজনিত দুর্বলতায় পথ চলতে পারছিল না। ডাটন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সে সুলতানের অধীনে ক্রীতদাসরূপে অনেক দিন ধরে কাজ করে করে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া তার দেহটাও টারজন নামধারী লোকটার মত বলিষ্ঠ ছিল না এতখানি।

লোকটা বলল, তোমরা দুজনেই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। ঠিকমত পা ফেলে চলতে পারছ না। তোমরা বরং এখানে একটু বিশ্রাম করো। আমি ঐ বাঁশবনে গিয়ে কোন শিকার পাই কি না দেখি।

সান্দ্রা বলল, না, এখন আমাদের একসঙ্গে থাকাই ভাল। একতাই বল।

একসঙ্গে তিনজনই ওরা এগোতে লাগল। টারজন নামধারী লোকটা হঠাৎ বলল, মনে হচ্ছে সামনের ঐ বাঁশবনটায় কি একটা বড় জন্তু রয়েছে। দেখি কোন শিকার পাওয়া যায় কিনা।

এই বলে সে তীর ছুঁড়ে দিল বাঁশবনটার ভিতরে।

কিন্তু বাঁশবনের মধ্যে মালগাশের বাঁদর-গোরিলাদের দলটা আহার খুঁজছিল, ওরা বুঝতে পারেনি।

একটা বাঁদর-গোরিলার গায়ে তীরটা লাগায় ওরা ক্ষেপে গিয়ে বেরিয়ে এল।

টারজন নামধারী লোকটা বলল, ওরা দেবতার সেবক।

সে বাঁদর-গোরিলাগুলোকে থামতে বলল। বলল আমি হচ্ছি তোমাদের দেবতা। তোমরা থাম। আমার কথা শোন। কিন্তু ওরা থামল না। ওরা ওদের তিনজনকেই আক্রমণ করল ভয়ঙ্করভাবে।

ডাটন আর নকল টারজনের হাতে গতকাল নিগ্রো মুসলমানরা যুদ্ধের সময় যে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল তাদের হাতে শুধু তাই ছিল। অস্ত্র মানে তীর, ধনুক আর বর্শা।

টারজন নামধারী লোকটা তার বর্শা দিয়ে একটা বাঁদর-গোরিলাকে আঘাত করলো। তারা এর আগে আবার দুটো তীর ছোঁড়ায় বাঁদর-গোরিলাগুলো আরো ক্ষেপে যায়। বাঁদর-গোরিলাগুলো তাদের দেবতাকে দেখে চিনতে পারলেও প্রথমে তার হাত থেকে ছোঁড়া তীরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তার প্রতি তাদের অতীতের আনুগত্যের কথা ভুলে গিয়ে শত্রু হয়ে ওঠে তারা।

ডাটন বর্শা দিয়ে যাকে আঘাত করল সেই বাঁদর-গোরিলাটা তার বর্শাটা কেড়ে নিয়ে ভেঙ্গে দিল। ডাটন তার বর্শাটা দিয়ে আঘাত করতে সেও সেটা ভেঙ্গে দিল। বাঁদর-গোরিলাগুলো এরপর বর্শার বাঁট দিয়ে টারজননামধারী লোকটার মাথায় জোর আঘাত করায় সে অচেতন হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। তাদের একজন ডাটনকে তুলে নিয়ে ঘাড়ে একটা জোড় কামড় দিতে সেও লুটিয়ে পড়ল। এবার একজন সান্দ্রাকে তুলে নিয়ে পালাতে লাগল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আর একটা বাঁদর-গোরিলা সান্দ্রাকে কেড়ে নেবার জন্য ছুটতে লাগল। তখন যে বাঁদর-গোরিলাটা সান্দ্রাকে কাঁধে তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল সে তাকে নামিয়ে দিয়ে অন্য গোরিলাটার সঙ্গে লড়াই করতে

লাগল। সান্দ্রা এই সুযোগে পালাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু অন্য বাঁদর-গোরিলাটাকে হারিয়ে দিয়ে আগের বাঁদর-গোরিলাটা আবার ধরে ফেলল সান্দ্রাকে।

সারাদিন ধরে অনেক খুঁজেও আহারের কোন সন্ধান পেল না ক্রাম্পরা। মাঝখানে একজায়গায় শুধু জল পেয়েছিল। তার দ্বারা পিপাসাটা মেটাতে পারলেও খাবার কোন কিছু পায়নি। রাত্রি হতেই শীতে কাঁপতে কাঁপতে শুয়ে পড়ল তারা দুজনে।

সহসা একটা সিংহের গর্জন শুনতে পেল তারা। সিংহটা কাছে এলে ওরা বুঝল সেটা মানুষখেকো নয় তবে খুবই ক্ষুধার্ত। কারণ সে মানুষের গন্ধ পেয়েও ক্রাম্পদের দিকে নজর দিল না। তাদের অদূরে যে দুটো মানুষের অচেতন দেহ মরার মত পড়েছিল তাদের একটাকে ঘাড়ে চাপিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেল।

সকাল হলে সিংহটার পেট ভর্তি থাকায় সে বনের গভীরে ঘুমোতে চলে গেল। ক্রাম্প আর মিনস্কি উঠে বলল, এই অবসরে আমাদের চলে যাওয়া উচিত এখান থেকে।

ক্রাম্প বলল, ঐ দেখ একটা মানুষ হয়ত ঘুমোচ্ছে।

মিনস্কি বলল, আরে, এই লোকটাই ত টারজন যে মেয়েটাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।

ক্রাম্প বলল, মেয়েটা এখন কোথায়, এর কাছে নিশ্চয় খবর পাওয়া যাবে। মেয়েটাকে পেলে এখনো তিন হাজার পাউণ্ড পাওয়া যেতে পারে।

এদিকে টারজন নামধারী লোকটা চেতনা ফিরে পেয়ে ততক্ষণে উঠে বসে চারদিকে তাকাচ্ছিল। সে সান্দ্রা আর ডাটনের খোঁজ করছিল। কিন্তু তাদের কাউকে দেখতে পেল না। শুধু দেখল দুজন শ্বেতাঙ্গ তার দিকেই আসছে। সে তাদের চিনতে পারল। সান্দ্রা আর ডাটন কোথায় গেছে ওরা তা জানে কি না তা বুঝতে পারছিল না। পরে সে ভেবে দেখল একদল বাঁদর-গোরিলা তাদের আক্রমণ করেছিল। তাদের দুজনকে অচেতন করে ফেলে দিয়ে সান্দ্রাকে নিয়ে পালায় তারা। তার মাথায় বর্শার বাঁট দিয়ে জোর আঘাত করে তাকে ফেলে দেয়।

ক্রাম্প মিনস্কিকে চুপি চুপি বলল, লোকটাকে খুন করা উচিত।

মিনস্কি বলল, কি দিয়ে খুন করবে? তোমার শুধু দাঁত ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই।

ওরা কাছে এলে নকল টারজন বলল, তোমরা কিকরে এলে এখানে? মিস পিকারেলকে দেখেছ? কোন খবর জান তার?

ক্রাম্প বলল, তুমি আমাদের শিবির থেকে তাকে চুরি করে নিয়ে যাবার পর থেকে তাকে আর দেখিনি। কোন খবরও জানি না।

টারজন নামধারী লোকটা বলল, গতকাল বিকালে আমরা তিনজনে এইখানে এসে পড়ি। তারপর একদল বাঁদর-গোরিলা আমাদের আক্রমণ করে। তারা বর্শার বাঁট দিয়ে আমার মাথায় জোর আঘাত করতেই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। তারপর কি হয়েছে তা আমি জানি না। মনে হয় ওদের দুজনকে তারা তুলে নিয়ে গেছে।

ক্রাম্প বলল, নিয়ে গেলে মেয়েটাকেই তারা নিয়ে গেছে।

এরপর সেখানে অনেক রক্ত দেখে বলল, এখানে এত রক্ত কিসের? তোমার দেহে কোথাও ক্ষত হয়েছিল?

টারজন নামধারী লোকটা বলল, না, আমার দেহে ক্ষত হয়নি। তাদের কারো রক্ত হবে। তাদের আমায় খুঁজে বার করতেই হবে। আমরা বেশ বন্ধুভাবেই ছিলাম। তারা ক্ষমা করেছিল আমার সব অপরাধ।

ক্রাম্প বলল, আমরাও যাব তোমার সঙ্গে। কিন্তু না খেতে পেয়ে বড় দুর্বল হয়ে পড়েছি আমরা। আমাদের হাতে কোন অস্ত্র নেই। তোমার তবু তীর ধনুক আছে। তুমি শিকার করতে পারবে।

নকল টারজন বলল, এস আমার সঙ্গে।

এরপর তারা বনের দিকে চলে গেল।

সান্দ্রাকে বাঁদর-গোরিলাটা যখন বনের ভিতর দিয়ে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন গাছের ডালে ও ঝোপের কাঁটায় লেগে তার দেহের নানা জায়গা ছিঁড়ে ও কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ তাদের পথে উঙ্গো তার দলবল নিয়ে এসে পড়ে। উঙ্গো দেখল সাঁচো নামে আলেমতেজোর এক বাঁদর-গোরিলা একটা শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে নিয়ে পালাচ্ছে।

উঙ্গো সাঁচোর পথরোধ করে দাঁড়াতেই সে তার দলের বাঁদর-গোরিলাদের ডাকতে থাকে। তারা এসে পড়লে দুদলে আবার লড়াই শুরু হয়ে যায়। সাঁচো সান্দ্রাকে নামিয়ে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে রাখে। সান্দ্রা যখন দেখল দু'দলের সব বাঁদর-গোরিলারা পরস্পরকে কামড়াচ্ছে এবং ভীষণভাবে মারামারি করছে তখন সে আর দাঁড়াল না সেখানে। সে চলে গেল। যেতে যেতে পিছন ফিরে একবার দেখল, সব বাঁদর-গোরিলারা তখনো লড়াইয়ে ব্যস্ত এবং তার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না।

একাদশ অধ্যায়

ক্রাম্প, মিনস্কি আর নকল টারজন একই সঙ্গে আহার আর সান্দ্রার অনেক খোঁজ করেও কিছুই পেল না। কোন আহারের বস্তু বা সান্দ্রার কোন সন্ধান পেল না তারা। নকল টারজনের খুব খিদে পেলেও তার মন সান্দ্রার চিন্তায় বিভোর হয়ে ছিল।

ক্রাম্প আর মিনস্কি দুজনে ঝগড়া করতে লাগল নিজেদের মধ্যে। মিনস্কি বলল, আমি কিছুই চাই না, শুধু এই অভিশপ্ত দেশটা থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।

ক্রাম্প বলল, ফের যদি একথা বলবে তাহলে তোমার মাথা ভেঙ্গে ফেলব।

নকল টারজন রেগে গিয়ে মিনস্কির গালে একটা চড় বসিয়ে দিল। বলল, মনে রেখো, আমার তীর ধনুক না থাকলে তোমরা কোন শিকার বা আহার পাবে না।

ক্রাম্প বলল, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোন শিকারই করতে পারনি।

নকল টারজন বলল, আমার কথা না শুনলে তোমরা যেতে পার।

ওরা ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ের মধ্যে একটা খনির কাছে এসে পড়ল। ওরা দেখল খনির মুখটা বেশ বড়। উপর থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে ধাপে ধাপে। খনির ভিতরটা পঁচিশ ফুট গভীর এবং খনির আধ একর জায়গা জুড়ে বিস্তৃত।

নকল টারজনের পাশে ক্রাম্প আর মিনস্কি দাঁড়িয়েছিল। ক্রাম্প আনন্দের আবেগে চীৎকার করে উঠল, খনি, সোনার খনি পেয়ে গেছি। দেখ, দেখ।

ক্রাম্প সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। মিনস্কি তার পিছু পিছু গেল।

এই খনিটা থেকেই আলেমতেজোর লোকেরা আর সুলতানের নিগ্রো মুসলমানরা সোনা খুঁড়ে নিয়ে যায়। নিগ্রো মুসলমানদের ক্রীতদাসরা এই খনিটাতেই কাজ করতে করতে হঠাৎ যুদ্ধ লাগায় কাজ ফেলে চলে যায়। যুদ্ধে নিগ্রো মুসলমানরা হেরে যাওয়ায় এবং সুলতান বন্দী হওয়ায় কাজ বন্ধ আছে। খনিটার ভিতরে তাল তাল খাঁটি সোনা ছড়িয়ে পড়ে ছিল। তাড়াহুড়ো করে সেগুলো নিয়ে যেতে পারেনি তারা।

সেই সব সোনার তালগুলো লোভে উন্মত্ত হয়ে ক্রাম্প কুড়িয়ে জড়ো করে

এক জায়গায় রাখতে রাখতে বলল, এগুলো সব আমার।

নকল টারজন আশ্চর্য হয়ে বলল, এগুলো নিয়ে কি করবে ?

ক্রাম্প বলল, তুমি একটা বোকা। কি করব ? এগুলো ইংলণ্ডে নিয়ে গিয়ে বিরাট ধনী হব। এই বলে সে তার গায়ের কোটটা খুলে তার মধ্যে সোনার তালগুলো তুলে রাখতে লাগল।

নকল টারজন বলল, এগুলো বয়ে নিয়ে যাবে কি করে ?

ক্রাম্প বলল, তোমার গায়ে একটা কোট থাকলে আমার উপকার হত। ঠিক আছে, আমি প্যাণ্টটা খুলে তাতে সোনার তাল যতগুলো পারব ভরব।

নকল টারজন বলল, তোমরা যা করবে করো। আমি এসব কিছুই নেব না।

ক্রাম্প বলল, কি বলছ তুমি! অসভ্য বর্বর লোকগুলোর জন্য এগুলো ফেলে রেখে যাবে ? খাঁটি সোনা বাছা। এগুলো দিয়ে যা খুশি কিনতে পারবে তুমি—মদ, মেয়েমানুষ, ঘোড়া। এ দিয়ে আমি একটা বড় উপাধিও লাভ করতে পারি। দেখবে আমি হব লর্ড টমাস ক্রাম্প।

মিনস্কি বলল, তুমি একটা মাথামোটা। তোমার মত লোককে কেউ লর্ড উপাধি দেবে না।

ক্রাম্প সেকথায় কান না দিয়ে নকল টারজনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, প্যাণ্ট কোট পরার মত তোমার শিক্ষা ও সভ্যতা না থাকলেও লজ্জার কিছু নেই। তুমি আমাদের এগুলো বয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পার। তোমার গায়ে শক্তি আছে। আমাদের থেকে দ্বিগুণ পরিমাণ সোনা তুমি বয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

নকল টারজন বলল, এসবে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি শিকার আর সান্ড্রা পিকারেলের খোঁজে যাচ্ছি। তোমরা যদি এ দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে চাও তাহলে সোনার কথা ভুলে গিয়ে আমার সঙ্গে আসতে পার।

ক্রাম্প বলল, না, মরে গেলেও যাব না। তুমি শিকারে যাবে যাও। আমি এ সোনাগুলো নিয়ে যাইব।

খনির মুখ থেকে চলে গেল নকল টারজন। সে দেখল যে পথে তারা এখানে এসেছিল সে পথটা খনির মুখে এসেই শেষ হয়েছে। সুতরাং ভুল পথে এসেছে তারা। এ দেশ থেকে বেরিয়ে যাবার পথটা খুঁজে পায়নি এখনো।

নকল টারজন চলে গেলে মিনস্কি বলল, এত সোনা কি করে বয়ে নিয়ে যাবে তুমি ? সে তার কোটের আঁচলে কয়েকটা সোনার তাল তুলে বলল, দারুণ ভারী।

ক্রাম্প তার কোট ও প্যাণ্টের মধ্যে সোনাগুলো ভরে একটা পুঁটলি করে বলল, আমার মনে হয় এর বেশী আর বইতে পারব না আমি।

সোনার পুঁটলিটা কাঁধের উপর তোলার চেষ্টা করল ক্রাম্প। কিন্তু মাটি থেকেই সেটা তুলতে পারল না।

মিনাস্কি বলল, লর্ড উপাধিটা তাহলে ফেলে যেতে হলো।

ক্রাম্প বলল, তোমাকে খুন করা উচিত।

মিনস্কি হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে তাকে ঠাট্টা করতে লাগল। সেও তার কোটটা খুলে তাতে কতকগুলো সোনার তাল ভরেছিল। তারপর কোটটা পুঁটলির মত করে বেঁধেছিল। কিন্তু তার পুঁটলিটা ক্রাম্পের পুঁটলির মত অতটা ভারী হয়নি। সে অতিকষ্টে পুঁটলিটা কাঁধের উপর তুলে নিল কোনরকমে।

ক্রাম্প তার পুঁটলিটা তুলতে না পারায় কতকগুলো সোনার তাল ফেলে দিয়ে সেটা তুলতে গেল। কিন্তু এবারও পারল না। সে রেগে গিয়ে মিনস্কি আর নকল টারজনকে গালাগালি করতে লাগল। সে আরো কতকগুলো সোনার তাল ফেলে দিয়ে পুঁটলিটা কাঁধের উপর তুলে নিল। কিন্তু সে সেই পুঁটলিটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারছিল না। বোঝাভারে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল। ঘাম ঝরছিল সর্বাঙ্গে।

মিনস্কি অর্ধেক পথ উঠে পড়ে গেল। সেখানেই শুয়ে রইল সে। ক্রাম্প হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে গিয়ে বলল, সরে যাও আমার পথ থেকে।

ক্রাম্প উঠতে গিয়ে পড়ে গেল। তারপর মিনস্কি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর উঠে সিঁড়ি বেয়ে খনির বাইরে এসে পড়ল। ক্রাম্পও তার দেখাদেখি কোনরকমে খনির বাইরে চলে এল। দুজনেই খনির মুখটার বাইরে এসে বোঝার ভারে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

বাঁদর-গোরিলাদের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল সান্ড্রা। তার কেবলি মনে হচ্ছিল কেউ যদি এখান থেকে তার দেশ স্কটল্যাণ্ডে ফিরে যাবার পথটা দেখিয়ে দেয় তাহলে সে তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া সব ধনসম্পত্তি দিয়ে দেবে তাকে।

এদিকে রাতেং নামে এক নিগ্রো মুসলমান তখন বনের মধ্যে একা একা শিকার করে বেড়াচ্ছিল। সে তখন ভাবছিল তাদের সুলতানের কথা। সুলতানকে বন্দী করে নিয়ে গেছে আলেমতেজোর রাজা। তাকে হয়ত তারা মেরে ফেলবে। তাহলে সুলতান আলির ছেলে সুলতান হবে এবং সে সুলতান হলে তাদের অবস্থা আরো খারাপ হবে। কারণ সে সুলতানের থেকে আরো নিষ্ঠুর এবং অত্যাচারী। নিগ্রো মুসলমানদের যে দলটা আলেমতেজোর দেবতা আর দেবীকে আলেমতেজোর প্রাসাদের পিছনের বনটায় ধরে সুলতানের কাছে নিয়ে যায় তারে গাঁয়ে তাদের মধ্যে রাতেংও ছিল। ওদের

শ্বেতাঙ্গ দেবী সত্যিই বড় সুন্দর। মাথায় সোনার মুকুট, বুকে সোনার বক্ষবন্ধনী আর জমকালো পোশাক পরায় তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। সুলতান তাকে স্ত্রী করত যুদ্ধে হেরে না গেলে।

এই সবকিছু ভাবতে ভাবতে সহসা কার পায়ের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল রাতেং। সে তার ধনুকে তীর সংযোজন করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে শব্দটা লক্ষ্য করতে লাগল। সে দেখল আলেমতেজোরা যাকে দেবী বলে, যার কথা একটু আগে সে ভাবছিল সেই শ্বেতাঙ্গ মেয়েটি এই পথেই আসছে একা একা। তার সঙ্গে কেউ নেই।

রাতেং গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতেই চমকে উঠল সান্দ্রা। ভয়ে সে ছুটতে লাগল পালাবার জন্য। কিন্তু ক্লান্তি আর দুর্বলতার জন্য সে বেশী জোরে ছুটতে পারল না। রাতেং তাকে ধরে ফেলল।

রাতেং ভাবল সে তাকে এখন গাঁয়ে নিয়ে যাবে না। এই পাহাড়ের পিছন দিকে একটা নির্জন গুহা আছে। সেখানে ঝর্ণার জল আর গাছে অনেক ফল আছে। সেখানে মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে সুলতানদের মত কিছুদিন ভোগ করবে। তারপর তার গাঁয়ে ফিরে যাবার সময় মেয়েটাকে গলা কেটে তাকে খুন করে ফেলে দিয়ে যাবে। গাঁয়ে তাকে নিয়ে গেলে সুলতানের ছেলে তাকে নিয়ে নেবে। অথচ তার জন্য তাকে কোন পুরস্কারই দেবে না। আলেমতেজোতে তাকে নিয়ে গেলে তারা পুরস্কার দিলেও সারাজীবন তাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে সেখানে।

রাতেং সান্দ্রাকে ধরে বলল, তুমি একা ?

সান্দ্রা বলল, আমার বন্ধুরা আমার পিছনে আছে।

তার কথা বিশ্বাস করল না রাতেং। সে চারদিকে তাকিয়ে আর কোন লোক দেখতে পেল না। সে তাই সান্দ্রার হাতটা ধরে তাকে টানতে টানতে পাহাড়ে উঠতে লাগল। পাহাড়টার ওপারেই আছে সেই নির্জন গুহাটা।

সান্দ্রা তাকে বলল, কি চাও তুমি আমার কাছে ?

রাতেং বলল, একটু পরেই জানতে পারবে। মনে রেখো, তুমি একজন নারী আর আমি একজন পুরুষ।

সান্দ্রা বলল, আমি নারী নই, দেবী।

রাতেং হাসল। হেসে বলল, একমাত্র আল্লা ছাড়া আর কোন দেবতা নেই। তুমি হচ্ছ কাফের, বিধর্মী। তোমাকে বধ করে স্বর্গে গিয়ে আমি পুরস্কার লাভ করব।

সান্দ্রা ভয়ে ভয়ে বলল, আমাকে বধ করবে তুমি ?

রাতেং বলল, এখন নয়, পরে।

সান্দ্রা দেখল লোকটা বর্বর। তার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের কোন

উপায় নেই। সে তাই বুদ্ধি খাটিয়ে একটা পরিকল্পনা করল। সে আর বাধা না দিয়ে লোকটার পিছু পিছু পথ চলতে লাগল। লোকটার পিঠে একটা তূণ ছিল। তাতে ছিল অনেক বিষমাখা তীর।

হঠাৎ পিছন থেকে রাতেঙের তূণ থেকে একটা তীর তুলে নিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেই তীরের ফলাটা রাতেঙের পিঠে বসিয়ে দিল। তীরের ফলাটা তার পিঠের মধ্যে ঢুকে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে এক ভীষণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল রাতেং। সে লাফ দিয়ে সান্দ্রার গলাটা টিপে ধরল। চিৎ হয়ে পড়ে গেল সান্দ্রা। রাতেংও পড়ে গেল। তার হাতদুটো তখনো সান্দ্রার গলাটা ধরে ছিল।

এদিকে আহারের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে নকল টারজন ভাবতে লাগল সান্দ্রা পিকারেল হয়ত মারা গেছে। ডাটনের জন্যও দুঃখ হচ্ছিল। তার প্রতি কিছুটা ঈর্ষাবোধ করা সত্ত্বেও লোকটাকে ভাল লেগেছিল তার। ক্রাম্প আর মিনস্কির সঙ্গ তার মোটেই ভাল লাগে না। সে তাই তাদের ছেড়ে চলে এসেছে।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা আর্তনাদ শুনতে পেল নকল টারজন। মানবতার খাতিরে সেই আর্তনাদের শব্দ লক্ষ্য করে ছুটতে লাগল। ঘটনাস্থলে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ভূত দেখে যেন চমকে উঠল। দেখল সান্দ্রা পিকারেল মরার মত পড়ে রয়েছে আর তার উপর একটা নিগ্রো আদিবাসী মরে পড়ে আছে। তার পিঠে একটা তীর গাঁথা ছিল।

ছুটে গিয়ে সান্দ্রার উপর থেকে মৃতদেহটা সরিয়ে দিল নকল টারজন। তারপর সান্দ্রার দেহটা নিজের কোলের উপর তুলে নিল। তার উপর কান পেতে দেখল তার দেহে তখনো প্রাণ আছে।

ক্রমে জ্ঞান ফিরে এলে চোখ মেলে চাইল সান্দ্রা। নকল টারজনকে দেখেই সে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, দেবতা! তবে কি আমি মরে গেছি। মৃত্যুপুরীতে গিয়ে তাকে দেখছি।

কথাগুলো খুব অস্পষ্ট হলেও তা শুনতে পেল নকল টারজন। সে বলল, না না মৃত্যু নয়, আমরা দুজনেই বেঁচে আছি।

সান্দ্রা বলল, আমি যে নিজের চোখে দেখেছি বাঁদর-গোরিলারা তোমাকে ও ডাটনকে মেরে ফেলেছে।

নকল টারজন সান্দ্রাকে বুকের উপর আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরে বলল, না প্রিয়তমা, তুমি আমি কেউ আমরা মরিনি।

সান্দ্রাও কোন আপত্তি করল না। সেও তার হাতদুটো বাড়িয়ে তার গলাটাকে জড়িয়ে ধরল। এইভাবে অনেকক্ষণ রইল ওরা। পরে সান্দ্রা যা যা ঘটেছিল সব বলল।

নকল টারজন বলল, সত্যিই তুমি খুব সাহসী।

সান্দ্রা বলল, পেলহ্যাম কোথায়? সে কি মারা গেছে?

নকল টারজন বলল, মনে হয় সে মারা গেছে। তার কোন খোঁজ পাইনি। আমি ত ভেবেছিলাম তুমিও মারা গেছ। কি করে রক্ষা পেলে বাঁদর-গোরিলাগুলোর হাত থেকে?

সান্দ্রা বলল, ওরা যখন আমাকে নিয়ে ঝগড়া করছিল তখন আমি পালিয়ে এসেছি। তাহলে এখন আমরা দুজনেই বেঁচে আছি?

নকল টারজন বলল, ক্রাম্প আর মিনস্কিও বেঁচে আছে। তারা সোনার খনি থেকে এত সোনা তুলেছে যা তারা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। ক্ষুধার্ত হলেও খাবারের চিন্তা নেই।

সান্দ্রা বলল, এখন তোমাকে কিছু শিকার করতে হবে। তারপর তাদের কাছে আমরা ফিরে যাব।

নকল টারজন বলল, তাদের কাছে যাবার কোন প্রয়োজন নেই। তারা শুধু সোনা ছাড়া আর কিছু চায় না।

সান্দ্রা বলল, তাহলে ক্ষিদের জ্বালায় মরে যাবে তারা আর তুমি সেটা দেখবে?

নকল টারজন বলল, অনেক সোনা পেয়েছে তারা; সুতরাং তাদের মৃত্যুটাও খুবই সুখের হবে।

সান্দ্রা বলল, এখন তাহলে আমরা কি করব?

নকল টারজন বলল, এখন আমাদের সামনে মাত্র দুটো পথ খোলা আছে। এক হলো, আলেমতেজোতে ফিরে গিয়ে আবার দেবদেবী সেজে থাকা, আর একটা পথ হলো ঐ পাহাড়টা পার হয়ে তোমার বাবার কাছে ফিরে যাওয়া। আমি মনে করছি তাই যাব। এখন আমাদের কিছু খাওয়া দরকার।

শিকারের সন্ধান করতে করতে বিকালের দিকে একটা হরিণ দেখতে পেল ওরা। একটা ছোট্ট নদীতে একটা হরিণ জল খাচ্ছিল। বর্শা দিয়ে হরিণটাকে শিকার করল নকল টারজন। তারপর কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বেলে সেই আগুনে হরিণের অনেকটা মাংস ঝলসে নিল। পরে দুজনে তা খেয়ে নদী থেকে জল খেয়ে এল।

পাহাড়ের ধারে একটা গুহা দেখে নকল টারজন বলল, এখন তুমি বেশী হাঁটতে পারবে না। এই গুহাটাতে আমরা রাতটা কাটাব; পরে আবার যাত্রা শুরু করব।

সান্দ্রা সেই নদীর ধারেই ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল হাতে মাথা দিয়ে। তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল নদীর ওপারে। আকাশটা একেবারে নীল। বেশ হাওয়া বইছিল। জায়গাটা একেবারে নির্জন। শুধু বন, নদী আর পাহাড়।

সান্দ্রা চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, আমার খুব ভাল লাগছে। যদিও তোমার নাম ধাম কিছুই জানি না তবুও তোমার সঙ্গ বড় ভাল লাগছে আমার।

নকল টারজন বলল, আমরা দুজনে দুজনকে ভালবাসি এটাই যথেষ্ট। নাম বা পরিচয় জেনে কি হবে?

ক্রাম্প আর মিনস্কি সেই খনির মুখটার বাইরে জ্বলন্ত রোদে শুয়ে রইল। অবশেষে মিনস্কি তার কনুইএর উপর ভর দিয়ে মুখটা তুলে চারদিকে তাকিয়ে দেখল অদূরে একটা গাছ রয়েছে। সে তাই অতি কষ্টে তার বোঝাটা নিয়ে সেই গাছটার ছায়ায় চলে গেল।

তার দেখাদেখি ক্রাম্পও সেখানে চলে গেল। অন্ততঃ রোদের আগুন থেকে রক্ষা পাবে তারা। সে বলল, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর আমরা আবার চলতে পারব।

মিনস্কি বলল, সেই বাঁদরের মত লোকটা কিছু খাবার নিয়ে না এলে আমি কোথাও যাব না।

তখন সন্ধ্যা নেমে আসছিল। ক্রাম্প বলল, লোকটার আরো আগেই আসা উচিত ছিল। সে আর আসবে না।

ওদের দারুণ জলপিপাসা পেয়েছিল। কিন্তু নকল টারজন শিকার নিয়ে এসে তাদের দেখতে না পেয়ে চলে যাবে এই ভয়ে জলের খোঁজে যেতে পারছিল না তারা।

মিনস্কি বলল, কেন সে আসবে বল? আমাদের দিয়ে ত তার কোন উপকার হবে না।

ক্রাম্প বলল, একবার যদি ধরতে পারি তাহলে খুন করব তাকে।

মিনস্কি বলল, তোমার হাতে কোন অস্ত্রই নেই আর তুমি শুধু সবাইকে খুন করবে বলছ।

ক্রাম্প চুপ করে গেল। মিনস্কি ঘুমিয়ে পড়ল। ক্রাম্প একবার মিনস্কির দিকে তাকিয়ে অভিশাপ দিতে লাগল নিজেকে। ভাবল আজ যদি তার গায়ে জোর থাকত তাহলে মিনস্কিকে এই সুযোগে হত্যা করে সোনাবোঝাই দুটো পুঁটলিই বয়ে নিয়ে যেতে পারত। লক্ষ লক্ষ পাউণ্ড সোনা।

ভাবতে ভাবতে ক্লান্তিতে ক্রাম্পও ঘুমিয়ে পড়ল।

সকালে উঠে অনেকখানি সুস্থবোধ করল তারা। কিন্তু লোকটা শিকার নিয়ে ফিরে এল না দেখে তারা আপন আপন পুঁটলি নিয়ে উঠে পড়ল। মিনস্কি বলল, খাবার পাই বা না পাই, জল ত চাই। তৃষ্ণা আর সহ্য করতে পারছি না।

খুব ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগল তারা। কিন্তু রোদের তাপ বাড়তেই পিপাসাটা তীব্র হয়ে উঠল তাদের আবার। সূর্য যত মধ্য আকাশের উপর উঠে যেতে থাকে ততই ওদের পিপাসা বেড়ে যেতে থাকে। ক্রাম্প কেবল বারবার বলতে লাগল, ঐ দেখ জল।

আসল কথা সূর্যের জলন্ত রোদ এখানে সেখানে পড়ায় জলের ভ্রম হচ্ছিল। ক্রাম্পের গলাটা এমনভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল যে একটু লালারস পর্যন্ত বার হলো না। তার দেহটা এমনভাবে শুকিয়ে গিয়েছিল যে একবিন্দু ঘাম পর্যন্ত বার হলো না। এবার তার কেবলি মনে হতে লাগল সোনা আর জীবন—দুটোর একটাকে তাকে বেছে নিতে হবে। দুটোকে একসঙ্গে ভোগ করতে পারবে না কিছুতেই।

অতীতের কথা মনে পড়ল ক্রাম্পের। তার শুকনো ঠোঁট দুটো ফুলে উঠেছিল। কত খাদ্য পানীয়, কত সুখশান্তি ভোগ করেছে, কত নারীকে ভোগ করেছে, কত লোককে খুন করেছে, কত মেয়েকে অপহরণ করেছে। একে একে সব মনে পড়ল তার।

মিনস্কি তাকে বলল, থাম, চুপ করো। তোমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ক্রাম্প বলল, আমি হচ্ছি স্যার টমাস ক্রাম্প, তুমি আমার চাকর। শোন মিনস্কি, তুমি আমার জন্য দামী পোশাক আর চটি এনে দাও। আমি রাজার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি। এখন আমার চার গ্যালন জল দরকার।

মিনস্কি বলল, তুমি ডুবে মরবে?

আবার ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে চলল তারা। তারা ভাবল একবার থামলে, বোঝাগুলো নামালে আর তারা উঠতে পারবে না বা বোঝাগুলোকে মাথায় তুলতে পারবে না।

টলতে টলতে ওরা এক পা এক পা করে যাচ্ছিল। হঠাৎ ঘাসের ভিতর লুকিয়ে থাকা একটা পাথরে পা লেগে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল মিনস্কি। সে উপুড় হয়ে শুয়ে রইল, উঠল না। এদিকে ক্রাম্প মনে ভাবল মিনস্কি উপুড় হয়ে শুয়ে তাকে লুকিয়ে জল খাচ্ছে।

ক্রাম্প তাই বলল, শুয়োর কোথাকার, সব জল খাবি না। আমার জন্যও কিছুটা জল রাখবি।

টলতে টলতে সে মিনস্কির কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে দেখল জল নেই। তখন সে মিনস্কিকে গালাগালি করতে লাগল। অভিশাপ দিতে লাগল। বলল, তুই সব জল খেয়ে ফেলেছিস। আমার জন্য এক ফোঁটাও রাখিসনি।

মিনস্কি বলল, এখানে জল ছিল না। আমি পড়ে গিয়েছিলাম। কিছুটা বিশ্রাম করার জন্য শুয়ে আছি।

ক্রাম্প ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। বলল, আমি ভেবেছিলাম জল পাওয়া গেছে।

আধ ঘণ্টা তারা সেখানেই রয়ে গেল। জলন্ত সূর্যের কড়া রোদ ওদের দেহের অবশিষ্ট শক্তিটুকু শোষণ করে নিল। পিপাসায় বুকটা ওদের ফেটে যাচ্ছিল। আরও এক ঘণ্টা থাকার পর উঠে বসল মিনস্কি। বলল, এবার আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমি জলের স্রোতের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, আমাদের ডানদিকে একটা গিরিখাতে জল আছে।

ক্রাম্প বলল, হ্যাঁ, একটা ছোট ঝর্ণা পাথর ভেঙ্গে বয়ে চলেছে।

মিনস্কি বলল, এইখানে সোনার পুঁটলিগুলো রেখে যাব। জল খেয়ে ফিরে আসব।

এই কথা বলে সে উঠতে গিয়ে আবার পড়ে গেল। ক্রাম্পও উঠতে গিয়ে উঠতে পারল না।

ক্রাম্প তখন চীৎকার করে বলল, মিনস্কি আমায় জল এনে দাও।

মিনস্কি বলল, তুমি জাহান্নামে যাও। তুমি নিজে উঠে যাও না কেন?

ক্রাম্প তার গায়ে একটা চাপড় দিয়ে বলল, নির্বোধ কোথাকার। জল নিয়ে এস বলছি। না হলে দুজনেরই প্রাণ যাবে।

আবার ওঠার চেষ্টা করল মিনস্কি। ক্রাম্প তাকে ধরে সাহায্য করতে লাগল। কিন্তু কোনরকমে উঠে দাঁড়াতেই সে পাশ চেপে আবার পড়ে গেল।

ক্রাম্প তখন তাকে বলল, শুয়োর কোথাকার, ওঠ, ওঠ বলছি।

মিনস্কি বলল, আমি উঠতে পারছি না।

ক্রাম্প বলল, হ্যাঁ, তুই পারিস কিন্তু মিথ্যা কথা বলছিস। তুই চাস আমি মরে গেলে আমার সোনাগুলো সব নিয়ে পালাবি। কিন্তু আমিও মজা দেখিয়ে দেব। আমার সোনা তুই নিতে পারবি না।

সে তার পুঁটলি খুলে একটা বড় সোনার তাল বার করে মিনস্কির পাশে বসে বলতে লাগল, আমার সোনা তুই কোনদিন নিতে পারবি না। বরং তোর সোনাই আমি নিয়ে নেব।

মিনস্কি যেভাবে পড়েছিল সেইভাবেই পাশ চেপে শুয়ে ছিল। ক্রাম্প সেই সোনার বড় তালটা দিয়ে মিনস্কির মাথায় জোর আঘাত করতেই তার দেহটা একধার জোর কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল একেবারে।

ক্রাম্প গর্জন করতে করতে বলল, তোকে এবার উচিত শিক্ষা দেব।

এই কথা বলে সেই সোনার ভারী তালটা দিয়ে পাগলের মত মিনস্কির মাথাটা ভাঙ্গতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথার খুলিটা ভেঙ্গে থেঁতো হয়ে গেল।

ক্রাম্প হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, আমি বলিনি তোকে খুন

করব। তখন আমার কথা বিশ্বাস করিসনি। এবার বিশ্বাস হবে ত ? এবার তোর আর আমার সোনা আমি একা ভোগ করব।

এবার ক্রাম্প উঠে দাঁড়িয়ে মিনস্কির সোনার পুঁটলিটা তুলতে গেল। কিন্তু সেটা সে মাটি থেকে তুলতে পারল না। বারবার চেষ্টা করেও সেটা তুলতে না পেরে বসে পড়ল। পুঁটলিটাকে ধরে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

পাহাড়ের তলা দিয়ে তখন সেই ঝর্ণাটা বয়ে চলেছিল কুলু কুলু শব্দে। তার স্বচ্ছশীতল জলে সূর্যের ছটা পড়ে চকচক করছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

আলেমতেজোর সীমানা থেকে বেরিয়ে যাবার সহজ পথটা খুঁজে পেতে দেরী হলো না টারজনের। কিন্তু পথটা পেলেও সে পথ ধরে বেশীদূর গেল না। সে বুঝল এখনো তাকে এই পাহাড় এলাকাতেই থাকতে হবে। কারণ এই পাহাড়ের কোথাও সেই টারজন নামধারী লোকটা সান্ড্রা পিকারেল নামে মেয়েটিকে নিয়ে আছে। ওদের দুজনকেই খুঁজছে সে এবং এই পার্বত্য এলাকা একেবারে ছেড়ে চলে গেলে তাদের দেখা আর পাবে না কখনো। তাছাড়া এখন শিকার চাই। তার সঙ্গী বোল্টন আর সে দুজনেই দারুণ ক্ষুধার্ত।

টারজন তাই শিকারের আশায় পাহাড়ের মধ্যেই ঘুরে বেড়াতে লাগল। বোল্টন এ অঞ্চল থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে চাইলেও টারজনকে ফেলে একা যেতে পারছিল না।

টারজন একটা হরিণ মেরে এনে তার খানিকটা মাংস বোল্টনকে দিল। সে দুটো কাঠ ঘষে আগুন জেলে মাংস ঝলসে খেল। সে কাঁচা মাংস খেতে পারে না। টারজন কাঁচা মাংসই খেল।

হঠাৎ বাতাসে দুটো মরা মানুষের গন্ধ পেল টারজন। বোল্টন কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেল না। টারজন বলল, অদূরে দুজন শ্বেতাঙ্গ মরে পড়ে আছে।

এ কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল বোল্টন। সে টারজনের সঙ্গে পাহাড়ের

উপর দিকে কিছুটা উঠে দেখল সত্যিই দুজন শ্বেতাঙ্গের মৃতদেহ পড়ে আছে। সে বলল, কি করে তুমি জানতে পারলে?

টারজন বলল, এটা অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে কোথাও পড়ানো হয় না। লোকদুটো অদূরে জল থাকা সত্ত্বেও পিপাসায় মারা গেছে। এই পুঁটলি দুটোয় খাঁটি সোনার অনেক তাল আছে।

বোল্টন বলল, এদের তুমি চিনতে?

টারজন বলল, হ্যাঁ। এদের একজন আমাকে দুবার হত্যা করতে গিয়েছিল।

সে ক্রাম্পের মৃতদেহটাকে পা দিয়ে দেখিয়ে দিল। বলল, তুমি কি এই সোনাগুলো বয়ে নিয়ে যেতে চাও?

বোল্টন বলল, না, ওদের মত আমিও কি মরব? আমার ওতে দরকার নেই। আমি শুধু এ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যেতে চাই।

সেদিন সকালে রোদ উঠলে সান্দ্রা ঘুম থেকে উঠে ঝর্ণার জল খেয়ে পিপাসা মেটাল। গতকাল সন্ধ্যার সময় সে একটা সিংহের গর্জন শুনতে পেয়েছিল। কিন্তু সে জানত না, গত রাতে সিংহটা ঝর্ণাটার ওপার থেকে চাঁদের আলোয় তাদের দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সিংহ শ্বেতাঙ্গদের গন্ধ পছন্দ করে না। তার উপর তখন তার পেট ভর্তি ছিল বলে সে চলে যায়।

ততক্ষণে তার সঙ্গী লোকটা জেগে ওঠায় তার চোখে চোখ পড়ল। সে বলল, কাল রাতে ঘুম হয়েছিল তোমার?

সান্দ্রা বলল, হ্যাঁ, আমরা দুজনেই খুব ঘুমিয়েছিলাম। জায়গাটা আমার স্বর্গের মত ভাল মনে হচ্ছে। এখানে সারাজীবন থাকতে পারি আমি। এখন আমার একমাত্র কাজ হবে তোমার পূর্ব পরিচয় জানা।

টারজন নামধারী লোকটা বলল, কি করে জানবে?

সান্দ্রা বলল, একটা জিনিস নিশ্চিত করে বলতে পারি, তুমি একজন আমেরিকান ভদ্রলোক। তুমি আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের লোক।

লোকটা বলল, আমি একজন চোর বা খুনীও হতে পারি।

সান্দ্রা বলল, তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

লোকটা সান্দ্রাকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল।

সান্দ্রা বলল, এ জায়গাটার স্মৃতি আমি কখনো ভুলব না।

লোকটা বলল, আমিও না। তবে আগামীকাল এখান থেকে চলে যাব আমরা। তোমার দেহে যাতে শক্তি ফিরে আসে তার জন্য আজকের দিনটাও আমরা বিশ্রাম করব এখানে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বোল্টন দেখল, টারজন নেই। সে ভয় পেয়ে গেল। টারজন কোথায় গেছে তা ভেবে পেল না কিছু।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা শুয়োর শিকার করে নিয়ে এল টারজন। সে বলল, খাওয়ার পরই আমরা যে পথে এসেছি সেই পথে কিছুটা গিয়ে লোকটার খোঁজ করব। আমার মনে হয় ওকে খুঁজে পেতে দেরী হবে না আর। লোকটাকে পেলেই খুন করব আমি।

বোল্টন বলল, সভ্য মানুষ কখনো কোন অপরাধীকে খুন করে না। আইনের সাহায্যে তার শাস্তি বিধান করে।

টারজন বলল, আমি সভ্য মানুষ নই। লোকটার অপরাধের সীমা নেই। সে আমার নাম নিয়ে আমার জানাশোনা আদিবাসীদের গাঁয়ে গিয়ে নারী ও শিশুদের চুরি করেছে। লোকে জানে আমিই এ কাজ করেছি। এইভাবে আমার নামকে কলঙ্কিত করে আমার বিরুদ্ধে আদিবাসীদের মন বিষিয়ে দিয়েছে।

বোল্টন বলল, তা হলেও ও কি বলতে চায় ওর স্বপক্ষে তা একবার শুনবে।

ওরা দুজনে একঘণ্টা পথ চলার পর থমকে দাঁড়াল টারজন। বলল, কারা যেন আসছে। দুজনের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি।

অথচ বোল্টন কিছু বুঝতে পারল না।

সত্যিই সান্দ্রা আর নকল টারজন হাত ধরাধরি করে পাহাড় থেকে উপত্যকার দিকে সেই পথেই নেমে আসছিল।

হঠাৎ টারজন তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সান্দ্রা বলে উঠল, টারজন তুমি ? আমি ত ভেবেছিলাম তুমি মারা গেছ মাথায় গুলি লেগে।

কথাটার কোন উত্তর দিল না টারজন। তার চোখ দুটো তখন সান্দ্রার সঙ্গী লোকটার উপর নিবদ্ধ। সে তাকে জীবনে দেখেনি কখনো এর আগে। এই লোকটাকেই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে।

সে তার সামনে গিয়ে বলল, তুমি তোমার তীর ধনুক ফেলে দাও।

লোকটা বলল, কেন ?

টারজন বলল, কারণ আমি তোমাকে খুন করব।

লোকটা তার তীর ধনুক ফেলে দিয়ে বলল, আমি বুঝতে পারছি না কেন তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও ?

কিন্তু সে ভয় পেল না। ভয়ের কোন চিহ্ন বা লক্ষণ পাওয়া গেল না তার মুখে।

টারজন বলল, আমি তোমায় খুন করব, কারণ তুমি আমার নাম ধারণ করে আমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন গাঁ থেকে অনেক নারী ও শিশু চুরি করে হয়

তাদের হত্যা করেছ অথবা শত্রুদের হাতে ক্রীতদাস হিসাবে তুলে দিয়েছ। আমার বন্ধুরা ভাবছে আমিই এ কাজ করেছি।

সান্ড্রা তাদের দুজনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে বলল, আমার কথা শোন টারজন, তুমি একে খুন করো না।

টারজন বলল, কেন করব না? সে ত তোমাকেও চুরি করেছিল।

সান্ড্রা বলল, দয়া করে আমার কথাটা শোন। লোকটা আসলে খারাপ নয়। কোন কারণে সে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। ও জানত ও-ই টারজন। আমিই ওকে বুঝিয়ে দিয়েছি ও টারজন নয়। আলেমতেজোর রাজা দা গামাই ওকে দিয়ে এই সব কাজ করিয়েছে।

টারজন বলল, আর কিছু তোমার বলার আছে?

সান্ড্রা বলল, আমি ওকে ভালবাসি।

টারজন এবার লোকটার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, তোমার কিছু বলার আছে?

লোকটা বলল, মিস পিকারেল যা বলেছে তা সব সত্যি। আমি জানি না আমি কে, কি আমার পরিচয়। আমি জানতাম না আমি যা যা করেছি তা অন্যায়। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আমি মিস পিকারেলকে তার বাবার কাছে দিয়ে আসতে চাই। আমি যাদের মৃত্যুর জন্য দায়ী তাদের জীবন অবশ্য ফিরিয়ে দিতে পারব না, যারা দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে তাদেরও মুক্ত করতে পারব না। কিন্তু এখন আমি সত্যিই অনুতপ্ত।

টারজন লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল। লোকচরিত্র সে বুঝত। সে বুঝল লোকটা আসলে খাঁটি এবং সে যা বলছে তা সত্যি এবং বিশ্বাসযোগ্য।

টারজন বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাদের ফিরে যেতে সাহায্য করব। তোমাদের দলের অন্য সব লোকরা কোথায়?

সান্ড্রা বলল, পেলহ্যাম ডাটন মারা গেছে বাঁদর-গোরিলাদের হাতে। অন্য দুজনকে আমি দেখিনি।

টারজন বলল, ক্রাম্প আর মিনস্কি মারা গেছে। গতকাল তাদের মৃতদেহ আমি দেখেছি।

সান্ড্রা বলল, ঐ দেখ কে আসছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সেদিন সকালে উঠে টারজনকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল বোল্টন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন সে ফিরে এল না তখন সে নিজেই বেরিয়ে পড়ল টারজনের খোঁজে। টারজন কোন্‌দিকে যেতে পারে

তা অনুমান করে সেইদিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

সান্দ্রা বোল্টনকে প্রথম দেখতে পায়। টারজনও তখন তাকে দেখতে পেয়ে বলে, ও আমার বন্ধু।

বোল্টন টারজনের মত অনেকটা দেখতে আর একটা লোককে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। সে তাদের কাছে আরো এগিয়ে এসে টারজনের মত দেখতে লোকটাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, র‍্যাণ্ড তুমি! আমি ত ভেবেছিলাম দু' বছর আগেই তুমি মারা গেছ।

র‍্যাণ্ড হতবুদ্ধি হয়ে বলল, তুমি হয়ত ভুল করছ। আমি তোমাকে কখনো দেখিনি।

বোল্টন হতাশ হয়ে বলল, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? আমি ফ্রান্সিস বোল্টন শিল্টন।

র‍্যাণ্ড বলল, আমি এ নাম কখনো শুনিনি।

সান্দ্রা আগ্রহের সঙ্গে বোল্টনকে বলল, আপনি একে চেনেন?

বোল্টন বলল, আমি অবশ্যই ওকে চিনি। ও আমাকে চিনতে পারছে না কেন তা বুঝতে পারছি না।

সান্দ্রা বলল, কিছু একটা হয়েছে। ও মাত্র দু'বছরের ঘটনা ছাড়া তার আগের কোন কিছু মনে করতে পারছে না।

বোল্টন বলল, আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়ায় ওর বাড়ি। ওর নাম কলিন র‍্যাণ্ডল্ফ।

সান্দ্রা র‍্যাণ্ডকে বলল, দেখলে আমি তোমায় বলেছিলাম তুমি একজন আমেরিকান। আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসী।

বোল্টন র‍্যাণ্ডকে বলল, এতদিন কোথায় ছিলে?

র‍্যাণ্ড উত্তর করল, আলেমতেজোতে। কিন্তু তুমি ঠিক জান আমি কে? ভুল করছ না ত?

বোল্টন বলল, মোটেই না। আমি তোমাকে ঠিক চিনি।

র‍্যাণ্ড বলল, তবু ভাল একজন আমাকে চেনে। হয়ত আমার স্মৃতিশক্তি অচিরেই ফিরে আসবে।

সান্দ্রা বোল্টনকে বলল, আপনি তাহলে ওর বিষয়ে সব জানেন? ও কি বিবাহিত?

বোল্টন বলল, না, বিবাহিত নয়। আমি ওর সবকিছু জানি। ওর বাবার গৃহভৃত্যদের নাম পর্যন্ত জানি। স্পেনে আমরা একসঙ্গে বছরখানেক ছিলাম আফ্রিকায় আসার আগে।

টারজন সবকিছু শুনে ভাবল সে লোকটাকে খুন না করে ভালই করেছে। এখন যেমন করে হোক এখান থেকে তাদের নিরাপদে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা

করতে হবে। সে তাই বলল, এখন চল। এখান থেকে বেরিয়ে যাবার সহজ পথ একটা খুঁজছি।

টারজন পা চালিয়ে পথ চলতে লাগল। কেউ কোন কথা বলার সুযোগ পেল না। সন্ধ্যার আগে ওরা একটা জায়গায় রাতটা কাটাবার জন্ম বিশ্রাম করতে লাগল। খুব ঠাণ্ডা থাকায় ওরা আগুন জ্বালাল।

সান্দ্রা বোল্টন আর র‍্যাণ্ডের কাছে বসল। সে র‍্যাণ্ডকে বলল, অবশেষে তোমার একটা নাম পেলাম। এতদিন তোমার নাম ধরে ডাকতে পাইনি।

এরপর বোল্টনকে সান্দ্রা বলল, আপনি ওর সম্বন্ধে যা জানেন বলবেন ত?

বোল্টন বলল, হঁ্যা, অবশ্যই বলব। ও খুব কথায় কথায় বাজী ধরত। এই বাজী ধরাই হলো ওর আফ্রিকা আসার কারণ।

সান্দ্রা বলল, কিন্তু আফ্রিকায় এসে আমাকে অপহরণ করার জন্ম নিশ্চয় বাজী রাখেনি। ও ত আমার নামই জানত না।

বোল্টন বলল, তাহলে তার আগের কথা সব খুলে বলতে হবে। র‍্যাণ্ড টারজনের খুব ভক্ত ছিল। টারজনের বই পড়ে ও টারজনের মত হবার চেষ্টা করে। ওর দেহটা বলিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ও ধনুর্বিন্তা শিখতে শিখতে পারদর্শী হয়ে ওঠে তাতে। ও আফ্রিকায় এসে টারজনের মত একা একা বন্তজীবন যাপন করার কথা বলে। আমি বলি ও এক সপ্তাহ আফ্রিকার জঙ্গলে কাটাতে পারবে না। কিন্তু ও শুনল না। স্পেন থেকে আমরা ইংলণ্ডে এলাম। সেখানে একদিন একটা ক্লাবে বসে থাকতে থাকতে একটা কাগজে পড়লাম দক্ষিণ আফ্রিকায় একটা আদিবাসী ছেলে একদল বেবুন বা বনমানুষ জাতীয় জন্তুর হাতে ধরা পড়ে। তারপর ছেলেটা মানুষ হয়েও ঐ বেবুনদের দলে থাকত। র‍্যাণ্ড ঘটনাটার কথা পড়ে বলল, ছেলেটা যদি মানুষ হয়েও ওদের সঙ্গে মিশে যেতে পারে তাহলে আমিই বা পারব না কেন? এই বলে সে বেবুনদের মত হাঁটা-চলা করতে লাগল। আমি বললাম, তুমি সভ্য মানুষ হয়ে তা কখনই পারবে না। ছেলেটা আদিবাসী জংলী বলেই পেরেছিল। র‍্যাণ্ড তখন এক হাজার পাউণ্ড বাজী রাখল।

আমিও তাতে রাজী হয়ে গেলাম। একঘণ্টা ধরে আলোচনার পর ঠিক হলো র‍্যাণ্ড আর আমি দুজনে তার ছোট বিমানটায় করে মধ্য আফ্রিকায় গিয়ে ভাল শিকার পাওয়া যায় এমন একটা জায়গায় নামব। তারপর আমি বিমানে করে অন্ত জায়গায় চলে যাব। একমাস পরে আমি তাকে তুলে নিয়ে যাব সেখান থেকে। আরো ঠিক হলো, কয়েকদিন অন্তর আমি সে যে অঞ্চলে থাকবে তার উপর দিয়ে উড়ে যাব। ধোঁয়ার কুণ্ডলির মাধ্যমে সে আমাকে তার অবস্থার কথা জানাবে। যদি উপর থেকে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলি দেখতে পাই তাহলে বুঝতে হবে সে ভালই আছে আর যদি দুটো কুণ্ডলি দেখা যায়

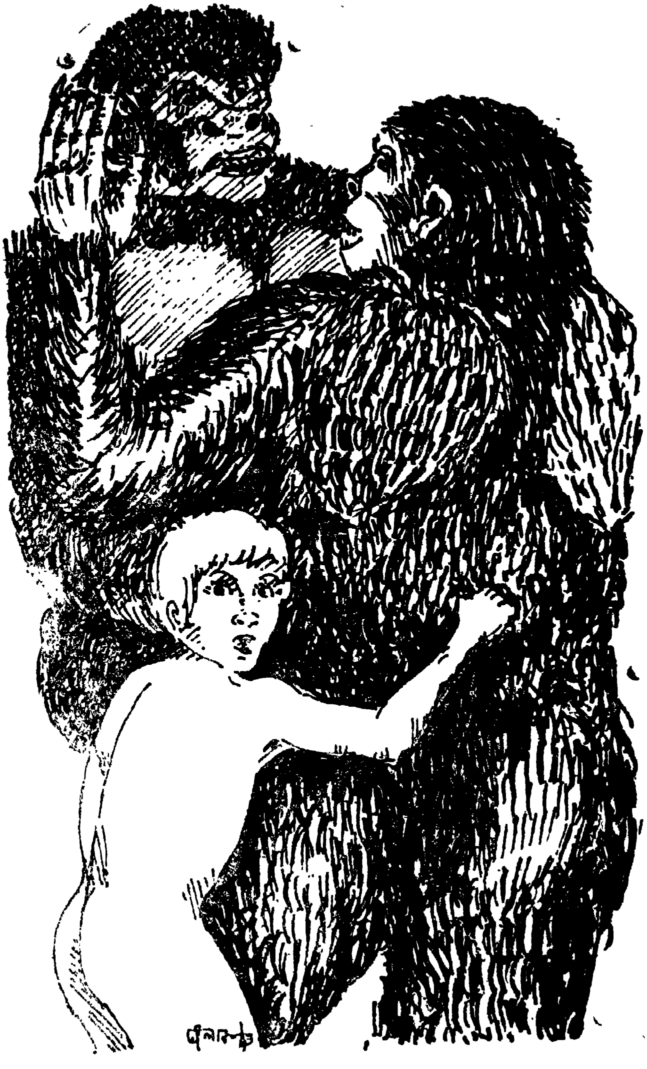

তাহলে বুঝব সে বিপদে পড়েছে এবং সাহায্য চায়। সে যদি টারজনের মত বেশভূষা করে একমাস সেখানে টিকে থাকতে পারে তাহলে সে বাজী জিতে যাবে এবং :আমি তাকে এক হাজার পাউণ্ড দেব আর না পারলে সে আমাকে এক হাজার পাউণ্ড দেবে।

আমরা মধ্য আফ্রিকায় গিয়ে নামবার মত একটা ভাল জায়গার খোঁজ করতে লাগলাম। কিন্তু ক্রমেই কুয়াশায় ঢাকা এক পার্বত্য এলাকায় গিয়ে পড়লাম। কুয়াশাটা এত ঘন ছিল যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না আমরা। তার উপর এঞ্জিনটা বিগড়ে গেল। বিমানটা কোথায় নামাব তা ঠিক করতে পারলাম না। তার আগেই র‍্যাণ্ড টারজনের মত বেশভূষা পরে ও অস্ত্র নিয়ে তৈরী হয়েছিল। একসময় র‍্যাণ্ড আমাকে ঝাঁপ দিতে বলল। বলল, পাহাড়ের উপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। ঝাঁপ দিলেই পায়ের তলায় পাহাড় পাবে। তখনি ঝাঁপ দিলাম আমি। তারপর দু বছর ধরে আর র‍্যাণ্ডের দেখা পাইনি।

সেখানে আমি র‍্যাণ্ডের অপেক্ষা করলাম অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু সে না আসায় আমি একটা গাঁয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম। পরে বুঝলাম সেটা নিগ্রো মুসলমানদের গাঁ। সুলতান আলি আমাকে বন্দী করে রাখল। ক্রীতদাস হিসাবে আমি সোনার খনিতে কাজ করতাম। তারপর আলেমতেজোর যোদ্ধারা আমায় বন্দী করে। সেখান থেকে যুদ্ধের সময় পালিয়ে এলে টারজনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

সান্ড্রা র‍্যাণ্ডের কাছে গিয়ে বলল, তারপর তোমার কি হলো র‍্যাণ্ড? তোমার কি সে কথা কিছুই মনে নেই?

র‍্যাণ্ড বলল, আমি ঝাঁপ দিয়ে আলেমতেজোর রাজপ্রাসাদের কাছে গিয়ে পড়ি। ওখানকার লোকরা বলতে থাকে আমি আকাশ থেকে পড়ি; আমি মানুষ নই, দেবতা। এরপর আর কিছু মনে নেই আমার। বিমান চালানোর কথাও মনে নেই আমার।

বোল্টন বলল, অথচ আমি জানি তোমার মত ভাল পাইলট দেখা যায় না। আমি ত জীবনে কখনো দেখিনি।

সান্ড্রা বলল, কিন্তু বিমানটা পড়ল কোথায়?

বোল্টন বলল, আলেমতেজোর কাছাকাছি কোথাও হয়ত পড়েছে সেটা।

র‍্যাণ্ড বলল, তাহলে ওরা ত সে কথা বলাবলি করত। কিন্তু কিছু ত বলেনি।

সান্ড্রা বলল, এও এক রহস্য।

সে রাতটা সেখানে কাটিয়ে পরদিন সকাল হতেই উপত্যকার দিকে এগিয়ে যেতে লাগল ওরা। পথে ক্রাম্প আর মিনস্কির দেহের হাড়গুলো ছড়িয়ে থাকতে দেখল। মাংসগুলো হায়েনা আর শকুনিতে এর আগেই সব

খেয়ে শেষ করেছে।

ওরা কিন্তু সহজ পথটা খুঁজে পেল না। তার থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়ল। মালভূমি থেকে অনেকটা নিচে এক মাইল বিস্তৃত গাছপালাহীন একটা জায়গায় ওরা যেতেই টারজন ওদের দেখাল, ঐ দেখ বিমানটা।

বোল্টন লাফিয়ে উঠল আবেগের সঙ্গে। বলল, এটাই ত র‍্যাণ্ডের বিমান।

সান্দ্রা বলল, তা কি করে হবে? এটা ত ভেঙেচুরে যায় নি।

বোল্টন বলল, বিমানটা যদি কোনরকমে আবার চালাতে পারতাম। এর গোটা গা-টা ধাতু দিয়ে গড়া। এটা সহজে ভাঙবে না।

একঘণ্টা ধরে চেষ্টা করার পর জাহাজটার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতে পারল বোল্টন। দরজাটায় জং ধরেছিল। ওরা দেখল বিমানটার যন্ত্রপাতি সব ঠিকই আছে। শুধু চাকার টায়ারগুলো বসে গেছে।

সান্দ্রা বলল, র‍্যাণ্ডই বিমানটাকে নামায়?

র‍্যাণ্ড বলল, আমি নামাইনি। আলেমতেজোর লোকরা বলছিল আমি আকাশ থেকে উড়ে এসেছি।

বোল্টন বলল, আমি বইতে পড়েছি বিমানবাহিনীর অনেক বিমান আপনা থেকে নেমে পড়ে।

কি মনে হতেই র‍্যাণ্ড বিমানটার মধ্যে ঢুকে কেবিনে গিয়ে পাইলটের সীটে বসে পড়ল। সে যন্ত্রপাতি সব পরীক্ষা করে দেখল। কেবিনের ভিতরে নানারকম যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ পূর্ব জীবনের কথা সব মনে পড়ে গেল র‍্যাণ্ডের। সে চীৎকার করে বলতে লাগল, ও সান্দ্রা! আমার সব কথা মনে পড়েছে।

সান্দ্রা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বোল্টন বলল, আমি জানতাম মনে পড়বে। এই কেবিনটাতে তুমি জীবনের অনেকগুলি দিন কাটিয়েছ। তুমি সত্যিই বিমানটাকে ভালবাসতে।

র‍্যাণ্ড বলল, একে একে এবার সব মনে পড়ছে আমার। বোল্টন ঝাঁপ দেবার পর মিনিট পাঁচেক আমি বিমানেই ছিলাম। তারপর আমিও ঝাঁপ দিয়ে আলেমতেজোর প্রাসাদের উঠোনে গিয়ে পড়ি। আমার মাথায় আঘাত লাগে আর তার জন্যই আমার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়।

সান্দ্রা র‍্যাণ্ডকে বলল, তোমার কি মনে হয় বিমানটা আবার উড়তে পারবে?

র‍্যাণ্ড বলল, ও না চাইলেও আমি ওকে ওড়াব।

দু ঘণ্টা কেটে গেল। র‍্যাণ্ড প্রথমে কার্বুরেটারের মধ্যে যে জট পাকিয়ে গিয়েছিল তা ঠিক করল। তারপর তেল কতটা আছে দেখে নিল। তারপর এঞ্জিনটায় স্টার্ট দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রপেলারের ঘর্ঘর আওয়াজ শোনা গেল।

টায়ারে পাম্প দেওয়া হলো।

র‍্যাণ্ড বলল, টায়ার পাম্প না নিলে তোমরা বেরিয়ে যাবে। আমি একা যাব।

সান্দ্রা বলল, না, আমরা কেউ যাব না। সবাই একসঙ্গে থাকব।

র‍্যাণ্ড বলল, তোমরা কেউ সোনার পুঁটলিগুলো নিতে চাও ত নিতে পার।

বোল্টন বলল, আমার কোন দরকার নেই। র‍্যাণ্ড বা টিমথি পিকারেলের মেয়ে সান্দ্রারও কোন সোনার দরকার হবে না। টারজন মনে করলে নিতে পারে।

টারজন হেসে বলল, আমি সোনা নিয়ে কি করব ?

টায়ারগুলো ঠিক হয়ে যেতেই বিমান ছেড়ে দিল র‍্যাণ্ড। বিমানটা মাটি ছেড়ে উপরে উঠলে সান্দ্রা বলল, ঈশ্বরকে সবকিছুর জন্যই ধন্যবাদ।

সমাপ্ত